গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
কার্ত্তিক ১৩৭৬, NOVEMBER, 1969

রঙতরঙ্গিনী বের—

দীপালী সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীগোপাল বিহারী দত্ত কর্তৃক, ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে

নিম এর উপকারিতা

হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে হিতকর বহুযুগ পরীক্ষিত মহোপকারী *নিম*-এর মূল অথচ সক্রিয় উপাদান-গুলি *নিম* টুথ পেস্ট-এ আছে। তাছাড়া *নিম* টুথ পেস্ট-এ রয়েছে 'ফ্লুরাইড' এবং আধুনিক দন্ত বিজ্ঞান সম্মত অন্যান্য উপাদান। *নিম* টুথ পেস্ট-এর হিতকর ফেনা মাড়ী সবল করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁতের ক্ষয় ও পায়োরিয়া নিবারণে সাহায্য করে ও দাঁত ঝকঝকে করে।

নিম টুথ পেস্ট-এর সর্বগুণ সমন্বিত মার্গোক্রিস ট্রুথ পাউডারও পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

গল্প ভারতী সমসাময়িক সাহিত্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব।

গল্প ভারতী নবজাগ্রত জাতির মর্মরাঙা মর্মকাহিনী।

গল্প ভারতী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ।

গল্প ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতি অন্তরের ব্যথা ও বেদনার কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

গল্প ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

গল্প ভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করেছে।

গল্প ভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প ভারতী জাতির ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী পূজা সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট এই যে ইহা শুধু একটি উৎসব ঋতুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সেইজন্যেই দেশব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পূজা সংখ্যা গল্প ভারতী বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে।

গল্প ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

আজই গল্প-ভারতীর গ্রাহক হউন

সডাক বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ১৫৲

যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন: ৫৫-৩২৯৪ ও ৫৫-১০৪৫

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেকই ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ লইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও সুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৩২৯
শক্তিপূজা ও শক্তি সাধনা		৩৩১
সঙ্গীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা	—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩১
কার্টুন		৩৩৫
বন্যা কন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩৩৭
প্রাচীনা ধরণী	—বাসন্তী বাগচী	৩৪৯
আসা যাওয়ার পথের ধারে তীর্থ পথের দিনলিপি	—শ্রীমতী জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৩
পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ	—দুর্গাদাস লাহিড়ী	৩৬৫

আমাদের দেশবাসীর ও পৃষ্ঠপোষকগণের সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ুক এই কামনা করছি এবং দেশ গড়ে তোলার সমস্ত কাজে আমরা সর্বাঙ্গীন সহায়তা ক'রব, নতুন করে আবার এই শপথ নিচ্ছি।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

উত্তরে টানছে
রুক্ষ বাতাস
স্বাভাবিক ভাবে মনে পড়ে

সুষমা

ট্রান্সপ্যারেন্ট
গ্লিসারিন সাবান

পি, স্টে এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

এই সংখ্যায়

ঘটনা-দুর্ঘটনা (গল্প)	—ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়	৩৬৯
গুমতির সেই ভাঙ্গা ঘরে ,,	—রঞ্জত রায় চৌধুরী	৩৭৫
তৃতীয় মেয়েটির মুখ ,,	—নির্ম্মলেন্দু গৌতম	৩৮১
চুম্বন ,,	—সুজন রায়	৩৮৬
একটি গল্প এবং অনুশীলা ,,	—সমর বসু	৩৯৩
বৈধব্য ,,	—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৪০১

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা
সিমলার বিখ্যাত
বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত

শাখা :
৫/৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ১৩-১৮৯৯
২৮, শতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬

হেড অফিস : ৫৬/২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৪৫০

সব মানুষের জন্য
আর
সব কলমের জন্য

সুলেখা
স্পেশাল
ব্লু-ব্ল্যাক ★ ব্রাউন ব্লু
ব্ল্যাক ★ ব্লাউন

সুলেখা
এক্‌জিকিউটিভ
পার্মানেন্ট : ব্লু-ব্ল্যাক, রেডি ব্লু
ও সুপার ব্ল্যাক
স্পেশেল : ব্রাউন ব্লু, এমারেল্ড
গ্রীন ও ভায়োলেট শেড

সুলেখা
জেনারেল
ব্লু-ব্ল্যাক ★ ব্ল্যাক
ব্রাউন ব্লু ★ রেড
গ্রীন • ভায়োলেট

আপনার পছন্দমত
যে-কোনটি
ব্যবহার করুন

সুলেখা
ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২

Progressive/SW-40 B

এই সংখ্যায়

এই প্রথম

উপচার (গল্প)	শ্রীমতী অঞ্জলী দে	৪১২
বাঙলার অবহেলিত গ্রাম		
বাঙলার গ্রাম : তারাপীঠ ও নাগুর	—গৌরীশংকর দে	৪২৩
খেলাধুলা	—জ্যোতির্ময়	৪২৭
বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ	—হেমেন্দ্রকুমার রায়	৪৩১
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৩৭
পুরনো দিনের কথা	—হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী	৪৪৫

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

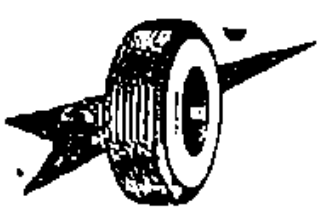

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল লক্ষ্যের উপযোগী।

ভেষ্ট • জাম্পার • বেনিয়ান • সোয়েটার • পাইওনীয়ার ফুল • শর্ট হাতা • স্লিভলেস জার্সী • পোলোনেক • সিমফিট • ওপেন ব্যাসিক • টুপ্যানেক • উইন-টেষ্ট • পাইওটেষ্ট ও অন্যান্য প্রভৃতি বিভিন্ন ষ্টাইলের পাওয়া যায়।

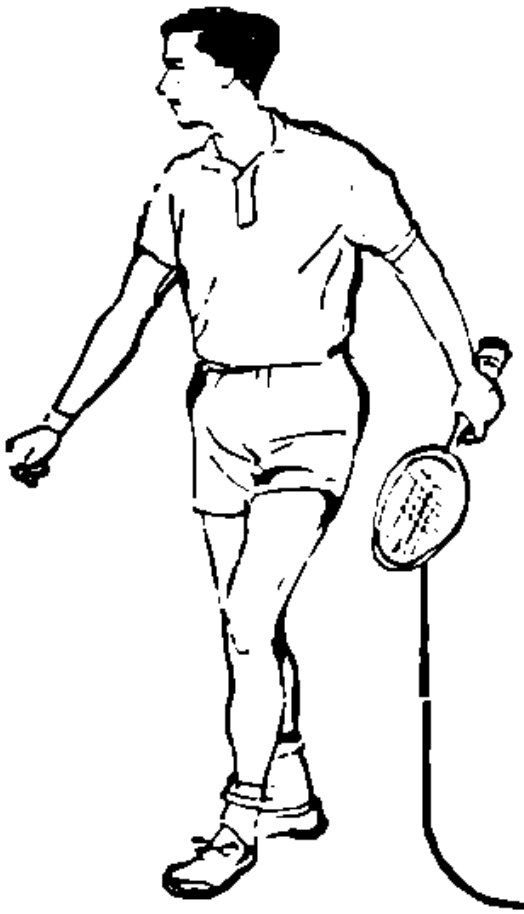

* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেনিস সার্ট • চেন সার্ট • ড্রয়ার ও ব্রীফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধোত ও প্রস্তুত।

ফোন: ৫৬-২৯৮০

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

মেয়ে মজলিশ

দীপান্বিতা উৎসব ও মেয়েরা	—বেলা দে	৪৫৩
শিশু পালনে মা বাবার দায়িত্ব	—আভা পাকড়াশী	৪৫৫
রঙ্গমঞ্চে পোষাক	—শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়	৪৫৬
সুন্দর স্বাস্থ্য লাভের জন্য মাত্র পাঁচ মিনিট	—বেবা রায়	৪৫৭
নারী সমাজের অপরাধ প্রবণতা	—অরুণা মুখোপাধ্যায়	৪৫৯
ধার নেওয়া-দেওয়া	—তৃপ্তিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬১

নতুন জীবনের নতুন প্রয়োজন।

নতুন জীবনের দাবী মেটাতে নবজাতকের জননীকে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনে। সন্তান প্রসবের পুর্বে ও পরে সমভাবে উপযোগী।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

OBL

ভাইনো-মল্ট

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, DECEMBER, 1969
একত্ত-জয়ন্তী সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীদোল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

দাঁত ও মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে

নিম এর উপকারিতা

হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে হিতকর বহুযুগ পরীক্ষিত মহোপকারী *নিম*-এর মৃদু অথচ সক্রিয় উপাদান-গুলি *নিম* টুথ পেস্ট-এ আছে। তাছাড়া *নিম* টুথ পেস্ট-এ রয়েছে 'ফ্লুরাইড' এবং আধুনিক দন্ত বিজ্ঞান সম্মত অন্যান্য উপাদান। *নিম* টুথ পেস্ট-এর হিতকর কেনা মাড়ী সবল করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁতের ক্ষয় ও পায়োরিয়া নিবারণে সাহায্য করে ও দাঁত ঝকঝকে করে।

নিম টুথ পেস্ট-এর সর্বগুণ সমন্বিত মার্গোক্রিস টুথ পাউডারও পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৪৬৭
কার্টুন		৪৭০
কংগ্রেস	—সন্তোষকুমার মজুমদার	৪৭১
কল্পতরু মহোৎসব	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৮১
পুরাতন পাতা		
বাংলার বৈশিষ্ট্য	—বিপিনচন্দ্র পাল	৪৮৫
বাঙলার অবহেলিত গ্রাম		
হাবড়া	—গৌরীশঙ্কর দে	৪৮৯

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা
সিমলার বিখ্যাত
বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত

শাখা :
৫/৬, বেরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-১৮৯৯
১৮, মতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬

হেড অফিস : ৫৩/২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৪৫০

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, অনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ঘ্রাণ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও সুখরোচক হয়।

শ্রীলতা দেবী

এই সংখ্যায়

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

রোঁদা আমাকে যা শিখিয়েছেন — মূল—স্টিফান জোয়াইগ, অনুবাদ—নীলাদ্রি সোম — ৪৯৭

গল্প

অমিত্রাক্ষর ছন্দ — —কুমার মিত্র — ৪৯৯

দুর্ঘটনার আলোয় — —বিজনকুমার ঘোষ — ৫১৪

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

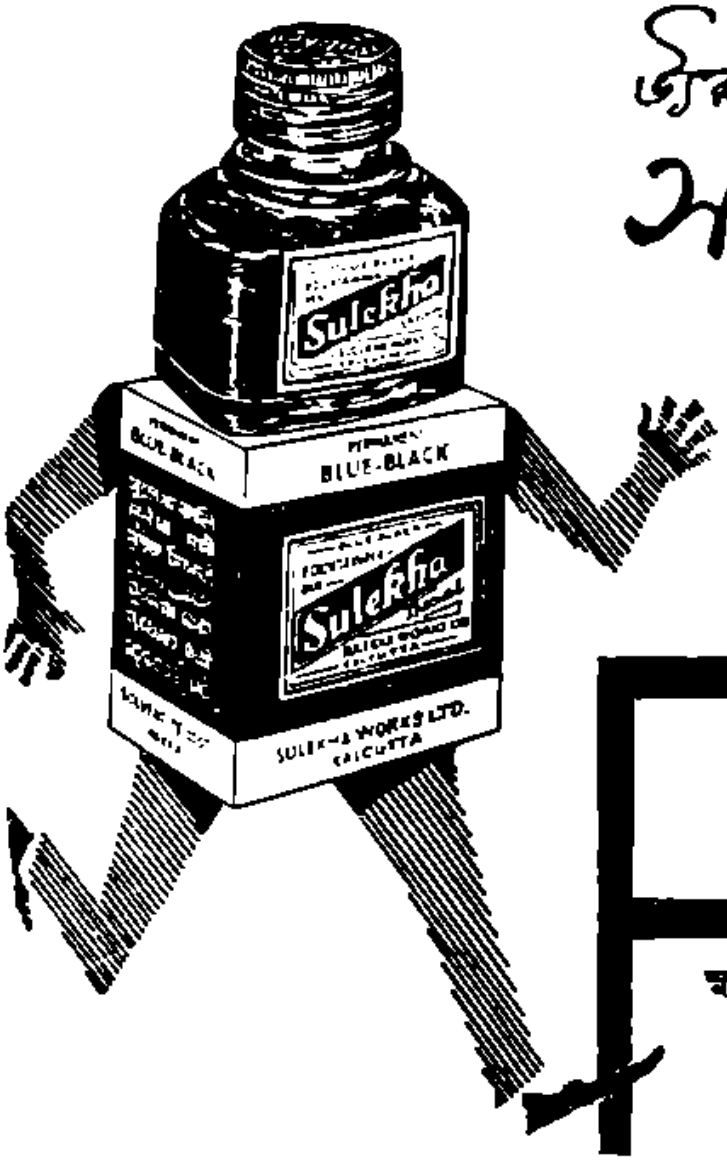

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষতায়

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিট' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ৭১২০ এম·এল· সাইজে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

এই সংখ্যায়

গল্প

জনৈক নাগরিক	—সুশীল সিংহ	৫২১
যে কাহিনী চিরকালের	—সুজন রায়	৫২৯
মাকুনা	—সরিৎশেখর মজুমদার	৫৩৪
রক্ত সন্ধ্যা (এই প্রথম)	—তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪২
পুরনো দিনের কথা	—হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী	৫৪৭
পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ	—দুর্গাদাস লাহিড়ী	৫৫৬

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকলে ব্যবহারের উপযোগী।

ক্রেইন • জেনারিল • রেমো • লাক্সি • পাইওনীয়ার ফুল • ব্রাইট আই • সিলভার আই' • 'ব্রাইটেক্স' • সিকাফ • কুপার বাস্টিটেক্স • ইন্টারলক • উইন-টেক্স' • 'পাইওটেক্স' • জনতা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রাণ্ড-এর পাওয়া যায়।

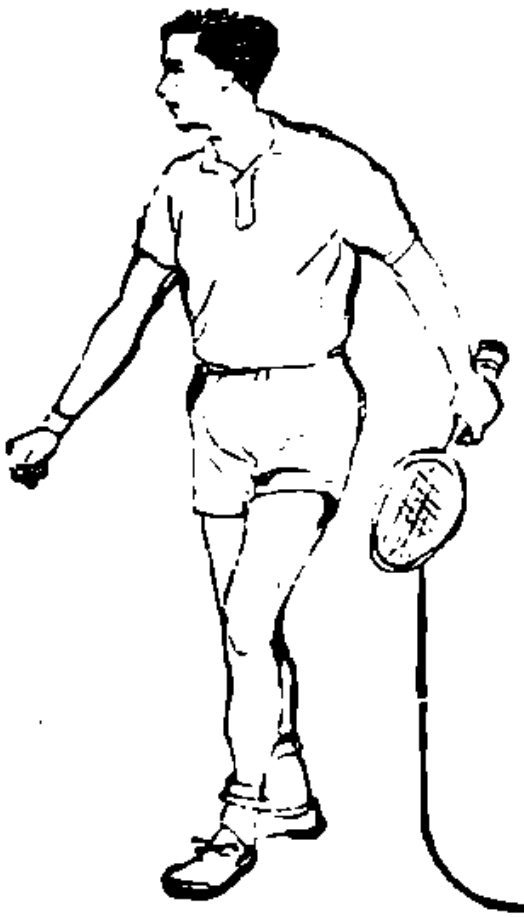

* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেবিস সার্ট • চেক সার্ট • ড্রয়ার ও ব্রা.ক 'প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত 'প্রণালীতে ধোত ও প্রস্তুত।

ফোন': ৫৬-২১৮৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

মেয়ে মজলিশ

এলো শীতের বেলা	—বেলা দে	৫৭১
শীতে রূপচর্চা	—মধুলা ও মঞ্জরী	৫৮০
জয়পুরী শিল্পের উৎস	—হেমপ্রভা মল্লিক	৫৬৪
শুনুন, একটা অভিনব খাদ্যের কথা	—সুরঞ্জনা সেন	৫৯৬
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৬৮
খেলাধূলা	—জ্যোতির্ময়	৫৭৫

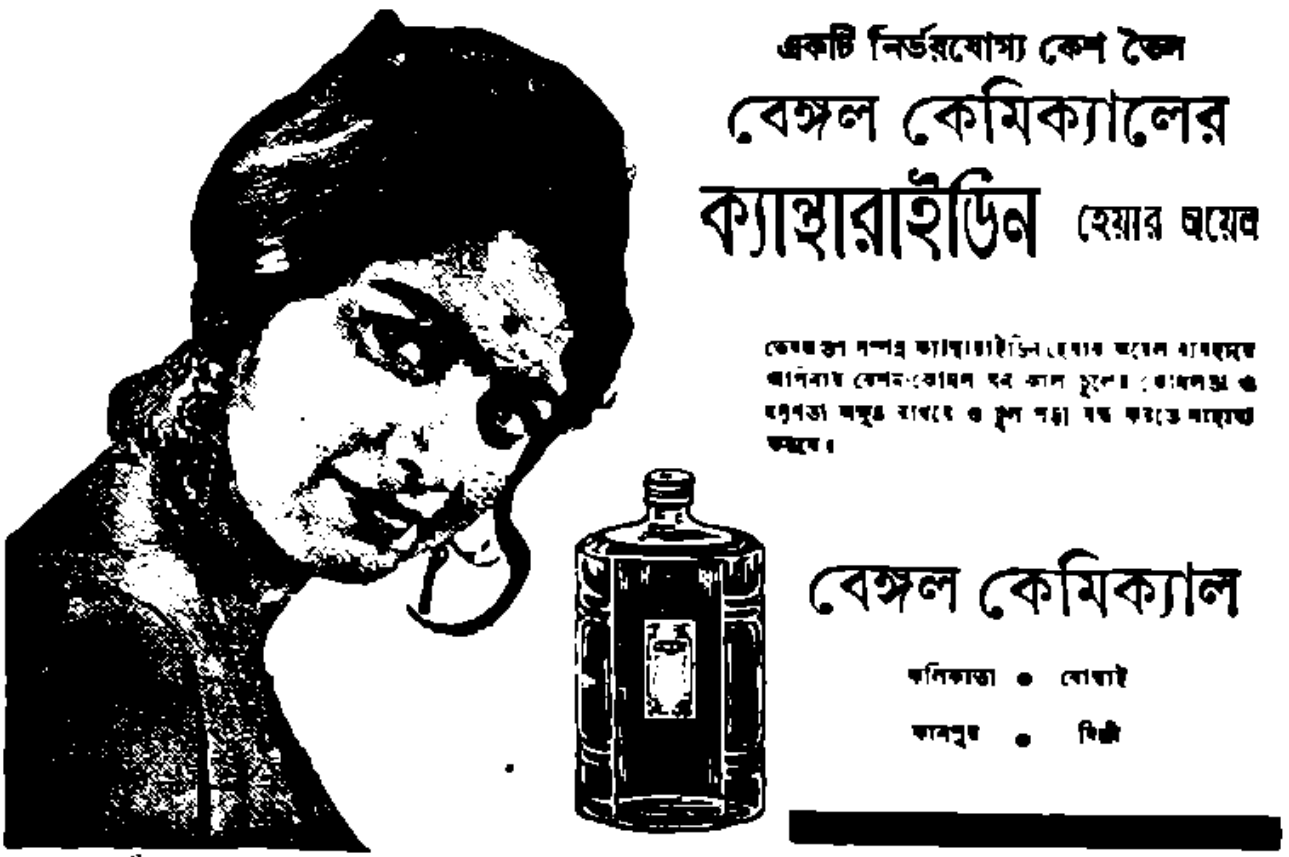

রাজধানী একসপ্রেস

গতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের এক নতুন রূপায়ণ

বিলম্ব ও ঝুলোবালিমুক্ত, বিলাসবহুল ও আরামপ্রদ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ট্রেনে মাত্র ১৭ ঘণ্টা ২০ মিনিটে হাওড়া থেকে দিল্লী ভ্রমণ করুন—ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার ভ্রমণের রোমাঞ্চ অনুভব করবেন। 'প্যান্ট্রি-কার'-এর সুব্যবস্থা আছে, সেখান থেকে আপনার আসনে চমৎকার আহার্য—সন্ধ্যার চা, রাত্রের খাবার ও প্রাতঃরাশ—পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আছে। খাবারের জন্য আলাদা কোন দাম ধরা হবে না।

প্রতিবারেই অমৃতবাজার-এ ভ্রমণ করুন

সপ্তাহে দু'বার—হাওড়া থেকে সোমবার ও শুক্রবার

নয়াদিল্লী থেকে বুধবার ও শনিবার

প্রথমশ্রেণী—	৯০ টাকা	অতিরিক্ত
দ্বিতীয়—	৫৮০ টাকা	অতিরিক্ত

পূর্ব রেলওয়ে

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

পৌষ ১৩৭৬, JANUARY, 1970

গল্প-ভারতী ৫৫

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহ: সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা

বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীঘোষ বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য মন্দির প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
১৩বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার কেশসংস্কার বন্ধ হবে, চুলের কোমলতা ও চকচকে ভাব বজায় থাকবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

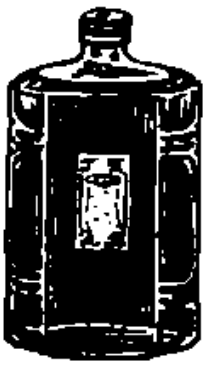

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

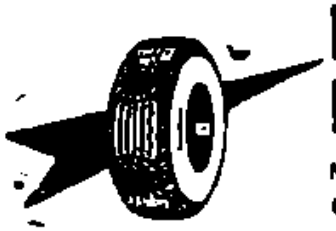

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৫৯৩
ভজন গান	—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯৬
বন্যাকন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৫৯৭
যে কাহিনী চিরকালের	—সুজন রায়	৬০৯
পিছনের জানালায়	—রামপদ মুখোপাধ্যায়	৬১০
এই তো মানুষ	—নির্মলেন্দু মাজা	৬১৫
আমাদের খাওয়া পরার বিজাতীয় প্রভাব	—গৌতম	৬৩০
মানুষ চেনা	—মহেশ ন্যায়রত্ন	৬৩৩
প্ল্যাঞ্চেটের আসরে	—বাসন্তী বাগচী	৬৩৫

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা
সিমলার বিখ্যাত
বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত
হেড অফিস : ৫৬/২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৪৫০
শাখা :
৫/৯, বেথুন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ১৩-১৮৬৯
১৮, শতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকলের মনোমত

উপযোগী।

ক্রেপ্টন • রেনাইল • রেমী • লাক্সি • পাইওনীয়ার কুল • ব্রাইট আই • সিল্কার আই • 'ব্রাইটেক্স' • সিল্কাক্স • সুপার মাল্টিটেক্স • ইন্টারলক • উইন-টেক্স • 'পাইওটেক্স' ও অন্যান্য প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রাড-এর পাওয়া যায়.

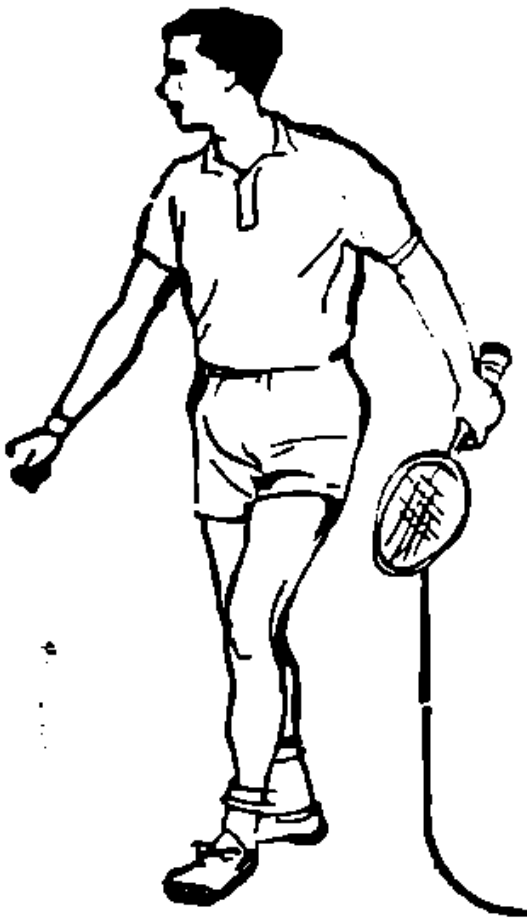

* দেখতে সুন্দর
* আরামপ্রদ
* টেকসই

টী-শার্ট • টেনিস শার্ট • চেন শার্ট • ড্রয়ার ও ব্রীফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধোত ও প্রস্তুত।

ফোন : ৫৩-২১৮৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

নক্ষত্রের জন্ম	—উমা দে শীল	৬৩৮
এই প্রথম		
ছেঁড়া তার	—বিমান দত্ত	৬৪৩
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৫০
খেলাধূলা	—জ্যোতির্ময়	৬৫৭
আমরা মেয়েরা	—মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫৯
মেয়েরা অজলিশ		
মহিয়সী নারী জননী পুতলীবাই	—প্রবাজিকা বেদপ্রাণা	৬৬৩
আমার ডায়েরী	—শিউলি ঘোষ	৬৬৫

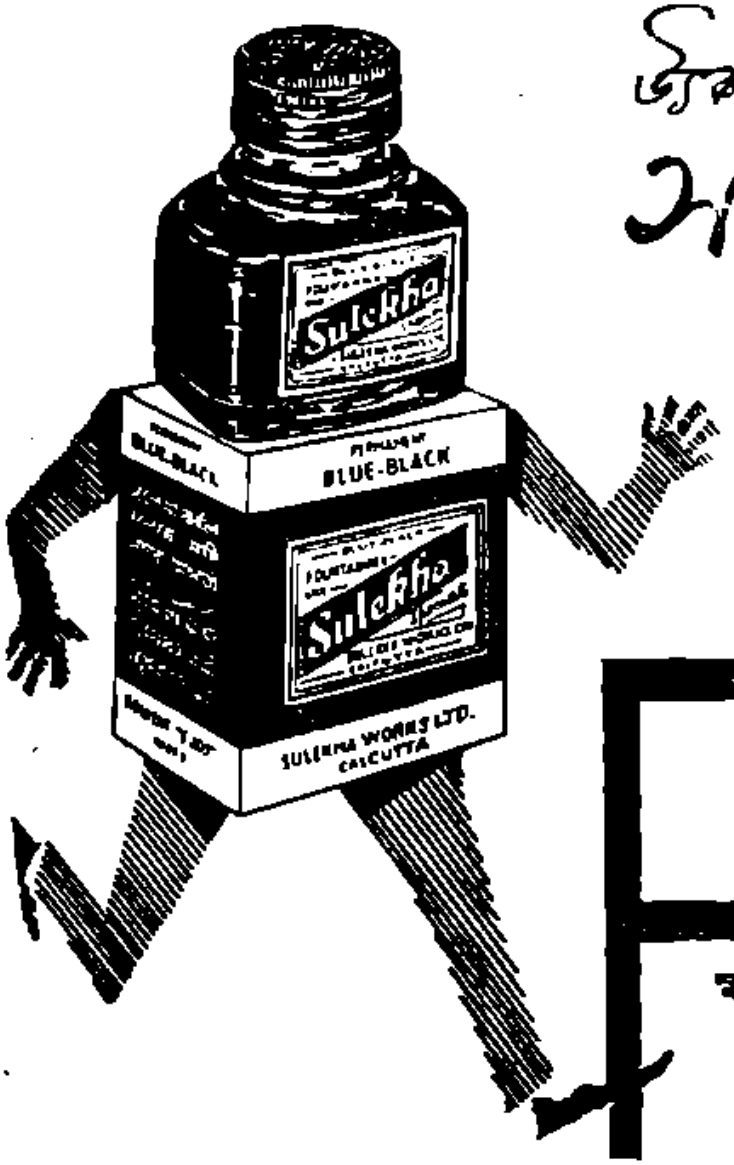

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে :
'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম,
'সিকুরিটি' সিলিং ওয়াক্স,
'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রং
৫ এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ৭১২ এম-এল সাইজে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৬৮৯
বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র		৬৯২
ভাববার কথা	—সদানন্দ	
ভান	—শক্তিপদ রাজগুরু	৬৯৫
একটি ছুটির দিনের দুপুর	—মানবেন্দ্র পাল	৭০১
চোখ	—সরলকুমার মুখোপাধ্যায়	৭০৬
যে কাহিনী চিরকালের	—সুজন রায়	৭০৯
আবার সেই জেল	—বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	৭১৮
বিপ্লববাদের ব্রহ্মা		
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		৭২৫

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা
সিমলার বিখ্যাত
বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত
হেড অফিস : ৫৬/২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন :-৫৫-১৪৫৩

এই সংখ্যায়

গল্প ভারতীর পাতা থেকে

স্বদেশী যুগের স্মৃতি —অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় ১৩৪

বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের এইপথ

অনুশীলন সমিতি— ১৪৪

শরৎচন্দ্রের চরিত্রের একটি দিক —শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৪৮

এই প্রথম

অপরাহ্নবতী [উপন্যাস] —সুবোধ সিংহ ১৫৩

পরিবার কল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা

এখনই আর সন্তান নয়

তিনটির পর একদম নয়।

যে কোন নিকটবর্ত্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে

যোগাযোগ করুন।

পঃ বঃ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

এই সংখ্যায়

কন্যাকুমারীর গল্প	—অরুণা মুখোপাধ্যায়	৭৬৮
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৬৯
মেয়ে মজলিশ		
আজকের সমস্যা	—বেলা দে	৭৭৪
আদর্শনারী শ্যামমোহিনী দেবী	—মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়	৭৭৫
অতি কৌতূহলী হয়ে বিপাক	—গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়	৭৭৮
টুকিটাকি		৭৮১
রান্না শিখুন	—কল্যাণী মুখোপাধ্যায়	৭৮২

লক্ষাধিক প্রচারিত
নির্ভীক, নিরপেক্ষ,
স্বাধীন, সংবাদপত্র

যুগান্তর

সুষ্ঠু ও সবল জনমতের
স্বচ্ছ দর্পণ।

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৭৯১
কার্টুন		৭৯৩
গল্প ভারতীর পাতা থেকে		
হোরি গান	—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯৪
শ্রীচৈতন্যের হোলী লীলা	—দ্বিজপদ গোস্বামী	৭৯৭
বন্যা কন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭৯৯
কল্লোল ও কালিকলম	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৮০৯
বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি পত্রাবলী	—নীলকান্ত গুপ্ত	৮১৩

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS ●

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিংয়ে পত্রিকা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

গল্প-ভারতী

২৭১ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,

কলিকাতা - ৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৪

এই সংখ্যায়

সরীসৃপ (গল্প)	—তুষারকান্তি ঘোষ	৮১৬
আবার সেই জেল	—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	৮১৯
গানের মেলায়	— শম্ভু ঘোষ (মহারাজ)	৮২৫
যে কাহিনী চিরকালের	—সুজন রায়	৮৩০
খেলাধূলা	— জ্যোতির্ময়	৮৩৬
জীবন-নাট্যের খণ্ডচিত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষ	—অনাথ উপাধ্যায়	৮৪০
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৮৪৫
আলেখ্য (গল্প)	—গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়	৮৫১

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা
সিমলার বিখ্যাত
বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত
মেন অফিস : ৫৬/২, রাধাচুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৪৫৩

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

এই প্রথম

দণ্ড	—ইভা রায়	৮৫৯
অপরাহ্নবর্তী [উপন্যাস]	—সুবোধ সিংহ	৮৬৫
বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের এইপথ অনুশীলন সমিতি —		৮৭৩

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশগুচ্ছ সুস্থ ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার কেশমূলগুলি দৃঢ় হবে, চুলের কোমলত্ব ও মসৃণতা অক্ষুণ্ণ থাকবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

সব মানুষের জন্য
আর
সব কলমের
জন্য

সুলেখা
স্পেশাল
ব্লু-ব্ল্যাক * রয়াল ব্লু
ব্ল্যাক * রয়াল

সুলেখা
এক্‌জিকিউটিভ
পার্মানেন্ট : ব্লু-ব্ল্যাক, রেড ব্লু
ও সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেবল : রয়াল ব্লু, এমারেল্ড
গ্রীন ও ওয়াশেবল রেড

সুলেখা
জেনারেল
ব্লু-ব্ল্যাক * ব্ল্যাক
রয়াল ব্লু * রেড
গ্রীন * ওয়াশেবল

আপনার পছন্দমত
যে-কোনটি
ব্যবহার করুন

সুলেখা
ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২

Progressive/SW-458

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৮৮৭
কার্টুন		৮৯০
'ধারার মেলা' শুশুনিয়া	—রামপ্রসাদ সরকার	৮৯১
কল্লোল ও কালিকলম	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৮৯৩
আবার সেই জেল	—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	৮৯৮
গল্প ভারতীর পাতা থেকে		
ভাঙ্গাগড়া	—অন্নপূর্ণা গোস্বামী	৯০৫
সেরা আদমী	—বিজনকুমার ঘোষ	৯১১
বিচিত্র বীন	—শিশির মজুমদার	৯১৯

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এটি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিস।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

যে কাহিনী চিরকালের রবীনসন ক্রুশো	—সুজন রায়	১৩১
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫৯
খেলাধূলা	—জ্যোতির্ময়	১৪৬
মধুমালতী	—হেমন্তবালা দেবী	১৭৯
এই প্রথম অপরাহ্নবতী [উপন্যাস]	—সুবোধ সিংহ	১৫১
বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের এইপথ অনুশীলন সমিতি—		১৬১

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী

সন্দেশ বিক্রেতা

সিমলার বিখ্যাত

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

মেন অফিস : ৫৩/৫, রাজেন্দ্রলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-১৪৩৩

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

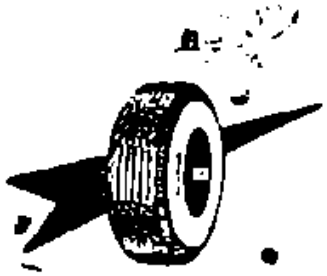

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিংয়ে পত্রিকা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কাপ রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

গল্প-ভারতী

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,

কলিকাতা—৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৩

এই সংখ্যায়

•

ক্রোড়পত্র

মেয়ে মজলিশ

বর্ষশেষ	—বেলা দে	১
একটি সমস্যা	—শকুন্তলা	২
ভবিষ্যৎ গৃহিণীর প্রতি উপদেশ	—শ্রীহেমন্তবালা দেবী	৩
দক্ষ ঠাকুরাণী	—শ্রীকণা দেবী ভারতী	৬
মা	—বেলা দেবী	৯

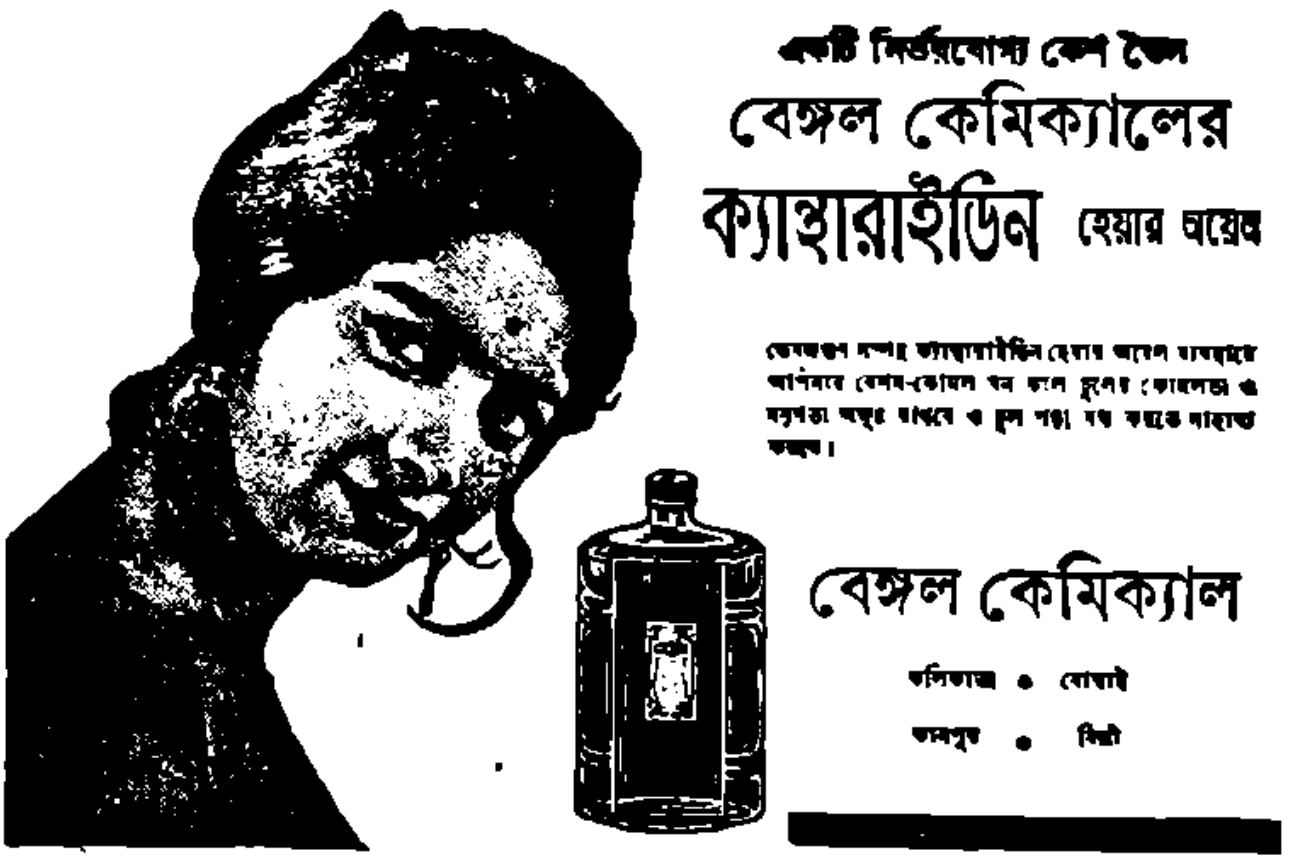

অস্বাস্থ্যকর মাড়ীই
দাঁতের ক্ষয় ও মুখের দুর্গন্ধের কারণ

মাড়ীর সুস্থতার জন্য **নিমের** উপকারিতা হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

নিম টুথ পেস্ট-এ **নিমের** সমস্ত গুণই রয়েছে

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

CNP-IB-6981

রজত জয়ন্তী বর্ষ

পঞ্চবিংশতি বর্ষ, দীপালী সংখ্যা

সম্পাদকীয়

মৃন্ময়ী মা

প্রতিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্ষমাপন্ন ভাবতাম—মাতৃমূর্তির এরকম প্রলয়ঙ্করী রূপ কেন?

ভাবতাম—কে এই প্রতিমার পরিকল্পনা করেছিলেন আর কেনই-বা জননী মূর্তির এমন সংহাররূপ?

যখনই কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এই মূর্তি পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করেছেন আমি আগ্রহের সঙ্গে তা পড়েছি। পড়ে কিন্তু খুশী হতে পারিনি। লেখা পড়ে কখনও-বা মনে হয়েছে লেখক নিজেই বুঝতে পারেন নি, আবার কখনও বা দেখেছি 'প্রলয়ঙ্করী' 'করালবদনা' 'মুণ্ডমালিনী'—এমনি সব বড় বড় বিশেষণ দিয়ে বুঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।

একবার ভেবেছিলাম কোনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে অনুরোধ করবো—কালীপূজার আবাহন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রগুলির বাংলা ব্যাখ্যা করে আমাকে বুঝিয়ে দিতে। তাহ'লেও বা এই বিসদৃশ মূর্তি পরিকল্পনার কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো।

কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এবং অনেক পুরাণগ্রন্থে এইরকম কালীমূর্তির বর্ণনা পেয়েছি, কিন্তু ব্যাখ্যা পাইনি।

এমন দিনে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা মনে হলো—তিনি লিখেছেন,—

'আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমায় দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাতে তোর শস্যভরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।

একবার ভেবেছিলাম রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাই জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয়নি।

পরে বুঝেছি অন্যায় করেছি। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত ছিল। আমার যথাযথ উত্তর একমাত্র তিনিই দিতে পারতেন।

তা যখন হয়নি, তখন নিজের কাছেই তার জবাব চেয়েছি।

—এই যে কালীমূর্ত্তি— এই যে ভয়ঙ্করী প্রতিমা, এ প্রতিমা আনন্দময়ীর প্রতিমা নয়। সাধকেরা এই ভয়ঙ্করী ভীষণ মূর্ত্তিকে মা বলে ডেকেছেন। শাস্ত্রকারেরা এই মূর্ত্তিটিকে কোথাও এতটুকু মধুর শান্ত ও সুখকর করবার চেষ্টা করেন নি। জননীমূর্ত্তির এমন সংহারক্রপ আমরা কোথাও কখনও দেখিনি।

জীবনের উষালগ্নে যে জননীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় সেই জননীই আজ তাঁর সত্যরূপে প্রকটিত হয়েছেন।

কালী—অর্থাৎ কালের ভয়াংশ—আমাদের অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনকাল। এই জীবনকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—নিরাসক্ত এবং নিষ্ক্রিয় মহাকালকে স্পর্শ করে তারই উপর প্রতিষ্ঠিতা। আমাদের সেই ক্ষণস্থায়ী জীবনকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী কি বলছেন?

বলছেন, এখানে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই সত্য।

যে মা আমি তোমাদের জন্ম দিয়েছি সেই মা-ই আমি তোমাদের সংহার করবো।

তার জন্য অবশ্য আমার লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই।

প্রকৃতির এই অমোঘ বিধান আমাকে পালন করতেই হবে।

কিন্তু তাই বলে তোমরা সেই মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে ভয় পেয়ো না।

উভয় হস্ত উত্তোলন করে তাই মা বলছেন—মা ভৈঃ!

তোমাদের জীবনের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে অর্থাৎ শত্রুকে বিনাশ করবো আমি। তোমাদের সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করবো আমি। তোমাদের বর দান করবো আমি। তারপর জীবনের ভোগকাল শেষ হলেই মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম করে আমিই তোমাদের নিয়ে যাব নব নব জীবনের অমৃতলোকে।

এ-সত্য তোমাদের অজানিত নয়। তোমরা সবই জানো। কিন্তু মায়ারূপিণী আমিই তোমাদের কাছ থেকে সে- সত্য গোপন করে রেখেছি। সৃষ্টি-রহস্যের খেলাটা ভাল জমবে বা বলে মৃত্যু এবং পরবর্তী জীবনের মাঝখানে আমিই টেনে দিয়েছি বিস্মৃতির একটি কৃষ্ণ যবনিকা।

আজ এই অমানিশার সন্ধিপূজালগ্নে তুলে দাও সেই কৃষ্ণ যবনিকা। চোখ চেয়ে তাখো সেই মহাসত্যকে। দেখে নিশ্চিন্ত হও। নিঃশঙ্ক হও।

এই মহাশক্তিরূপিণী মহাকালীর কৃষ্ণ যবনিকা উত্তোলন করে নিঃশঙ্ক এবং নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভবতারিণী মা-কালী সাক্ষাৎ জননীরূপে প্রকটিতা হয়েছিলেন তাঁর কাছে।

পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিকামনায় বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরা সবলেই শক্তি প্রার্থনা করেছিলেন এই মহাশক্তি দেবী কালিকার পদপ্রান্তে।

এমন কি সুভাষচন্দ্রের বিস্ময়কর অন্তর্ধানের পরমুহূর্তে তাঁর পরিত্যক্ত শূন্য গৃহে দেখা গিয়েছিল দেবী কালিকার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি। ভারতবর্ষের মুক্তিকামনায় দুর্দ্ধর্ষ বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার শক্তি তিনি প্রার্থনা করেছিলেন এই মহাশক্তিরূপিণী কালিকার কাছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শক্তিপূজা

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর শক্তিসাধনায় এক নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ধ্যানে মৃন্ময়ী বঙ্গজননীর মধ্যে চিন্ময়ী বিশ্ব-জননীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি গাহিয়াছিলেন—'বন্দেমাতরম্'। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন মায়ের তিনটি রূপ—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। মা যা ছিলেন, 'মা যা হইয়াছেন' ও 'মা যা হইবেন'। দুঃশৈশবকুষ্ট শুচিক পীড়িত বাংলার বুকে যখন মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে তখন দেশমাতৃকার মধ্যে কালিকার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

কালী-অন্ধকার-সমাচ্ছন্না-কলিমাময়ী। ছন্নছন্নছাড়া এই ভস্ম নায়িকা। আজ দেশের সর্বত্রই শ্মশান তাই মা কঙ্কালমালিনী। হায় মা! 'কমলাকান্তের দুর্গোৎসবে' তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বলিতেছেন—যদি দশভূজা দশপ্রহরণধারিণী জননীকে আবার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে আলস্য ও ইন্দ্রিয়শক্তি বিসর্জন দিতে হইবে এবং সকল ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইতে হইবে।

বাংলা দেশের একজন সাধক কবি গাহিয়াছেন—শক্তিপূজা কথার কথা নয়, (শ্যামা) যদি কথার কথা হতো চিরদিন ভারত শক্তিপূজা করে শক্তিহীন হতো না" বাস্তবিক আমরা যুগে যুগে শক্তিপূজার গভীর তাৎপর্য বিস্মৃত হইয়াছি। বাহিরের আচার অনুষ্ঠানকে আমরা প্রাধান্য দিয়াছি কিন্তু আমাদের মধ্যে যে প্রসুপ্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে উহাকে জাগ্রত করিনাই, আর এইভাবে যখনি আমরা শক্তিসাধনার তাৎপর্য বিস্মৃত হইয়াছি তখনই আত্মপ্রত্যয় আত্মপরিচয় হারাইয়া আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। যে মহাশক্তি রহিয়াছেন বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মূলে, যাঁহারা চরণে শরণ করিয়া সাধকেরা মরণজয়ী হইয়াছেন একমাত্র সেই মহাশক্তির আরাধনার দ্বারাই মানুষের দেহের ও মনের রূপান্তর সাধিত হইতেপারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ যে শক্তি সাধনায় বাঙালীকে দীক্ষা দিয়াছেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন তার উত্তর সাধক। স্বদেশী যুগে বাংলার যে সব বীর সন্তান দেশ মাতৃকার বন্ধন মোচনের জন্য আত্মাহুতি দিয়াছিলেন তাঁহাদের শক্তি সাধনার গুরু ছিলেন ত্রয়ী বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব। উত্তরকালে দুর্গমপথের যাত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই দীক্ষাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনে প্রচণ্ড বাধাবিঘ্নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই মহাশক্তির ধ্যানই করিয়াছেন সুভাষচন্দ্র এবং বিপুল শক্তির অধিকারী হইয়াছেন।

অমাবস্যার নিশীথে গাঢ় অন্ধকারে যখন চতুর্দিকে সমাচ্ছন্ন, দীপাবলীর আলো যখন ম্লান বা নির্বাপিত, সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা যখন মনকে উদাস করিয়া তোলে সেই সময়ই শ্যামা পূজার প্রশস্ত সময়। আজ সীমাহীন দুর্গতির মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা যেন অন্তরের সত্যিকারের পূজা করিতে পারি এবং সকল প্রকার ভয় ও দুর্বলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি—এই হউক আমাদের প্রার্থনা।

সত্যিই তো ব্রহ্মময়ীর সন্তান আমরা আমাদের আর ভয় কি? অভীঃ অভীঃ ভয় নাই, ভয় নাই—এই ভাবনা অনুক্ষণ অন্তরে জাগরূপ রাখিয়া আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। যদি দুর্জয় মনঃশক্তি ও একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা আমরা ভয়কে জয় করিতে পারি তবেই আজিকার দুর্দিনেও আমাদের শক্তি পূজা সার্থক হইবে। আমরা আমাদের চরিত্র শক্তি ও আদর্শ ফিরিয়া পাইব। আমরা সত্যিকারের পূজা, সত্যিকারের জীবনপন-সাধনা ভুলিয়াগিয়াছি, তাই আজ আমাদের এই অন্তহীন দুর্গতি।

সঙ্গীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৩।২৪ সালের কথা। আমি তখন কলেজের ছাত্র। তখন কলকাতায় সঙ্গীত সম্মেলনের এতটা ঘটা ছিল না—সঙ্গীত চর্চাও এত ব্যাপক হয়নি। নামকরা সঙ্গীত বিদ্যালয় দুই একটি ছিল এবং তখন বাঙ্গালার রাজন্যবর্গ ও ধনী সমাজ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সঙ্গীত-আসর সাধারণতঃ বসত রাজদরবারে, সৌখীন সঙ্গীত-রসিক ধনীগৃহে এবং কয়েকটি বহুকালের প্রতিষ্ঠিত ক্লাবে। আর মুরারি উৎসব এবং শঙ্কর উৎসব ছিল, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত দুইটি বৃহৎ বাৎসরিক সঙ্গীত সম্মেলন। বাঙ্গলার অনামধন্য মৃদঙ্গাচার্য্য মুরারি মোহন গুপ্তের স্মৃতি বাৎসরিক উপলক্ষে মুরারি সম্মেলন এবং শিবরাত্রির পরদিন 'শঙ্কর উৎসব' হত। প্রথমটির প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা ছিলেন, মুরারি মোহনের সুযোগ্য শিষ্য মৃদঙ্গাচার্য্য পণ্ডিত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও তদীয় শিষ্যবৃন্দ এবং দ্বিতীয়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৃদঙ্গাচার্য্য দীননাথ হাজরা মহাশয়ের যোগ্য শিষ্য অনন্যসাধারণ মৃদঙ্গ বাদ্য শিল্পী খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দুর্লভ ভট্টাচার্য্য ও খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উভয়ই ছিলেন সৌখীন বাদ্যবিশারদ, তাঁরা সঙ্গীত ব্যবসায়ী ছিলেন না। তাঁদের পরিচালিত সম্মেলন দুইটি তখনকার দিনে বাঙ্গলা দেশে শুধু সঙ্গীতের মানরক্ষা করত তাই নয়, সঙ্গীতের নিয়ন্তা ছিল ঐ সম্মেলনদ্বয়। সমগ্র বাঙ্গলায় এতদ বিরাট সঙ্গীত অধিবেশন কোথাও হত না। বাঙলার বাইরে যত গুণী ও সঙ্গীত রসিক এই সম্মেলনে যোগদান করার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন। উত্তর কলকাতায় শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহ সংলগ্ন রাস্তা ঘিরে মুরারি সম্মেলন এবং শটলডাঙ্গায় মল্লিকবাড়ীর প্রাঙ্গনে শঙ্কর উৎসব হত। উভয় সম্মেলনেই বহুসহস্র শ্রোতার সমাবেশ হত এবং সকলে একাগ্রচিত্তে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গুণিগণের সঙ্গীত শুনতেন। আসরে ধ্রুপদের স্থানই প্রথম ও প্রধান ছিল এবং ধ্রুপদের আসর সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বিপুল জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। তারপর খ্যাল এবং যন্ত্রাদি হত। বাঙ্গালা চিরকালই বহিরাগত শ্রেষ্ঠ গুণিগণকে মর্য্যাদা দিয়েছে এবং তাঁরা বাঙ্গলাতেও শিল্পীগণ এখন যেভাবে সম্মানিত হন, তা অন্যত্র বিরল।

তখনকার দিনে, মুরারি সম্মেলনে বা শঙ্কর উৎসবে, নূতন শিল্পীদের গুণ যাচাই হ'ত। এই সম্মেলনে যাঁরা পারদর্শিতার যথাযোগ্য পরিচয় দিয়ে প্রশংসা ও সম্মান লাভ করতেন, তাঁরাই বাঙ্গলায় ওস্তাদ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতেন। উপরোক্ত সঙ্গীত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষেরা Box office-এর ধার ধারতেন না—শিল্পবর্গ প্রদত্ত চাঁদায় সুচারুরূপে অধিবেশন সম্পন্ন হত। শিল্পীরা এখানে অবশ্য দক্ষিণা পেতেন না বা কেউ নিতেন না, কিন্তু তাঁদের এই আসরে প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যৎ সম্মান ও অর্থাগমের পথ সুগম করত।

অযোগ্য গুণী বা শিল্পীদের দরবারের নামে বা ঘরানার দোহাই দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ কল্পনাতীত ছিল। এমন শোনা গেছে তৎকালীন অনেক বহিরাগত শিল্পী আসরে তাঁদের ইপ্সিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে না পেরে ফিরে গেছেন দেশে, আবার নব উদ্যমে সাধনা দ্বারা পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। গুণের বিচার বিষয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বা খগেনবাবু অভিনয় স্পষ্টবাদী ছিলেন—মিথ্যা স্তুতিবাদ প্রবঞ্চনার সামিল মনে

করতেন। আবার যখন প্রকৃত যোগ্যতার পরিচয় পেতেন, তখন তাঁদের উদার অন্তঃকরণ আনন্দে ভরে উঠ্‌ত এবং শতমুখে সর্বজন সমক্ষে প্রশংসা করে উৎসাহ দান করতেন। মুরারি সম্মেলন ও পঙ্কজ উৎসবের তৎকালীন বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন লছমী প্রসাদ মিশ্র (প্রসিদ্ধ বীণকার ও গায়ক), পণ্ডিত বিষ্ণুনাথ রাও (প্রসিদ্ধ বাঈয়া ও ধ্রুপদ গায়ক), রাধিকা প্রসাদ মিশ্র, কেরামতুল্লা খাঁ (প্রসিদ্ধ সরোদ বাদক) শিবসেবক ও পশুপতিসেবক মিশ্র এবং মহীয় পিতৃদেব প্রমুখ গুণিগণ।

তখনকার দিনে বহিরাগত যে সকল সঙ্গীতজ্ঞ স্থায়ীভাবে বাঙ্গলায় বাস করতেন, তাঁরা বাঙ্গলার আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিতেন, শুধু যে তাঁরা বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করতেন তা নয়,—তাঁরা বাঙ্গলা গান ধরণ দিয়ে গেয়েছেন। মারাঠা ওস্তাদ বিষ্ণুনাথ রাও, বাঙ্গলা দেশে আসেন উনবিংশ শতকের শেষভাগে। তখন তিনি যুবক—খামার ও তারানায় অদ্বিতীয়, যদিও ধ্রুপদ খ্যাল প্রভৃতিতেও তাঁর প্রভূত খ্যাতি ছিল। বাঙ্গলায় এসে মুরারি সম্মেলনে গাইবার সুযোগ হল, স্বীকৃতি পেলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিল্পকলায় পারদর্শিতায়। ধরণী শিল্পী বাঙ্গলার সঙ্গীত সংস্কৃতিতেও আকৃষ্ট হলেন। এত বড় ওস্তাদ কিন্তু তিনি শ্যামাসঙ্গীত এবং অন্যান্য বাঙ্গলা গান কি মধুরভাবে গাইতেন, তা যাঁদের শোনার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা জানেন। এচ্‌ এম্‌ ভি. রেকর্ডে প্রদত্ত, 'এমন দিন কি হবে তারা', 'তারা তারা তারা বলে' প্রভৃতি তাঁর গানগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাঙ্গলার কোন এক পল্লীগ্রামে প্রভাত ফেরী গেয়ে চলেছে—'হর-হর-হর, বম্‌-বম্‌-বম্‌, বাবে শিবগৌরী'—গানটি তাঁর এত ভাল লেগেছে যে তা' শুনে শিখে শিখে রেকর্ডে গেয়ে গেছেন। তিনি আজীবন এই বাঙ্গলা দেশেই কাটিয়ে ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বাঈজী গহরজানকে অপূর্ব ধরণী কণ্ঠে গাইতে শুনেছি—

'বসন পর মা বসন পর মা',
'মজ্‌ল আমার মন ভ্রমরা'

প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শ্যামা সঙ্গীত। আলটাদ উৎসবে মুস্তারীবাঈ, রবীন্দ্রসঙ্গীত "মজিরে মন কে" সুন্দরভাবে পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতার আনন্দ বর্ধন করেছেন। তাই মনে হয়, তাঁদের ছিল উদার মনোবৃত্তি, শিল্পভাবের মধ্যে সংকীর্ণতার লেশ ছিল না—তাঁরা বাঙ্গলাকে অনেক কিছু দান করেছেন আবার বাঙ্গলার সঙ্গীত ভাণ্ডার থেকে নিয়েছেনও অনেক কিছু। এই সংখ্যায় কমলাকান্ত রচিত একটি বিখ্যাত শ্যামা সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রদত্ত হল—

সিন্ধু খাম্বাজ—দাদরা

মজ্‌ল আমার মন ভ্রমরা
কালীপদ নীলকমলে।
চরণ কালো ভ্রমর কালো
কালো কালোয় মিশাইল।
সুখ দুখ সমান হ'ল
আনন্দ সাগর উথলে।
কমলাকান্তের মন আশা পূর্ণ এতদিনে
দেখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান যন্ত্র
ব্রহ্ম দেখে ব্রহ্ম মিলে।

১´ ০ ১´ ০ ১ ।
সা । রমা | জ্ঞরা সপ্‌ধ্‌ । প্‌ । সা | প্‌ সা । । । ধ্‌
ম ঝ্‌ ন০ | ০০ আ০ যায় ম ন্‌ ভ্র | ম য়া ০ ০ ০

—আমরা বেশ আছি

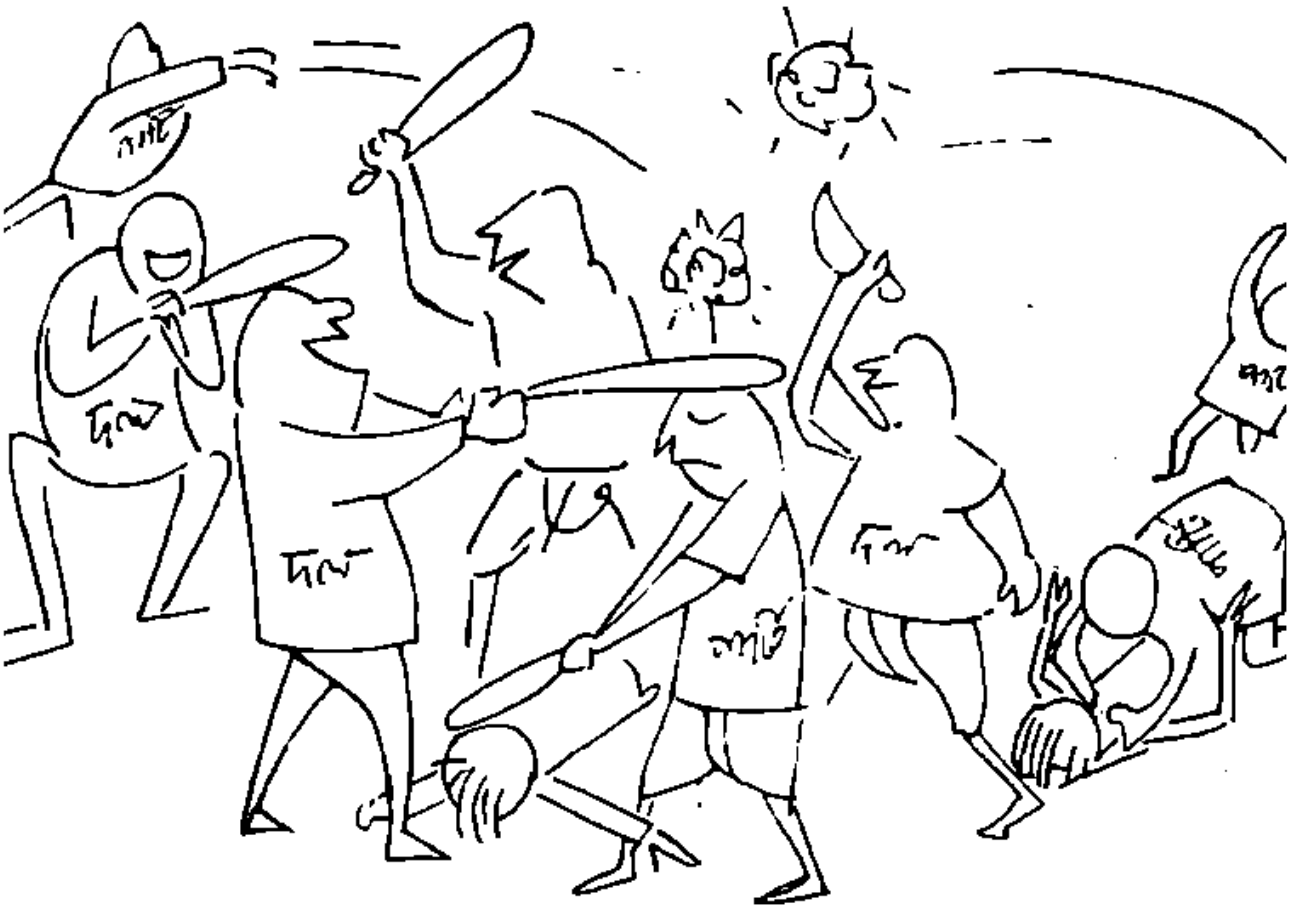

আমরা ঘুচাবো মা তোর দৈন্য
মানুষ আমরা নহি তো মেষ ॥

বন্যাকন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে। সে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?]

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার কার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা অজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের

সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক শীযুষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে দর্পিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস্ দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সাহিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আগ্রহান্বিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে

উঠল। হিমাংশুই তার হরিন মন্দির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্বাসন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে ছদ্দিন জুড়াই। সন্দীপের কথা মনেপড়ল। সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা দিতে। হিমাংশু নিলনা, বললে, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে দেবে সেদিন খাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভয় ঢুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে ভুল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বস-এর পাল্লায় পড়ে সুবীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে শেখাল মদ খেতে। একটা কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুবীর আর নিজের দর্প পালন করল না। বিরোধ ঘুমায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুবীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু মাতলামির পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে

ঘষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হলনা। তখন কুমারী সেজে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কমলেশ তার ফি বাবদ এমন এক জিনিস দাবি করল যাতে বনছায়া রাজি হতে পারল না।

সেবারের পার্টিতে হিমাংশু বেশিকরে মদ খাইয়ে সুবীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম লাবণি, তাকে বলে দিল যেন সুবীরকে একেবারে তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুবীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুবীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্দীপ সেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে। নিজে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চটে গিয়ে সুবীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুবীর বনছায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে তারপর অনুরোধ করল হিমাংশুকে ধরে তাকে বম্বেতে উচ্চতর পদে বদলি করিয়ে দিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্দীপের অন্তরলোকে দ্বন্দ্ব সুরু হল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শক্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সে উদাসীন থাকতে পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে সুবীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্দীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের বাঁটোয়ারা হয়ে গেল—এক ঘরে সুবীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুবীর তার ঘরে একটা ক্লাব বসাল যাতে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। লেখার জন্যে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্দীপেরই দ্বারস্থ হল। দেখল সন্দীপ সযত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠায় সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্দীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্দীপের বাড়িতে বসে উপন্যাস নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক শ্রীযুত হুতের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল শ্রীযুত। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখে গিয়েছি।]

সাক্ষাৎ

ঠোঁট ভিজিয়ে চুক চুক করে বিষ্যি মদ খাচ্ছে বনছায়া—গ্লাস হাতে নিয়ে পীযূষ তাই দেখছে একদৃষ্টে। হ্যাঁ, স্পষ্ট মদ—কোনো ছলনা নেই। তরল ঠোঁট, উজ্জ্বল চোখ, আরক্ত মুখ—স্পষ্ট বনছায়া।

পীযূষের কাছে এই মৃদু মদের চেয়েও বেশি মনোরম।

গোপন কী কথা আছে এই সম্বন্ধে পীযূষের কোনো মোহ ছিল না। সে জানত কোনো একটা লেখা তাকে পছাতে চাইছে, কিন্তু তার জন্যে এই যে দুঃসাহসিক পরিবেশ রচনা—গোপন কথা ও নিরিবিলি দেখা করার প্রস্তাব—এতেই বনছায়া মোহময়ী হয়ে উঠেছে। মদিরা কি শুধু পানীয়ে? মদিরা কথার সুরে, মদিরা চোখের ইঙ্গিতে। একটি কটাক্ষ যেমন বিষমাখা করে দিতে পারে তেমনি আরেকটি কটাক্ষ পারে চকিতে বিহ্বল করে তুলতে।

'আমার জন্যে কিছু এনেছ তো?' হাসি-খুসি মুখে জিজ্ঞেস করল পীযূষ।

'কিছু—' যেন ভড়কে গেল বনছায়া। তাকাল করুণ চোখে।

'কোনো লেখা-টেখা? ছোট গল্প বা রম্যরচনা বা ভ্রমণকাহিনী বা অমনিতরো কিছু?'

'কিছু-টিছু নয়,' বনছায়া চোখ নাচিয়ে আলোর ঝলক তুলে বললে, 'আপনার জন্যে সমস্ত এনেছি।'

'সমস্ত?' গ্লাসটা শেষ করে চোখ বড় করে তাকাল পীযূষ।

'হ্যাঁ, একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস।'

'তাই বলো।' হো-হো করে হেসে উঠল পীযূষ। বললে, 'আমি ভেবেছিলাম—'

পেটে মদ গিয়েছে, তাই বনছায়াও অনায়াসে মাত্রা ডিঙিয়ে যেতে পারল। বললে, 'যা ভেবেছেন তাই। কিন্তু লেখাটা 'প্রবাহে' ছাপতে হবে।'

'নিশ্চয়ই ছাপব। কই এনেছ লেখাটা?' অতি-উৎসাহে হাত বাড়িয়ে দিল পীযূষ।

'আদ্যোপান্ত এনেছি।' বনছায়া ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাল: 'কিন্তু এখানে পড়বেন?'

'পড়ব না, দেখব। দেখবও না, শুধু ধরব।'

কালো চোখে গরল মেখে তাকাল বনছায়া।

সেই গরলই পীযূষের মনে হল অমৃতের মত। জিজ্ঞেস করলে, 'উপন্যাসের কী নাম রেখেছ?'

'একাকিনী।'

'এ নাম চলবে না। একাকিনী বললেই কী রকম শোকাকুলা মনে হয়। কী জানি লাইনটা একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে—'

'সেই একাকিনী নয়। আমার নায়িকা অন্য অর্থে একাকিনী। বলতে পারেন, অবিবাহিতা—ব্যাচেলার ওম্যান, কেরিয়র-গার্ল, বলতে পারেন, স্বাধীনজীবিনী—'

'তার মানে ওল্ড মেড—'

'না। বরং বলতে পারেন ম্যান-হাণ্টার।'

'ম্যান-হাণ্টার? সত্যি? তবে বেশ হট স্টাফ?'

'দারুণ হট।'

'তবে ডবল-কলমে ছাপব। হট হলেই হিট।' পাণ্ডুলিপিটা হাতে করে অনুভব করল পীযূষ। বললে, 'বেশ জলের মত সহজ করে লিখেছ তো? বেশ খুলে মেলে?'

'খুলে মেলে?' মনোহর করে হাসল বনছায়া।

'হাঁ, আজকালকার সাধারণ পাঠকেরা প্রতীকে-ইঙ্গিতে কিছু বুঝতে রাজি নয়, তাদেরকে সব কথা স্পষ্ট করে সহজ করে বলে দিতে হবে। তারপর দুজনে ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল—শুধু এটুকু বলেই তুমি খালাস পাবে না। তারপর বন্ধ ঘরে কী হল সেটাও বিস্তৃত করে তোমাকে বলতে হবে।'

'তা বলতে হবে বৈকি।' মিটি-মিটি হাসল বনছায়া: 'দরজায় খিল দেবার পর দুজন তো ঝগড়া-মারামারিও করতে পারে।'

'তা হলে লেখক তো সেটা এমনিতেই লিখবে। ধরো যেখানে নায়ক-নায়িকা মিলিত হতে যাচ্ছে সেখানে—সেটাই যখন লেখকের বলবার উদ্দেশ্য—তখন, সেখানে কী হবে?'

'নায়ক-নায়িকা যদি স্বামী-স্ত্রী হয়—'

বনছায়ার কথার উপর পীযূষ একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল: 'ধুর—ধুর! বিশুদ্ধ স্বামী-স্ত্রী অচল। স্বামী হলে পরস্ত্রী আর স্ত্রী হলে পরপুরুষ আনতে হবে। তেমনতরো নায়ক-নায়িকার বেলায় শুধু দরজায় খিল চাপিয়ে ভাগ দিয়ে দিলেই আর চলবে না, আরো কিছু প্রাঞ্জল মানে প্রাণ-জল-করা বর্ণনা ছাড়তে হবে।'

'বড় জোর আরেকটা লাইন শুধু লেখা চলে—তারপর সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে দিল—'

'মোটে এইটুকু? বন্ধ দরজার বাইরে ক্ষুধার্ত পাঠক যদে আছে, তাদের কথা ভাববে না? তাদের তুমি অন্ধকারে রেখে দেবে? তারা শুধু অন্ধকার দেখবার জন্যে তোমার বই কিনবে ভেবেছ?'

বনছায়া সহসা কী রকম ম্লান হয়ে গেল। ক্লান্তের মত বললে, 'তার জন্যে অবান্তর বিষয় টেনে আনতে হবে?'

'গল্পটা এমনভাবে টেনে আনবে যাতে বিষয়টা আর অবান্তর না থাকে। আজকাল ঐ অবান্তরটাই বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ওটা যত বেশি জমাট আর জোরালো করতে পারবে ততই তুমি অভ্যর্থিত হবে। ততই তোমাকে বোল্ড বলবে, প্রোগ্রেসিভ বলবে, বলবে জীবনসন্ধানী। আজকাল লেখকদের সুখ্যাত হবার দিন নয়, কুখ্যাত হবার দিন। কি, তোমার উপন্যাসে সেই কুখ্যাতির মশলা আছে তো?'

'কুখ্যাতির মশলা?'

'মানে, জীবনসন্ধান?'

'আছে হয়তো, কিন্তু অতদূর নয়—'

'তবে এই যে বলছিলে তোমার বইটা হট স্টাফ—'

'মানে থীমটা হট। একটি মেয়ে সারা জীবন বিয়ে না করেও কেমন সফল হতে পারল তারই কাহিনী। স্বামী সংসার ও সন্তান না পেলেও যে জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় না, নিঃসঙ্গতাও কত বড় সম্পদ হয়ে উঠতে পারে, কত বড় সহায়, আমি তাই দেখাতে চেয়েছি। প্রথার বাইরে স্বাধীন মেয়ের সামগ্রিক জীবন-বিকাশের ছবি এঁকেছি।'

'তা হলে তোমার নায়িকার জীবনে নিশ্চয়ই প্রেম আছে।'

'এক নয়, একাধিক আছে। শরীরকে সে বাদ দিয়ে বাঁচছে না। সে নানা জায়গায় নানা উপায়ে সায়জ্য খুঁজছে।'

'চমৎকার। সামঞ্জস্য খুঁজছে না বলে বলো পরিতৃপ্তি খুঁজছে।'

'হ্যাঁ, তাইতো—পরিতৃপ্তিই খুঁজছে।' দীপ্ত চোখে সায় দিল বনছায়া: 'সামঞ্জস্যেই পরিতৃপ্তি।'

'একটু তফাৎ আছে।' পীযূষ হেসে উঠল: 'তুমি জল মিশিয়ে মিশিয়ে ক্রমে ক্রমে কথাটাকে সামঞ্জস্য করলে, আমি রস মিশিয়ে গাঢ় করে কথাটাকে পরিতৃপ্তি করলাম। তাই মানে দাঁড়াল একটি মেয়ে বিয়ে না করেও সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকতে পারে।'

'আপনি এত সুন্দর বোঝেন!'

'তা এত বছর ধরে সাহিত্য পত্রিকা চালাচ্ছি, এটুকু বুঝবনা? বুঝি বলেই তো বলছি, স্বাদ বিস্বাদে ঘণ্টা একটু চড়া করো, কথাবার্তা বেশ মাতাল মাতাল—বুঝতে পারছ কী বলছি?'

'বুঝতে পারছি। মানে ভাষাদর্শে খুব ন্যাংটা দিতে হবে—খিস্তি খেউড়।'

'নিশ্চয়। জীবনভিত্তিক উপন্যাস—কথ্য ভাষা তুমি বাদ দেবে কী করে? যাতে খিস্তি খেউড় ব্যবহার করতে পারো তার জন্যে তেমনি দু'চারটি চরিত্র আমদানি করো। ধরো তোমার উপন্যাসের নায়িকা কোনো ঘটনার সূত্র ধরে কোনো বস্তিতে, পতিতালয়ে, এসে উপস্থিত হল, সেখানে একটা কলহের মধ্যে পড়ে গেল—ব্যস, আর কথা নেই, সেই উপলক্ষে ছড়িয়ে দাও কটা নোংরা গালাগাল। তারপর দেখ কেমন হিট করে।'

'কী আশ্চর্য, অমনি কাছাকাছি একটা সিন আছে বইটাতে।'

'থাকলেও নিশ্চয়ই গালাগাল ব্যবহার করতে পারোনি। ওগুলো শিখে নাও। মনতো বলো আমিই আয়গামত বসিয়ে দেব।'

'আপনিই বসিয়ে দেবেন।' মেখায় ভরপুর গলায় বললে বনছায়া।

'আর শোন। সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে দিয়ে পালিয়ে যেওনা। অন্ধকারে একটি বাতি জ্বেলো। নিজের একটা টর্চ কোরো। তোমার পাঠকেরা একটু দেখুক, উপভোগ করুক। সেই কখন থেকে তারা বসে আছে।'

'কখন থেকে বসে আছে!'

'একেকটা উপন্যাস, কী বিরাট তার আয়তন! যেন ঢালা ময়দান! সেই কখন থেকে পাঠক মাঠ ভাঙছে, পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছে, বলি, কিসের আশায়? এখন তুমি যদি দরজার কাছে চেনে এনে ফস করে ঘরের আলো নিবিয়ে দাও, তাহলে তার কী দশা হয়? সে কি তোমাকে আর প্রশংসা করে? বলে, যাচ্ছে লেখক, মামুলী, প্রথামানা, লেকেলে, কাপুরুষ। তাই সাহস দেখিয়ে ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল, আলো জেলে দেখাও কী হচ্ছে না হচ্ছে, তারপর দেখ কেমন তোমাকে সে তারিফ করে, মান দেয়, মালা দেয়। আধুনিক লেখক—শুধু লেখক নয়, মহিলা লেখক, অশ্লীল উপন্যাস লিখেছে, কী রকম সোরগোল পড়ে যাবে কল্পনাও করতে পারোনা। এক বইয়েই বিখ্যাত হয়ে যাবে। তোমাকে আগেই বলেছি সাহিত্যে কুখ্যাত হওয়াই বিখ্যাত হওয়া।'

'কিন্তু আইনকে তো মানতে হবে।'

'ও কিছু নয়। ওর কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। যাহা বাহান্ন তাহাই তেপান্ন—আইন আছে তেপান্নতে, তুমি বাহান্ন পর্যন্ত যাবে, তেপান্নকে ছোঁবেনা, আইনের সাধ্য নেই চোখ রাঙায়। অথচ কতটুকু বস্তুতে কতখানি মন লোকের বুঝতে বাকি থাকবে না।'

'কিন্তু আর্টের দাবি ?'

'সে তুমি বুঝবে। কিন্তু আমি বলব শিপলের—পাঠকের দাবির কথা। 'আমাদের দাবি মানতে হবে।' আমরা বর্তমানের বাস্তব জীবন চাই, বিকৃত জীবন, আমাদের দাও তার অবিকল প্রতিচ্ছবি। ঢাকাঢুকি চলবেনা, চলবেনা ঘোরপ্যাচ। সুন্দর করে বলার দিন চলে গিয়েছে, এখন শুধু সরল করে বলার দিন।'

'আপনি যেমন সাজেস্ট করেন তেমনি করে ন্যারেও করে নেব।'

'কিন্তু,' পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠা উলটেই পীযূষ আঁতকে উঠল : 'কিন্তু এ তুমি করেছ কী ?'

'কী করেছি ?'

'লম্বা লম্বা প্যারাগ্রাফ লিখেছ। প্রকৃতি বর্ণনা করেছ বুঝি ? মনের বর্ণনা ? মানসিক সংগ্রামের বর্ণনা ? ওসব বর্ণনা-টর্ণনা চলবেনা। ওসব বর্ণনাকে আজকালকার পাঠকেরা প্রবন্ধ বলে। বলে, উপন্যাসের মধ্যে প্রবন্ধ বরদাস্ত করতে পারবনা। দ্রুত ঘটনা, নাটকীয় কথাবার্তা, সেক্স, সাসপেন্স, ফুলফিলমেন্ট। তা হলেই কেল্লা ফতে।'

'আমার উপন্যাসে সবই আছে, সবই পাবেন। যদি বলেন তো বর্ণনা ছেঁটে দেব, ডায়লগ তীক্ষ্ণ করব, শব্দগুলোকে ফুল করব।'

'কিন্তু একাকিনী নাম হবেনা।' পীযূষ ঠোঁট ওলটাল।

'মুক্তবেণী রাখলে কেমন হয় ?'

'মুক্তবেণী বিবসনা'—তারচেয়ে বিবসনা রাখ। শহরে গ্রামে হৈ-হৈ পড়ে যাবে।'

'ভীষণ লজ্জা করবে ভাবতে।' বনছায়া ইচ্ছা করেই একটু চটুল হল। পরে বললে 'তার চেয়ে অবগুণ্ঠনা ভালো।'

'অবগুণ্ঠনা—হ্যাঁ, অবগুণ্ঠনা ভালো। সমস্ত অর্থেই সুসম্পূর্ণ। নাও, রাখো।' পীযূষ পাণ্ডুলিপিটা বনছায়ার দিকে এগিয়ে দিল।

'সে কি ফিরিয়ে দিচ্ছেন ?'

'না, না, তোমার ব্যাগে রাখতে বলছি। আমার কাছে কোথায় রাখব ? আমি আরেক পাত্র খাব। কী বলো, অবগুণ্ঠনার খাতিরে একটু অবগুণ্ঠন হয়েই যাই।'

'বেশ তো, খান।' ভয়-ভয় করলেও বলল বনছায়া।

'যখন একবার হাতে করে আদর করে ধরেছি তখন ও মনোনীত হয়ে গিয়েছে। বাড়ি যাবার সময় নিয়ে যাব বুকে করে।'

পীযূষ যে মাতাল হয়ে উঠেছে সহজেই বুঝতে পারল বনছায়া। কিন্তু কাজ যেখানে আদায় করতে হবে সেখানে কুণ্ঠিত হবার অর্থ হয়না। বিলোল চোখে তাকিয়ে তাই জিজ্ঞেস করলে, 'কবে যাগায় বার করবেন ?'

খাবারের প্লেটে মনোযোগ করল পীযূষ। বললে, 'আসছে সপ্তাহেই বয় করে বিজ্ঞাপন দেব, আর তার পরের সপ্তাহ থেকেই বেরুবে ধারাবাহিক।'

'সত্যি ?' নিজের গ্লাসটাকে তপ্ত উৎসাহে আঁকড়ে ধরল বনছায়া।

'তুমি একেবারেই খাচ্ছনা।'

'না, বয়ে নয়ে যাচ্ছি।' বনছায়া বড় করে চোখ মিলল।

'উপন্যাসের জন্যে দক্ষিণা কত আশা করা ?'

'দক্ষিণা ?' বনছায়া উথলে উঠল : 'আপনি যা ভেবে মনে করে দেবেন তাই নেব।'

'যা দেব, দিয়ে অনুভব করব, তুমি তার চেয়েও ভোগাতর। শোনো, বিশ্বাস করো, কোম্পানির থেকে যা আদায় করতে পারি পুরোটাই তোমাকে দেব, তোমার থেকে কোনো কমিশন নেব না।'

'বা, নেবেন বৈকি, যা রেওয়াজ, আমার বেলায় তার ব্যতিক্রম করবেন কেন ?'

'না, না, তোমার থেকে নিতে পারব না। তুমি আমাকে যে ছুটি দিচ্ছ তার দাম কি টাকায় হয় ? মাঝে মাঝে শুধু কণ্ঠটা সিক্ত করে দিও তা হলেই ধন্য মানব নিজেকে।'

'ধন্য তো আমি হব। আপনার কাছ থেকে কত কিছু জানা যায়, শেখা যায়।'

ভারী হাতে বিল মেটাল বনছায়া। পীযূষ সেদিকে তাকিয়েও দেখল না। বললে, 'সি ডি দিয়ে ঠিক নামতে পারবে তো ? অসুবিধে হলে আমাকে বোলো।'

বনছায়া দেখল তার পা দুটো যেন ঠিক আগের মতই ক্ষিপ্র নেই, মন্থর হয়ে পড়েছে। তবু যাচাইয়ের দেখবার জন্যে বললে, 'আপনার বরং অসুবিধে হলে আমাকে ধরতে পারেন।'

সে যেন পীযূষকে বলে দিতে হবে। উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে পীযূষ বললে, 'সে তো ঘরে-ঘরে আমাকেই তোমার ধরা হ'ল।'

হোটেলের চেনা ঘর স্ট্যাণ্ড থেকে ট্যাক্সি এনে দিল। দুজনে বসল পাশাপাশি।

বনছায়া জানে পীযূষ এবার কিছুটা দাঁতে-নখে হিংস্র হয়ে উঠতে চাইবে, বনছায়া খুব একটা বাধা দেবে না—স্পর্শকাতরতা একটা সাময়িক দুর্বলতার ছাড়া আর কী। তবে যদি বর্বর হয়ে উঠতে চায় সে নিশ্চয়ই বাধা দেবে—শুধু সে নয়, তার জঠরের শিশুও বাধা দেবে।

'সেদিন এক সাহিত্যিক বলছিলেন আমার নামটাই নাকি আদ্যন্তময়।' পীযূষ নৈকট্য অনুভব করল। বললে, 'আমি হচ্ছি পীযূষ—'অমৃত' বা রস যেখানেই পান করি। আর তুমি হচ্ছ অবঞ্জনা।'

'কিন্তু মনে রাখবেন বিধবলা নই।'

'না, না, অবঞ্জনাই শ্রদ্ধাজ্ঞ।'

তারপর কথা উঠল ট্যাক্সি কাকে আগে পৌঁছে দেবে। বনছায়া চাইছে আগে পীযূষকে পৌঁছাক, তাহলে পাণ্ডুলিপিটা নিরিবিলে পীযূষের হেফাজতে পীযূষের বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারে—হারাবার ভয় থাকেনা। নয়তো বনছায়াকে আগে নামিয়ে পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোথায় কত ঘোরাঘুরি করে তার ঠিক কী। মাতাল হয়েছে, নামবার সময় পাণ্ডুলিপি গাড়িতে ফেলে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তারপরে বললেই হল 'অবঞ্জনা' বাঁধন কেটে উড়ে পালিয়েছে। কত কষ্টে পাণ্ডুলিপি পুনর্নির্মাণ করেছে, সে আর কাক জেনে কাজ নেই। আবার যদি নষ্ট হয় তা হলে, মাতাল হয়েছে বনছায়া, পাগল হয়ে যাবে। তাই তার ইচ্ছে পীযূষ তার চোখের সামনে পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিয়ে বাড়ি ঢুকুক। বললে, 'আপনার বাড়িটা কাছে, আপনিই আগে যান।'

'তা কি হয় ?' বাহুর ঘেরে বনছায়াকে আরো আপনার করে নিয়ে পীযূষ বললে, 'তুমি মদ খেয়েছ, তোমার একা ফেরাটা ঠিক হবে না। সঙ্গে একজন থাকা ভালো।'

গলা নামাল বনছায়া। বললে, 'কিন্তু বাড়ির দোরগোড়ায় আমার স্বামী যদি দেখে ফেলেন ?'

'কী দেখে ফেলেন ?' পীযূষ তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল।

'দেখে ফেলেন যে-ট্যাক্সি থেকে আমি মাতাল অবস্থায় নামছি সেই ট্যাক্সিতে আপনি ব'সে, তাহলে—

'ও, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমি তাহলে আগে নামি।' পীযূষ ভেবে দেখল এই ব্যবস্থায় ট্যাক্সি ভাড়া থেকেও সে রেহাই পায়। সেটুকুই বা কম কী।

'হ্যাঁ, আমি একা আমার নিজের ঘরে দাঁড়াতে চাই।'

'নিশ্চয়ই। তুমি যে অবলা।'

'না, বন্ধন আছে বৈকি, মূল বন্ধনই তো আছে।'

'তা হলে তো তুমি ছিন্নবন্ধা!'

নামবার আগে লেখাটা নিজের থেকেই চেয়ে নিল পীযূষ। বনছায়ার গায়ে আদরের লঘু একটি প্রলেপ বুলিয়ে বললে, 'আমি তোমাকে ফোন করব। সাবধানে যেয়ো।'

সাবধানেই গিয়েছে, ঠিকমত পৌঁছেছে বাড়িতে। ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে হেঁটে এসে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে, সুবীরের সঙ্গে দেখা। সুবীর নামছে সিঁড়ি দিয়ে, কোথাও বেরুচ্ছে বুঝি বাইরে, কে জানে হয়তো বা সেই মদ খেতে।

সিঁড়ি পেরিয়ে নিজের ঘরে একবার ঢুকে পড়তে পারলেই বনছায়া নিশ্চিন্ত হতে পারত। সে তার একলা ঘরের একক কর্ত্রী, খেত কি খেত না, শুয়ে থাকত কি থাকত না, কোথাও কোনো জবাবদিহি ছিলনা। এমনকি আলো নিবিয়ে ঘর বন্ধ করে দিয়ে থাকতে পারত চুপচাপ। কিন্তু ঘরে ঢুকবার মুখে সিঁড়ির উপরেই সুবীরের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে মুস্কিল হল। কে জানে কেন তখন থেকেই মনে হচ্ছিল এমনি কোথাও মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে আর অশান্তি বাড়বে। পাপ পুণ্য ধর্ম অধর্ম ওসব কিছুই নয়, আসল হচ্ছে শান্তি-অশান্তি। যদি অশান্তি না হয় তবে সংসারে সমস্ত ভালো, পাপ-তাপও ভালো। তবু ভাগ্য বলতে হবে, পীযূষকে দেখেনি। পীযূষকে দেখলে অশান্তি আরো বাড়ত। অশান্তিই পাপ।

'এ কী, তুমি?' প্রায় শোকার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সুবীর।

কী দেখে সে এমন আতঙ্কিত হল? বনছায়ার চুলে ও আঁচলে পারিপাটা নেই, তাই দেখে, না কি সে মদ খেয়েছে বলে? তাকে মদ খেতে তো সুবীরই শিখিয়েছিল—এখন তবে সে সাধু সাজবে কোন হিসেবে? আর মদ খেয়ে ট্যাক্সিতে ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফেরবার সময় কে আর কিটকাট থাকে?

কিন্তু বনছায়া যে টলছে, দাঁড়াতে পাচ্ছেনা। 'একা আমার নিজের ঘরে দাঁড়াতে চাই' খানিক আগে বলা কথাটা যেন ব্যঙ্গের সুরে ফিরে এসে বাজল বুকের মধ্যে। ব্যস্ত হাতে রেলিংটা ধরে ফেলে কোনোরকমে সামলাল বনছায়া। হ্যাঁ, হয়তো পড়বে, পড়ে আবার উঠবে, আবার দাঁড়াবে, তবু নিজের ঘর ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না।

আবার সিঁড়িতে পা ফেলতে ভুল করল বনছায়া, প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, সুবীর ছুটে এসে তাকে দু হাতে ধরে ফেলল।

'ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।'

'না। ঘরে চলো।'

বনছায়া ছাড়ান পাবার জন্যে বারকতক ছটফট করল বটে-কিন্তু সুবীরের সঙ্গে পেরে উঠল না। শক্ত মুঠিতে বনছায়ার একটা হাত আঁকড়ে ধরে তার ঘরের মধ্যে টেনে আনল।

'আমি তোমার ঘরে যাব না।' বনছায়া বাধা দিতে চাইল: 'আমার ঘরে যাব।'

'না, আমার ঘরটা কাছে, আমার ঘরেই যাবে।'

মদ শরীরের শৈথিল্য এনেছে তাই বনছায়া জোর খাটাতে পারল না। ঘরে টেনে এনে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মদ খেয়েছ?'

'কেন, অন্যায় হয়েছে?'

'হ্যাঁ, অন্যায়ই তো হয়েছে।'

'তোমার কাছ থেকেই তো পাঠ নিয়েছি। তুমিই তো গুরুগিরি করেছ।'

'সে তো বাড়িতে খাবার জন্যে।'

'যা বাড়িতে খাওয়া যায় তা বাইরে খাওয়া যায় না? তুমি যে খাও? তোমার বসএর সঙ্গে খেলে সেটা বাইরে খাওয়া হত না?'

'সেটা তো পার্টিতে খাওয়া হত।'

'এটাও পার্টিতে খাওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু এতগুলি খেয়েছ কেন?'

'আনন্দে খেয়েছি।'

'কিসের আনন্দ?'

'তা তোমাকে বলব কেন? তুমি যে খাও তোমার আনন্দের কথা বলো আমাকে?'

'আমি আনন্দে খাই কে বললে? আমি খাই দুঃখে, বৈরাগ্যে, মুক্তিতে—'

'তা যার যেমন অভিরুচি।'

'না, তুমি খেতে পারো না, অন্তত এখন আর পারো না। আমার চেয়ে তোমার দায়িত্ব অনেক বেশি।'

'দায়িত্ব?'

'হ্যাঁ, তোমার পেটে আমার সন্তান।'

'সন্তান—তোমার সন্তান?' হেসে উঠল বনছায়া।

'তার মানে? আমার সন্তান নয়?'

'সন্তানই নয়। আমি আমার অফিসের নার্সিং হোমে একজামিন করিয়েছি, ডাক্তার বলেছে ওটা একটা টিউমার, অপারেশান করে বিযুক্ত করতে হবে।'

'আমার অফিসের নার্সিং হোমের ডাক্তার কী বলে জানতে হবে।' সুবীর দৃঢ় স্বরে বললে, 'আমি কাল তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।'

'আমার নিজের অফিস ছেড়ে পরের অফিস থেকে সুবিধে নিতে যাব কেন? আমি কি কারু সাবঅর্ডিনেট? আমার স্বাধীন মর্যাদা নেই?'

জোর করে উঠে দাঁড়াল বনছায়া। নিজের ঘরের দিকে চলল। আবার পা টলল, সুবীর এগিয়ে এল না, বনছায়া নিজেই সামলাল দেয়াল ধরে।

'টিউমার যাক, তোমার নিজের স্বাস্থ্য তো রাখতে হবে।' কী রকম অন্য সুরে যেন কথা বলল সুবীর: 'এখন পড়ে-টড়ে গেলে তো তোমার নিজেরই বিপদ।'

'তার জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও।'

বনছায়া নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

সুবীর অভিরামের উদ্দেশে হাঁক পাড়ল : 'অভিরাম, তোমার মা এসেছেন। তাঁকে দেখো।'

দরজার বাইরে অভিরামের উপস্থিতি টের পেয়ে বনছায়া বললে, 'শুধু দেখো কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।'

দু দিন পরে 'প্রবাহে' বেরুল ঘোষণা : আগামী সংখ্যা থেকে নবীন কথাশিল্পী বনছায়া দেবীর শক্তিশালী উপন্যাস—'অবগুন্ঠন' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে।

অফিসে টেলিফোন ধরল বনছায়া।

'তোমার উপন্যাস দুর্দান্ত হয়েছে। শুধু কটা জায়গা একটু ঘোরালো করতে পারলে আরো জমবে। বুঝতে পারলে তো একটু অশিষ্ট, প্রথামুক্ত—'

'বুঝতে পেরেছি। আমি ঠিক করে দেব।'

'আর একটা কথা। তোমার নায়িকাকে একটু কাঁদাবে।'

'কাঁদাব?'

'হ্যাঁ, দুঃখটা উচ্চারিত না দেখলে পাঠকের সুখ হয় না।'

'অত বড় তেজী মেয়ে কাঁদবে কী!'

'তেজী হোক, ভিজে হোক, মেয়ে হলেই কাঁদবে। কারণে কাঁদবে, অকারণে কাঁদবে। সে মেয়ে ডাকাতই হোক বা ডাইনিই হোক, কথায়-অকথায় এক-আধবার না কেঁদে ছাড়বে না।'

'আর হাসবেনা?' খিলখোলা আনন্দে হেসে উঠল বনছায়া।

'সে তো তুমি হাসবে। তোমার মত হাসতে জানে ক'জন। শোনো এবার অবগুন্ঠনার প্রথম আবির্ভাবটা সেলিব্রেট করতে হয়।' শীযুষ দীপ্তকণ্ঠে বললে, 'এবার আমি স্ট্যার্ট করব।'

'কিন্তু জানেন,' বনছায়া একটা কান্নার সুর বের করে বলল : 'শরীরটা খুব খারাপ।'

(ক্রমশঃ)

বাংলার সেদিনের অভিজাত জমিদার বাটোরের রাজমাতার স্মৃতিচারণ—এতে পাঠক সেদিনের সমাজের অনেক অজ্ঞাত কথা ও চিন্তাধারার স্বাদ পাবেন—

প্রাচীনা ধরণী

বাসন্তী বাগচী

"এখন যদি কোনো পুরোনো লোক আমাদের বাড়ীতে আসে, তাহলে সে আর কিছু চিনতেই পারবে না"—উদাস দৃষ্টিতে বার মহলের দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরের সামনে শ্বেত পাথরের বারান্দায় বসে বলছিলেন বাটোরের রাজমাতা শ্যামমোহিনী দেবী। চিরানব্বই বছর বয়সে একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছেন তিনি গত বছর ৺লক্ষ্মীপূজার কিছু পরেই। জ্যেষ্ঠা কন্যা ৺বিভাবতী দেবী চলে গেছেন কয়েক বছর আগেই। চলে গেছেন জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী, জামাতা, পুত্রবধূ···তারও বহু আগে গেছেন আরো দু'টি শিশু পুত্র কন্যা। তাদের অকালমৃত্যুর পরেই শুভজনদের পরামর্শ অনুসারে দেশের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কোলকাতার বাড়ীতে স্বামীর কাছে চলে এসেছিলেন তিনি। তখনকার দিনের বালিকা রাজবধূ ঠাকুর বাড়ী, চৌধুরী বাড়ী এবং দেশবন্ধুপরিবারের মহিলাদের সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে।

"সারা বাড়ী লোকজনে গমগম্ করতো তখন, কত লড়া, কত গান বাজনা, কত খাওয়া-দাওয়া, আমাদের সামনের গোল বারান্দাতেও কত ছিটিং কত পার্টি।···এখন তো ছাদে কেউই যায় না, আগে এখানেই হোত বাড়ীর মেয়েদের আচার, বড়ি শুকোনো, কাপড় বিছানো রোদ্দুরে দেওয়া। দেশের বাড়ীতে যখন ছিলাম, শাশুড়ীর সঙ্গেও কথা বলার নিয়ম ছিল না, ইসারায় বোঝাতে হোত সব। ভালোবাসতেন খুব করতেন, কিন্তু অন্যান্য অনেকের কাছ থেকে নিজেও শুনতে হয়েছে দশবছর বয়সেই 'বুড়ি বৌ' বলে।

ঘুমের ঘোরে ছুটো খাটের মধ্যের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেছি খাটের তলায়—স্বামীকে চেঁচিয়ে ডাকার তো নিয়ম নেই—কী বলেই বা ডাকি,—ফিস্‌ফিস্ করে ডাকছি—মহারাজ, রাজা, ও রাজামশাই! স্বামী ঘুমে অচেতন, দিলাম বসিয়ে এক চিমটি। স্বামী ধড়মড় করে উঠে বসে আমাকে টেনে তুললেন। খাটে উঠে বসেই বল্লাম "এবার বলেন একটা উপায়।"··

ভিতর বাড়ীর উঠোনে তুলসী তলায় হরিলুট হচ্ছে—এই এত বড় বড় কেশী বাতাসা সবাই ছুড়িয়ে আঁচলে তুলছে, আমিও তুললাম কয়েকটা···ওমা আমার বাতাসা আঁচল থেকে লাফিয়ে পালাচ্ছে কোথায়? ভয় পেয়ে কেঁদে উঠলাম,—সবাই আলো এনে দেখলো এই এত বড় সাদা ব্যাঙ।

আমার ভাষে বৌ—তোর মা'ও কথা বলতো না কারো সঙ্গে। নতুন বৌকে মেয়েরা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনের মায়ের নাম কী?' সে আঙুল দিয়ে নিজের অনন্ত আর বালাজোড়া দেখিয়ে বোঝালো মায়ের নাম অনন্তবালা।

কোলকাতায় আসার পর অনাচারী, ব্রেক্ষ বলে দেশে আমাদের নাম রটে গেল, আমরা জামা জুতো পরি, বই পড়ি, মেম সাহেবের পার্টিতে যাই, আরো কত কী!···শুভর্ণরের মেম সাহেব ছিলেন স্টীয়ার-

পার্টি বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘাটে। একা বিধবা রাণী ছিলেন আমাদের সঙ্গে,—কিন্তু তিনি তো খাবেন না ওখানকার কিছু। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, জল পিপাসা অনুভব করলেন—অথচ ওঁদের জল খাবেন না। গঙ্গাজল আনিয়ে নিজে হাতে করে দিলাম ওঁর মুখে।

রাজবাড়ীতে কয়েকবার নাটক অভিনয়ও করেছি আমরা ঠাকুরবাড়ী চৌধুরী বাড়ী, দেশবন্ধু পরিবারের মেয়েদের আর আমার আত্মীয়দের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" আর স্বর্ণকুমারী দেবীর "লজ্জাবতী।" প্রথমটিতে আমি একবার ক্ষীরি আর একবার রাণী কল্যাণী সেজেছিলাম, সেবার ক্ষীরি সেজেছিল আমার ভগ্নী সম্পর্কীয়া 'পিসী'। দ্বিতীয়টিতে আমি সেজেছিলাম লজ্জাবতী। পর্দা খাটি, পুরুষের ঢুকবার হুকুম ছিল না। মহারাজ কিন্তু লুকিয়ে দেখেছিলেন আমাদের অভিনয় পর্দার আড়াল থেকে।

"দিদা, আপনার গান কিন্তু কখনো শুনি নি, আজ একটা গাইতেই হবে।" দিদা আন্তরিক লজ্জায় লাল হয়ে উঠে ছোট মেয়ের মত দুই হাতে মুখ ঢাকলেন—"ওমা আমি এখন গান গাইব কী? ছি ছি কী যে বলিস! আমার কি এখন কিছু মনে আছে না গলায় সুর আছে?" অনেক পীড়াপিড়ির পরে কোনোমতে গাইলেন "আলিবাবা নাটকের ২।১টি গান এবং "ভীষ্ম" যাত্রার গান "আজি সাঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ তব রঙ্গভূমির খেলা আমার" (৺রসিক চক্রবর্তীর রচনা)। দিদার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র,—আমাদের বেণুদা শ্রীযুক্ত নীরেন লাহিড়ী (ছায়াচিত্র পরিচালক) বল্লেন, "এই গানটি দিদার কাছে শিখে আমার একটি ছবিতে জুড়ে দিয়েছিলাম।"

"দিদা, এখনো কী মিষ্টি গলা আপনার, কেন গান করেন না?" "চুপ্, চুপ্, একেবারে মুখবন্ধ। খবরদার একথা আর কারো কানে যেন না যায়।" বেণুদা বল্লেন, "আমার তো সঙ্গীতে হাতে খড়ি দিদার কাছেই, ছোটবেলায় দিদাই তো পিয়ানো বাজিয়ে আমায় শিখিয়েছিলেন "শান্ত হ'য়ে মম চিত্ত নিরাকুল" এই রাবীন্দ্রিক ব্রহ্মসঙ্গীতটি। তাঁর শিক্ষা আবার দেশবন্ধুর ভগ্নী স্বর্গীয়া অমলা দাসের কাছে।" মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ এবং রাজকুমারী বিভাবতী দেবীরও প্রাথমিক লেখাপড়া এবং সঙ্গীত শিক্ষা হয়েছিল ৺মিস দাসের কাছেই।

"শুনেছি আমার মা প্রথম বৌ হয়ে এবাড়ীতে এসে পৌঁছবার পর ৺মিস দাসের চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরা ভারিক্কি চেহারা এবং আদর যত্ন দেখে তাঁকেই শাশুড়ী বা শাশুড়ী স্থানীয়া কেউ ভেবে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন চুল বেঁধে সাজিয়ে দেবার পর; —কিন্তু তিনি প্রণাম গ্রহণ করেন নি।"

"তোর ঠাকুরমা তখন ছিলেন আমার শাশুড়ীর কাছে নাটোরে। তোর ঠাকুরদাদা বল্লেন বৌ আগে শাশুড়ীকে প্রণাম করে তারপর রওনা হবে নাটোরে, তাই প্রথমে এসে উঠেছিলেন এখানে।... তোর মা'র বিয়ের সময় সে কী হলাহলি নিমন্ত্রণ পংক্তি ভোজন নিয়ে।"...

"শুনেছিলাম আপনি নাকি গাউন পরে পার্টিতে যেতেন?"

"বাজে কথা, আমি কখনো বাইরের পুরুষদের সামনে বেরোই নি। রবীন্দ্রনাথের সামনেও তখন বেরোই নি। দেশবন্ধু ছিলেন আমার ধর্ম-ভাই, তিনি এবং অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাড়া আর কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেন নি। শাড়ী জামা জুতো মোজাই পরেছি প্রথম প্রথম ঠাকুরবাড়ী আর চৌধুরীবাড়ীর বান্ধবীদের সহায়তায়। আগে নিজে নিজে তো কিছুই পারতাম না। মহারাজ আর তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তাস খেলেছি প্রায়ই সমস্ত রাত জেগে—পোকার প্রুফ-আরা।"

"আপনি তো বিয়ের আগেই লেখাপড়া শিখেছিলেন, শুনেছি আমার ঠাকুরমা বাথরুমের দেয়ালে

পড়তে কাঠি আর জল দিয়ে লিখে লিখে মুছিয়ে অক্ষর পরিচয় করেছিলেন। বইপড়া আর জামাপরা দুটোই ছিল তখন দারুণ গর্হিত কাজ।"

"তোর বাবা ছোটবেলায় কার্বুক হাতে করে একদিন ভিতর বাড়ীর দালান দিয়ে যাচ্ছে; আমার শাশুড়ী বসেছিলেন সেখানে, বীয়েরা বঁটি নিয়ে বসে তেঁতুল কাটছিল। শাশুড়ী জিজ্ঞেস করলেন "কুবের ধন, আজ কী পড়লে?" তোর বাবা উত্তর দিলো "মুগীর পাতা।" অমনি সমস্ত তেঁতুল শাশুড়ী বাইরে ফেলে দিলেন, বঁটি আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নেওয়া হোল আর বইখানা খুচি খুচি করে নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলা হোল—লোকে বলে। শাশুড়ী আমায় আদর যত্ন করতেন খুব, কিন্তু তিনি ছিলেন বৈষ্ণব মতে দীক্ষিতা সেকালের শুদ্ধাচারিণী বিধবা,—আমার কিছু ছুঁতে দিতেন না।"

"আপনিও তো এখন আমাদের কারো ছোঁওয়া খান না।"

"অদীক্ষিতের ছোঁওয়া আমি খাই না।"

কারো ছোঁওয়া না খেলেও সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসে খেতে, নিজে উপস্থিত থেকে যত্ন করে খাওয়াতে দিদা কত যে ভালবাসেন,—উপস্থিত থাকতে না পারলে কত যে উদ্বিগ্ন হন, দুঃখ পান তা লিখে বোঝানো কঠিন। প্রত্যেকটি লোকের সামান্য সুবিধা অসুবিধার প্রতি এখনো তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টি, যদিও হঠাৎ দেখামাত্র এখন আর লোক চিনতে পারেন না। তাঁর জন্য কারো একটুকু অসুবিধা হচ্ছে মনে হলেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন এবং নিজের সব কাজ নিজেই করবার জন্য ব্যস্ত হন। অবশ্য বাল্যসঙ্গিনী অথবা বিশেষ স্নেহের পাত্রী দু'একজনের উপর মাঝে মাঝে গোপনে চড়-চাপড়-চিমটি যে চলে না, তা নয়। পৌত্র জ্ঞানাথ বা ইন্দ্রজিতের সঙ্গে নিয়মিত দেখা না হলে, পৌত্রী শুভশ্রী, জয়শ্রীর চিঠি আসতে দেরি হলেও দিদার কত উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, দুপুর রাত্রে একা একা হেঁটে গিয়ে ডাকাডাকি।

"হ্যাঁরে, মানুষ নাকি চাঁদে গেল, আবার সেখান থেকে ফিরে এল? আজকাল তো আর কাগজ পড়তে পারি না;—কী আশ্চর্য্য ঘটনা।"

সাত দিন ধরে দিদা বারবার ঐ কথাটাই ভেবেছেন আর খোঁজ নিয়েছেন নভোচারীরা নিরাপদে এসে পৌঁছলেন কি না। সমুদ্রের মধ্যে তাঁরা এসে নামবেন শুনে শিউরে উঠেছেন বারবার। "কল্কি অবতারও তাহলে দেখা দেবেন শীগ্‌গির,—আর দেরি নেই। কে যেন শুণে বলেছিল তিনি নাকি জন্মেছেন এক বেনের ঘরে?"

দিদার বিবাহের সময় ঘটেছিল মাটোরে প্রথম ভয়াবহ ভূমিকম্প,—অসংখ্য বাড়ীঘর ধ্বসে পড়েছিল, প্রাণহানি ঘটেছিল অনেক, মাটি ফুঁড়ে জলও নাকি উঠেছিল। তারপর দ্বিতীয়বার ভূমিকম্প মাটোরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের সময়। সে সব কথা দিদা এখনো ভুলতে পারেন নি। এখনো জন্তুটি দেখলেই অথবি অনুভব করেন।—মাঝে মাঝেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—'মাটি কাঁপছে।'

(বেণুদা বলেন ঐ জন্যেই তো দিদা কখনো এ বাড়ীর ছাদেও উঠতে চাইতেন না, —পড়ন্ত ভেঙে পড়বে।)

কেউ হেঁটে বাইরে যাচ্ছে শুনলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন,—মনে পড়ে যায় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের দুর্ঘটনা ও অকাল মৃত্যুর কথা। "খবর্দার সন্ধের পরে কেউ হেঁটে বাইরে যাবি না। আমার হাতের নোয়া তো ঘুচলো অমনি করেই।"

বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে পুবের জানলার ধারের সামনে গিয়ে আবার ফিরে আসেন মাঝে মাঝে।

জন্মদিনে পায়সের বাটিটি ঘরে পাঠিয়ে দিতে ভোলেন না। "তুই ঘরের সামনে দিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে এলি, হঠাৎ কেন জানি না, মনে হোল আমার ছেলের মতন।" গত বছর বিজয়ার পরেও অমনি করে এসে মাকে প্রণাম জানিয়ে গেছেন, 'আগে যাওয়া' নিয়ে হাসিঠাট্টাও করে গেছেন পুত্র যোগীন্দ্রনাথ। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আত্মীয়ার হাত ধরে রাজবাড়ীর দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছিলেন অনুঢ়া কবি-কন্যা স্বর্ণলতা মীরা দেবী। পরলোকগতা কন্যার সদ্য সদ্যকে জড়িয়ে ধরে শিশুকন্যার মতই আদর করেছিলেন বৃদ্ধা রাজমাতা। মীরা দেবীও অভিভূতভাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই আদর। পুরোনো অনেক স্মৃতি তাঁর মনেও সেদিন জেগে উঠেছিল। "অমলা মাসিমা নিজে রান্না করে সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে পরিবেশন করে খাওয়াতেন, লোভীর মত সবাই খেতাম ছোটদের পক্ষে দুর্লভ, তাঁর হাতের ঈষৎ কাল ডাল—সুস্বাদু রান্না। আমিও তো কতদিন এসে এ বাড়ীতে খেয়ে গেছি।"

কবির মধ্যমা কন্যার অকালমৃত্যুর কথা বিদায় মনে ছিল, তবু হঠাৎ কেমন কুণ্ঠ হয়ে গেল। "তুই—রেণুকা?" "না, আমি মীরা।"

মহারাজার শয়ন কক্ষে ধূপ দীপ জ্বালিয়ে ক'দিন রোজই সন্ধ্যায় হোত প্রার্থনা-গান। কন্যা-শোকাতুরা মীরা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও সঙ্কোচবশতঃ যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি,—মীরা দেবী শুনেছিলেন সে কথা।

"দেখা করতে চেয়েছিলে,—এই তো দেখা হোল, তোমার গানও শুনলাম, ইন্দ্রজিতের মৃত্যু রাত্রেও। মাঝে বোল আমার কথা।"

সকলের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়েই যেন চলে গেলেন মীরা দেবী। সে খবর জানানো হয়নি রাজমাতাকে।

* * *

জমিদারির ছাড়ার সমস্যা, নানা সংকট সত্ত্বেও মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সঙ্গীতকে কোনদিন ভোলেন নি। 'মানসী ও মর্মবাণী' নামে মাসিক পত্রিকার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালীর মর্ম কথাই প্রচারিত করেছেন। সঙ্গীতে তাঁর খ্যাতি ও অবদান ছিল অসামান্য। আবার অন্যদিকে খেলার জগতের তাঁর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সেদিনের স্মরণীয় বাঙালীদের মধ্যে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট নাম।

আসা-যাওয়ার পথের ধারে তীর্থপথের দিনলিপি

[ভ্রমণকাহিনী]

শ্রীমতী জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোয়েলিয়ার ভোরের ঘুমভাঙানো গানে, সারা গোচর পল্লী মুখর হয়ে উঠেছে। বৌদি ও আমি, বাইরে বাগানে এসে দাঁড়ালাম। সারা বনভূমি জুড়ে কেমন শান্ত পরিবেশ, উষার আলোর সাড়া পেয়ে, ভোরের পাখীরা বন্দনা গান সুরু করে দিয়েছে। ভারি ভাল লাগছে—বাইরের বারান্দায় খাটিয়ার ওপর সকলে ঘুমোচ্ছে অকাতরে—ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস সারাগায়ে যেন স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে যাচ্ছে—

এই নিত্য প্রভাতের আলো আর রাতের আঁধারের মেলা চলছে পৃথিবীর বুকে। কত ভাঙছেন কত গড়ছেন অলক্ষে বসে, যিনি সৃষ্টির আর ধ্বংসের লীলা খেলছেন তাঁর একটি আঙুলের নাড়াচাড়াতে চলছে পাশার খেলা। যাদুর খেলা—ধ্বংস প্রলয় সৃষ্টি।

মিসেস রাওরাত তার দুটি মেয়েকে নিয়ে দেখা করতে এলেন। প্রায় নটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে উঠে বসলাম। আবার সেই বাস ছাড়ার ব্যাপার। পথের ধারে হাঁ করে সব হাড়ি কাণ্ডার অপেক্ষায় বসে আছি! পাহাড়ী ছেলে মেয়েরা গাড়ীর চারি ধারে, ভীড় করে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাদের দেখছে। একটি বেশ ফুট ফুটে মেয়ে বছর আটেকের, কাছে ডেকে তার নাম জিগ্যেস করলাম, এক মুখ হেসে নাম বললে তার—নন্দা। এক কৌচড় কাঁচা আম কুড়িয়ে ছিল, তাই থেকে আমার হাতে দুটো আম দিলে। সকলকার হাতে দু চারটে করে পয়সা দিতে কি খুসী! এক সঙ্গে ওরা গান ধরলে—ওদের ভাষায়।

মিঃ রাওরাতকে জিগ্যেস করলাম, ওরা কেন গান গাইছে? মিঃ রাওরাত বললেন, ওরা আপনাদের গুণ গান করছে। শুনে তো হেসে মরি! ভারি মজা লাগছে—ঐবে এবার ছাড়ি কাণ্ডা এলো এতোক্ষণ পরে, যেন গায়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

"কর্ণ প্রয়াগ" ছেড়ে চলেছি। এখানে পিণ্ডর আর অলকানন্দা দুই নদী এক হয়েছে, জল এক ধারে সাদা আর একধারে নীল, ভারি সুন্দর দেখতে লাগছে—রাস্তা এখানকার ভীষণ খারাপ, চারি ধারে ছড়ি ছড়িয়ে আছে, সারা পথই পাথর ছড়ানো। গাড়ী ধীরে ধীরে চলছে—একটি লোহার ব্রীজ পার হলাম। রৌদ্রের প্রখরতা বেড়েছে। এখন পাহাড়ী মেয়েরা মাথায় তিন চারটে করে গাগরী বসিয়ে পড়ানে পথ দিয়ে তর তর করে নেমে চলেছে ইয়াক্ তাড়াতে তাড়াতে, দেখলে বিস্ময় লাগে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে ঝর্ণার ধারার মত।

"নন্দ প্রয়াগ" পার হলাম, নন্দাদেবী ও অলকানন্দা আমাদের সঙ্গে পথ দেখিয়ে চলেছেন, এই অপরূপ দৃশ্য লিখে বর্ণনা করা যাচ্ছে না!

আবার আমাদের গাড়ী বাস সব দাঁড়িয়ে গেল, আবার লাইন ক্লিয়ার নইলে গাড়ী চলবেনা। দু' তিনটি পাহাড়ী ছেলে গাড়ীর কাছে এসে, হাততালি দিয়ে গান আরম্ভ করে দিলে, গানের একবর্ণও বুঝিনা! হাত পেতে বললে, দিদিরে রাণীমাই এক সিক্কা, এক পাই মিল যানেসে চলা যাই--ওদের রকম দেখে আমরা হেসে ফেলি। দু চারটে করে পয়সা দিতেই খুসী হ'য়ে চলে গেল, সেই মুড়ি পাথর পর্ব্বত পেরিয়ে চক্ষের নিমেষে পড়ানে পথ দিয়ে নেমে।

এতক্ষণে গাড়ী ছাড়লো,—পাহাড়ের কোল দিয়ে মন্থর গতিতে এঁকে বেঁকে চলেছে। পথ যেন ফুরোয় না, পথের যেন আর শেষ নেই! কত রং-বে-রঙের পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে তাদের রূপের মাধুরী ছড়িয়ে, কেউ ধপ ধপে সাদা কোনটা বা কষ্টি পাথরের মত কালো, আবার কেউ সেকস্পীয়রের কোনটা বা সিমেন্টের মত—আবার অন্য পাহাড়ে রোদের আলো পড়ে, মনে হচ্ছে লক্ষ মাণিক জ্বল জ্বল করে জ্বলছে! কি অপূর্ব্ব!

এইবার চামোলী পড়ল, এটা হেডকোয়ার্টার, এখানে, কোর্ট, থানা, কালেক্টারী, হাসপাতাল, পোষ্টঅফিস, স্কুল, বনবিভাগ সব রয়েছে। গাড়ীর এঞ্জিন এতো গরম হ'য়ে গেছে যে, গাড়ী এখানে থামাতে হল। অমর সিং গাড়ীতে জল ভরে নিলে, মিঃ কেবল ঝর্ণা থেকে তোয়ালে ভিজিয়ে এনে মাথায় চাপা দিয়ে বসলেন, ওঁকে দেখে আমার খুব হাসি পাচ্ছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে খুব খিদে পেয়ে গেছে—লজ্জায় বলতে পাচ্ছেন না।

এখানে দাদার জন্যে কমলালেবু কেনা হ'ল, একটি করে লেবু ছয় আনা, তাতে না আছে রস না আছে স্বাদ। এঞ্জিন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে অমর সিং গাড়ী ছাড়লে। আবার পাখী বলছে, এক তরফ এক তরফ, কেমন সাবধান করে দিচ্ছে যাত্রীদের। এক পাশ দিয়ে যাও নইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। পাখীটি ভারি সুন্দর দেখতে! গাটা কালো, চোখ দুটি টুক টুক করছে কুঁচের মত লাল, ঠোঁট দুটি হলদে—

এবার "বিষ্ণু প্রয়াগ" পড়ল, বিষ্ণু গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম। এইখানে নাকি, নারদ মুনি, বিষ্ণু আরাধনা করে, বেদব্যাস লাভ করেছিলেন। এ জায়গাটি ভারি চমৎকার।

আমরা "পিপুল চটিতে" এসে পৌছোলাম। এখান থেকে "যোশীমঠ" উনিশ মাইল। এখন বেলা একটা, চারটের আগে গাড়ী ছাড়বেনা, সুতরাং এখানেই অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

"পিপুল চটিতে"—বহু যাত্রী এসে পড়েছে। সমস্ত চটি ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে—যাত্রীর ভীড়ে জায়গা নেই। রাস্তার ধারে সব বসে আছে। সেই খানেই স্নান খাওয়া সেরে নিচ্ছে সকলে।

হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে আঁধি উঠলো। ঠিক যেন ধূলোর বৃষ্টি! গাড়ীর কাঁচ বন্ধ করে সকলে ব'সে আছি। গর্জ্জন কি বাতাসের—যেন প্রলয় হ'চ্ছে—গাছ পালা নুয়ে পড়ছে মাটির বুকে, আবার সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল!

ভারি আশ্চর্য্য দেখলাম, রোজ বেলা বারোটা বাজলেই আঁধি উঠবে, বৃষ্টি হবে, মিনিট পনেরর মধ্যেই আবার কোথায় সব, ভোজবাজির মত মিলিয়ে যাবে। যেন ভূতুড়ে ব্যাপার।

বিকেল ছটায় আমরা "যোশী মঠে" এসে পৌছালাম। এখনে ভাতি প্রস্তুত ছিল, টেম্পল সেক্রেটারী এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। ভাতি করে আমরা সাত আট তলার সমান উঁচু, রেল ছাউনি উঠলাম।

স্নান করে জামাকাপড় বদলে—সন্ধ্যা বন্দনা সেরে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম, দূর থেকে সন্ধ্যা

আরতির, কাঁসর ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে—ঘন্টীমঠে দোকান বাজার প্রচুর, রেস্তিওতে গান হচ্ছে, যাত্রীদের চল্‌ছে আনাগোনা, প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে অনেক। এ যায়গাটা একেবারে, ভরপুর।

নীচে সমের ক্ষেত। পাহাড়ী মেয়েরা পিঠে টুকরী বেঁধে, গম কেটে বোঝাই করছে তাতে। বার বার উঠছে ডেনামাইটের গর্জ্জন তার সঙ্গে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে, আকাশ অন্ধকার করে দিচ্ছে! বিরাট বিরাট পাহাড়কে, ডেনামাইট দিয়ে কাটানো হচ্ছে রাস্তা তৈরী হবে বলে।

সন্ধ্যা আস্তে আস্তে নেমে আসছে তার ধূসর রঙের ওড়নাখানা আকাশের বুকে ছড়িয়ে দিয়ে। ঘরে বাতি জেলে দিয়ে গেছে, বড্ড ক্লান্ত লাগছে কেন জানিনা, ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম, মাথার যন্ত্রনা হচ্ছে খুব, তাই শুনে, দাদা ব্যস্ত হ'য়ে ওষুধের বাক্স খুলে "ডেরামন" বার করে খাইয়ে দিলেন। বৌদি সকালকার পরবার জন্যে আমাদের জামাকাপড় ইত্যাদি গুছিয়ে রাখলেন। অমর সিং আর বদরী বারান্দায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওরা সত্যই ক্লান্ত। রাত নটা নাগাদ মিঃ কেবল আর মি রাওয়াত আমাদের রাতের খাবার নিয়ে এলেন, ভাত, মুগডাল, ভিণ্ডির তরকারি, আলুর তরকারি আর চাটনী। কোনরকমে মুখে একটু দিয়ে, আবার শুয়ে পড়লাম। যেন নেশার মত শরীর হয়েছে। দাদাও এবার শুলেন। বৌদি এসে আলো নিভিয়ে আমার পাশে এসে শুয়ে পড়লেন।

২৯।৪।৬১।

অনেক ভোরেই আজ সকলে উঠে পড়েছি। ঘন্টীমঠ থেকে আমরা এখন পাণ্ডুকেশ্বর যাব। এখান থেকে গাড়ী যাবার আর রাস্তা নেই। আমরা তৈরী হয়ে নিলাম, বাইরের বারান্দায় বসে, দাদা ও আমি চিঠিগুলো তাড়াতাড়ি লিখে নিচ্ছি। বৌদি দাদার ওষুধপত্তর আর টুকি টাকি, পথের দরকারি জিনিষগুলো গুছিয়ে নিচ্ছেন। কুলীরা মাল নিয়ে নেমে গেছে। মিঃ কেবল আমাদের জন্যে চা আর গরম নিম্‌কি নিয়ে এলেন, চিঠি লেখা শেষ করে, চা, নিমকি খেয়ে আমরা তাঁবুতে গিয়ে উঠ্‌লাম। এক সঙ্গে সকলে বলে উঠ্‌লো, জয় বদরী বিশাল কি জয়—

হে ঠাকুর সীতারাম, তোমার আশীর্ব্বাদ আর স্নেহকরুণা ধারা আমার মাথায় থাকলে, পথে কোন বিপদ আমাদের স্পর্শ করতে পারবেনা।

বেশ রোদ উঠেছে, চারিধারে, সূর্যের আলোর স্পর্শ পেয়ে ঝলমল করছে, আমরা ছাতা খুলে মাথায় দিয়ে চললাম। রাস্তা খুব খারাপ! রাস্তা চওড়া করে তৈরী হ'চ্ছে চারিধারে মিলিটারি, ক্যাম্প বসেছে। এপথের দৃশ্য আর একরকম অলকানন্দা ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে চলেছে—অপূর্ব সে জলতরঙ্গের সুর। কত রঙ্গেরই না পাখী, জলে ঠোঁট ডুবিয়ে আকণ্ঠভরে জলপান করছে জলের ঢেউয়ের উপর পাখা মেলে স্নান করে নিয়ে, পাথরের গায়ে ডানা ঝেড়ে নিচ্ছে।

পাহাড়ী ছেলেরা হাতে ছোট ছোট লাঠি নিয়ে, গরু মোষ ছাগল ভেড়া চরাতে বেরিয়েছে। চটিতে চটিতে যাত্রীদের চায়ের আসর বসেছে। ভোরে শিশিরকণা ফুলের গা থেকে এখনও ঝরে পড়েনি মাটির বুকে।

মধ্যে মধ্যে পথের মাঝখানে ঝর্ণার জল থৈ থৈ করছে, নেমে আসছে পাহাড়ের বুক থেকে নীচের দিকে নেমে গিয়ে মিশে যাচ্ছে অলকানন্দার সঙ্গে। ভগবান বসে বসে কি মনোরম করেই না সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর এই স্বর্গকানন, এ মায়াবিনী কানন, মায়ামন্ত্রমুগ্ধ হয়ে হয়ে তন্ময় হ'য়ে যাচ্ছি!

এখানকার রাস্তা বড় বিপদসংকুল! যাত্রীরা অতি সাবধানে চলছে। ভাতি ওয়ালারা সব সময় চক্ষুদুটি

সজাগ রেখে চল্‌ছে। নুড়িতে পথ ভর্ত্তি পা একটু এদিক্‌ওদিক হ'লে আর রক্ষে নেই। আমরা অনেক সময় ডাণ্ডি থেকে নেমে, হেঁটেই যাচ্ছি—পা পিছ্‌লে গেলেই হয়ে যাব, একেবারে বদরী প্রাপ্তি!

পথে চল্‌তে চল্‌তে ডাণ্ডিওয়ালারা হাঁপিয়ে পড়ছে। অনবরত ডাণ্ডি নামিয়ে বিশ্রাম করছে ঝর্ণার ধারে গিয়ে, আঁচ্‌লা ভরে জল খেয়ে ভেজা মিটুচ্ছে। দাদার মুখ চোখ কালী বর্ণ হয়ে উঠেছে। মনের জোরে এগিয়ে চলেছেন তিনি। আমাদেরও ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়্‌ছে—

বেলা চারটের সময় আমরা "টেম্পল্ গেষ্ট হাউসে" এসে উঠ্‌লাম। দাদাকে জোর করে শুইয়ে দেওয়া হল। পথে, শ্রীপদের খুব জ্বর এসেছিল, যোশীমঠ থেকে, ওখানকার ডাক্তারকে দেখিয়ে, পেনিসিলিন্ ইন্‌জেক্‌সন করে তবে বেচারার জ্বর ছেড়েছে। এইটুকু ছেলে পথের ধকল সহ্য করা কি সোজা কথা।

এখন তো কিছু খাবার ব্যবস্থা করতে হবে, দোকানে কোনো খাবার নেই—তাই মিঃ কেবল ও মিঃ রাওয়াত সকলকার জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

বৌদি পথে, সারাক্ষণ বরফের টুক্‌রো নিয়ে মুখে মাথায় দিয়ে, এখন কাশতে আরম্ভ করেছেন। আমারও খুব মাথা ধরেছে। আমায় শুতে বললেন বৌদি, আমার শুতে ভাল লাগছে না। বৌদি শুয়ে পড়লেন। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, অদূরে দেখ্‌তে পাচ্ছি পাহাড়ের ওপর একটা বটগাছের তলায় সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধান তার উপর বড় বড় পাথরের হুড়ি রেখে কাঠের আগুন জেলে, মিঃ কেবল ডেক্‌চিতে খিচুড়ি বসিয়েছেন। এতো পরিশ্রম করেও এঁদের কি ক্লান্তি নেই! সারাক্ষণ খালি আমাদের যাতে কষ্ট না হয়, অসুবিধা না হয় তাই দেখে বেড়াচ্ছেন।

আমরা দোতলায় আছি। নীচে দোকান বাজার। যাত্রীরা দোকানের ধারে বসে ছাতু গুড় পুঁটলী থেকে বার করে, জল ঢেলে ভ্যালা করে করে মুখে পুরছে—ঝর্ণার ধারে গিয়ে আঁচ্‌লা ভরে জল খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করছে। আবার তারা পথ চল্‌বে, সন্ধ্যের আগে চটিতে আশ্রয় নেবে, রাতের অন্ধকার কাটবার আগেই তারা আবার যাত্রা সুরু করবে, পাকদণ্ডী দিয়ে নেমে যাবে ঘুরে ঘুরে। এমনি করে গিয়ে তারা পৌছোবে সেই প্রেমময়ের দ্বারে, মিলন হবে সেখানে গিয়ে সব ব্যাথা জুড়িয়ে যাবে তাঁকে দর্শন করে।

দাদা বললেন, এখানে আর দেরী করা চল্‌বেনা—তাড়াতাড়ি বার না হ'লে পাণ্ডুকেশ্বর, পৌছোতে রাত হয়ে যাবে। রাস্তা খারাপ! সেজন্য আমরা তখুনি ডাণ্ডিতে গিয়ে উঠ্‌লাম।

রাস্তায় খুব ধীরে ডাণ্ডিওয়ালারা চল্‌ছে। বিদায়ী সূর্যের আলোয় নীল আকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে—বনের মধ্যে থেকে কাঠুরেরা কাঠ কেটে মাথায় করে বোঝা নিয়ে নেমে আস্‌ছে সন্ধ্যের আগেই ওদের ঘরে ফিরতে হবে। তারুক বের হবে, একটু পরেই মধু খেতে আস্‌ছে পাহাড় ভেঙ্গে বাঘও বার হবে।

৬টা নাগাদ পাণ্ডুকেশ্বরে এসে পৌছোলাম। টেম্পল গেষ্ট হাউসের রাস্তটা এখানে থেকে, ভোর বেলায় রওনা হব বদরীনারায়ণের পথে আবার। পাণ্ডুকেশ্বর একটি বড় গ্রাম। সামনেই বিশাল পাহাড় ওর ওপরেই পাণ্ডবরা বাস করতেন। নীচে একতলায় যোগ বদরীর মন্দির রয়েছে। এখানে ধর্মশালা, সদাব্রত আছে, বহু চটি রয়েছে, চটিগুলিতে যাত্রীভর্ত্তি। মন্দিরে যোগবদরীর তাম্রশাসন পত্র রয়েছে। অসম্ভব মাছি এখানে, মাছিতে ঠিক মৈত্রের মত এসে আমাদের আক্রমণ করল। মশারি ঢেকে বসে আছি। দেওয়ালের গায়ে আল্‌নায় জামা ঝুল্‌ছে তাতে কালোকালো মাছিতে ভর্ত্তি। এমন মাছি জীবনে দেখিনি। এ যেন মাছির রাজ্য! রাত্রের খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি আমরা শুয়ে পড়লাম।

৩০।৪।৬১ ।

ভোর হতে না হ'তেই আমরা তৈরী হয়ে গেছি, ছটার মধ্যে রওনা হতে হবে। যাত্রীদের যাত্রা সুরু হয়ে গেছে। রাত চারটে থেকে লাঠি ঠুকে ঠুকে টর্চ্চ ও হ্যারিকেন নিয়ে হাতে চলেছে সকলে দুর্গম পথ অতিক্রম করে। ছটা বাজতেই ভাতিওয়ালারা এলো আমরাও যাত্রা সুরু করলাম এবার। আর অপেক্ষা সয়না। সত্যিই কি তাঁর কৃপা হবে, দর্শন পাব কি প্রভু? তোমার কাছে পৌছোতে আর কতদূর? দু-চোখের পাতা আনন্দ অশ্রুতে ভরে ওঠে।

যাত্রীদের কাতর ডাকে কেঁপে উঠছে বনভূমি, জয় বদরী বিশাল—আর কত দূর—আর কত দূর! কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা চলেছেন, কাপানে করে কেউ যোধপুরী কেউ মাদ্রাজী বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী তো আছেই। অতি বৃদ্ধা একজন চলেছেন কাপানে করে, বাড়ী তার যোধপুরে, লোলচর্ম্ম চোখের পাতাগুলো ঝুলে পড়েছে, কত বয়েস অনুমান করা মুস্কিল। সঙ্গে তাঁর নিজের লোক কেউ নেই! গ্রামের লোকেদের সঙ্গে এসেছেন। বদরী বিশালকে দর্শন করে জীবন ধন্য করতে—জন্ম জন্মান্তরের কামনা বাসনাকে তাঁর চরণে বলি দিতে। আর তাঁর জন্ম হবেনা, বদরী বিশাল ঠাঁই দেবেন তাঁর রাতুল চরণে।

"ব্রহ্মকমল" ফুটে বন আলো করে আছে। এতো ফুলের জন্ম যে কি করে এমন জায়গায় হয়, আশ্চর্য্য, পাহাড়ের দুধারে থোকা থোকা ফুটে আছে কাঠ গোলাপ কত রকমের রঙের ফুল যে পাহাড়ের বুকে ফুটে আছে তার নামই জানিনা। যেমন রূপ তার তেমনি সুগন্ধ। চারি ধারে বন তুলসীর বনে ছেয়ে আছে। এখানকার তুলসী পাতার গন্ধ কেমন অন্য রকম। ঠিক রাঁধুনী মত খেতে পাতাগুলো।

হঠাৎ ভাতিওয়ালাদের ডাকে আমার সম্বিত ফিরে এলো—মাইজী সিধা হোকে বৈঠিয়ে, ইধার উধার মাৎ করনা। ভাতি গির যায়গা।

ভয়ে ভাতির মাঝখানে, শিখণ্ডির মত স্থির হ'য়ে বসে আছি। বেশী নড়াচড়া করেলেই একেবারে খপাত ধরণীর কোলে।

ভাতিওয়ালারা বলতে বলতে চলেছে এক তরফ—এক তরফ ধীরসে, কদম, কদম, জয়, বদরী বিশাল—থরথর করে ঘাম বার হচ্ছে ওদের, এই বিশ্রী রাস্তা চলতে, উঃ রাস্তা কি ভীষণ খারাপ! না দেখলে বোঝা যায় না! ভয়ে, শুরু শুরু রূপ করছি—

ভাতিওয়ালারা বলছিল, মাইজী কদিন আগে ঠিক এই যায়গা থেকে, ভাতি শুদ্ধ লোক পা পিছলে, অলকানন্দায় পড়ে গেল, তার আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেলনা। চার জন ভাতিওয়ালাও মারা গেল সেই সঙ্গে, তাছাড়া গরু, ঘোড়া, মোষ, ছাগল তো হরদম পড়ছে! ওদের কথা শুনে বুকের মধ্যে কেমন করছে ভয়ে! হায়! আর বৌদির ভাতি দেখতে পাচ্ছিনা! পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে—

দল বেঁধে চলেছে বড় বড় শিংওলা ছাগল আর ভেড়ার পাল, পদপালের মত চলেছে পিঠে মাল নিয়ে, চটিতে চটিতে খাবার দিতে যাচ্ছে ওরা, আটা নুন ছোলা মটর আর চাল।

সামনেই "গ্লেসিয়ের" দেখতে পাচ্ছি পথে বরফ জমে পড়ে রয়েছে চাপ চাপ। অলকানন্দার ওপর বরফ পড়ে ঢেকে গেছে, তলা দিয়ে, বেগে যেন, গর্জ্জন করতে করতে বেগে চলেছে—স্রোতের ধাক্কায়, বরফগুলো ভেঙে গুহার মত গর্ত্ত হয়ে গেছে যায়ে যায়ে। এখানে, কেদারের মত অত ঠাণ্ডা নেই আর অত বরফও নেই।

এখন বেলা এগারোটা বেজেছে। ডাণ্ডিওয়ালারা আনন্দে বলে উঠলো ঐ দেখুন—মাইজী বদরী বিশালের মন্দির আমরা এবার এসেগেছি।

অদূরে বদরী বিশালের মন্দিরের সোনার চূড়া রোদের আলোয় ঝকমক করছে। জয় বদরী বিশাল! তোমার দ্বারে এসেছি আর আমার ভয় নেই। আনন্দে সারা মন-প্রাণ নেচে উঠছে চোখে গড়িয়ে পড়ছে প্রেমাশ্রু! বলে উঠি কই এগিয়ে চলো দেখি সেই চাঁদ মুখ।

দাদা ডাণ্ডি থেকে বলে উঠলেন, জ্যোৎস্না, আমরা এসে গেছি বদরী নাথের মন্দির দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সোনার চূড়োর লালপতাকা উড়ছে? আনন্দে বলে উঠি পেয়েছি পেয়েছি তাঁর মন্দিরের চূড়া দেখেছি। আনন্দে গেয়ে উঠি—

পাষাণ দেবতা পূজিব বলিয়া
বহু দূর হ'তে এসেছি চলিয়া
দিওনা দিওনা চরণে ঠেলিয়া
কপাল আমার মন্দ···

মন্দিরের কিছু আগে ডাণ্ডিওয়ালারা আমাদের এনে নামাল। এখান থেকে, পায়ে হেঁটে মন্দির দর্শন করতে হয়। চলেছি সেই নয়ন বিনোদের মন্দির দর্শন করতে—

মস্ত বড় পাথরের মন্দির—গায়ে তার কত কারুকার্য্য করা, উঁচু উঁচু পাথরের সিঁড়ি, জানালা ঝিলিমিলি সব, লাল সবুজ রংকরা লোহার রেলিং তার ওপোর পেতলের কাজ করা, একধারে বিষ্ণু দেবতা, আর এক ধারে লক্ষ্মী মূর্ত্তি রয়েছেন। সোনার চূড়ায় লাল পতাকা হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছে। মন্দিরের সামনে বিরাট ঘণ্টা ঝুলছে। বহু যাত্রীর ভীড় জমেছে ভেতরে আর বাইরে। কেউ দর্শন করে আনন্দে উছলে পড়ে হাতে প্রসাদী ফুলের ডালা নিয়ে ফিরছে, আবার কেউ পূজার ডালা সাজিয়ে নিয়ে দর্শনের প্রতিক্ষায়, উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্বারে পথের ধারে বসে আছে কত নাগা সন্ন্যাসী গেরুয়াধারী আর বহু ভিখারী, দুধারেই দোকান বাজার, গম্ গম্ করছে চারিধার।

মন্দিরের দ্বারে বদরী বিশালকে প্রণাম জানিয়ে, আমরা উঠলাম গিয়ে, "টেম্পল গেষ্ট হাউসে"। টেম্পল সেক্রেটারী মাদ্রাজী। তিনি বড় আদর করে, আমার দোতলার ঘরে এনে বসালেন। তপ্তকুণ্ডের জল আনিয়ে দিলেন, আমাদের মুখ হাত ধোবার জন্যে পথে কোনো কষ্ট হয়েছে কিনা খোঁজ খবর নিলেন। দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে আমাদের জন্যে খাট বিছানা পাতিয়ে, তবে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বাথরুমে এসে জলে হাত দিয়ে দাদা লাফিয়ে উঠেছেন, ও বাব্বা এযে আগুণ বেঁারা বার হচ্ছে রে! সকলে এক এক করে হাত দিয়ে দেখছি, খুব মজা লাগছে তপ্ত কুণ্ডের জল যে, তাই এতো গরম।

যাই হোক আমরা স্নান সেরে জামা কাপড় বদলে, খাটে এসে বসলাম, সেক্রেটারী, একজন লোক সঙ্গে নিয়ে হাজির। তার হাতে ট্রেতে সুগন্ধ কফির পট দুধ চিনি আর বিস্কিট্। বললেন, ভদ্রলোক, আর কিছু দিতে পারলামনা। একটু কফি খেয়ে শরীর তাজা করে নিন। দাদা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

আমরা "কফি" খেয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে নিলাম। এখনও আমাদের সব মাল এসে পৌছোয়নি। বাইরের বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলাম, বৌদি, আমি ও মিসেস্ ডালেরাও—এখান থেকে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। বহু দেশের যাত্রী এসেছে মাদ্রাজী বাঙ্গালী রাজস্থানী গুজরাটি পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী কোনো দেশের লোক আর বাকি নেই। থালা গামলা, বাটি, ঘটি, যার যা আছে নিয়ে ছুটেছে—বদরী বিশালের ভোগ নেবার

আছে। রাস্তায় ভীড় হয়েছে অসম্ভব। এক কণা অন্ন ভোগ পাবার জন্যে সকলে পাগল। কে আগে পাবে সে প্রসাদ কণিকা।

হঠাৎ দেখি রাস্তায় খুব ভীড়! একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে ঘিরে, বহু নরনারী নারায়ণ নারায়ণ বলে হাত তালি দিতে দিতে আসছে। সন্ন্যাসীর চুলে জটা নেমেছে, পরণে এক টুকরো কাপড় কোমরে জড়ানো। দাড়ি বুকের ওপর পড়ছে। দেখলে ভক্তিতে মাথা নুয়ে পড়ে। মিঃ রাওয়াতকে আমরা জিগ্যেস করতে বললেন, ইনি হচ্ছেন, নারায়ণ বাবা বা মৌনী বাবা বলে সবাই জানে। ইনি বহু বৎসর ধরে বদরী নারায়ণের সাধনা করছেন, যোষী পুরুষ, দু-দুবার ওঁর বদরী নারায়ণের দর্শন মিলেছে—কথা বলেন না মৌন সাধু। ঐযে, অদূরে মন্দির দেখছেন? ওটা যত ভক্তশিষ্যরা মিলে তৈরী করিয়ে দিয়েছে। ঐ মন্দিরের গুহার মধ্যে থাকেন।

ছমাস পরে যখন সমস্ত বরফে ঢেকে যায়, সব লোকেরা বসী মঠে নেমে যায়, নারায়ণ স্বামী তখন ঐগুহায় একা থাকেন। মন্দিরের মধ্যে সামান্য ফল আহার করেন আবার না খেয়েও কাটিয়েছেন দিনের পর দিন।

আমরা মিঃ রাওয়াতের মুখে এ সব কথা শুনে, সকলে গিয়ে, তাঁকে প্রণাম জানালাম।

বেলা একটা নাগাদ মিঃ কেবল, আমাদের সকলকার জন্যে বদরী বিশালের ভোগ নিয়ে এলেন। ভোগের থালা দেখে তো সকলে অবাক! বিরাট এক থালা, তাতে যা অন্নভোগ দিয়েছে যারো চোখ জল লোক খেতে পারে।

আর এক বালতী খোলা শুদ্ধ কাল কলায়ের ডাল—তাতে, গোটার মসলার মত, নানা রকম মসলা দিয়ে রান্না। এরকম ডাল এর আগে আমরা কখনও খাইনি।

দেব-দর্শনের আগেই ভোগ গ্রহণ করা হ'ল। সকলের কি আনন্দ সেই ভোগ খেতে বসে। ডাল আমাদের মুখে এখনও লেগে আছে। এতো মসলার ঝাল আমাদের মুখ চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। দাদা আবার এক বিন্দু ঝাল খেতে পারেন না—সেই মানুষ পরমানন্দে পরমেশ্বরের প্রসাদ খাচ্ছেন। আর নাক চোখ দিয়ে ঝালে জল বরছে। কি ঝাল রে বাবা! হেসে আমরা অস্থির হচ্ছি ডাল ভাতের বহর দেখে! এক বিন্দুও পড়ে রইল না থালায় বা বালতীতে সব কোথা দিয়ে শেষ হ'য়ে গেল। বদরী বিশালের কত দয়া! আমাদের পেট ঠাণ্ডা করিয়ে তবে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন। মা যেমন সন্তান ঘরে এলেই আগে তাকে খাইয়ে দাইয়ে, শান্ত করে, তবে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কাছে শোন।

খানিকটা বিশ্রামের পর, বেলা চারটে নাগাদ বৌদি, দাদা আর আমি বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম। অলকানন্দার ওপোর এই "রেষ্ট হাউস" তারি সুন্দর দৃশ্য দেখাচ্ছে ওপর থেকে। বিদায়ী সূর্যের আলপনা দেখা যাচ্ছে অলকানন্দার ওপরে। কত ভক্ত, সাধুসন্ত তপ্তকুণ্ডে নেমে স্নান করছেন, শ্রাদ্ধ করছেন—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে। জল দিয়ে দেঁয়া যাবার হচ্ছে তপ্তকুণ্ড থেকে।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আমরা বদরী বিশালের আরতি দেখবার জন্যে মন্দিরে রওনা হ'লাম। পরমানন্দকে দর্শন করবার অপেক্ষা আর সয় না। আর তো দেরী নেই দিন বদ্দু এবার তো দুনয়ন ভরে দেখে নেব তোমায়।

মন্দিরের মধ্যে যেন ভাব ভক্তি লুটো-পুটি করে খেলছে। কোথাও ভগবৎ পাঠ হ'চ্ছে—কোথাও বা কৃষ্ণর ভজন গান হ'চ্ছে বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে। ধূপের চন্দনের গন্ধে চারিধার কেমন ম ম করছে। কি পবিত্র পরিবেশ। আমরাও ভজন গানে যোগ দিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই, টেম্পল সেক্রেটারী আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন, মন্দিরে আরতি হবে এবার। বদরী বিশালকে দেখে অভিভূত হ'য়ে গেলাম। রাজবেশে সেজে বসে আছেন বিশ্বের রাজাধিরাজ! সর্ব্বাঙ্গে মণির পোষাক ঝক্‌মক্ করছে—মাথায় সোনার মুকুট তাতে মণিমুক্তার কাজ করা ওপরে ময়ূরপুচ্ছ দেওয়া জল জল করছে কপালে হীরের টিপ্, গলায় বনফুল আর তুলসীর মালা, সকলে একসঙ্গে ব'লে উঠি, জয় বদরী বিশাল কি জয়—আরতী আরম্ভ হল।

আমাদের বসবার জায়গা করে দিয়ে, সেক্রেটারী সকলকে বসিয়ে দিলেন। যাত্রীরা ভজন গান আরম্ভ করলেন, যত দর্শনার্থীরা, সকলেই আমরা ভজন গানে যোগ দিয়েছি রাওয়াল কত রকম করেই না আরতি করলেন, সে এক অপূর্ব্ব পরিবেশ।

ভজন শেষ হ'ল। পুরোহিত সকলকে প্রসাদী তুলসী পত্র হাতে দিলেন। এক এক করে সকলে প্রণাম জানিয়ে বদরী বিশালের পায়, মন্দির থেকে বার হয়ে আসছি। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে বলি—ওগো হরাল হরি, আজ আমার সকল প্রাণ সকল মনের অভিষ্ট সার্থক হল। কত কৃপা করেছ সখা তাইত এ দুটি নয়ন ভরে তোমায় দেখতে পেলাম, যাত্রা সফল হল সিদ্ধি হল। আনন্দাশ্রুতে দুটি চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। রাওয়াল, (পুরোহিতকে এদেশে বলে রাওয়াল) তিনি হাসাকে, হিন্দিতে জিগ্যেস করছেন, কতদিন থাকা হবে এখানে, এবং তোরেই যেন আমরা স্নান সেরে মন্দিরে চলে আসি। তোর সাতটায় বদরী বিশালের অভিষেক পুজো হবে, এবং আমরা স্পেশাল ভাবে পুজো দেখতে পাব। অভিষেক পুজো হ'য়ে গেলে, তবে যাত্রীদের পুজোর জন্যে ছাড়া হবে, পাঁচ হাজার যাত্রী এসেছে। আমরা পরশু আরতি দেখব কিনা জিগ্যেস করলেন, সে হবে রাত নটায়।

রাওয়ালের বয়েস মাত্র কুড়ি বছর—সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি, সারা দেহে পবিত্র ভাব ফুটে উঠেছে চোখে মুখে একটা দেব ভাব জ্যোতি। উনি মারাঠী ব্রাহ্মণ। এদেশের নিয়ম, যাঁরা বদরী বিশালের পুরোহিত হবেন, তাঁকে সারা জীবন কৌমার্য্য ব্রত পালন করে, ব্রহ্মচারী হ'য়ে থাকতে হবে। অনেক সৌভাগ্য না হলে, বদরী বিশালের রাওয়াল হওয়া যায় না। আমরা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে মন্দির থেকে, যখন ফিরে এলাম রাত দশটা বাজে।

মন্দির থেকে, আমাদের জন্যে গরমাগরম পুরী তরকারি আর হালুয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন। মুখ-হাত ধুয়ে পরম তৃপ্তি করে সেসব খাওয়া হল। দাদা বললেন রাত হয়েছে আর তোমরা গল্প করোনা ভোরে উঠতে হবে সেকথা মনে আছে ত? বৌদি আমি যখন বিছানায় এসে শুলাম, রাত এগারোটা বেজে গেছে।

৩১।৫।৬৩:

রাতের কুহেলী তখনও কাটেনি। তোরের শুকতারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে আকাশের বুকে—বদরী বিশালের মঙ্গল আরতির কাঁসরঘন্টার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তপ্ত কুণ্ডের জলে স্নান সেরে তৈরী হয়ে, পুজোর উপকরণ গুছিয়ে নিয়ে সকলে রওনা হলাম, বদরী বিশালের অভিষেক দেখতে।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে—চারিধারে বরফের পাহাড় যায় বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। যত যাত্রীরা মন্দিরের বাইরে, বারান্দায় লাইন করে সব দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক কলেজের লাইনের মত। একদিকে পুরুষ, একদিকে নারী। দুই দোরে পাহারা দিচ্ছে ভোজপুরী দুই দারোয়ান। যাত্রীরা পুজোর জিনিষগুলি হরিদ্বারের হাতে দিচ্ছে মন্দিরের দোরের সামনেই বড় একটা রূপোর থালা পাতা আছে—তাইতে ভোগের

প্রসাদ রাখা আছে যাত্রীদের পুজোর জিনিষগুলি, নিবেদন করে সেই থালার মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে সেই থেকে কিছু কিছু প্রসাদ সকলকে দিয়ে দিচ্ছে—দর্শনার্থী যাত্রীরা এক একজন এক মিনিট করে বদরী বিশালকে সুগন্ধ ধূপের গুচ্ছ জেলে দিচ্ছে মন্দিরের গায়ে গায়ে। দু-এক মিনিটের বেশী কারো দাঁড়াবার উপায় নেই—পিছনে হাজার হাজার যাত্রী দর্শনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

পুজোর জন্যে যে যা কামনা করে এনেছে—সব রাওয়ালের হাতে দিয়ে যাচ্ছে—তিনি নিবেদন করে দিচ্ছেন। অভিষেক পুজো দেখতে হলে হাজার এক একশো এক দিতে হয়। যে যত পারবে। এখন অভিষেক পুজো হবে। যাঁরা এই পুজো দেখবার ব্যবস্থা করেছেন, শুধু তাঁরাই এখন মন্দিরের ভেতর থাকতে পাবেন। শাস্ত্রী লিস্ট হাতে নিয়ে, নাম ধরে ডাকছেন—এক এক করে সব গিয়ে ঢুকছি—প্রায় জন পোনের হবে, আমরা ভেতরে গেলাম। তাছাড়া তিনজন শাস্ত্রী দুজন ছড়িদার আর ভারোয়ান দু-জন! মাদ্রাজী এক ভদ্রলোক স্বামী-স্ত্রী এলেন, বিশাল বপু একজন শেঠজি তাঁর স্ত্রী-পুত্রবধূ। বাঙালী বলতে শুধু দাদা বৌদি আর আমি।

মাটিতে কার্পেট বিছানো, তাইতে লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেল। সামনেই বাঁধান বেদী, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমরা তিনজন গিয়ে তার ওপর বসলুম। রাওয়াল আমাদের বার বার জিগ্যেস করছেন, আমরা ভাল দেখতে পাচ্ছি কিনা! এতো দিনের মনের বাসনা আজ বুঝি পূর্ণ হবে, নবযুবল কিশোরের আজ নব নব রূপ দর্শন করে জীবন ধন্য করব।

বদরী বিশালের পুজো দেবার জন্যে কত জিনিষই না এনেছে ভক্তরা, বড় বড় রূপোর থালা করে, রূপোর বাটিতে ভরে এনেছে নানারকম মেওয়া, বেনারসী আদাকাপড় সাচ্চা জরির কাজ করা চাঁদোয়া গায়ের উত্তরী সোনা মুক্তার গহনা রূপোর কিছুক বাটি কাজললতা কুমকুম, পায়ের নূপুরমল, কোমরপাটা বাঁশী আতর পান পোলাপজাম কত লিখব আমি? ধূপদানী চন্দনকাঠ কপালের টিকলী যার যা মনের বাসনা নিয়ে গেছে বাসুদেবের চরণে অর্ঘ্য দেবার জন্য। আমরা অতি সামান্য কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম, তাঁর চরণে দেব বলে। মনে মনে হাসি আর বলি, তোমার নিয়েই যে তোমায় দেওয়া প্রভু! তোমাকে দেবার কার সাধ্য আছে বদরী বিশাল? আমার যে তোমায় দেবার কিছুই নেই সবা চোখের জলে আমার, তোমার রাঙাচরণ দুটি ধোওয়াব সেই হবে আমার গঙ্গাজল আমার ভক্তি চন্দনে তোমায় শ্রীঅঙ্গ লেপন করব, সেই হবে আমার শ্বেতচন্দন। প্রেমের ধূপ জলে করব তোমার আরতি আর তো দেবার কিছু নেই। কি দেব তোমায়?

আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে
আমার ব্যথার পূজা
হবে সমাপন।

রাওয়াল, স্নান করে, শুদ্ধ চিত্তে এলেন। দেহ দিয়ে তার ঝরে পড়ছে—ব্রহ্মচর্য্যের জ্যোতি কি শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি—এমন নইলে পুরোহিত। সঙ্গে এলো তাঁর বরকন্দাজ রূপোর আদা সোটা নিয়ে, মাথায় রূপোর ছাতা ধরে। পৌঁছে দিয়ে গেল, মন্দিরের মধ্যে।

মন্দিরের ভেতর বেদির ওপাশে শাস্ত্রীরা বসেছেন, এক সুরে তাঁরা বদরী বিশালের মহিমাকীর্ত্তন করছেন,—এবার রাওয়াল বদরী বিশালের অভিষেক আরম্ভ করলেন—আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি—প্রথমে তপ্তকুণ্ডের জল ঘড়া ঘড়া ঢেলে স্নান করালেন, তারপর দুধ ঢাললেন ঘড়াঘড়া, গা মার্জন করলেন, গামছা দিয়ে,

এরপর মধু, ঘি, দই দিয়ে স্নান হল। সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়ে দিলেন, কানাইয়ের। আতর চন্দন মাখানো হল বেশ করে, দেহে। এইবার একটি রূপোর বাটি করে আনলেন, নানারকম সুগন্ধ দ্রব্য মিশানো একটা হলুদ রঙের তাল তার মধ্যে আছে জায়ফল, কস্তুরী, চন্দন, আতর, বাদাম, পেস্তা, অগুরু আরো কতকি! সেই মিশ্র তালটি বদরী বিশালের শ্রীঅঙ্গে লেপন করা হল, তাতে মূর্তিটি আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো ঠিক মনে হচ্ছে ঐটিতে যেন গায়ে জামাকাপড় পরান হয়েছে—

পাণ্ডারা সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন অভিষেকের সঙ্গে এক এক করে বদরী বিশালের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং কোন কোন দেব-দেবী পাশে রয়েছেন। এইবার পাণ্ডারা কাতরস্বরে বদরী বিশালকে আহ্বান করে ভজন গাইতে লাগলেন, তার সঙ্গে আমরাও ভজন গানে যোগ দিলাম সকলে—কি মধুর সেই স্তব গান নারায়ণ, বদরী নারায়ণ—গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠ্‌ছে ঝন্ ঝন্ করে পাঁচ ছটা ঘণ্টা বাজছে একসঙ্গে এক একটা ঘণ্টার বড় বড় ঘুঙুর গাঁথা দশ বারোটা করে, কি অপূর্ব সেই দৃশ্য যে দেখেছে সেই মজেছে! সকলের দু-গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে আবেগে প্রেমাশ্রু! অল্প রাগের পর, রাজবেশ পরলেন—কানাইরাজা, ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন চতুর্ভুজ মূর্তিতে সিংহাসনের ওপর রাখালরাজ। বেশভূষার পর সোনার থালার ওপর ছোট ছোট সোনার বাটি করে এলো ভোগের জন্যে নানারকম মেওয়া মিছরী ছানা ক্ষীর, মিনিট দু-একের জন্যে সামনের দিকের পর্দা টেনে দিলেন, রাওয়াল—ভোগ নিচ্ছেন গোপাল—

এদিকে প্রধান পাণ্ডা আমাদের হাতে তুলসীপাতা দিয়ে নাম গোত্র সংকল্প করে যে যা সকলে এনেছি রাওয়ালকে দিলেন, আমাদের নামে উৎসর্গ করে দেবার জন্যে। আর বদরী বিশালের অভিষেকের দুধ মধু ইত্যাদির বাটি প্রত্যেকের কাছে কাছে নিয়ে এলেন স্পর্শ করাবার জন্যে—সেই অঙ্গ মার্জনার জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কি অপূর্ব তার স্বাদ আর গন্ধ, বর্ণনার অতীত! এইবার আরতি আরম্ভ হল, অভিভূত হয়ে বসে আছি বাইরের কোনো কথা মনে নেই। কারো কথা মনে নেই—

এ পঞ্চ প্রদীপ নয়, এ ষড়ের প্রদীপ! কত থাক্ যে সাজানো আমি আর গুণে উঠ্‌তে পারিনি। তারপর চামর, পাখা, দর্পণ, কর্পূর, পদ্মপুষ্প, বস্ত্র দিয়ে আরতী শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডারা হাতের নানারকম মুদ্রাভরে, শাস্ত্র পাঠ করলেন। শেষে আবার বদরী বিশালের মহিমা কীর্ত্তন করে অভিষেক পুজো শেষ হল।

যারা বদরী বিশালের অভিষেক পুজো দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁরাই একমাত্র এর উপভোগ করে ধন্য হয়েছেন।

আমি আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি মন হরণ করে নিয়েছেন, মনহরণকারি। যিনি, একটি আঙুলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছেন, সুদর্শন চক্রধারী ষোলশো গোপীদির মনকে যিনি, হরণ করে টেনে এনেছিলেন, ঘরের বাইরে, আর বাঁশীর মন ভোলান সুরে, শ্রীমতীকে অভিসারে এনেছিলেন তাঁর প্রেমকুঞ্জে সেই চতুর কানাইয়া আজ আমাকেও টেনে নিয়েছেন তাঁর রাঙাচরণে, চোখ ফেরাতে যে চায় না! যেন টেনে রেখেছে চুম্বকের মত তাঁরই চরণকমলে নিজেকে নিবেদন করে অভিভূত হয়ে বসে আছি।

সম্বিত ফিরে এলো—পাণ্ডা বলছেন—ভাল করে দেখে নিন্ বদরী বিশালকে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি সিংহাসনের ওপর নারায়ণ শিলা হয়েছেন। তাছাড়া নর-নারায়ণ পঞ্চ মূর্তি নারদমুনি, আর লক্ষ্মী রয়েছেন। বদরী বিশালকে, ছ'মাস মনুষ্যরা পুজো করেন, ছ'মাস দেবতারা পুজো করেন। ঐ তপ্ত কুণ্ডের জলে, স্বর্গের অপ্সরারা এসে স্নান করেন বলে তাই কুণ্ডের জলের এতো মাহাত্ম্য; কার্ত্তিক মাস থেকে

কেদারনাথ আর বদরীনাথের পূজো যখন মঠে হয়। ছ'মাস বরফে সব পথঘাট মন্দির চেকে যায়, তখন রাওয়ালরা নীচে নেমে যান ঘোকানপাট হাট বাজার সব নেমে যায় নীচে। মন্দিরের মধ্যে সাড়ে সাত সের অখণ্ড ঘিয়ের প্রদীপ জেলে, ঘর বন্ধ করে রাওয়াল নীচে নেমে যান। এই প্রদীপ ঠিক ছ'টি মাস জলবে। শান্তী আমাদের হাতে চরণামৃত দিলেন, কি অপূর্ব গন্ধ তার।

রাওয়াল এগিয়ে এসে বললেন, এবার আপনারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসুন পুজো শেষ হয়েগেছে, দাদা বৌদি আমি বেদীর ওপর থেকে নেমে এলাম, পা যেন অবশ হয়ে গেছে। মূর্তির সামনে এসে প্রণাম করলাম, চির সুন্দরকে প্রাণভরে দেখে মনের মধ্যে এঁকে নিলাম, আর তো তোমার কাছে আসতে পারবনা বন্ধু, চোখের জলের বাষ্পে সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। রাওয়াল দ্বারের সামনে, প্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, আশীর্বাদ পুষ্প নিয়ে, আমরা তাঁকে প্রণাম করতেই হাতজুলে আমাদের নমস্কার জানিয়ে তিনজনের হাতে আশীর্বাদী পুষ্প দিলেন। চেতনা যেন আস্তে আস্তে ফিরে আসছে—চারিদিক চেয়ে দেখি ঘর ফাঁকা শুধু রাওয়াল আর আমরা তিনজনে রয়েছি, দাদাকে জিগ্যেস করলেন রাওয়াল, ভাল করে অভিষেক পুজো দেখতে পেয়েছি কিনা আমরা। দাদা বললেন, খুব ভাল করে দর্শন করেছি! বদরী বিশাল আমার মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন। আজই ফিরে যাবেন নাকি? সজল চোখে বলি, হাঁ আজই ফিরে যাব—দাদার শরীর ভাল নেই। তিনি স্মিত হেসে বললেন ওসব ঠিক হয়ে যাবে। বদরী বিশাল আশীর্বাদ করেছেন। তাঁর কথায় প্রাণে শক্তি এলো মনে বল এলো। মন ভরে নিয়ে যাচ্ছি, পূর্ণ ঘট—মূল ঘট আজ পূর্ণ হয়েছে—যাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে আমরা বেরিয়ে এলে ওদের ছাড়া হবে।

শেষবারের মত নবজলধর শ্যামসুন্দরকে, প্রাণভরে দেখে নিলাম সজল চোখে, মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম এক করে। দাদা বললেন, চল মন্দির প্রদক্ষিণ করে যাই—মন্দির প্রদক্ষিণ করা হল। আরো অনেক দেব দেবী রয়েছেন।

সামনেই, গরুড়, মহাবীর হনুমানজি সিদ্ধিদাতা গণেশ, জানদ্বারে সালঙ্কারা লক্ষ্মীদেবী দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

এবার আমরা বদরীনাথের ভোগরান্নার ঘরে গেলাম, ভোগ দর্শন করতে। লম্বা থালের মত উনুনকাটা, তাইতে কাঠের জাল দিচ্ছে বড় বড় পেতলের কলসীর ধরনের হাড়ী তাইতে অন্ন আর খিচুড়ী ভোগ করেছে আর সেই খোলাগুড় মসলা দেওয়া কলায়ের ডাল, সে যে কত হাঁড়ী বলতে পারিনা। এ বিরাট ব্যাপার জগন্নাথের অন্নছত্র।

"রেস্ট হাউসে" ফিরে এসে তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। সেক্রেটারী আমাদের বদরী নারায়ণের গায়ের সিল্কের বস্ত্রখণ্ড নির্মাল্য গায়ের চন্দন প্রসাদ ছবি সব দিলেন! আবার যেন আসি বললেন, অনেক বিনয় করে।

ডাণ্ডিওয়ালারা প্রস্তুত ছিল, আমরা এবার রওনা হব। আর একবার মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে ডাণ্ডিতে গিয়ে আমরা বসলাম। ডাণ্ডিওয়ালারা ষোলজন একসঙ্গে বলে উঠলো জয় কেদারনাথ জয় বদরী বিশাল, আপনা থেকেই বিরহের বিচ্ছেদ বেদনায়, চোখে জল উপছে এলো, ওগো নবজলধর ওগো চতুর কানাইয়া মন প্রাণ সবই তোমার পায়ে রেখে যাচ্ছি তুমি আমার সঙ্গে থাক প্রভু—

ধীরে ধীরে ডাণ্ডি এগিয়ে চলো, এবার আমরা, এতোদিনের মন বাসনা পূর্ণকরে ফিরে চলেছি তোমার দয়া তোমার ক্ষমার ভাণ্ডার অফুরন্ত। তুমি যে অন্তর জুড়ে বসেআছ কৃষ্ণ কানাইয়া।

ট্রপিক্যাল মেডিকেল স্কুলের ডিরেকটার ডাঃ আর এন চৌধুরীর স্ত্রীও চলেছেন। যখন আমরা ডাণ্ডি করে আবার নেমেচলেছি ফেরার পথে, হঠাৎ পাহাড়ী পথের মাঝখানে দুর্গাপুরের পাওয়ার প্লান্টের সুপারিন্টেণ্ডের স্ত্রী মিসেস এ. কে ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি হেঁটেই চলেছেন বদরীবিশালকে দর্শন করতে। দুজনকে দেখে দুজনেই যেন আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। ডাণ্ডিতে বসে হাত বাড়িয়ে দুজনে দুজনের হাত ধরলাম, বললাম এবার চলতি পথের যাত্রী—আমি ফিরে চলেছি ভাই। তিনি বললেন আপনার তো দর্শন হয়ে গেল এবার বদরী বিশালকে দেখতে চলেছি। দুজনে কেমন বিহ্বল হয়ে উঠেছিলাম আর কথা যেন যায় হচ্ছেনা কারো মুখ থেকে—ডাণ্ডি আর দাঁড়াতে চায়না। হাত ছেড়েদিলাম বললাম দর্শন করে নেমে আসুন ভালভাবে আবার দেখা হবে দুর্গাপুরে গিয়ে। মিসেস ঘোষ সরে দাঁড়ালেন পাহাড়ের ধারে—দুজনের দুচোখের আনন্দ অশ্রু উপচে উঠলো। আমার ডাণ্ডি ধীর কদমে নেমে চলো পাহাড়ের আলুঢালু পথ ধরে—আর তাঁকে পিছন ফিরে দেখতে পারলাম না।

এক এককরে সবকিছু পিছনে ফেলে চলেছি ধ্যানমগ্ন গিরিরাজ, অরণ্য বনভূমি অলকানন্দামন্দাকিনী ফলফুল বনের পাখী সুন্দরী বর্ণা' তোমাদের সকলকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তোমাদের স্নেহ ভালবাসা কোনোদিনও ভুলবনা। হে-গিরিরাজ, আমরা যখন প্রচণ্ড রোদ্রের তাপে ক্লান্ত হয়ে পথে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তোমার কোলের ছায়ায় আমাদের বিশ্রাম করতে দিয়েছ। হে বনস্পতি, তোমার তরুতলে আমরা আশ্রয় নিয়েছি—ওগো সুগন্ধ পুষ্পরাশী, তোমাদের সুগন্ধে অপরূপ রূপ মাধুরীতে, আমাদের ক্লেশকে ভুলিয়ে দিয়েছিলে, দুনয়ন ভরে তোমাদের দেখেছি হে বৃক্ষ সকল, তোমাদের সুবাতাসের স্নিগ্ধ ছায়ায় আমাদের প্রাণ শীতল করেছ। ওগো সুন্দরী বর্ণা, তোমার স্নিগ্ধ শীতল ক্ষীর ধারা পান করে আমাদের তৃষ্ণা মিটিয়েছ, আমাদের জীবন রক্ষা করেছ তুমি অলকানন্দা, মন্দাকিনী, তোমাদের নূপুর নিক্কনের সুর মূর্চ্ছনায় পথে যেতে যেতে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়েছি! হে বনের পাখী, তোমদের ভোরের ঘুম ভাঙানিয়া গানে আমাদের জাগিয়ে দিয়েছ। তোমাদের সকলকার কাছে আমরা ঋণী! যাবার পথে সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাচ্ছি। যুগযুগ ধরে তোমরা সকল জীবকেই, এমনি করে স্নেহনীড় দিয়ে ঘিরে রাখছো, পথিকের পথক্লেশ নিবারণ করছ, তৃষ্ণার্থির তৃষ্ণা নিবারণ করছ। যদি তোমাদের কাছে কোনো সময় অপরাধ করে থাকি ক্ষমা করো বন্ধু ক্ষমা করো। বিদায় নিয়ে এবার ফিরে যাচ্ছি বিদায়, বন্ধু বিদায়……

সমাপ্ত

[নিজের পরিচয়ে লেখিকা জানিয়েছেন, তাঁর শ্বশুর ছিলেন বিখ্যাত এটর্নী ৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীজগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ

দুর্গাদাস লাহিড়ী

[বাংলার লেখক সমাজে দুর্গাদাস লাহিড়ী আজ একটি বিস্মৃত নাম। কিন্তু "পৃথিবীর ইতিহাস" নামে গ্রন্থ রচনা করে একদিন তিনি যে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তা প্রাচীনকালের গ্রন্থজগতের খবর যারা রাখেন তাঁরা অবশ্যই জানেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী শুধু ইতিহাস রচয়িতাই ছিলেন না, রস রচনাতেও তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। ১৯১৫ সালে তিনি "পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ্' নামে যে বইটি প্রকাশ করেন তার মধ্যে তাঁর অনেক কৌতুকোজ্জ্বল ব্যঙ্গরচনার সমাবেশ আছে। বইখানি আজ দুষ্প্রাপ্য। সেই গ্রন্থ থেকে কয়েকটি চুটকি রচনা উদ্ধার করে দেওয়া হল। রসিক ব্যক্তি, রসরচনা, ব্যঙ্গ কৌতুক, বাঙালীর কাছে চিরকালই সমাদৃত। এই বইটির ভূমিকায় গ্রন্থকার সে কথা বলেছেন। তিনি লিখছেন—"রঙ্ তামাসা আমোদ আহ্লাদ প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। আনন্দে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। তাই আমাদের দেশে, পাল পার্বণে সকল সময়েই রসরঙ্গের আমোদ আহ্লাদের প্রাচুর্য ছিল। দেশের রাজারা আমোদ আনন্দ রসরঙ্গের জন্য বিশেষ রস-রসিকগণকে ভরণপোষণ করিতেন।

এখন অন্ন চিন্তাই চমৎকারা। সুতরাং বিশুদ্ধ আনন্দ-রস পান অতি অল্প জনের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এখন অল্প লোকেই রসের মাহাত্ম্য বুঝিয়া থাকেন; আবার, অল্প লোকেরই রসাস্বাদের অবসর আছে। ব্যঙ্গ-রঙ্গ-রস ভাব এখন তাই অনেক স্থলে বিপরীত অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে। গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি রস-ভাবে গালি বর্ষণ করিয়াও পুরস্কার লাভ করিয়া গিয়াছেন। আর, এখনকার দিনে, রসের ভাবে মিষ্ট কথা বলিলেও লোকে গালি বলিয়া মুদ্গর ধরে। কাল এমনই বিষম দাঁড়াইয়াছে।

'পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ্'—রঙ-তামাসা মাত্র। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কদাচার পরিবর্জিত হয়, সুশিক্ষা লাভ হয়—ইহাই এই গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য।"

আমরা আশা করি, গল্প-ভারতীর পাঠকবৃন্দ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল পূর্বে প্রকাশিত এই রচনাগুলির কৌতুকরস উপভোগ করে আনন্দ পাবেন।

—সম্পাদক গল্প-ভারতী]

পূজার বাজার

বড় লোকের বাড়ীর দ্বারে নহবৎ বসেছে, সাহেবদের নিমন্ত্রণ জন্য কার্ড ছাপা হচ্ছে : রঙ বেরঙের তেলের বিজ্ঞাপনে সহর ছেয়ে ফেলেছে, সংবাদ পত্রের উপহার বিতরণ আরম্ভ হয়েছে,—সুতরাং পূজা এসেছে। সন্দেহ হয়, জোড়াসাঁকোয় যান, চিৎপুরে দেখুন, বড় বাজারে ঘুরুন, বৌবাজারে বেড়ান—ঠিক বুঝতে পারবেন। তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, ইষ্টইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীতে জেনে আসুন—কত গাড়ী রিজার্ভ হয়েছে। গোল চুকিয়া যাইবে। পূজার বাজার, অনেক খরচ, হিসাবের একটা বন্দোবস্ত থাকা ভাল। তাই পঞ্চানন্দ ব্যবস্থা দিতেছেন—যিনি এক শত টাকা মাহিনা পান, তিনি দুই শত, চারি শত বা তদধিক টাকা খরচ করিতে পারেন। অভাব হয়—উত্তমর্ণ আছেন। ক্যালান বজায় রাখিতে যিনি না পারিবেন, তাঁহার জন্য পঞ্চানন্দ গলায় দড়ি বা অহিফেন সেবন ব্যবস্থা দিলেন। পঞ্চানন্দের কথা শুনিয়া এ বৎসর পূজায় নিশ্চয় পাঁচটি আত্মহত্যা হইবে। গণনা নিভুল।

সাহিত্যসেবী কে?

ভাবনার কথা বটে। পঞ্চানন্দ ভাবিয়া পান না—বাঙলায় সাহিত্যসেবী কে? সকলেই তো সাহিত্যের সেবা করিতেছেন, ইস্তক বটতলার কেরাওয়ালা হইতে লাগাইত খ্যাকার কোম্পানী, ইস্তক মোকারের মুহুরী লাগাইত ব্যাস বাল্মীকি—সাহিত্য সেবী সব কে? বাবু যদি বাঙলা ভাষায় চিঠি পত্র লেখেন, তিনিও সাহিত্য সেবী, সংবাদপত্রে যিনি পেটেণ্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন লেখেন, যিনি থিয়েটারের হাণ্ডবিল আঁটেন, যিনি কেতাবের ঝাঁকা মাথায় করিয়া শিয়ালদহের রেলে পৌঁছিয়াদেন, যিনি স্বীয় চরণ পঙ্কজে ধূলিত করিয়া কেতাবগুলিকে বাঁধাইয়া দোকানে হাজির করেন,—তিনিও কি সাহিত্যসেবী নন? যিনি বাড়ী বাড়ী সংবাদ পত্র বিলি করেন, যিনি ডাকঘরে কেরাণীর কাজ করেন, যিনি থিয়েটারে যাইয়া দর্শকরূপে নিদ্রা যাপন করেন—ইহারা কি সাহিত্যের সেবা করেন না? যাঁহাদের কোন না কোন লেখা ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে; অথবা যাঁহারা কিছু না কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারেন নাই; অথবা যাঁহারা লিখিবার কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আজিও লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহারা কি সাহিত্য সেবী নহেন? কি জানি—কে সাহিত্য সেবী? এ পর্যন্ত কেহ ইহার একটা মীমাংসা করিলেন না—এ বড় দুঃখের কথা।

নূতন নাটক

পঞ্চানন্দ কহিলেন—ভক্তগণ! পূজার সময় তোমরা যে আনন্দ উৎসব করিবে, তাহাতে কোন ভাল নাটকের অভিনয় করিবে না?

ভক্ত রামদাস। প্রভু, আপনি তো সবই জানেন। ভাল নাটক কোথায়? বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণ

চরিত্র', 'বিবিধ প্রবন্ধ' পর্যন্ত নাটক হইয়া গিয়াছে। এখন আর নাটক করিবার বই কোথায় প্রভু!

পঞ্চানন্দ। বৎস রামদাস, তুমি দীর্ঘজীবী হও। ভাল কথাটা আজ আমায় স্মরণ করাইয়া দিলে। বাঙলায় এখনো বহু পুস্তক আছে, যাহা হইতে ভাল নাটক হইতে পারে।

রামদাস। এমন কি পুস্তক প্রভু!

পঞ্চানন্দ। বৎস! 'ধারাপাত' দেখিয়াছ তো? অঙ্কপাশ হইলেও উহাকে নাটক করা অতীব সহজ। আর 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' দেখ নাই? আহা তাহা হইতেও কেমন সুন্দর নাটক হইতে পারে। অভাবে, 'বোধোদয়' পুস্তক খানিকেও সুন্দর নাটকে পরিণত করিতে পারো।

রামদাস। প্রভু, বড় বিস্ময় বাড়িতেছে এ সকল পুস্তক নাটক হইবে কি রূপে?

পঞ্চানন্দ। নাটকে কি কি প্রয়োজন জান? প্রথম বিবেচনা কর—'নাটক' শব্দের অর্থ কি? না+টক=নাটক। অর্থাৎ যাহা 'টক' নহে। তবে কি? তিক্ত হইলে হানি নাই। কিঞ্চিৎ কষায় হয়—সেও ভাল। তবে মধু একে বারেই বর্জিত হওয়া প্রয়োজন কারণ, মধু অম্ল-পরিবর্ধক। বহু বাঙালী অম্লগ্রস্ত। অতএব টক বা মিষ্টি ভিন্ন অন্য যে কোন রসের অর্থাৎ কটু কষায় তিক্ত প্রভৃতি রসের পরিপাকে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাই এখনকার সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক। নাট্যাঙ্গ বুঝিতে হইলে, ইহাই প্রথম বুঝা আবশ্যক।

রামদাস। নাট্যাঙ্গে আর কি কি প্রয়োজন প্রভু?

পঞ্চানন্দ। আর প্রয়োজন—ছন্দ। জ্ঞানোদয়ে ছন্দ কি সহজ সুন্দর হয়। নমুনা দেখ—

"আমরা
ইতঃস্তত যে সকল বস্তু
দেখিতে পাই, সে সকল-
কে পদার্থ কহে। পদার্থ
তিন—
—প্রকার।—চেতন অ—
চেতন ও উদ্ভিদ।"

কেমন বৎসগণ, এইরূপ করিয়া সাজাইলে সুন্দর ছন্দ হইতে পারে না কি?

রামদাস। প্রভু, অদ্যই এ তত্ত্বকথা আমি থিয়েটারের ম্যানেজারকে শিখাইয়া দিব। অহো, এমন সুন্দর পন্থা থাকিতে,—হে নটবরগণ, তোমরা ভাবিত হও কেন?

চুইকি

শুশধর, বাপের একই ছেলে। বাপের অসুখ করিয়াছে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তোমার বাবা কেমন আছেন? কোন মন্দ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে কি?" শুশধর ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—

"মন্দ বৈ আর কি বলব ডাক্তারবাবু! তিনি আজ বিছানায় উঠে বসতে পেরেছেন। আমার আর আশা নেই।"

• • •

ভদ্রলোকের এক কথা।

মাস্টার। (ছাত্রকে) কেমন, এবার পড়েছো কেমন?

ছাত্র। তার কসুর কিছু হয়নি। ফ্লাসে উঠতে পারি না, এই যা দুঃখ। আমার পরীক্ষার কী-টে জমা করে নেন। কাগজখানা কিল্‌আপ্‌ করেছি।

মাস্টার। সে কি হে! তিনবার পরীক্ষা দিলে, তিন বারই এক বয়ন লিখছ যে! এবার কিছু বাড়িয়ে দাও।

ছাত্র। আজ্ঞে, তা পারবো না। সেই পড়া, সেই পরীক্ষা, সেই স্কুল, সেই আমি ছাত্র, সেই আপনি মাস্টার মশাই, সবই যখন ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে, বয়সের বেলায় উল্টো পাল্টা করলে যে গোল হবে। বিশেষত, একবার যা লিখে দিয়েছি, তা বদলাই কি করে? আমি ভদ্রলোকের ছেলে মশাই। ভদ্রলোকের এক কথা।

ঘটনা-দুর্ঘটনা

ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়

অপ্রত্যাশিত ঘটনা এবং ঘটেও গেল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

স্থানীয় কলেজের তরুণ অধ্যাপক পি. বি. অর্থাৎ প্রণব ব্যানার্জি। চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে একটু টাল খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কায়দা করে নিজেকে সামলে নেবার আগেই রব উঠল, এই গেল, গেল, গেল।

কি গেল, কোথায় গেল, এসব কিছু বোঝবার আগেই চোখ তুলে প্রণব দেখতে পেল একটি পতনোন্মুখ দেহ। হুমড়ি খেয়ে টলে পড়ছে ট্রামের দিকে। ট্রামটা তখনও থামেনি। গতি মন্থর কিন্তু তখনও এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। চিন্তা বা ভাবনা করবার সময় নেই। প্রণব ক্ষিপ্রগতিতে দু'হাত বাড়িয়ে পতনোন্মুখ দেহটিকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিল নিজের ঘন সান্নিধ্যে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরমুহূর্তেই বিস্ফোরণ ঘটে গেল। একটা প্রচণ্ড চড় সজোরে এসে পড়ল তার মুখের উপর। সঙ্গে সঙ্গে তার রিমলেস চশমাখানা ফুটপাতের উপর ছিটকে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল। প্রণব চোখে অন্ধকার দেখল। কিন্তু কিছু বোঝবার আগেই একটা তীক্ষ্ণ মেয়েলী কণ্ঠস্বর তার কানে এসে পৌঁছল, স্কাউণ্ড্রেল! বাউণ্ডেলেমি করবার জায়গা পান নি। মেয়েছেলের গায়ে হাত! ইডিয়ট, নন্সেন্স! আমি পুলিশ ডাকব।

এতক্ষণে প্রণব সম্বিত ফিরে পায়। বাপসা চোখে তাকিয়ে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক অতি আধুনিকা মেয়ে। মেয়েটিকে চিনতে পারে সে। এতক্ষণ ট্রামে বসেছিল তারই সম্মুখের আসনটি দখল করে এবং প্রায় নিরাবরণ এবং নিরাভরণ শাণিত দেহের সুষমা দিয়ে সকলেরই কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল নিজের উপর।

মেয়েটি আবার ঝাঁঝিয়ে উঠে, ভদ্রলোকের ছেলে আপনি? ইতর কোথাকার। মজা দেখাচ্ছি দাঁড়ান। তারপর ক্ষীতায়মান জনতার দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে বলে, আপনারা সব সাক্ষী। আমাকে একটু সাহায্য করুন। একে আমি পুলিশে দেব। এরাই পথে ঘাটে মেয়েদের শালীনতা নষ্ট করে, বে-ইজ্জত করে। অর্বাচীন কোথাকার!

ভিড়ের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। সৌম্য চেহারা। দেখে মনে হয় এক সময় গভর্ণমেণ্টের কোন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। ভদ্রলোক ট্রামের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু হট্টগোলের মধ্যে পড়ে ট্রাম ধরা হল না তাঁর। তিনি মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললেন, ছেলেটি সত্যই অর্বাচীন যা। অর্বাচীন না হলে এভাবে এগিয়ে এসে তোমার এত বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে যাবে কেন? চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে টাল খেয়ে আছাড় ত খাচ্ছিলে তুমি। ট্রামের তলায় যে ঢুকে যেতে না, কে বলতে পারে। হাত-পা তোমার যদি খোঁড়া হয়ে যেত কি এসে যেত ওর। কিন্তু বোকার

মত তোমাকে নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে ওর না এই লাঞ্ছনা। তাই অধীচীন ওকে বলব না ত বলব কাকে? তারপর প্রণবকে লক্ষ্য করে বলেন, খুব অন্যায় কাজ করেছ বাবা। এমনটি আর কখনও ক'রনা। দয়া, ধর্ম, মানবতা দেখাতে যাওয়াটাই আজকালকার দিনে বোকামি। ওরা ট্রামের তলায় পড়ুক আর বাসের তলায় যাক কি গেল এল তোমার। বাঁচাতে গেলেই ত উল্টে চড়, চাপড় খেতে হবে। পুলিশের হাতে যেতে হবে। বাপ পিতামহের নামে কলঙ্ক পড়বে। তার চেয়ে তফাতে থাকাই মঙ্গল।

জনতা বুঝেছিল ব্যাপারটা। দেখেও ছিল সব। তারা টিট্‌কারী দিয়ে উঠল মেয়েটির উদ্দেশ্যে। বৃদ্ধ আবার মেয়েটিকে বললেন, পুলিশের হাঙ্গামায় যেও না মা। তাতে কেলেঙ্কারী বাড়বে বই কমবে না। অন্যায়কে সমর্থন করবে না কেউ। তুমি যা করেছ তাকে অন্যায় বললে অত্যন্ত লঘু করে বলা হবে। খুব মোলায়েম করে বললেও বলা যেতে পারে অকৃতজ্ঞতা। আর ভিড় না বাড়িয়ে নিজের কাজে চলে যাও যা।

মেয়েটির নাম প্রণতি। হাবে ভাবে মনে হয় বড় লোকের মেয়ে। হয়ত উঠতি বড়লোক। তাই সেমাক একটু বেশী। সেই সেমাকের ঘোরেই এমনি এক অচিন্তনীয় কাজ সে করতে পেরেছিল। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথায় তার চৈতন্য ফিরে আসে। সেই সঙ্গে বুঝতে পারে নিজের হঠকারিতার কথা। বুঝতে পারে নিজের খামখেয়ালির জন্য চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে সে এক প্রচণ্ড বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু সে বিপদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে ঐ লোকটি যার চোখের চশমা তারই মুঠাঘাতে আজ মাটিতে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ। নিজের চশমাটিও তার অক্ষত নাই। নিজেরই অসাবধানতায় তার ডাল দুখণ্ড হয়ে গিয়েছে। স্বেচ্ছায় সে এ দুর্বিপাক ডেকে এনেছে অনর্থক ছেলেটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে। অথচ এ সবের কিছুই প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবকে মেনে নিলেই সব হাঙ্গামা চুকে যেত। এমন ঘটনা যে বিরল তা নয়। তবে—

বিমূঢ় প্রণব, একপাশে অপ্রতিভ মুখে দাঁড়িয়ে বোধ হয় তার চশমাটির খোঁজে ব্যস্ত ছিল। কে একজন তার ভাঙা চশমাটি হাতে তুলে দিয়ে বলল, ওদ্রতার খেসারত ত দিলেন বেশ। নিজের মান খুইয়ে পরের ত জান বাঁচালেন। কিন্তু লাভ হল কি? অকৃতজ্ঞতাই যাদের আভরণ, তিন আঙুল কাপড়ে যাদের আবরণ, তাদের বিশ্বাস করবেন না কখনও। তারা পারে না কি? আরে ছোঃ—।

প্রণতি আর দাঁড়ায় না। ভ্যানিটি ব্যাগটা শক্ত করে চেপে ধরে ঘাড় নীচু করে ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। অশান্ত জনতার টিট্‌কারীতে সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যায়।

প্রণবও আর দাঁড়িয়ে থাকে না। বিপরীতমুখী একখানা ট্রামে উঠে সে জনতার সহানুভূতিকে এড়িয়ে যায়।

পরদিন। ভাঙা চশমাখানি নিয়ে চশমার দোকানে এসে ঢোকে প্রণব। পরিচিত দোকান। মালিকের হাতে চশমাখানি তুলে দিয়ে বলে, কাচ দুখানা পাল্টে দিতে হবে, মিঃ সরকার।

সরকার চশমাখানা পরীক্ষা করে বিস্মিত হয়। বলে, মারামারি করেছিলেন নাকি কারুর সঙ্গে? এই ত সেদিন পাল্টে নিয়ে গেলেন কাচ। এর মধ্যে ভেঙে চুর?

প্রণব বলে, এ্যাকসিডেন্ট।

—বেশ বড় রকমের এ্যাকসিডেন্ট বলুন। ছিটকে পড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়?

প্রণব হাসে, ছিটকে গিয়েছিল বলে গিয়েছিল। একেবারে দশ হাত দূরে।

—ইস্! বেশ ভালো লেন্সই দিয়েছিলাম আপনাকে। এ রকম লেন্স সচরাচর বাজারে পাওয়া যায় না। যাদের আছে, তারা ঠেসে দাম নেবে। কত দিয়েছিলেন সেবার মনে আছে?

—তিরিশ।

—এখন চল্লিশেও পাবেন না। ব্লক-এ আমার দু-একজোড়া এখনও আছে। আপনি তিরিশই দেবেন।

—বেশ তাই। কিন্তু পাব কবে। অন্ধ হয়ে আছি।

—কাল বাদ পরশু। বেলা একটার মধ্যে আসবেন। পেয়ে যাবেন।

—ধন্যবাদ। আমি ঠিক সময়েই আসব। সেদিন বারটা থেকে একটার মধ্যে আমার কোন কাজ নেই। অসুবিধে হবে না আমার। আচ্ছা চলি। ফিরে আসছিল প্রণব। কিন্তু ফিরতে গিয়েই চমকে উঠে। ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে সেতকালের সেই অলক্ষণা মেয়েটি। হাতে একখানা দুমড়ে যাওয়া চশমা। দুজনার চোখাচোখি হয়। প্রণবের চোখ দুটি জ্বলে উঠে। ইচ্ছা হয়, কাল যে চড়টা তার মুখের উপর এসে পড়েছিল, সেইটাকেই ফিরিয়ে দিয়ে ওর মুখটাকে চ্যাপ্টা করে দেয়। কিন্তু সব ইচ্ছা সব সময় পূরণ হয় না। তাই এ ইচ্ছাটাকেও সে দমন ক'রে একটা জলন্ত কটাক্ষ মেয়েটির মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে দোকান ছেড়ে চলে আসে।

কিন্তু একটা জিনিষ প্রণবের দৃষ্টি এড়াল না। মেয়েটির মুখে আর যেন সে হাস্তিকতা নাই। কেমন যেন একটা নিস্তেজ ভাব, একটা অপ্রতিভতা চোখ দুটিতে মাখান। তবে এসব নিয়ে মাথা ঘামানর মত মনের অবস্থা তার নয়। সে নিজের উত্তেজনায় দীর্ঘ পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

প্রণতিও কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। এভাবে যে আবার তাদের দেখা হবে এ সে আশা করেনি। দোকানের মালিক শ্রীসরকারের মুখে প্রফেসর ব্যানার্জি সম্বোধন শুনেই তার মাথা ঘুরে উঠে। ইনিই প্রফেসর ব্যানার্জি! আর এঁরই গায়ে হাত তুলেছিল তারই মত একজন সাধারণ মেয়ে। যা মুখে এসেছিল তাই বলে গালি দিয়েছিল। চরিত্রের উপরও কটাক্ষ করতে কোন দ্বিধা করেনি। লজ্জায় মাথা তার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইছিল। একবার মনে হ'ল, প্রকাশ্যে প্রফেসর ব্যানার্জির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কিন্তু ততক্ষণে প্রণব চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

শ্রীসরকার প্রণবের চশমাখানি নিয়ে ভিতরের কক্ষে গিয়েছিল। ভিতরে মধ্যে প্রণতির উপস্থিতি সে টের পায়নি। কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনেই প্রণতিকে পেয়ে স্বাগতম জানায়, আসুন, আসুন, অনেক দিন আপনি আসেন নি এ দিকে।

প্রণতি জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলে, মেয়েরা ভাবী স্বার্থপর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তারা কিছু করতে চায় না। আজ প্রয়োজন হয়েছে তাই এসেছি। বলে দুমড়ান চশমাখানা সে এগিয়ে দেয়।

সরকার হাতে করে নিয়ে দেখে। বলে, ডালটা দুমড়ে গেছে। ঠিক করে দিলেই হবে। তবে একটা আপ টু ডেট ডিজাইনের ফ্রেম আসছে আজকালের মধ্যে। দেখতে ভারী সুন্দর। এটা বাতিল করে সেটাই দিয়ে দেব। অপছন্দ হবে না।

—তাই দেবেন। কিন্তু দক্ষিণা?

—মৎসামান্য। তার জন্য আটকাবে না। আগে পছন্দ হ'ক। কাল ঠিক করে রাখব। পাবেন পরশু দিন।

নির্দ্দিষ্ট দিনেই প্রণতি আসে। বলে, দিন আমার চশমা।

সরকার একটা ফ্রেমের বাক্স এগিয়ে দেয়। বলে, এইমাত্র এসে পৌঁছুল। যেখানা খুশি বেছে নিন। দাম সব এক। মাত্র পঞ্চাশ টাকা।

—পঞ্চাশ টাকা! প্রণতি চমকে ওঠে। তারপর মনে মনে কি যেন হিসেব করে নিয়ে ফ্রেমগুলো সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, অনেকগুলো টাকা! এবার থাক, পরে দেখব। আপনি বরং পুরোণ ফ্রেমটাই সারিয়ে দিন।

সরকার নাছোড়বান্দা। বলে, এ জিনিস চট করে পাবেন না।

—পাব। নিশ্চয়ই পাব। আর একান্তই যদি না পাওয়া যায় কি আর করা যাবে বলুন। তারপর একটু ইতস্তত: করে বলে, প্রফেসর ব্যানার্জির···চশমাখানা? হয়ে গেছে কি? তিনি তিরিশটাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন ওখানা নিয়ে যাবার জন্য।

—নিশ্চয়ই। প্রফেসর মানুষের চশমা। না হ'লে রক্ষে আছে। নিয়ে যাবেন?

প্রণতি সম্মতি জানায়। বলে, সেই জন্যেই ত টাকা এনেছি। সে তার ব্যাগ খুলে তিরিশটা টাকা শো কেসের উপর রেখে দেয়।

সরকার চশমা বার করে এগিয়ে দেয়। প্রণতি হাতে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখে। তারপর একটু দ্বিধাভরে বলে, একেবারে আনকোরা নতুন লেন্স্। একবার চোখে পরে ফিট্ করে নিয়ে যাওয়াই ভাল। তাহলে বারবার দৌড় ঝাঁপ করতে হবে না। টাকা আমি দিয়ে গেলাম। চশমাও রইল। তিনি এসে ফিট্ করে নিয়ে যাবেন। আর সাড়ে বারোটার মধ্যে হয় ত আমি ফিরতে পারব না। বরঞ্চ একখানা চিঠি রেখে যাচ্ছি তাঁকে দেবেন। তিনি বুঝতে পারবেন সব। চিঠিটা দিতে ভুলবেন না কিন্তু। তাহলে ভাববেন তিনি।

সরকার সহাস্যে বলে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিসেস ব্যানার্জি। চিঠি চশমা যথা হস্তেই পৌঁছে দেব—।

প্রণতি আর শোনবার জন্যে অপেক্ষা করেনা। দ্রুত পদে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এসে একবার চারিদিক ভাল করে দেখে নেয়। তারপর একরকম ছুটেই ট্রাম ধরতে এগিয়ে যায়।

প্রণবও আসে ঠিক সময়ে। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারটা। সরকার চশমাখানা এগিয়ে দিয়ে বলে, একবার দেখে নিন, চোখে ঠিক ফিট্ করল কিনা। ঐ জন্যই ত উনি তখন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন না। বলে গেলেন, আপনি চোখে ফিট করে দেখে নেবেন।

প্রণব বিস্মিত হয়। প্রশ্ন করে, উনি মানে?

—মিসেস্ ব্যানার্জি। এই কিছুক্ষণ আগেই উনি এসেছিলেন। চশমার দাম তিরিশ টাকা দিয়ে গেলেন। বললেন, আপনি এসে চশমা ফিট করে দেখে নেবেন। কি যেন কাজ আছে তাঁর। এই চিঠিখানা রেখে গেছেন। এ থেকেই বুঝতে পারবেন সব।

মিসেস ব্যানার্জি! প্রণব হতভম্ব হ'য়ে পড়ে। হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে নিঃশব্দে চোখ বুলিয়ে যায়—

শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রফেসর ব্যানার্জি,

আমার অসভ্যতার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। গত পরশুর ঘটনার জন্য আমি আন্তরিক অনুতপ্ত।

এ আমার এক দুরারোগ্য রোগ। সময় সময় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কেন যে এমন কাণ্ড করে বসি এর কারণ আমি নিজেই জানি না। মনস্তাত্ত্বিকেরা হয় ত বলতে পারেন। আপনি জ্ঞানীগুণী পুরুষ। হয়ত বুঝবেন এবং আমার হিষ্টিরিয়গ্রস্ত ব্যবহারকে ক্ষমাও করবেন।

আপনার চশমার ক্ষতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি। তাই তারই খেসারত দিয়ে গেলাম দোকানের মালিকের হাতে। ঘৃণা ভরে ফিরিয়ে দিয়ে আমার অসভ্যতাকে আর প্রশ্রয় দেবেন না।

ইতি—

প্রণতি মুখার্জি।

নাম আছে, ঠিকানা নাই। প্রণব ব্যাপারটা বুঝে আপন মনে একটুখানি হাসে।

সরকার প্রশ্ন করে, হাসলেন যে? আরও কিছু হুকুম আছে নিশ্চয়ই তাই তামিল করতে ছুটতে হবে এখুনি? ভারী হাসি খুশি মেয়ে মিসেস ব্যানার্জি। ব্যবহারও খুব মিষ্টি। কিন্তু যেতে হবে কত দূর?

প্রণব আরক্ত হয়ে উঠে। চিঠিখানার উপর চোখ রেখেই উত্তর দেয়, বড়লোকের মেয়ে। ওদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। বন্ধুর সঙ্গে মটরে গেছেন ডায়মণ্ডহারবারে শিকনিক করতে। হুকুম হয়েছে আমাকেও যেতে হবে সেখানে এবং এখুনি।

সরকার বলে, তাহলে আর দেরী করবেন না। পৌঁছুতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।

—হুঁ। আমার মাথা খারাপ হয়নি। ওঁদের খুশির খেয়াল চরিতার্থ করতে গেলে গরীবের সরকারী চাকরীটাই খোয়া যাবে। ওসবের মধ্যে আমি নেই।

—তাহলে?

—যাব না।

—যাবেন না? মনক্ষুণ্ণ হবেন তিনি বারবার অনুরোধ করে গেছেন চিঠিখানা দিতে যেন ভুলে না যাই। অথচ—সরকার হেসে বলে, অথচ আপনার জন্যে তিনি কতখানিই না স্বার্থ ত্যাগ করেছেন। জানেন বোধ হয় তাঁরও চশমার ফ্রেম দুমড়ে গেছে। নতুন ধরণের ফ্রেম একখানা দেখালাম। পছন্দও হ'ল খুব। কিন্তু চশমার গ্লাসের জন্য তিরিশ এবং ফ্রেমের জন্য পঞ্চাশ একসঙ্গে অতোগুলো টাকার ভার আপনার পক্ষে অতিরিক্ত হ'বে বলে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করলেন। বললেন, এবারের মত পুরোন ফ্রেমখানাই সরিয়ে দিন। পরে নতুন ফ্রেম কিনে নেব।

প্রণব আবার হাসে। বলে, এ কৃচ্ছ্র সাধন কৃপণতার নামান্তর মাত্র। মেয়েদের হাত দিয়ে টাকা গলে না তা নিজেরই বা কি আর পরেরই বা কি। কিন্তু অপরে দিলে তাদের কৃচ্ছ্র সাধনার রূপ খসে পড়ে। তখন তারা বে-হিসেবী, বিলাসী সব।

সরকারও হাসে। বলে, মিসেস ব্যানার্জিকে একথা বলব। শুনলে খুশি হবেন না তিনি। কিন্তু বলি কি, দুদিক দিয়ে তাঁকে অ-খুশি করবেন না। ডায়মণ্ডহারবার যখন গেলেনই না, তখন ফ্রেমখানা কিনে দিন, তিনি খুশি হবেন।

প্রণব মনে মনে কি যেন ভেবে নেয় তারপর বলে, কথাটা যদি না শোনাতেন কোন দায় ছিল না আমার। কিন্তু শোনার পর যদি পাশ কাটিয়ে যাই কথাটা তাঁর কানে উঠবে নিশ্চয়ই তখন আমার ভদ্রতার ওপর একটা দোষারোপ পড়বে। তার চেয়ে ফ্রেমখানা দেখান ত একবার।

সরকার ফ্রেমের বাক্স এগিয়ে দেয়।

অনেকগুলোর মধ্যে একখানা ফ্রেম বেছে নেয় প্রণব। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলে, এই খানায় মানাবে ভাল। কর্সা মেয়েদের এই রংটা যেমন মানায় তেমন আর কিছুতে নয়। দক্ষিনেটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে আপত্তির কোন কারণ থাকবে না।

কড়কড়ে পাঁচখানা দশটাকার নোট ব্যাগথেকে বার করে প্রণব গুণে দেয়। বুকের ভিতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠে। বিনা দোষে এ কি শাস্তি তার! কিন্তু সে ভাব সে দমন করে নেয়। মনে মনে বলে, এই ঠিক হ'ল। সেই সবিতা নারীর স্পর্দ্ধার এই হবে সমুচিত জবাব।

সেই রাত্রে যখন দোকান বন্ধ করতে যাচ্ছিল সরকার ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হ'ল প্রণতি। বলল, সো সরি মিঃ সরকার। বড্ড দেরী হয়ে গেছে আমার। চশমাখানা হয়ে গেছে?

—নিশ্চয়ই। ভায়মণ্ডহারবার থেকে দেরী হয়ে গেল বুঝি?

—ভায়মণ্ডহারবার! প্রণতি অবাক হয়ে যায়।

—তাই ত। প্রফেসর ব্যানার্জি এসেছিলেন। আপনার চিঠিখানা পড়ে তিনিই বললেন এ কথা। বললেন, বড় লোকের মেয়ে। বন্ধুর সঙ্গে গেছেন ভায়মণ্ডহারবার পিকনিক করতে। হুকুম হয়েছে আমাকেও যেতে হবে সেখানে। এসব ওঁদেরই সাজে, গরীবদের সাজে না। ওঁদের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করতে গেলে গরীবের সরকারী চাকরীটাই খোয়া যাবে। ওসবের মধ্যে আমি নেই।

প্রণতি মনে মনে প্রফেসর ব্যানার্জির উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সরকারের ইঙ্গিতে সে আকর্ণ লাল হয়ে উঠে।

সরকার পুনশ্চ বলতে থাকে, কিন্তু যাই বলুন, একদিকে আপনার হুকুম তামিল না করে আপনাকে যেমন ক্ষুণ্ণ করেছেন, আর এক দিক দিয়ে তেমনি পুষিয়েও দিয়ে গেছেন। আপনাকে বলেন নি সে কথা।

প্রণতি চকিত হয়ে উঠে। বলে, না ত। আমার সঙ্গে আর দেখাই হয় নি তাঁর।

—ওঃ তাই। বলছিলাম আপনার ফ্রেমের কথা। আপনার মনের মত ফ্রেম তিনি নিজেই বেছে দিয়ে গেছেন। বলছিলেন, মেয়েদের হাত দিয়ে টাকা গলে না। এসব কৃচ্ছ সাধন তাদের কৃপণতার নামান্তর মাত্র কিন্তু অপরে দিলে তাদের কৃচ্ছ্র সাধনার রূপ খসে পড়ে। তখন তারা বে-হিসেবী, বিলাসী সব। ফ্রেম পছন্দ করে গেছেন একথা শোনার পরও যদি না কিনে দিই, আমার ভদ্রতার ওপর একটা দোষারোপ হবে। শেষ পর্যন্ত এই ফ্রেমখানা তিনি পছন্দ করে দিয়ে গেলেন। বললেন, কর্সা মেয়েদের এই রংটা যেমন মানবে তেমন আর কিছুতে নয়। তখুনি চশমা ঠিক করে রেখেছি। এখন দেখুন কেমন মানায়। বলতে বলতে প্রণতির চোখে চশমাখানা পরিয়ে দেয় সরকার। তারপর উচ্ছসিত হয়ে বলে উঠে, চমৎকার মানিয়েছে, আপনাকে। আমি নিজেই ভাবতে পারিনি, এ রংটা এত সুন্দর ম্যাচ করবে আপনাকে। মুখের বাহারটাই বদলে গেছে। প্রফেসরের রং পছন্দ করবার ক্ষমতা আছে।

প্রণতির সারা মুখ চোখ গরম হয়ে উঠে। মনে হয় সেদিন যে চড়টা সে মেরেছিল প্রফেসরের মুখে, সেই চড়টাই যেন দ্বিগুণ বেগে এসে পড়েছে তার নিজেরই মুখে। সে আর দাঁড়াতে পারে না। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে নিজের অজান্তে উত্তপ্ত গালের উপর হাত বুলাতে বুলাতে একরকম ছুটেই চলে নিজের বাড়ীর দিকে।

প্রগতির সেই ভাঙা ঘরে

রজত রায়চৌধুরী

আসুন, আসুন, দীপ্তিদি, আজ এত দেরী হ'ল?

মাথা নিচু করে ঢুকল দীপ্তি। চার হাত চওড়া দু'হাত লম্বা একটা ঘর। তার তিন ভাগ জুড়ে একটা তক্তাপোষ। ওপরে মাদুর পাতা। মাদুরটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, তেল ধুলোয় নোংরা এবং বিবর্ণ। হাত দিয়ে তারই খানিকটা অংশ পরিষ্কার করে মদন বলল, বসুন দীপ্তিদি।

দীপ্তি বসল। উৎসুক চোখে বাস্তবন্দী ছোট্ট ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল। পাশের লম্বা চার্টটার দিকে। তারপর সহাস্তে বলল, বলো মদন, তোমার রথ আসছে কখন?

দাঁত বার করে হাসল মদন। একটু বোকা বোকা লাগল হাসিটা। বলল, আজ বাস বড় কম চারটে ব্রেকডাউন ছিল, একটু আগেও একটা হয়েছে, বলতে বলতে চার্টটা হাতে তুলে নিল। কী যেন হিসেব করল মনে মনে। বললে, আজ আপনাকে ভোগাবে দীপ্তিদি। সতের মিনিট দেরী।

দীপ্তি যেন খুশি হল একথা শুনে। ব্যাগটা খুলে একটা টিফিন বাক্স বার করল। তারপর মদনের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার কলসীতে জল আছে তো?

—একটু আগে টিউবওয়েল থেকে টাটকা জল আনিয়েছি।

—আচ্ছা মদন, তুমি এর আগেও দু'একবার টিউবওয়েলের কথা বলেছ। এখানে টিউবওয়েল কোথায়?

—এই কাছেই। পি. ডাবলু. ডি'র কোয়ার্টারের সামনে।

নামেই ঘর। আসলে এটা একটা আটচালা ছাড়া আর কিছুই নয়। পাঁচফুট উঁচু একটা টিনের পাল্লা। সেটাই এ ঘরের একমাত্র দরজা। দুদিক বন্ধ। দক্ষিণদিকে একটা কঞ্চির জানলা। মাথার টালিতে জায়গায় জায়গায় ফাট ধরেছে। পশ্চিমের একটা কোণা তো হেলেই পড়েছে।

তবু এ ঘরটা যাত্রীদের পরম প্রিয়। ঘড়িবাবু মদন মণ্ডল বয়সে নবীন। কিছুটা লেখাপড়াও জানে। জমিজমা আছে। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবার। তবু কাজ তো একটা করতে হবে। কিন্তু এ কাজটা ছাড়তে পারছে না কেন, সেটাই সবার কাছে আশ্চর্য। নাহলে কলকাতার পোর্ট কমিশনার্সে তার চাকরি প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিল—তবু নিল না মদন। সবাই অবাক হয়েছিল। কিন্তু মদন কারুর কথাই শোনেনি।

একটু সরে বসে মদনের দিকে পেছন ফিরে দীপ্তি খাচ্ছে। কী খাচ্ছে তা অনুমান করতে পারে

মদন। কলা, ডিমসিদ্ধ আর সন্দেশ। সেই সঙ্গে মাখনমাখানো খানকতক বিস্কুট। চিবিয়ে খাবার একটা অস্ফুট শব্দ হচ্ছে। মদন দীপ্তির দিকে তাকাল।

এর আগেও বহুবার ও দীপ্তির দিকে তাকিয়েছে। না তাকিয়ে পারেনি। রঙটা যাকে বলে ফর্সা তা নয়। তবে একটা ঔজ্জ্বল্য আছে তাতে। এমন রঙ যে কোন মানুষের চোখে রঙ ধরাতে বাধ্য—এমন বাজি মদন তার পাড়ার দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে ইতিমধ্যেই ধরেছিল। এবং বলা বাহুল্য, প্রতিবারই তার বাজি জিততে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। তাছাড়া দীপ্তির ফিগারটাও অপূর্ব। সাধারণ বাঙালী মেয়ের চেয়ে সে একটু বেশিই লম্বা। মদনের মতে পাঁচফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি। মুখ চোখ নাক ভুরু আহামরি গোছের নয়—কিন্তু সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা ছন্দ আছে তাতে। তার চেয়েও বেশি করে আছে দীপ্তির চুল বাঁধার কারুকার্যে। কোথায় যে সামান্য কি একটা কায়দা করে চুলগুলোকে বাঁধে দীপ্তি তাতে তার মুখের শোভা যেন অনেকখানি বেড়ে যায়।

দু'হাতে দুটি সোনার চুড়ি। চৌকো ঘড়িটা চক্‌চক্ করে বাঁহাতে। কানে ঝোলানো পাথরে দুল পরে দীপ্তি। এক একদিন এক এক রঙের। শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে।

মদন দীপ্তির দিকেই তাকিয়েছিল। ব্লাউজের নিচে ইঞ্চি চারেক স্থান অনাবৃত। কালো ব্লাউজের সঙ্গে কমলা প্রিন্টের শাড়ির মাঝখানে এই অনাবৃত জায়গাটা একটা সাদা বর্ডারের মতন মনে হচ্ছে।

কোমর থেকে পিঠটা চওড়া হয়ে কাঁধের দিকে চলে গেছে। মদন দেখল, শুধু বহির্বাসেই রঙ মিলিয়ে শাড়ি ব্লাউজ পরেনি দীপ্তি অন্তর্বাসও পরেছে রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল মদন। বাস আসছে কলকাতা থেকে। তার গর্জন শোনা যাচ্ছে। এপাশ ফিরে দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল মদন। সগর্জনে প্রচুর ধুলো উড়িয়ে যাত্রীবাস এসে থামল। আর প্রায় পরমুহূর্তেই দীর্ঘ ছায়া ফেলে একটা লোক ঘরে এসে প্রবেশ করল।

ঘড়িবাবু মদন মণ্ডল ঘড়ি মিলিয়ে চার্টে টাইম বসাল।

—ঠিক হ্যায়—বাজখাঁই গলায় ঘরে কেপে উঠল আটচালাটা।

—বিলকুল ঠিক। হেসে কাগজটা ফেরৎ দিল মদন। সেই পাগড়ী মাথায় লোকটা কাগজটা নেবার সময় কৌশলে কিছু গুঁজে দিল মদনের হাতে। মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে বেরবার সময় বলল, যো সো এক নম্বর—

—যো মিনিট—জবাব দিল মদন।

বাস চলে গেলে ঘাড় ফিরিয়ে মিষ্টি হেসে দীপ্তি বলল, এই সাংকেতিক কথাগুলোর মানে—

হাসল মদন। সেই বোকা বোকা হাসি। বলল, ও আমাদের লাইনের কথা দীপ্তিদি।

—সে তো বুঝতেই পারছি। মানেটা কি? চোখ এবং ভুরু দুটো নেচে উঠল দীপ্তির।

—মানে—পকেট থেকে দেশলাই বার করল মদন, বলল, মানে হল এর আগের দুশো এক নম্বর গাড়ির খবর কি?

—আগের গাড়িটা বুঝি দু'মিনিট লেট-এ রান করেছে দীপ্তি প্রশ্ন করল।

—ঠিক ধরেছেন—প্রায় বিস্মিত হল মদন। হাসল দাঁত বার করে বোকার মতন। কী ভাগ্যিস, কনডক্টরের পয়সা গোঁজাটা দীপ্তিদি দেখেনি।

—কি গো মদনবাবু তোমার গাড়ির খবর কি?

—মতিবাবু আছি ? কি খবর ? এখন আবার কলকাতায় কেন ?

—কেন সন্ধ্যে বেলা কি কলকাতায় কাজ থাকতে পারে না—একটা মিলে করা শাড়ীর হাত দরজায় এসে পড়ল। এবং পরমুহূর্তেই সরে গেল।

—টাইমটা বলো দেখি, এককাপ চা খাওয়ার সময় হবে কি না ?

—হবে। জবাব দিল মদন।

দীপ্তিদির পাশে মেয়েটিকে বড় বেমানান বোধ হত। ভাবল মদন। বেশ কয়েকদিনই মদন লক্ষ্য করছিল একটি ছিপছিপে দোহারা চেহারার তরুণী বুকের ওপর একগাদা বই খাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেয়েটির চোখ দুটো বেশ টানা টানা। পিঠভর্তি একরাশ কালো চুল! তবে ওই মিলের বা তাঁতের লাল পাড় শাড়িতে যেন চেহারার কোন জৌলুষই খোলে না। কী যে হয়েছে সব মেয়ে স্কুলগুলোর! এরা আবার এককাঠি উঁচুতে। লালপাড় শাড়ি। বিধবাদের মত বড় চাওড়া সাদা সংস্কৃতের ব্লাউজ।

দীপ্তিকে প্রশ্ন করেছিল মদন, আচ্ছা দীপ্তিদি, আপনারা ফ্যাশন করতে পারেন, মেয়েরা পারে না কেন ?

—তাহলে যে স্কুলটা ফ্যাশন প্যারেড হয়ে দাঁড়াবে, হেসে জবাব দিয়েছিল দীপ্তি।

—কই, আপনাদের কলেজ তো ফ্যাশন প্যারেড হয়ে দাঁড়ায় নি। মদন তর্ক করতে চেয়েছিল।

কথাটা ভাববার মত। দীপ্তি বলেছিল, আমি তো মাত্র কয়েকমাস এসেছি। কেমন করে জানব কী উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ এমন স্কুলড্রেস প্রবর্তন করেছেন।

মদন আর প্রশ্ন করেনি। একদিন বৃষ্টি নেমেছিল। মেয়েটি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই মদন বলেছিল, ভেতরে এসে বসো না। কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবে।

এই ঘরে, যেখানে বসে টিফিন খাচ্ছে দীপ্তি, তারই কাছাকাছি একটা জায়গায় বসল মেয়েটা।

সারাদিনের ক্লান্তির চেহারা। কপালের ওপর ছোটবড় অনেকগুলো চুল ঘামে লেপ্টে রয়েছে। গলায় এক চিলতে সোনার হার। বেশ টাইট ব্লাউজ পরণে। মদন প্রায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই দেখল। প্রশ্ন করল, কোন্ ক্লাসে পড় ?

—ক্লাস টেন।

—কোথায় থাক।

হাত তুলে একটা দিক নির্দেশ করে মেয়েটি বলল, ওই যে সরকারী হাসপাতালটা আছে, ওখানকার কোয়ার্টারে থাকি।

—ও। তুমি তাহলে ডঃ ঘোষের মেয়ে।

একটু হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল মেয়েটি।

তারপর থেকে মদনের ডিউটি বিকেলের দিকে থাকলে মেয়েটি সোজা চলে আসত ঘরে। মদনের প্রায় গা ঘেঁসেই বসত। ঘড়িটা তুলে নিয়ে সময় দেখত। তারপর মদনের দিকে মুখ তুলে বলত, মদনদা বলুন না, কখন গাড়ি আসবে ?

মদনের ইচ্ছে হত, যত খুশি ব্রেকডাউন হোক বাসের দেরী হোক অনেক। কিন্তু অধিকাংশ দিনই বাস এসে যেত পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে। এরই মধ্যে কথাবার্তা হত অনেক।

মদনের পাশে একটি গল্পের বই রেখে তুলে নিত গৌরী। উল্টেপাল্টে বলত, আচ্ছা মদনদা, আপনাদের লাইব্রেরীতে বুদ্ধদেব নেই, আশাপূর্ণা, কিংবা ওই যে বইটা,.....

—কি বই? হেসেই প্রশ্ন করত মদন।

—ওই যে সিনেমা হচ্ছে—মনে পড়েছে, তিন নয়নের পাপে।

—আছে।

—আমাকে পড়াবেন।

—পড়াব।

—তাহলে কাল এনে রাখবেন।

—আচ্ছা।—বলেই খেয়াল হত মদনের। বলত, কাল তো আমার বিকেলে ডিউটি নেই। একেবারে সোমবার।

একদিন দুজনকে একই সঙ্গে পেয়েছিল মদন। সেদিন চড়কের জন্য, আর ফাঁকীর মেলার জন্য স্কুল-কলেজ একই সঙ্গে ছুটি হয়েগিয়েছিল।

গৌরীই এসেছিল আগে। বাস্তবধর্মী ঘড়িটার পাশে দুটো ফুটন্ত রক্তগোলাপ রেখে হাত বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ সেগুলো তুলে নিয়েছিল। মদন, একি, দুটো নয়, দুটো নয়, বলতে বলতে গৌরীর একটা হাত ধরে ফেলেছিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে শাড়ির একটা খসখস শব্দে এবং পরিচিত একটি সংলাপ দরজার সম্মুখে উচ্চারিত হয়েছিল, মদন, তোমার রথের কত দেরী?

পদব্যস্ত মদন মুহূর্তে গৌরীর হাত ছেড়ে দিয়েছিল এবং বসুন দীপ্তিদি, আগে বসুন, তারপর দেখছি বাসের খবর কী—বলে পরিস্থিতিটা সহজ করে এনেছিল।

—বা! সুন্দর গোলাপ তো? দীপ্তির চোখ গিয়ে পড়েছিল ফুলগুলোর ওপর।

গৌরী বসেনি। দাঁড়িয়েই ছিল। একটা ফুল সে দীপ্তির হাতে তুলে দিয়েছিল।

সেসব দিন মনে হচ্ছে মদনের কতকাল আগের। এই তো এখনও মাসখানেকও পার হয়নি, গৌরীর বিয়ে হয়ে গেছে। আর সেই একহারা চেহারার মেয়েটি এই ঘরে আসবে না কোনদিন। হাসবে না। কথা বলবে না। বই কাড়াকাড়ি করবে না।

দীপ্তিদির বোধ হয় টিফিন খাওয়া শেষ হল। জল গড়াচ্ছেন সেলাসে। মদন জানে এরপর মিনিট পাঁচেক সময় যাবে মেকআপের জন্য। ছোট আয়না, পাউডার, লিপস্টিক, চিরুনী সব আছে দীপ্তিদির ব্যাগে।

—মদন, দীপ্তি ডাকল, এবং মদন চোখ ফেরাতেই, একটু দেখো বলল দীপ্তি।

এ দেখার অর্থ এখন যেন কেউ হট করে এই আটচালাটার ভেতর না ঢোকে। একটা আড়ামোড়া ভেঙে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল মদন। সিগারেট ধরাল।

প্রথম দিন কেন জানিনা করেই দীপ্তির কাছ থেকে সিগারেট খাবার অনুমতি চেয়েছিল মদন। দীপ্তি সলাজে বলেছিল, আশ্চর্য্য তো কম নয়, দিদির কাছে সিগারেট খাওয়ার জন্য পারমিশন।

—মা তো আমাকে পারমিশন দিয়েছে বাড়িতে—মদনও যুক্তি দেখাতে চেয়েছিল।

খুব ওপর ছেলে তুমি, দীপ্তি মন্তব্য করেছিল।

সে কথা মনে পড়তে, আবার বাড়ির সবার হাসি মুখ মনে পড়ল মদনের। পোর্ট কমিশনার্স-এর

চাকরিটা না নেয়ায় বাবারা সবাই রেগে টং হয়েই আছেন। কেউ কথা বলেন না। বেজবৌদি ওদের স্পাই হয়ে জানতে এসেছিল, এ চাকুরিটা না ছাড়ার কি কারণ? মা বলেছিলেন, স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে তো আর পড়লিনি, তা এখন গ্রাজুয়েট হয়েছে, পড়তে চাস তো পড়।

কারুর কথায় ভোলেনি মদন। বাস দিগ্বিকেটের গুমটির ঘড়িবাবুর পোস্ট সে ছাড়তে রাজি হয়নি।

মদন, খুব আস্তে অথচ মিষ্টি করে ডাকল দীপ্তি।

—বলুন। মদন যেন তৈরী হয়েই ছিল।

—নাও, হাত পাতো, খান চারেক সন্দেশ আর একটা কেক একটা নক্সাকাটা কাগজের প্লেটে করে দিল দীপ্তি।

—এর আগেও দু'একবার কিছু না কিছু খাইয়েছে দীপ্তি। কিন্তু আজকেরটা যেন স্পেশাল বলেই মনে হচ্ছে।

—দীপ্তিদি, কি ব্যাপার বলুন তো? খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মদন।

—কিছু না, তুমি খাও তো আগে, দীপ্তি সামনে এসে বলল।

কিন্তু কেকে কামড় দেবার আগেই বাসের গোঁ গোঁ আওয়াজ ভেসে এল। দীপ্তি একবার বাসের দিকে একবার মদনের হাতের খাবারের দিকে তাকাল। কি যেন ভাবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর আবার বসে পড়ল টুপ করে।

বাসের জানালা থেকে একটা মোটা ভারী গলা ভেসে এল, মদন আছিস নাকি?

—আছি মেশোমশাই, প্রায় লাফ দিয়ে নেমে গেল মদন।

—শোন্, ওই চাকরিটা আর রাখতে পারলাম না। অতকাল এ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেছে। তোর বড়দাকে বলিস, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলুম, আর আটকে রাখা গেল না। যা দিনকাল, জানিসই তো—

বাস চলে গেল। মদন ঘরে ঢুকে বেশ অবাকই হল। এর আগে কতদিন আটকে রাখতে চেয়েছে দীপ্তিদিকে কত অনুনয় করে—কোনদিন শোনেন নি দীপ্তি, আর আজ! আশ্চর্য হবে বৈকি মদন।

পা গুটিয়ে খাটের উপর বসল মদন। খেতে লাগল। ঘরে মধ্যে আলো ইতিমধ্যে মরে এসেছে। খেতে খেতে মদন তাকাল দীপ্তিদির দিকে। দীপ্তিদি বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মদন দেখল, দক্ষ করে টানা কাজলমাখা চোখে যেন ভাবতন্ময় হয়ে গেছেন তিনি। আজ দীপ্তির গলায় লকেটঅলা একটা হার। বুকের কাপড়টা একটুখানি সরে গেছে। ঠিক বুকের মাঝখানে, যেখানে একটা সুস্পষ্ট খাঁজ দুভাগে ভাগ করেছে বুককে, সেখানে একটা লকেট। মদন এই প্রথম দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনতে ভুল করল।

দীপ্তিই সচেতন হল। বলল, মদন খাও। আমি তোমার জন্যই এই বাসে গেলাম না।

মদন লজ্জিত হল। চোখ নামাল। মনে মনে ভাবল, স্কুলের পিরিয়ড নেবার পর সপ্তাহে তিনদিন কলেজে পড়ান দীপ্তিদি। তিনদিনই সব শেষ ক্লাশ নেন তিনি। অন্যান্য অধ্যাপকরা কাছেই থাকেন, যাদের ক্লাশ থাকে শেষ পিরিয়ডে কেবল দীপ্তিদি ছাড়া। আর এই তিন দিনের মধ্যে কোন্‌দিন মদনকে পাওয়া যাবে—তা স্কুলে যাবার আগে জেনে যান দীপ্তিদি। এবং সেই তিনদিনই এখানে টিফিন করেন তিনি।

স্কুল কলেজ এখান থেকে মাইলখানেকেরও বেশি দূরে। চারটে পঞ্চাশের বাসটা না ধরতে পারলে আধঘন্টা বসে থাকতে হয় এখানে। এ সময় রিক্সাও কম। তাই দীপ্তি টিফিন খাবার জায়গা হিসেবে এই থামটাই বেছে নিয়েছে।

দীপ্তিই হাসে কথা বলে দিল। মদন বিস্মিত হল খুব। বললে, কি ব্যাপার বলুন তো?

দীপ্তি আবার বসল খুব ঘন হয়ে। একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ নাকে এল মদনের। দীপ্তিদির গায়ের গন্ধ। মদন দেখতে চেষ্টা করল লকেটটাকে, কিন্তু দেখতে পেল না।

দীপ্তি বলল, তাহলে মদনবাবু, আজকে রাতের পর কাল তোমার ডিউটি নেই। একেবারে পরশু ভোরে আবার শুরু—তাইতো?

—হ্যাঁ। ঠিক। মদন ঘাড় নাড়ল।

—তাহলে আজই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা।

—সে কি? মদন যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—কাল একবার কলেজে আসব—একটু দরকার আছে। আমি পরশুর পরের দিনই জয়েন করছি।

—লণ্ডন!

—হ্যাঁ। ওখানে ও সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। আমি গিয়েই য়ুনিভার্সিটিতে পড়া শুরু করব।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মদন। বললে, কবে আসবেন?

—তা বলতে পারিনে—নাও ফিরতে পারি—মিঃ সেন যদি ভালো চান্স পেয়ে যান ওখানেই সেটেলড্ করব।

টের পাওয়া গেল বাস আসছে। দীপ্তি বাসে ওঠবার পর একেবারে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল মদন। কিছু যেন সে বলতে চেষ্টা করল, পারল না।

দীপ্তিদি রুমালশুদ্ধ হাতটা নাড়লেন। বাস চলে গেল।

তে-মাথার সেই অরাজীর্ণ হেলে পড়া ঘরটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মদন।

তৃতীয় মেয়েটির মুখ

নির্মলেন্দু গৌতম

ব্যাগটাকে সাবধানে প্রায় বুকে চেপে ধরে ব্যাংক থেকে বেরুলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। এখন আর বাসে নয়, ট্যাক্সিতেই যাবেন তিনি। বাসে যেতে অস্বস্তি বোধ করছেন। একটু এগিয়ে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়াতেই জ্যোতিপ্রকাশবাবু অজিতবাবুকে উল্টোদিকের ফুটপাথে দেখতে পেলেন। আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছেন অজিতবাবু। দীর্ঘদিন পরে অজিতবাবুকে দেখে জ্যোতিপ্রকাশবাবু ভেতরে ভেতরে খুশী হয়ে উঠলেন। উঁচু গলায় অজিতবাবুকে ডাকলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু।

খানিকটা অবাক হয়েই অজিতবাবু ফিরে দাঁড়ালেন।

জ্যোতিপ্রকাশবাবু হাত তুলে তাঁকে দাঁড়াতে বলেই খুব সাবধানে এবং দ্রুত রাস্তাটা পেরিয়ে অজিতবাবুর কাছে এলেন।

'বহুদিন পর দেখা পেলাম আপনার।' জ্যোতিপ্রকাশবাবু বললেন।

অজিতবাবু প্রায় জড়িয়ে ধরেছেন তাকে। আশ্চর্য একটা উত্তাপে ভ'রে গেলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু।

জ্যোতিপ্রকাশবাবু কের বললেন, 'হঠাৎ চেনা চেনা মনে হতেই তাকিয়ে দেখি আপনি যাচ্ছেন।'

অজিতবাবু বললেন, 'অথচ এদিক দিয়ে আমার কিন্তু যাবার কোনো কথাই ছিলো না।'

'কেমন আছেন আগে বলুন!' জ্যোতিপ্রকাশবাবু বললেন।

'ভালো। আপনার কি খবর?'

'খুব ভালো নয়।'

'তবে আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনার বয়স অনেক বেড়ে গেছে।' ভালো ক'রে একবার তাকিয়ে অজিতবাবু বললেন।

জ্যোতিপ্রকাশবাবু হাসলেন। হাসির মধ্য দিয়ে খানিকটা বেহনা প্রকাশ হলো যেন। বললেন, 'সত্যি বয়স আমার অনেক বেড়ে গেছে।' ব'লে একটু থামলেন। তারপর কের বললেন, 'আপনার বাড়ির ঠিকানা জানবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। পাইনি। না হলে আপনার বাড়িতেই যেতাম একদিন।'

অজিতবাবু বললেন, 'আমি জানতুম, আপনি যেতেন আমার ওখানে। এদিকে আমিও আপনার পুরোনো ঠিকানায় গিয়ে ঘুরে এসেছি একদিন। পাড়ার একজন বললো, রিটায়ারের কদিন পরেই ওবাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন আপনি।'

জ্যোতিপ্রকাশবাবু বললেন, 'একখানা ছোটো বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। অতো টাকা ভাড়া দেবার সাধ্যি কোথায় এখন!'

অজিতবাবু কিছু বললেন না।

জ্যোতিপ্রকাশবাবু অজিতবাবুর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালেন এবার। অজিতবাবু যে বয়সে রিটায়ার করেছেন, সেই বয়সটা এখনও স্থির হয়ে আছে অজিতবাবুর শরীরে। বয়স বাড়েনি। অথচ সত্যি জ্যোতিপ্রকাশবাবু এই ক'বছরে অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন। আয়নার সামনে দাঁড়ালে জ্যোতিপ্রকাশবাবু স্পষ্ট দেখতে পান মুখের অজস্র ভাঁজের মধ্যে বার্ধক্য খেলে বেড়াচ্ছে। কেমন অসহায় বোধ করেন জ্যোতিপ্রকাশ বাবু। ছোটো জানালার কাছে এসে দাঁড়ান। আকাশ দেখেন, রোদ্দুর দেখেন। বড়ো ভাবনার মধ্যে নিজের এই ছোটো ভাবনাটাকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

অজিতবাবু জ্যোতিপ্রকাশবাবুর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললেন, 'কাজ আছে নাকি এখন?'

হাত ঘড়ির দিকে চোখ ফেরালেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। বললেন, 'না, তেমন কিছু কাজ নেই।'

'তাহলে চলুন আমার সঙ্গে। আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই।'

অজিতবাবুর কথায় একটু ভাবলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। হাতের ব্যাগটার দিকে একবার তাকালেন। পাঁচ হাজার টাকা ব্যাগটার মধ্যে। সামিত আগে ব্যাংক থেকে তুলেছেন। এতোগুলো টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে কেমন দুর্বল বোধ হচ্ছে। বাসে উঠতেই সাহস পাচ্ছেন না। ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেজন্য।

অজিতবাবু তাড়া দিলেন, 'কি ভাবছেন?'

'বরং আরেকদিন যাবো। আপনি ঠিকানাটা দিয়ে দিন।'

অজিতবাবু বললেন, 'অসুবিধে আছে বুঝি?'

কি বলবেন, ঠিক ভেবে পেলেন না জ্যোতিপ্রকাশবাবু। ব্যাগটাতো হাতেই রইলো। তুলে কোথাও রাখবার কোনো প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া কে আর জানতে গেছে যে তার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা আছে। একটু কম ভীড়ের বাসে উঠলেই হবে। দিনে দুপুরে নিশ্চই কোনো ভয় নেই।

অজিতবাবুকে ফিরিয়ে দিতে কেমন দুর্বল বোধ করলেন মনে মনে।

কাজেই শেষে বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন।'

অজিতবাবু খুশী হয়ে উঠলেন।

বাসষ্টপের দিকে হাঁটতে থাকলেন দু'জনে।

'যাদবপুরে ছোটোখাটো একটা বাড়ি করেছি। জীবনের শেষ দিনগুলোয় আর ভাড়া গুণতে ইচ্ছে হয়না।' অজিতবাবু বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে সুখ ক'রে পড়লো।

জ্যোতিপ্রকাশবাবু নিজের ভাড়া বাড়ির কথা ভাবলেন। অমিয়বাবুর ছোটো ছেলে পয়লা তারিখে এসে ভাড়ার টাকা গুণে নিয়ে যায়। সারাজীবন তাকে সম্ভবতঃ অমিয়বাবুর ছোটো ছেলের হাতেই মাসের পয়লা তারিখে ভাড়ার টাকা গুণে দিতে হবে। খানিকটা বিষণ্ণ বোধ করলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। অজিত-বাবুর দিকে তাকিয়ে একটু দেরী করেই দুর্বল গলায় বললেন, 'সত্যি কথাই কিন্তু।'

'আপনার বড়ো ছেলে কি করছে এখন?' অজিতবাবু শুধালেন।

'ছোটোখাটো একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দিয়েছি। বেশীদূর পড়াতে পারলাম কই?'

'ছোটোটি?'

'কিছু করে না। পায় দায়, আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।' অবজ্ঞার গলায় বললেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু।

অজিতবাবু আর কিছু শুধালেন না।

জ্যোতিপ্রকাশবাবু জানেন অজিতবাবুর ছেলে বিভাস বাইটার্সে ভালো কাজ করে। একটিই ছেলে। বিভাসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে জ্যোতিপ্রকাশবাবুর। বিভাস তাকে কাকাবাবু ব'লে ডাকে। এই মুহূর্তে বিভাস সম্পর্কে কোনো কথা শুনতে পারলেন না জ্যোতিপ্রকাশবাবু।

বাসস্টপে এসে দাঁড়াতেই বসে এলো।

অজিতবাবু এবং জ্যোতিপ্রকাশবাবু বাসে উঠে পড়লেন। বসবার জায়গা অবশ্য পেলেন না কেউ। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন দু'জন।

জ্যোতিপ্রকাশবাবু খুব সাবধানে এবং সতর্কভাবে ব্যাগটাকে ধ'রে রইলেন। পাঁচ হাজার টাকা ব্যাগের মধ্যে। না এলেই হতো, হঠাৎ মনে হলো জ্যোতিপ্রকাশবাবুর। ট্যাক্সি ক'রে এতোক্ষণ বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারতেন। নিশ্চিন্ত হতে পারতেন তিনি।

অজিতবাবুই দুটো টিকিট কিনলেন। জ্যোতিপ্রকাশবাবুকে কাটতে দিলেন না।

কয়েকটা ষ্টপ পেরোবার পর বসবার জায়গা পেলেন দু'জনেই।

জ্যোতিপ্রকাশবাবু কোলের ওপর ব্যাগটা একরকম আঁকড়ে ধরেই বসলেন। বাইরে তাকালেন তারপর। জনত, বাসষ্টপ দোকান পাট ইত্যাদি কোনো কিছুর দিকে তাকালেন না। বাইরে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে থাকলেন। নিজের বার্ধক্যে পৌঁছুনো চেহারাখানি।

অজিতবাবুর সঙ্গে এক আপিসে কাজ করতেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। দীর্ঘকাল পাশাপাশি চেয়ারে বসেছেন। তারপর একই সঙ্গে রিটায়ার করছেন দুজন। একটা অদ্ভুত হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিলো দু'জনের মধ্যে। যে হৃদ্যতাটুকুকে দু'জনের কেউ-ই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন না। পরস্পর পরস্পরের মুখ মুখ বিনিময় করতে করতে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। বিকেলের রোদ্দুরের মতো তার স্মৃতিটুকু আজও বিষণ্ণ হয়ে রেয়ে আছে। বেদনার্ত হলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে জ্যোতিপ্রকাশবাবু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং নিজের ষ্টপ আসতে অজিতবাবু যখন ডাক দিলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবুকে, তখন চমকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'এই ষ্টপে নামতে হবে।' অজিতবাবু বললেন।

'চলুন তাহলে।' ব্যাগটা আঁকড়ে ধ'রে পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু।

বাসষ্টপে নেমে খানিকটা হেঁটে এসে দাঁড়ালেন অজিতবাবুর বাড়ির সামনে। একতলা ছোট্ট এখখানা বাড়ি। চমৎকার।

অজিতবাবু উদ্ভাসিত গলায় বললেন, 'এই আমার বাড়ি!'

জ্যোতিপ্রকাশবাবু আচ্ছন্নের গলায় বললেন, 'চমৎকার!'

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। অজিতবাবু তাড়া দিলেন, 'কী হলো, চলে আসুন ভেতরে।'

অজিতবাবুর সঙ্গে ভেতরে এলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। দরজা খুলে দিলেন অজিতবাবুর স্ত্রী।

সাজানো গোছানো ঘরগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে দেখালেন অজিতবাবু। তারপর বাইরের ঘরে এসে বসলেন।

'চমৎকার!' জ্যোতিপ্রকাশবাবু কেবল বললেন।

সুখ-সুখ মুখ ক'রে অজিতবাবু বললেন, 'প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে যা পেয়েছিলাম, সব এর পেছনে খরচ করেছি।'

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের কথায় জ্যোতিপ্রকাশবাবুর ভেতরটা কেমন ন'ড়ে উঠলো। ছোটো জানালাটার মধ্য দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। একটুখানি ফাঁকা জায়গা। ফাঁকা জায়গা টুকুতে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে ইচ্ছে হলো তার।

'বিভাসও মাঝে মাঝে কিছু ক'রে জমাচ্ছে। একবারে সেটা দিয়ে বড়ো কিছু একটা করবে আর কি।' কথাটা ব'লে অজিতবাবু ড্রয়ার থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রে জ্যোতিপ্রকাশবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'নিন।'

হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। জ্যোতিপ্রকাশবাবু অন্যমনস্কভাবে সিগারেটটা ধরালেন, কিন্তু তা একটু পরে দু'আঙুলের ফাঁকে আপনি পুড়তে থাকলো।

বড়ো ছেলেটা যা আয় করে তা এতো কম যে মাসের সাতদিন পেরুলে আর বাজার করবার টাকা থাকে না। জ্যোতিপ্রকাশবাবু ভাবতে থাকলেন। তার পেনশনের টাকা বাড়ি ভাড়ায় লেগে যায়। যা দু'চার টাকা বাকী থাকে, তা দিয়ে সিগারেটের খরচ হয় না। অথচ বড়ো ছেলের কাছে টাকা চাইতে অস্বস্তি বোধ করেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু।

এবার জ্যোতিপ্রকাশবাবুর মনে হলো অজিতবাবুকে না ডাকলেই হতো। অভাবের জন্য দুঃখ বোধটাকে এতো বড়ো ক'রে মনে হতো না তাহলে।

অজিতবাবু বললেন, 'আপনার মেয়েদের খবর বললেন না তো।'

জ্যোতিপ্রকাশবাবু এবার দীর্ঘ করে সিগারেটে টান দিলেন। তারপর ধোঁয়াটুকু ছাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'তৃতীয় মেয়েটির বিয়ে দিচ্ছি এবার। আগামী সতেরোই বিয়ে। সেজন্যেই আপনার ঠিকানাটা খারুণ ভাবে খুঁজছিলাম। বিভাস রাইটার্সে কোথায় কাজ করে জানলে কোনো অসুবিধেই হতো না।'

কথাটা বলতেই মেয়েদের সুখী মুখ জ্যোতিপ্রকাশবাবুর চোখে ভাসলো। দু'জনেরই ভালো বিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় মেয়েটির জন্যেও ভালো ছেলে পেয়েছেন। এর জন্যে অবশ্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে।

ব্যাঙ্কের যা তৃতীয় মেয়েটির বিয়ের জন্য তোলা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের শেষ টাকা। তিনটি মেয়ে না থাকলে অজিতবাবুর মতো এমনি ছোটো একটা বাড়ি তুলতে পারতেন তিনি। এমনি নরম চেয়ার তৈরী করতে পারতেন। যেখানে ঠিক এমনি অজিতবাবুর মুখোমুখি বসতে পারতেন। সুখের গল্প করতে পারতেন।

ভেতরে ভেতরে কেমন ঘামিয়ে উঠলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু।

অজিতবাবু বললেন, 'মেয়েদের বিয়ে দেয়াটাই সব থেকে কঠিন ব্যাপার। সেই কঠিন ব্যাপারটা সেরে ফেললেন একেবারে। এখন তো রীতিমতো সুখী মানুষ আপনি।'

কথা শুনেই জ্যোতিপ্রকাশবাবু নিবিড় চোখে তাকালেন অজিতবাবুর দিকে। অজিতবাবুর মেয়ে নেই। তবু অজিতবাবুর চোখ দেখে মনে হলো, তিনি যেন জ্যোতিপ্রকাশবাবুকে ঈর্ষা করছেন।

অবাক হলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। মেয়ে নেই বলেই তো অজিতবাবু এমন চমৎকার একখানা বাড়ি

তুলতে পেরেছেন। মেয়ে থাকলে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাগুলো মেয়েদের জন্যেই নিঃশেষে খরচ ক'রে ফেলতে হতো। তার মতো অল্প ভাড়ার একটা বাড়িতে থাকতে হতো।

একমুহূর্তে জ্যোতিপ্রকাশবাবু যেন নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন। সমস্ত অভাবের মধ্যেও মেয়েদের সুখী মুখগুলো যখন তাঁর চোখে ভাসে তখন সমস্ত অভাব, সমস্ত কষ্ট যেন উত্তীর্ণ হয়ে যান। মেয়েরা যখন বাড়িতে আসে তখন কী যেন দিয়ে পাবার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। মেনার পয়সা দিয়ে নাতি-নাতনিদের জন্য চকোলেট কেনেন। আবার চলে যাবার সময় গুপকর একটা বেদনায় জ্যোতিপ্রকাশবাবু ভ'রে যান। কিন্তু এ সুখ থেকে বাদ প'ড়ে গেছেন অজিতবাবু। সংসারে এমন সুখের অধিকার যার নেই সে নিশ্চিন্তভাবেই উদাসরায়ণ হয়ে উঠবে।

হাতের প্রায় ফুরিয়ে আসা সিগারেটটাতে দীর্ঘ একটা টান দিলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। সামনে রাখা এ্যাসট্রেতে ছাই ঝাড়লেন। বুকের মধ্যে কোথায় যেন সুখের একটা অস্থিরতা অনুভব করতে থাকলেন। তারপর চাপা একটা উত্তেজনায় অজিতবাবুকে বললেন, 'আমি এখুনি ফিরবো কিন্তু।'

'সে কি? বসুন গল্প-টল্প হোক।'

'না না, বসবো না। বসবার সময় নেই আমার।' উত্তেজনাটুকু খানিকটা প্রকাশ পেলো এবার।

'তাহলেও একটু চা খেয়ে তো যাবেন।'

'না না, আজ আর চা নয়।'

ব'লে ব্যাগটা প্রায় বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে উঠে দাঁড়ালেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। অন্যমনস্কভাবে অজিতবাবুর দিকে তাকিয়ে শুধালেন, 'এদিকে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে তো?'

'যাবে। কিন্তু ব্যস্ত হবার কি আছে!' অবাক হয়ে বললেন অজিতবাবু।

জ্যোতিপ্রকাশবাবু ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন। ব্যাগটা বুকে চেপে ধরেই বললেন, 'ঠিকানা তো জেনেই গেলাম। আমি বরং আরেকদিন আসবো।'

অজিতবাবুর নির্বোধ মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বাইরে এলেন জ্যোতিপ্রকাশবাবু। তৃতীয় মেয়েটির মুখ তার মনে পড়ছে। শুধু তার তৃতীয় মেয়েটির সুখই নয়, তার নিজের সুখ ও এই ব্যাগটার মধ্যে। অত্যন্ত সাবধানে এখন এই ব্যাগটা নিয়ে বাড়িতে পৌঁছুতে হবে যে!!

চুম্বন

সুজন রায়

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাত। সাগরতীরের ছোট ছোট গ্রামগুলি স্তব্ধ, আড়ষ্ট। হিংসীয় অম্বুধি যেন ঘুমন্ত শিশুর মতো শান্ত।

উপসাগরের কিনারায় পাহাড়ের ধারে জেলের দল শীতের প্রকোপ উপেক্ষা করে এরই মধ্যে কাজে লেগে গেছে। কেউ বা জাল টেনে তুলছে। কেউ বা খেয়ানৌকা ভাসিয়ে যাত্রীর অপেক্ষা করছে, কেউ বা নৌকা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখছে।

নগরের পুরোহিত এসে মাঝি শ্রীমন্তের নৌকায় উঠলেন। বারেক আকাশের পানে তাকিয়ে বললেন—শ্রীমন্ত, আজকে কি আকাশ সারাদিন এমনি পরিষ্কার থাকবে?

শ্রীমন্ত উত্তর দিল—আজ্ঞে হাঁ। একটু পরেই কুয়াশার ঘোর কেটে যাবে। আপনার কোন চিন্তা নেই।

পুরোহিত বললেন—তাহলে আর দেরী কি? যাত্রা করা হোক।

শ্রীমন্ত নৌকা ছাড়তে ইতস্তত করছে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—বিলম্ব কিসের শ্রীমন্ত?

সামনের দিকে তাকিয়ে শ্রীমন্ত বললে—আর একজন যাত্রী আসছে। সেও কর্পূরনগর যাবে। অবশ্য আপনার অনুমতি ছাড়া তাকে নৌকায় নিতে পারবো না। ওই যে—

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পুরোহিত বলে উঠলেন—আরে, এ যে শৈলা!

দ্রুত পদে একটি তরুণী নৌকার কাছে এসে দাঁড়ালো এবং পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে প্রণাম জানালো।

পুরোহিত বললেন—সুপ্রভাত শৈলা। তুমি কি আমাদের সঙ্গে কর্পূরনগরে যাবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

—শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা কর। নৌকা ওর।

শ্রীমন্ত ইতিমধ্যে কয়েকটা কাঠের বাক্স সরিয়ে শৈলার বসবার জায়গা করে দিয়েছে।

শৈলা বললে—আমার কাছে কিন্তু চারটির বেশি কাহন নেই। এতে কি যাওয়া যাবে?

শ্রীমন্ত বললে—ও আমার চাই না। তুমিই রেখে দাও।

মাঝির কথার উত্তরে ভ্রুভঙ্গী করে তরুণী বললে—আমি বিনা কড়িতে যেতে চাই না।

সস্মিত মুখে পুরোহিত বললেন—এসো, এসো, শৈলা! শ্রীমন্ত বড় ভাল ছেলে। তোমায় বিনা ভাড়ায় পার করে দিলে। এসো, উঠ এসো।

এই বলে তিনি তার হাত ধরে নৌকায় তুলে বললেন—বোসো এইখানে। দেখ, এরই মধ্যে শ্রীমন্ত ওর গায়ের নতুন চাদরখানা তোমার জন্যে পেতে দিয়েছে। না, শ্রীমন্ত, ওতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। একজন তরুণীর জন্যে একজন যুবক যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে, তা সে আর কারুর জন্যে পারবে না। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই স্বাভাবিক নিয়ম চলে আসছে।

নৌকায় উঠে শৈলা শ্রীমন্তের চাদরখানি একপাশে সরিয়ে রেখে নিজের জায়গায় বসল। শ্রীমন্ত তা লক্ষ্য করে মুখ গম্ভীর করে নৌকা চালিয়ে দিল।

শৈলার দিকে চেয়ে পুরোহিত প্রশ্ন করলেন—তোমার পুঁটলিতে কি আছে?

—সুতো। নগরে দু'জন খদ্দের আছে। তাদের বিক্রি করব।

—সুতো কি তুমি নিজে বেচতে যাবে?

শৈলা ঘাড় নাড়ল।

—তোমার মা কেমন আছেন?

বিষণ্ণ মুখে শৈলা জবাব দিল—ভাল নেই। বৈদ্য বলেছেন, জীবনের আশা খুব কম।

পুরোহিত বললেন—এই সময় তোমার বিবাহটি হোয়ে গেলে তোমার মা অনেকদিন শান্তি পেতেন। যে শিল্পীটির সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল তাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করলে কেন? শুনেছি, ছেলেটি সৎ, ভদ্র—

শৈলা মৃদু দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলো—আমি বিবাহ করব না।

—সে কি? বিবাহ করবে না! চিরকাল একাকী একঘেয়ে জীবন যাপন করবে? তা কখনো হয়! আর কেনই বা বিবাহ করবে না?

শৈলা নীরব।

পুরোহিত বললেন—আমার কাছে বলতে কি তোমার সংকোচ বোধ হচ্ছে? খুব কি গোপনীয় কিছু?

—না প্রভু, তা নয়!

এই বলে শৈলা পুরোহিতের কাছে সরে এলো। তারপর শ্রীমন্ত না শুনতে পায় এমনি মৃদুস্বরে তার জীবনের কাহিনী বলতে লাগল:

কীভাবে তার বাবা প্রতিরাত্রে মত্তাবস্থায় বাড়ীফিরে মায়ের উপর অত্যাচার করতো, কেমন করে মায়ের গোপন-সঞ্চিত সামান্য অর্থ থেকে আরম্ভ করে তাঁর প্রত্যেকটি অলঙ্কার তার বাবা এক এক করে কেড়ে নিয়েছিল, কেমন করে তার মা নীরবে স্বামীর সকল নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে ভিতরে ভিতরে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন—অসহায়া নারীর প্রতি পুরুষের নির্মম নিপীড়নের সেই করুণ কাহিনী বিবৃত করে শৈলা বললে—

বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর মা তাঁর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন বটে, কিন্তু আমি তা পারিনি। সেই থেকে সমস্ত পুরুষ জাতটার উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। সেই জন্যেই ঠাকুর আমার বিবাহ করবার কোন সাধ নেই, কোন পুরুষের কবলে আমি যাবো না কোনদিন।

নৌকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছাল।

নৌকা থেকে নেমে পুরোহিত শৈলাকে বললেন—তুমি অবসর মতো একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো।

তারপর শ্রীমন্তকে উদ্দেশ করে বললেন—আমি এবেলা আর ফিরবো না। শৈলা অবশ্য নিশ্চয়ই ফিরবে। তুমি ওর জন্য অপেক্ষা কোরো।

শ্রীমন্ত বললে—আমি দুপুর অবধি থাকবো। তার মধ্যে যদি তুমি আসো···

শৈলা তার কথার কোন উত্তর না দিয়েই এগিয়ে গেল।

কিছুদূর এসে সে পথের বাঁকের মুখে দাঁড়াল। পুরোহিত চলে গেলেন অন্যদিকে। শৈলা পিছন ফিরে তাকালো, দেখলো, মুখের উপর অপরিসীম বেদনার ছায়া নিয়ে শ্রীমন্ত তারই পানে তাকিয়ে আছে।

• • • •

শৈলা যখন ফিরে এলো তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়! প্রখর সূর্যকিরণে জলস্থল উত্তপ্ত। জনশূন্য বালুবেলা।

শ্রীমন্ত ইতিমধ্যে নগরের ভিতর গিয়ে আহার সমাধা করে এসেছিল। কয়েকটা কমলালেবু কিনে এনে সেগুলি নৌকার একপাশে একটা চুবড়ির মধ্যে রেখে সে শৈলার অপেক্ষায় বসেছিল।

শৈলা এসে বিনা বাক্যব্যয়ে নৌকায় উঠে বসল। শ্রীমন্ত নৌকা ভাসিয়ে দিল। কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

নৌকার অপরদিকে পাশ ফিরে বসেছিল শৈলা, কিছুক্ষণ নীরবে নৌকা চালাবার পর শ্রীমন্ত দাঁড় বন্ধ করে উঠে এসে লেবুর চুবড়িটা বার করল এবং সেটা শৈলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—দু'একটা খাও, তেষ্টা পাবে, বড্ড গরম। তেমনি রোদ। আমাদের যেতে হবে বড় কমখানি তো নয়!

—তুমি খাও। আমার দরকার নেই।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শ্রীমন্ত বললে—তোমার মায়ের জন্যে লেবু ক'টা নিয়ে যেও। তোমার মায়ের যে এতো অসুখ তা তো জানতাম না!

শৈলা বললে—বাড়ীতে লেবু আছে। আর বাজারও কাছেই। তাছাড়া মা তো তোমায় চেনেনা যে তোমার দেওয়া জিনিষ তাঁকে দেব।

—বেশতো! তুমি আমার পরিচয় তাঁর কাছে দিও।

—আমি? আমিও তো তোমায় চিনি না।

শ্রীমন্ত আর কোন কথা বললে না। রাগে অপমানে দুঃখে তার সর্বশরীর যেন জ্বালা করতে লাগল। শৈলা তাকে চেনে না? মিথ্যাবাদী! যতদিন তারা এখানে এসেছে ততদিন ধরে শ্রীমন্ত তার মনস্তুষ্টির জন্য শতসহস্ররূপে চেষ্টা করে আসছে! আর আজ শৈলা তাকে চেনে না? ক্ষুব্ধ ক্রোধে বসে ভিতরে ভিতরে ফুলতে লাগল শ্রীমন্ত।

অনুকূল বাতাসে তরী ভেসে চলেছে। চারিদিকে অটুট স্তব্ধতা।

কিছুক্ষণ এমনি করে কেটে গেল। তারপর সহসা শ্রীমন্ত দাঁড় টানা বন্ধ করে শৈলার দিকে ফিরে তাকালো। চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললে—আজ এর একটা নিষ্পত্তি করে ফেলতে চাই। শৈলা! কেন তুমি আমাকে এতখানি অবহেলা কর? আমার মনের কথা তুমি নিশ্চয় জানো, অনেকদিন ধরেই জানো। তবে কেন বার বার এমন করে আমায় অপমান কর!

অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল শৈলা—অপমান তোমায় করিনি কোনদিন। কেবল জানিয়ে দিয়েছি, তোমাকে স্বামীত্বের আসনে বরণ কোরে নিতে পারবো না, কাউকে কোনদিনই পারবো না।

—কেন পারবে না ?

—একথা জিজ্ঞাসা করবার তোমার কোন অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না।

—অধিকার নেই ?

শ্রীমন্তের কথায় ধমকে শীলা মনে মনে চমকে উঠল তার মুখের পানে চেয়ে দেখল, একটা বিশ্রী বিকৃত হাসিতে সে মুখ কুৎসিত বিবর্ণ।

উদ্দাম কণ্ঠে শ্রীমন্ত বলে উঠল—অধিকার আছে। আর এইখানে এই মুহূর্তে সেই অধিকারের প্রতিষ্ঠা করব আমি। তুমি এখন আমার মুঠোর মধ্যে, সেটা বোধ হয় তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না।

শীলা স্তব্ধ বোধ করল, বুঝলো, শ্রীমন্ত সহসা আজ উন্মত্ত হোয়ে উঠেছে। তাকে প্রতিনিবৃত্ত করা সহজ হবে না। তবুও নির্ভীক কণ্ঠে বললে—হাঁ, তা জানি। তুমি এখন ইচ্ছে করলে আমায় মেরে ফেলতেও পারো। কিন্তু তবুও—

—হাঁ, পারি। তাই করব আজ। এই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে দু'জনের স্থান যথেষ্ট আছে। দু'জনে একসঙ্গে আজ ওরই অতলে তলিয়ে যাব। আজ, এখনি।

এই বলে শ্রীমন্ত ক্ষিপ্ত পশুর মত লাফিয়ে গিয়ে শীলার হাত ধরে সবলে তাকে আকর্ষণ করল।

মুহূর্ত মাত্র !

পরক্ষণেই একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করে শ্রীমন্ত শীলাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে সরে দাঁড়াল। তার ডান হাতের মণিবন্ধের কাছ থেকে ঘন রক্তস্রোত প্রবাহিত হোতে লাগল। আত্মরক্ষার জন্ত শীলা প্রাণপণ শক্তিতে তার হাতের উপর দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল।

—তোমার অধিকারে আমি ? কোনদিন না। কথার সঙ্গে সঙ্গে শীলা নৌকা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ক্ষণকালের জন্ত শ্রীমন্তের বাহ্যজ্ঞান বুঝি লোপ পেয়েছিল। সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলো, শীলা তার দেহ জলে ভাসিয়ে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে। হাঁপিয়ে পড়ছে সে। থেকে থেকে ডুবে যাচ্ছে। আবার উঠছে। আবার ডুবছে।

ক্ষিপ্রহাতে দাঁড় তুলে শ্রীমন্ত শীলার দিকে এগিয়ে গেল। ক্ষতস্থান থেকে অবিরল ধারায় রক্ত ঝরতে লাগল।

নৌকা শীলার পাশে নিয়ে গিয়ে কাতর স্বরে শ্রীমন্ত বলল—ভগবানের দোহাই শীলা, নৌকায় ওঠো। আমার মাথার ঠিক ছিল না। তাই তোমায় অপমান করতে চেয়েছিলাম। তার জন্তে আমায় ক্ষমা কোরো না। শুধু নৌকায় উঠে নিজের জীবনটাকে বাঁচাও। এখান থেকে ঘাট অনেক দূর। অমন করে পারবে না। উঠে এসো।

শীলা একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল। তারপর নৌকা ধরল।

• • • •

দুজনে আবার নীরবে পথ অতিক্রম করতে লাগল। শীলা নৌকায় ওঠবার সময় নৌকা একপাশে হেলে গিয়ে শ্রীমন্তের চাদরখানা জলে পড়ে ভেসে গিয়েছিল। শীলা তা লক্ষ্য করেছিল।

পা মুহূর্তে মুহূর্তে হঠাৎ নৌকার পাটাতনের এক জায়গায় নজর পড়তেই শীলা চমকে উঠল।

কাঁচা রক্তে সেখানটা লাল। পরক্ষণেই চোখ তুলে শ্রীমন্তের হাতের পানে তাকিয়ে সে মনে মনে শিউরে উঠল। তার বুকের মধ্যে বেদনা জাগল, অনুশোচনায় সারা অন্তর আলোড়িত হল।

নিজের যে রেশমি ওড়নাটা দিয়ে সে গা মুছছিল, সেটি শ্রীমন্তের দিকে বাড়িয়ে ধরে শীলা বললে—এখানা নাও। হাতটা বাঁধ।

শ্রীমন্ত ঘাড় নেড়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে নীরবে নৌকা চালাতে লাগল।

কিছুক্ষণ কাটল শুধুতার মধ্যে। তারপর শীলা উঠে গিয়ে শ্রীমন্তের পাশে বসল, বোধ করি বারেকের জন্য দ্বিধা করল, তারপর শ্রীমন্তের ক্ষিপ্ত হাতখানি নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে ওড়নাটি পাট করে তার হাত বেঁধে দিতে লাগল। দু'একবার ক্ষীণ প্রতিবাদের চেষ্টা করে শ্রীমন্ত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

নৌকা ততক্ষণে ঘাটের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে।

• • • •

শ্রীমন্ত নিজের ঘরে বসেছিল। রাত নেমেছে। আকাশে তারার মালা। সমুদ্রের দিক থেকে ভিজা বাতাস আসছে।

গভীর আলোকে শ্রীমন্ত যেন নিস্তেজ নির্জীব। শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের পানে চোখ মেলে সে দুপুরের ঘটনার কথা ভাবছিল।

শীলা ঠিকই বলেছে। সে একটা জানোয়ার। তার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। কাল সকালেই সে শীলার ওড়না ফিরিয়ে দেবে। আর কোনদিনও শীলা তাকে তার মুখে দেখতে পাবে না। শ্রীমন্ত এখান থেকে চলে যাবে।

সহসা বাড়ীর দরজায় কার পায়ের সাড়া পেয়ে শ্রীমন্ত ফিরে চাইল। পরক্ষণেই শীলা এসে ঘরে ঢুকলো।

বিস্মিত শ্রীমন্ত নীচু স্বরে বললে—তোমার ওড়না নিতে এসেছো? কষ্ট করে আসবার দরকার ছিল না। কাল সকালেই কারুকে দিয়ে নিশ্চয় পাঠিয়ে দিতাম।

অধীর কণ্ঠে শীলা বললে—না, না, সেজন্যে নয়। বেহেদের দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে এই সব পাতা পাড়িয়ে নিয়ে এসেছি। এতে তোমার ঘা খুব তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। এই দেখ।

হাতের চুবড়ির ডালা খুলে সে কতকগুলি পাতা বার করল।

স্নিগ্ধকণ্ঠে শ্রীমন্ত বললে—এত কষ্ট স্বীকার করবার কি দরকার ছিল? আমি বেশ ভালই আছি। আর এই যে সামান্য আঘাত, এ তো আমার উচিৎ পাওনাই পেয়েছি। সে জন্যে কেন তুমি কষ্ট করে এলে!

শীলা বললে—আমার ইচ্ছা হল আমি এলাম! আমি এসেছি তোমার হাতটা কেমন আছে দেখতে আর এই পাতাগুলো তোমার হাতে লাগিয়ে দিতে। বাঁ হাত দিয়ে ভাল করে এগুলো লাগানো যাবেনা।

—ওষুধের দরকার নেই, হাত আমার এমনিই ভাল আছে।

—কই দেখি! ও মাগো! বলছ, ওষুধের দরকার নেই, দেখ তো কীরকম ফুলে উঠেছে!

—বেশী কিছু নয়। দুদিনেই সেরে যাবে।

শ্রীমন্তের কথায় কর্ণপাত না করে শীলা ক্ষিপ্রচরণে একটা পাত্রে জল ভরে নিয়ে এলো।

তারপর শ্রীমন্তকে বিছানার উপর বসিয়ে নিজে সামনে একটা চৌকিতে বসে পরম যত্নে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে লাগল। শ্রীমন্ত শান্ত বালকের মত চোখ বুজে বসে রইল।

হাতবাঁধা হবার পর একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীমন্ত বললে—তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ। আমায় তুমি আর একটি দয়া কর।

—কি বল?

—আমায় তুমি ক্ষমা কর! দুপুরে আমি যা বলেছি, যা করেছি, দয়া করে ভুলে যাও, মনে রেখোনা। কেমন করে কী যে হোয়ে গেল, তা আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু তোমার যে কোন দোষ নেই, তা বেশ বুঝতে পারছি। যাইহোক ভবিষ্যতে তুমি আর কোনদিন আমার মুখ থেকে বিরক্তিকর কোন কথা শুনতে পাবেনা, এ আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি। এবারের মতো আমায় তুমি ক্ষমা কর।

শ্রীমন্তের কথা শুনতে শুনতে শৈলা অস্থির হোয়ে উঠছিল। তার কথা শেষ হোতেই ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল—কেন তুমি অত করে বলছ, দোষ তো আমারই। তোমার সঙ্গে অমন করে ব্যবহার না করলে তো কিছুই ঘটত না। তারপর তোমায় অমন করে—

শ্রীমন্ত তাকে বাধা দিয়ে বললে—নিজেকে বাঁচাবার জন্যে যা করেছিলে, তা ঠিকই করেছিলে। আমার পশুত্বকে বিনাশ করতে ঠিক অতখানিই প্রয়োজন ছিল। ক্ষমা চাইবার কথা মুখেও এনোনা। তুমি আমায় যে উপকার করলে ধন্যবাদ দিয়ে তার কণ পরিশোধ করা যাবেনা, সুতরাং সে চেষ্টা করবনা। এই নাও তোমার গহনা!

গহনাটি হাতে নিয়ে সেটি শ্রীমন্তের বিছানার উপর রেখে শৈলা তার কাপড়ের ভিতর থেকে একটি ছোট সুন্দর রূপার ফুলদানি বার করে বললে—আমার দোষে তোমার চাদরখানা গেছে। তার দাম তো আমি দিতে পারবো না। তার বদলে এইটা তুমি নাও। বিক্রি ক'রে—

তারপর কথা শেষ হলনা, শ্রীমন্ত বলে উঠল—না, না ও আমি কিছুতেই নিতে পারবো না।

—কেন নিতে পারবেনা? আমি তো তোমায় উপহার দিচ্ছিনা। আমি তোমার যে ক্ষতি করেছি তারই পূরণ স্বরূপ—

—এ কী বলছ শৈলা!

শ্রীমন্তের বিহ্বল বেদনাতুর মুখের দিকে চেয়ে শৈলা আর কিছু বলতে পারলো না। নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

করুণ কোমল কণ্ঠে শ্রীমন্ত বলতে লাগল তুমি এবার বাড়ী যাও শৈলা! তুমি আজ আমার জন্যে যা করেছো, তা আমি চিরজীবন স্মরণ করব। কিন্তু তোমার জিনিষ আমি নিতে পারবো না। রাত হোয়েছে, এখন তুমি বাড়ী যাও, আর কোনদিন শ্রীমন্ত তোমাকে বিরক্ত করতে তোমার সামনে দাঁড়াবে না? এ কী! শৈলা তুমি, কাঁদছ?

শ্রীমন্তের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শৈলা দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললো। তার পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়ে আর্তকণ্ঠে বললে—আমি যে আর সইতে পারছি না! ওগো! কেন তুমি আমায় এমন ভাল করে বলছ! কেন আমায় চলে যেতে বলছ? আমি তোমার প্রতি অবিচার করেছি, অন্যায় করেছি, তোমায় যন্ত্রণা দিয়েছি। তুমি আমায় শাস্তি দাও, আমায় পীড়ন কর, আমায় দলিত মথিত করে উপযুক্ত দণ্ড দাও, আর, আর ··

বলতে বলতে শৈলার কণ্ঠস্বর আবেগে আবেশে জড়িয়ে এলো—আর যদি তুমি আমায় এখনো ভালবাস তাহলে আমায় নাও, আমার ওপর তোমার অধিকার বিস্তার কর। শুধু এমন করে আমায় চলে যেতে বোলো না, আমায় দূর করে দিওনা!

অশ্রুর আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হল।

মুহূর্ত কয়েক বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল শ্রীমন্ত। তারপর শৈলার দুহাত ধরে তাকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে বললে—যদি তোমায় এখনো ভালবাসি? তুমি কি ভেবেছো শৈলা, আমার এই সামান্য ক্ষতের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের সমস্তটুকু রক্তই বেরিয়ে গেছে? কিন্তু শৈলা, এ কি সত্যি?

অশ্রুসিক্ত চোখদুটি শ্রীমন্তের মুখের উপর ফেলে শৈলা বললে—সত্যি! আমি তোমায় সেই প্রথম দেখা থেকেই ভালবাসি! তোমাকে দেখবা মাত্রই আমার মন দুর্বল হোয়ে পড়ত, রাঙা হোয়ে উঠতো, মনে হোত নিজেকে বুঝি আর ধরে রাখতে পারবো না। তাই তো সে ভাব দমন করবার জন্যে তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হতাম, তোমায় অবহেলা দেখাতাম, তোমায় কটুকথা বলতাম। কিন্তু এখন থেকে আর কখনো সে-শৈলাকে তুমি খুঁজে পাবেনা। এখন থেকে তুমি আমার—

কথা অসমাপ্ত রেখে শৈলা নিজের পেলব বাহুর বাঁধনে শ্রীমন্তের গলা জড়িয়ে মুখখানি তুলে ধরল। আবেশে তার দুইচোখ বুজেএলো।

শ্রীমন্তের চোখের সামনে থেকে নিমেষে বিশ্বসংসার লুপ্ত হোয়ে গেল। বহুদিনের আকাংক্ষিতা প্রিয়াকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার ক্ষুব্ধ অধরে সে নিজের আতপ্ত ওষ্ঠাধর স্থাপন করল।

সেই দীর্ঘ বিলম্বিত চুম্বনের মধ্যে দিয়ে দুটি প্রাণের স্পন্দন যেন এক হোয়ে মিশে গেল।

---

* দক্ষিণভারতের একটি প্রাচীন গাথা অবলম্বনে।

॥ একটি গল্প এবং অনুশীলা ॥

সমর বসু

একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে টিফিন খাচ্ছিল পরাশর। সামনের আসনে ব'সে অনুশীলা নোয়েটার বুনছিল।

গল্পটা চোখে পড়তেই পরাশর ন'ড়ে চ'ড়ে ঠিক ও'রে বসল। গল্পের নাম, লেখকের নাম, এবং তৎসংশ্লিষ্ট ছবিটির ওপর একবার ভালভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে, পরাশর পড়তে সুরু করল।

বুনতে বুনতে মাঝে মাঝে অনুশীলা পরাশরের দিকে তাকাচ্ছিল। পরাশরের কিন্তু সেদিকে কোনও লক্ষ্য ছিল না। গল্পটি পড়তে পড়তে সে এমন নিবিষ্ট হ'য়ে প'ড়েছিল, যে তরকারি মাখা রুটির টুকরোটা মুখে তোলবার অবকাশও পায়নি। হাতের মধ্যেই সেটা ধরা ছিল

অনুশীলা তাই দেখে মৃদুহেসে জিজ্ঞেস করল,—ওটা কি পত্রিকা পরাশরবাবু, কি পড়ছেন আপনি?

পরাশর শুনতে পেল না।

অনুশীলা জানে পরাশর একটু সিরিয়স্ টাইপের ছেলে। চাঙ্কা লেখা ভালবাসেনা। বিশেষ ক'রে পত্র-পত্রিকার গল্প, সে তো পড়তেই চায় না। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দর্শন বিষয়ক গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ পাঠেই সে আনন্দ পায়। সহকর্মীমহলে এর জন্যে পরাশরের একটা সুনাম, কিংবা দুর্নাম আছে।

অনুশীলা লক্ষ্য করেছিল—পত্রিকাটা নতুন। পরাশরের হাতে এ-পত্রিকা সে এর আগে কোনও দিনই দেখেনি। তাই ভেবেছিল,—একটু পরেই পত্রিকাটা সে চেয়ে নেবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কথা বলতে সাহস হ'লনা। শুধু জিজ্ঞেস করল—ওটা কি পড়ছেন আপনি।

পরাশর কোনও উত্তর না দেওয়ায় অনুশীলার জানবার আগ্রহ বাড়ল। মনে মনে বুনোনের ঘরগুলো গুণে নিয়ে কাঁটা দুটো একত্র ক'রে অনুশীলা জোর গলায় বলল,—টিফিনটা শেষ ক'রে নিন, তারপর না হয় পড়বেন।

তবুও পরাশর কিছু বলল না। কিন্তু খাবারটা মুখে তুলে নিল। তারপর টিফিন খেতে খেতেই পড়তে লাগল।—অর্থাৎ অনুশীলার কথাগুলো তার কানে গিয়েছে।

ওকে বিরক্ত না ক'রে অনুশীলা এবার নিজের কাজে মন দিল।

পড়া শেষ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরাশর। নিজের মনেই বলল,—বাঃ, বেশ চমৎকার হ'য়েছে।

পত্রিকাটা মুড়ে টেবিলের ওপর রেখে টিফিনের কৌটোটা নিয়ে জল-ঘরে গেল। হাত মুখ ধুয়ে এসে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল,—জানেন মিসেস মিত্র···

অনুশীলা ঘাড় হেঁট ক'রে উল বুনতে লাগল। কিছুই যেন শুনতে পায়নি।

অনুশীলাকে একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে পরাশর বলল,—এই পত্রিকাটা রাখুন আপনার কাছে, আমি একটু ঘুরে আসছি। ততক্ষণে আপনি উল বোনাটাও সেরে ফেলুন। অনেক কথা আছে।

—কথাটা শেষ ক'রেই যান। এরপর আর গল্প করার সময় পাবোনা। অনেক কাজ জমে রয়েছে।

—তাহ'লে একটু অপেক্ষা করুন। লিপাংটেটা খেয়েই আসছি।

পরাশর চলে গেল।

অনুশীলা কাঁটা শুদ্ধ পনসের কোলাটা ব্যাগের মধ্যে রেখে পত্রিকাটা টেনে নিয়ে ছবি দেখতে লাগল। হঠাৎ নজর পড়ল একটি গল্পের ওপর। নাম—'বিপাশার কামনা।' লেখক শ্রীআশিস সেন।

এই গল্পটাই কি পরাশর এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিল। গল্প তো পরাশর পড়ে না। লেখকও তেমন নামকরা নয়, তাহ'লে! অনুশীলা আবার পাতা ওল্টাতে লাগল। পরাশরের পাঠোপযোগী কোনও নিবন্ধের সন্ধান না পেয়ে, অনুশীলা ধ'রে নিল। পরাশর নিশ্চয়ই ঐ গল্পটাই পড়ছিল।—"বিপাশার কামনা।"

গল্পটি বার ক'রে অনুশীলাও পড়তে সুরু ক'রে দিল। পড়তে পড়তে পরাশরের মত অনুশীলাও কখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

পরাশর এসে অনুশীলার ঐ অবস্থা দেখে বুঝতে পারল গল্পটাই পড়ছে অনুশীলা। তাই অমন নিবিষ্ট হ'য়ে প'ড়েছে।

পাঠকের মনকে অভিভূত করবার মত লিপি-দক্ষতা এত তাড়াতাড়ি কি করে অর্জন করল আশিস। পরাশর ভাবতে লাগল,—সেদিক থেকে লেখাটা কিন্তু সার্থক হয়েছে। বিষয় নির্বাচনেও যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছে আশিস। সমস্যাটা অতি সাম্প্রতিককালের হ'লেও গল্পটির মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে নারী মনের একটি চিরন্তন চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছে!

কিন্তু এত কথা আশিস জানল কি করে! এইতো সেদিন বি. এ. পাশ করল। সামনের বছরে বোধহয় এম. এ দেবে। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ছেলেটা অফিসে ঘুরে বেড়ায় নাকি। নইলে এমন উপকরণ সে সংগ্রহ করল কি ক'রে।

ভাবতে ভাবতে পরাশর একবার অনুশীলার দিকে তাকাল। তেমনি নিবিষ্ট মনেই অনুশীলা গল্পটা পড়ছে। শেষ না করে অনুশীলা কথা বলবে না। অর্থাৎ বলতে পারবে না।

পরাশর র‍্যাক থেকে একটা ফাইল টেনে নিল। ফাইলের ভেতর থেকে এক তাড়া চিঠিপত্তর বার করে দেখতে লাগল। কিন্তু কাজে মন বসল না। গল্পটা সম্বন্ধে অনুশীলার সঙ্গে কিছু আলোচনা না করতে পারলে স্বস্তি পাওয়া যাবে না। অতএব কাজ চাপা দিয়ে পরাশর অপেক্ষা করতে লাগল।

পত্র-পত্রিকায় কোনও 'গল্প' সম্বন্ধে না হ'লেও, অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়েই অনুশীলার সঙ্গে আলোচনা হয়। শুধু আজ বলে নয়, অনেকদিন আগে থেকেই। অনুশীলার তখনও বিয়ে হয়নি। তখনও মুখার্জি। অসিতের সঙ্গে বিয়ে হবার পর হ'ল—মিসেস মিত্র।

অসিতও এই অফিসেই কাজ করে। ওরা সবাই এক সেক্শনেই কাজ করত। অসিত পরাশর—অনুশীলা এবং আরও অনেক ছেলেমেয়ে। বিয়ের পর অসিত ইচ্ছে ক'রেই অন্য সেক্শনে ট্রান্সফার হয়ে গেল।

বিয়ের আগে ওদের ভালবাসা হয়েছিল। এবং পরাশরই সেটা প্রথম আবিষ্কার করে। অবশ্য সে কথা সে কাউকে জানায়নি। ওদের ভালবাসার ক্রমপরিণতি নিতান্ত গোপনেই পরাশর লক্ষ্য করত। প্রথম যেদিন বুঝতে পারল,—সেদিনকার কথা আজও মনে আছে পরাশরের। কি একটা কারণে সকাল সকাল সেদিন ছুটি হয়ে গিয়েছিল। হাতে অনেক কাজ জমে থাকায় পরাশর ঠিক ছুটির পরই বেরিয়ে যেতে পারেনি। একমনে কাজ করছিল। অনুশীলাও কাজ নিয়ে বসেছিল।

অসিত বোধহয় অনুশীলাকে সঙ্গে নিয়ে এই হঠাৎ পাওয়া ছুটিটাকে কোথাও গিয়ে উপভোগ করতে চেয়েছিল। তাই ঘড়ির কাঁটার ওপর চোখ রেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। অনুশীলার পাশে এসে চাপা গলায় বলল—অনু, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, তাড়াতাড়ি উঠে পড়।

পরাশরের চায়ের কলম হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল। অসিতের ছোট্ট সম্বোধনটা মুহূর্তের জন্যে পরাশরকে কেমন যেন অভিভূত ক'রে ফেলল। পাছে ওরা ধরা প'ড়ে গিয়ে লজ্জা পায়, তাই কাটল থেকে মুখ তুলল না পরাশর। যদিও বুঝতে পারল,—অসিত চলে গেছে, অনুশীলাও যাবার জন্যে তৈরি হ'চ্ছে।

এরপর আরও একদিন পরাশর শুনল,—অসিত এসে অনুশীলাকে ডাকছে—নীলা, আজ পাঁচটার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

কখনও 'অনু', কখনও 'নীলা'। কিন্তু একবারও অনুশীলা নয়। পরাশর জানে—যত নাম যখন আকারে ছোট হয়, তখন তাতে গভীর প্রীতির কোমল স্পর্শ এমন নিবিড় ভাবে জড়ানো থাকে যে, সমস্ত মনটাই আনন্দে ভরে ওঠে। নামটা তখন আর 'নাম' থাকে না। আনন্দ ঘন অনুভবে পরিণত হয়। শুধু যে শোনে তার কাছে নয়, যে ডাকে তার কাছেও। ঐ ছোট্ট ডাকটুকুতেই যে ডাকে, তার কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে আসে, আর যে শোনে, ঐ দু'টি শব্দই তার কানে আশ্চর্য সুরের ঝঙ্কার তোলে।

পরাশর বুঝতে পেরেছিল ওরা পরস্পরকে ভালবেসেছে।

তারপর একদিন ওদের বিয়ে হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে রেজিষ্ট্রী অফিসে উপস্থিত না থাকলেও, একটা প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে পরাশর নিমন্ত্রিত হয়েছিল।

ওদের বিয়েটাকে পরাশর কিন্তু সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারেনি। এ-কথা অনুশীলাকে না বলতে পারলেও অসিতকে সে বলেছিল। পরাশরের আপত্তির কারণটা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তাই ওর কথা অসিত মানে নেয়নি।

অন্য অনেক সহকর্মীদের মত পরাশর একথা বলেনি, যে কায়স্থ ব্রাহ্মণের বিয়ে হওয়াটা সমাজে চল্ হ'লেও তার ফল নিশ্চয়ই শুভ হয় না। কিংবা প্রায় সমবয়সী ছেলেমেয়েদের বিয়ে হওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। পরাশর বলেছিল—যদি চাকুরে মেয়েকেই বিয়ে করতে চাও, তাহলে অন্য অফিসে সন্ধান কর; নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। একই অফিসে একসঙ্গে বসে সারাদিন কাজ করবে। একই ঘরে সারারাত কাটাবে; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব সময়ই যদি তোমরা অত্যন্ত কাছাকাছি থাকো, তাহলে দুদিনেই যে তোমরা পরস্পরের কাছে ফুরিয়ে যাবে। কোনও চার্ম থাকবে না। একেবারে আটপৌরে হয়ে যাবে। সন্ধে বেলায় যখন তুমি বাড়ি ফিরবে, তখন চোখে তোমার কোনও তৃষ্ণাই থাকবে না, মনের ক্লান্তিও দুঃসহ হ'য়ে উঠবে। তাই বলছিলাম একটু ভেবে দেখো। অর্থাৎ Look before you leap.

অসিত হো: হো: ক'রে হেসে উঠে বলেছিল,—এতদিনে বুঝলাম, তোমার সবলে দার্শনিক বলে কেন!

পরাশর আর কোনও কথা বলেনি। ওদের বিবাহ সম্বন্ধে এবং বিবাহের পর ওদের দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে পরাশর আশ্চর্য ভাবে নীরব থেকেছে। অসিত কিংবা অনুশীলার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব তাতে কিন্তু এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং অনুশীলার কাছে সে যেন আরও আপন হয়ে গিয়েছে। এবং অসিতও তাকে আর নেহাৎ বন্ধু ব'লে মনে করেনা, শুভাকাঙ্খী পরমাত্মীয় ব'লে শ্রদ্ধা করে।

প্রায় বছর চারেক হ'ল ওদের বিয়ে হয়েছে। একটি ছেলেও হ'য়েছে। এতক্ষণ তার অন্নেই সোয়েটার বুনছিল অনুশীলা। গত মাসেই তার অন্নপ্রাশন হ'য়ে গেল। অফিসের বন্ধু-বান্ধবীরা অনেকেই গিয়েছিল নিমন্ত্রিত হয়ে।

বিয়ের প্রীতিভোজের মত অন্নপ্রাশনের শুভানুষ্ঠানটা আরকেডিয়া হোটেলে না হয়ে হয়েছিল— সি. আই. টি বিল্ডিং-এর দু-কামরার একটি সু-সজ্জিত ফ্ল্যাটে। পরাশর সে সময় অসুস্থ ছিল। তাই সে-উৎসবে যোগ দিতে পারেনি। এবং সেই জন্যেই কয়েকদিন আগে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে পরাশর ওদের বাসায় গিয়েছিল।

পরাশর শুনেছিল,—বিয়ের পর মা-বাবার সংসার ছেড়ে অসিত নতুন সংসার পেতেছে। শুনেছিল— তাতে মা-বাবার খুব অসুবিধে হয়েছে, কিন্তু নিজেদের সুবিধের জন্যে, সে-অসুবিধের কথা ওরা ভেবে দেখেনি। কেননা, সেই সময়েই এই দু-কামরার ফ্ল্যাটটা পেয়ে গিয়েছিল অসিত।

তারপর একটু একটু ক'রে গভীর আনন্দে এবং পরম উৎসাহের ওরা দু'জনে নতুন সংসার সাজিয়ে তুলেছে। নতুন অতিথি আসার পর সে উৎসাহ আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। এতদিন শুধু ওরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল, এখন এই শিশুটিকে পেয়ে ওদের জীবন, পরস্পরের কাছে আরও অর্থপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। ঐ শিশুটিকে ঘিরেই কত স্বপ্ন দেখে ওরা। মনে মনে কত বাসনার জাল বোনে। অন্তরঙ্গ জীবনের সন্ধান পেয়ে ওরা দু'জনেই যেন কত বদলে গেছে।

ওদের এই পরিবর্ত্তন নীরবে লক্ষ্য ক'রেছে পরাশর। কোনও মন্তব্য করেনি।

নিমন্ত্রিত হ'য়ে সেদিন পরাশর যখন ওদের ফ্ল্যাটে এল, তখন বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে কিছুক্ষণ অনুশীলার দিকে তাকিয়ে রইল। অতি সাধারণ বেশ-বাস অনুশীলার। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও,— মুখে চোখে, ঠোঁটে কিংবা ভ্রূযুগলে। কোলে একটি ফুটফুটে সুন্দর শিশু নিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছ'য়েছে। শিশুটি মায়ের গলা জড়িয়ে,—কানের দুলটা নিয়ে খেলা করছে, আর অনুশীলা হাসতে হাসতেতাকে আদর করছে। পরাশর যে এসেছে, প্রথমে তা জানতেই পারেনি।

এ-এক অন্য অনুশীলা পরাশরের সঙ্গে এর কোনও পরিচয়ও নেই। পরাশরের ভাবুক মনও কোনওদিন এ-ছবি কল্পনাতেও আঁকতে পারেনি। পরাশর বিস্মিত হ'ল, মুগ্ধ হল।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই খুশী-খুশী মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল।

দু'কামরার ফ্ল্যাট। একটা ঘর বেশ বড়। আর একটা মাঝারি ধরণের। দক্ষিণ দিকে একফালি বারান্দা। সবই সুন্দর, সাজানো-গোছানো। পরাশর ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল।

ছোট ঘরটাই ওদের ড্রয়িংরুম। শীল আর বেতের তৈরী সোফাসেট সাজানো রয়েছে ঠিক মাঝখানে। পূবদিকের দেওয়ালের গায়ে একটা বুককেস্। কাচের সার্সির ভেতর দিয়ে ভেতরের বইগুলো সব দেখা যাচ্ছে। একটা পেডেষ্ট্যাল ফ্যান। ওপরের দেওয়ালে লাগানো গুটি কয়েক ছবি। রাজপুত এবং মোগল আমলের কাহিনী অবলম্বনে আঁকা ছবিগুলো দামী ফ্রেমে বাঁধানো। আর এক কোণে ভিন কোণা ছোট্ট টেবিলের ওপর মস্তবড় জয়পুরী ফুলদানী। তাতে প্লাষ্টিকের পুষ্পস্তবক।

বড় ঘরটায় পাশাপাশি দুটো খাট। আগাগোড়া মণিপুরী কাজ করা রঙীন চাদরে মোড়া। ওপাশে একটা স্টীলের আলমারি। তার পাশে ছোট্ট বেতের ওপর একটা রেডিওগ্রাম।

রান্নাঘর সংলগ্ন বারান্দাটিকে পর্দা দিয়ে ঘিরে খাবার ঘর করা হয়েছে। পাশেই দেওয়ালের গায়ে একটা ফ্রীজ।

দক্ষিণের বারান্দায় টবে নানা রকমের মরশুমী ফুলের গাছ। রেলিঙের গায়ে ম্যাটিকের লতাপাতা।

পরিচ্ছন্ন পরিশীলিত রুচির পরিচয় ছড়িয়ে র'য়েছে সর্বত্রই। সব মিলিয়ে এমন একটা মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে মন আনন্দে ভরে ওঠে, শরীরের ক্লান্তিও দূর হয়।

কিন্তু পরাশরের তা' হ'ল না। অব্যক্ত অন্তর্বেদনায় কেমন যেন সে মুষড়ে পড়ল। এ বেদনা ঠিক ঈর্ষাপ্রসূত নয়। এ আশাভঙ্গজনিত বেদনা। অন্যান্য অনেক দম্পতীর মত অসিত-অনুশীলাও যে বাইরের ঐশ্বর্যকে এত মূল্য দেবে, এ আশঙ্কা পরাশর কোনও দিনই করেনি। পরাশর জানে, এইসব উপচারগুলো কিছু সুখ, কিছু আরাম দেয় সত্যি, কিন্তু তার জন্যে অনেক আনন্দঘন অবসরকে নির্বাসন দিতে হয়। এরাও তাই দিয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও দেবে। জীবনকে যন্ত্রে পরিণত করবার ভ্রান্তিকর প্রবণতা এদেরও পেয়ে বসল কেন? অন্তত জীবনে কি এরা সুখী হ'তে পারত না! —এইখানেই পরাশরের বেদনা। এইখানেই তার যত ক্ষোভ!

অসিত এতক্ষণ বাইরে ছিল। কিকে সঙ্গে নিয়ে বোধহয় বাজারে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকেই পরাশরকে দেখে আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল,—এতদিনে আমার সব সাধ পূর্ণ হ'ল।

পরাশর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

অসিত বলল,—আমি কতদিন ভেবেছি আমার ফ্লাটে তোমায় নিয়ে আসবো, কিন্তু কেন জানিনা বলতে পারিনি। কেমন যেন সংকোচ হ'ত। ভাবতাম হয়তো তুমি আসবে না।

ওটা তোমার মিথ্যে সংশয়। আসলে তোমার সংকোচ ছিল অন্য কারণে।

অসিত ঠিক বুঝতে পারল না পরাশর কি বলতে চায়। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

অনুশীলাই বলল,—অন্য আবার কি কারণে ওঁর সংকোচ থাকতে যাবে।

ম্লান হেসে পরাশর বলল,—আপনাদের এই সংসারটি একদিনেই সুখে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। অনেক সময় লেগেছে। সুতরাং ততদিন অসিতকে অপেক্ষাই করতে হ'ত।

হাসতে হাসতে অনুশীলা বলল,—তা' যা ব'লেছেন।—ব'লেই ছেলেটাকে পরাশরের কোলে বসিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

অসিত জিজ্ঞেস করল,—কার মত হ'য়েছে বলতো।

শিশুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল পরাশর। তারপর ওকে আদর করতে করতে বলল,—এর মায়ের মত।

—ঠিক ব'লেছ,—অসিত উজ্জ্বসিত হয়ে বলল,—আমিও তাই বলি। ওর মা কিন্তু তা' বিশ্বাস করতে চায় না। অফিসের আর সবাই ত সেদিন ব'লে গেল,—ওর মুখ-চোখ নাকি আমার মত। মা'র কাছ থেকে শুধু গায়ের রঙটাই পেয়েছে।

—তাই হবে বোধ হয়।—পরাশর উদাস ভাবে বলল।

ঠিক সেই সময় দরজার পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনুশীলা ওদের ডাকল,—আসুন! খাবার দেওয়া হয়েছে।

—এত তাড়াতাড়ি,—বলতে বলতে পরাশরের কোল থেকে শিশুকে নিজের কোলে নিল অসিত।

খেতে খেতে অসিত জিজ্ঞেস করল,—ঘর-দোর কিরকম দেখলে।

পরাশর কিছুমাত্র ইতস্তত: না ক'রে বলল,—একটু বাড়াবাড়ি হ'য়েছে ব'লে আমার মনে হ'ল। অবশ্য প্রয়োজন আর বিলাসের সীমারেখা যে কোথায় তা' নিশ্চিত ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় না, তবুও আমি বলব—একটু বাড়াবাড়ি হ'য়েছে।

অসিত কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অনুশীলা বলল,—বেশির ভাগ জিনিসই হায়ার-পারচেজে' কেনা। মাসে মাসে 'পেমেন্ট' করি। গায়ে লাগে না। এক সঙ্গে তো এত জিনিস কেনা যেত না। আপনি তো আগে থেকেই সব জানতে পেরেছেন,—নইলে কি ক'রে বললেন,—সংসারটাকে সাজাতে অনেক সময় লেগেছে। যাক্, এখন আর কিছু কিনছি না। ছেলেটাকে তো মানুষ করতে হবে।

—হাঁ! ওটা কিন্তু টাকার বিনিময়ে হবে না। কেননা, কাজটা শুধু কঠিন নয়, বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ।

—কোন কাজটা!—অসিত জিজ্ঞেস করল।

—ছেলে মানুষ করা—। —আগ্রহ ভ'রে বলল পরাশর,—। তারপর জিজ্ঞেস করল,—সারাদিন ও কা'র কাছে থাকে?

—ঝিয়ের কাছে! ভারী গলায় অনুশীলা জবাব দিল।

অসিত তাড়াতাড়ি বলল,—ভারী বিশ্বাসী! আর খুব কাজের। এই রান্না-বান্না সবই তো সে ক'রেছে। ওর বাপের বাড়ি থেকে এসেছে। ছেলেটা ওকে পেলে আর কারোর কাছে থাকতে চায় না।

পরাশর আর কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ ক'রে রইল।

তারপর হঠাৎ এক সময় পরাশর বলল,—সুন্দর সুন্দর দামী দামী আসবাব, টবে সাজানো বহুতরী ফুলের বাহার,—তোমার এই সাজানো-গোছানো বাসা ভবনের কোনও কিছুই আমাকে মুগ্ধ করেনি। তবে একটা আশ্চর্য ছবি আমার সমস্ত মনটাকে বিস্ময়ে আনন্দে গভীরভাবে পূর্ণ ক'রে দিয়েছে।

অসিত, অনুশীলা - দুজনেই উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল।

আনন্দোজ্জ্বল মুখে পরাশর বলল,—তোমাদের ফ্ল্যাটে পদার্পণ ক'রেই দেখলাম—শ্রীমতী মিত্র শিশু পুত্রকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন। শিশুটি মায়ের গলা জড়িয়ে আপনমনে কানের দুল নিয়ে খেলা করছে। আর শিশু জননী হাসতে হাসতে তাকে আদর করছেন। শিশুরা মাতৃক্রোড়ে শোভা পায়, এ কথা যেমন সত্যি, শিশুকে কোলে নিলে মায়ের রূপও সুন্দরতর হয়, এ কথাও ঠিক তেমনি সত্যি। ঐ অপূর্ব দৃশ্য আমি কোনো দিনই ভুলবো না।

শুনতে শুনতে অনুশীলার সমস্ত মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

তা' লক্ষ্য ক'রে পরাশর বলল,—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজকের এই আধুনিকযুগের মেয়েদেরও ঐ একটাই কামনা। কোথাও সে কামনা নিশ্চেতন মনের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, বাইরের ভোগ-বিলাসের চাপে প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না। কোথাও বা সে-কামনা দুর্দম হ'য়ে উঠে অবৈধ পথের সন্ধানে ফেরে। —সন্তান যতদিন না কোলে আসে, মেয়েরা কি চায় তা' নিজেরাই বুঝতে পারে না।

—একটু থেমে পরাশর আবার বলতে লাগল,—ছেলেকে বুকে চেপে ধ'রে শ্রীমতী মিত্র আমাকে কি যেন বলতে গেলেন,—কিন্তু ছেলেটি খেলার ছলে হাত দিয়ে মায়ের মুখটা চেপে ধরল। মা ধমক দিয়ে বললেন,—আঃ, বিরক্ত ক'রনা, কথা বলতে দাও। —আমি আশ্চর্য হ'য়ে শুনলাম,—মা তার শিশুকে শাসন করছে। কোথাও শিশুকে ধমক দিচ্ছে না। —আমি অভিভূত হ'য়ে গেলাম। বিশ্বাস কর অসিত, আমি অভিভূত হ'য়ে গেলাম।

অসিত আর অনুশীলা অবাক বিস্ময়ে পরাশরের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রইল।

পরাশর হাসতে হাসতে বলল,—অনুষ্ঠানের দিনে এলে, এইসব ছবি আমি দেখতেই পেতাম না। ভীড়ের মধ্যে কোথায় সব হারিয়ে যেত। ভাগ্যি সেদিন আমার অসুখ করেছিল।

—মাঝে মাঝে তুমি যদি আস, আমরা খুব খুশী হব। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কথাগুলো বলল অসিত।

—সত্যি আসবেন ? —অনুশীলা জিজ্ঞেস করল।

—আসবো !

কিন্তু ওদের ফ্লাটে আর যাওয়া হয়নি পরাশরের। সামনের সপ্তাহে একদিন যাবার কথা হ'য়ে আছে। টিফিনের আগেই তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল অনুশীলার সঙ্গে। তারপরই অনুশীলা উল বুনতে বসল।

গল্পটা শেষ করেই অনুশীলা বিরক্ত হয়ে বলল,—শেষটা একদম বাজে হয়েছে। বড্ড কাঁচা লেখা।

—কোন লেখাটার কথা বলছেন।—পরাশর জিজ্ঞেস করল।

—"বিপাশার কামনা" ওটা আবার একটা গল্প হয়েছে নাকি !

—কেন ! আমার তো বেশ ভাল লাগল।—অবশ্য গল্প আমি বেশি পড়িনা। অফিস আসবার সময় আসিস পত্রিকাটা আমার হাতে দিয়ে বলল,—আমার একটা গল্প আছে এতে। গল্পটা কেমন লাগল বলবেন। আমরা এক মেসেই থাকি।

—ও ; সেই জন্যেই আপনার ভাল লেগেছে। আশিসবাবুর বয়স কত ! নিশ্চয়ই ছেলেমানুষ ! বিয়ে থা করেনি।

—কি করে বুঝলেন ?

—লেখা পড়েই বোঝা যায়।

—তাই নাকি !—আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হয়েছিল। এত অল্প বয়সে, সংসার অভিজ্ঞ হয়েও এত কথা ও জানল কি ক'রে। আমার ধারণা লেখক যারা হয়, তাদের একটা সহজাত বোধশক্তি থাকে। ইংরাজীতে থাকে বলে Intuition. তার সাহায্যে অনেক কিছু তারা দেখতে পায়, উপলব্ধি করতে পারে। অন্ততঃ আশিসের লেখা পড়ে তাই আমার মনে হয়েছে।—কোনখানটা খারাপ লাগল আপনার।

—শেষটা। বলেই অনুশীলা গল্পটা বার করে তার শেষাংশটুকু পড়তে সুরু করেছিল।

.....দরজায় হাত দিতেই দরজাটা খুলে গেল। চৌকাঠ পেরিয়েই চিৎকার করে ডাকল বিপাশা—কেষ্টর মা, ও কেষ্টর মা ! ছেলেটা অমন করে কাঁদছে কেন ? সেই মোড় থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি। কি করছ তুমি, কানের মাথা খেয়ে বসে আছ নাকি !

ছেলেকে কোলাতে কোলাতে কেষ্টর মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভয়ে ভয়ে বলল,—খোকার যে ভীষণ জ্বর এসেছে দিদিমণি। সেই থেকে কাঁদছে। কিছুতেই ভোলাতে পারছিনা।

ছাতা, ব্যাগ কৌচের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেকে বুকে তুলে নিল বিপাশা। গায়ে হাত দিয়ে দেখল,—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাওয়া করতে লাগল।

—তোমার ডাক্তারবাবু এসেছে। বিপাশা জিজ্ঞেস করল।

কেষ্টর মা বলল,—হ্যাঁ ! কিছুক্ষণ আগে এসেছেন। এসেই ডাক্তারখানায় চলে গেলেন।

এতক্ষণে ছেলে বুঝতে পারল মা এসেছে। তাই চোখ মেলে চাইল। কাঁদতে কাঁদতে কিছুক্ষণ মায়ের আদর উপভোগ করল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

জোর পায়ে ঘরে ঢুকল বিজন। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, খোকা ঘুমিয়েছে ! কখন এলে তুমি।

—এইমাত্র !—গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল বিপাশা।

সমস্ত ঘরটা থমথম্ করতে লাগল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কেষ্টর মা চলে গেল নিজের কাজে।

আস্তিনের কাপড়টা না বদলেই কৌচের ওপর গিয়ে বসল বিপাশা। জিজ্ঞেস করল,—ডাক্তারবাবু আসবেন না।

ছেলের পাশে বসতে যাচ্ছিল বিজন। বিপাশা বলল, থাক, ওখানে আর বসতে হবেনা। এখুনি ঘুম ভেঙে যাবে। এদিকে এসে বস।

—ডাক্তারসাবুর আসতে একটু দেরি হবে। এই ট্যাবলেটটা দিয়েছেন এখুনি খাইয়ে দেবার জন্য। অবশ্য ঘুমুলে খাওয়াতে হবেনা। টিপয়ের ওপর ট্যাবলেটটা রেখে দিল বিজন।

বিপাশা কোন কথা বললনা। জানালার পর্দার দিকে চেয়ে চুপচাপ ব'সে রইল। ঘরে যে আরও একজন লোক আছে এবং সে তার পাশেই বসে আছে, এ-খেয়াল তার রইলনা।

—কি হল তোমার !—বিজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—আমি আর পারছিনা।—দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল বিপাশা। আমি ক্লান্ত, তুমি আমায় ক্ষমা কর।—বলতে বলতে কৌচের ওপর ভেঙে পড়া শরীরটাকে এলিয়ে দিল।

কেষ্টর মা চা-জলখাবার দিয়ে গেল।

বিজন বলল—ওঠ, চা খাও।

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা টেনেনিয়ে বিপাশা বলল,—এইভাবে আর বেশিদিন চালানো যাবেনা। এবার আমাকে ছুটি দাও। নইলে সব কিছুতেই বাঁচবেনা। ক'দিন আগে কিরকম ভারী অসুখ থেকে উঠল। আজ আবার জ্বরে পড়ল।—জানিনা কি হবে !

বিজন ঘুমন্ত শিশুর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

—আমি আর চাকরি করবনা।—আমায় তুমি রেহাই দাও :—ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে বলল বিপাশা।

বিজন ঘরের আসবাবগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল্।

বিপাশা বুঝতে পারল বিজন কি বলতে চায়।…বাজারে অনেক টাকা দেনা।—বিজন একা সে-সব সামলাবে কি ক'রে !

কিন্তু তবুও বিপাশা সংকল্পে স্থির হয়ে রইল। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা-টুকু নিঃশেষে পান করে কৌচ ছেড়ে ছেলের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল।…

এইখানেই গল্প শেষ করেছেন অভ্রদোষ।—অনুশীলা স্নেহের সঙ্গে কড়কগুলো বলল।

—সুন্দর ইঙ্গিত !—উচ্ছসিত হয়ে উঠল পরাশর।—কৌচ ছেড়ে বিপাশা ছেলের পাশে গিয়ে শুলো। …অর্থাৎ ছেলেই তারকাছে সব। স্বামী আসবাবগুলো নিতান্ত অর্থহীন।—ঠিক কথাই তো বলেছে আশিস।

—নাঃ, ঠিক কথা নয়। মেয়েরা কখনো ও-কথা বলতে পারেনা। ইচ্ছে থাকলেও না। বলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

—কোন্ কথা ?—আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল পরাশর।

—ঐ চাকরি ছাড়ার কথা।—অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুশীলার গলা একটু কর্কশ হয়ে উঠল।

পরাশর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—তাই হবে বোধহয় !

।। বৈধব্য ।।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

বহুদিন থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় জ্যৈষ্ঠমাসের এই শেষ-বিকেলের ফুটপাত থেকে তখনও তপ্ত নিঃশ্বাস উঠছিল। দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত রাস্তা এটা। একটু এগিয়ে গেলেই ট্রাম লাইন। দু-পাশে দেবদারুর সারি। এই বসন্তের নতুন নরম পাতাগুলো রোদ লেগে এখন ক্লান্ত, পিপাসার্ত হয়ে উঠছে।

শুচিতা বাসার নেখে নেখে একটা বাড়ী খুঁজছিল। একবার ঘড়িটা দেখল। উঁহু, সাড়ে চারটে। পাঁচটার ট্রেন আর পাওয়া যেতনা। পরের ট্রেন সে-ই সাতে সাতটায়। তা হলে কোন্নগরে পৌঁছতে একটু রাত হয়ে যাবে।

দু'একজন পথচারী শুচিতাকে দেখতে দেখতে না-দেখার ভান করে চলে গেল। মনে মনে হাসল একটু শুচিতা। সত্যি, ও সাধারণের চেয়ে একটু বেমানান। এই বয়সে, অর্থাৎ যখন কোনো আধুনিকা শুভ্রশুভ্র বিধবা হলেও সাজে সজ্জায় কৌমার্যের ঝলমলে বিজ্ঞাপন বয়ে নিয়ে বেড়ায়, তখন শুচিতা তপস্বিনীর মত নিরাভরণ, নির্জন। এইটাই শুচিতার বিশেষত্ব এবং এইটাই তার আকর্ষণ।

বাসাবাড়ীটা বেশ গোলমেলে। রাস্তাটা পেরিয়ে এলো শুচিতা। বেলা পড়ে এসেছে। দেবদারুর পাতায় এখন ঘরে ফেরার রোদের রং।

প্রতীকের এ বাসায় শুচিতা আগে কখনও আসেনি। আচ্ছা, বাসাটা প্রতীকেরই বা বলি কেন? যে মারা গেছে এবং যে বাসায় সে একদিনও বাস করেনি, তার সঙ্গে ওর নামটা জুড়ে দেবার কোনো যুক্তি নেই।

বাসনা সম্প্রতি এই ঠিকানায় উঠে এসেছে। পাবলিশার না বললে শুচিতা এ ঠিকানা কখনো জানতে পারতনা। আগের বাসায় গিয়ে কী বোকা বনে গেছল সেদিন! তা, পাবলিশার ব্যবসা চেনে। সদ্যমৃত লেখকের বইয়ে কিছু কাটতি আছে সেই লোভে প্রতীকের কবিতার বইয়ের এই নতুন এডিশন। বিজ্ঞাপন দেখে বইটা কিনতে গিয়েই শুচিতা বাসার মাষারটা সংগ্রহ করেছে। বেচারা পাব্‌লিশার জানেনা, কবিতা বইটা তাকেই উৎসর্গ করা!

এতক্ষণে মাষার পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে।

সিঁড়িতে উঠতেই বাসনার গলা শোনা যাচ্ছিল—'এতটু সন্তো না হলে আমার বেত্তাতে যেতে ভালো লাগেনা বাবু! বড্ড লোকজন'।

পলাশ ঘরে অস্বস্তিকর স্তব্ধতার মত ভাব। খুকুর পলার স্বর শোনা গেল না।

বাসনা আবার হেসে হেসে বলছিল, 'আমি কিন্তু ট্রামে-বাসে যেতে পারব না ও। বলে রাখছি।'

এমন মুহূর্তে কলিং বেলের শব্দটা শুচিতার নিজের কানেই বড় খারাপ লাগল।

'ইস্, কে আবার এলো এখন?' বিরক্ত মুখে কপাট খুলে দিয়েই বাসনা থমকে দাঁড়ালো।

শুচিতা একটু হেসে বলল, 'কি? খুব অবাক হয়ে গেলে তো?'

'শুচি, তুমি? মানে তোমার এই বেশ? কি ব্যাপার? কবে থেকে?'

শুচিতা বলল, 'না, বেশিদিন নয়।'

'ওমা! বিয়ে করলেই বা কবে? বিদেশ চলেই বা কবে? এ যে সব—'

'মিষ্টি। কেমন? তাই না?'

'তা একটা খবর-টবর দেবে তো? কি হয়েছিল ভদ্রলোকের?'

'না, তেমন কিছু না। এই সামান্য অসুখ-বিসুখ।'

'ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড। এসো, ঘরে এসো। বাঃ বাঃ কতোদিন পরে তোমাকে দেখলাম। আমাদের তো একেবারে ভুলে গেছ আজকাল। প্রতীক মারা গেল। তবু একবারও এলে না। কী যে ঝড় গেল আমার ওপর দিয়ে!'

'ঝড় আমারও কম যায়নি, বাসনা। সে যাক্, কোথাও বেরুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে? আমি এসে বাধা দিলাম না তো?'

বাসনা হেসে উঠল—'আরে না না কোথায় আর যাব। এই একটু···। তুমি কদিন পরে এলে···। আচ্ছা পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি হলেন মিঃ পলাশ সরকার। সেন্ট্রাল গভর্মেণ্টের—পলাশ! ডিপেণ্ডেণ্ট ফিরেণ্টার একটা না হলে তোমাকে কারুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভালো লাগে না বাপু। অবশ্য শুচি আমাদের ঘরের লোক। ওর সঙ্গে খুব জানাশোনা ছিল।'

শুচিতা ধীরে ধীরে বলল, 'বাঃ তাতে কি? ছোট বড় চাকরি দিয়ে মানুষের পরিচয় মাপতে হয় নাকি! ওঁর ডেজিগনেশন যাই হোক, আমি কিছু মনে করিনি ওতে'।

বাসনা খুশি হয়ে বলল, 'তা বলে এমন কিছু হেলাফেলা নয়'।

বাসনা এবার ভাল্প করা খাটো চুলগুলো অপ্রশস্ত, সংকীর্ণ কপাল থেকে আলগোছে সরাতে সরাতে বলল, 'শুচিতা হোলো প্রফেসার, বুঝলে পলাশ। আচ্ছা পাড়াগাঁয়ের কোন্ কলেজ যেন তোমার?'

'প্রফেসর নই। লেকচারার!'

'কিলসকি।'

পলাশের ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি খেলে গেল।

বাইরে ছায়া ঘন হয়ে আসছিল। শুচিতা একবার ঘড়ির দিকে তাকালো।

পলাশ কেন যেন চলে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছে বলে শুচিতার মনে হচ্ছিল। হয়তো ওদের দুজনের বেড়াতে যাওয়ার বাধা পড়ল বলে। বা শুচিতার এই শুভ্র, শান্ত উপস্থিতির কাছে পলাশ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিল না বলে।

পলাশকে এ পকেট ও পকেট হাতড়াতে দেখে বাসনা হেসে উঠল। । 'কি? খুচরো নেই বোধ

হয়? ঠিক বলেছি আমি। যাও, নিয়ে যাও। কতোবার বলেছি, সব সময় কিছু খুচরো কাছে রাখবে। পথেঘাটে কতো দরকার হয়। তা না—'

বাসনা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে এক টাকার একটা নোট বের করল।

'কবে আসছ, পলাশ?'

'দেখি, কাল বিকেলে যদি পারি?'

বাসনা অট্টহাসির মত মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'যদি পারি? মানে? অন্য কোথাও এনগেজমেন্ট আছে নাকি?'

সিঁড়িতে জুতো পায়ের শব্দ ক্রমশঃ মিলিয়ে আসছিল।

বাসনা কপাট বন্ধ করতে উঠল।

শুচিতা দেখছিল, বাসনার প্রসাধন পর্বটা পুরো সারা হয়নি। মুখে ঘন পাউডার। ঠোঁটে, নখে লাল রং। বেঁটে শরীরে স্লীভলেস ব্লাউজ। অগোছালোভাবে পরা রঙিন শাড়ী। আচ্ছা, বয়স কতো হবে? হ্যাঁ প্রায় চল্লিশ। প্রতীকের সম বয়সী ছিল বাসনা। মাঝখানে ওর কয়েক বছর পড়া বন্ধ ছিল। তা, এই পাপড়ি করে-যাওয়া শরীরে অট্টহাসির চপলতা আনবার একটা উদগ্র চেষ্টা, পেটকাটা ব্লাউজের নীচে স্ফীত থলথলে চামড়ার কয়েকটা ভাঁজ, সেখানে কেমন একটা অশ্লীলতা লেগে আছে। সব মিলে যেন একটা বড় বিশ্রী, বেসুরো গন্ধ।

অথচ বাসনা এককালে সুন্দর ছিল। এই বয়সেও পোড়ন খাকা সম্ভব। কিন্তু একটা ক্ষুধিত, পোড়াতুর চরিত্র, মকদ আলটা মডার্ণ হওয়ার নামে ওকে কেমন কুৎসিত করে তুলেছে!

বাসনা সদ্য বিধবা। প্রতীক মাত্র মাস দুই মারা গেছে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শুচিতা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

কপাট বন্ধ করে ফিরে এসে বাসনা রঙ চটে যাওয়া, সামান্য ভাঙা বেতের চেয়ারটায় বসল। 'হ্যাঁ, এবার তোমার খবর-টবর বল। কি হয়েছিল ভদ্রলোকের? নাম কি? ও নামতো বোধ হয় মুখ আনবে না—যেমন বিরহিনীর সাজ দেখছি। তা, কদ্দিন ম্যারেড লাইফ কাটালে? বাচ্চা-কাচ্চা? হয়নি? বেঁচে গেছ মাইরি! সবাইতো আর প্রতীকের মত নির্বোধ নয়। কতো করে বললাম টেক প্রিকশান। তা, না। বাড়ীতে দুষ্টু বাচ্চা চাই যে তার বইপত্তর ছিঁড়বে, লালনীল পেন্সিল দিয়ে যেখানে সেখানে লিখবে। অথচ এই ছাখোনা, কি করি এখন ছেলেটাকে নিয়ে? ধরো, আমারো তো জীবন আছে, সাধ আহ্লাদ আছে। কি? ঠিক বলছিনা?

শুচিতা একটু সময় স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলল, 'খোকা কৈ? দেখি?'

একটি বছর পাঁচেকের শিশু এসে দাঁড়ালো।

'বাঃ কি সুন্দর! ছাখো, ছাখো চোখ দুটো ঠিক প্রতীকের মত।'

শুচিতা শুধু অবাক হয়ে ওকে দেখছিল। বুকে জড়িয়ে ধরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে বড় ইচ্ছে করছিল তার। ইচ্ছে করছিল সদ্য পরিচ্ছন্ন দুর্বাঘাসের মত ওর সুন্দর আঙুলগুলো দিয়ে নিজের কপালে রাখতে।

বাসনা বলল, 'এই তোর শুচি মাসী—বাবা যার কথা বলত। যাও, এবার ওঘরে যাও। বড়োদের কথার কাছে বেশিক্ষণ থাকতে নেই।... ...জানো শুচি, ছেলেটাকে আজো ম্যানার্স শেখাতে পারলাম না।'

'কোন ক্লাসে পড়ে ?'

'আর ক্লাস ! বাসা বদল করার পর আর ভর্তি করাতেই পারিনি।'

'ও।'

'আর কি জানো, ঠিক ওর বাবার মত একগুয়ে, রাক।'

শুচিতা ধীরে ধীরে বলল, 'একগুয়ে পুরুষই ভালো। ওরা জীবনে বড়ো হয়।'

'আর একেবারে সাধারণের মতো বেঁচে কি লাভ ?'

বাসনা দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টালো। 'তারপর বলো, ভদ্রলোক কি করতেন ? বড় কার্যের বড় অফিসার নিশ্চয়ই। তুমি বাবা, বেশ চালু মাল আছ। মোটা মাইনে, বোমাস। কি ? ঠিক বলছিনা ?'

'না।'

'তবে ?'

'উনি কলেজের লেকচারার ছিলেন।'

'মাই গড ! প্রতীকের মত ঐ টিচারগুলোকে দু'চক্ষে দেখতে পরি না আমি। আচ্ছা শুচি ? তুমি কি করে ট্যাও কর ওদের ? তোমার ভাল লাগে ?'

'লাগে'।

'রাগ কোরোনা, তোমার কেন টেস্ট নেই। হায়ার সোসাইটি তুমি ভাখোনি। আই মাই সে। প্রতীককে কতোবার বলেছি, একটা অন্য চাকরি ভাখো কার্মে-টার্মে। কিন্তু লোকটা ছিল বোকা, অলস, অপদার্থ। বললাম, অন্ততঃ ছাত্রদের জন্য বানাবে, বেনামে নোট বই লেখ। টু পাইস আসবে। সংসারে ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। ভালো পাড়ায় একটা বাসা করা দরকার। বাড়ীতে ফ্রীজ নেই, সোফা সেট নেই। আধুনিক গান শুনব, হিন্দী গান শুনব, একটা হামী রেডিও নেই। তা না, শুধু কবিতা লিখবে। নোট লেখকরা নাকি লেখকই নয়। আর তোমার কবিতা পড়ে কেউ ? যত সব অবাস্তব কথা ! .....আমিও ঠিক করে ফেলেছি ওর ঐসব বইপত্তর বিক্রি করে দেব। মিছিমিছি ঘরটাকে নোংরা করে রাখা। সাজানো গোছানো যায় না।'

শুচিতা চমকে উঠল—'সে কি ? প্রতীকের বইগুলো বিক্রী করে দেবে ?'

'দোবই তো ? কে পড়ে তোমার ঐ বস্তাপচা টলস্টয়, গুর্কির ভক্তি, বালজাক, শেলি—আরো কি সব নাম মনেও থাকে না ছাই। যত রাবিশ। দেখেও গেছে একজন পুরনো বইয়ের দোকানদার।'

শুচিতা চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় বলল, 'বইগুলো আমাকে বিক্রী করবে ? আমার কোয়াটারে অনেক জায়গা আছে। প্রতীক বই খুব ভালবাসত। ওর সেই ভালোবাসার জিনিসগুলো—'

'ভালোবাসত বলে মাথায় করে রাখতে হবে ? না, না, আমার টেষ্ট আলাদা। কিছু ইংরাজী ম্যাগাজিন রাখব ভেবেছি। পুরোনো হলেও ক্ষতি নেই। বসার ঘরে থাকবে। বুঝলে ? নইলে এই বাসিগঞ্জ পাড়ায় কালচার্ড বলে না।'

'তুমি আজকাল ইংরেজী ম্যাগাজিন পড় নাকি ?'

বাসনা বড় বড় দাঁতগুলো বের করে হেসে বলল, 'আরে না না, ওসব পড়ার বিদ্যে আমার নেই।

আমো-ই তো ধিঙ্গে আমার খাওড়াস পর্যন্ত। তবে হ্যাঁ, ছবি বেশি। কী সব তাজা তাজা শরীর! আচ্ছা শুচি, ওদেশের মেয়েদের এত বয়সেও শরীর এমন টাইট, স্ট্রং থাকে কি করে বলত?'

শুচিতা অবাক হচ্ছিল, ভালো লাগছিলনা তার। এ প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না।

বাসনা আবার হেসে হেসে বলল, 'যাই বলো বাপু, এই বিধবার বেশে তোমাকে দেখতে বেশ লাগছে কিন্তু। বয়সে আমার চেয়ে তুমি আর কত ছোট? তবু রূপ ফেটে পড়ছে। সাইরি বলছি। ওঙটা যদিও আমার গায়ের মত টকটকে ফর্সা নয়, তবু মুখ চোখ হাত পা তোমার খুব ভালো। শুচি, আসল কথা কি জানো? তোমাকে বিধবা বলেই মনে হয়না। আচ্ছা, আমার মত পোশাকটোশাক পরতে তোমার আপত্তি কি? যে মারা গেছে তার জন্য অত আদিখ্যেতা কেন? বড় জিলিয়ে সিল্কের পাড়ী ব্লাউজ পর, দেখবে ঠিক হিরোইন হিরোইন লাগছে। কত অফিসার তোমায় লুফে নেবে। এমন কি সিনেমায়ও নামতে পার। আরে, আমারও বয়স হয়েছে। তবু ছেলেগুলো কেমন পেছনে ঘুর ঘুর করে। নামের পেছনে একটা 'ডি' জুড়ে দিয়ে···। আসলে বুঝলেনা গন্ধ শুকতে চায়। এই আর কি? এই তো পলাশকে দেখলে। এটাই আমার লেটেস্ট রিক্রুট। তা কেমন লাগল? চোদ্দা ট্রাউজারে, টাইতে ওকে বেশ মানায় কিন্তু! আসলে হায়ার সোসাইটিতে মিশতে হলে এমনি একটা বয়ফ্রেণ্ড চাই। বুঝলে?'

শুচিতার গা ঘিন্ ঘিন্ করছিল। কাঁপ গলায় বলল, 'সেকি! ওতো তোমার চেয়ে বয়সে ছোটো?'

বাসনা শুচিতার থাইটুতে একটা মৃদু থাপ্পড় মেরে হেসে কানে কানে বলল, 'কম বয়সের ছেলেরাই স্লিজিং। ওদের উত্তাপ বেশি। বুঝলে? তা নয়তকি টাকমাথা বুড়োর সঙ্গে প্রেম করে? না শুচি, তোমার সত্যি কোন টেস্ট নেই।'

একটা অব্যক্ত ঘৃণায়, যন্ত্রণায় শুচিতা ওর দিকে তাকাতে পারছিল না। ওকে এই মেকআপ-এ, এই চেহারায়, এই রসিকতায় এখন একটা ধূর্ত ক্ষুধিত মাংসলোভী শিকারী নেকড়ে বলে মনে হচ্ছিল।

বাসনা আবার ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'জানো শুচি, প্রেমে পড়লে ছেলেগুলো বড্ড ইডিয়ট বনে যায়। ওরা আর তখন বয়সটয়স দেখেনা। মানে, দেখার অবসর থাকেনা। বোঝার অবসর পাকে না, এই যৌবনটার আসবাবপত্র সব নিউ মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। হাউ সিলি!'

বাসনা মাতালের মত হেসে উঠল।

ঘৃণায় শুচিতা মুখ ফিরিয়ে নিল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওদিকে জানালার ফ্রেমে বাঁধা আকাশটা ঘন কালো।

শুচিতা উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

বাসনা যেন একটু হতাশ হোলো। তার এমন রসালো কথাগুলো শুচিতা যেন তেমন গুরুত্বই করলনা। বলল, 'বোসো, চা করে আনি। পলাশের জন্য আজ মাংসের কাটলেট বানিয়েছিলাম। চায়ের সঙ্গে—'

'আমাকে মাফ করো বাসনা। আমি মাছ মাংস খাইনা।'

বাসনা আবার হেসে উঠল—'মাইগড। আঃ তুমি একখানা হেখানে মাইরী। সংসারে বিধবা যেন আর কেউ হয়না? আচ্ছা শুচি, তুমি ভদ্রলোককে খুব ভালোবাসতে?'

'কি জানি।'

'ভদ্রলোক?'

'তাও ঠিক জানিনা। তবে ভালোবাসতে চেষ্টা করেছিলাম। ওতেই আমার আনন্দ।'

'না বাপু, তোমার কথা বুঝতে পারছিনা। যেন সব হেঁয়ালি।'

'আসলে ভালোবাসার কথা বলা যায় না। ওটা মন বুঝতে পারে। তখন কী শান্তি, যন্ত্রণা, আনন্দ। বাসনা, ভালোবাসার কথা তোমায় কি করে বলব?'

'আচ্ছা, ভদ্রলোক তোমাকে দামী দামী শাড়ী, গহনা, প্রেজেন্টেশন দিত?'

'দু' একটা বই ছাড়া কখনো কিছু দেয়নি'।

'না, তোমার ভুল হয়েছে। ভদ্রলোক ভালোটালো বাসতনা। বুঝলে, আজকালকার ছেলেগুলো বড় স্বার্থপর। কেবল নিতে চায়। চাও পেলে টাকা পয়সাও।'

'আমি শুধু দিতে চেয়েছিলাম। ওর আনন্দের জন্য সারা জীবন শুধু দিতে চেয়েছিলাম। নিজের জন্যে কিছু রাখেনি। ওই আমার তৃপ্তি, আমার আনন্দ।'

শুচিতার চশমাছলো চোখের দিকে তাকিয়ে বাসনা কেমন অবাক হয়ে গেল।

'যোসো, যোসো। বাথরুম থেকে এসে ভদ্রলোকের আরো গল্প শুনব। আচ্ছা, নাম কি ছিল ভদ্রলোকের?'

শুচিতা বলল, 'প্রতীকের বইগুলো কোথায়?'

'ও, বইগুলো? ঐ কোণের ঘরে। দাবধান কিন্তু। পুরনো বইয়ে মধ্যে বড্ড কাঁকড়া বিছে থাকে।

'সে কি! বইগুলো ঝাড়পোছ করো না?'

'তুমিও যেমন? আমার আর কাজকর্ম কিছু নেই। না?'

সদ্যজাত সিনেমার একটা উৎকট আধুনিক গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাসনা বাথরুমের দরজা বন্ধ করছিল। ঐখানে থেকে চেঁচিয়ে বলল, একটু দেরি হবে কিন্তু।'

বাসনা চলে যেতে শুচিতার ভালো লাগছিল। যেন একটা অপবিত্র, অপরিচ্ছন্ন, ঘরের দুর্গন্ধ পেরিয়ে এই মাত্র সে নির্জন ছাদের, খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালো। এবার সে তার বড় প্রিয়, বড় পবিত্র বড় সুন্দর স্মৃতিটাকে কাছে, একবারে বুকের কাছে নিঃশ্বাসের মতো করে পাবে।

ঘরটা বড় ছোটো, আগোছালো, উপেক্ষিত। ধুলো জমে জমে বইগুলোর মলাট কালো হয়ে গেছে। শুচিতার দুঃখ হোলো। বুঝতে পারল, বাসনা নিজের জীবন থেকেও প্রতীককে অনাদরে, অসম্মানে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে।

বাসনার কাছে প্রতীকের কোনো মূল্যই নেই, কখনো ছিলনা বলতো। যা ছিল, তা প্রয়োজন। বানরের গলার মুক্তোর হারের মত বাসনার জীবনে প্রতীকের উপস্থিতি তেমনি নিরর্থক, অবাঞ্ছিত। অথচ আশ্চর্য! শুচিতা বহু চেষ্টা করেও প্রতীককে একথাটা বোঝাতে পারেনি। অথবা প্রতীক বুঝেও ফিরে আসতে পারেনি। শুচিতা অবাক হয়ে গেছল, দীর্ঘ আট দশ বছর ধরে যার সঙ্গে একটি নিবিড়, সুন্দর গভীর সম্পর্ক তিলে তিলে, দুঃখে সুখে, আঘাতে বিপদে, মুক্তোর মত নির্জনে নিভৃতে গড়ে উঠেছিল, বাসনা কি দিয়ে ক'মনের খেলায় তা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে পেরেছিল। শুচিতা নিজেকে বিশ্লেষণ করে জানতে চেয়েছে কোথায় এবং কি ত্রুটি ছিল তার।

তারপর কতোদিন পরে দেখা হোলো প্রতীকের সঙ্গে। উঃ! তখন কি শুচিতা জানত, এইটিই শেষ দেখা তাদের।

অন্য দিনের মতো সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় কোটারের পশ্চিমের বারান্দায় বসেছিল শুচিতা। এইটাই তার একান্ত নিজের সময়। এইখানেই বসে বসে সে পশ্চিমের আরক্ত আকাশ, আর নদীটা পুরো দেখতে পায়। দেখতে পায় কখন অন্ধকার ঘন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের রং বদল হয়। একটা নৈঃশব্দ্যের মুহূর্ত চেনা পরিবেশকে, চেনা জগৎকে কেমন বিস্মৃত দূরত্ব উদার উদাসীন করে তোলে।

আর দেখতে পায় একজনের ছবি, যে ছবির সঙ্গে তার জীবনের রং রেখা, সুর একদিন মিলে গিয়েছিল।

সত্যি, প্রতীককে এই সময় জীবন মনে পড়ত। কতটা পথ দুজনে একসঙ্গে চলে এসেছে। সেই মফঃস্বলের কলেজ থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যন্ত। প্রতীক সত্যি ভালোবাসত তাকে, যে ভালোবাসার ওপর নির্ভর করা যায়। যে ভালোবাসা এই সন্ধ্যাবেলার নদীর মত শান্ত। সব পুরুষের ভালোবাসার প্রাণ ভরে না। ভালোবাসাও যেন এক শিল্প-যন্ত্রের মত সব শিল্পীর হাতে সমান বাজে না। কখনো কখনো একটি সূক্ষ্ম তারের মধ্যেই সারাজীবন গান ঘুরে ওঠে।

শুচিতার মনে আছে, একবার যেন প্রতীকের টাইফয়েড হয়েছিল। কোনোভাবে ক্লাস শেষ করে কখনো প্রস্তির ব্যবস্থা করে শুচিতা সেই গ্রামবাজার ছুটত। আসলে অসুস্থ প্রতীককে ছেড়ে শুচিতা থাকতে পারত না। তখন কেমন শিশুর মত মনে হোতো প্রতীককে। সব ভালোবাসার মধ্যে কে এমনি মানুষের স্নেহ মেশানো? কে জানে।

এমনি টুকরো টুকরো চিত্রগুলো মাইলস্টোনের মতো পথে পথে ফেলে আছে।

বহু বছর পরে সেই প্রতীক এসেছিল একদিন। ঝড়ের মত। শুচিতা চমকে উঠেছিল, 'তুমি'?

'খুব অবাক হচ্ছ? কলের ফেলেই চলে এলাম। তোমার বাসাটা আবার অন্তহীন পথ পেরিয়ে। মানে, মাঝপথে ট্রেন বন্ধ। অগত্যা রিক্সায় পদব্রজে। আঃ এতক্ষণে বাঁচলাম। একগ্লাস জল দাও তো?'

প্রতীককে কেমন বড্ড আনস্মার্টলাগল মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল,একটা বিধ্বস্ত মানুষ। শরীরটাও ভেঙে গেছে। শুধু সেই দুটি উজ্জ্বল চোখ, প্রশস্ত ললাট আগের মতো বেঁচে আছে। শুচিতা কি বলবে, কি করবে বুঝতে পারছিল না। মাঝপথে ট্রেন বন্ধ হলে রিক্সায় কিছুটা এলেও, অন্ততঃ তিন চার মাইল হেঁটে এসেছে প্রতীক তখনো রিক্সা কলেজ পর্যন্ত আসত না। কিন্তু প্রতীক কেন এসেছে? বিয়ের পর ও-তো একদিনও আসেনি।

জল নিয়ে এসে শুচিতা দেখল, প্রতীক ধবধবে মুখে তেমনি বসে আছে। মনে হোলো জীবন কিছু ভাবছে। আরো মনে হোলো কোথাও বড় রকমের ঝড় উঠেছে একটা।

প্রতীকের গলার এ স্বর শুচিতার অচেনা—'একটা বিশেষ কাজে এলাম, শুচি।' 'বিশেষ কাজ? আমার সঙ্গে? বলো, রাত হয়ে যাচ্ছে। কি চলে যাবে এবার।' প্রতীক ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো।

—'আমাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করছ?'

শুচিতার বুকটা কেঁপে উঠল। একথা সে বলতে চায়নি, একথা সে বলতে পারে না। প্রতীক তার বড় আপন। বাইরে যতো ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক। তবু, প্রতীক! কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

শুচিতা বলল, 'না সেকথা বলছি না। আমার কাজ আছে।—মানে, খাতাগুলো দেখা আজ শেষ করতে পারলে ভালো হয়।'

'কোনো কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই। তোমার কাজ আছে, এইটিই যথেষ্ট।'

আহত প্রতীক, আত্মাভিমানী প্রতীক, চুপ করে রইল।

শুচিতার ভেতরে ভেতরে কান্না পাচ্ছিল। এই প্রতীকের কথাই সে এমনি সন্ধ্যায় একা বসে বসে ভাবে। ঘুমুবার আগে একদণ্ড তার একান্ত সময়টুকু সে আজো প্রতীকের ধ্যানেই কাটায়, যেমন আগে কাটাতো। এইটুকুই তো আজ শুচিতার সারা দিবসের সঞ্চয়! অথচ আজ যখন সে সামনে বসে আছে—।

'তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এলাম, শুচি! আমার বড় ভুল হয়ে গেছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস প্রার্থনার মত জেগে রইল।

'ও, এই কথা?' শুচিতার গলার স্বর তবু রুক্ষ শোনালো।

'কথাটা বলতে দেরি হোলো। কিন্তু আর দেরি হোলে হয়ত বলাই হোতো না। কাজেই 'বেটার লেট্ দ্যান নেভার।'

নিজের মনেই প্রতীক একটু হাসল। কিন্তু হাসিটা বড়ো নিষ্ঠুর, বড়ো করুণ। 'আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি।'

শুচিতা তাকালো প্রতীকের মুখের দিকে। কারণ ও যা বলে, করতে চেষ্টা করে। 'এসব কথা থাক্, প্রতীক। পুরনো জীবন আমি ভুলে গেছি।'

'না ভোলো নি। ভুলে গেলে জোর করে আমাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করতে না।—কিন্তু থাক্। তর্ক করতে আমি আসিনি। কেন এতোদিন পরে এসেছি তা বলেছি! আমার সব অপরাধ সত্ত্বেও তোমার কাছে একটা আশ্রয় আমার আছে—সেটা জানি। যুক্তি দিয়ে নয়, অনুভব দিয়ে। এবং সেটাই আমার শেষ আশ্রয়। একদিন তুমি সেবা করে আমায় বাঁচিয়ে ছিলে। কাজেই—এ প্রাণে তোমারও কিছু দান আছে!'

আবার প্রতীক নিঃশব্দে হাসল। শুচিতা ধীরে ধীরে বলল, 'কথাগুলো বড় নাটকীয় শোনাচ্ছে। অথচ বাসনার জন্য যখন—'

'শুচিতা, আমি বাধ্য হয়েছিলাম। সেটা একটা ডিফারেন্ট হিস্ট্রি। আজ বলার সময় নেই। জানি না কখনো আসবে কিনা। শোনো, আমি প্রতারিত। বাসনা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জনপদ বধূর পক্ষে হয়ত রাত্রিবাস চলে, কিন্তু সংসার করা চলে না।'

শুচিতার গলার স্বর ইস্পাতের মত কঠিন—নিজের স্ত্রী সম্পর্কে শোভনভাবে কথা বলাই সঙ্গত।'

'আমি বাঙ্গিন দেওয়া সমাজের লোক নই শুচি। আমার কাছে মিথ্যা শোভনতার চেয়ে রূঢ় সত্যের মূল্য বেশি।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললনা।

'বেশ, বাসনার কথা থাক্। তোমার কথা বল্?'

'আমি চলে যাচ্ছি।'

শুচিতা চমকে উঠল একটু, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'ঠিকানা এখন দেবার দরকার নেই। শোনো, আমার খোকাকে তোমার কাছে দিয়ে যেতে পারবে? ওকে কিছুদিনের জন্য তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। বড় ভালো ছেলে। ও একদিন বড় হবে। দেখ, নইলে, নষ্টলে, বাসনা একদিন ওকে মেরেই ফেলবে।'

প্রতীকের গলার স্বর ভারি শোনালো।

'কি যা তা বলছ? বাসনা ওকে মেরে ফেলবে!' শুচিতা অবাক-হয়ে উঠল।

'অসম্ভব নয়। ওর পুরোনো ইতিহাসটা হঠাৎ আবিষ্কার। আর অন্যের মত বর্তমানের ইতিহাসটা তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

'মানে? অন্য কাউকে ভালোবাসার-টাসার ব্যাপার?'

প্রতীক ঘুরের অন্ধকারগুলোর দিকে চোখ রেখে বলল, 'সব ক্রটি সত্ত্বেও ভালোবাসা নদীর স্রোতের মত পবিত্র। ভালোবাসায় ঘটনা নয়, শুচি। সে ইতিহাসটা বড় কদর্য! ···আমি শুধু মুক্তি চাই। আর চাই, খোকার জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়। এই মুহূর্তে আর কিছু চাইবার নেই আমার। তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। এবং সে ক্ষমা করা না করা, তোমার ইচ্ছা! আমি পরাজিত—আই এ্যাম-এ লষ্ট ম্যান!'

'সেইজন্য এতো বছর পরে এসেছ?'

'আরো বহু বছর পরে হলেও আসতাম। ভালোবাসার মেয়াদ কখনো তামাদি হয় না, শুচি। একমাত্র মৃত্যুতেই তার শেষ।'

শুচিতার বড়ো ভালো লাগছিল, বড়ো করুণ করুণ লাগছিল এই ক্লান্ত অনুতপ্ত আহত প্রতীককে। ইচ্ছা করছিল, সেই আগের দিনের মত একটু ওর কাছে বসে। শুধু চুপ করে অন্ধকারের মত ওকে ঘিরে থাকে। কিন্তু আজ আর তা হয় না। শুচিতা তখন অহল্যার মত মৃত! এখন যুগের আদিগন্ত!

এক সময় আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ? আর বরো, খোকাকে যদি না রাখি।'

প্রতীক উদাসীন গলায় বলল, 'সে স্বাধীনতা তোমার আছে?'

'কিন্তু প্রতীক, একটা জিনিস বড় আশ্চর্য লাগছে। এই কথা বলার জন্য তুমি এত দূর এলে! তোমাকে আজ ঠিক বুঝতে পারছি না।'

প্রতীক হাসল একটু। 'কেন? আজ কি আমি খুব এক্সসাইটেড?'

'কি ঘটেছে? বাসনার সঙ্গে ঝগড়া?'

'না। বহুদিনের বহু বিশ্বাসঘাতকতার একটা প্রতিশোধ আমি চাই।'

'কার ওপর?'

'না, বাসনার ওপর নয়। ওর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমিও দায়ী। সোনা চিনতে ভুল করে যে রোল্ড গোল্ড কেনে, মূল্যটা তাকেই শোধ করতে হয়।'

কথাগুলো বড়ো কঠিন শোনাচ্ছিল। ভেতরে যে একটা প্রবল ঝড় বইছে, শুচিতা তা বুঝতে পারছিল।

'থামথেয়ালি ছাড়। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তোমার।—আচ্ছা, একটু বোসো। আমি আসছি। কেমন?'

একটু পরেই শুচিতা রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে অবাক! প্রতীক কখন চলে গেছে। টিপয়ে রাখা জলের গ্লাসটা ঠিক তেমনি ভরে আছে। এক চুমুক জলও প্রতীক খায়নি। সিগারেট প্যাকেটটাও নিয়ে যেতে ভুলে গেছে।

শুচিতা অনেকক্ষণ একটা মৃত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। ···কিন্তু বাড়ী ফিরবে কি করে? ট্রেন কি এখন চলছে? এই মুহূর্তে প্রতীকের জন্য শুচিতা চিন্তা না করে পারছেনা? ভুলতো সব মানুষেরই হয়। প্রতীক যদি আজো তাকে ভালোবাসে, তবে সে কেন তাকে ফিরিয়ে দেবে?

সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটল শুচিতার। কী আনন্দ, অথচ কী যন্ত্রণা! প্রতীক ফিরে এসেছে। হ্যাঁ, ভালোবাসলেই ভুল হয়, ভালোবাসলেই ফিরে আসে। ভালোবাসা যেখানে নেই, শুধু অভিনয়, শুধু

ত'দিনের খেলা, সেখানে কেউ ফিরে আসে না! আঃ, প্রতীক অনন্ত. প্রতীকের ভালোবাসাই তাকে পূর্ণ করেছে। সব পুরুষের ভালোবাসা তো নারীকে পূর্ণ করে না।

না, কাল ব্যাপারটা পাড়াতেই শুচিতা বলবার। আজ সে প্রতীককে ভালো করে গ্রহণ করেনি। আসলে সে প্রস্তুত ছিল না। —ইস্ প্রতীককে জিজ্ঞেস করে রাখলে ভালো হোতো কাল তার ক্লাশ কখন। তা যখন হোক্—গিয়ে বলবে, আজ কলেজ পালানো ছাত্র আমরা। চল, যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে পড়ি! দেখছ না, বিকেলের আকাশে কেমন রোদ জ্বলে আছে! অনেক, অনেকদিন পরে আবার গঙ্গার কোল ঘেঁষে আমরা বসব। কেউ কোন কথা বলব না। কেউ কারুর দিকে তাকাব না! কারণ আমরা এখন শেষ বিকেলের আলোর মত পেঁচ!

আঃ, কতোদিন এমনি করে তারা কাছাকাছি বসেনি!

সকাল হোলো। হকার কাগজ দিয়ে গেছে। কাগজটা খুলে দেখতে দেখতে একটা ছোট্ট সংবাদ চোখে পড়ল। সংবাদটা ভালো করে পড়তে চেষ্টা করছিল শুচিতা। কিন্তু এতো সহজ ভাষাগুলোর অর্থ সে ঠিক ধরতে পারছে না। চোখেও কিছু দেখা যাচ্ছে না! আঁচলে চোখ মুছল শুচিতা। না, পৃথিবীতে কোথাও এতোটুকু আলো নেই! তখন সকাল নয়। রাত্রির ঘন অন্ধকারে সব ঢেকে গেছে!

শুচিতা শিশুর মতো বিছানায় লুটিয়ে পড়ল!

তারপর অন্ধ জীবন।

কতক্ষণ প্রতীকের বই-রাখা এই ছোট ঘরটায় শুচিতা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কার হাত গায়ে লাগতে চমকে উঠল।

'শুচি মাসী তুমি কাঁদছ কেন?' —খোকা চুপি চুপি কখন ওঘর থেকে উঠে এসেছে।

'কাঁদছি কই? চোখে কি একটা পোকা পড়ে গেল। আচ্ছা, খোকা, তুমি আমার কাছে থাকবে? নদীর ধারে আমার একটা ছোট্ট বাড়ী আছে। চারধারে অনেক গাছপালা। ঘরের সামনে বড় উঠোন। সেখানে দুজনে মিলে একটা বাগান তৈরী করব। কতো গাছের চারা লাগাবো। বুঝলে? খুব মজা হবে। আর আমার কাছে পড়বে।'

'আমার ছড়ার বই, আর সেই যে বাবা দিয়েছিল—ছবি আঁকার বই সেটা নিয়ে যাব না?'

'হুঁ সব বই, খেলনা।'

'জানো, শুচি মাসী, বাবা তোমার কথা বলত। আর দাঁড়াও, তুমি বাবাকে যে বইটা দিয়েছিলে না —সেই যে মোটা ইংরেজী বইটা—নামটা কি যেন—সেটা মাঝে মাঝে দেখতো। এখুনি খুঁজে আনছি।'

শুচিতা বইটা খুলে দেখল। হ্যাঁ, সেই কবে প্রতীককে "রেমারেকশন" বইটা উপহার দিয়েছিল।— বহু জায়গায় লাল দাগ দেওয়া। শুচিতা দাগগুলোর ওপর হাত বুলালো - যেন ওর মধ্যে প্রতীকের জীবনের উত্তাপ আজো লেগে আছে! —প্রতীক এতো বড় শাস্তি তুমি আমায় দিয়ে গেলে! কেন আর একটা দিন, শুধু একটা দিন অপেক্ষা করতে পারলে না—কেন? কেন?'

বাথরুমের কপাট খোলার শব্দ হতেই খোকা চলে গেল।

বাসনা তোয়ালে দিয়ে অতি সাবধানে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'কি? বইপত্তর দেখলে?'

'দেখলাম। আমি সব দোষ। তুমি আর মুখপো বইর দোকানদারকে দিও না। এই যাঃ—এখন সাড়ে ছ'টা। না এবার আমাকে যেতে হবে। নইলে ট্রেন পাব না।'

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। শুচিতা বলল, 'খোকাকে যদি নিয়ে কাছে রাখি, তোমার খুব কষ্ট হবে? বুঝতে পারছ, সেই ঘুরে একা একা থাকি? বড় খারাপ লাগে। কেউ ত নেই আমার। শ্বশুর-শাশুড়ী, কবে মারা গেছেন।'

বাসনা খুশি হতে গিয়েও চেপে গেল। 'তা নিয়ে যাবে, যাও। কিছুদিন থেকে আসুক। যত হোক আমার ছেলে। মাঝে মাঝে না দেখলে,—বুঝলে না?'

শুচিতা প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নেমে গেল। পেছন থেকে বাসনা হঠাৎ বলল, 'শুচি, সেই তখন থেকে বলছি, কদ্দিন বিয়ে করলে, বরকে প্রথম প্রথম কেমন লাগল, ভদ্রলোকের নাম কি—কিছু বললেনা। বজ্জ চাপা মেয়ে বাবা!'

'এসো বলছি।'

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে নিচ তলার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। সামনে সেই চওড়া রাস্তাটা এখন অন্ধকারে ঢাকা।

বহুদিন পরে বহু দূরে মেঘ ডাকল।

বাসনা অধির হয়ে উঠছিল, 'কই বললে না?'

'সত্যি, শুনতে চাও?'

বাসনা খুশি গলায় বলল, 'সত্যি চাই। খুব ইন্টারেস্টিং, তাই না? কি নাম ছিল?'

শুচিতা বাসনার মুখের দিকে সেই অন্ধকারে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'তার নাম প্রতীক।'

'প্রতীক?' বাসনা যেন একটা গোখরো সাপের ছোবল খেয়ে লাফিয়ে উঠল।

'শোনো বাসনা, প্রতীককে আমি ভালোবাসতাম। আজ সে নেই। আততায়ীর দিন সে আমার কাছেই গিয়েছিল। আমি তার সব ভুল, ত্রুটি ভুলে গেছি। আমরা সারা জীবনের বন্ধু। এই মৃত্যুতেও আমরা বন্ধু আছি। আর এই যে বিধবার বেশ, এ তার অসুখ। তার ভালোবাসার স্মৃতি। আমি খুব সুখে, খুব শান্তিতে আছি বাসনা। আজ এসেছিলাম খোকাকে নিয়ে যাবার কথা বলতে। ও আমার কাছেই বড় হোক। প্রতীক সেই আদেশই দিয়ে গেছে আমাকে। আচ্ছা, চলি।'

অন্ধকারে বাসনার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তাকে এখন একটা মৃত মানুষের কঙ্কাল বলে মনে হচ্ছিল। সেই মুমূর্ষু যৌবনের উগ্র বিজ্ঞাপন, সেই অষ্টাদশীর নকল চাপল্য, সেই তীক্ষ্ণ চোখের খেলা—সব যেন ধূসর, নিষ্প্রাণ এক ধ্বংসস্তূপ।

বাসনা কোনো কথা বলল না। ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

শুচিতা নিচ থেকে শুনতে পাচ্ছিল, সিঁড়ির ধাপগুলো পেরোতে এখন বাসনার বড় কষ্ট হচ্ছে। পায়ের ছন্দ কেটে যাচ্ছে। বড় ক্লান্ত, অতিক্রান্ত যৌবনের পরাজিত পদক্ষেপ। যেন নিঃশ্বাস টানতে ওর কষ্ট হচ্ছে এখন।

মৃদু, ছন্দহীন, পায়ের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে হ'তে এক সময়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

শুচিতা হাত মেলে দেখল, এখন অশ্রুবিন্দুর মত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

এই প্রথম

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' সহায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাঁদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেন তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে দেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

সম্পাদক গল্পভারতী

উপচার

শ্রীমতী অঞ্জলী সে

মুরতমী স্কুলের বর্ণালী সমারোহের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল জ্যোতির্ময়। ডালিয়া, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, রজনীগন্ধা আরও কত ফুল চারিদিকে, কত রঙের মেলা বসেছে ছোট বাগানখানা জুড়ে—শেষ অঘ্রাণের হিমেল সকালে, উজ্জ্বল ঝকঝকে রোদে স্নান করে, উত্তুরে বাতাসে শ্বাস নিয়ে ষোড়শী তরুণীর লাবণ্য পাপড়িতে মেখে ফুলগুলো ফুটে উঠেছে। পরিবেশটা কি মনোরম, কি স্নিগ্ধ!

জ্যোতির্ময়ের সারা মুখে প্রশান্ত তন্ময়তা, অপরিচিত জনের চোখে অনায়াসেই সে ভাবুক কবি অথবা আত্মসমাহিত শিল্পী বলে চিহ্নিত হতে পারে, এই মুহূর্তে; যদিও তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় পরিচিতের দল তাকে কঠোর বাস্তববাদী বলেই জানে চিরকাল। আজকের বিশেষ দিনটিতে যারা শুভেচ্ছা জানাতে আসবে, সন্ধ্যেবেলা যাদের সে নিমন্ত্রণ করে এসেছে আজ তার বাসায় মিষ্টি মুখ করতে, যারা লৌকিকতা আর সামাজিক আড়িজাতা বজায় রাখতে রজনীগন্ধার তোড়া অথবা অন্য আরও কিছু না কিছু হাতে নিয়ে আসবে, মাপা হাসিতে অভিনন্দন জানাবে, সংযত শালীন কৃত্রিম ইঙ্গিতেভরা কথাবার্তা বিনিময়ের পর মিষ্টির প্লেট হাতে তুলে নেবে, বিদায় নেবার সময়েও যথারীতি সৌজন্য-বিনিময় করে যাবে—তাদের মধ্যে একজনও জানতে পারবে না—পেশায় যন্ত্রবিদ, একান্ত বাস্তববাদী জ্যোতির্ময় সেনের মনোজগতের সাম্প্রতিক সংবাদ। স্নিগ্ধ মুখ, সপ্রতিভ যুবকের মনের গভীরতম প্রদেশে, গত একবছর ধরে যে বন্যাবাত্যা বয়ে চলেছে—তার খোঁজ জানে না অন্তরঙ্গ বান্ধবের দল। গত একবছরের দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকম্প তার সহজাত মনোবৃত্তির কঠিন প্রাচীরগুলো ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ করেছে, আর সেই জায়গায় কাদামাটির নতুন দেওয়াল গড়তে সুরু

করেছেন অদৃশ্য, রসিক কোন শিল্পী আসন খেয়ালে, তার খোঁজ গায়ত্রী ছাড়া আর একজনই মাত্র রাখেন—যার সহজ, নিষ্কলঙ্কিত মনুষ্যে জ্যোতির্ময়ের বাস্তব চিন্তাধারার পাথর কঠিন বেয়ালে প্রথম কাটল ধরেছিল ; যার তীক্ষ্ণ অনুভূতির কাছে তাদের সম্পর্কের ফাঁকটা গোপন থাকেনি। গত কয়েকটা মাসে যে ভাঙাগড়ার ব্যাপার চলেছে, জ্যোতির্ময় গায়ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যার খবর তাদের প্রাত্যহিক সংযোগের বন্ধুজনেরও অগোচরে রয়ে গেছে—তাও যে তাঁর কাছে সুবিদিত, তা বুঝতে জ্যোতির্ময়ের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি—সেদিন একটিমাত্র কথাতেই তিনি তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—খুব সহজভাবেই বলেছিলেন—শুক্রবার কিন্তু আমরা যাচ্ছিনা, রবিবার সকালে যাবো, সোমবার ফিরে আসবো। শুক্র আর শনি এই দুটো রাত তোমাদের থাক, যদি শুক্রবারের একটা রাত বোঝাপড়ার পক্ষে যথেষ্ট না হয়।…

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাতে গায়ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল জ্যোতির্ময়। সরোজবাবুর কথায় বিস্মিত হয়েছিল গায়ত্রী, লজ্জাও পেয়েছিল একটু—প্রতিবাদের সুরে প্রশ্ন করেছিল—বোঝাপড়া আবার কী ? কখন যে কী বলেন সরোজদা, বোঝাই মুস্কিল।

—ও বোঝাপড়ার দরকার আর নেই বুঝি ?—হেসেছিলেন সরোজবাবু, জ্যোতির্ময়ের চোখে চোখে তাকিয়ে জানতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সেটা কবে ঘটল জানতে পারলাম নাতো ? আমি তো ভেবে রেখেছিলাম গতবছর যার শুরু, এবছর তার শেষ হবে। আর তার জন্য শুক্রবারের রাতটিই হবে সবচেয়ে প্রশস্ত ক্ষণ। অদিনে, অক্ষণে এমন একটা গরম কাজ কবে সারলে, জ্যোতির্ময় ?

জ্যোতির্ময় তৎক্ষণাৎ বুঝেছিল সে ধরা পড়েছে। উত্তর দিতে পারেনি, তার অপ্রতিভ মুখ দেখে সুনন্দা এগিয়ে এসেছিল সামনে, সরোজবাবুর কৌতুকে উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু ইশারায় বলে উঠেছিল—খুব হয়েছে, গোয়েন্দামশাই এবার শান্ত হোন। এসো জ্যোতির্ময়, আর পিতু, চল আমার কিচেন গার্ডেন দেখবি চল, বেগুন আর টমাটো যা ফলেছে না—

সুনন্দার পিছু পিছু বেরিয়ে যেতে যেতে একপলকের জন্য সরোজবাবুর দিকে তাকিয়েছিল জ্যোতির্ময়। ভদ্রলোক সারা মুখে হাসি মেখে এদের চলে যাওয়া দেখছিলেন, জ্যোতির্ময়ের তাকানো লক্ষ্য করে তাঁর হাসি আরও একটু বিস্তৃত হয়েছিল, ঠোঁটের ফাঁকে, চোখের তারায় ঝকঝকে সাদা দুপাটি দাঁতের সারিতে।

জ্যোতির্ময়ের কাণের কাছটা গরম ঠেকেছিল। হঠাৎ, দ্রুতপায়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে সুনন্দাদের পিছু নিয়েছিল সে।

সর্বাঙ্গে ফুলকোটা রজনীগন্ধার ডাঁটিটার দিকে তাকিয়ে সরোজবাবুর সেই হাসিটা এখন মনে পড়ল জ্যোতির্ময়ের—ভদ্রলোক সত্যি বুদ্ধিমান, অত্যন্ত তীক্ষ্ণধীও বটে, অথচ এমন একটা সরলতা সব সময় ঘিরে থাকে তাঁকে, কথায় কথায় এমন গভীরতার মধ্যে চলে যেতে পারেন অনায়াসে—তখন তাঁর সেই আন্তর প্রশান্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কিছুতেই ভাবা যায় না এই মানুষই সময় বিশেষে কত ছেলেমানুষী করতে পারেন ছোটদের সঙ্গে। সংসার সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা কত স্বচ্ছ, কত মুক্ত আর উদার ; এ সত্যটা যেদিন থেকে বুঝতে পেরেছে জ্যোতির্ময় সেদিন থেকেই তার লজ্জাবোধের সূত্রপাত—আজকাল প্রায়ই সে নিজের কাছে লজ্জিত বোধ করে, যখন ভাবে—গায়ত্রীর মত মেয়েকে মিসেস তরফদার বা মিসেস সাহানী বানাবার উগ্র প্রচেষ্টা কত হাস্যকর করেছিল সরোজবাবুর কাছে, সুনন্দার কাছে—তার হীনমন্যতা লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই তাঁরা কৌতুক বোধ করেছেন, গায়ত্রীর অসহায়তা বুঝতে পেরে কষ্ট পেয়েছেন। সত্যি, জ্যোতির্ময় কি বোকা ছিলে তুমি, সেদিন কত অগভীর ছিল তোমার চিন্তাধারা—নিজেকে নিরুচ্চার ধিক্কার দিল ইঞ্জিনীয়ার

জ্যোতির্ময় সেন—কত পরশপাথরের টুকরো খুঁজি ভেবে তুমি ছুঁড়ে ফেলেছ, কত পরমদামী রত্নে খেছে অবহেলায়, গায়ত্রীর চটকটানি লক্ষ্য করে, অকাটীন, তুমি তাকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়েছ—সমাজে বিশেষ হোতে গেলে, হাই সোসাইটিতে মেলামেশা করতে হোলে শুধু রূপ, ডিগ্রী আর স্বামীর অর্থের জোর থাকলেই হয় না, আরও কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকা দরকার। সকলের সঙ্গে অনায়াসে মেশবার ক্ষমতা থাকা চাই, অক্লান্তভাবে হাসতে গল্প করতে সময় বুঝে উঠতে জানা চাই—তা নয়ত সোসাইটিতে আর পাঁচজনকে ডিঙিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নাকি ?

গায়ত্রীকে বিয়ে করবার পর স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে চেয়েছিল বিলেত ফেরত কেতাদুরস্ত ইঞ্জিনীয়ার জ্যোতির্ময় সেন—স্ত্রীর সংস্কারের ভার নিয়েছিল নিজের হাতে। গায়ত্রী শিক্ষিতা মেয়ে রূপসীও বটে কিন্তু ওর রূপে যতটা কমনীয়তা, সে তুলনায় ঔজ্জ্বল্য কম, যতখানি স্নিগ্ধতা সে পরিমাণে তীব্রতা নেই। হেসে হিল্লোল আছে ছন্দও আছে কিন্তু মাদকতা নেই, চোখের দৃষ্টিতে আছে অপ্রতিভ সলজ্জ আভাস, নেই কটাক্ষ—নেই মোহিনী মায়া। স্বাভাবিক কালো চোখ দুটি বেশ টানা টানা, কাজল মাখিয়ে তাকে আকর্ষণীয় করে তোলার অভ্যাস ছিলনা গায়ত্রীর। স্বভাবেও বড় নম্র, বড় ধীর গায়ত্রী। এত সুকুমার, মনে হয় সামান্য আঘাতও যেন সহ্য হবে না ওর, না দেহে না মনে।

এই গায়ত্রীরই সংস্কারের ভার নিয়েছিল জ্যোতির্ময়। সোসাইটির আর পাঁচজন মহিলা মিসেস ভরদ্বাজ, মিসেস, সাহানা, মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা মিসেস উপাধ্যায়ের সমকক্ষ করে তুলতে চেয়েছিল স্ত্রীকে। নিত্য-নূতন পার্টিতে যেতে হয়েছে গায়ত্রীকে, স্বামীর পছন্দমত শাড়ী গয়নায় নিজেকে সাজাতে হয়েছে, রকমারী প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করে চেহারার উগ্রতা আনতে হয়েছে, বিভিন্ন বয়সী নরনারীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে হয়েছে, জোড়া জোড়া চোখের সামনে বুকে ভিতরে কাঁপা হাতে প্লেট তুলতে হয়েছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে, প্রকৃতি বিরোধী এসব ব্যাপারে তার ভেতরটা কতখানি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার সামান্য আভাসও বাইরে প্রকাশ পেতে দেয়নি গায়ত্রী, প্রাণপণ চেষ্টায় স্বামীর যোগ্য স্ত্রী হিসেবে নিজেকে তৈরী করতে চেয়েছে সে। কোনদিন অনিচ্ছা জানায় নি, নিজের স্বভাবের স্বপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করেনি, পার্টিতে পিকনিকে কদমাফেসি গান গাইতে গিয়ে যখন চোখে জল আসতে চাইত, চোখে ভেসে উঠত চাঁদের-আলোয়-ভেসে যাওয়া ছাদের ওপরে শুধু তাদের দুজনের একান্ত নিজস্ব নিবিড় আদরের ছবি, তখনও কোনদিন স্বামীকে সে ইচ্ছা জানতে দেয়নি। কারণ এটা সে বুঝেছিল জ্যোতির্ময় তাকে দেখতে চায় বাইরের জগতে। বাইরে তার যত প্রশংসা হবে ততই খুশী হয়ে উঠবে জ্যোতির্ময়, ঘরের নিভৃতে তাকে নিয়ে শুয়ে থাকার কথা ভাবতে পারে না তার স্বামী। সেতারটায় ধুলো জমতে সুরু করেছিল, সেখার অভ্যাস একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল গায়ত্রী, রান্নাঘরে ঢোকা বারণ ছিল তার—সারাদিন শুয়ে বসে ঘুমিয়ে আর সাজা সজা, ছুটির দিনগুলো হৈ হৈ করে কাটিয়ে ক্রমশঃ ক্লান্তি বোধ করছিল গায়ত্রী। শরীর কৃশ হচ্ছিল দিন দিন, কোন পার্টি পিকনিক বা এন্টারটেনমেন্টে যেতে যেতে যেতে হয়ে গাড়ীর পেছনের সীটে চলে পড়লেই অনুযোগে মুখর হোত জ্যোতির্ময়—কি হোল ? শরীর খারাপ লাগছে নাকি ? তুমি বড্ড ঢোঙ, রাণী। কিছুতেই মন থেকে সায় পাও না যেন, শুধু আমার মন রাখতে রাজী হও। কেন তুমি এমন ? তোমাকে এভাবে জোর করতে আমার ভাল লাগে না, তা বোঝ ? সলজ্জভাবে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করত গায়ত্রী,—মুখে বলত—না, না, বেশ আছি আমি, খুব ভাল লাগছে আমার, তুমি বড্ড ভাবো আমার জন্যে।

ইদানিং সত্যিই তাদের শুরু করেছিল জ্যোতির্ময়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে কোথায় যেন একটা ফাঁকের সৃষ্টি হচ্ছে—এ রকম একটা সন্দেহ খুব মৃদু ভাবে তাকে নাড়া দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। কারণও ছিল অবশ্য—কোনদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখেছে গায়ত্রীর জায়গা খালি—চোখ ফেরাতে জানালার অস্পষ্টভাবে চোখে পড়েছে তাকে—সামান্য বিরক্ত হয়েছে জ্যোতির্ময়—ঘুমজড়ানো ভারী গলায় ডেকেছে—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? শোবে এসো। চমকে বিছানায় ফিরে এসেছে গায়ত্রী—অস্ফুট কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করেছে, বড্ড গরম লাগছিল, তাই—

যেদিন সন্ধ্যেবেলা একা বেরোত জ্যোতির্ময়, ফিরতে রাত বেশী হোলে বাসার কাছাকাছি এসে কানে যেত সেতারের মৃদু সুর, ফিরং বেলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে থেমে যেত তা, ঘরে এসে অনুযোগ করত গায়ত্রীকে—না খেয়ে বসে আছো তো? কি যে সব সংস্কার তোমাদের, স্বয়ং স্বামী দেবতা হুকুম দিলেও কি তার নড়চড় হয় না? খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেই পারতে, এতরাত অবধি জেগে বসে থাকার দরকার কী? একেই তো শরীরের যা হাল হয়েছে—

গায়ত্রী প্রতিবাদ করত না, স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসি ঠোঁটে লেগে থাকত আর শান্তভাবে টেবিলে রাখা খাবার সাজাতে বসত নিপুণহাতে।

এর মধ্যেই এসে পড়ল সেই দিনটি, তাদের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হোল ২৫শে অঘ্রাণ। জ্যোতির্ময়ের তেমন ইচ্ছে ছিল না কিন্তু অরুণ একেবারে মেতে উঠল তাদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী পালনে। ছোটবেলার বন্ধু, বর্তমানের সহকর্মী অসম্ভব হুজুগে, অরুণকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাই ছিল না জ্যোতির্ময়ের, গায়ত্রীর কাছে নিভৃতে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করল শুধু—অরুণটা আছে বেশ। কোথায় কার বিয়ের বছর পুরল, ছেলের অন্নদিন এগিয়ে আসছে, কে প্রমোশন পেয়ে খাওয়াল না—সব কিছুরই দায়িত্ব ওর। পারেও বাবা। আমার নাকি গুচ্ছের দুলের অর্ডার দিয়েছ। বলছিল—গত দুলপূর্ণিমায় আর কি সাজান হয়েছিল, এবার দেখিস কেমন সাজাই। তোমার জন্যে সাদা বেনারসী কিনেছে, সুব্রতকে বলেছে বুঝি—মিসেস সেনকে সাদা বেনারসীতেই সব চেয়ে সুন্দর মানবে, দেখিস। সুব্রত বলতে গিয়েছিল—জ্যোতির্ময় গাঢ় রং পছন্দ করে—তাতে বলেছে ওটা একটা সবেট, ওর রুচি পছন্দমত কাজ করতে গেলে সব মাটি হবে। বোঝ একবার, আমি সবেট, যত বুদ্ধি ওর মাথায় গিজ গিজ করছে। আরে বাবা, প্রমোশন কে পাচ্ছে বল দেখি বছর বছর সে কি অরুণ সরকার না জ্যোতির্ময় সেন? যাহাগুরু আর কাকে বলে? শুধু শুধু এক গাদা টাকার শ্রাদ্ধ! আমার নাকি জলসা বসাবে। তোমাকে বলেছে কিছু? পরেশের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল শুনলাম—কাকে কাকে আনা যায় তারই খোঁজ খবর নিচ্ছিল—তা নিক আমাকে বলতে এলে তো আমি স্রেফ না করে দেব, তুমিও যেন রাজী হোয়না। একদিন পরের ঘাড় ভেঙে ভালমন্দ খাবি, তা না হয় বুঝি কিন্তু ও সব গান-বাজনা হুজুতের কি দরকার, তাতো বুঝি না—

কিন্তু অরুণ জ্যোতির্ময়কে কিছু বলতেই আসে নি। ঘর সোর সাজান থেকে আরম্ভ করে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, জলসার আয়োজন সবই প্রায় একা করেছিল সে। সরোজবাবু সুনন্দাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, চিঠি লিখে সোক পাঠিয়েছিলেন গায়ত্রী—সকাল থেকেই আসতে লিখেছিল সে, ওঁরা রাজীও হয়েছিলেন কিন্তু সরোজবাবুর হঠাৎ একটা জরুরী মিটিং পড়ে গেল। সকালবেলা একান্ত আগ্রহ নিয়ে যখন গায়ত্রী বারান্দায় পায়চারী করছে সেই সময়েই ফোন এলো সরোজবাবুর। দুঃখিত ভাবে জানালেন তাঁর

অবস্থা, মিটিং সেরেই বেরিয়ে পড়বেন বলে আশ্বাস দিলেন, জলসার খোঁজ নিলেন, কখন বসবে আসর, কে কে আসছেন ইত্যাদি।

বিকেলবেলা অরুণের স্ত্রী অনিমা এসে গায়ত্রীকে সাজিয়ে দিল, দামী বেনারসীতে, রত্নালঙ্কার মালায়, জ্যোতির্ময়কে অনবরত-বিনয় তর্জন-গর্জন করে ধুতি-পাঞ্জাবী পরাল। জ্যোতির্ময় খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল—বেনারসীটা লাল হলেই ভাল হত—সোবার ঘরে ঢুকে আঁতকে উঠল—এ কী করেছিস রে? এত ফুল? বেল্লুতে আর দুএকটা আইটেম বাড়ালে তো পারতিস—

অরুণ ধমক দিল বন্ধুকে—চুপ কর, শুধু খাওয়ার কথা, পাগল নাকি তুই?

কথা ছিল খাওয়া-দাওয়ার পর আসর বসবে। ব্যাকে-ডিনার, প্রতিটি আইটেম্ সুনির্বাচিত, অভ্যাগতরা তৃপ্তি পেলেন খেয়ে আর প্রশংসা পেল অরুণ, তার নিখুঁত ব্যবস্থাপনার জন্য। বিগুণ উৎসাহে মাত্ত হল সে জলসার আয়োজনে।

কিন্তু এবার বাদ সাধল স্বয়ং গৃহকর্তা, জ্যোতির্ময় সেন। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে তার আপত্তি জানাল সে—এতরাত্রে আর ওসব হাঙ্গামায় দরকার নেই।

বিব্রত হোল অরুণ, অস্বস্তি বোধ করল গায়ত্রী। কয়েকজন শুধু গায়ত্রীর গান শুনতে চাইলেন, অন্যান্য অনুষ্ঠান না হয় থাক আজ, অন্য কোনদিন হবে। কিন্তু এ প্রস্তাবও এক কথায় নাকচ করল জ্যোতির্ময়। —মাপ করবেন, আজ উনি খুবই ক্লান্ত, সারাদিন যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে ওঁর, এর পর ওঁকে আর গান-বাজনার অনুরোধ করবেন না আপনারা—

কোথায় ক্লান্ত?—প্রতিবাদ করতে চাইল রুক অরুণ—উনি তো রাজী? সাইতে তো বটেই, বাজাতেও। তাখ না মেজরাণ পরে, তারটার বেঁধে তৈরী একেবারে।

জ্যোতির্ময় আরো কঠিন হোল—না, আজ আর ভাল লাগছে না। মাপ কর।

নিরুপায় অরুণ অভ্যাগত সঙ্গীত রসিকদের কাছে হাত জোড় করে মাপ চাইল। শীঘ্রী যথা আর একদিন আসর বসাবার প্রতিশ্রুতিও দিল সেই সঙ্গে। আধ ঘন্টার মধ্যেই বসবার ঘর খালি হয়ে গেল। এককোণে যন্ত্রগুলো সরিয়ে রেখে ঘরের বাতি বন্ধ করল জ্যোতির্ময়, দরজা ভেজিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলো সোবার ঘরে। বেয়ান-আলমারী খুলে ছোট হাতীর দাঁতের কৌটোটার মধ্যে আঙুলের মেজরাপ খুলে রাখছিল গায়ত্রী, ধুতি ছাড়তে ছাড়তে বিরক্ত গলায় জ্যোতির্ময় বলল—আর কেন? জামাকাপড় ছাড়ো এবার শুতে হবে তো? ইস্। ফুলের ছড়াছড়ি তাখো একবার, বিছানাটা করেছে কি? এর মধ্যে কখনো ঘুমনো যায়?

গায়ত্রী এগিয়ে এলো—আমি সরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দিদি-জামাইবাবু তো এখনও এসে পৌঁছালেন না?

ওহোঃ তাইতো!—সচকিত হোল জ্যোতির্ময়—কটা বাজলো তাখো তো? সাড়ে নটা? তাইতো! এত দেরী হবার তো কথা নয়। দেড় থেকে দু'ঘন্টা তো লাগে বড় জোর। আচ্ছা, আমি দেখছি ফোন করে, বেরিয়েছেন নাকি, হয়ত কাজের চাপে বেরোতেই পারলেন না,—

বসবার ঘরের আলো জেলে ঢুকলো জ্যোতির্ময় কিন্তু ফোন আর করতে হোল না, আর আগেই রাস্তায় পরিচিত হর্ন বেজে উঠলো—দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো জ্যোতির্ময় গায়ত্রী দুজনেই—

—সরোজবাবু ভরাট গলায় হাঁক দিলেন—কই হে, সব চুপচাপ কেন? এর মধ্যেই সব মিটে গেল নাকি?

গায়ত্রী গেট খুলে এগিয়ে এলো দ্রুত পায়ে, সুনন্দা ততক্ষণে মেয়ে দাঁড়িয়েছে মৌটুসীর হাত ধরে—গায়ত্রীকে হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল একেবারে—বড্ড দেরী গেল, তাই। ভাবনা, সাতজনে মিটিংএর নামগন্ধ নেই। আজই লগ্নবুঝে এমন মিটিং পড়ে গেল যে কলেজ থেকে ফিরতেই সাতটা বাজিয়ে। তাও এত জোরে চালিয়েছেন যে কী বলব—আমার তো রীতিমত ভয় হচ্ছিল—

ড্রয়িংরুমের চওড়া সিডানে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে দিতে আর একবার খুব অনুযোগ জানালেন সরোজবাবু—সত্যি, এটা কেমন হোল জ্যোতির্ময়? আমি এদিকে পকাশের ঘরে কাঁটা ঠেলে এসেছি। তোমার দিদি তো উ-আঁ শুরু করেছে ভয়ে, আমি এমনিতেই তো দেরী করে গেছে, যতটা পারি শুনি দিয়ে, নিদেন পীযূষ বাজনাটাও তো শুনতে পাবো। জয়-জয়ন্তী বাজাবে যখন, তখন নিশ্চয়ই শেষের দিকে বলবে, তা তোমরা সন্ধ্যে রাত্রেই সব মিটিয়ে দিলে! নাঃ যাই বল, এটা তোমরা খুব অবিচার করলে আমার ওপর। সকালবেলাতেও পীযূ যা প্রোগ্রাম বলল তাতে তো রাত দেড়টা দুটো হবার কথা। সবলে আসেন নি নাকি? কিরে পীযূ অমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস যে?

গায়ত্রী বড় সোফাটার পেছনে দাঁড়িয়েছিল মুখ নীচু করে—এবার সামান্য হাসতে চেষ্টা করে বলল—জলসা হয়নি, জামাইবাবু।

—সে কী! কেন? —চমকে সোজা হয়ে বসলেন সরোজবাবু।

সুনন্দাও বিস্মিত হোল বেশ—কেন রে? কেউ আসেন নি বুঝি?

—না, না এসেছিলেন সবাই। আচ্ছা, দিদি তোমরা বোস, আমি তোমাদের খাবার নিয়ে আসি—গায়ত্রী যেন পালাতে চাইল সরোজবাবুর চোখের সামনে থেকে।

সুনন্দাও উঠে দাঁড়াল—চল, আমিও যাই তোর সঙ্গে। দুজনে বেরিয়ে যেতেই সরোজবাবু বক্র দৃষ্টি ফেললেন জ্যোতির্ময়ের ওপর—ব্যাপার কী, ব্রাদার? ঝড়বৃষ্টির আভাস পাচ্ছি যেন?

—না, না, কি যে বলেন—সপ্রতিভ হাসল জ্যোতির্ময়—আমার বন্ধু অরুণ সব ব্যবস্থাই করেছিল। আমিই বাধা দিলাম, সারাদিন গায়ত্রীর যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে, তার ওপর আসর বসলে তো সারারাতও বিশ্রাম হোত না, ও অবশ্য ইচ্ছুক ছিল কিন্তু শরীরটা তো বিশেষ ভাল নেই, তাই—

—হুঁ, বুঝলাম—সরোজবাবুর মুখ চিন্তান্বিত—গায়ত্রীর শরীরটা সত্যিই খারাপ হয়েছে। কিন্তু কেন বল দেখি?—

—কি করে বলব বলুন? সামান্য কুণ্ঠিত হোল জ্যোতির্ময়—এমনি তো কোন অসুখতা নেই, খাচ্ছে দাচ্ছে স্বাভাবিক—তবে জানেনই তো ওর স্বভাব—এত চাপা—

—আচ্ছা, জ্যোতির্ময় একটা কথা বলব—কিছু মনে কোরনা ভাই—অবশ্য আমি জানিনা আমার ধারণা কতখানি ঠিক—তবে গত কিছুদিন থেকেই এ কথাটা আমার প্রায় মনে হচ্ছে—জ্যোতির্ময়ের উৎসুক সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করে দ্বিধা ভয় করলেন সরোজবাবু—জানো, আমার কি মনে হচ্ছে জানো? তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোথায় যেন একটা ফাঁক সৃষ্টি হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে তুমি, যে, প্রত্যেক ভাষাতেই ব্যাকরণ একে অন্যের চেয়ে আলাদা। একই ব্যবহারে কেউ সাড়া দেয় কেউ নীরব হয়ে যায়, কেউ উজ্জ্বল হয়, সুখী হয়, আবার কেউ বিরক্তিতে মলিন হয়, তাই বলছিলাম—

জ্যোতির্ময় সরোজবাবুর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে, কথাগুলো শুনছিল। মৃদু উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ছোট ছোট তরঙ্গ তুলছিল তার হৃদপিণ্ড ঘিরে—সরোজবাবু হেসেছিলেন নিঃশব্দে—রাগ কোর না ভাই।

তুমি আমার অনেক ছোট্ট তা ছাড়া তোমরা দুজনেই আমার বড় ভালবাসার জন, নীতুতো বটেই, তার চেয়ে তুমিও। দুজনেই শিক্ষিত তোমরা লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছ। আমার মনে হয় তোমাদের উচিত পরস্পরকে আরও গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করা বিশেষকরে তোমার, গায়ত্রী কি চায় একটু চেষ্টা করলেই তুমি তা জানতে পারবে। কিন্তু সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদে তা সম্ভব হবে না তাই। যে পথ তুমি নিয়েছো তাতে গায়ত্রীকে কতখানি পাচ্ছো—তা একমাত্র তুমিই জানো। কিন্তু গায়ত্রী যে বঞ্চিত হচ্ছে তোমাকে পাওয়ার ক্ষেত্রে তাতে আমি নিঃসন্দেহ। এপথে হবে না জ্যোতির্ময়—আমার নিজের স্থির বিশ্বাস তোমাদের মেলবার পথ এটা নয়।

—আপনার মতে সত্য, সঠিক পথ তবে কোনটা?—জানতে চেয়েছিল জ্যোতির্ময়।

—আমার মত জেনে কী হবে?—এবার শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন সরোজবাবু—তোমরা নিজেরা খুঁজে বের কর। অন্তর মেলাও, গানের সুরের আসন পাতো, সেতারে মীড় তোল—তাখো পথ মেলে কিনা—

ওরে তোর কোথায় গেলি সব?—হরাজ গলায় হাঁক উঠেছিল এরপর—কি আছে নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি ও জ্যোতির্ময়, তাখো না একবার, কি করছে ওরা, একেবারে অসভ্য যাচ্ছায় গেল যে—

সচকিত জ্যোতির্ময় এসেছিল ঘরজার দিকে, খোলা গলায় আবার হেসে উঠেছিলেন সরোজবাবু। পরদিন বিকেলে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আরও অনেকবার সলজ্জে হেসেছিলেন, হাসিয়েওছিলেন সকলকে কিন্তু জ্যোতির্ময় সহজ হ'তে পারেনি একবারও। সরোজবাবুর প্রতিটি হাসির শব্দ তার বুকের পাঁজরে পাঁজরে মাথা খুঁড়েছে, অনাখাদিত একটা অসহায়তা অবসন্ন করেছে তাকে।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে সরোজবাবু হাত বাড়িয়ে জ্যোতির্ময়ের বাহুতে চাপ দিয়েছিলেন—হেসে বলেছিলেন—চীয়ার আপ, ব্রাদার। আসছে বছর আমরা কেউই যাতে মিস্ না করি, তার শুরু আজ থেকেই প্রস্তুতি শুরু হোক্, কি বল? উইস্ ইউ গুড লাক—

গায়ত্রীকে বলেছিলেন—রেওয়াজ কর নিয়মিত। ওই বছর ঘুরে এসে। ভুল হলে গাঁট্টা, মনে থাকে যেন।

মনেও আছে। আজ সেই দিন, ২৪ অঘ্রাণ। এই এক বছর ধরে বড় পাষাণভারে এসেছে জ্যোতির্ময়, কত ঘর, কত সংসার, নিঃশব্দে পার হয়ে এসেছে তার হিসেব নেই। কিন্তু তার এই এগোন যে গায়ত্রীর অগোচর নয়, তার প্রমাণ গায়ত্রী নিজে। তার শরীর সেরেছে আগের চেয়ে অনেকখানি, একটা সুখী সুখী ভাবও তাকে চারিদিকে ঘিরে থাকে আজকাল, কাছে এলে তার রেশ রেণু রেণু ছড়িয়ে পড়ে জ্যোতির্ময়ের সর্বাঙ্গে ছাপিয়ে মনের মিস্তুতেও। যোগাকিত আবেগে কায়দে অকায়দে গায়ত্রীকে পাঁকড়ে ধরে সে—নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে গায়ত্রী—

দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছো, না? বাড়িতে আরও একটা যে মানুষ আছে, সে খেয়ালও থাকে না দেখছি—

মৃদু কণ্ঠ চাপা পড়ে নরম ঠোঁটে—ওর যদি জানাজানি থাকে তাহলে এখানে আসবেই না এবার, আর

যদিই বা আসে তাহলেই বা ক্ষতি কী। দেখে শুনে তৈরী হতে পারবে, ভবিষ্যতে তাকে আর ঠেকতে হবে না আমার মত—

—তুমি বুঝি ঠেকেছ? ছাড়ো, আমার লাগছে—

—লাগছে? তবে তো ছাড়তেই হয়। কিন্তু দেবী, সরোজদা কি বলেছেন মনে আছে তো?—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে। তোমাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না, যাও—বলেই ঝুঁকে হেসে সরে যায় গায়ত্রী।

চোখ ইকি তালিয়ার পাশফিরে সন্তর্পণে একটা আঙুল ছোঁয়াল জ্যোতির্ময়—নীচু হয়ে খুব মৃদুস্বরে বলল—আজ সারারাত জাগতে হবে, বুঝলি। ওরাও পাকবে অবশ্য। ওই সোলাপরাণী, রজনীগন্ধা ওরা। আজ তো সরোজদা আসছেন না, বলেই দিয়েছেন। আজকের রাত শুধু আমাদের। সরোজদাকে কিন্তু ঠিকঠাক রিপোর্ট দিতে হবে তোকে। গায়ত্রী কি বাজাবে জানিস তো? জানিস না? তবে শুনে রাখ—

তালিয়ার বুকে মুখ লুকিয়ে চুপি চুপি জ্যোতির্ময় বলল—জয়-জয়ন্তী।

ধবধবে সাদার মাঝখানে হলুদের ছাপ আলা চন্দ্রমল্লিকার গুচ্ছটাকে তুলিয়ে দিয়ে একটা প্রজাপতি উড়ে গেল, বারান্দার খোলায় অস্থির লতায় উঁকেছে।

ম্যাক্সিম গোর্কি

নবীন লেখকের প্রতি

অক্টোবর-বিপ্লবের আগে থেকেই গোর্কি তাঁর অনেকখানি সময় ব্যয় করে এসেছেন নবীন লেখকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়। তাদের লেখা উপন্যাস, গল্পের পাণ্ডুলিপি গোর্কি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন, নিজের মতামত ও সমালোচনা দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। এর একটা খুব সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন- এর উদ্দেশ্য হল শ্রমিক শ্রেণীর বীশক্তি বিকাশের কাজে সহায়তা করা।

সোভিয়েট শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও ম্যাক্সিম গোর্কি নবীন লেখকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন; সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে তাদের মনে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন; সমস্ত সংঘাত ও পারস্পরিক বিরোধিতা সহ বাস্তবের গতি-প্রকৃতিকে আর তার প্রধান প্রবণতাগুলিকে সততার সঙ্গে তাদের বুঝতে সাহায্য করতেন।

তরুণ লেখকদের গোর্কি সব সময়ে বলতেন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে, জনসাধারণের জীবনের সন্নিকট হতে, নতুন জগৎ যারা গড়ে তুলছে তাদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে। তিনি বলেছেন, "লেখকদের শুধু দর্শক, শুধুই পর্যবেক্ষক হলে চলবে না। মানুষের মনকে স্পর্শ করতে হবে লেখার মধ্যে দিয়ে, আর এই মনকে স্পর্শ করার অর্থ হল পাঠককে প্রভাবিত করা, জনগণের প্রচণ্ড শক্তির উৎসকে অবারিত করা, তাদের শ্রমশক্তিতে এক তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করা।" তরুণ লেখকদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এক নতুন মানুষের আবির্ভাবের দিকে তাদের সমস্ত আবেগগত ও বুদ্ধিগত শক্তিকে সংহত করতে।

বলা বাহুল্য, জীবনের নঞর্থক দিকগুলির প্রতি, মানব চরিত্রের কুৎসিত দিকগুলির প্রতি, গোর্কি যে চোখ বন্ধ করে থাকতেন, মোটেই তা নয়। কিন্তু সাহিত্যে শুধু সেইটেকেই বিবৃত করা সম্পর্কে তিনি বিরুৎসাহ ছিলেন, কারণ মানুষ তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সব সময়ে এক মহৎ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, সমগ্র ভাবে মানুষ সর্বদাই নতুন ও উচ্চতর মূল্যবোধ অর্জন করছে। সেই অর্থেই গোর্কির লেখার মূলাধার "নতুন মানুষের অভ্যুদয়"-এর উল্লেখ এতো বেশি ক'রে লক্ষ্য করা যায়—"এই মানুষের বিকাশের দিকে তাকিয়েই আমি মুগ্ধ হবার, বিস্মিত হবার অধিকার পেয়েছি।"

বাংলার অবহেলিত গ্রাম

আজ গ্রামের দিকে তাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের "মা যা হইয়াছেন" সেই বর্ণনা মনে পড়ে——"কালী —— অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী।" আমাদের একান্ত প্রার্থনা এই অবস্থার পরিবর্তন হউক——"মা যা ছিলেন" সেই মূর্তি আবার আমরা প্রত্যক্ষ করতে চাই——"সর্বালঙ্কার পরিভূষিতা, হাস্যময়ী, সুন্দরী • • বালার্ক—বর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্যশালিনী।"

কলকাতা বাংলা দেশ নয়; বাংলা দেশও কলকাতা নয়। বাংলা তথা ভারতের প্রকৃত পরিচয় তার হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ গ্রামে। গ্রাম আমাদের দেশের সভ্যতার ধাত্রীর গরোজী। গ্রামই আমাদের প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৃত জাদুঘর। জনশিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ——আমাদের সকল উদ্যমের গুরুতে আছে গ্রাম। তাই গ্রামকে অবহেলার অর্থ আত্মহত্যা। এই অবহেলার জন্যই আমাদের দেশ আজ মৃতপ্রায়। পৃথিবীর অন্য সভ্য দেশগুলি কিন্তু গ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সোভিয়েট রাশিয়া জানে তার শক্তির প্রকৃত উৎস কৃষক। আমেরিকার পণ্ডিত নেহেরু যখন গিয়েছিলেন তখন আইজেনহাওয়ার তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রামের বাড়িতে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি গ্রামকে গৌরবের বিষয় ব'লেই জানে। আমরাও যতদিন গ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলাম, আমাদের উন্নতি ছিলো অব্যাহত; গ্রামকে অবজ্ঞা করার পর থেকেই শুরু হলো আমাদের পতন।

তাই, আর নগরের দিকে অন্ধভাবে ছুটে যাওয়া নয়, এবার আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে গ্রামের দিকে। তার জীর্ণ পঞ্জরে আবার সঞ্চারিত করতে হবে নতুন প্রাণ। স্বাস্থ্যে, সম্পদে, সৌন্দর্যে সংস্কৃতিতে আবার সাজাতে হবে গ্রামের মানুষ আর প্রকৃতিকে। তবেই আবার আমরা বেঁচে উঠবো। এই পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে 'গল্প-ভারতী' ধারাবাহিক আকারে নিবেদন করছে বাংলার বিভিন্ন জেলার বিচিত্র গ্রামের বিস্ময়কর বিবরণ। এই বিবরণ পুঁথিগত নয়; লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত। একই উদ্দেশ্যে 'গল্প-ভারতী' শারদীয় সংখ্যায় পরিবেশন করেছে গ্রাম-বাংলার লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ: যাত্রা, কবিকতা, রামায়ণ গান, পাঁচালী, কবির লড়াই ইত্যাদি। এই ধরণের বিবরণ যত বেশি প্রকাশিত হয়, ততই মঙ্গল। গ্রামই হলো আমাদের মহাভারত; আর মহাভারতের কথা তো অমৃত সমান।

বাংলার গ্রাম ঃ তারাপীঠ ও নান্নুর

গৌরীশঙ্কর দে

পাইকোড় থেকে আবার ট্রেনে রামপুরহাট। স্টেশনে নামতেই রোদ বেশ কড়া মনে হলো। উঠে পড়লাম তারাপীঠের বাসে। ভয়ানক ভিড়। আমরা অবশ্য বসার জায়গা পেয়েছি।

এই ভিড়ের মধ্যেই একজন আবার উঠেছে রান্না-করা মাংসের পাত্র নিয়ে। বেশ বড়ো পাত্র। গামছা দিয়ে বাঁধা। পাত্র থেকে ঝোল লেগে গেলো একজন যাত্রীর কর্সা পাঞ্জাবীতে। আর যায় কোথায়! ভদ্রলোক তো রেগে আগুন। বাসের অন্য যাত্রীরাও ওই পাত্র থেকে আশু বিপদের আশঙ্কায় চাঁ চাঁ ক'রে উঠলো। পাত্রধারী একটু লজ্জিত ভাবেই বললো, "আপিসের বড়ো সাহেবের জন্য নিয়ে যাচ্ছি।"

শুনে যাত্রীরা তেলে—বেগুনে জ্ব'লে উঠলো, "নষ্টুমি করেছে তোমার বড়ো সাহেবের। তোমার বড়ো সাহেব তো আমাদের কী!"

তর্ক-বিতর্ক, কথা-কাটাকাটিতে রীতিমতো এক ঝড় উঠেছে বাসের মধ্যে। কিন্তু সব ঝড়ের মতো এই ঝড়ও এক সময় শান্ত হলো। এতক্ষণে মনে পড়লো আমরা তারাপীঠের দিকে চলেছি।

তারাপীঠ সম্পর্কে কত কথা শুনেছি। এখানে না কি অসংখ্য সুন্দরী বিধবা আছে। তাদের দিকে পাপ-চোখে তাকালে আর উপায় নেই। বাইরে অপেক্ষা ক'রে আছে পালে পালে সেয়াল, বেরিয়ে আসা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইত্যাদি কত কথা।

আগে খুবই দুর্গম ছিলো তারাপীঠ। নিতান্ত ধার্মিক যাত্রি ছাড়া কেউ নিশ্চয়ই যেতো না। অন্তত আমার মতো কোনো সৌখীন পর্যটক তো নয়ই।

দুর্গম যে ছিলো এখন তা মনেই হয় না। রামপুরহাট থেকে বাস নিয়ে সোজা থামলো তারাপীঠের সামনে। দুর্গমতা নেই ব'লেই বোধ হয় তারাপীঠ তার রহস্য হারিয়েছে অনেকখানি।

পাশেই দ্বারকা নদী। ঘোলা জলের রং সামান্য গেরুয়া। স্রোত বেশ আছে। তবু আমরা যারা পূর্ববঙ্গের লোক আমাদের চোখে এ-সব নদী, নদী বলেই মনে হয় না। নদী বলতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে পদ্মা, মেঘনা আর আড়িয়লখাঁর ছবি। দ্বারকা নদীকে তাই নিতান্ত খাল ব'লেই মনে হলো। তবু তো নদী। স্রোত আছে, জোয়ার-ভাঁটা আছে। দু-তীরে সঞ্চিত হয় নরম পলিমাটি। হোক তা সামান্য।

তারাপীঠের কাছে দ্বারকা নদীর উপরে ব্রিজ। ব্রিজ পেরিয়ে বাস এসে দাঁড়িয়েছে এপারে। বড়ো রাস্তা থেকে একটা ছোট রাস্তা গিয়ে গেছে মন্দিরের সামনে।

মন্দিরে যেতে পথে পড়ে একটা বড়ো পুকুর। নাম জীবন্তকুণ্ড। যে-সব মেয়েদের সন্তান হয়ে বাঁচে

না, তারা এই পুকুরে স্নান করলে নাকি মৃতবৎসা দোষ কেটে যায়। আগে না কি জলের আরো গুণ ছিলো। তখন এর ছোঁয়া লেগে মরা মানুষও নাকি বেঁচে উঠতো। একবার এক সওদাগর তার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন বারকা নদীপথে। বারকা নদীই কি তখন এমন ছিলো? ছিলো মজাবড়ো নদী। হঠাৎ সওদাগরের ছেলেটি মারা গেলো। সওদাগর শোকে বুক চাপড়াতে লাগলেন। এমন সময় একজন বললো জীবৎকুণ্ডের কথা। ওখানে ঘুরে গিয়ে নাকি একটা মরা মাছ জ্যান্ত হয়ে পুকুরের জলে পালিয়েছে। শুনে অবিশ্বাসী সওদাগর পুত্রের মৃতদেহ পুকুরের জলে নিক্ষেপ করলেন। কী আশ্চর্য! সঙ্গে-সঙ্গে মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারিত হলো। ছেলে চোখ খুললো।

এই কাহিনী শুনলাম তারাপীঠে দু একজনের মুখে। তারাপীঠ সম্পর্কে যে-সব বই বিক্রি হচ্ছে ওখানে, সেখানেও দেখলাম একই কাহিনী। মনে হয় পীঠের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই এই কাহিনীর সৃষ্টি।

যাক, জীবৎকুণ্ডের অলৌকিক মহিমা থাক বা না থাক, পুকুরটির জল বেশ টলটলে। দেখলেই জলে নামতে লোভ হয়। বাঁধানো ঘাটে ব্যাগ ইত্যাদি রেখে দুজনে নেমে পড়লাম জলে। স্নান ক'রে সমস্ত শরীর অসম্ভব স্নিগ্ধ লাগলো। এত ভালো লাগলো যে বলবার নয়। স্নান ক'রে এ-রকম তৃপ্তি খুব কম জায়গায় পেয়েছি।

মরুভূমির মতো রিক্ত বীরভূম। চারদিকে ধূ ধূ গেরুয়া রঙের মাটি। সবুজ ঘাস যদি বা এক আধটু থাকে তা মনে হয় যথার্থ অলংকার। তার উপরে অসহ্য উত্তাপ। এর মধ্য দিয়ে যে সব তীর্থযাত্রী একদিন আসতো, তারাপীঠে পৌঁছতে পৌঁছতে তারা নিশ্চয়ই মৃতপ্রায় হয়ে পড়তো। তখন এই স্নিগ্ধ গভীর জলাশয়ে স্নান ক'রে তারা যেন পুনর্জীবন লাভ করতো। মুহূর্তে দূর হতো পথশ্রম। তাই যদি তারা এই জলাশয়কে জীবৎকুণ্ড নাম দিয়ে থাকে এবং মন্দির সংলগ্ন হওয়ায় এর অলৌকিক মহিমা প্রচারিত হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অবশ্য এ আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

মন্দিরে যেতে বাঁ দিকে জীবৎকুণ্ড। আর ডান দিকে শ্মশান। শ্মশান তো নয়, তপোবন; এমনি নিবিড় গাছপালা, মাঝখান দিয়ে চ'লে গেছে সরু পথ। বনের ভিতরে ঢুকতে চোখে পড়ে সমাধি আর সাধুদের আশ্রম। এখানেই নাকি ছিলো সাধক বামাক্ষ্যাপার তপস্যার আসন।

এই শ্মশান সম্পর্কে কত রোমহর্ষক গল্প শুনেছি। এখন, অন্তত দিনের আলোতে সে-রকম কিছুই মনে হলো না। বনের ভিতরে বিচিত্র গাছপালা আর লতা, তাই একটু অন্ধকার অন্ধকার। পথের কাছে দুই একটা হাড় খুলি চোখে পড়লো। তার কারণও জানা গেলো একটু পরেই।

হাঁটতে-হাঁটতে দু'জনে চলে এলাম বনের শেষ প্রান্তে। সামনেই বারকা নদী। জায়গাটা এত ভালো লাগলো। মনে হলো বহুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

কিছু দূরেই নদীর ধারে একদল লোক। এরা শবযাত্রী। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজনে ব্যস্ত। ওই দিকে তাকিয়ে সব কিছু কেমন অবাস্তব মনে হলো। মনটা উদাস হয়ে গেলো। কী হবে ছুটোছুটি করে? এই তো পরিণাম। সব কিছুর শেষে চির-বিশ্রাম। এই কথাটা সর্বদা স্মরণে রাখার জন্যই কি সাধক বামাক্ষ্যাপা শ্মশানের কোলে বেছে নিয়েছিলেন তার সাধনপীঠ?

এই অঞ্চলে কাঠের ভীষণ অভাব। তাই বেশির ভাগ লোকেরই সঙ্গতি নেই মৃতদেহ সৎকারের। সেই কারণে বারকার তীরে শব সমাহিত করা হয়, সামান্য মুখাগ্নি বা সৎকারের পর। অনেক সময় তা-ও না ক'রে। শব যাত্রীরা যদি অলস বা অনিচ্ছুক হয় তাহ'লে মাত্র এক হাত দেড় হাত মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ

সেই গর্তে নামিয়ে সামান্য মাটি চাপা দিয়ে রাখে। ফলে, যা হবার তাই হয়। শবযাত্রীরা চ'লে যাবার পরেই শুরু হয় শেয়ালের কাড়াকাড়ি। সে দৃশ্য নিশ্চয়ই বীভৎস এবং ভয়াবহ। কিন্তু এই বীভৎসতা ও ভয়াবহতার জন্য শবযাত্রীরাই দায়ী; কোনো অলৌকিক বা ভৌতিক ব্যাপার নয়। আর তাই আসার সময় বনের এখানে সেখানে চোখে পড়েছে মানুষের হাড়!

বন থেকে বেরিয়ে এবার চলেছি মন্দিরের দিকে। পথ থেকে মন্দির বেশ খানিকটা উঁচুতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। প্রশস্ত সিঁড়ির দুদিকে বসেছে ছোট-ছোট দোকান সস্তা মনিহারী জিনিস ইত্যাদির। বহু লোক এসেছে পূজা দিতে। তাদের মধ্যে মহিলা যাত্রীর সংখ্যা বেশী।

মন্দিরের সামনে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের সামনে যূপকাষ্ঠ। কাঁধির ভাঁজে আছে। মাছি ভনভন করছে। কেমন একটা গন্ধ। নাটমন্দিরে অনেক বই পত্রের দোকান। তারাপীঠ ও বামাক্ষ্যাপা সম্পর্কে লেখা অনেক বই বিক্রি হচ্ছে। কম দামের, বেশি দামের। আর বিক্রি হচ্ছে মন্দির ও জীয়ৎকুণ্ডের ছোট বড়ো ফটো। আমি নিজে জীয়ৎকুণ্ডের একটা ছবি কিনে নিলাম।

মন্দিরের গায়ে সুন্দর টেরাকোটার কাজ। প্রতিমা দর্শন করা গেলো।

জীয়ৎকুণ্ডের ধারে ছোট একটি ঘরে খান তিনেক প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি। একটা মূর্তি নাকি একবার চুরি হয়েছিলো। কিন্তু এত ভারী যে বেশিদূর নিয়ে যেতে না পেরে চোর কিছু দূরেই ফেলে যায়।

তারাপীঠ থেকে বেরিয়ে, ব্রিজ পেরিয়ে এপারে এসে দাঁড়ালাম বাসের অপেক্ষায়। এমন সময় এলো বৃষ্টি বহু দূর থেকে। ঘোলা মাঠে তার ক্রম-আবির্ভাব স্পষ্ট দেখা গেলো। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো। আর, কালো অলজ্য মেঘ যেন ঝুলে পড়েছে দিগন্তবিস্তারী প্রান্তরের বুকে। আরো কুঞ্চিত আরও গেরুয়া হয়ে উঠেছে দ্বারকার স্রোত। শ্মশানের বনের গাছপালা ঝুঁয়ে পড়ছে থেকে থেকে।

কাছেই একটা নতুন বাড়ি উঠছে। আমরা আশ্রয় নিয়েছি সেখানে। আমাদের সঙ্গে অপরিচিত বহু যাত্রী ও যাত্রিনী। ওখানে দাঁড়িয়েই উপভোগ করছি বৃষ্টির অপূর্ব দৃশ্য। এ-রকম পরিবেশে এ-রকম বৃষ্টির দৃশ্য হয়তো জীবনেই আর কখনো চোখে পড়বেনা।

তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। তন্ময়তা ভাঙলো বাস এসে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে। সামান্য ভিজে দৌড়ে উঠে পড়লাম বাসে। এবারও বাসে ভিড়। বসার জায়গা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তারাপীঠ আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়নি, ভয়াবহও মনে হয়নি। মনে হয়েছে সুন্দর। সুন্দর তার প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর জন্য, পত্রঘিন ছায়ার আরামের জন্য, ক্ষীণদেহী দ্বারকার জন্য। মনে হলো বামাক্ষ্যাপা কেবল সাধকই ছিলেন না; তিনি ছিলেন কবি। না হলে এমন সুন্দর স্থান নির্বাচন সম্ভব নয়।

রামপুরহাট স্টেশন পর্যন্তও যেতে হলো না। চোখে পড়লো বোলপুরের বাস চ'লে যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে তারাপীঠের বাস থেকে নেমে উঠে পড়লাম বোলপুরের বাসে। এ যেন বিরামহীন যাত্রা।

শহর এলাকা ছাড়াবার পর বাস ছুটে চললো ঝড়ের বেগে। দুরন্ত গতিতে। অকৃত শরীর। ঝিমুচ্ছিলাম। হঠাৎ ঝিমুনি কেটে গেলো। তাকিয়ে দেখি চমৎকার দৃশ্য। এখানকার মাটি সমুদ্র-বক্ষের মতো তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ। ছোট-ছোট টিলা। গেরুয়া-মাটি। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট জলাশয়। তাতে ফুটে আছে লাল আর সাদা পদ্ম। দেবদারু বন। শাল বন। আবার গেরুয়া মাটি। মাটির ঢেউ। বাংলার এ আরেক রূপ। এ রকম দৃশ্যপট ঝুঁয়ে রেখে এক ছুটে বাস এসে দাঁড়ালো সিউড়ী শহরে। পথে পড়লো ময়ূরাক্ষী নদী। ময়ূরাক্ষীর বাঁধ। নদীর জলের রং-ও গেরুয়া।

সিউড়ীতে বাস থামলো মিনিট-দশেকের জন্য। তারপর আবার ছুট। থামলো এসে বোলপুর। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে রোমাঞ্চিত বোধ করলাম। এত কাছে এসে পড়েছি! আমি শান্তিনিকেতনে কখনো যাইনি। তাই বোধ হয় এই রোমাঞ্চ। জলপাইগুড়ি কলেজে যখন কাজ করেছি তখনও ট্রেনে যাতায়াতের পথে বোলপুর পড়েছে। সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখেছি, কখনো নামা হয় নি।

বেলা প্রায় তিনটে। সকলের খিদে পেয়েছে। খেয়ে নিলাম মহামায়া হোটেলে। এবার কোথায় যাই। শান্তিনিকেতন, না নান্নুর। ভাবলাম শান্তিনিকেতন দেখবার সুযোগ অনেক পাবো। নান্নুরেই আগে যাই। বোলপুর ফিরে এসে সময় থাকলে শান্তিনিকেতনে যাওয়া যাবে।

আবার বাস। আবার ছুট। দূরত্ব নেহাৎ কম নয়। কমলবাবু অবশ্য নান্নুরে আগে এসেছেন। আমি নবাগত।

সারি-সারি মাটির বাড়ি। প্রচুর লোকজন। নান্নুরে বেশ জনবসতি। শহরের জাঁক-জমক না থাকলেও ঘন বসতি একটি ছোট-খাটো শহরেরই মতো।

চণ্ডীদাসের আরাধিতা দেবী বাশুলীর মন্দিরে যাবো। পথে পড়লো একটি তোরণ। তোরণের পরিকল্পনা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর। তোরণ উদ্বোধন করেছেন তরুণকান্তি ঘোষ মশাই। তিনি তখন ছিলেন রাজ্যের শিল্প-মন্ত্রী।

মন্দিরে যাবার পথে চোখে পড়লো ছোট-খাটো পাহাড়ের মতো একটা ঢিবি। তার-কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা। সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। এই ঢিবির সামান্য অংশই খুঁড়ে দেখা হয়েছে। তাতেই পাওয়া গেছে গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা। তবু গোটা ঢিবিটা কেন যে আজো খুঁড়ে দেখা হয়নি বোঝা কঠিন। ঢিবির উপরে মস্ত একটা গাছের নিচে ভাঙা বিষ্ণুমূর্তি। গ্রামের লোকেরা পূজা দিতে আসে বিশেষ পরবে।

ঢিবির পরেই মন্দির। অনেকগুলি মন্দির। সব মন্দিরের বয়স অবশ্য সমান নয়। কয়েকটি মন্দির প্রাচীন। এবং তাদের গায়ে চমৎকার টেরাকোটার কাজ। বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে। মনে হলো শুধু মন্দিরের এই টেরাকোটার কাজ দেখবার জন্যই নান্নুর যাওয়া উচিত। বাশুলীর একখানা ছবি কিনলাম পুরোহিতের কাছ থেকে। আশ্চর্য প্রতিমা। অনেকটা সরস্বতী মূর্তির মতো।

মন্দির পেছনে রেখে গেলাম গ্রামের আরেক প্রান্তে। চোখে পড়লো মস্ত এক দীঘি। রামী ধোপানীর দীঘি। পাড়ে একখানা কাঠ সংরক্ষিত। এর উপরেই নাকি রামী কাপড় কাচতো।

কিংবদন্তীর কতটুকু সত্য, কতটুকু মিথ্যা জানি না। চোখে দেখে নান্নুর বেশ ভালোই লাগলো। সন্ধ্যেবেলা চা খেলাম নান্নুরের ছোট একটা দোকানে।

বাস এলো। ফিরে এলাম বোলপুর। কিন্তু শুনলাম রাত্রিবেলা শান্তিনিকেতন দেখা যাবে না। বন্ধ হয়ে গেছে। এ-যাত্রা আর শান্তিনিকেতন দেখা হলো না। দোকান থেকে দুজনে দুটো ব্যাগ কিনলাম। শ্রীনিকেতনের দুস্থ মেয়েরা হাতে তৈরী করে। প্রায় সারারাত জিরিয়ে-জিরিয়ে কাটিয়ে দিলাম শান্তিনিকেতন স্টেশনে, শান্তিনিকেতনের কাল্পনিক ছায়াঘন ছবি মনে-মনে এঁকে। ট্রেন এলো রাত তিনটায়। এবারের মতো বীরভূম ভ্রমণ শেষ।

ক্রিকেটের গল্পসল্প

জ্যোতির্ময়

পুজোর ছুটির পরেই কলকাতার মাঠে সাজ সাজ রব পড়ে যাবে। মাঠের দুধারে সাদা জিন পড়বে। মাঝে মাঝে দেখা যাবে দুধারে উইকেট। অর্থাৎ ক্রিকেট এসে যাবে।

এ বছর আবার ক্রিকেটের রাজসূয় যজ্ঞ। অসট্রেলিয়া ভারতে খেলতে আসবে। যত লোক খেলা দেখবে তার চেয়ে বেশি লোক খেলার টিকিট না পেয়ে ঘরে বসে বা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বেতারে রীলে শুনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবেন। ক্রিকেটের উন্মাদনা সে এক ভিন্ন স্বাদের বস্তু। দীর্ঘ বিলম্বিত দিনের পর দিন তার তাড়না। পাঁচ দিন ধরে টেস্ট খেলা। প্রথম দিনের অবস্থা এক রকম। দ্বিতীয় দিনে তার বিপরীত। প্রতি মুহূর্তে ঘোর অনিশ্চয়তা। হারতে হারতে জেতা। জিততে জিততে হারা! ক্রিকেট এক মহান অনিশ্চয়তার খেলা। সেই জন্যেই বোধ করি তার আবেদনও এমন হৃদস্পর্শী।

ক্রিকেটকে ঘিরে যুগে যুগে কত যে কাহিনী আর কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্রিকেটকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে। জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট সমালোচক নিভিল কারডাসের লেখায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্মের আস্বাদ পাওয়া যায়। কবিতার মতো মনোহারী তাঁর ক্রিকেট ভাষা। ভারতীয় ক্রিকেট-বীর প্রিন্স রণজিৎ সিংজীর লণ্ডনের লর্ডস মাঠে খেলা দেখে কারডাস লিখেছিলেন —

A New light from the East seemed to have pervaded the Western sky—a light hitherto unseen in the Western Horizon--a light mystic and majestic, which can not be defined.

একজন ক্রিকেটারের ব্যাটিং দেখে এমন প্রশস্তি আর শোনা যায় নি।

রণজিৎ সিংজী ছিলেন সত্যিই এক অনন্যসাধারণ ব্যাটসম্যান। তাঁর বহু কীর্তি। ইংলণ্ডের তরফে অসট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যখন তাঁকে টেস্ট দলে মনোনীত করা হোল তখন বিলাতের চারিদিকে কী সোরগোল! শেষকালে কিনা একজন কালা ভারতবাসী ইংলণ্ডের টেস্ট দলে। ইংলণ্ডের হোল কি! নির্বাচকমণ্ডলীর কী মাথার গোলমাল হোয়েছে? বাঘা বাঘা অসট্রেলিয়ান বোলারদের বিরুদ্ধে এই ভারতীয় প্রিন্স নিশ্চয়ই লোক হাসাবেন! কাউন্টি খেলায় কিছু রান করেছেন বটে। কিন্তু তাই বলে টেস্ট দলে। আরে ছ্যা ছ্যা!

নির্বাচক মণ্ডলীর মান রক্ষা করেছিলেন রণজিৎ সিংজী। ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি! এ দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী জগতের মাত্র অল্প কয়েকজন ব্যাটস্‌ম্যান!

• • • •

এই সংখ্যায় ক্রিকেটের কিছু গল্পই বলা যাক! আর রণজিৎ সিংজীকে নিয়েই শুরু হোক গল্প। একজন ব্যাটস্‌ম্যানের পক্ষে সেঞ্চুরি করা বড় অল্প সময় সাপেক্ষ নয়। লায়া দিনে পাঁচ ঘণ্টা খেলার মধ্যে অনেকেই তিনচার ঘণ্টা সময় নিয়েছেন নিজস্ব শত রান পূর্ণ করতে। অনেকে আরও বেশি! তাই একই দিনে দু' ইনিংস খেলে দু' ইনিংসএই সেঞ্চুরি! অবিশ্বাস্য ব্যাটিং বৈকি! এই অনন্যসাধারণ রেকর্ড স্থাপন করেছেন রণজিৎ সিংজী! ১৮৯৬ সালে সাসেক্স-এর তরফে ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে খেলছেন রণজিৎ সিংজী! দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে নেমে কোন রান না করে তিনি নট আউট থাকেন। ইয়র্কশায়ার রান করেছিল ৪০৭। তৃতীয় দিনে সাসেক্স-এর সকলে আউট হোয়ে গেলেন মাত্র ১৯১ রানে। তার মধ্যে রণজিৎ সিংজীর রান ১০০। নিয়ম অনুযায়ী সাসেক্স-কে ফলো অন করতে হল। দিনের শেষে সাসেক্স-এর রান উঠল ২ উইকেটে ২৬০। তার মধ্যে রণজিৎ সিংজীর নট আউট ১২৪ রান উজ্জ্বলতম ব্যাটিংএর নিদর্শন রূপে চিহ্নিত হয়ে রইল।

খুব কম সময়ের মধ্যে একশ রান করবার নজীর হিসাবে আমরা বলি, বাঃ, লোকটা কি অদ্ভুত ব্যাট করল, লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরী। অর্থাৎ ব্যাটিং শুরু করে দু'ঘণ্টার মধ্যে সেঞ্চুরি করাটাকে আমরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে মনে করি। রিপোর্টার বড় হেডিংএ রিপোর্ট ছাপেন—সেঞ্চুরি বিফোর লাঞ্চ।

অতএব যদি শোনা যায়, কোন ব্যাটসম্যান পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে সেঞ্চুরি করেছেন তাহলে তাক্ লাগে বৈকি! বহু রেকর্ডের অধিকারী পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান সার ডোনাল্ড্ জর্জ ব্র্যাডম্যান এই অবিশ্বাস্য রেকর্ডটিও করেছেন।

নিউ সাউথ ওয়েলস কাউন্টির হোয়ে খেলতেন তিনি। একটি ঘরোয়া (অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক) খেলায় লিথগো ক্লাবের বিপক্ষে তিনি রান করেছিলেন ২৫৬। এই খেলায় এক সময়ে তিনি একশ রান করেন মাত্র তিনটি ওভার খেলে। তিন ওভারে পিটিয়ে একশো রান!! বিস্ময়কর ব্যাপার। সেই খেলায় ছিল আট বলে ওভার। সেই তিনটি ওভারে ব্র্যাডম্যানের রান উঠেছিল এইভাবে :—

প্রথম ওভার : ৬, ৬, ৪, ২, ৪, ৪, ৬, ১
দ্বিতীয় ওভার : ৬, ৪, ৪, ৬, ৪, ১, ৪, ৬
তৃতীয় ওভার : ১, ৬, ১, ১, ১, ৪, ৪, ৬=১০২

• • • •

A game of glorious uncertainties, that's Cricket—অভিজ্ঞ সমালোচকের এ উক্তি যে কতখানি সত্যি, নীচের কাহিনীটি তার প্রমাণ দেবে।

বিলাতে দুই কাউন্টি দলের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক খেলা শুরু হবে—হ্যাম্পশায়ার বনাম ওয়ার উইকশায়ার। হ্যাম্পশায়ারের অধিনায়ক স্বনামধন্য ক্রিকেটার লর্ড টেনিসন টসে জয়লাভ করলেন। মাঠ তাজা সবুজ শুকনো—ব্যাটসম্যানদের স্বর্গ। কিন্তু টেনিসন সেই অনুকূল অবস্থায় ব্যাট করতে দিলেন বিপক্ষ দলকে। সবাই অবাক! টেনিসন এ কী করলেন। বিপক্ষদলের ক্যাপ্টেন ক্যালথর্প টেনিসকে বললেন—

লাগবেন, তোমার কি মাথার ঠিক নেই। কাল রাতে কী মাত্রা বেশি হোয়ে গেছে?' টেনিসন জবাব দিলেন—"বাজে কথা রেখে ব্যাট করতে যাও।"

ওয়ারউইকশায়ার ২৬৩ রান করল। তারপর হ্যাম্পশায়ার খেলতে নেমে সবাই আউট হোয়ে গেল মাত্র ১৫ রানে। মাঠের মধ্যে হৈ হৈ হিড়িকবার! হ্যাম্পশায়ারের সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে চেঁচালো—জয় টেনিসন যুগবাদ।

ড্রেসিংরুমে ক্যালথর্প এলেন টেনিসনকে সমবেদনা জানাতে!" এ ম্যাচটা তুমি ইচ্ছে করে হারলে। যাও হুলো অন করগে। খেলা খুব শিগগিরই শেষ হবে মনে হচ্ছে।"

ক্যালথর্পের উক্তির জবাবে টেনিসন বললেন—"৫০০ টাকা বাজী, আমরা জিতবো।"

ক্যালথর্প হাসলেন: "বল কি! এই ম্যাচ তোমরা জিতবে? কাল দুপুরেই তোমাদের শেষ করে দেব। তারপর শুক্রবার অর্থাৎ পরশু যাব গলফ খেলতে।"

টেনিসন বললেন—"শুক্রবার গলফ খেলতে যাবে কি এই মাঠে তোমাদের ফিলডিং করতে কালঘাম ছুটবে, তা দেখা যাবে।"

হ্যাম্পশায়ার ২০৮ রান পিছিয়ে থেকে ফলো অন করে দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১৮ রান তুললো! পরের দিন দলের প্রধান ব্যাটসম্যান মীড ২৪ রান করে আউট হোলেন। কিন্তু দমবার পাত্র নন লর্ড টেনিসন। পরবর্তী ব্যাটসম্যান রূপে খেলতে নেমে উনার বেপে ৪০ রান করলেন। ১৭৭ রানে ৬টা উইকেট পড়ে গেল। এখনো ইনিংস-এ হার এড়াতে ৩১ রান দরকার। বাকি ৪টি উইকেট। সেই ৪ উইকেটে রান উঠল ৩৪৪। অবিশ্বাস্য ব্যাটিং। প্রথম ইনিংসও যারা গোল্লা, তারাই এবার একের পর দুই গোল্লা বসাচ্ছে। অর্ধ ব্রাউন করলেন ১৭২, আর নবীন ব্যাটসম্যান লিডসে করলেন নট আউট ১১০। হ্যাম্পশায়ার দলের ইনিংস শেষ হল ৫২১ রানে।

পরের দিন ওয়ার উইকশায়ারের সবাই আউট হোয়ে গেল ১৪৮ রানে।

প্রথম ইনিংসে ২৩৩ রানের জবাবে মাত্র ১৫ রান করেও হ্যাম্পশায়ার সেই খেলায় জয়লাভ করল ১৪৪ রানে।

• • • •

আত্মবিশ্বাস সর্বক্ষেত্রেই সাফল্য লাভের প্রধান সর্ত। বিশেষ করে খেলার মাঠে এবং ক্রিকেট খেলায়! এক ঘন্টার খেলা নয়, একদিনের খেলা নয়। পর পর চার পাঁচদিন ধরে খেলা। এই দীর্ঘ সময় ধরে আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা শক্ত ব্যাপার বৈকি। উত্তেজনার মধ্যে খেলা শুরু এবং সেই অবস্থাতেই খেলা শেষ। সে এক কথা। আর একদিন খেলা শেষ হবার পর রাতে শুয়ে শুয়ে বিনিদ্র অবস্থায় পরের দিনের চিন্তা। সে অন্য কথা। কাল ঠিক মতো খেলতে পারবো তো? অনেক সময়েই এই কালকের ভাবনায় খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাসে চিড় খেয়েছে আর পরের দিনে খেলায় তিনি তাঁর খেলার জৌলুষ হারিয়েছেন। এমন ঘটনা বিরল নয়।

মনোবল আর আত্মপ্রত্যয় ক্রিকেট খেলায় খেলোয়াড়ের প্রধান সহায়। ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার ও অধিনায়ক সি, কে নাইডু খেলার সময় তাঁর সতীর্থদের কানে অহরহ এই মন্ত্রণা দিতেন—মনোবল অটুট রাখো, আত্মবিশ্বাস হারিও না।

দীর্ঘ শক্ত শরীরের মতো তাঁর মনোবল আর আত্মবিশ্বাসও ছিল তেমনি দৃঢ়। যেদিন শপথ নিয়ে

নামতেন যে আজ ভাল খেলবোই সেদিন তাঁকে আর রাখা যেতো না। অনেক সংকট মুহূর্তে আর বিশেষ বিশেষ খেলায় এই উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাসের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি।

১৯৩৩ সালে প্রথম সরকারীর সঙ্গরকারী ইংলণ্ড দল ভারত সফরে এসেছে। দলের নেতা দুর্ধর্ষ অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ক্রিকেট কর্তা তাঁকে স্বাগত জানিয়ে তার-বার্তা পাঠাচ্ছেন. মামুলী ভাষায় লেখা সব তারবার্তা! তার মধ্যে নাইডু টেলিগ্রাম পাঠালেন—অপেক্ষা করুন, শিগগিরই মোলাকাৎ হবে।

এম সি সি-র প্রথম খেলা পাঞ্জাব গভর্নরের একাদশের বিরুদ্ধে। ইঙ্গোর থেকে নাইডু খেলতে এলেন সেই ম্যাচে। এবং মাঠে নেমে প্রথম খেলাতেই প্রথম দিনে সেঞ্চুরি হাঁকালেন!

নাইডু যেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলেন, এই খেলায় ভারতীয় ব্যাটিংএর কিছু দাপট তিনি জার্ডিনকে দেখাবেন। খেলার শেষে জার্ডিনকে বলতে হয়েছিল—সার্থক তোমার স্বাগত-বার্তা।

এর আগে ১৯২৭ সালের একটি ঘটনা! আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে এম, সি, সি একাদশ ভারতে খেলতে এসেছে। বোম্বাইএর মাঠে বোম্বাই জিমখানার বিরুদ্ধে এম, সি, সি দলের মারমুখো ব্যাটসম্যান জি, এফ, আর্ল প্রচণ্ড পিটিয়ে খেলে ৮টি ওভার বাউণ্ডারি সমেত সেঞ্চুরি করলেন। বহুদিন ওরকম হুঙ্কার বহুর বোম্বাই মাঠে শোনা যায়নি! সেদিনের খেলার শেষে প্যাভিলিয়নে বসে স্বপক্ষের ও বিপক্ষের সবাই শতমুখে আর্লের প্রশংসা করতে লাগলেন। নাইডু বসেছিলেন এক পাশে, বললেন, "কাল আমাদের খেলা। কালও কিছু দেখবে তোমরা।"

পরের দিন যথাসময়ে ব্যাট হাতে নিয়ে নাইডু মাঠে নামলেন। শুরু থেকে অধীর আবেগে তিনি যেন স্পন্দমান! মার আরম্ভ হল। কী প্রচণ্ড হিটিং। ছক্কার পর ছক্কা। কোথায় মিলিয়ে গেল আগের দিনের আর্লের খেলার অভূত। ১১টি ওভার বাউণ্ডারি মারলেন নাইডু। প্রথম শ্রেণীর খেলায় এটি একটি রেকর্ড। বিদ্যুৎ গতিতে রান করলেন ১৫৮।

নিজের ওপর কতখানি বিশ্বাস আর কতখানি দৃঢ় মনোবল থাকলে বলে ক'য়ে এমন খেলা খেলা যায় তা অনুমান করতেও মনে বিস্ময় জাগে।

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ

দেবেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম প্রয়োগশিল্পী।

অধনীন্দ্রনাথ বলতেন,—আমি বাংলা থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাই না, ম্যাজিক দেখতে যাই। অবশ্য এর মধ্যে খানিকটা কৌতুককর অত্যুক্তি আছে—কিন্তু এইটুকু ব'লেই তাঁর কথা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পরে তাঁর সম্পূর্ণ উক্তি উদ্ধার ক'রে আমরা দেখাব যে, তার মধ্যে ভাববার কথাও আছে যথেষ্ট।

পিতামাতা নাট্যানুরাগী ছিলেন ব'লে আমিও শৈশব থেকেই বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলুম। তারপর ক্রমেই অভিনয় দেখাটা বদ-অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল—নির্বিচারে ভালো-মন্দ সব অভিনয়ই দর্শন করাটা হয়ে উঠল যেন নেশার মত—একচক্ষু হরিণের মত একদিকে ধাবিত হয়ে হারিয়ে ফেললুম জ্যোতিষ্পথের ঠিকানা।

সাধারণ রঙ্গালয়ের আবহ হয়ে উঠেছিল অধিকতর ভয়াবহ। একখানা কৌতুকনাট্যের [লেখকের নাম মনে নেই] অভিনয়ে দেখলুম, জনৈক রায়বাঘিনী জাতীয় স্ত্রীলোক তার অথর্ব স্বামী-বেচারাকে সম্বোধন করে এবং তার গালে ঠোনা মেরে গান ধরেছে—

'তোর যমেচণ্ডী ছিলে পিত্তি,
হাঁ কর রে বাপ!'

ওই পালারই আর একটি শীতি-কণিকা : অফিসযাত্রী কেরানীবাবুরা স্ত্রীদের সম্বোধন করে তারস্বরে এক সঙ্গে গান গাইছেন :

'তুই শালী তো করলি দেরি
আনতে গিয়ে তরকারি!'

সাহিত্যিক ও কবি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ পর্যন্ত সে যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের পরিস্থিতির ভিতরে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজের তাল হারিয়ে ফেলতেন। তাঁর 'সাবিত্রী' একখানি জনপ্রিয় ধর্মমূলক নাটক। ওরই একটি ভূমিকায় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজের মৃতাশীলা সহধর্মিনীকে গান গেয়ে বলতেন—

'তুমি লো আমার 'ম'য়েতে আকার,
আমি লো ধাছনি!'

অমৃতলাল বসুর প্রহসনগুলির কিছু কিছু অংশ যে কুবিখ্যাত হয়ে আছে তা নিতান্ত অকারণেই নয়।

ভালো অভিনয় দেখবার আশায় এ-সব অত্যাচারও সহ্য করতুম, কিন্তু গিরিশোত্তর যুগে উচ্চশ্রেণীর অভিনয়ও দুর্লভ হয়ে উঠল। তবু থিয়েটর দেখা ছাড়তে পারলুম না। দুরন্তআশা। নেশা।

অথচ সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে গিয়ে মাঝে মাঝে চমক লেগেছে। প্রখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ মাতুলানীর আত্মীয় এবং প্রায়ই আমার মাতুলালয়ে গমনাগমন করতেন। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার জানাশুনা। আমার অভিনয় দেখবার আগ্রহ দেখে একদিন তিনি তাঁর পরিবার সংশ্লিষ্ট এক নাট্যানুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন। অভিনয়ে নাটক ছিল 'বিসর্জন'। তখন আমার বালক বয়স। মঞ্চের উপরে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। রীতিমত অবাক হয়ে গেলুম। এখানে কুশীলবদের মুখে যে অনুপম কবিত্বপূর্ণ ভাষা শুনলুম, সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে কোনদিন তার তুলনা পাই নি। আজকের দিনের মঞ্চনাটকের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলতে পারে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল মঞ্চনাটকে অল্পবিস্তর সাহিত্যিক কবিত্বকে আনবার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু গিরিশচন্দ্র এদিকটা যেন সম্পূর্ণভাবেই যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়েছেন। খুব সম্ভব তাঁর মত ছিল সাহিত্যিক কবিত্ব মঞ্চনাটকের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করে—বার্ণার্ড শ' এবং আরো অনেক নাট্যবিশেষজ্ঞেরও ওই মত। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের জনপ্রিয়তার অভাব দেখে এ মত অমূলক নয় ব'লেই মনে হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো 'থ্রে-রাইটার' বা মঞ্চনাট্যকার ছিলেন না, মঞ্চের সুবিধা অসুবিধা বুঝে কোন দিনই তিনি নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নি। তিনি ছিলেন স্বাধীন নাট্যকার বা 'ড্রামাটিস্ট'। এবং সর্বোপরি তিনি যে কবি, কোন-কিছুর জন্যে লেখনী ধারণ করে এ কথাটা কোনদিন তিনি ভুলতে পারেন নি। এটা প্রমাণিত করবার জন্যে বেশী বাক্যব্যয় করবার দরকার নেই—তাঁর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কীয় সহস্র প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস—এমন কি অসংখ্য পত্রই সে প্রমাণ বহন করছে। অধিকন্তু যাঁরা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন রবীন্দ্রনাথের অতি-সাধারণ কথাবার্তা পর্যন্ত উচ্চসাহিত্যের উপযোগী হয়ে উঠত। কবিত্ব ও রবীন্দ্রনাথকে অভিন্ন বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

যে সময়ে 'বিসর্জন' দেখেছিলুম তখন আমার নাটকত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়স হয় নি। কিন্তু কবিত্ব রসসাযুর্যের দিক দিয়ে ওই নাট্যাভিনয় আমাকে একেবারে অভিভূত ক'রে দিলে। মানুষের তরুণ বয়সেই তার মনের ভিতরে ভালো করে আঁকিয়ে বসে কবির কবিত্ব।

অভিনয়ের ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা না করলেও চলবে কিন্তু সেদিনকার সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল এমন পরিচ্ছন্ন সুরুচির পরিচায়ক, যা তখনও পর্যন্ত কোন পেশাদার বাংলা থিয়েটারে গিয়ে কেউ আশা করতে পারত না। তার কারণও বোঝা কঠিন নয়। ওই অনুষ্ঠানের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন নাট্যানুরাগী অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। কলিকাতার য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট যখন সৌখিন নাট্যজগতে গৌরবের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করেছিল, তখন সেই গৌরবের কতকাংশ ছিল বিনয়েন্দ্রনাথের প্রাপ্য। তাই শিশিরকুমার ভাদুড়িকে প্রায়ই একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পথনির্দেশক বিনয়েন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করতে শুনতুম।

তখন রবীন্দ্রনাথের আর একখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক ছিল 'রাজা ও রাণী'। তখনকার দিনে লোকে যা চাইত, এখানি ছিল মঞ্চনাট্যের উপযোগী সেইরকম মেলো-ড্রামা, তাই সাহিত্যিক কাব্যরস থাকা সত্ত্বেও সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত ও জনসাধারণের দ্বারা সাদরে অভিনন্দিত হয়েছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েটারে যখন তার অভিনয় আরম্ভ হয় আমি তখন মাতৃকোলের বালিকা। কিন্তু তার গানগুলি ঘরে-বাইরে লোকের মুখেমুখে শুনে শৈশবেই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর আন্দাজ ষোলো বৎসর বয়সে ভবানীপুরের এক সৌখিন সম্প্রদায়ের দ্বারা কোরিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথমে 'রাজা ও রাণী'র অভিনয় দেখলুম এবং আবার সেই কবিত্বের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ নাটকের

ভাষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল আমার চিত্ত। সেদিনকার অভিনেতাদের মধ্যে দুইজন শিল্পী পরে যথেষ্ট নাম কিনেছিলেন। একজন হচ্ছেন তিনকড়ি চক্রবর্তি, নবযুগের সাধারণ রঙ্গালয়ও যাঁর উল্লেখযোগ্য দান থেকে বঞ্চিত হয় নি। দ্বিতীয় শিল্পী হচ্ছেন বংশী বাবু, তিনি পেশাদার থিয়েটারে যোগ দেন নি বটে, কিন্তু প্রাচীন বয়সে একাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। 'রাজা ও রাণী'র পশুরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হয়েছিল অতুলনীয়। তাঁর সেই ভাবদ্যোতক দুরন্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর আজও আমার কানে বাজে মৃদঙ্গের বোলের মত।

পরে স্টার থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নায়কতায় আবার "রাজা ও রাণী'র অভিনয় দেখেছিলুম। মোটেই ভালো লাগে নি। একমাত্র স্বর্গীয়া সুশীলাবালাই [রাণী সুমিত্রার ভূমিকায়] সেই পুনরাভিনয়ের মানরক্ষা করেছিলেন,—আর কেউ রবীন্দ্রনাথের কবিতা উচিত মত আবৃত্তি করতেই পারেন নি।

তারপর সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্প ও উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখেছি, কিন্তু সে সব হয়েছে যেন দুধের অভাবে ঘোলের ব্যবস্থা। এরই মধ্যে অল্পস্বল্প উৎরে গিয়েছিল 'বউঠাকুরাণীর হাটে'র নাট্যরূপ 'বসন্ত রায়'।

তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রশস্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করলুম এবং তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে পড়লুম। নির্বোধেরা নাকি স্বর্গের দরজায় ধাক্কা মারতেও ভয় পায় না—আমিও ভয় পেলুম না। কারুর সাহায্য না নিয়ে, একলা গিয়েই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলুম এবং প্রথম পরিচয়ের দিনেই তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাকালব্যাপী তর্কযুদ্ধ করলুম ধর্মভোচিত মুক্তি নিয়ে। তারপর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং আমি যে তাঁর স্নেহাশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত নই, তার পরিচয়ও পেয়েছিলুম বার বার। কিন্তু রবীন্দ্র-ভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভাষায়—

"তবু তরিল না চিত্ত!"

কারণ অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে আমার মন তখন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, একথা প্রায়ই শুনতুম নাট্যকলায় বিশেষজ্ঞ বহু গুণী ব্যক্তির মুখে। তাঁর একাধিক অভিনয় চিত্রও দর্শন করেছি। এই পর্যন্ত। যখন আমি যুবক, তখন তিনি কেবল গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, পদ্য লেখেন এবং বড় জোর কোন কোন সভায় কবিতা আবৃত্তি বা প্রবন্ধ পাঠ করেন—ভুলেও অভিনয়ের নাম মুখে আনেন না।

তবে হ্যাঁ, সে হচ্ছে আবৃত্তির মত আবৃত্তি। একদিন টাউন হলে তাঁর রচিত শিবাজীর উপরে এক সুদীর্ঘ কবিতার আবৃত্তি শ্রবণ করলুম—সে-রকম ভাবব্যঞ্জনার বিচিত্র আবৃত্তি তার আগে বা পরে আর কখনো শ্রবণ করবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কী সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর! তখনও মাইকে'র সাহায্যে স্বরক্ষেপণপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি, বক্তা বা গায়কদের আপন কণ্ঠের উপরেই নির্ভর করতে হ'ত। কিন্তু টাউন হলের অমন যে বিরাট হল ঘর, রবীন্দ্রনাথের চাঁচা-ছোলা উদাত্ত কণ্ঠস্বর তার প্রত্যন্ত দেশ পর্যন্ত তরঙ্গের পর তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মত গিয়ে পৌঁছতে লাগল। শব্দ এবং ভাব অনুসারে তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনও লক্ষ্য করলুম বিশেষ ভাবেই। এ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীর বিশেষত্ব। কিছুকাল পরে তাঁর নিজের কণ্ঠের গান শুনলুম। সে হচ্ছে "ভাব হ'তে রূপে অবিরাম আনাগোনা"।

একবার কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর [কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] সঙ্গে কবিকে দর্শন করতে গিয়েছি। আমি তাঁকে অভিযোগ ক'রে বললুম,—লোকের মুখে

আপনার অভিনয়ের কত সুখ্যাতিই শুনি! কিন্তু চিরদিনই আমাদের লোকের মুখের কথা হয়েই চুপ থাকতে হবে?"

রবীন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যরসাত্মক মুখে, কিন্তু গম্ভীর স্বরে কেবল বললেন,—"ধৈর্য্যাবলম্বন কর।"

তারপরেও বেশ কিছুকাল পর্য্যন্ত কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কবির সাড়া পাওয়া যায় নি। অথচ মাঝে মাঝে খবর পেতে লাগলুম, শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চে কোন কোন ভূমিকায় কবি আমার অভিনেতার কর্ত্তব্যপালন করেছেন। মনে অভিমান জাগত। কলকাতায় আমরা কি এতই ফ্যালনা? কিন্তু উপায় কি? রবীন্দ্রনাথ তখন নাট্যজগতের পুরাতন ধারা ছেড়ে নূতন ভাবের নূতন পদ্ধতিতে নাটকের পর নাটক রচনা ক'রে যাচ্ছেন, অভিনয় দর্শনে বঞ্চিত হয়ে আমরা তাদের নিয়েই উপভোগের আনন্দে মেতে উঠলুম।

তারপর এল সেই স্মরণীয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ—য়ুরোপের বুকে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের চলাবহ রক্তাক্ত কাহিনী লেখা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের বীরভূম জেলা দুর্ভিক্ষ চামুণ্ডার করালগত হয়ে দিগ্বিদিক বিদীর্ণ করছে মর্ম্মান্তিক হাহাকারে। কবির হৃদয় শান্তিনিকেতনেও অশান্ত হয়ে উঠল। দুর্ভিক্ষের পরিবর্ত্তে যতটা সম্ভব সুভিক্ষের ব্যবস্থা করবার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি চ'লে এলেন কলকাতায় এবং টিকিট বিক্রয় ক'রে টাকা তোলবার জন্যে নিজের নবরচিত গীতনাট্য 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এবং সেই সঙ্গে তাঁর ভূমিকার মত জুড়ে দিলেন 'বৈরাগ্যসাধন' নামে নাটকাকারে গ্রথিত আর একটি রচনা।

আমরা বিপুল আনন্দে স্থির করলুম এই নাট্যাভিনয়ে বটের সাজসজ্জায় কবি স্বয়ং মঞ্চের উপরে করবেন আত্মপ্রকাশ। 'বৈরাগ্যসাধনে' তিনি হবেন কবি এবং 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউল।

শুনলুম ছ-হ ক'রে টিকিট বিক্রয় হয়ে যাচ্ছে—যদিও সে যুগের হিসাবে টিকিটের দাম ছিল যথেষ্ট চড়া। পাছে শেষটা কাকে পদে অনুতাপ করতে হয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি একখানি প্রবেশপত্র কিনে ফেললুম। নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হয়ে দেখলুম, জোড়াসাঁকোর পুরাতন বাড়ির সুবৃহৎ অঙ্গনে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ঠাকুরদালানের সামনে প্রেক্ষাগার এবং মঞ্চ বাঁধা হয়েছে দক্ষিণ দিকে।

দর্শকদের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে রীতিমত অবাক হয়ে গেলুম। প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছাপ। এত উচ্চ শ্রেণীর দর্শকের জনতা তার আগে বাংলাদেশের আর কোন অভিনয়ের আসরে উপস্থিত থাকতে দেখি নি। দর্শকদের মধ্যে য়ুরোপীয় স্ত্রী-পুরুষেরও অভাব ছিল না। কিন্তু যবনিকার সামনে ব'সে তখনও আন্দাজ করতে পারি নি, যে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে আছে কি এক অভাবিত রূপকথার সজল স্বপ্ন!

যবনিকা উঠল। প্রথমেই দেখলুম রাজসভা। ভূমিকা গ্রহণ করেছেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। পরে এলেন 'কবি'—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের কোঠায়—মাথার উপরে বার্দ্ধক্যের শুভ্রতার ছাপ। কিন্তু যে কবিকে দেখলুম তিনি তো বৃদ্ধ নন—চোখের সুমুখে দেখলুম যেন যৌবনের সরসতায় অপূর্ব 'কচি ও কোমল' এবং 'রাঙ্গা'র সুকুমার প্রতীকে। ছন্দস্পন্দের প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠছে যেন তাজা তারুণ্যের চঞ্চল গতির মৌন সঙ্গীত এবং ভাবেও সেই বটের বয়োধর্ম্মের এতটুকু প্রভাব।

তারপরেই বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়—যা ছিল আমার ধৈর্য্যাতীত এবং ধারণাতীত! শুরু হ'ল 'ফাল্গুনী'র গানের পালা এবং নৃত্যসঙ্গীত! ইন্দিরা দেবীর ভাষায়:

"অবন দাদার মঞ্চ-সজ্জার কথাও উল্লেখযোগ্য। আগেকার কালের সেই বিসদৃশ বিদেশীয়ানাকে তুলে দিয়ে তার জায়গায় পিছনে একটি নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন, সেটি এখনও দেওয়া হয়। তার উপরে কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার তলায় একটি মাত্র নীল ফুলের উপরে একটি ক্ষীণ চন্দ্ররেখা।"

তারপর সেই ইঙ্গিতময় পশ্চাৎপটের সামনে আরম্ভ হল যে আশ্চর্য ও বিচিত্র নাট্যলীলা, আমার দরিদ্র ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তবে যতটা পারা যায় সে সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি আমার লেখা "সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে, যাঁদের আগ্রহ আছে পড়ে দেখতে পারেন। সেই গ্রন্থ থেকে কেবল একটু অংশ উদ্ধার করলুম :

"তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অন্ধ বাউলের ভূমিকায়। একেবারে বিপরীত ভূমিকা। প্রাচীন বাউল, দেহে যৌবনের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু বার্ধক্যও যে শ্রীমন্ত হ'তে পারে, তার দিকে তাকালে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। বাউল অন্ধ বটে, কিন্তু আত্মার মহান দৃষ্টিতে তার সৌম্যিত ভাব দীপ্যমান। হাতে একতারা নিয়ে বাউল মনোহর নাচের ভঙ্গিতে গান ধরলে—"ধীরে বন্ধু ধীরে"। সে কি হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত, রাগিনীর ঝংকারে তার কি গভীর ভাবের অভিব্যক্তি, যে কোন মুক্তিত চিত্তও তার ধ্বনির ইন্দ্রজাল মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। সেই অপূর্ব সুর-মূর্ছনীর সঙ্গে বাউলের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিগলিত হয়ে শ্রোতাদের শ্রবণ-মনের উপরে ঝরে পড়তে লাগল। কত সেরা গুণীর গান শুনেছি, কিন্তু মানসচোখে আর কারুর কণ্ঠধ্বনির মধ্য তেমনভাবে অন্তঃসঙ্গে রূপায়ণ করতে দেখি নি। এ আমার অতিবাদ নয়, সেদিনকার প্রেক্ষাগারে যে ভাগ্যবানরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই আমার কথায় সায় দিয়ে বলবেন, সঙ্গীতে তেমন রূপায়ণ ধারণাতীত। এডওয়ার্ড টমসন সেই গীতাভিনয় দেখে লিখেছিলেন :

"Not often can men have seen a stage part so piercing in its combination of fervid action with personal significance. It was almost as if Milton had acted his own Samson Agonistes."

এই উপলক্ষে স্থানান্তরে আমি যা বলেছিলুম, সেইটিই হচ্ছে আমার প্রধান কথা। বাল্যকাল থেকেই সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু মহাশিল্পের মধ্যে যথাযথ প্রয়োগ নৈপুণ্য 'ফাল্গুনী'র আগে আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

একসূত্রে বাঁধা বীণার মত এই নাট্যানুষ্ঠানটি যে অনাহত ও অপূর্ব রাগিনী ছুটিয়ে তুলেছিল, তার গৌরব পাওয়া গিয়েছিল প্রয়োগকর্তার অতুলনীয় প্রতিভার অমূল্য প্রসাদ। সেইদিন স্বচক্ষে দেখে প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম যথার্থ প্রয়োগশিল্প কাকে বলে। তার আগে এ সত্য উপলব্ধি করবার কোন উপায়ও ছিল না, কারণ আমরা ছিলুম নানাদিকে অর্থহীন ও অসঙ্গতি দোষদুষ্ট পেশাদার বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত। কাজেই এটা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, বাংলাদেশে প্রয়োগশিল্পের দিকে নাট্যরসিকদের চোখ খুলে দেন সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই। কেবল চোখ খুলে দিলেন না, তিনিই হলেন প্রথম পথপ্রদর্শক।

এই হ'ল বাংলা রঙ্গালয়ের নব রূপায়ণের প্রথম প্রচেষ্টা।

সেকালকার যে সব সৌখিন রঙ্গালয় থেকে এসেছিল আমাদের পেশাদার থিয়েটারের আদর্শ, তাদৃশ্যাভিনয় রঙ্গালয় ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের ফলে সে আদর্শ হয়ে পড়েছিল অচল। তবু শিশিরোত্তর যুগের অধঃপতিত অভিনয়ভবনের মধ্যে কোন শিল্পির মিলাতও হয় নি।

বিংশ শতাব্দীতে ঠাকুরবাড়ির নাট্য প্রতিষ্ঠানে আবার নূতন ভাবে যুগধর্ম আত্মপ্রকাশ করলে বটে কিন্তু আমাদের পেশাদার রঙ্গালয় সেদিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার মনে করলে না। এই অজ্ঞতা এবং অনাড়ম্বতা আর্টের পক্ষে মৃত্যুর মত।

তার অব্যবহিত পরের কথা আর একজন নাট্য বিশেষজ্ঞের মুখে শ্রবণ করুন। আমার যা বক্তব্য, ['গল্পভারতী'র রবীন্দ্রজয়ন্তী-সংখ্যায়] আগেই বলেছি, এবারে শুনুন 'ডাকঘর' অভিনয় সম্বন্ধে আর একজন শুধী নাট্যানুরাগীর উক্তি। 'সূত্রধার' [স্বর্গীয় অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য] লিখেছেন :

"পঁয়ষট্টি বছর ধ'রে লেখক থিয়েটার রেখে আসছেন ; আজও বিরাম নেই। তাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এতদিন ধ'রে তো থিয়েটারের সেবা কোন্ থিয়েটারের কোন্ অভিনয় তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে ? উত্তরে, তাকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে। ১৯১৭ সালে জোড়াসাঁকোতে বিচিত্রা-ভবনে 'ডাকঘরের যে অভিনয় হয়, আজ অবধি কোনো অভিনয়ই তার কাছে পৌঁছতে পারে নি। ••• এগারো রাত্রি এই অভিনয় হয়েছিল। একদিন দর্শকদের মধ্যে ছিলেন আনি বেসান্ট, বালগঙ্গাধর তিলক, লাজপৎ রায়, মদনমোহন মালবীয়, মহাত্মা গান্ধী। অভিনয় শেষ হল, মহাত্মাজী আর ওঠেন না ; স্তব্ধ হয়ে ব'সে, চোখ দিয়ে টস্‌টস্ ক'রে জল পড়ছে।"

আমার সৌভাগ্যক্রমে সে অভিনয়ের আসরেও আমি উপস্থিত ছিলুম। 'সূত্রধার' কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নি। গান্ধীজী বাংলা জানতেন না। তবু তিনি না কেঁদে থাকতে পারেন নি। প্রেম অভিনয়ের এমনি গুণ। ইংলণ্ডে গিয়ে রুশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে নানা নাট্য-সম্প্রদায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে, সাধারণ ইংরেজ দর্শকরা তাদের ভাষা বোঝে না, তবু অভিভূত হয়।

'ফাল্গুনী'তে দেখেছিলুম একরকম প্রযোগনৈপুণ্য, 'ডাকঘরে' দেখলুম প্রযোগ শিল্পীর আর একরকম প্রতিভার নিদর্শন। কিন্তু এখানেও পেশাদারদের কাছকে আদর্শের সন্ধানে উপস্থিত থাকতে দেখলুম না। সেখানে চলতে লাগল সেই পুরাতন কানুনীর পরিবেশন। এদিকে নাট্য জগতে নবযুগধর্মের বিজয়কেতন নিয়ে যেখা দিলেন যে একজন নূতন পথিকার, সে সত্য তাঁরা অনুভব করতেও পারলেন না।

• • • •

জীবনের প্রথম অধ্যায়ে শিল্পী আকাঙ্খা করেন খ্যাতি-ঐশ্বর্য, প্রেম-প্রতিপত্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ওঠেন খ্যাতির চরম শিখরে।

তারপরেই আসে অপ্রত্যাশিত নানা বিপত্তি। অন্তর্ভিমানের শিল্পী-জীবন এই খানেই হয় শেষ। আর যাঁরা মহান তাঁদের জীবনের নতুন অধ্যায় খুলে যায় ঐ ছঃখ বেদনা।

এখন তিনি আর তার নির্দেশে ছবি আঁকবেন না, এখন যার একজনকেই খুশী রাখতে হবে—সে বিধেকে—অন্তর শিল্পের উদ্ভব ঐ ছঃখবেদনা-প্রেরণা থেকে। শিল্পী রেমব্রাণ্টের জীবনী এই কথাই বলে।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুরানো দিনের কথা

পূজার মরশুমে বঙ্কিমচন্দ্রের নাটক

সে যুগ আর নেই। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন পূজোর মরশুমে একাধিক নাট্যশালায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকাবলীর পুনরভিনয় হ'ত আর প্রত্যেক থিয়েটারেই প্রতি রাত্রে হাউস ফুল বোর্ড টাঙানো থাকতো। কোন নাট্যশালায় চন্দ্রশেখর, কোনটিতে দুর্গেশনন্দিনী, কোথাও বা বিষবৃক্ষ অথবা ভ্রমর।

বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকগুলি সম্পর্কে আর একটা বড়ো করে বলবার কথা এই যে তাঁর কোন নাটক মকস্ করে কোন থিয়েটার কখনো লোকসানের মুখ দেখেনি। তাঁর চন্দ্রশেখর নাটকটি তো ছিল বাংলা থিয়েটারের লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

কর্তৃপক্ষ মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন, এ-মাসে বিক্রি এত কম যে কি ক'রে শিল্পীদের মাইনে হবে সেই চিন্তায় তাঁরা দিশাহারা। শেষ পর্যন্ত তাঁরা নাট্যাচার্য অমৃতলালের শরণাপন্ন হলেন। বাংলা থিয়েটারের প্রতি, বাংলা থিয়েটারের নটনটীদের প্রতি অমৃতলালের ছিল অগাধ ভালবাসা। শুনে বললেন, ভাবছ কেন তোমরা! চন্দ্রশেখরের স্টীমার গ্র্যাকার্ড ছাড়ো! আমার নাম দাও—নরেশ কন্‌টার, আর নরীকে ডেকে নিয়ে এসো, সে শৈবলিনীর পার্টটা করে দিয়ে যাক।

সেই ব্যবস্থাই হোল! অভিনয়ের দিন, শুধু হাউস ফুল্ নয়। অগণিত দর্শক টিকিট না পেয়ে ফিরে গেল।

এমনিই ছিল সে যুগে চন্দ্রশেখর নাটকের দুর্বার আকর্ষণ! বহু বহু বার কোন কোন থিয়েটারের অর্থ সংকটের সময় চন্দ্রশেখর নাটক সংকট মোচন করেছে।

এই সূত্রে সে-যুগে বহু রঙমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকগুলি কীভাবে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে সম্পর্কে বিগত যুগের স্বনামধন্য মঞ্চ-কর্মী ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনা এই সংখ্যায় পরিবেশিত হল। বহু রঙমঞ্চের পুরানো ঐতিহ্য সম্পর্কে যাঁরা অনিসন্ধিৎসু তাঁদের কাছে রচনাটি ভাল লাগবে আশা করি।

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের প্রভাব

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাংলার নাট্যশালার গঠনে প্রথমে দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসন যে সাহায্য করেছিল বঙ্কিমের উপন্যাস-গুলিও তার চেয়ে কিছু কম সাহায্য করেনি। গিরিশচন্দ্র নাটকার হবার আগে এবং পরেও বঙ্কিমচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করেনি।

বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্সের যুগ আনল। তখন পাঠক সম্প্রদায় এই নবরসের আস্বাদনে উৎসুক হয়ে উঠলেন। বাংলা নাট্যশালার কর্তৃপক্ষরা পাঠকদের এই আনন্দ দেখে এইসব উপন্যাস নাটকাকারে দর্শকদের সামনে জীবন্ত করে তুললেন। বাংলার নাট্যশালাতেও রোমান্সের যুগ এলো। বাংলা সাহিত্যেও যেমন বাংলা নাট্যশালাতেও তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রই এই রোমান্টিক যুগের প্রবর্তক।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগে করা যায়।

(১) রোমান্টিক,—যথা : দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী।

(২) পারিবারিক ; যথা—ইন্দিরা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল।

(৩) ঐতিহাসিক, যথা, রাজসিংহ, আনন্দমঠ।

এগুলির প্রত্যেকটিই রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে। এখনো হচ্ছে।

গিরিশচন্দ্রের গঠিত সম্প্রদায়ের অভিনেতা অভিনেত্রীরা বঙ্কিমের উপন্যাস বর্ণিত চরিত্রের অভিনয়ে বাংলার দর্শকবৃন্দকে যে রস পরিবেশন করেছেন, যাঁরা তার আস্বাদন করেছেন তাঁরা কোনদিন ভুলবেন না।

গিরিশচন্দ্রের কথা ছেড়ে দিন, মহেন্দ্রলালের 'নবকুমার', 'গোবিন্দলাল', 'নগেন্দ্রনাথ' প্রভৃতি দেখলে মনে হত যেন উপন্যাসের সেই সব নায়কের চরিত্র তাঁর জন্যেই অঙ্কিত হয়েছিল।

স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের মুখে শুনেছি, শোভাবাজার রাজবাড়িতে মহেন্দ্রলালের 'নবকুমারের' অভিনয় দেখেই তাঁর রঙ্গমঞ্চে যোগ দেবার বাসনা জাগরিত হয়। এই অভিনয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন গিরিশচন্দ্র। এই অভিনয়ের ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রের এক অসাধারণ শক্তির পরিচয় আমরা পাই। অভিনয়ের জন্যে সকলেই প্রস্তুত, এমন সময় দেখা গেল, 'কপালকুণ্ডলার' খাতাখানি নেই। বোঝা গেল, এই সম্প্রদায়কে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবার জন্যে বিপক্ষদলের কেউ সেটা নিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় খাতা আর নেই। এদিকে দর্শকে ভরে গেছে চারদিক। অথচ বই নেই। অভিনেতারা সকলেই বিপন্ন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র দমলেন না। তিনি তখনই একখানা কপালকুণ্ডলা উপন্যাস আনিয়ে বললেন, 'কোন চিন্তা নেই. আমি মুখে মুখে ছায়াটাইম করে প্রম্পট করছি, তোমরা উৎসাহ নিয়ে রে কর।'

হলও তাই। গিরিশচন্দ্র পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ মুখে মুখে ছায়াটাইম করে প্রম্পট করলেন আর তাঁর সুদক্ষ শিক্ষাদ্বারা এমনি নিপুণতার সঙ্গে অভিনয় করলেন যে দর্শকরা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম বুঝতে পারলেন না।

সুকুমারী দত্তের 'বিমলা', 'গিরিজায়ার' অভিনয় দেখে শোনা গেছে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন, 'আজ বিমলা গিরিজায়াকে জীবন্ত দেখলাম।' সুরেন অমৃতলাল মিত্রের 'চন্দ্রশেখরে' সেই ছদ্মবেশী কদম

বিলাপ, "সমাতন, আমার সংসার' যেন এখনো কানে ঝংকার তুলছে। বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীর 'মনোরমা' যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনো সে অভিনয় ভুলবেন না। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের গোবিন্দলালও কম উল্লেখযোগ্য নয়। সীতারূপে শ্রীমতী সিনকড়ির শ্রী—মৃকণাথার শিক্ষিয়ে সেই মনোমোহিনী মূর্তি আর আবেদন—'হিন্দুকে হিন্দু না রাখলে, কে রাখবে? মার মার শত্রু মার। মার শত্রু মার।'—সেই উত্তেজনাব্যঞ্জক সংলাপ ভোলবার নয়।

রঙ্গমঞ্চে এই যে বিভিন্ন রসের অভিব্যক্তি দেখবার সুযোগ আমরা পেয়েছি, তার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র, আর এই রসবিকাশের শিক্ষক ও গুরু গিরিশচন্দ্র।

অর্ধেন্দু শেখরের অভিনয়-রঙ্গ

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

[বাংলা থিয়েটারের আদিযুগে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ছিলেন এক বিরাট পুরুষ। তাঁর সমকক্ষ চৌকস অভিনেতা আর কেউ জন্মাননি। কমিক; সিরিওকমিক এবং সিরিয়স্—সর্ব রকমের অভিনয়েই তাঁর ছিল অপার দক্ষতা। অভিনয়-কলা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও ছিল যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক। তখনকার নাট্যানুরাগীরা তাঁর সম্বন্ধে বলতেন—একটুস চূড়ামণি। গিরিশচন্দ্র তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে একমাত্র যাঁকে সমীহ করতেন, তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিতেন তিনি এই অর্ধেন্দুশেখর। অভিনয় কলা ছাড়াও অর্ধেন্দুশেখরের ব্যক্তিত্বের আর একটি বিশেষত্ব ছিল, সে তাঁর রসপ্রিয়তা। থিয়েটারের বাইরে এবং মঞ্চের উপরেও তাঁর এই রসপ্রিয়তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। এই রসপ্রিয়তার মধ্যে ফুটে উঠত তাঁর বাক-চাতুরী, উত্তর-প্রত্যুত্তরের ক্ষিপ্রতা আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। অর্ধেন্দুশেখরের এই রঙ্গ-কাহিনীগুলি সংকলিত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের প্রতিলেখক অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা" বই থেকে। বইটি বাংলা ১৩৩০ সালে প্রকাশিত হয় এবং এখন আর পাওয়া যায় না। অবিনাশচন্দ্রের নিজস্ব ভাষাতেই কাহিনীগুলি পরিবেশিত হল।]

আবু হোসেন, বাবু হোসেন ও আমীর হোসেন

মিনার্ভা থিয়েটারে 'আবু হোসেন' অভিনয় দেখিতে পুলিস কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট আমীর হোসেন আসিয়া বক্সে বসিয়াছেন। আবু হোসেনবেশী অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"আজ অভিনয় হবে কি—আবুহোসেন।" মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "এই চুল দিয়েছে কে—বাবু হোসেন।" আর আজ এখানে মাননীয় দর্শককে—আমীর হোসেন। এই বলিয়া বক্সের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত অভিনেতার সুনিপুণ ভঙ্গীতে হাতযোড়ের সহিত এমন কৌশলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে অভিবাদন করিলেন যে তাহা কেবল অর্ধেন্দুশেখরই সম্ভব।

কিছু নয়—ও সো-হাঁচি

অর্দ্ধেন্দুশেখর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেই দর্শকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। তিনি অভিনয়কালে নাটক ছাড়া তাঁর মার্কিক যোগাইয়া দিয়া দর্শকগণকে হাসাইয়া অস্থির করিতেন। মাঝে মাঝে দর্শকরাও তাঁহার সহিত রঙ্গ করিতেন। একদিন তিনি অভিনয় করিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একজন দর্শক হঠাৎ হাঁচিয়া ফেলায় আর একজন দর্শক অর্দ্ধেন্দুবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবেম মা, হাঁচি পড়েছে।" অর্দ্ধেন্দুবাবু ফিরিয়া বলিলেন, "কিছু নয়, ও সো-হাঁচি, নাকে খড় আটকেছে।"

ও বেটা, তুমি ওখানে!

একদিন অর্দ্ধেন্দুবাবু কোন একটি নাটকে অভিনয় কালীন "হরে" তৃতীয়কে ডাকিতেছেন। তৃতীয়টির ভূমিকা যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে বিলম্ব হইতেছে, এ-কারণ অর্দ্ধেন্দুবাবু ক্রোধের ভাণে 'হরে', 'হরে' বলিয়া চিৎকার করিতেছেন, এমন সময় একজন দর্শক গ্যালারি হইতে রঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে যাই।" অর্দ্ধেন্দুবাবু দর্শকটির দিকে লক্ষ্য করিয়া অভিনয় ছলে বলিলেন, "ও গুখোর ব্যাটা, তুমি ওখানে গিয়ে বসে আছো?" দর্শক মণ্ডলী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাচাল দর্শকটির লজ্জায় মাথা হেঁট হইল।

Who Comes There

এবারেণ্ড থিয়েটার সম্প্রদায় একবার মফঃস্বলে অভিনয়ার্থে নৌকাযোগে যাইতেছিলেন। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় দেখা গেল, দূরে একখানা ছিপ তাঁহাদের দিকে সোঁ সোঁ করিয়া আসিতেছে। মাঝিরা সভয়ে বলিল, "হুজুর, ওরা ডাকাত, ছিপে চ'ড়ে নৌকো মেরে বেড়ায়।" সমুখে রাত্রি, তাহাতে জলপথ, আবার ডাকাত। নৌকায় যে কয়জন অভিনেতা ছিলেন তাঁহারা চিৎকার করিয়া উঠিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবুও সেই নৌকায় ছিলেন, তিনি গম্ভীর হইয়া অভিনেতাদের বলিলেন, "চ্যাচামনি, যা বলি, সিগগির কর্। নৌকায় ড্রেসের বাক্স আছে, চটপট সাহেবের আর কনষ্টেবলের পোষাকগুলো বার করে ফ্যাল্।" সৌভাগ্য-ক্রমে সেই নৌকাতেই ড্রেসের ছিল, সে তৎক্ষণাৎ পোষাক বাহির করিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুর উপদেশ মত তাঁহাকে সাহেব ও কয়েকজন অভিনেতাকে কনষ্টেবল সাজাইয়া দিল। ষ্টেজে অভিনয়ার্থে একটি নকল বন্দুক ছিল, অর্দ্ধেন্দুবাবু সেই বন্দুক হস্তে কনষ্টেবলবেশী অভিনেতাদের লইয়া নৌকায় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে ডাকাতদের ছিপও কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। সাহেববেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রকৃত ইংরাজের ন্যায় মিলিটারি কায়দায় বন্দুক তুলিয়া বলিলেন—"Who comes there?" কথাটি পুনরায় উচ্চারিত হইতে না হইতে জলদস্যুরা ইহাদের জলপুলিস ভাবিয়া ভয়বেগে ছিপ ফিরাইয়া পলায়ন করিল। বন্দুকের শব্দ হইলে নৌকার মধ্যে হাসির একটা হুল্লা পড়িয়া গেল। কয়েকমিনিটের মধ্যে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া মাঝিরা অবাক বিস্ময়ে অর্দ্ধেন্দুবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

শেয়াল কুকুরে কাঁদচে

মিনার্ভা থিয়েটারে আবুহোসেন অভিনয় হইতেছে। রক্ষিগণ আবুহোসেনকে বন্ধন করিয়া পাগলা গারদে লইয়া যাইতেছে, আবুর মাতা, "ও বাপরে, আমার কি হলরে" বলিয়া কাঁদিতেছে। কয়েকটি দর্শক রঙ্গ করিয়া এই কান্নার সুরে কাঁদিতে লাগিল। আবুহোসেনবেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু যাইতে যাইতে ফিরিয়া মাতাকে বলিলেন, "মা, আর কাঁদিস নে। তোর কান্না শুনে শেয়াল কুকুরে কাঁদছে।"

ঘুন্তকী সাহেবকা পাক্কা তামাসা

অর্ধেন্দুশেখরকে অনেকে "সাহেব" বলিয়া ডাকিতেন। কি কারণে তাঁহার এই নাম হইল তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। মূল ঘটনাটি এই :

বাগবাজারে আদি প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটার সম্প্রদায় যে সময়ে জোড়াসাঁকো ৩৮৫ নং আপার চিৎপুর রোড, মধুসূদন সান্যালের বাটীর (উপস্থিত যেখানে মহিষেদের খড়িওয়ালা বাড়ি) উঠান ভাড়া লইয়া টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণ নাট্যশালারূপে অভিনয় করিতেছিলেন, সেই সময় ডেবকার্সন নামক একজন সাহেব কলিকাতার অপেরা হাউসে তাঁহার বঙ্গাভিনয় দেখাইতেছিলেন।

'ডেবকার্সন সাহেবকা পাক্কা তামাসা' বলিয়া তিনি অভিনয় ঘোষণা করেন। তাঁহার The Bengalee Babu, Professor, The School Master প্রভৃতি বঙ্গাভিনয় দর্শনে সাহেব মহলে আমোদের তুফান বহিয়া যায়। এত ভিড় হইত যে রঙ্গালয়ে স্থান কুলাইত না। ডেবকার্সন সাহেবের এই বঙ্গাভিনয় দেখিতে এত অধিক বাঙালী দর্শক অপেরা হাউসে যাইতে লাগিল যে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের বিক্রয় কমিয়া আসিল।

তখন অর্ধেন্দুবাবু "ঘুন্তকী সাহেবকা পাক্কা তামাসা" বলিয়া ন্যাশন্যাল থিয়েটারে রঙ্গাভিনয় আরম্ভ করিলেন। ডেবকার্সন তাঁহার "বেঙ্গলীবাবু" অভিনয়ে যেমন—

I am a very good Bengalee Babu
I Keep my shop at Radha Bazar,
I live at Calcutta, eat my Dal-Vat
And smoke my hookka···

ইত্যাদি গাহিয়া বাঙালীবাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন, অর্ধেন্দুবাবুও সেই রকম সাহেব সাজিয়া গান করিতেন—

"হাম বড় সাব হ্যায় দুনিয়াসে
None can be compared হামারা সাথ।
থিয়েটর ঘুন্তকী name হামারা—
চাটগাঁও যে মেরা বিলাত।
কোর্ট পিনি, প্যাণ্টুলুন পিনি,
পিনি ছেঁড়া হ্যাটহাট,
Every two years new suit পিনি
Direct from Chandny Bazar
Dirty nigger hate হামারি
বড় মজলা আছে ছোঃ ছোঃ"—ইত্যাদি।

তাঁহার সহিত রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়া সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেহালা বাজাইতেন ও পল্‌কা নাচ নাচাইতেন।

ডেবকার্সন সাহেবের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পাল্টা জবাব পাইয়া বাঙালী দর্শকদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সেই সময় হইতে "ঘুন্তকী সাহেব" বলিয়া অর্ধেন্দুবাবুর নাম জাহির হয়।

মুষ্টি যোগ

মিনার্ভা থিয়েটারে সে সময়ে অতুলবাবুর 'শিল্পী করহাট' গীতিনাট্যের মিহাস্যাল হয়। সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী দাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহবুবের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মহবুবকে কোন একটি দৃশ্যে "হো হো" করিয়া হাসিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে হইত। দাতকড়ি বাবুর সেই হাসি প্রাণের সহিত বাহির হইত না—যেন কাঠহাসির ন্যায় বোধ হইত। তিনি নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুবাবুকে ধরিয়া বলিলেন,—"সাহেব, যাহাতে আমার হাসি প্রাণের সহিত বাহির হয়, সেইরূপ আমাকে শিখাইয়া দিতে হইবে।" অর্দ্ধেন্দুবাবু 'আজ শিখাইব, কাল শিখাইব' করিয়া বিলম্ব করিতে থাকেন। দাতকড়িবাবু প্রত্যহ অনুরোধ করিয়া শেষে হতাশ হইয়া আর তাঁহাকে কিছু বলিতেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবু দাতকড়িবাবুর বিরক্তির কারণ বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না।

বহু রঙ্গালয়ে প্রত্যেক নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আচার্য্য ও বিশিষ্ট অভিনেতাদের প্রণাম বা নমস্কার করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। শিল্পী করহাটের প্রথম অভিনয় রজনীতেও সেইরূপ সকলকে নমস্কারাদি করিলেন। কিন্তু দাতকড়িবাবু অভিমানবশত অর্দ্ধেন্দুবাবুকে নমস্কার করিলেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবু দাতকড়িবাবুর এই অভিমানের কারণ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, কোন কথা কহিলেন না।

যে সময়ে দাতকড়িবাবু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত 'হো হো হাসি' হাসিবার উপক্রম করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে সম্মুখস্থ উইংসের পার্শ্বে একটি শব্দ শুনিয়া যেমন চাহিয়াছেন,—দেখিলেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু বিনয়ের বেশে অদ্ভুত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন। দাতকড়িবাবু সেই দৃশ্য দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সেইরূপ হাসিতে হাসিতেই অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলেন। অভিনয়ও সুন্দর এবং স্বাভাবিক হইল।

উক্ত দৃশ্য অভিনয় করিয়া ভিতরে গিয়া দাতকড়িবাবু অর্দ্ধেন্দুবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "কেমন, প্রাণের হাসি শিখলি তো! বড় যে অভিমান করেছিলি?"

দাতকড়িবাবু বলেন,—"সে ছবি আমি আজ পর্য্যন্ত তুলিতে পারি নাই এবং এমন নূতন রকমের শিক্ষাও কাহারো নিকট পাই নাই।"

রোগের অবস্থা দেখিয়া কোন্ রোগীকে কিরূপ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে হইবে, গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর উভয়েই তাহা বিলক্ষণ রূপ বুঝিতেন এবং ইহাই তাঁহাদের শিক্ষাদানের বিশেষত্ব ছিল। তবে গিরিশচন্দ্র বিশেষ গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন।

নাট্য দর্শন

শ্রীশমহলে বিদ্যাসুন্দর
নতুন রূপে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের
কাহিনী : রূপে রসে সমৃদ্ধ

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। সেই প্রাচীন অলৌকিক-ধর্ম্মী কাহিনীকে নাটকাকারে গ্রথিত করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। বিদ্যাসুন্দর নাটক দেখতে গেলে অনেক অবশ্যম্ভাবী ঘটনাকে

মেনে নিতে হবে। এবং একবার সেই মন নিয়ে দেখা শুরু করলে নাটকটি সকলেরই ভাল লাগবে। যদিও কয়েকটি দৃশ্যে কিছু টানা পোড়েন আছে, যা সরলতার পরিবর্তে বিরসতার সৃষ্টি করেছে, তাহলেও সব মিলিয়ে দর্শক নাটকটির মধ্যে রস পাবেন। হাল্কা রস, মধুর রস এবং করুণ রস। কিন্তু কোথাও শালীনতার সীমা লংঘিত হয় নি। নাটকটীর প্রযোজক ভট্টাচার্য্য যথেষ্ট রসবোধ এবং সুরসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত গানগুলির কথাও অতি সুখশ্রাব্য।

পাত্রপাত্রীদের রূপসজ্জা অনবদ্য। তারী সুন্দর মানিয়েছে সবাইকে।

বেশবাসও মনোরম উজ্জ্বল। সে তুলনায় দৃশ্যসজ্জা নিষ্প্রভ। আলোক সম্পাতের কাজ উচ্চাঙ্গের। আবহ সঙ্গীত ও সঙ্গীত পরিচালনা বিশেষ প্রশংসা দাবী করতে পারে।

অভিনয়ে এই রঙ্গরসনাট্যকে সার্থকরূপ প্রাণপ্রাচুর্যে উজ্জ্বল ও অবশ্যপাঠ্য করে রাখেন যাঁরা মাল্যিকরূপে অনুশ্রী সেন। চলনে, বলনে, হাসে, নৃত্যে, গানে, ভঙ্গীতে তিনি প্রতিটি মুহূর্তকে একটি ছন্দে বেঁধেছেন এবং সেই সুর ও ছন্দ আগাগোড়া অব্যাহত রেখেছেন।

বিদ্যা ও সুন্দর রূপে যথাক্রমে শর্মিতা বিশ্বাস ও রূপক মজুমদারকে তাঁদের সুশ্রী চেহারার জন্যে মানিয়েছেও যেমন চমৎকার, অভিনয়ও তাঁরা করেছেন তেমনি যথোপযুক্ত কৃতিত্বের সঙ্গে। বিদূষকরূপে তরুণকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল অভিনয় করে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছেন। বিদ্যার সহচরী অঞ্জনারূপে নতুন শিল্পী অরুণী চট্টোপাধ্যায় আমাদের রীতিমত বিস্মিত করেছেন তাঁর সাবলীল অভিনয়ে। এঁরা ছাড়া ছোট বড় সকল শিল্পীই সুঅভিনয় করেন।

নাট্য প্রবাহ

ঐকান্তিক। কুমারটুলীর এই নাট্যসংস্থা গত ১৩ই অক্টোবর মিনার্ভা মঞ্চে শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" অভিনয় করেন। এই সংস্থার সভ্যরা সকলেই তরুণ, তাঁদের অভিজ্ঞতাও অল্প, তাই তাঁদের পক্ষে পথের দাবীর মতো এক বিরাট ও কঠিন নাটক নির্বাচন করা সাহসের কথা বৈকি। অভিনয়ের আগে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান-সভাপতি শ্রীশচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণে সেই কথাই বললেন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে পথের দাবীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, ঐকান্তিকের তরুণ সভ্যরা যে নাটক নির্বাচনে তথাকথিত জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় কোন নাটক না বেছে পথের দাবীর মতো এক বিপ্লবের সুর সমন্বিত নাটক অভিনয় করবার আয়োজন করেছেন তার মধ্যে তাঁদের বিশিষ্ট চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

নির্দেশনায় গোরাচাঁদ গোস্বামী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন, প্রদ্যোত বসাক (সব্যসাচী) দীপক চক্রবর্তী (কবি), অমল ভট্টাচার্য (তেওয়ারী), গোবিন্দ গোস্বামী (ওলওয়ারকর), উমাশংকর রায় (নিমাই দারোগা), খোকন দাস (অপূর্ব), অমলেশ সরকার (রাজেন্দ্র), শংকর ঠাকুর (খেমদত), মল্লিকা দাস (সুমিত্রা), আলো মজুমদার (ভারতী), মীনা দাস (নবতারা)। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন, নিমাই রায়, পুলক কুণ্ডু, শংকরেশ্বু দাস, নন্দ মজুমদার, নিমাই শেঠ, প্রকাশ দে, প্রদীপ কুণ্ডু, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিনয় মোটামুটি ভালই হয়েছে। শিল্পীদের ঐকান্তিকতা ও যত্নগত প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

চলোর্মি। রাজেন্দ্রলালা স্ট্রীটস্থ চলোর্মি সংঘ সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে এবং শ্রীকল্যাণ চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় কাশী বিশ্বনাথ প্রেক্ষাগৃহে সম্প্রতি বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উপলক্ষে কবি

মুকাভ ভট্টাচার্য্যের কাব্যনাটিকা 'অভিযান' এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন সুসাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)।

শ্রীঅমুপতি মুখোপাধ্যায়ের নাট্য পরিচালনায় ব্রহ্মজ্যোতি, রুকেশু, অরুণ, অর্ঘেন্দু, চঞ্চল, কল্প, তাপস, প্রণয়, সন্দীপ, অভীন্দ্র, চন্দ্রচূড়, পারস্থ, অম্বিকা প্রমুখ শিল্পীরা 'অভিযান' অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

'ভাষা' নৃত্যনাট্যের সার্থক রূপায়ণের জন্য শিল্পীরা সমাগত সকলের সমাদর অভিনন্দন পেয়েছেন।

এই উৎসব অনুষ্ঠানে ঘোষণার দায়িত্ব পালন করেন শ্রীসুমিত্রা দাস।

জামসেদপুরে নাট্যচর্চা
আরও কয়েকটি সংস্থার পরিচয়

(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

মিলনী : ১৯১৪ সাল, সে আজ পঞ্চান্ন বছর আগের কথা। এর কিছুদিন আগে ১৯০৮ সালে টাটা ইস্পাত কারখানা তৈরী হোয়েছে। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর ডাঃ শক্তিরাম চক্রবর্তী টাটা কোম্পানীর প্রথম এবং প্রধান চিকিৎসক। কর্মীদের অসুস্থ দেহের ও চিকিৎসার ভার ও দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত। কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর কর্মীদের মাত্র দেহের ভারই অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু কর্মীদের মনের ভার? তিনি স্বেচ্ছায় সে ভার তুলে নিলেন। তিনি বুঝেছিলেন—কঠোর পরিশ্রমের পর কর্মীদের জন্য কোন আমোদ-প্রমোদের যদি ব্যবস্থা না করা যায় তো তাদের কর্মে কোন উৎসাহ আসবে না, জীবনে একঘেয়েমি আসবে আর যাবে শুকিয়ে মন। তাই তাদের মনকে সঞ্জীবিত কোরে তোলবার জন্য তিনি আরও কয়েকজন কর্মীর সহায়তায় গড়ে তুললেন "সাকচি ড্রামাটিক ক্লাব।" তাঁরা প্রথম অভিনয় করলেন 'প্রফুল্ল' ও 'আবুহোসেন'। এই ভাবে বেশ ক'বছর চলবার পর আর দুটী স্থানীয় সংস্থা "উড়িষ্যা ড্রামাটিক ক্লাব ও সারস্বত সম্মেলনীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে নতুন নামকরণ হল "মিলনী" এবং অভিনয় করেন 'কণ্ঠহার'। অসংখ্য নাটক অভিনয় করেছেন এঁরা। বিষ্টুপুরে এঁরা নিজস্ব মঞ্চ স্থাপন করেন ১৯২১। জামসেদপুরে "মিলনী"ই হোচ্ছে প্রাচীনতম নাট্য সংস্থা। প্রথম দিকে মাত্র পুরুষেরাই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। অধুনা স্ত্রী-পুরুষের যুগ্ম প্রচেষ্টাতেই অভিনয় হয়। নাট্যাভিনয় ছাড়াও দেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত ও নৃত্য বিশারদেরা মিলনী মঞ্চ হোতে জামসেদপুরবাসীদের তৃপ্তিদান করেছেন—যেমন সরোদে আলি আকবর, নৃত্যলীলায় ইন্দ্রাণী রহমান। প্রতি বৎসর "মিলনী", অন্যান্য সঙ্গীত-সংস্থার সম্মিলিত প্রয়াসে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। কিছু দিন আগেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' পরিবেশন করেন। সম্প্রতি অতীত দিনের অভিনেতাদের সম্মিলনে স্মারক-অভিনয় পর্যায়ে কর্ণার্জুন অভিনীত হয়। গত ১৯৬৪ সালে সাড়ম্বরে তাঁরা "সুবর্ণ-জয়ন্তী" পালন করেন।

নিউ সিদগোড়া মহিলা সমিতি : পল্লীর কয়েকজন মহিলার চেষ্টায় ১৯৪৬ সালে এই মহিলা-সমিতির জন্ম হয়। ১৯৬৩ সালে ইহা সর্বভারতীয় মহিলা সমিতি (A. I. W. E) শাখা হিসাবে গণ্য হয়। পল্লীর শিক্ষার উন্নতির জন্য এই মহিলা-সমিতির অবদান অতুলনীয়। ১৯৬৪ সালে বিশ্বভারতীর লোক শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। শিক্ষা প্রসার ছাড়াও এঁরা প্রতিবৎসর রবীন্দ্র-জন্ম জয়ন্তী ও সম্বাবর্তন উৎসব উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিসার, নটীর-পূজা, বিসর্জন, রক্ত-করবী এবং তপতী প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ের দ্বারা এঁরা রসিক-জন-মনকে আনন্দ দান করেছেন। এই বৎসর বার্ষিক উৎসব বিশ্বভারতী লোক শিক্ষা'র সম্বাবর্তন উপলক্ষে শেষ-রক্ষা নাটক মঞ্চস্থ করেন।

পুরোনো দিনের কথা

হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

নাটোরের আভিজাত্য তুলনীয় ছিলো ঐ রাজশাহী জেলারই আহিলাড়ের সঙ্গে। ভোড়াগাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও হরিপুর চৌধুরীবাড়ি থেকেও তাঁরা কিছু পাশ্চাত্য কিছু ব্রাহ্ম আবার কিছু দেশীয় নূতনতর ভাবও পেয়েছিলেন। নাটোর তথা রাজশাহীর ঐতিহ্য—অতিথিকে মুগ্ধ, বিস্মিত করা, নাম যশ অর্জন। বাবার লক্ষ্য—ক্রিকেট খেলা, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা, কুটির শিল্প চর্চা, উদ্যান রচনা ও সঙ্গীত শাস্ত্র চর্চা। এস্রাজ বাজানো, শেখানো, পাখোয়াজ বাজানো, গুরুক প্রতিষ্ঠা, অভিনয় শিক্ষাদান ইত্যাদি। সামাজিকতার দিকে তেমন লক্ষ্য ছিলোনা। মা তো পুরাণ্ড পুরাণতন্ত্রাদি পাঠ, অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সংবাদ বিনিময় এই সব নিয়েই থাকতেন। আশ্রিত, প্রজা, দীন দরিদ্র এঁদের কথা ভাবতেন এবং সীমিত, মৃদু শক্তিতে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। বাড়ির সংসারে মহিলাদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চা চলতো, যন্ত্রসঙ্গীতের সংসার গান দুই। পড়াশুনা দুই। নিয়মনীয়। অবশ্য যাত্রাগান, চণ্ড, কীর্তন, কথকথা মাঝে মাঝে শুনেছি সেখানেও কিন্তু ঘরোয়া গান নিষিদ্ধ। আচার বিচার রক্ষণশীলতা সেখানেই ছিলো বেশি। মা নিষ্ঠাবতী আচারপরায়না ছিলেন, কিন্তু তাঁর খৃষ্টান, ব্রাহ্ম ও মুসলমান মহিলাদের সঙ্গে আলাপ ছিলো। তাঁরা এসে চলে গেলে মা আবশ্যকীয় শুদ্ধি বিধান করতেন। একদিন জনৈকা মহিলা এলো মা তাঁকে বাইরে রোয়াকে চেয়ার দিয়ে নিজে মাটিতে বসলেন। মহিলা বল্লেন মা তাকে ঘরে বসতে না দিয়ে অপমান করেছেন। মা বল্লেন মুক্ত আকাশের নীচে উচ্চাসনে বসিয়ে মা তাঁকে সম্মানই দিয়েছেন। যিনি যে সমাজের অন্তর্গত, তাঁর পক্ষে সেই সমাজের বিধি নিষেধ মেনে চলা উচিত, এই ছিলো মায়ের বক্তব্য। অনেকের অনেক ঘরোয়া বিবাদ মা মিটিয়ে দিতেন, প্রয়োজনে শাস্তিও দিতেন অনেককে। অসচ্চরিত্রতার শাস্তি স্বরূপ মা এক স্ত্রীলোকের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বাপের বাড়ি দিলেন পাঠিয়ে পরবর্তীকালে বাবাও এক ব্রাহ্মণ যুবকের অর্ধেক চুল ও অর্ধেক গোঁফ দাড়ি কামাতে বাধ্য করেছিলেন। সে লজ্জায় একমাস মাথায় মুখে কাপড় জড়িয়ে পড়ে থাকতো। ঘর থেকে বেরোতনা।

১৩২০ সালের বৈশাখে তরীর দ্বিতকন্যার জন্ম। ১৩২০ সালের কার্তিকে শ্রীশ্রীমাকে গৌরীপুরে নিয়ে যাওয়া হয় বাবার ইচ্ছাক্রমে। ঐ সময় মায়ের ইচ্ছায় আমার শ্রীহরিনাম গ্রহণ। নাটোর দাব ভিভিশনের রাজুরভাগ গ্রামে অদ্বৈত বংশ পাবার গোস্বামী বংশে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গোস্বামীর তিন কন্যা, একপুত্র। ১২৭৮ সালে আশ্বিন মাসে মধ্যমা কন্যারূপে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আবির্ভাব। পূর্বনাম শ্রীকীরদা সুন্দরী দেবী। বর্তমান নাম শ্রীশ্রীমাই কিশোরী দেবী। সাধারণে শ্রীশ্রীসারদামাতা দেবী নামেই পরিচিতা। এঁরই কনিষ্ঠা কন্যা

ছিলেন আমাদের বৌ ঠাকুরাণী ৺প্রাণদা সুন্দরী দেবী। (আমার জননীর পিসতুতো ভগিনী) শ্রীশ্রীমার জন্মদিনে শুনেছি নহবৎ বসেছিল। তিনি পিতার বিশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন। তাঁর আবদার চলতো, স্বাধীনতা ছিল। প্রতিবেশীর সমালোচনা তাঁরা তুচ্ছ করতেন। গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলালজীর অতিথি শালার সমাগত সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে বসে তিনি তীর্থের কথা, ধর্ম্মের কথা শুনতেন, তাঁদের দেখাদেখি তাঁদের সঙ্গে সেতার বাজিয়ে ভজন গাইতেন। তাঁর বাল্যলীলা এই রূপই ছিল। যথাসময়ে তাঁর বিবাহ হয়। রাজসাহী পুঁটিয়া রাজার জ্ঞাতি চৌপুখুরিয়ার রাজা শ্রীকালীনারায়ণ ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ হয়। রাজার অন্য দুই ভাই শশীনারায়ণ ও বিষ্ণুনারায়ণ। শেষোক্তজন সাধু হয়ে গৃহত্যাগ করেন। শশীনারায়ণ জন সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। রাজামহাশয় কুলদেবতা শ্রীশ্রীগোপালদেবের আরাধক হয়েও তান্ত্রিক নায়িকা সাধনা করতেন। তাঁর দুই পত্নী বিয়োগের পর এটি তৃতীয়পক্ষ। কিন্তু এঁর সঙ্গে তিনি দাম্পত্য সম্পর্ক তেমন রাখতে পারেননি ইষ্টদেবী নায়িকার প্রতি আনুগত্য থাকায়। এই সুযোগ শ্রীশ্রীমা ধর্ম্মাচরণের সুবিধা পেতেন। রাজামহাশয়ের গ্রন্থাগারে সংস্কৃত বাংলা অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ সঞ্চিত। পণ্ডিত মহাশয় পড়াতে আসতেন। সারারাত্রি জেগে মোমবাতির আলোকে শ্রীশ্রীমা একা একা ঐসব আলমারীর পুস্তক পাঠ করতেন। পরে রাজা মহাশয় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন। রাজসাহী, রামপুর বোয়ালিয়া তখন স্বাধীন জমিদারদের সংস্কৃত ক্ষেত্র। লোকেন পালিত তখন জেলাশাসক। ক্ষেপ চন্দ্র সেনের প্রভাবে তখন রাজসাহী ব্রাহ্মভাবাপন্ন। জমিদারগণ প্রগতি সম্পন্ন। অবরোধপ্রথা প্রত্যাহার, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা ও অন্যান্য নানা বিষয়ে আন্দোলন চলছে। পার্টি, সভা, বিভিন্ন উপলক্ষে জন সমাবেশ চলছে। অনেক স্বামী আপন পত্নীকে সেই সব সভায় যোগদানে বাধ্য করছেন। পর্দা প্রথার পরিবর্ত্তে এরূপ স্ত্রী স্বাধীনতা রক্ষণশীলেরা পছন্দ করছেননা এসবও নিয়ে খুব সামাজিক আন্দোলন আলোচনা চলছে। রাজামহাশয়ের জন্য শ্রীশ্রীমাকেও এসবের মধ্যে যোগদান করতে হোতো। তিনি নীর ক্ষীর ন্যায়ে সব বিষয়ের ভালোটুকু নিতেন, মন্দটুকু ত্যাগ করতেন এবং সব জিনিষ পরীক্ষা করে দেখতেন। এ ব্যাপারেও তাঁর একদল নিন্দুক জুটেছিল। ইতিমধ্যে ভগ্নী প্রাণদাসুন্দরীর (বৌঠাকুরাণী) স্বামী হৃষিকেশ সান্যালের মৃত্যু। তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র সান্যাল বিধবা পুত্রবধূকে দ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ধাত্রী বিদ্যায় শিক্ষিতা করে তুলতে চান। বনতোষিনী নামক ধাত্রী পুত্রবধূকে ইতিমধ্যে সেলাই, বোনা ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত শেখাতে আসেন। দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্র 'পিসিমার' সংলালিত। শ্রীশ্রীমা নানা কৌশলে ভগ্নীকে শ্বশুরালয় থেকে সরিয়ে আনেন। জ্ঞানেন্দ্রকেও আনা হয়। কিছুদিন বাপুর ভাগে থাকার পর নিরাপত্তার জন্য পুত্র সহ প্রাণদা দেবী গৌরীপুরে মাসশাশুড়ীর (আমার মা) কাছে এসে কয়েক বৎসর থাকেন। পরে জ্ঞানেন্দ্র ডেভনরে বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনা করেন। পরে কলিকাতায় এসে থেকে বি এ পাশ করেন। পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন। শ্রীশ্রীমা বৈষয়িক দুর্যোগে রাজমহাশয় সহ কিছুদিন নিজ পিত্রালয় বাপুর ভাগে থাকেন। বৈধব্য অবস্থার পর তিনি বিষয়াশয় ত্যাগ করে জিয়াগঞ্জ বালুচরে গঙ্গাবাস করতে যান। সেখানে জনৈকা ভক্তিমতী মা গোস্বামিনীর নিকট যুগলমন্ত্রে দীক্ষিতা হয়ে ভজন সাধন করেন। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর ভাবে ধর্ম্মালোচনা ও সাধু সেবা করতেন। ননদের মাতৃপিতৃহীন দুটি বালক এবং নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বিভূতি ভূষণকে কাছে রেখে লালন পালন করেন। জিয়াগঞ্জে নিজস্ব বাড়ি কিনে কিছুদিন বাস করেন, পরে ঐ বাড়ি বিক্রী করে কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করেন। জিয়াগঞ্জ থাকাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের

সাক্ষাৎলাভ এবং তারপরেই জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়। একদিন রাত্রে তিনি জপ সাধনার্থ গঙ্গাতীরে গিয়েছেন ফিরে এসে দেখেন ঘর জনশূন্য। সর্বস্ব অপহৃত। এই অবস্থায় গৌরীপুরের মুকিয়াহাটের বাসার ভগ্নী প্রাণবন্ধু সুন্দরীর কাছে আসেন। পূর্বে পূর্বাভিষেক ও সন্ন্যাস গ্রহণ সত্ত্বেও তা গোপন ছিল। এখন প্রকাশ্য বৈষ্ণবিক ধারণ করেন এবং শ্রীশ্রীনাথুমাতা দেবী নামে পরিচিতা হলেন। ইতিপূর্বে আত্মীয়া হিসাবেই আমাদের কাছে তিনি এসেছেন। আমার ভাগ্নীর কঠিন ব্যাধি তিনি তান্ত্রিক সাধনাদ্বারা সরিয়ে তোলায় মা ও ভগ্নী তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। ১৩২১ আশ্বিনে অসুস্থা মা যাচ্ছেন নিজ বিবাহের ছাব্বিশ বৎসর পরে জন্মভূমি দর্শনে কাশীধামে, মৈহাটীতে একবেলা থেকে ট্রেন বদল হবে। মায়ের চেষ্টায় মৈহাটিতে গুরুস্থানী প্রমীলা দিদির বাড়িতে শ্রীশ্রীমার কাছে আমার দীক্ষা গ্রহণ। আমি সংসার ধর্মের যোগ্যা ছিলাম না, কোনো দায়িত্ব নেবারই যোগ্যতা নাই আমার।...কাশীধামে আমরা ছিলাম পীতাম্বর পুরায় মায়ের নিজ জন্ম ভিটার কেদার ঘাট রোডে। আমার পুত্র তখন ছিল মদন পুরায়। তিনি শাশুড়ীর মৃত্যুর পর শ্বশ্রূমাতার শেষ জীবন দুঃখে শোকে এখানেই অতিবাহিত হয়েছিল।

স্বর্ণমাসি ও তাঁর মা আমার পুত্রকে দেখাশোনা করতেন। একদিন স্বর্ণমাসি পুত্রকে এনেছিল আমাকে দেখাতে। পাছে দুর্বল হই, এই ভয়ে দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম। পরে ভগ্নী এসে দরজা খুলে পুত্রকে কোলে বসিয়ে দিল। কিন্তু তখন মনোভাব অন্যরকম, তখন বৈরাগ্যভাব। কাষ্ঠ পুত্তলির মতোই ছিলাম। কাশীতে আসবার কিছু আগে আমার ভাইয়ের উপনয়ন উপলক্ষে অতি অল্পদিনের জন্য পেষবার ঠাকুরমা গৌরীপুরে এলেন। ফিরে যাবার অল্পদিন পরেই দেওঘরে তাঁর দেহান্ত ঘটে। মা শোকাতুরা। আশ্চর্য। ঠাকুরমাকে এত ভালোবাসতাম, আমার মন কেন পাষাণ হোলো, চোখে কেন জল এলো না! পূর্বভাবোধ হোলো। মা কাশীতে এলেন আমাদের নিয়ে, তিনি আর ফেরেন নি গৌরীপুরে। শীতের প্রথমে 'হেমগৌরাঙ্গ' এলেন আমার ঘরে। প্রথমে একটি যুগল মূর্তি আনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ সীসার শ্যামবর্ণ। শ্রীমতী পিতলের, স্বর্ণ বর্ণা। অবশ্য অষ্টধাতু বিগ্রহ। কয়েকদিন পরে চপল স্বভাববশতঃ ঠাকুর পছন্দ না হওয়ায় ফেরৎ দিই। সন্ধ্যাকালে কর্মচারীসহ নিজে চাদনীচকে যাই, গিয়েই দেখি একটি অষ্টধাতুর স্বর্ণবর্ণ শ্রীযুগল। কিন্তু শ্রীমতীটি শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপা নয়। আমার হাতে বেশি টাকা না থাকায় ১১ সের ওজনের শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিটি শুধু ৩৮৲ দিয়ে কিনে নিয়ে এলাম। ঠাকুর কোলে করে বাড়ি এলাম। ঐ বাড়ি আমার শ্বশুরমহের। মায়ের যে ঘরে জন্ম, সেই ঘরে ঠাকুর এনে মাটিতে ঠক করে বসালাম, ঘরের মেজের একটু চটা উঠে গেল। মা বলেন, একী বিগ্রহ এনেছিস? ইনি যে এসেই আমার ঘর ভেঙে দিলেন।" আমি বললাম, তুমি যখন এঁকে বিগ্রহ ঘরে, তখন ইনি তাই। এঁর নাম থাক্ হেম-গৌরাঙ্গ। সেবা জানতাম না, নিজে করিওনি বড় একটা। ভগ্নী বসন্তবালা রাত ৪টায় উঠে নিত্যকৃত্য ও গঙ্গাস্নানান্তে সেবা পূজা করতেন। আমি শুধু খেলার সাথী হিসাবে দেখতাম। হেম গৌরাঙ্গকে নিয়ে গরমকালের রাত্রে ছাদে মাদুর পেতে শুয়েছি। ঠাকুর নিয়েই দেওঘর গেলাম কাকাবাবুর বাড়িতে। রেলগাড়িতে তাঁকে পথের দৃশ্য দেখাতে দেখাতে নিয়ে গিয়েছি। দেওঘরের মাঠে পথে কোলে করে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছি। তখনো পায়ে প্রণাম পর্যন্ত করিনি। সন্ধ্যাবেলায় একটি ছোট চামচেতে ঘৃত সিক্ত হাতে পাকানো তুলার সুতায় প্রদীপ জেলে মুখের সামনে নেড়ে আরতি করেছি। দেওঘর থেকে ফেরার পথে ষোলের পূর্বদিন শ্রীশ্রীনাথুমাতার বেলুড় আশ্রমে খোপনে প্রথম যাই। ঠাকুরের সাজ-সজ্জা জানতাম না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন "মেয়ে কাশী থেকে একটি ভক্তা এনেছে।" পরদিন মুকিয়া হাটের বাসায় ঠাকুরকে আনীত হলাম। বাবা

নিজেও আনাতে এসে তাঁকে আশীর্ষ দিয়ে গেলেন। (যাবা শাক আমিষাশী) আমার সঙ্গে কাশীতে গেলাম।

১৩২২ সালের প্রথমে মামাবাবু (মায়ের মাসতুতো বড় ভাই) ৺কৈলাসচন্দ্র বসু ও তাঁর পরিবার-বর্গসহ পুরীতে যাই। প্রথমে 'বটমহল' নামে একটি বাড়ী ভোলা বাড়িতে উঠে বিব্রত হই। একদিন চক্রতীর্থে এসে ঠাকুরকে স্নান করিয়ে চক্রনারায়ণ মন্দিরে এলাম। সংবাদ পেয়ে গুরুভ্রাতা শ্রীগৌরী দাস বাবা ও মুরলিধর দাদা দেখতে এলেন। তাঁরা শ্রীআশ্রম নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তখন সবেমাত্র দুইখানি ঘর বাসোপযোগী হয়েছে। আমি বল্লাম তাঁরা যদি দিনকয়েকের জন্য ঠাকুর রাখেন তবে বড়ই ভালো হয়। আমি বাসা ঠিক করে এসে ঠাকুর নিয়ে যাব। তাঁরা সানন্দে সম্মত হয়ে ঠাকুর নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীমা এলেন, আমি দর্শন করতে গেলে আমাকে বল্লেন "হেমা, আমি ভাবছিলাম শূন্য আশ্রম কেমন করে দেখব? এসে দেখলাম তোর ঠাকুর এসে বসে আছেন। যতদিন শ্রীবৃন্দাবন থেকে আমাদের ঠাকুর না আসেন, ততদিন ঠাকুর এইখানেই থাকুন।" পরে দেখলাম সোহাগদা প্রভৃতি সকলে ঐ ঠাকুরের যথারীতি সেবা করছেন। এ ঠাকুর আমি কেমন করে নিয়ে যাব, আমি তো এ রকম সেবা পারবো না। কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীমা বল্লেন শ্রীরামদাদা স্বপ্ন দেখেছেন, ঠাকুর আর আমার কাছে ফিরে যাবেন না। আমি আনতে গেলে দাদারা নাকি লাঠি নিয়ে আসছেন। তারপর আমাকে একটি না যাবি পত্রে দলিল লিখে দিতে হোল তারপর জৈষ্ঠী শ্রীএকাদশীতে ঐ ঠাকুর "শ্রীশ্রীগৌরকিশোর" নামে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ ঐ শ্রীবিগ্রহ অন্তর্ধান করেন। পরে শ্রীবৃন্দাবন থেকে বর্তমান শ্রীবিগ্রহ এনে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত করা হোল। উভয় বিগ্রহই সোনার গৌরাঙ্গ নামে জনসমাজে পরিচিত হয়েছেন। এই সময়েই মামাবাবুর কল্যাণে প্রকাশ্যভাবে শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ করি এবং 'মহাপ্রসাদ আনন্দে' যোগদান করি। এই সময় ছেলের টাইফয়েড, জীবিতাশা অল্প, সংবাদ পাই। মনে করি যেতে যেতেই হয়ত তনয় শেষ হয়ে গেছে অথবা এমনি হবে। যাত্রাস্থান থেকে আমার ভবযন্ত্রণা পড়ব। তখন অতি বিশ্বাসের যুগ, নাস্তিকতা নাই, সংশয় নাই। ৺বিমলাদায়ীর মন্দিরে ছেলের জন্য শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করে ঈশ্বরে নির্ভর করে রইলাম। ছেলের কাছে কাশীতে গেলাম না বলে বহু নিন্দা রটে গেল। সৌভাগ্যক্রমে ছেলে আরোগ্যলাভ করলো। আমার পিসতুতো ভাই অমূল্য দাদার সঙ্গে ভগ্নী বসন্তবালা এলেন আমার কাছে। শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে আসা। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে পরমানন্দে শ্রীরথযাত্রা দর্শন, রথটানা মহাপ্রসাদ আনন্দ। শ্রীরথ সপ্তমীতে আমার ও শ্রীঅষ্টমীতে ভগ্নীর প্রথমাভিষেকসহ আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীদীক্ষা গ্রহণ। শ্রীশ্রীমা মন্ত্র গুরু, শ্রীশ্রীঠাকুর শিক্ষাগুরু। পরে কাশীতে যাই কিন্তু শরীর ভালো থাকে না, মন ও ভালো থাকে না। ঐ আশ্বিনেই আবার আমি পুরীতে। সঙ্গে আমাদের ভূতপূর্ব পাচক, পরে কর্মচারী দাদাবন্ধুত মুখোপাধ্যায় এবং পুরাতন দারবান ৺হরদার ত্রিবেদী এবং গুরুভগ্নী গোপীদিদি ছিলেন চিত্রকরদাহীর দোতলা বাড়ি ভাড়া করি। বাড়ির অন্যান্য অংশে আরো ভাড়াটে ছিলেন। একখানা বাড়ির আংশিকভাবে ভাড়াটে হওয়া এই প্রথম। কিন্তু তখনো ফ্ল্যাট কাকে বলে জানতাম না। এই বাড়িটির অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভালোই ছিলাম। পৌষ মাসে মাতা ও ভগ্নী কাশীবাস ছেড়ে স্থায়ীভাবে এখানেই চলে এলেন। ১৩১২ সালের মাঘে আমরা চলে আসি অনাথ কুটির সংলগ্ন ধনিকুটির নামক বাড়িতে। শ্রীশ্রীমার উপদেশে বসন্তবালা নানা চাতুর্যে পিতার নিকট থেকে অর্থসংগ্রহ করে চক্রতীর্থে বাড়ি তৈরি করেন। মাত্র চারখানা ঘর সম্পূর্ণ হতেই আমরা সেই বাড়িতে চলে আসি। এখান থেকেই ১৩২০ সালের এই চৈত্র আমার স্বামী এসে আমাকে কাশীতে নিয়ে যান। তারপর

১১ বৎসর মার সঙ্গে দেখা হয় নাই। ১৩২৪ সালের প্রথমে চিঠির নির্দেশ পাই এক পত্রে, আমাকে এখন সংসার ধর্ম পালন করতে হবে, আশ্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব রাখা চলবে না। কেবল ইষ্টমন্ত্র ও নিরামিষ ভোজনটুকু বজায় রাখতে হবে অন্য নিয়ম অমিয়ে: ১৩২৪ সালের ২৬শে ফাল্গুন কন্যা বাসন্তীর জন্ম। ১৩২৮ সালের ১লা ভাদ্র বুধবার শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্ধান মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ বালুচরের সরকারবাড়ি নামক প্রসিদ্ধ ভবনে ১২৭৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী শেষ রাত্রে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জাতিশাখা বংশে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব। তিনিই জ্যেষ্ঠ। পিতামহদেব ছিলেন বিপত্নীক গৃহসন্ন্যাসী। বহু শিষ্যসেবক পরিবেষ্টিত ও সতত শ্রীভগবৎ কথায় নিরত তাঁহার মহল ছিল আলাদা। পিতা রসিকলালের ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ত্রিসন্ধ্যা খোল করতালযোগে কীর্তন, শ্রীশ্রীগৌরগোপাল সেবা, গো সেবা, ভক্ত বৈষ্ণব সেবা, এই নিয়ে তাঁর গৃহস্থালী। বাড়িতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মীয় আচার নিষ্ঠা ও অবরোধ প্রথা। বাসস্থানী পাচক পছন্দ করতেন না। পত্নী পরমেশ্বরী বা প্রেমময়ী। কন্যা হরিভাবিনী, মনোরমা শ্যামভাবিনী ও কৃষ্ণভাবিনী। পুত্র শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ, শচীনন্দন ও সচ্চিদানন্দ। শেষোক্তজন দুঃখ দারিদ্র্য পীড়িত, রোগ জর্জর অবস্থায় পৈতৃক ভিটায় এখনো বর্তমান। শৈশবে রাধাবল্লভ একা, নিঃসঙ্গ, কেবলমাত্র পিতামহের ক্রোড়ে বসে ভগবৎ কথা শ্রবণ। খেলাধূলা তাকে বসে জানতেন না। সঙ্গীসাথী কেউ ছিল না। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব মতে আচৈশব সাত্ত্বিক জীবন। বালো পড়াশুনায় প্রশংসা। প্রতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। শিক্ষকগণের পুত্রাধিক স্নেহভাজন। বালো শ্রীশ্রীগোবিন্দ বাড়িতে উৎসব সম্পর্কনে ভাববিহ্বলতা। কৈশোরে যৌবনে অধ্যয়ন, ভক্তিগ্রন্থ অনুশীলন, গঙ্গাতীরে বনে বনে ব্রজলীলা সংস্মরণ, ভ্রমন। পুষ্পসজ্জায় আপন অন্তর্যামীকে ভূষিত করা। বৃক্ষ কোটরে অবস্থান করে নিসর্গ শোভা দর্শন। গৃহত্যাগ সংকল্প। তীব্র বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা। বারংবার পলায়ন ও প্রত্যাবর্তন। জননীর আগ্রহে পরিণয়। মনোভাব দর্শনে আত্মীয়গণ চিন্তিত হন। পিতার আদেশে পড়াশুনা শেষ করতে হয়। সংস্কৃতে এম এ পাশ করেন প্রাইভেটে। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর ছাত্র ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ যাতায়াত ছিল। বোধ হয় ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনও দেখে এসেছেন। তৎকালে প্রকাশিত সমস্ত রবীন্দ্র গ্রন্থ পাঠ করেছেন। কিছু কিছু কবিতা ও গান খাতায় উদ্ধৃত ছিল। আবৃত্তিও করতেন। অধ্যাপনাও করেছেন কিছুদিন। দশকর্ম আবশ্যক, বিবাহ না করলে পত্নীত্যাগই বা হয় কেমন করে। ইতিপূর্বে এক ব্রাহ্মণ ভুল করে ক্ষত্রিয় গায়ত্রীর পরিবর্তে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে উপবীত ধারণ করিয়েছিলেন। উপনয়ন অন্যতম সংস্কার। বিবাহ দ্বারা দশবিধ সংস্কার সিদ্ধ হয়। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। পত্নীকে স্বমতে আনতে চেষ্টা করেন। তন্ত্রী শ্যামভাবিনী ভক্তিমতী স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্বামীর আত্মবিসর্জন করেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শন লাভ। একাধারে জননী, ভগিনী, বান্ধবী ও শ্রীগুরু ভাবে দর্শন যোগমায়া পৌর্ণমাসী, জাত্যাদ্যা জগৎজননী ভাবে দর্শন, সংসার বন্ধন মুক্তি। তীর্থ পর্যটন। সন্ন্যাস গ্রহণ। তিরোভাবের সংবাদ পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পুরী যাওয়ার চেষ্টা করে বাধা পেলাম। ১৩২৯ সালে ভাই বীরেন্দ্রবিনোদের বিবাহ উপলক্ষে দৌহীপুর গেলাম। ১৩২৭ সালে শ্বশুর মহাশয় স্বানলাভে কয়েক মাস ভুগে স্বর্গতঃ হলেন। ১৩২৭ সালে দিদি শাশুড়ী (শ্বশুরের) ৺ভগবতী দেবী জাজপুরে একই রোগে বিগতা হন। ১৩৩২ প্রথম জ্যেষ্ঠপুত্র বারীন্দ্রবিনোদের জন্ম, ১৩৩৩ শেষে তার অকালমৃত্যু। ১৩৩৪ সালের শেষ ভাগে গিরিডি ও কেশবরে বাবা ও আমরা সকলে একত্র ছিলাম। মা তখন পুরী থেকে এসে দেখা করেন। ১১ বৎসর পরে দেখা। বাবার সঙ্গে দেখা ৯ বছর পরে। বাবার চেষ্টায় একটা আলোয় হয়।

কিন্তু এটা কার্যতঃ পরিণত হতে চায় নি সহজে। অনেক বিরোধ ঘটেছিল। এরপর যাবা পাই শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা নিয়ে। এই সংঘাতে আমার মন বিষণ্ণ হয়, আমি বিষয়ান্তরে মন দিতে চাই। এই সূত্রেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সংস্রবে আসি আমি।

রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু ছিলেন মামা শ্বশুর মহাশয়ের (নাটোর মহারাজ) অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার স্বামী ছিলেন রবীনাথের মুগ্ধ ভক্ত, কিন্তু আমরা ছিলাম পল্লীবাসিনী, গ্রাম্য বধূ। কলিকাতার বিরাট মহলে মেলা-মেশার যোগ্য বলে নিজেদের আমরা কখনো ভাবতে পারি নি। হঠাৎ হাতে এলো রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" ও "শেষের কবিতা" গ্রন্থ দু'খানি।

আমি পূর্ববঙ্গীয় জমিদারের কন্যা, কলিকাতায় আমার জন্ম এবং জীবনের অধিকাংশ সময় এখানেই কেটেছে। কিন্তু আমার শৈশবে ও বালাকালে আমরা চিকের আড়ালেই থাকতাম, প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয় রাখিনি। বন্ধ পাল্কী নদীর জলে ডুবিয়ে আমার মাকে স্নান করানো হোলো। চিক ঘেরা বারান্দায় থেকে ঘোড়ার ট্রাম চলতে দেখেছি, ছ্যাকরা গাড়ি চড়েছি খুব কম। বাবার একটা "ল্যান্দো" গাড়ি পরে কেনা হয়। মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে গড়ের মাঠে গিয়েছি, বাবা নেমে যেতেন, আমি গাড়িতেই থাকতাম। দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাড়িতেই যা কিছু হয়েছিল। বিবাহের পরে আর পড়াশুনা সেভাবে হয়নি। স্কুল কলেজে যাই নাই নি, বাড়িতেও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সময়টা বোধ উত্তীর্ণ হতে পারি নি। মামাশ্বশুর বাড়িতে অন্তঃপুরে বহুজীবন যাপন করেছি সাত বৎসর, তন্মধ্যে মাঝে মাঝে পিত্রালয়েও এসেছি, তারপর একটানা পাঁচ বৎসর পিত্রালয়েই কাটে। তখন একটু 'বিদ্রোহিনীর' জীবন যাপন করি, অর্থাৎ প্রচলিত মত বিশ্বাস, প্রচলিত জীবন ধারণপদ্ধতি ও পরিবেশের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহসী হই। আমি পরিবারের সকলের প্রতিকূলে, অভিভাবকদের মতের বিরুদ্ধে। কেবলমাত্র আমার মাতৃদেবীর আনুকূল্য পেয়ে) শ্রীগুরু মাতৃদেবীর নিদ্দেশে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করি, কিন্তু শরীর মনের দুর্বলতা হেতু আমি না পারি সংসারের কর্তব্য পালন করতে, না পারি আধ্যাত্মিক সাধন ভজনের উন্নতি সাধন করতে। কাজে কাজেই কতকটা আত্মকেন্দ্রিক, কল্পনা বিলাসী হয়ে পড়ি এবং বাস্তব বিমুখী হয়ে সাংসারিক বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ হই। ঘর প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, চুরি ইত্যাদির অভিজ্ঞতা জীবনে আসে, মানুষ চিনতে ভুল হয়। নানা কারণে মানসিক অবস্থা আমার খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। আমার একগুঁয়েমিও ছিল, সহজে নিজের মত বিশ্বাস বদল হোত না, যখন হোত তখন আবার একরকম মত বিশ্বাসই আবার দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু, এত কথার পরে এটুকু উপসংহার রাখা ভালো যে এতৎ সত্ত্বেও আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের অশেষ স্নেহ ও আনুকূল্য আমি জীবনে পেয়েছি, তা অমূল্য বস্তু, সে ঋণ শোধ করবার সাধ্য আমার হয়নি। নত নত মস্তকে সে মস্তকে সে ঋণ স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় আমার নাই। মরুভূমি সদৃশ আমার জীবনে সেই সমস্ত স্নেহই আনন্দাশ্রুর নির্ঝর প্রবাহিত করেছে। এই আমার জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনা। যাই হোক আত্মীয় স্বজনের মতের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায় বাড়িতে কিছুকাল আমার গতিবিধি ছিল সুনিয়ন্ত্রিত, এক রকম বন্দী জীবনই যাপন করতাম। পরে এই সময় শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের জন্য ব্যাগ্রতা প্রকাশ করে যখন ব্যর্থ হোলাম, তখন দারুণ ক্রোধে, ক্ষোভে মনস্তাপে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে কিন্তু প্রায় ঘরে অবশেষে বল্লাম "আজ থেকে আমি ধর্মের লাইন ছেড়ে দিলাম, আমি অন্য পথে চলব। এই সংবাদে সংসার বিজ্ঞদের হাসি হাসে, আধ্যাত্মিক গুরুজনেরা সন্ত্রস্ত হন। আমি ভক্তি গ্রন্থের পরিবর্তে মাসিক পত্রিকা, রবীন্দ্র গ্রন্থাদি পড়তে এবং সিনেমা থিয়েটার দেখতে সুরু করলাম।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি', এবং নতুন প্রকাশিত "যোগাযোগ" ও "শেষের কবিতা" আমাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল। বালাকালে আমি বাবার লাইব্রেরী থেকে এনে পড়েছি, পরে হিতবাদী সংস্করণের "প্রজাপতির নিবন্ধ", য়ুরোপের প্রবাসীর পত্র", "গল্পগুচ্ছ" কিছু কিছু পড়ে ফেলে দিয়েছিলাম ১৩১৪ সালে "গোরা" "শারদোৎসব" "রাজর্ষি" ও গান বাঁধিতে পুরাতন উপহার স্বরূপ পেয়েছিলাম, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হবার পরে প্রায় পাঁচ বৎসর আমি ভক্তি গ্রন্থাদিই শুধু পাঠ করতাম, অন্যসব পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আবার নূতন করে পড়া আরম্ভ করার পূর্ব লিখিত বইগুলি আমার চোখের সম্মুখে একটি নূতন জগৎ উদ্ঘাটিত করলো। কবিগুরুর প্রতি আমার নূতন করে শ্রদ্ধা জাগরূক হোলো। আমার স্বভাব এই যে, যতই দুঃখ কষ্ট অসুবিধায় থাকিনা কেন, আমার মনের মধ্যে চিরদিন একটি অবাধ্য, দুষ্টু, চঞ্চল শিশুর অস্তিত্ব বর্তমান; কৌতুক কৌতূহল সে কিছুতেই ছাড়তে পারে না। অতলান্তিকের পঞ্চম এবং রবীন্দ্রনাথের সেই 'খাটৌড়ুসের গ্রাম্য বাসিন্দাটির' সঙ্গেও যেন তার কিছুটা মিল। সেই জন্যই কবিগুরুর সঙ্গে আমার অপার-দুস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একটা সেতু নির্মানের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। পরিচয় না দিয়ে জোনাকি দেবী ছদ্মনামে একটি কবিতায় অভিনন্দন জানালাম তাঁকে। কবিতাটির প্রথম দুটি ছিল 'ওগো যোগাযোগ, শেষের কবিতা প্রণেতা।' পরবর্তী অংশ মনে নাই। সেতু রচিত হোলো, অপ্রত্যাশিত ভাবেই আমার প্রেরিত ঠিকানায় চিঠির উত্তর এলো "কল্যানীয়া জোনাকি, তুমি আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করো।"—অনেকে বলেছিলেন বহুলোক তাঁকে চিঠি লেখে, সকলের চিঠির উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়না, তাই কাউকে দিয়েও স্বহস্তে লেখেন না অনুরূপ হস্তাক্ষর বিশিষ্ট চারজন সেক্রেটারী আছেন, তাঁরাই লিখেছেন,···ইত্যাদি। কিন্তু চিঠি আমি পেলাম, জোনাকী দেবী এবং মক্কবালা দেবী ছদ্মনাম ও রাখলাম ব্যবহার করে আরো কিছু চিঠি এবং পাঠালাম, তার উত্তর ও তিনি ছিলেন স্বহস্ত লিখিত পত্রেই। অবশেষে একদিন পুত্র শ্রীমান বিমলাকান্ত রায় চৌধুরীর সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিত হোলাম এবং কবির দর্শনলাভ করে তীর্থস্নানের পুণ্য অনুভব করলাম। মাঝে মাঝেই আসতাম তাঁর কাছে, যখন তিনি জোড়াসাঁকোয় বা বরাহ নগরে আসতেন। প্রথমে পুত্র, পরে অন্যান্য পরিচিত আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গেও এসেছি। সবাপেক্ষা কৌতুককর চিত্রটি এই যে আমার বৃদ্ধা পিসশাশুড়ী ও জ্যাঠশাশুড়ীর সঙ্গে, বৈলাতিবিল্ব ভেদে, কলসী গামছা ইত্যাদি উপকরণ সমেত গঙ্গাস্নানে যাবার প্রাক্কালে মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকো হয়ে গিয়েছি এবং সংবাদ মাত্র না দিয়েও অকস্মাৎ একখানি অর্দ্ধহলিন লালপেড়ে সাড়ি পরিহিত অবস্থায় তাঁর সম্মুখীন হয়ে তাঁকে চমৎকৃত করেছি। তিনি নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় (তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তির কিঞ্চিৎ ক্ষীনতা ঘটেছিল) এরূপ আকস্মিক আবির্ভাব দেখে বেশ একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, আর তাঁর ললাট নেত্র, মুখমণ্ডলের অবস্থা দেখে আমার মনে ভীতি সম্ভ্রমের পরিবর্তে হাস্যোদ্রেক হয়েছে, কিন্তু সে হাস্য সম্বরণ করে প্রণাম করে আত্মপরিচয় প্রদান করেছি এমন দু'একদিন ঘটেছে। তাঁর সঙ্গে আমার যে লঘুকৌতুকের সম্পর্ক ছিল, তা গড়ে উঠবার সুযোগ ঘটে আমার মাতুল সম্পর্কীয় হরিপুরের চৌধুরী পরিবারের সংযোগ বশতঃ। আমার মাতামহ বংশের অনৈকা বধূ হরিপুরের চৌধুরী পরিবারের দুহিতা ছিলেন। সুতরাং চৌধুরী মাতুলগণ আমার মাতুল সম্পর্কীয় ছিলেন, এই সূত্র ধরেই আমার বাবার সঙ্গে তাঁদের মধুরতা ছিল। এই সম্পর্কে স্বর্গীয়া পুরনারা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী আমার মাতুলানী এবং পুরনীয় কবিগুরু আমার মাতামহ স্থানীয় ছিলেন। আমার পরিচয় পাবার পর তিনি সবসময় আমায় তুমি বলতেন এবং

নিজের দৃষ্টি শক্তির ক্ষীনতার কথা জানিয়ে আমাকে বলতে বলতেন। আমি তো ইচ্ছা করলেই তাঁর কাছে আসতে পারিনা, হয়ত বৎসরে একবার কি দুইবার আমার সুযোগ ঘটে, এই জন্য তাঁর কাছে আমার অস্বাভাবিক মার্জনীয় ছিল। আমাকে তিনি একটু বকাঝকাই করতেন। কিছুক্ষণ বসে কথাবার্তা বলবার পর আমি গঙ্গাস্নানে চলে যেতাম, বাড়ি ফিরে বিলম্বের জন্য যা হয় একটা কৈফিয়ৎ দিতে হোত। কিন্তু এতো প্রাথমিক অবস্থা। পরে যখন সকলেই জানতে পারলেন, তখন রীতিমত বাড়ির গাড়ি করেই পুত্রবধূ বধূ জামাতাসহ এসেছি ; কেউ কোনো আপত্তি করেন নি। আপত্তি ছিল আধ্যাত্মিক দিক থেকে। এই উপলক্ষে কিছু মনোমালিন্যও ঘটেছিল এবং তার ফলে সেখানকার সকলের সঙ্গে প্রায় অর্ধ বিচ্ছেদই ঘটেছিল। আমার জননী এবং ভগিনী এই ব্যাপারে মর্মাহতা হয়েছিলেন, কেন না, আমাদের শ্রীগুরুধাম সংরক্ষণশীল, আমার স্বাধীন ভাবে চলাফেরা এবং নিজ গন্ডীর বাহিরে পদার্পন তাঁরা ভালো চক্ষে দেখেননি। আমার জননীদেবী তো চিরদিনই অবরোধ বাসিনী, ভগ্নীও তদ্রূপ ছিলেন অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যক বলে তাঁকে বাড়ির বাড়ির বাইরে ইথানীং যাতায়াত করতে হলেও অপ্রয়োজনে তিনি কোথাও কখনোই যেতেন না। কাজেই আমাকে তাঁরা সহজে ক্ষমা করতে পারেননি। কবিগুরুর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা পারিবারিক ও সামাজিক গন্ডীর সীমা অতিক্রম করে অনির্বচনীয়তা লাভ করেছিল। তাঁকে আমি পত্রে অনেক জিজ্ঞাসা করতাম, অনেক বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতাম। আমার ঔদ্ধত্য, ঔৎসুক কৌতুক স্পৃহা অনেক সময় হয়ত বা ইষৎ মাত্রা ছাড়িয়েও যেতো, তৃতীয় নেত্রে ইষৎ রক্তাভাও ঘনিয়ে উঠতো কিন্তু কোনদিনই সেজন্য আমি মার্জনা লাভের বা স্নেহলাভের অযোগ্যা বিবেচিত হইনি। এই আমার পরম সান্ত্বনা। এখ যাঝে মাঝে বসে ভাবি যে, কত মূর্খতাই না তখন করেছি, কেমন করে তিনি আমাকে সহ্য করতেন, আমি তাঁর ঐরূপ হৃদ্য ব্যবহারের যোগ্য ছিলাম না! তখন ভেবে দেখি সর্বপ্রকারেই ব্যবধান অপরিমিত, বয়সে, শিক্ষা দীক্ষার পরিবেশে সকল প্রকারেই,—তখন অপরিমিত বিস্ময়ে তাঁর মুখর নক্ষত্রলোকের দিকে তাকাতে হয় যে, কেমন করে ঘাসের শিশির এই অমিত তেজা মহাজ্যোতিষ্কের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে! তিনি যার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে এসেছেন, বোধহয় আমি মূর্তিমতী তাই। কিন্তু কেমন করে এই বিপরীত পক্ষদ্বয় একত্রে বসে স্নিগ্ধ হৃদ্যতা আস্বাদন করতে পারে এটাই আশ্চর্য্য ছিল। কিন্তু এই অসম্ভবই তো সেদিন সেদিন সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মতো একজন মহামনীষী, যিনি স্বভাবতঃই সরল, সুন্দর, স্নিগ্ধচিত্ত, বিশ্বপ্রেমিক, নির্মল স্বভাব, তিনি তো কখনোই কৃত্রিম সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য এতটা বহুমূল্য সময় অপব্যয় করতে পারেন না। এখানেই তাঁর উদারতা, মহত্ত্ব, সমবেদনা, করুনা প্রভৃতি বৃহৎ পর্যায়ের সদ্গুনের সঙ্গে আরো একটু বিশেষ প্রকারের সৎপ্রবৃত্তি অনুভব করেছি, তাকে বিশুদ্ধ স্নেহ ব্যতীত অন্যকিছুই বলা যায়না। সেই জন্যই সাহসভরে বলে ভাবি যে আমি কি ঐ স্নেহ পাবার যোগ্য ছিলাম ? সুজনীয় কবিগুরুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কোনো বিবরণ নানা কারণে তখন লিখে রাখা হয়নি। তাঁর অনুপম বাচন ভঙ্গি, দৃষ্টি এবং অভিব্যক্তিকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করবার মতো ভাষার ঐশ্বর্য্যও আমার নাই। আমি সমস্ত কথা অবিকল মনে করে রাখতেও পারিনি। অতএব তাঁর কথা লিখতে আমার মনে দুর্ভাগ্য সংশয় আসা খুবই স্বাভাবিক। তবু সামান্য কিছু তা স্মৃতি টুকুর উপরে নির্ভর করেই, তার ত্রুটি বিচ্যুতি যেন অযোগ্য না হয়, এই প্রার্থনা।

[ক্রমশঃ

দীপান্বিতা উৎসব ও মেয়েরা

বেলা দে

বাংলা দেশে মেয়েলী ব্রত ছাড়া আরো অনেক রকম অনুষ্ঠান আছে তার মধ্যে দীপান্বিতা উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন মনের শিল্প সাধনায় রচিত হয় দেবতার প্রতিমা, প্রসাদ নিতে মিলিত হয় গৃহের সমস্ত পরিজন ও প্রতিবেশী। অবশ্য কালের পরিবর্তনে বাংলা দেশেও উৎসবের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন সকল পুজাই সার্বজনীন হয়েছে। তবুও বাঙালীর শেষব প্রকৃতি তার সকল অনুষ্ঠানেই একটি মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। এ মাধুর্য্য অবশ্য বাঙালীর একার সম্পদ নয় এ ভারত হৃদয়ের সনাতন মধুস্রোত।—তাই দীপান্বিতা দেওয়ালী উৎসব যেমন সারা ভারতের জাতীয় উৎসব তেমনি এই উৎসব উপলক্ষে মেয়েরা তাঁদের গৃহখানিকে প্রদীপ দিয়ে সাজিয়ে আলোকমণ্ডিত করে রাখেন। এ ছাড়া নানারকম খাবার আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। পশ্চিমে দেখেছি দেওয়ালী উপলক্ষে নানা রকম চিনির শুকনো খাবার ছাঁচে ফেলে রং করে সাজিয়ে দেওয়ার রীতি আছে। দেশীয় ভাগ মিষ্টি খাবার এই সময় দেওয়া নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিয়ের রকমারী খাবার বোঁদে, মিহিদানা, জিলিপী, পঞ্চা ইত্যাদি বাংলা দেশেও এই সময় মেয়েরা বাড়ীতে তৈরী করে থাকেন।

আগে কার্তিকমাস পড়বার আগে অর্থাৎ আশ্বিনের সংক্রান্তিতে আকাশ প্রদীপ দেওয়া হোত প্রায় প্রতি ঘরেই কিন্তু এখন এর প্রচলন প্রায় উঠেই গেছে—কবির গানেও আছে—

ঘরে ঘরে লোক পাঠালো—
দীপালিকায় আলোও আলো
আপন আলো
ঘর কর ধরিত্রীরে।"

আজকের মানুষ এত বেশী কৃত্রিম হয়ে গেছে যে এসব কথা ভাবতেও পারে না—তবুও মনে হয় চিরাচরিত প্রথাগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে যার মর্য্যাদা লুপ্ত হয়ে গেলে আমাদের উৎসব অনুষ্ঠানগুলোও একে একে মুছে যাবে।

কালীপূজার পরই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া একটি মিলন উৎসব। পারিবারিক প্রীতির বন্ধনকে নিবিড়তর করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত যমপঞ্চমী, ষষ্ঠী, প্রভৃতি মেয়েলী ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোটার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় এই ব্রত হয়। ভগ্নি সংযত ও উপবাসী থেকে পুরোহিত

যাত্রা যথাবিধি সংকল্প করে গণেশাদি দেবতাদের পূজান্তে যম যমুনা ও চিত্রগুপ্তের পূজা করান। পরে ভাইয়ের ললাটে উষাকালে সংগৃহীত নীহার দিয়ে মার্জনা করে ঘৃত, চন্দন, ও কজ্জল তিলক দিয়ে ভূষিত করেন। পরে ভাইকে মিষ্টান্নাদি খাওয়ান এবং ভাই দীর্ঘ আয়ু কামনা করেন।

আধুনিক জগতে—যখন স্নেহ প্রেম মায়া মমতার বন্ধনকে ছিন্ন করে ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়াই আভিজাত্যের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে তখন এমন একটি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য।

শিশুপালনে মা বাবার দায়িত্ব

আভা পাকড়াশী

বিবাহের প্রথম একটি দুটি বছর ভারী আনন্দের। দায় নেই, দায়িত্ব নেই। অবশ্য একান্নবর্তি পরিবার হলে মাত্র গুরুজনদের মেনে চলার দায়িত্ব থাকে মেয়েদের, আর পুরুষের তো তাও নেই।

আসল দায়িত্ব আর সমস্যা এঁদের শুরু হয় মা বাবা হবার পর। শিশু বড় হয়ে কেমন রূপ নেবে তার অনেকটাই নির্ভর করে কিন্তু মা বাবার শিক্ষার ওপরে। তাই সেই সময় থেকেই নিজেদের ওপরেও শাসন আর নিয়ন্ত্রণের বেড়া টানতে হবে তবেই হবে সন্তানের নিয়ন্ত্রণ।

প্রথম বা দ্বিতীয় সন্তান মা বাবার চোখের মণি। ছোট্ট ছোট্ট দুটি কুঁড়ি, তারা কোন মালিন্য নিয়ে আসেনি। একটু বড় হতেই আসে তার আনাগোনা জানার বায়না। এই সময় থেকে মা বাবারও সংযম আর ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হয়। কেননা সে সময় আমরা, "ও কিছু বোঝে না" বলে অবহেলা করি। শিশুর সেই তিন বছর বয়স থেকেই কিন্তু তার চিত্ত গঠন শুরু হয়। এই সময় থেকেই তার মনে যে ছাপ পড়ে, সেই ছাপের সঙ্গেই মাপ মেপে সারাজীবন যে যে সব কিছুকে মাপতে থাকে। সুতরাং এই চিত্ত গড়ার সময় থেকেই তাকে শক্ত করে ধরতে হবে। শুধু খাওয়া নয়, সুস্থ চিন্তায়, ভদ্র ব্যবহারে, বিবেচক, সত্যবাদী, উদার সন্তান যাতে গড়ে ওঠে তার জন্য মা বাবা দুজনকেই সমান সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঐ নির্মল শিশুর মনে সবপ্রথম কালিমা মাখান কিন্তু মা বাবাই! ধরুন আপনার নিজের বাচ্চাটিকে আপনি সকলের থেকে লুকিয়ে কিছু খাওয়ালেন। তারও সেদিন থেকেই লুকিয়ে কাজ করার হাতে খড়ি হল। কিম্বা হয়তো কোন আত্মজনের কাছে তার সামনেই আপনি তার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। সেও নিখল অন্যকে খারাপ বলতে কারুর নামে নালিশ করতে। তার ফল হয়তো আপনি তাকে খুব বকলেন, কিম্বা মারধর করলেন, রাগ করে বললেন—যত সব পাকামী শিখেছ! সে তো তখন দিশেহারা।

শিশুর কাছে তার মা সবচেয়ে প্রিয়, আর বাবা হলেন সর্বজ্ঞ। সর্বশক্তিমান। তাঁদের মতই তো সে করেছে; তবে আর তার অন্যায়টা হল কোথায়। এ থেকেই সে শ্রদ্ধা হারায়।

শিশুরা সব চাইতে সুচতুর, সে ঠিক বুঝে নেয় মা বাবার মনোভাব। তাঁরা কাকে কতটা আপন ভাবেন আর কাকে কতটা পর। তাঁদের সঙ্গে সেও সমান ভাবে—সেও ঠিক তত ডিগ্রিই আপন পর মেনে চলে।

মিথ্যে কথা বলতে তারা পেট থেকে পড়েই শেখে না। মা বাবার মিথ্যে আচরণই তাদের মিথ্যে শেখায়। মা হয়ত বেড়াতে বেরিয়েছেন ছেলেকে নিয়ে; বেরী হয়ে গেছে, বললেন, এই! বাড়ীতে বলিস না কোথায় গিয়েছিলাম, তাহলে তোকে লজেন্স দেব। অন্য কোন কথা শিখিয়ে দিলেন হয় তো। সেদিন থেকে সেও এটা শিখে নিল। পরে যে ঐ মাকেই ফাঁকি দেবে! এক কাজ করে অন্য কথা বলবে। ঠিক

এই ভাবেই তাঁদের পরিবারতন্ত্রের অভ্যাস তার মধ্যেও অর্পায়। এর জবাবে অনেকেই হয়তো বলবেন— তা বলে বাপু, বিবেকানন্দ হব, না পরমহংস সাজব! সংসারে থাকতে গেলে কি আর এত বেঁধে ঢেকে চলা যায়?

এঁদের কথা হল, ছোট জায়গায় থাকা, ছেলেমেয়েরা সব সময় সামে সামে আছে। সংসারের ছোটখাট দোষগুণ তারা দেখছে, ঝগড়াঝাঁটি সবই তাদের সামনে হচ্ছে, এর মধ্যে যার ভাল হবার সে ঠিকই ভাল হবে আর যার মন্দ হবার তাকে শত ভাল করে রাখলেও সে মন্দই হবে। আগেকার দিনে মানুষ এত উদার হত অত নিঃস্বার্থ হত, ওসব কথা বললেই তো আর চলবে! তারা থাকত সব কেমন জায়গায়? উদার উন্মুক্ত পরিবেশে মাঠে ময়দানে খেলেধুলে তারা বড় হত, তাই তাদের মনও হত অমনি খোলামেলা। আর এখন সঙ্কীর্ণ হতে হতে কোন রকমে ঠেসেঠুসে কোনঠাসা হয়ে দিন কাটাচ্ছে মানুষ, তাই তাদের মনও সঙ্কীর্ণ হচ্ছে। এখন এসব উপদেশ দিতেই ভাল, মানতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

কিন্তু তখনকার কালে অশিক্ষিতা মায়ের সুশিক্ষিত সন্তান হত। আর আজ শিক্ষিতা মায়ের শিক্ষিত সন্তান হবেনা। তবে আর শিক্ষার মূল্য কোথায়! পার্টি, পলিটিকস, ডিভোর্স, ক্যাসন এসবে শিক্ষার মান নয়! আসল মান হল এঁদের শিক্ষায় শিক্ষিত সুসন্তান! পরিধি কমে গেলেও সেটা তো বেড়েছে! যতই গতির ঘূর্ণ হোক তবু মা বাবা দুজনেরই কিছুক্ষণ সময় শিশুদের জন্য খরচ করতে হবে। আপনাদের সঙ্গ পেয়ে আর সাহচর্যে দেখবেন ভদ্র, সভ্য এরা হবেই। ওদেশের বাসস্থানও বড় নয়। সেখানের মায়েরা এক সঙ্গে দুটি তিনটি বাচ্চা কি করে সামলায়! আবার যখন বাপ আসে সেও তার সঙ্গে কাজের ভার নেয়। স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে একতা থাকলে তাদের মধ্যেও আসে একাত্মতা। আর পুরুষ যদি স্বার্থপরের মত মনে করেন যে ছেলে মানুষ করা শুধু মায়েরই কাজ, তা কিন্তু মোটেই নয়! তাঁরও সহযোগিতা চাই বৈকি! আবার ছেলেমেয়েরা দোষ করলেই মা বেচারা যদি অমনি বকুনি খান সেখানেও ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে মাকে চোখ রাঙায়!

আবার মা যদি অনবরত ছেলে মেয়ের দোষ ঢাকতে এসিয়ে যান, স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া করেন সেখানে ছেলেমেয়েরাও আবার বাপকে সম্মান করে না।

শান্তির সংসারে ছেলেরাও সভ্য শান্ত হয়। যদি তারা দেখে বাবা মাকে ভালবাসে তাঁর কথা শোনে, তাঁকে সমীহ করে, তখন তারাও সেটাই করবে। তেমনি আবার মা যদি বাবাকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁকে সেবা যত্ন করেন, ছেলেরাও তাঁকে তেমনি করতে শিখবে। সুতরাং উভয়েই যদি উভয়কে ভালবাসেন উপযুক্ত মূল্য দেন। তাহলে সন্তানেরাও তাই দিতে শিখবে! নিশ্চয়ই ভাল হবে তারা।

সেই কারণেই বলছি প্রথম থেকে গোড়া বাঁধুন! একটু সময় ব্যয় করে এদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তারপর নিজেরা যতখুশী ঝগড়া করুন বা পরচর্চা করুন তাতে কিছুই এসে যাবে না। এরা কোন কথা জানতে চাইলে, সহজ করে বুঝিয়ে দিন, বিরক্ত হবেন না। আপনার চোখ দিয়েই সে প্রথমে দেখে। আপনার মন নিয়েই সে মন বোঝে। তাই বলছি, যাই করুন, ওরা কাছাকাছি আছে এটা মনে রেখে ওদের চোখ কান বাঁচিয়ে করুন। নয়তো ওদের মত করেই করুন, সন্তানেরা মানসিক দ্বন্দ্ব মুক্ত, উদার সুস্থতা হয়ে গড়ে উঠুক, তারা মানুষের মত মানুষ হোক এটা কোন মা বাবার না কাম্য। সুতরাং মা বাবা উভয়েরই এটি একটি বিশেষ গুরু দায়িত্ব নয় কি! দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই দেখবেন এই সমস্যার সহজ সমাধান হবে আর দেশ আর সমাজও এমনি সুস্থ মনের সভ্য সুশিক্ষিত সন্তান পেয়ে অনেক উন্নত হবে। এই আমাদের আশা।

রঙ্গমঞ্চে পোষাক

শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন এই কলকাতার শহর এবং বাইরে নানা অঞ্চলে, নানা শহরে বহু অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অভিনয় আমরা সকলেই দেখতে ভালোবাসি এবং দেখবার পর আনন্দ অনুভব করি। নাটক অভিনয় আমাদের দেখতে ভালোলাগে কারণ জীবনের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে নাটক। আজকের যুগে নাটক শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে শিক্ষার ক্ষেত্রেও। যে বিষয়কে আলোচনা বা পাঠের মাধ্যমে পরিষ্কার করে বোঝান যায় না, সেই বিষয়কে অনেক সহজ ভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে বোঝান যায়। অভিনয় অনুষ্ঠিত হওয়া কালে পরিচালক বা পরিচালিকাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয় নাটকের পাত্র-পাত্রীর প্রতি। পরিচালক যদি শুধু মাত্র আলোক-সম্পাত, সঙ্গীত এবং অভিনয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে তবে নাটকটি সম্পূর্ণ ভাবে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয় না। নাটকের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল পোষাক-পরিচ্ছদ এবং Make-up। যদিও আগের দিনের রঙ্গমঞ্চে এই দুটি দিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শিশিরকুমার পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই, সব শ্রেণীর নাটকেই একই পোষাক-পরিচ্ছদ ও Make-up করা হোত। অমর দত্তের "ক্লাসিক-থিয়েটার" থেকে এই প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন সুরু হয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ির সময় থেকে নাটকের পোষাক এবং Make-up নাটকের শ্রেণী অনুযায়ী হোতে সুরু করে। আজকের আধুনিক যুগে যখন নানা দিক দিয়ে নাটকের পরীক্ষা চলছে, তখন যদি কোন নাটকের পাত্র-পাত্রীর পোষাক নাটক অনুযায়ি না হয় তা হোলে দর্শকের মনে তা আঘাত করবেই। আমার প্রত্যক্ষ এমন একটি অভিজ্ঞতা আছে। ঘটনাটি হোল—

শরৎচন্দ্রের "বিজয়া" নাটকটি দেখতে গিয়ে বিজয়াকে প্রথম দর্শনেই যে পোষাকে দেখলাম তা আমার মনে আঘাত দিলো। বিজয়াকে দেখলাম আমি, হাতকাটা চোলি ব্লাউজ পরা, চুড়ো করে খোঁপা বাঁধা, মুখে চড়া ভাবে অতি আধুনিক রীতির Make-up করা। এ বিজয়াকে শরৎচন্দ্রের বিজয়া ভাবা দর্শকের পক্ষে সম্ভব নয়। উপন্যাসে যে বিজয়াকে আমরা দেখি, সে হোল মার্জিতরুচির একটি শিক্ষিতা নারী। চরিত্রের পোষাক ও Make-up এ যদি কোন দোষ থাকে তা না নাট্য রস গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। যাতে নাটকের মূল রস প্রকাশিত হয় এর প্রতি পরিচালক বা পরিচালিকা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। নাটক বিভিন্ন শ্রেণীর হয়ে থাকে যেমন—ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক সাংকেতিক এবং প্রহসন। এই শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি রেখে চরিত্রগুলির পোষাক এবং Make-up করা উচিত। শুধু শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি দিলে হবে না, এর সঙ্গে যুগ এবং কালের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। পরিবেশ এবং পরিস্থিতিও পরিচালকের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যেমন মনে করুন—প্রফুল্ল একটি সামাজিক নাটক। আজকের দিনের কোন সামাজিক পোষাক উমাসুন্দরী, জানদা এবং প্রফুল্লকে নিশ্চয় পরাব না। কারণ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ জীবন, পছন্দ এবং ভালো লাগার পরিবর্তন হচ্ছে।

রবীন্দ্র নাটকের পোষাকের মধ্যে সুরুচি ও কাব্যময়তার পরশ পাওয়া যায়। যে সমস্ত প্রখ্যাত নাট্য-সংস্থায় রবীন্দ্র নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে তা দেখলেই স্পষ্ট ভাবে আমরা এ বিষয় বুঝতে পারবো। "মালিনী" নাটকের নায়িকা মালিনীকে সেকেলে বসন এবং ফুলের অলঙ্কার পরালে এই চরিত্রটি অনেক জীবন্ত মনে হবে। এই চরিত্রের কেশ-বিন্যাস করা হবে না। চুল এলো করে রাখতে হবে। "সেবরকার" পোষাক সামাজিক নাটকের পোষাক হবে। কিন্তু ঠাকুর বাড়ীর ঐতিহ্য রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ হাফ হাতা লেস বসান ব্লাউজ, পিন করে শাড়ী পরতে হবে। চুল বাঁধাও অন্য ধরণের হবে। ঠাকুর বাড়ীর কোন মহিলার ছবি দেখলেই এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। এমন অনেক নাটক আছে যার পোষাক প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে বই পড়ে, চিত্র দেখে পোষাক তৈরী করা উচিত। পোষাক এবং Make-up এর ব্যাপারে একটি বিশেষ কালকে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে জাঁকজমক পূর্ণ পোষাকের ব্যবহার বেশী। কারণ তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটক সংখ্যা এবং জনপ্রিয়তায় অনেক বেশী। আধুনিক নাটকের মধ্যে আমরা পোষাকের জাঁকজমক কম দেখতে পাই। কারণ নাটকের গতি বর্তমানে বাস্তবমুখী হচ্ছে। Make-up করার সময় ঠোঁট, চোখ, ভ্রু চরিত্র অনুযায়ি অঙ্কন করতে হবে। মুখের রং চরিত্রের অবস্থা অনুযায়ী করতে হয়। অবস্থা বলতে এখানে চরিত্রের মানসিক এবং দৈহিক দুটি দিকই বোঝায়। স্বাচ্ছন্দ যদি না থাকে তবে মুখের রং low light এর দিকে যাবে। অর্থাৎ মুখের রংয়ের মধ্যে উজ্জ্বলতা থাকবে না। কিন্তু অবস্থা ভালো হ'লে ঠিক এর বিপরীত হবে। এ ক্ষেত্রে মুখের রং উজ্জ্বল হবে। অনেক সময় দেখা যায় কোন বয়স্ক চরিত্রকে রূপ দেবার সময় মাথার চুল পাকা করে দেওয়া হয় কিন্তু মুখে কোন রেখা বা ভাঁজ অঙ্কন করা হয় না। এই দোষকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল বলতে পারি। বয়সের পরিবর্তনের সময় চরিত্রটি ভালো করে জানতে হবে। ঠোঁট অঙ্কন করবার সময় লাল রংয়ের থেকে কালচে লাল রং মঞ্চের পক্ষে অনেক বেশী উপযোগী। চোখ এবং ভ্রু খুব চওড়া না করে মুখের গড়ন কি রকম তার প্রতি দৃষ্টি রেখে করা উচিত। অভিনয় কালে হাত, পা, গলা সকল স্থানেই Paint করা উচিত। কারণ তা না হোলে মুখের রংয়ের সঙ্গে দেহের অন্য অংশের অমিল থাকবে। এই সকল দিকে পরিচালক বা পরিচালিকা যদি দৃষ্টি দেন তবে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেওয়া তাঁর পক্ষে খুব অসম্ভব নয়।

সুন্দর স্বাস্থ্যলাভের জন্য মাত্র ৫ মিনিট সময় দিন

রেবা রায়

এক নম্বর ব্যায়াম

জানেন কি, মেরুদণ্ড সোজা রেখে পায়ের পাতার উপর ব'সে থাকাও একটা সুন্দর ব্যায়াম? হাত দু'খানি থাকবে জানু দুটির উপর। এই ভঙ্গিটি জানু সুগঠিত ও মেরুদণ্ডকে ঋজু রাখে। এই ভঙ্গিতে বসে তারপর শরীরের পশ্চাৎভাগ ধীরে ধীরে তুলুন, হাঁটুর নিচেকার পায়ের অংশটুকু মাটির সঙ্গে লেগটে থাকবে আর হাত দুখানি থাকবে দুই জানুর উপরে। এবার হাত দুটো ধীরে ধীরে মাথার উপরে সোজা ক'রে দিন। তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ান।

দু নম্বর ব্যায়াম

এই সহজ ব্যায়ামটি কটি ও পশ্চাৎদেশ সুগঠিত করতে সাহায্য করবে। এমনভাবে দাঁড়ান যাতে দু পায়ের মাঝখানে বেশ খানিকটা ব্যবধান থাকে। দু পা একটুও যেন না বেঁকে থাকে। মাথার উপরে হাত দুটো সোজা ক'রে তুলে ধরুন, এক হাতের আঙুল দিয়ে অন্য হাতের আঙুল ধরে রাখুন। এবার কোমরের উর্দ্ধাংশ থেকে শরীর সামনের দিকে বাঁকিয়ে দিন, হাত দুটো সোজা অবস্থায় সঙ্গে-সঙ্গে নামিয়ে আনবেন এবং ডান পায়ের সামনেকার মাটিতে রাখবেন। ডান পা হাঁটুর কাছে সামান্য একটু বাঁকবে কিন্তু বাঁ পা যেন সোজা থাকে। শরীরের ওজন যেন শরীরের ডান দিকে। এর পরে একই ভঙ্গিতে বাঁ হাটু বাঁকাবেন আর ডান হাঁটু তখন সোজা রাখবেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। এই ব্যায়ামটি ক্রমান্বয়ে বার দশেক করুন।

দুটি ব্যায়ামই সহজসাধ্য। খোলামেলা জায়গায়, মাঠে উঠোনে বা ছাদে, অভ্যাস করলে ভালো হয়।

ওষুধ বেশি খাবেন না

বেশি অসুখ হয়ে না পড়লে, বা তেমন দরকার না পড়লে ওষুধ খাবেন না। যখন-তখন আর খানিকটা অকারণে ওষুধ খেলে ওষুধই শেষ পর্যন্ত আপনাকে খেয়ে বসবে। অনেক বাড়ির টেবিলের ড্রয়ার বা আলমারী খুললে যে পরিমাণ পিল, টনিক, ভিটামিন বা হরমি বড়ি দেখা যায় তাতে সেগুলিকে ছোট-খাট ওষুধের দোকান ব'লেই মনে হয়। সত্যি, ওষুধ খাওয়া অনেকের এক অনর্থক নেশা। এতে শরীর এবং অর্থ দুইই নষ্ট হয়। মনে রাখবেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন শারীরিক সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আমাদের শরীরের ভিতরেই আছে রোগ-প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক শক্তি। সেই শক্তিকে আরো জাগ্রত থাকতে সহায়তা করুন, সেই শক্তির উপরে আস্থা রাখুন। মনে রাখবেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধও শরীরের সেই সহজাত শক্তির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। অকারণে ওষুধের নেশা ক'রে সেই স্বাভাবিক শক্তিকে হেলায় চিরতরে নষ্ট করবেন না। বাজারের কতগুলি ওষুধ নিয়মিত সেবনে তা নেশাতে দাঁড়িয়ে যাবেই। আর তাহলেই মহাবিপদ।

টনিকের কথাই ধরুন। কারুর পক্ষে তা হয়তো সত্যি দরকারী। কিন্তু অনেকেই রকমারী টনিক সেবন করে নিতান্তই সখে পড়ে এবং অনেক সময় অতিরিক্ত পরিমাণে। অনেকের নাকি জোলাপ ছাড়া কোষ্ঠ পরিষ্কারই হয় না। হবে কি করে। জোলাপ বেশি ব্যবহার করাতে শরীর তার স্বাভাবিক ক্রিয়া ভুলে গেছে ব। শরীরকে যত বেশি অন্যায় প্রশ্রয় দেয়া যায় ততই সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। অনেক ওষুধ শরীরকে সাহায্য করে না, তাকে অকর্মণ্য হতেই সাহায্য করে।

ওষুধ কিনে-কিনে বাড়িটাকে হাসপাতাল বানিয়ে তুলবেন না। মনে রাখবেন, অকারণে যখন তখন ওষুধ ব্যবহারই একটা রোগ, একটা মানসিক ব্যাধি।

॥ আজিকার সমস্যা ॥

নারীসমাজের অপরাধ প্রবণতা

অরুণা মুখোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট, সুপ্রীমকোর্ট

নারী সমাজের অপরাধ প্রবণতার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই অপরাধ শব্দটির তাৎপর্য আমাদের জানতে হয়। অপরাধ বা ইংরাজীতে যাকে বলে crime সেটি নাগরিক আইনের বিপক্ষে কখন কার্য সাধন করে আবার কখনও বা ত্রুটিসাধনও করে। রাষ্ট্রের আইন সম্মত কার্যপ্রনালীর ফলেই ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি বিধান করা হয়। অপরাধ প্রত্যক্ষভাবে নাগরিককেই বিশেষ ভাবাপন্ন করে তোলে। আর দেওয়ানী দোষ বা Civil injury প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত অধিকারের বিরোধী। সুতরাং ফৌজদারী অপরাধ ও দেওয়ানী দোষ বা অপরাধের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য হলো প্রথমটিতে আদালতে শাস্তির বিধান আছে ও পরেরটিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এই ফৌজদারী অপরাধের মধ্যেই দেওয়ানী দোষ জড়িত থাকে কিন্তু প্রতিটি দেওয়ানী দোষেতেই ফৌজদারী অপরাধ অথবা প্রতিটি ফৌজদারী অপরাধেই দেওয়ানী দোষ লিপ্ত থাকে না।

বড়যন্ত্র, ব্যক্তিগত উপদ্রব, অন্যায়ভাবে প্রবেশ ইত্যাদি এগুলি হলো দেওয়ানী দোষ বা অপরাধ। আর যারা হাঙ্গামা মিথ্যা করেদে রাখা অথবা নিন্দা অপবাদ দেওয়া এগুলি হলো ফৌজদারী অপরাধ ও দেওয়ানী দোষ উভয়ই।

তবে পুরোপুরি অপরাধ বলতে এখানে বোঝায় জালিয়াতি, বহুবিবাহ, নরহত্যা ইত্যাদি। বর্তমান প্রবন্ধে এই ধরণের অপরাধের কথাই বলছি আদালতের অভিজ্ঞতা হতে :

নিজের ব্যক্তিগত কর্মজীবনে দেখেছি অনেক সময় মেয়েরা অভাবের তাড়নায় অপরের সন্তানকে হত্যা করে ফৌজদারী অপরাধে লিপ্ত হন। মেদিনীপুরের একটি মামলায় দেখেছিলাম এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিধবা মাত্র ২৪৲ টাকা দেনার জন্য পাশের বাড়ীর ভদ্রমহিলার ছেলেকে জলে গলা টিপে হত্যা করে তার কোমরের রুপোর চেনটি খুলে নেয়। ছেলেটির মৃতদেহ পুলিশ আবিষ্কার করে ও সেই বিধবাকে ধরা হলে জানা যায় যে ঐ চেনটি বিক্রী করে দেনা শোধ করেছে। পরে অবশ্য হত্যার অপরাধে ৩০২ ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে বিধবার মৃত্যুদণ্ডের হুকুম হয়ে যায়।

তবে মেয়েদের দ্বারা অপরাধের মূলে অভাবের তাড়না ছাড়াও আরো একটি গুরুতর কারণ বর্তমান থাকে। সেটি হলো মেয়েদের মানসিক অতৃপ্ত বোধ ও যৌন চেতনা। একবার বহুর ২০ বয়সের এক গ্রাম্য নিম্নশ্রেণীর বিধবাকে দেখেছিলাম আদালতে হাজির হ'তে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ৩০৭ ধারায়

হত্যা করার চেষ্টায় অপরাধী ছিল সেই বিধবাটি। অপরাধের কারণ প্রসঙ্গে জেনেছিলাম তার স্বামীর মৃত্যুর পর অপর একটি পুরুষ প্রেমিকের প্রতি বিধবাটি আসক্ত ছিল; এই পুরুষটিকে বিয়ে করার প্রবল আকাঙ্খাকে বাধা দিয়েছিল বিধবাটির বাবা, মা ও ভাই; কারণ তাদের জাতিতে বিধবা বিবাহ ছিলনা! সুতরাং বিধবা তার মনের প্রবল অনুভূতিকে জয় করতে না পেরে একদিন স্থির করলো সেই অপর পুরুষটির কাছে পালিয়ে যাবে। এই সমস্যই সে বাবা মায়ের রান্না করা খাদ্যে ধুতুরো বিষ মিশিয়ে দেয়। বহু জেরার পর যে স্বীকার করে যে বাবা মাকে হত্যা করার ইচ্ছা তার ছিলনা; কেবলমাত্র অন্যপুরুষটির কাছে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ইচ্ছেই তার প্রবল হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য এই মামলায় ধুতুরো বিষ খাদ্যপ্রয়োগে বাবা, মা ও ভাইয়ের যে জীবন সংশয় ঘটতে পারে এটি ২০ বছরের মহিলার পক্ষে জানা সম্ভব নয় এই কারণের ভিত্তিতেই ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

মেয়েদের দ্বারা হত্যা ও আত্মহত্যার অপরাধের প্রসঙ্গে আদালতে আরো দুটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একবার একটি স্ত্রীলোককে তার ৬ মাসের শিশুকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ী থেকে মনের দুঃখে বেরিয়ে আসে। কিছুদূর যাবার পর সে তার স্বামীকে পিছন হতে ছুটে আসতে দেখে আতঙ্কে সামনের একটি পুকুরে ঝাঁপ দেয়। এতে শিশুপুত্রটির মৃত্যু ঘটে কিন্তু মহিলাটির উদ্ধার পায়। নিম্নকোর্টের আদালতের বিচারে শিশুপুত্রের মৃত্যু ঘটানোর অপরাধে ও আত্মহত্যা করার চেষ্টার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে ৮ মাস কারাদণ্ড হয়। তবে হাইকোর্টে আপীলের রায়েতে বলা হয় যে শুধুমাত্র স্বামীর নির্যাতনের হাত হতে রেহাই পাবার জন্যই সে এই বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিল। সুতরাং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৯ ধারা অনুসারে স্ত্রীলোকটিকে আত্মহত্যা করার চেষ্টার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যায়না। হাইকোর্টের বিচারে তার ৬ মাস কারাদণ্ডই উপযুক্ত শাস্তি বলে বিবেচিত হয় ও ৮ মাস কয়েদ ভোগ করেছে বলে সে তখনি মুক্তি লাভ করে।

আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এটিতে শাশুড়ী পুত্রবধূকে এমনভাবে প্রহার করে যে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এরপর শাশুড়ী তাকে তুলে ছাদ হতে ফেলে দেয়। এতে তার মৃত্যু ঘটে। শাশুড়ী আত্মরক্ষা করে এই বলে যে পুত্রবধূটি আত্মহত্যা করেছে; কিন্তু আদালতের বিচারে সাব্যস্ত হয় যে শাশুড়ীই তার হত্যার জন্য দায়ী। এই অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

মেয়েদের দ্বারা হত্যা ও আত্মহত্যার বহু অপরাধের মূলেই দেখেছি সমাজই প্রকৃত দায়ী; কখন বা অভাবের তাড়নায় তারা অপরাধে লিপ্ত হয়েছে আবার কখন বা অল্প বয়সের বিধবা তার অতৃপ্ত ভোগলালসাকে প্রকট রূপ দিতে গিয়ে তার প্রতিরোধকারী আপন প্রিয়জনকে হত্যা করার চেষ্টাতেও দ্বিধা করেনি। এ এছাড়া সামাজিক পরিবেশে শাশুড়ী ও পুত্রবধূর কলহও অনেক অপরাধের কারণ থাকে।

তবে এই ধরণের অপরাধ ছাড়াও মেয়েরা আরো কতকগুলি অপরাধ করে থাকেন। এই সংখ্যাই এখন বেশি। এগুলি হলো ৩৬৩ ধারায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের অপরাধ। ৩৬৩ ধারার অপরাধে অনেক সময় মেয়েরা ছোট ছোট মেয়েদের অভিভাবকদের আওতা হতে সরিয়ে নিয়ে যায় কোন অসৎ উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে এই অপরাধে ৭ বছর কারাদণ্ড পর্য্যন্তও শাস্তি দেওয়ার বিধান আছে। এ ছাড়া মেয়েরা হত্যা অথবা নারীঘটিত অপরাধমূলক কাজে সহায়তাও করে থাকেন। আজকাল মেয়েরা মোটর গাড়ী চালাতে

গিয়েও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে অন্যের প্রাণ সংশয় করে অপরাধে লিপ্ত হচ্ছেন। ৩০৭এ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ২ বছর কারাদণ্ড ও Motor vehicles Act অনুসারেও তার শাস্তি হয়।

একবার আদালতের কাজে প্রেসিডেন্সী জেল পরিদর্শন করতে গিয়ে বহু মেয়ে আসামী দেখেছিলাম। এদের মধ্যে বেশ বেশির ভাগই দেখলাম যারা পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন ও এই পাপ ব্যবসায়ের সহায়তার কাজেও আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন। আর যে দুটিকে দেখলাম তাদের মধ্যে একটি হত্যার অপরাধে সহায়তা করেছে আর অপরটি ছোটখাটো সামান্য চুরীর অপরাধের আসামী।

অপরাধকে দমন করার জন্যই আইনের প্রবর্তন হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তবুও অপরাধের পথ এখনও বন্ধ হয়নি। পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় কম বেশি একই অবস্থা। তাছাড়া আমাদের হতে হয় ১৯৪৭ সালে আমেরিকাতেও খুনের আসামী মেয়ে ছিল ৩৭৩ জন। বর্তমান যুগে এদের সংশোধন করার উপায় সম্বন্ধে আইনের দৃষ্টিতে বলা যায় যে আইনের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত ও সেই ধরণের শিক্ষা দেবার জন্যই সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ আরো বেশিমাত্রায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

ধার নেওয়া-দেওয়া

তৃপ্তিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় শোনা কাহিনী মনে পড়ে গেল। আমাদের পুরোহিত মহাশয়ের কাছে শুনেছিলাম। এক ব্যক্তি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে প্রথমে স্ত্রীকে দুটি কথা জিজ্ঞেস করতেন—ধার শোধ করেছ, ধার দিয়েছ? এটি রূপক প্রশ্ন ধার শোধ করার অর্থ বাবা মার কাছে ছেলেবেলায় পাওয়া স্নেহ আদর এবং খাওয়া পরার বিনিময় স্বরূপ তাঁদের সেবা শুশ্রূষা এবং পরার ব্যবস্থা করা এবং ধার দেওয়ার অর্থ—ভবিষ্যতে নিজের ছেলেদের কাছে সেবা এবং খাওয়া পরার প্রত্যাশায় তাদের আদর যত্ন এবং ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। কথাটা প্রাচীন হলেও আমার কাছে খুব মূল্যবান মনে হয়।

অবশ্য প্রাচ্যের এই আদর্শ কথাটার মূল্য বোধ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক।

দুশো বছর ইংরেজ রাজত্বের ফলে ইংরেজদের আচার ব্যবহার সমাজ ব্যবস্থা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে। আমাদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার পাশ্চাত্য প্রভাবে সম্পূর্ণ প্রভাবিত আজ। যেমন আমাদের ভাবপ্রবণ বাঙালীর, একান্নবর্তী পরিবার কত সুখের ছিল। আজ সেখানেও পাশ্চাত্য ধারা বয়ে চলেছে। অবশ্য 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হলেই শান্তি সভ্যতা বজায় থাকে। সে না হয় ভাইয়েরা নিজের কর্মস্থানে থাকল তাদের স্ত্রীপুত্র নিয়ে কিন্তু বুড়ো বাপ মা, তাদের কি ব্যবস্থা হবে? আমরা পাশ্চাত্য প্রভায় প্রভাবিত হলেও জন্তু তো তাঁদের ক্ষমা করবে না।

পাশ্চাত্য দেশ ধনীর দেশ। সেখানকার মা-বাবা ছেলেমেয়ে মানুষ করেও গাড়ী-বাড়ী তৈরী করতে পারে। অন্ততঃ নিজের বার্ধক্যের সংস্থান তো বটেই। কিন্তু বাংলা তথা ভারত গরীব দেশ। ছেলেমেয়ে মানুষ করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে খুব কম লোকই বাড়ী গাড়ী দুরখান, নিজেদের শেষ জীবনের

সংস্থান করতে পারেন। তাঁরা কোথায় যান? ছেলেরা বড় হলে সেই বাপমাকে যদি কাছে না রাখেন তবে তাঁদের কি উপায়? তবে হ্যাঁ, আগে যেমন লোকে থাকত মা বাবাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করবে সেটা বোধহয় আজকের যুগে উঠে গেল। বেশ তো, দেবতাজ্ঞানে যদি সম্ভব না হয় অন্ততঃ শিশুজ্ঞানে ভালবাসতে হয়। শিশুজ্ঞানে যদি দেখা হয় তাহলে জিনিষটা অনেক সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে যায়। বুড়োমানুষের দোষ ত্রুটি ছেলের মত ধরে নিলেই তাকে খানিকটা মেনে নেওয়া যায়। শিশু যেমন নিজেকে বেশী করে চেনে, তেমনি শিশুদের মত তাঁরাও (মা বাবা) নিজেদের খুব বেশী করে চিনতে শেখেন। ছেলেমেয়েদের সুখ সুবিধার প্রতি স্বতঃই তাঁদের দৃষ্টি কম থাকে, তখন তাঁদের মনে পড়ে না এই ছেলেমেয়েকে তাঁদের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। এইসব শিশু সুলভ মনোভাবের জন্য শিশুর মত বৃদ্ধদেরও আহার নিদ্রা স্নান ইত্যাদি সমস্ত নিয়ম ধরা হয়। এই কথাটা মনে রেখে যেমন নিজের ছেলেকে ঘড়ি ধরে খাওয়ানো শোওয়ানো বেড়ানো ইত্যাদি করা হয়, তেমনি শ্বশুর শাশুড়ীর দৈনন্দিন কাজে যেন নিয়মের ব্যাঘাত না ঘটে এতটুকু সেদিকে বধূদের যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা উচিত। আধিক স্বাচ্ছল্য সব পরিবারে থাকে না, কিন্তু নিয়মের স্বাচ্ছন্দ্য সামান্য চেষ্টাতেই দেওয়া যায়।

একটা কথা আছে 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না।' কথাটা চিরকালীন সত্য, তবু গঙ্গা না হোক সামান্যতম আহার বাসস্থান যখন ভাগের মা বাবাকেও দিতেই হবে, তখন আমার মতে এক ছেলের কাছে মা আরেক ছেলের কাছে বাবাকে রাখার নীতিটা ভাল। যদি মা বাবা দুজনেই একসঙ্গে ভাগ করে এক এক ছেলের কাছে থাকেন তাতে মা বাবারও স্থান তথা মন পরিবর্তন হয়, একঘেয়েমী যায়, ছেলেদের কাছেও সেটাই বোধ হয় বেশী কাম্য। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পর থেকে দূরে থাকতে হয় না। এই রকম হিসেব করে থাকলে মাবাবাদের মন ভাল থাকে, ছেলেদের মধ্যেও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় না।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথার উল্লেখ করছি। বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর থেকে চালু হয়ে গেছে কথাটা "বালা প্রণয়ে অভিশাপ আছে।"

প্রণয়-বিবাহ সাধারণতঃ কখনোই অভিভাবকের মনঃপুত হয়না। সুতরাং নবদম্পতি প্রথম থেকেই শ্বশুর শাশুড়ীর বিষদৃষ্টিতে পড়েন এবং উভয় সঙ্কটে পতিত পুত্র একদিকে জনক-জননী অন্যদিক জায়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্বভাবতঃই বহুরূপী, খিটখিটে হয়ে পড়েন এবং গৃহিনীর সঙ্গে গৃহসুখ পান না। কাজেই প্রণয়ীযুগল দুদিনেই প্রণয় গর্জনে পর্যবসিত হয় এবং সে গর্জনে আশ্রয় প্রতিবেশীকে আক্ষেপ করতে শোনা যায় বাল্য প্রণয় কখনো স্থায়ী হয়? 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' অনায়াসেই 'প্রতাপচন্দ্রের অকালমৃত্যু এবং শৈবলিনীদের জীবনব্যাপী অশান্তির অবসান ঘটাতে পারে।

আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। অনেক অনেক দিন আগে পৌরাণিক যুগেও বানপ্রস্থ যাওয়ার ব্যবস্থা চালু ছিল। যুধিষ্ঠিরের অতকষ্টে রাজত্ব পাওয়ার পরেই তাদের ঐহিক সুখ না দেখেই কুন্তীদেবী চলে গেলেন বানপ্রস্থে। আবার কিছুকাল রাজত্ব করার পর যুধিষ্ঠির নাতি পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে পাঁচভাই দ্রৌপদী সহ চলে গেলেন মহাপ্রস্থানের পথে।

কেন, তাঁদের কি অতবড় রাজপ্রাসাদের এককোণে ঠাঁই মেলেনি? না তাঁরা বুঝে ছিলেন সংসার থেকে অবসর নেবার সময় হয়েছে।

আর্য্যদের সমাজব্যবস্থায় ছিল কিছুকাল সংসার ধর্ম পালন করে বনে চলে যাওয়া। "পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ।" চাকরীতেও "রিটায়ারিং এজ" আছে। সামান্য একটা রেশনের দোকানে বা টিকিট ঘরের সামনে

লাইনে দাঁড়ালে যখন রেশন বা টিকিট নিয়ে নেওয়া হয়, তখন সেইখানে একমিনিট দাঁড়িয়ে যদি খুচরো পয়সা গোনা হয়, পেছনের লোক ঠেলতে সুরু করে "লাইন থেকে সরে যান মশাই, বাইরে দাঁড়ান"— তেমনি ভগবানের রাজত্বেও সংসারে বেশীদিন দাঁড়ালে পেছন থেকে বলতে সুরু করে।

তবে আজকের 'বনমহোৎসবের' যুগে তো বন নেই। 'বন কেটে বসত' হচ্ছে। কাজেই বনে যাবার প্রশ্ন ওঠেনা তবে সংসারে থেকেও পাকাল মাছের মত পাকটুকু আর গায়ে লাগানো উচিত নয় আজকার বৃদ্ধবৃদ্ধাদের।

সংসারে থাকলেও বৃদ্ধবৃদ্ধার সংসারে ভাল, মন্দ আছে. সেই এসব কিছু দেখা উচিত নয়, কারণ আধুনিক ছেলের বিয়ে নিশ্চয়ই কম বয়সে হয়না, যে পুত্রবধূ আসে তারও বয়স নিশ্চয়ই এমারো বারো নয়। কাজেই সংসার সম্বন্ধে বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা নিয়েই তারা সংসারে প্রবেশ করে। কাজেই এইটে ভাল ওইটে মন্দ দেখাবার দিন পেরিয়ে গেছে। বরং এইসব বলতে গেলেই পুত্র পুত্রবধূর অপ্রিয় ভাজন হবারই সম্ভাবনা। তার সবচেয়ে বড় কারণ এক যুগের ভালমন্দ আরেক যুগে বাতিল হয়ে যায়। যদি কোন কাজে ভুল হয়, ঠেকে শিখবে তারা। বলার প্রয়োজন হয় না। বয়সই ঠিক সময় সব কিছুই শেখায়।

একটা কথা বলতে শোনা যায় মা বাবাদের—"কতকষ্টে ছেলে মানুষ করেছি তার কাছ থেকে এই ব্যবহার!" অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দুই যুগের মানুষের মতের অমিল।

কিন্তু একথা একবারও মনে করেন না তাঁরা নিজের আনন্দের জন্যে ছেলেকে মানুষ করেন। কোন এক ভাবী পুত্রবধূর জন্য ছেলেকে বড় করে তোলেন না কেউ। অতএব সেই ছেলেই বড় হলে তাদের উপর সংসারের ভার ন্যস্ত করে নিজেদের নিরালম্ব ভাবে থাকা উচিত।

তাঁদেরকেও দেখতে হবে ছেলেদের যেন তাঁদের জন্য বিশেষ কোন অসুবিধা না হয়। কারণ তাদের সংসার পালনের এই সময়। জন্ম থেকেই মা বাবার শাসনের মধ্যে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়। আবার বৃদ্ধ বয়স হলেই সেই ছেলেমেয়েরাই তাঁদের মতই পুত্রবধূর কাছে থাকতে বাধ্য হবেন। আমি অবশ্য অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা বলছি। কাজেই বিয়ের পর যদি ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আনন্দ না করে তবে কোন সময় তারা জীবন উপভোগ করবে? তাদেরও তো রেশনের দোকানে জিনিষ নিয়ে খুচরো গোনবার সময় দেবেনা পরবর্তী যাত্রীরা।

এইসব কারণে শাশুড়ী ও বধূর মধ্যে একটা অলিখিত আইন সৃষ্টি করে নিতে হয় তোমাদেরও নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না, আমাদেরও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেনা তবেই সংসারে শান্তি বিরাজ করবে। অন্ততঃ পক্ষে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' তো হবেই।

আবার পুরোহিতের কাছে শোনা গল্পকথার উল্লেখ করছি। যার দেওয়া এবং যার শোধ করা কথাদুটোর মধ্যে সূচ্যর্থও আছে। যার নিতে সবারই ভাল লাগে কিন্তু শোধ করতে সকলেই কাতর হয়। শুধু কর্তব্য বোধে এবং যারা হয়েই মানুষ করে শোধ করে। এই যার নেওয়া দেওয়া যে বাধ্যতামূলক এবং কর্তব্য বোধ প্রসূত এই ব্যাপারটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় মাঝামাঝি ভুলে থাকাটাই কাম্য নয় কি?

গল্পভারতী

অগ্রহায়ণ ১৩৭৬

রজত জয়ন্তী বর্ষ

পঞ্চবিংশতি বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

নলিনীবাবু এলেন আমার বাড়ীতে। প্রায়ই আসেন। আজও এসেছেন। নলিনীবাবুর বয়স সত্তোর পেরিয়েছে। বেশ জ্ঞানী-গুণী মানুষ।

তিনি এলেই ঘরের আবহাওয়াটা যেন অন্যরকম হয়ে যায়। ভদ্রলোকের মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। আনন্দময় পুরুষ। হাসতে হাসতে কথা বলেন। কিন্তু তাঁর সব কথা—সব আলোচনা কেমন যেন একটুখানি অন্য ধরণের। ধর্মের কথা বলেন। আধ্যাত্মিক আলোচনা করেন। তাঁর সব কথাই যেন জীবন, মৃত্যু আর ভগবানকে নিয়ে।

আমি সেদিন তাঁকে বলেছিলাম—মানুষের বয়েস যতই বাড়তে থাকে ততই যেন মৃত্যুভয় তাকে পেয়ে বসে। তাই বৃদ্ধ বয়সে মানুষ বুঝি মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে বেশি ভালবাসে?

নলিনীবাবু হেসেছিলেন আমার কথাটা শুনে। বলেছিলেন, হ্যাঁ। 'হারাই হারাই সদা ভয় হয়।' এ শুধু ভয় নয়। পরিচিতের কাছ থেকে চিরবিদায় নেবার ব্যথা।

তারপর তিনি তার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, শুনুন তাহ'লে। মানুষ যতদিন তার ছোট্ট পরমায়ুর খণ্ড চেতনার মধ্যে বাস করে ততদিন সে নিজেকে ভাবে নিতান্ত অসহায়। তখন সে মৃত্যুর অনুভূতিতে দুঃখ পায়—কষ্ট পায়। তারপর যদি সে তার নিজের সাধনার দ্বারা খণ্ড চেতনার ঊর্দ্ধে গিয়ে পূর্ণ চৈতন্যের সন্ধান পায়, অবিনশ্বর আত্মায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আর তার মৃত্যু ভয় থাকে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি মৃত্যুভয় জয় করেছেন?

নলিনীবাবু বললেন, জয় করেছি কিনা ঠিক জানি না। তবে জীবন-মৃত্যুর অজানা রহস্যটিকে জানবার চেষ্টা করছি অনেকদিন থেকে। এতদিন পরে মনে হচ্ছে যেন কিছুটা জানতে পেরেছি। যতই জানছি ততই যেন মন থেকে ভয় চলে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখনও আপনি পুরোপুরি জানতে পারছেন না কেন?

নলিনীবাবু বললেন, এই জানার পথে ভগবান নিজেই বাধার সৃষ্টি করে রেখেছেন। প্রথম থেকেই আমাদের চোখ বেঁধে দিয়ে এই সংসারের অরণ্যে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। ছেড়ে দিয়ে নিজে লুকিয়ে আছেন এক জায়গায়। লুকিয়ে থেকে লুকোচুরি খেলছেন আমাদের সঙ্গে। বলছেন, 'এইবার ধরো আমাকে!' আমাকে একবার ধরতে পারলেই তোমার মুক্তি। বুড়ী ছুঁলেই খেলা শেষ।

—চোখের বাঁধন খুলতে পারছেন না?

নলিনীবাবু বললেন, না রে ভাই, বড় শক্ত গেরো।

যেমন ধরো—আমার সংসার আছে—স্ত্রী-পুত্র কন্যা—সব আছে। ইস্কুল-মাষ্টারী করে সংসার চালিয়েছি, এখন বয়স হয়েছে, ইস্কুলের মাষ্টারী নেই, প্রাইভেট টিউসনি করে সংসার চালাই। আজ আমি হঠাৎ যদি মারা যাই, কে আমার এই সংসার চালাবে, কে খেতে পরতে দেবে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে—এ দুশ্চিন্তা থেকে আমার রেহাই নেই। ছেলেটা ছোট, এখনও ক্লাস-এইটে পড়ে, সে কিছুই করতে পারবে না, দুটো বড় বড় বিবাহযোগ্যা মেয়ে—কেই-বা তাদের বিয়ে দেবে, খাবেই-বা কি, পরবেই-বা কি—এই কথা ভেবে ভেবে যখন দিশেহারা হয়ে যাই তখন মৃত্যুভয়কে জয় করেছি—এ-কথা বলি কেমন করে?

বললাম, তবে যে এতক্ষণ বলছিলেন—

কথাটা তিনি আমাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি সব। জ্ঞান দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বুঝি সব। অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে আছি যে-আমি, সেই নির্বোধ আমাকে দিয়েই মহামায়া করিয়েছেন যা-কিছু সব। অথচ আমাদের অহং-বুদ্ধি এতই প্রবল যে সব সময়েই ভাবি—আমিই করেছি। আমরা সহজে এই অহং-বুদ্ধির অতীত সত্তার অনুসন্ধান করি না। তা যদি করতাম তাহ'লে ভগবানের নিত্য এবং শাশ্বত সত্তার পরিচয় পেতে পারতাম।

আমাদের নিম্ন প্রকৃতি সব সময়েই ঊর্দ্ধ প্রকৃতিকে স্পর্শ করবার জন্য উন্মুখ আমি জানি। জানি আমাদের প্রাকৃত জীবনের গতি দিব্য জীবনের দিকে।

কিন্তু সব কিছু জেনে শুনেও আমরা সহজে সে দিব্য জীবন লাভ করতে পারি না।

মন আমাদের সব সময়েই চঞ্চল। সব সময়েই আমি আমার সংসারের মমতায় মোহমুগ্ধ। আর সেই জন্যই হৃদয় শান্ত হয় না। আবার অচঞ্চল এবং শান্ত বিশুদ্ধ এবং পবিত্র হৃদয়াবেগ ছাড়া আত্মার উদ্বোধন হয় না।

আবিলতাহীন হৃদয়েই স্ফুরিত হয় ভাগবত প্রেম।

এই প্রেম যতক্ষণ না জন্মায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুধু ভগবান এবং তাঁর অপরিমেয় শক্তি সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি মাত্র, করুণাময় ভগবানের অপরিমিত আনন্দ-শক্তির সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় না।

এই বলে নলিনীবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এতক্ষণ বড় বড় কথা বললাম, এইবার শুনুন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। এই সংসার, জন্ম মৃত্যু আর ভগবান সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলেছেন শুনুন। বড় বড় তত্ত্বকথাকে তিনি জলের মত সোজা করে বুঝিয়ে দিতেন।

এইটি তাঁর বরাবরের অভ্যাস। কথায় কথায় পরমহংসদেবের কথা না বললে নলিনীবাবু তৃপ্তি পাননা।

কথা হচ্ছিল প্রতাপ মজুমদারের সঙ্গে বৈকুণ্ঠ সেনের।

প্রতাপবাবু বললেন, ঈশ্বর সত্য অথচ তাঁর সৃষ্টি মিথ্যে একথা মানতে আমি রাজী নই। তাঁর সৃষ্টিও সত্য।

বৈকুণ্ঠ সেন বললেন, ওই তো ঠাকুর বসে রয়েছেন। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্।

বলেই ঠাকুরের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলুন তো মশাই সংসার কি মিথ্যে?

এক কথায় জবাব দিয়ে দিলেন ঠাকুর। বললেন, যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানা যায় ততক্ষণ মিথ্যে। ততক্ষণ মায়া। ততক্ষণ শুধু আমার আর আমার। এদিকে চোখ বুজলে কিছু নেই অথচ আমার ছেলের কি হবে? আমি মরে গেলে মেয়ে দুটোর বিয়ে হবে কেমন করে? এই তো?

বৈকুণ্ঠ সেন বললে, কিন্তু সংসারের হাজার ঝামেলার মধ্যে তাঁকে জানাও তো মুস্কিল। তাঁকে জানাবো কেমন করে?

ঠাকুর বললেন, এক হাত তাঁর পাদপদ্মে রাখো, আর এক হাতে সংসারের কাজ কর। ছেলেদের গোপাল বলে খাওয়াও। বাপ-মাকে দেবদেবী বলে সেবা কর। স্ত্রীর সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বল। তুমি যখন সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যাবে না, সংসার করতে এসেছ সংসার যখন করবেই, তখন ঈশ্বরকেও রাখো সংসারকেও রাখো।

বৈকুণ্ঠ সেন বললেন, তাই-বা রাখতে যাব কেন? সংসার যখন অনিত্য, তখন সংসারই-বা রাখবো কেন?

ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরকে জেনে সংসার করলে সংসার অনিত্য হয় না।

—সংসারের খাটুনি কতদিন খাটবো বলুন তো?

—যতদিন তিনি খাটাবেন ততদিন। তিনি যে কাজ করতে দিয়েছেন সেই কাজ মন দিয়ে করো। যদি মনে করো—তাঁর দেওয়া কাজ তুমি করে যাচ্ছ তাহ'লে তাকে আর শুকনো কর্তব্য মনে হবে না। মনে হবে তাঁরই পুজো করছো। ছেলেদের মানুষ করবে, মেয়েদের বিয়ে দেবে—স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে যাবে। তা যদি না করলে তাহ'লে তো তুমি নির্দয়। যার দয়া নেই সে মানুষই নয়।

কে একজন বলেছিল, এই সব করতে করতে মাঝ পথেই যদি আঁধার নেমে আসে? যদি সব বুঝিয়ে গুছিয়ে দেবার সময় না পাই?

ঠাকুর বলেছিলেন, তাঁরই হাতে ছেড়ে দিয়ে যাবে—যিনি তোমাকে এই ভার দিয়েছিলেন। তুমি তো আর মন্দ লোকের ওপর ছেড়ে দিচ্ছ না—স্বয়ং ঈশ্বরের ওপর দিচ্ছ।

আবার এলো সেই অন্ধ বিশ্বাসের কথা।

ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাস রেখে সব কাজ করে যাও। তোমার জন্যও বিশ্বাসই আনবে নির্ভরতা। তোমাকে করবে নির্ভয়।

এই কথা বলে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ননীবাবু বললেন, জয় হোক শ্রীরামকৃষ্ণের!

তাঁরই ওপর নির্ভর করে সব কাজ করে যাচ্ছি।

তবু ভুল হয়, ভ্রান্তি হয়, মাঝে-মাঝে সব কিছু ভুলে যাই। তখন বলি—

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ!

বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমরা ঘুচাবো মা তোর দৈন্য

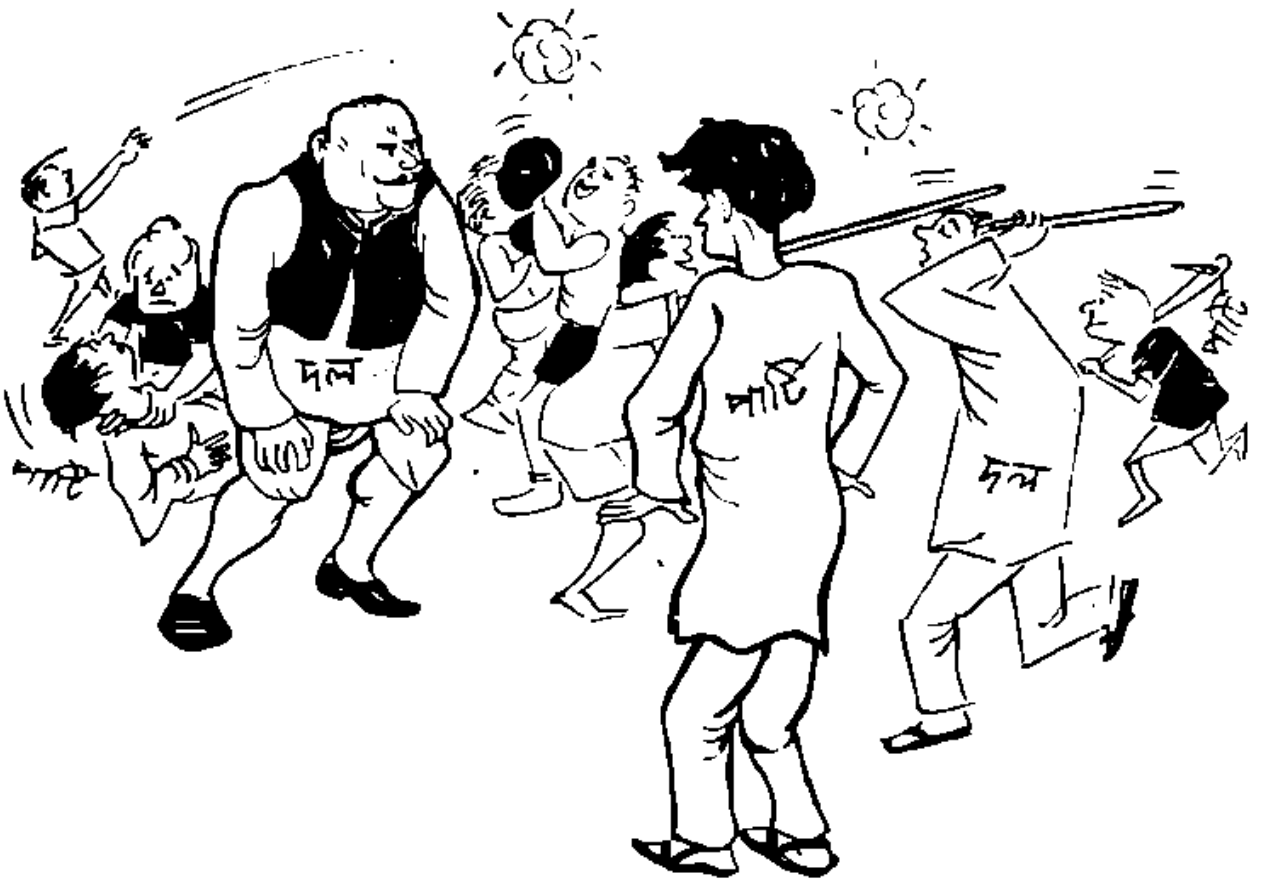

মানুষ আমরা নহি তো মেষ .....

একদিন কংগ্রেসই ছিল একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই কংগ্রেসেরই পতাকাতলে দেশের সর্বশ্রেণীর কোটি কোটি নরনারী মাতৃ-মন্ত্রের নামে শপথ গ্রহণ করেছিল—'বন্দেমাতরম্'!

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খলই মুক্ত করবে, এমন নয়, দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ়তর করবে—দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য-সদ্ভাবে প্রদেশে প্রদেশে ভ্রাতৃত্বের রাখী-বন্ধন পরিয়ে দেবে—এই ছিল কংগ্রেসের মহান সঙ্কল্প। সেই সংকল্পে আসমুদ্র হিমাচল সারা ভারতবর্ষ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল। বাংলা দেশ এবং বাঙালীর সঙ্গে এই কংগ্রেসের অতীতের সম্পর্কের কথা পরলোকগত সুবিখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার গল্প-ভারতীর পৃষ্ঠায় একদিন লিখেছিলেন—আজকের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সেই সুসম্বদ্ধ তথ্যমূলক কংগ্রেস-কাহিনী আমরা পুনর্বার পরিবেশন করছি।

—সম্পাদক

কংগ্রেস ও বাঙ্গালী

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ভারতে আত্মকর্তৃত্ব লাভের আশায় রাজনৈতিক আন্দোলনের গোড়ার কথা বলবার পূর্বে, অতীত থেকে বর্তমান যুগে আসার ইতিহাস স্মরণ করা দরকার।

ভারতে ইংরাজের আগমন আর রাজ্যবিস্তার ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। বিদেশী ও বিধর্মী রাজশক্তি ভারতে কিছু নতুন ব্যাপার নয়। বাইরে থেকে এসে মুসলমান রাজশক্তি ভারতে জুড়ে বসলো। তার প্রবল স্বেচ্ছাচারী বাহুবলের ধাক্কাটা খুব জোরেই লাগলো—কিন্তু তার মধ্যে অন্তঃকরণের সৃজনীশক্তি জাগ্রত করবার মত কোন বুদ্ধির দীপ্তি ছিল না বলে ভারত বাইরের আঘাতে সঙ্কুচিত হ'য়ে তার অতীতের জড় প্রথার মধ্যে রইল আত্মগোপন করে। মুসলমান রাজশক্তির দশাও তাই। সেও তার অতিনির্দিষ্ট চিরপ্রথার সংস্কারজড়িমাজালে আচ্ছন্ন। তাই বহির্বিশ্ব থেকে এই দুই জড় সভ্যতা পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে ভারতের দিগন্ত জুড়ে ছিল—দেশের চিত্তলোকে কোন নবসৃষ্টির আবেগ জাগাতে পারেনি। বিরুদ্ধ মতের সংঘাতে ধর্মান্দোলন হয়েছে, এক এক জন ধর্মপ্রচারককে কেন্দ্র করে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু চিরপ্রথার বেড়া দেওয়া সমাজের বাইরের ও মনের কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

এমন সময় এলো ইংরাজ, কেবল বণিক বা রাজারূপে নয়—এক নবীন সভ্যতার চিত্তদূতরূপে। রাজশক্তি এবং রাজপরিচালনার কেন্দ্র রইল সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। এদেশেও বৃটিশ শাসক ও বণিক সামাজিক জীবনে মুসলমান অপেক্ষাও দূরে সরে রইল। কিন্তু ইয়োরোপের নবীন সভ্যতা সংস্কৃতি কল্পনার কুহকমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাধনা এমন ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের চিন্তা চরিত্র বুদ্ধির ওপর প্রভাব বিস্তার করলো, যা এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। মুসলিম আধিপত্যের বিলোপ এবং বৃটিশ রাজশক্তির অভ্যুদয় সম্বন্ধে আমাদের সেদিনের মনভাবে কিছুটা সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিলো, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে সাহিত্য

দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসের অভিনব ভাবরস আস্বাদনে আমাদের মনে কোন কুণ্ঠা ছিল না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সামাজিক সুবিচার, মানুষ মানুষ বলেই অপক্ষপাতভাবে সমান ব্যবহার পাবার অধিকারী—এ সব কথা আমাদের দেশে নতুন। অন্যায় করবার অবাধ অধিকারই প্রতাপের লক্ষণ—ধর্মের বিধিবিধান মেনে চলবে সাধারণ লোক, কিন্তু সেই সব নিয়ম মানবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, অভিজাত এবং রাজকুলসম্ভূত অসাধারণদের এই তো জানা ছিল চিরকাল। ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর মনে এটা কত বড় বিপ্লব সে কথা আজ বিস্তার করে বলবার প্রয়োজন নেই।

ইংরাজ রাজত্ব দানা বেঁধে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার এই বিপ্লবের পূর্বেই সমাজ বিপ্লব সুরু হয়েছিল। জমির ওপর প্রজার অধিকার বিলুপ্ত হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসূত্রে জমির মালিক হয়ে বসলো জমিদার শ্রেণী, কৃষককুলের হল সর্বনাশ। অন্যদিকে বৃটিশ বণিকের সর্বগ্রাসী লোভে কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে গেল। এই অর্থনৈতিক বিপ্লব এবং বস্তুর সর্বনাশে সমাজের উচ্চবর্গ বিশেষ বিচলিত হয়নি। বরং তারা ব্যবসায়ী সাহেব গোমস্তা ও কুঠিয়ালের দালাল উকীল সরকারী চাকুরিয়া হয়ে স্বচ্ছলতার মুখ দেখলো। ইংরাজী শিক্ষার ফলে ইংরাজ সমাজে আদর ও দেশী সমাজে সম্ভ্রম পেয়ে বৃহৎ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন উচ্চশ্রেণীতে পরিণত হ'ল।

ইংরাজের রাজধানী কলিকাতা—ভদ্র শ্রেণীর নবনাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার শিক্ষা বিস্তার আর ইংরাজের অনুকরণের মাতামাতির মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বশালী মানুষের আবির্ভাব হ'ল। প্রাচীন জ্ঞান বিদ্যার আবিষ্কার ও অনুশীলন চললো। বিগত শতাব্দীর এই সব আন্দোলনের আমি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। কেননা আমি রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনের কথাই মুখ্যভাবে বলতে বসেছি।

শিক্ষিত সমাজে বিগত শতাব্দীর গোড়া থেকেই সাহিত্য ও সংবাদপত্রের রাজনীতিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। ইংরাজের যুক্তিতে তার ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির নজীর দেখিয়ে দেশ শাসনের কিছুটা অধিকার হওয়ার আবেদন নিবেদনের মধ্যে অবশ্যই দেশাত্মবোধের বালাই ছিল না। এই সব নির্দোষ ও নিরীহ আলোচনায় ইংরাজেরা বিরক্ত হতেন না, কৌতুক অনুভব করতেন। ১৮৫৭এর সিপাহী বিদ্রোহের পর, ভারতবাসী কি চিন্তা করে তা জানবার একটা কৌতূহল রাজপুরুষদের মনের মধ্যে ছিল। ক্রমে শতাব্দীর শেষের দশকে এসে ধর্মান্দোলন মন্দীভূত হ'ল। কলকাতায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন, "স্বর্গীয় চাকুরী" ব্রতী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি কেশবচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সুর স্বতন্ত্র ও চড়া। কেশবচন্দ্রের "ইয়ং বেঙ্গল" সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হ'ল। বৃটিশ ঔদারনৈতিক রাজনীতি-স্কুলের পাশ করা ছাত্র সুরেন্দ্রনাথের মুখে ইতালীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, ম্যাৎসিনী গ্যারিবল্ডীর স্বদেশ প্রেমের বাণী শুনে শিক্ষিত যুবজনচিত্ত মোহিত হ'ল। হ'ল রাজনীতি চর্চার সূত্রপাত।

এই আন্দোলনকে ভারতব্যাপী আন্দোলনে পরিণত করার অগ্রণী হলেন সুরেন্দ্রনাথ। আনন্দমোহন বসু ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থাপন করলেন ভারত সভা। এই ভারতসভাই জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। ১৮৭২-১৮৮৩ এই কয় বৎসরের প্রস্তুতির ইতিহাসের নায়ক বাঙালীর প্রতিভা এবং বাগ্মীতা। পরবর্তীকালে আবেদন ও নিবেদনের শূন্যগর্ভ বাগবিভূতি নিয়ে অনেকে হাসাহাসি করেছে, কিন্তু ইতিহাসের বিচারে এর মূল্যও স্বীকার করতে হবে। সুরেন্দ্রনাথের ভারতব্যাপী একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়বার সঙ্কল্পে ইংরাজদের টনক নড়লো। এই আন্দোলন যাতে বিপথগামী না হয়, তাঁরা সতর্ক হলেন। ইংরাজের তত্ত্বিরে ও তত্ত্বাবধানেই জাতীয় কংগ্রেসের গোড়াপত্তন হ'ল। বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ পাটনা থেকে সাড়া এলো ; কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি হলেন,

বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানর্জি। কিন্তু কার্যতঃ ১৮৮৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান নেতা ও পরিচালক। এই কংগ্রেসের বার্ষিক, অধিবেশনে তিনদিন বক্তৃতা দিয়েই অনেকে নেতা হয়ে গেলেন।

কংগ্রেসের প্রথম অধ্যায়ের দীর্ঘ বৎসরগুলি একঘেয়ে দাবির পুনরুক্তি মাত্র। এর লক্ষ্য শাসন-ব্যাপারে অধিক সংখ্যায় উচ্চপদে ভারতবাসীর নিয়োগ, অস্ত্র আইনের কঠোরতা হ্রাস, লবণ শুল্ক প্রত্যাহার এবং মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনায় শাসক শ্রেণীর কর্তৃত্বমুক্ত স্বায়ত্ত শাসন প্রভৃতি। জমিদার ব্যবসায়ী চাকুরিয়া শ্রেণী রাজরোষের ভয়ে কংগ্রেসের ত্রিসীমানায় যেতন না; স্বাধীন বৃত্তিজীবী আইন ব্যবসায়ীরাই ছিলেন কংগ্রেসের মেরুদণ্ড। বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েও এই ধারাই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন, আইনজীবীরা স্বাধীন ভারতের কর্তৃত্বাধিকারও তাঁদেরই হাতে। সেকালে শিক্ষিতবর্গের মধ্যে এঁদের উপার্জন ছিল সর্বাধিক এবং তা শাসকশ্রেণীর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল না। কাজেই এঁরা আইন বাঁচিয়ে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারতেন, যা অপরের পক্ষে নানা কারণে সম্ভব ছিল না।

ইতিহাস সোজাপথে চলে না, মাঝে মাঝে চৌমাথার মোড়ে এসে স্বতন্ত্র পথ নেয়। হঠাৎ বাংলা-দেশে তাই ঘটলো। লর্ড কার্জন, বাংলা দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন। এক প্রচণ্ড বেদনা পেয়ে বাঙালীর স্বদেশপ্রেম ধামোদরের দুর্দম বন্যার মত কূল ছাপিয়ে ছুলে উঠলো—সমস্ত শিক্ষিত সমাজটা দোল খেয়ে নড়ে উঠলো। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী ও বয়কটকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় আন্দোলন, যা পরবর্তীকালে ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলনরূপে পরিচিত হয়েছে, সেটা শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর আন্দোলন হলেও, কংগ্রেসের আন্দোলন নয়! আন্দোলনের গোড়ার দিকে যদিও কংগ্রেসের জনক সুরেন্দ্রনাথ এর উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন ও সরকারী দমন নীতি এ দুইএর অনিবার্য সংঘর্ষ দেখে তিনি পিছিয়ে গেলেন। বাঙালীর এক জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচারে এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এ আন্দোলনের বাণী হ'ল আত্মনির্ভরতা এবং আত্মশক্তির সন্ধান। কংগ্রেসের সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত অংশ "পিটিশান আর প্রটেষ্টের" সীমার বাইরে এগুতে চাইলেন না। কংগ্রেসের মধ্যে দুই পৃথক চিন্তা ও কর্মধারা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা গেল—মডারেট বা নরমপন্থী, জাতীয়তাবাদী বা চরমপন্থী।

বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলন ও নবজাতীয়তাবাদ বাঙালার সীমাতেই আবদ্ধ রইল না। লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র এবং লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে পাঞ্জাব সুর মেলাল। এই প্রবল নবীন জাতীয় আন্দোলন, কংগ্রেসে প্রবেশাধিকার চাইলো, মডারেট নেতারা বাধা দিলেন। ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি দাদাভাই নৌরজী ঘোষণা করলেন, স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের লক্ষ্য। রাজনৈতিক পরিচালনায় স্বরাজ শব্দটির সংজ্ঞা অস্পষ্ট হলেও, এতে সেদিনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা বহুলাংশে তৃপ্ত হয়েছিল। অবশ্য 'স্বরাজ' লাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে গৃহীত হয়েছিল, বহুপরে ১৯২১ সালে। কিন্তু দাদাভাই নৌরজী দুইকূল সামাল দিতে পারলেন না। কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে মডারেটদের সংখ্যাধিক্যে বয়কট প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় তিলক ও বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিরা কংগ্রেস মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে এলেন বটে, সে কেবল সংখ্যা গুরু হয়ে প্রবেশ করবার সঙ্কল্প নিয়ে।

জাতীয়দল শক্তিসঞ্চয় করতে লাগলেন. ১৯০৭ এর সুরাট কংগ্রেসে বলাবলের পরীক্ষা। মডারেট দল মনোনীত সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ভোটের দাবী করা হল, মডারেটরা প্রবাদ গণলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড হল। মডারেট ও জাতীয় দলের বিরোধ তীব্র হল, সে সুযোগ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করলেন। লালা লাজপৎ রায়, অজিত সিংহ নির্বাসিত হলেন, রাজদ্রোহের অপরাধে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত তিলক মান্দালয় জেলে হলেন বন্দী। এই সময় গোপনে বিপ্লব-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল, ১৯০৮এ আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় তা উৎঘাটিত হল। রাজশক্তি সুযোগ বুঝে দমন নীতি দুর্বিসহ করে তুললো। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, সভাসমিতি বন্ধ, রাজ অত্যাচারের নির্মম অভিযানের সম্মুখে নেতাহীন জাতীয় দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অন্যদিকে মডারেট ও মুসলমানদের বিরোধীতায় স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ মন্থীকৃত হওয়ায় ফলে আদর্শবাদী যুব-শক্তি কতক বিপ্লবের গুপ্তপন্থা, কতক বিবেকানন্দের সেবাধর্মের মধ্যে স্বদেশের অভ্যুদয়ের সাধনা গ্রহণ করলো। ১৯১১ সালে রাজা ষষ্ঠ জর্জ ভারতে এসে বঙ্গভঙ্গ রহিত করলেন। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা জোড়া লাগলো, কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র হ'ল। বাঙ্গালী আমরা কার্জনী শাসননীতিতে অহংগর্বে আত্মহারা হলাম। মডারেটরা এটাকে তাঁদের নিয়ম তান্ত্রিক আন্দোলনের জয় বলে আত্মগৌরব ঘোষণা করলেন।

রাজ অত্যাচারে জাতীয়দল ছত্রভঙ্গ, নেতারা কেউ মৃত, কেউ নির্বাসিত, কেউ বা ঢাকা দিয়েছেন এমন অবস্থায় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন একটা প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র। লোকে জাতীয় কংগ্রেস বলতো না, ওর নাম দিয়েছিল 'মেটা মজলিস'। এই মডারেট কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষাও বোম্বাই-এর ফিরোজসা মেটার প্রভাব ছিল বেশী। এই সময় ১৯১৪ সালে ইয়োরোপের মহাসমর, জার্মানীর আক্রমণে ইংলণ্ডে ত্রাহি ত্রাহি রব। ভারত রক্ষা আইনের নামে বাঙ্গালার শত শত যুবক বন্দী ও অন্তরীণ হল। একদিকে দমন নীতি অন্য দিকে স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি বৃটেনের দুমুখো নীতিতে মডারেটেরা ভবিষ্যতের আশায় পুলকিত হলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙ্গলার জাতীয় দল বিপ্লবীদলগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। এদের নেতারা অধিকাংশই বন্দী, বাইরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন। বৃটেনের স্বায়ত্ত শাসন দেবার প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে মিসেস্ বেসান্ত "হোমরুল" আন্দোলন আরম্ভ করলেন। আইরিশ জাতীয়দলের দাবীর এই প্রতিধ্বনি শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। সদ্য কারামুক্ত তিলক এই আন্দোলনকে সমর্থন করলেন, ফলে বাঙ্গালার জাতীয় দলের নেতারাও তাঁর অনুগামী হলেন।

১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস সভাপতি হলেন সুরেন্দ্রনাথ অনুগামী অম্বিকাচরণ মজুমদার। দীর্ঘকাল পর জাতীয়তাবাদী ও মডারেট দল পুনরায় কংগ্রেসী ক্ষেত্রে সমবেত হলেন। অন্যদিকে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লীগও লক্ষ্ণৌএ এসে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালেন। স্বায়ত্ত শাসনের সম্মিলিত দাবীর একটা সর্বজনসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হ'ল এবং যথারীতি বৃটিশ দরবারে পেশ করা গেল। ওদিকে ইয়োরোপীয় যুদ্ধের মোড় ঘুরেছে, আমেরিকা নতুন শক্তি নিয়ে আক্রমণ করায় জার্মানী নাজেহাল। রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর বলশেভিক দল বিজয় পতাকা প্রোথিত করেছে। বৃটেনের সুর ঘুরলো। তাঁরা ১৯১৭ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দাবীর জবাবে বললেন,—ধাপে ধাপে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। জাতীয়তা-বাদীরা নিরাশ হলেন, মডারেটরা আনন্দে উদ্বাহু হয়ে পশ্চিম দিগন্তে নিবদ্ধ করলেন সতৃষ্ণ দৃষ্টি।

ইতিমধ্যে বাঙলার জাতীয়তাবাদ আর তার বৃটিশ শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা নব্য ভারতের চিন্তায় গভীর প্রভাব বিস্তার করলো। রাজনীতি ক্ষেত্রে যা বাঙলার ধ্বনি, ভারতে তার প্রতিধ্বনি কিন্তু পথ কি? মডারেটদের নিয়ম তান্ত্রিক আন্দোলন, আবেদননিবেদন ব্যর্থ, আবার গুপ্ত বিপ্লবিক আন্দোলনও প্রায় নিষ্ফল। মহাযুদ্ধ বিজয়ী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার বিষাক্ত ফণা ভারতের ললাটের সম্মুখে তুলে ধরেছে। এমন সময় ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়। এ এক অভাবনীয়ের আবির্ভাব। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন নয়, নয় হিংসা-মূলক গোপন পথে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চরম আত্মোৎসর্গ। ভারতের সমষ্টি মানবের অহিংস নিরুপদ্রব প্রতিরোধ। কিরূপে সম্ভব! যে শতাব্দী ধরে যে লোকসাধারণ ঘুমঘোরে অচেতন, তাদের জাগরণ কি সম্ভব? যদিও লোকসাধারণ বা 'পীপল' কথাটি আমরা ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে ধার করে ব্যবহার করতাম, এতকাল আমাদের আন্দোলনের মধ্য তাদের অস্তিত্বও ছিল না। বিশেষতঃ বাঙলাদেশের একদল দুঃসাহসী যুবক স্বদেশী যুগ থেকে এইটিই ভেবেছিলেন, সমস্ত দেশের হয়ে তারা (মুষ্টিমেয় হলেও) চরম আত্মোৎসর্গ দ্বারা আনবেন বিপ্লব। এর ফলে তাঁরা প্রলয়ের বহ্নিশিখায় নিজেদের আহুতি দিয়েছিলেন, জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি জাগিয়ে-ছিলেন, বাঙ্গালীর ভীরুতার অপবাদ মোচন করেছিলেন। তাঁদের নিষ্ফলতা আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। কিন্তু এতবড় দুঃসাধ্য সাধনের দ্বারাও রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি সত্যকার দরদ দেখা দেয়নি। দেবতা বা অপদেবতাদের যেমন আমরা ভক্তিতে নয় ভয়ে নমস্কার করি, বিপ্লবীদের প্রতি দেশের মনোভাব ছিল অনেকটা ঐ রকমের।

এমন সময় মহাত্মা এলেন, যেন সিঁদ মহলের দ্বার বাতায়ন খুলে গেল। কোটি কোটি মানুষের এক আশ্চর্য উদ্বোধন ঘটলো আমাদের চোখের সামনে। ১৯১৮র কলকাতার বিশেষ কংগ্রেসে গান্ধীজী নীরব দর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসে জাতীয় দলের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখে মডারেটরা কংগ্রেসের বাইরে চলে গেলেন। বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, যোগেশ চন্দ্রবর্তীর নেতৃত্বে বাঙলার শক্তিশালী জাতীয়দল সগৌরবে জাতীয় আন্দোলনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। মহাযুদ্ধের অবসানে বাঙলারবন্দী বিপ্লবীদল কারাগার অন্তরীন থেকে বেরিয়ে এলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পর বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের আর এক অভ্যুদয় ঘটলো।

ইতিমধ্যে ইতিহাস চললো এগিয়ে, রাউলাট আইন তার প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ, জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড, খিলাফৎ নিয়ে মুসলমানদের বিক্ষোভ, ঘটনার পর ঘটনায় জনসাধারণের বিক্ষোভ ফেটে পড়তে লাগলো দুর্জয় ক্রোধে। ভারতের সম্মিলিত জাতীয় দলের নেতারা, গান্ধীজীর নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেন। অহিংস অসহযোগ নীতিতে তাঁদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু আইনসভা বর্জন করা সমীচীন মনে হ'ল না। বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে জাতীয় দল কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২০) গান্ধীজীর প্রস্তাবের ওপর এক সংশোধনী প্রস্তাব এনে বললেন, অসহযোগ আন্দোলনের কর্মনীতি আপাততঃ স্থগিত রেখে দেশকে অহিংস সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা হোক। ভোটে গান্ধীজীর জয় হল, চিত্তরঞ্জন জনমত মেনে নিয়ে গান্ধীজীর অনুগামী হলেন। নাগপুর কংগ্রেসে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেল, দেশের কাজে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আইন ব্যবসা ত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ সমর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পেল, কিন্তু আন্দোলন পরিচালনার পক্ষে এই ভাবাবেগ সব সময় অনুকূল নয়। রাজ অত্যাচার আছে, উদ্বানীদাতা স্পাইদের স্থানে স্থানে আন্দোলনকে বিপথগামী করবার চেষ্টা আছে। ফলে সারাক্ষণের নেতৃত্ব ও সংগঠনের

প্রয়োজন হল। কংগ্রেস আর বার্ষিক বিতর্ক সভা রইল না, পল্লীনগরে শাখা প্রশাখা সমন্বিত এক বিশাল রাজনৈতিক সঙ্ঘরূপে সারা ভারতের ঐক্য বিধায়ক হয়ে উঠলো। মেলা, মহাকুম্ভ ও পল্লীর শাখা সমন্বিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনে বাঙ্গলার কর্মীদের সংগঠনী প্রতিভা সারা ভারতের শ্রদ্ধা অর্জন করলো। চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে এক বৎসরের জন্য উকীল ওকালতী ছেড়ে, ছাত্র স্কুল কলেজ ছেড়ে কংগ্রেস ক্ষেত্রে সমবেত হ'ল। বাঙ্গলার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের শ্রেষ্ঠ কর্মীরাও গান্ধীজীর কর্মপন্থা মেনে নিয়ে কংগ্রেস পরিচালনা ও চরম সংঘর্ষের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ উপায়ে স্বরাজ লাভই জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য—এই ঘোষণা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বাঙ্গালী ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হল। ১৯২১ সাল শেষ হবার পূর্বেই গভর্ণমেণ্ট রুদ্রমূর্তি ধারণ করলো। রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির সংঘর্ষে বাঙ্গালীই সারা ভারতে সর্বাগ্রে দাঁড়ালো। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ, আইন অমান্য ও কারাবরণ, তবু শেষ রক্ষা হ'ল না, শয়তানী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবার দুর্জয় সঙ্কল্প ঘোষণা করেও গান্ধীজী শেষ অঙ্কে চৌরী-চোরার হিংসা উপলক্ষ্য করে আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। ষাট হাজার কারারুদ্ধ অনুচর নিয়ে দেশবন্ধু ক্ষুব্ধ হলেন। সুযোগ বুঝে রাজদ্রোহের অপরাধে গান্ধীজীকে গভর্ণমেণ্ট কারাগারে নিক্ষেপ করলো। অসহযোগ আন্দোলন তিমিত হয়ে গেল।

তাটার মুখে দেখা গেল, মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে ঘুরে সরে যাচ্ছে। বিপ্লবীরাও 'গান্ধীনিতীর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। দেশবন্ধু কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসের কর্মনীতিতে পরিবর্তন চাইলেন, বললেন জাতীয় সংগ্রামকে আইনসভার ভেতর নিয়ে যেতে হবে। গান্ধীজীর নৈষ্ঠিক অনুগামীদের সঙ্গে বিরোধ ঘটলো, তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করলেন, অধিকাংশের সমর্থন লাভ করলেন, আইন সভার নির্বাচনে মডারেট দল পরাজিত হল, বারম্বার মন্ত্রিসভার পতনেও দ্বৈতশাসন প্রণালী ধ্বংস করা গেল না। এক বাঙ্গলা ও মধ্যদেশ ছাড়া কোথাও কংগ্রেস সাফল্য লাভ করেনি। কিন্তু বারম্বার এই ধ্বংসমূলক কার্যক্রমের প্রাথমিক উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে গেল। বাংলা সরকার হিংসামূলক গুপ্ত আন্দোলনের অজুহাতে সুভাষচন্দ্র সহ বহু কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করলেন। দেশবন্ধু স্বাস্থ্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন। স্বরাজ্য দলের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম, আর গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য দেশে কোন নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারলো না। বৃটিশ রাজশক্তির প্রশ্রয়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উগ্র ও প্রবল হয়ে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সমাধি রচনা করলো। তবুও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে বাঙ্গালীর জাতীয় দল কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক আদর্শের পতাকা বহু বিরুদ্ধতার মধ্যেও অবনমিত হতে দেননি।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি প্রাপ্ত সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয়, তিনি কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠানরূপে সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য বাঙ্গালার তরুণদের ডাক দিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পর নব্য বাঙ্গলা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল। আইন সভার মধ্যে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদের উৎসাহ ও উত্তেজনা মন্দীভূত অথচ সমগ্র দেশ নূতন কর্ম পদ্ধতির জন্য উদগ্রীব। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যুব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রস্তুতি চললো। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেস এক সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে সুভাষচন্দ্র তার সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিলেন। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সুভাষচন্দ্র দাবী করলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ লক্ষ্য

ঘোষণা করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হোক। মহাত্মাজীর প্রভাবে স্থির হ'ল পূর্ণ স্বরাজ শাসন ব্যবস্থার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে এক বৎসর সময় দেওয়া হোক। বলাবাহুল্য, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন।

এর পর ইতিহাস স্মরণীয় লাহোর কংগ্রেস। বাঙ্গলার জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক দলের নেতারূপে সুভাষচন্দ্র, ভাবী সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে গান্ধীজীর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হওয়ায় উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধান হ'ল—সম্মুখে সংগ্রাম বাচালতার সময় নেই।

গান্ধীজী সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। সমগ্র দেশ আগ্রহে অধীর। কংগ্রেসের মধ্যে দল উপদল চিরদিনই ছিল, প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু পর শাসনের বন্ধন ছিন্ন করা নিয়ে কোন দ্বিমত ছিল না। কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে ঘোষিত হ'ল ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস। ভারতের নানা প্রান্তে এবং বাঙ্গলা দেশেও ঐদিন জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাক্য লক্ষ লক্ষ নরনারী উচ্চারণ করলো।

"যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভারতকে সব দিক দিয়ে রিক্ত ও দুর্বল করেছে, তার নৈতিক মেরুদণ্ড দিয়েছে ভেঙ্গে, তার অধীনে আর এক মুহূর্তও থাকা আমরা পাপ বলে মনে করি, আমাদের জন্মগত অধিকার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।" এই সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণের পর, আদর্শ ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল। বাঙ্গলার দুঃখব্রতী যুগশক্তি দুর্গম পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আদেশের প্রতিক্ষায় অধীর।

মহাত্মা গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহ সুরু করলেন, সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন বন্যার মত উদ্বেল হয়ে উঠলো। গভর্ণমেণ্ট প্রথমেই কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করে নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বাঙ্গলা পুরভাগে এসে দাঁড়ালো। দলে দলে নরনারী কারাগারে চললো। দমননীতির রক্তচক্ষু বিস্ফারিত—লাঠি, গুলি, জেল, জরিমানা, বাজেয়াপ্তির অমানবিক নিষ্ঠুরতায় বাঙ্গালী নিঃসঙ্গ। মেদিনীপুরে কাঁথীর সমুদ্রতট, মহিষ বাথানের লবণ হ্রদের তীর দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকামীদের রুধিরে রঞ্জিত হ'ল।

গভর্ণমেণ্টের উলঙ্গ বর্বরতায় স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠলো। দমননীতির পাশাপাশি তাঁরা ভেদনীতি প্রয়োগ করলেন; শাসন সংস্কারের লোভ দেখিয়ে কংগ্রেসকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো তলে তলে। এক শ্রেণীর নেতারা রাজনীতিক গোল টেবিল বৈঠক গ্রহণ করলেন এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা জাতীয় দাবীর বিরোধিতা করতে লাগলেন। এইসব প্রতিক্রিয়ার বিশেষভাবে মন্ত্রাবেট দলের মধ্যস্থতায় গান্ধীজী আন্দোলন স্থগিত রেখে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

কিন্তু গান্ধী আরউইন প্যাক্টে কংগ্রেসী মহলে কিছুটা বিক্ষোভ দেখা গেল। বাঙ্গলার পক্ষ হইতে সুভাষচন্দ্র ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নি। করাচী কংগ্রেসেও তিনি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজীর লণ্ডন বৈঠকে যোগদান করার প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। পরবর্তী ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছিল।

গান্ধী আরউইন চুক্তি একটি বড় রকম জয়—এই আনন্দে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে শিথিলতা দেখা দিল। আপোষের পথেই কংগ্রেসের অভিপ্রায় মত শাসনতন্ত্র রচিত হবে এই মিথ্যা ভরসায় কংগ্রেস পন্থীরা যখন উন্মনা, তখন প্রতিহিংসা পরায়ণ বৃটিশ আমলাতন্ত্র ভারতবাসীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার আগ্রহে

দমননীতির ছুরিতে ধার দিতে লাগলেন। এবং নানা অছিলায় চুক্তির লঙ্ঘন করে, কংগ্রেসের অপবাদ রটনা করতে লাগলেন। বৃটিশ বণিক ও মুসলিম নেতাদের মিলিত চক্রান্তে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে গেল। গান্ধীজী শূন্য হাতে ফিরে এলেন। গভর্ণমেণ্ট মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়ে কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করলেন, গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা যথানিয়মে বন্দী হলেন। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে অপ্রস্তুত কংগ্রেস ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, আইন অমান্য আন্দোলনের সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটলো।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন মত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র নির্বাসনে—তবুও নতুন শাসনতন্ত্রের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার তীব্র প্রতিবাদ হ'ল। বাঙ্গালার জাতীয় ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যক আসন দেওয়া হ'ল এবং তপশিলী হিন্দুদের স্বতন্ত্র করে দেওয়া হ'ল। বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বোম্বাই কংগ্রেসে বাটোয়ারা সম্পর্কে না গ্রহণ না বর্জন নীতি গৃহীত হ'ল।

এই গোঁজামিল দিয়ে কংগ্রেস নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ এবং পরে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিল।

সুভাষচন্দ্র নির্বাসন থেকে ফিরে এসে বাঙ্গালার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব তাঁর প্রভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি সংগ্রামশীল গণ আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসন্ন। ইংরাজ বেকায়দায় পড়বে, এই সুযোগ স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর গ্রহণ করা উচিত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে চরমপত্র দেওয়া হোক। গান্ধী অনুগামী নেতারা সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন এবং তাঁর আপোষবিরোধী অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর দু'বৎসর আপোষ রক্ষার জন্য কালহরণ করে অবশেষে ১৯৪২এর আগষ্টে কংগ্রেস নেতারা আন্দোলন আরম্ভ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। আবার নেতৃবৃন্দ গ্রেফ্‌তার এবং কংগ্রেস বেআইনী হ'ল। বাঙ্গলার কংগ্রেসপন্থীরা মান-অভিমান ভুলে গিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মেদিনীপুরের কৃষক শ্রেণীর দৃঢ়বদ্ধ প্রতিরোধ এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা নতুন ইতিহাস রচনা করলো। আর একবার প্রমাণিত হ'ল, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মত ও পথ নিয়ে দল উপদলে যতই ভেদ বিবাদ থাকুক না কেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী বাহুতে বাহু বেঁধে মাথা উঁচু করে এক হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেম এবং আত্মোৎসর্গের এই বিচিত্র ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবী ব্যাপী ধ্বংসলীলার প্রচণ্ড আবর্তে ভারতও টলমল করে উঠলো। পশ্চিমে বলদর্পিত জার্মানী আর পূর্বদেশে সাম্রাজ্যলোভী জাপানের দিগ্‌বিজয়ী বাহিনীর পদতলে ইয়োরোপ ও রাশিয়ার রাজ্যগুলি লুটিয়ে পড়লো। সাম্রাজ্যলোভীর সঙ্গে সাম্রাজ্য ভোগীর সেই যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিধ্বস্তপ্রায়। এমন সময় কাপিত জার্মানী আক্রমণ করে বসলো—সোভিয়েৎ রাশিয়া। স্তালিনের নেতৃত্বে দুর্জেয় গিরিশ্রেণীর মত লাল পল্টন, স্বদেশ রক্ষার জন্য অটলোদ্যত মহিমায় দাঁড়ালো পূর্বপ্রান্তে মার্কিন আমেরিকা জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপুল সামরিক বলপ্রয়োগ করলো। জার্মানী ও জাপানের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর দেখা গেল, পুরাতন সাম্রাজ্যবাদও মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তমোক্ষণে মুমূর্ষু।

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ রইল না, সমগ্র এশিয়ার সর্বজাতির অভ্যুত্থানে এশিয়ার মুক্তি-আন্দোলনরূপে এক দুর্জয় আকারে প্রকাশ পেল। আন্তর্জাতিক ঘটনার চাপে ভারতে ইংরাজ তার শাসন-যন্ত্র শিথিল করতে বাধ্য হ'ল।

কংগ্রেসের নেতারা কারাগারের বাইরে এসে দেখলেন, মুসলিম লীগ বৈরী, তারা ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা চায়। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগকে সামনে রেখে ইংরাজ সাম্রাজ্য বজায় রাখার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, এমন সময় মহাযুদ্ধের যবনিকা উত্তোলিত হওয়ায় দেখা গেল পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠনের বিস্ময়কর কীর্তিকলাপ। বর্মায় ধৃত আজাদ-হিন্দ ফৌজের নায়কদের লালকেল্লায় বিচার উপলক্ষে সব কাহিনী প্রকাশ পেল। ছড়িয়ে পড়লো ভারতীয় সৈন্যদলে অসন্তোষ, সমগ্র দেশ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো।

এর পরবর্তী ইতিহাস সেদিনের ঘটনা। ইংরাজের তাগিদে আর জিন্নাজী চালিত মুসলিম লীগের জিদে দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা লাভ করা ছাড়া আর পথ রহিল না। হয়তো ছিল, গান্ধীজী তীব্র আপত্তি করেছিলেন, পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা বলি দিতে। কিন্তু তাঁর সে আপত্তি টিকলো না। জাতীয় স্বাধীনতার বেদী মূলে বাঙ্গালী চরম বলি দিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হল। যদিও উভয়পক্ষের স্বীকৃতিতেই রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য ঘটলো, তবুও আত্মঘাতী বীভৎস হিংসা ও হত্যা ঠেকান গেল না। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন পশ্চিম বাঙ্গলায় ঘরছাড়া উদ্বাস্তু বাঙ্গালী আজো পথে প্রান্তরে মাথা গুঁজবার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবুও বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খল খুলে গেছে, হাতে এসেছে বহু প্রথিত আত্মকর্তৃত্বের অধিকার। প্রচণ্ড মার খেয়েও বাঙ্গালী বৃহৎ বঙ্গনার কোভে, নিখিল ভারতীয় বৃহৎ দায়িত্ব ভোলেনি। দুঃখ-দুর্দশার দুঃস্বপ্নের স্মৃতি মণ্ডিত এক একটি বৎসর অতিক্রম করে সে চলেছে, নব অভ্যুদয়ের অরুণোদয় লক্ষ্য করে। ভারতের স্বাধীনতার বেদীর ভিত্তিমূল দৃঢ় করার জন্য বাঙ্গালীর রক্তের প্রয়োজন ছিল, অকৃপণ হয়ে অকাতরে বাঙ্গালী প্রয়োজনের অধিক রক্ত দিয়েছে। ভাবীকালের মহিমার উপর ধ্রুব দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, বাঙ্গালী আজকার দুর্গতি ধৈর্যের সঙ্গে বহন করে চলেছে, মহৎ মনুষ্যত্বের অমৃতলোকের পথে সে যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে মৃত্যুঞ্জয়ী।

কল্পতরু মহোৎসব

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ক্যান্সারের যন্ত্রণা যে কত ভীষণ—তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

গলায় সেই ক্যান্সার রোগ হলো ঠাকুরের।

প্রথমে হলো গলায় সামান্য যন্ত্রণা, কথা বলতে বলতে থামতে হয়। গলায় হাত দিয়ে বলেন, এ কী হলো রে আমার? এমনটি তো কখনও হয় না।

ডাক্তার দেখলেন, কবিরাজ দেখলেন।

ওষুধ দিয়ে দিয়ে তারা হার মেনে গেলেন। রোগ আর কেউ ধরতে পারে না কিছুতেই। গলার ব্যথা-বেদনা থামলো না—

দিন-দিন যেন বাড়তেই লাগলো।

ঠাকুর বরফ খেতে বড় ভালবাসেন। কাঁচা বরফ কড়মড় করে চিবিয়ে খান। তাঁর ধারণা হলো ঠাণ্ডা বরফ খেয়েই হয়েছে। গলায় ছোট ছোট বীচি আওয়েছে।

কাঁচা বরফ না খেয়ে কুল্‌পি বরফ খেয়েছিলেন সেদিন।

তাতেও কিছু হলো না। বরং বাড়লো অসুখটা।

মাকে বললেন, মা, বরফ আর খাব না!

মাকে একবার যখন বলেছি তখন আর কখনও খাব না। রামকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন মনে-মনে। কিন্তু এমনি মনের ভুল—

হাসতে হাসতে ছেলেমানুষের মত বললেন সেদিন—'মাকে বলেছিলাম—মাছ খাব না রোববারে, কিন্তু ভুলে খেয়ে ফেলেছি।'

কলকাতা থেকে একজন ভক্ত এসেছে। ঠাকুর বরফ খেতে ভালবাসেন, তাই সে তার সঙ্গে নিয়ে এসেছে খানিকটা কাঁচা বরফ।

মাষ্টারমশাই বসেছিলেন কাছে। ঠাকুর তার মুখের দিকে তাকালেন। ঠিক যেন অপ্রাপ্তবয়স্ক এক বালক।—'তুমি কি বল—খাবো?'

মাষ্টার চুপ করে রইলেন।

'চুপ করে রয়েছ কেন? হ্যাগা, বল না!'

মাষ্টার বললেন, 'মাকে জিজ্ঞাসা করে নিন। যদি তিনি অনুমতি দেন তো খান।'

'না আমি প্রতিজ্ঞা করেছি মায়ের কাছে। মা রাগ করবে। খাব না।'

খেলেন না ঠাকুর।

প্রতাপ মজুমদার—নাম করা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।

তিনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলেন ঠাকুরকে।

ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ এই ওষুধই ভাল। বেশ ঠাণ্ডা ওষুধ।

প্রতাপ মজুমদার বললেন, 'কিন্তু এত কথা বলা আপনাকে ছাড়তে হবে। কম কথা বলুন। কথা একেবারে বন্ধ করতে পারলে ভাল হয়।

বড় কঠিন আদেশ।

মুখখানি চুন করে বসে রইলেন ঠাকুর।

'কত দূর থেকে কত লোক আসছে এখানে। তারা একটা কথাও শুনে যাবে না?'

—'নাই-বা শুনলো আপনার কথা? আপনাকে দেখেই তো তাদের আনন্দ।'

ঠাকুর বললেন, 'কিন্তু আমার আনন্দ যে কথা বলে!'

'ছি ছি শেষ পর্যন্ত আমার সেই কথা বলার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলি মা? যাগো, যত সব এঁদো লোকগুলোকে আমার কাছে এনে দিবি মা, একজনের ছুঁয়ে পাঁচজনের জল, আমি কত আর ছুঁ দিয়ে দিয়ে জাল ঠেলবো? আমার চোখ গেল, হাড়-মাস কালি হলো। এবার আমাকে রেহাই দে, আমি আর পারবো না। আমার কি দায় পড়েছে? তোর সখ যাকে তুই করগে যা। বেছে বেছে ভাল লোক আনতে পারিস না,—যাদের দু'চারটে কথা বললেই চলে! এ যে একেবারে বাজে লোকের ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস? লোকের জ্বালায় আমার নাইবার খাবার সময় নেই। এই তো একটা মাত্র মুটো চাক, রাতদিন বাজালে কদ্দিন আর টিঁকবে—বল্।'

শেষে কথা বলতে বলতে একদিন রক্ত উঠলো ঠাকুরের গলা দিয়ে।

ঠাকুরকে নিয়ে আসা হলো কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে।

—'এ কোথায় এনে আমাকে বন্দী করলি? নিয়ে চল্ আমাকে সেই দক্ষিণেশ্বরে।'

এখান-সেখান ঘুরে ঘুরে এলেন শ্যামপুকুরে।

আসতে লাগলো কবিরাজের দল। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, নবগোপাল, দ্বারিকানাথ।

গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, 'এ ব্যাধি দুরারোগ্য।'

মহেন্দ্র সরকার এলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই চলবে।

ভক্তেরা বললেন, 'কত লোকের কত দুরারোগ্য ব্যাধি আপনি নিজে আরোগ্য করেছেন, আর নিজের বেলা কষ্ট পাচ্ছেন কেন?'

ঠাকুর বললেন, তাদের সব ব্যাধি যে নিজের এই দেহটায় টেনে নিয়েছি।

—তাহ'লে মাকে বলেন না কেন?

ঠাকুর বললেন, এই শরীরটার জন্য মাকে বলবো? যে শরীর আমার চিরদিন থাকবে না আমি তার জন্যে মাকে বলবো না।

মাকে কিছু বললেন না তিনি। কিন্তু সমানে চলতে লাগলো তাঁর কথা বলা। সবাই বুঝতে পারছে, অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কিন্তু কী অবিচল ধৈর্য, কি আশ্চর্য সহ্যশক্তি!

ঠাকুরকে নিয়ে আসা হলো কাশীপুর উদ্যানবাটীতে।

শরীর তাঁর অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে গেছে। মুখে শুধু কালীনাম, আর প্রত্যেকের সঙ্গে সহাস্য আলাপন।

কোনও আগন্তুককে ফিরিয়ে দেবার হুকুম নেই।

আপামর সাধারণের জন্য তাঁর অবারিতদ্বার।

১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারী।

হঠাৎ যেন মনে হলো তাঁর গলার ব্যথাটা কিছু কমেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন। বাগানের ভেতর পায়চারি করতে লাগলেন।

ঘুরে একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন সুপ্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার গিরিশ ঘোষ আর ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তমশাই।

তাঁরা দুজনেই তখন ঠাকুরের কথাই বলছিলেন।

গিরিশচন্দ্র তো কিছুদিন থেকে সকলকে বলে বেড়াচ্ছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার নর-নারায়ণ।

রামচন্দ্র দত্তমশাইও সেকথা স্বীকার করেন, কিন্তু সব সময় মন স্থির রাখতে পারেন না। তার জন্য তাঁর উদ্বেগের অন্ত নেই। বারংবার মনে মনে তাঁরই কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ঘুরে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের কথাবার্তা আলোচনা কিছুই শুনতে পাননি। শুধু হাসতে হাসতে তাঁদের কাছে এসে বললেন, 'হাঁগো গিরিশ—'

বলেই আঙুল দিয়ে তিনি তাঁর নিজের দেহটিকে দেখিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে তুমি কী দেখেছো যে এত করে সবাইকে বলে বেড়চ্ছো?'

গিরিশচন্দ্র তক্ষুনি হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তাঁর পায়ের কাছে। বললেন, 'কী যে দেখেছি তা জানি একমাত্র আমি। কিন্তু তা প্রকাশ করবার মত ভাষা আমার নেই।'

কথাটা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। চোখদুটি বন্ধ করে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক!'

এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করে গিরিশচন্দ্র বলেন, 'ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন।'

সেই তখন থেকে পয়লা জানুয়ারী তারিখটিকে 'কল্পতরু দিবস' নামে প্রতিবৎসর সমারোহের সঙ্গে পালন করা হয়।

এই নিয়ে আর একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে।

ঠাকুর নাকি সেদিন নিজে বলেছিলেন, 'ওরে কে কোথায় আছিস ছুটে আয়! আমি আজ কল্পতরু হয়েছি। যার যা মনস্কামনা আছে খুলে বল্। আমি তোদের সব মনস্কামনা আজ পূর্ণ করবো।'

কাছে ছিলেন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর তখন খুব খারাপ অবস্থা। অর্থাভাবে নিরারুণ বিপন্ন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে ডেকে দিলেন।

উপেন্দ্রবাবু নাকি ঠাকুরকে বলেছিলেন, আশীর্বাদ যদি করবেন তো এমন আশীর্বাদ করুন—যেন আমার সাহিত্যমন্দিরের সদর দরজাটা এমন হয় যেখানে একটা প্রকাণ্ড হাতী ঢুকে যেতে পারে।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'টাকা চাইলি তুই? আচ্ছা তাই হবে।'

এই ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল কিনা আমরা জানি না, তবে বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দিরের অগাধ ঐশ্বর্য্য এবং তার হাতী-পেরোনো বিরাট সিংহদ্বার দেখে মনে হয় এর মূলে কিছু সত্য হয়ত-বা আছে।

আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন গিরিশচন্দ্র।

—'তুমি কিছু চাইলে না?' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁকে।

গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমার একটিমাত্র প্রার্থনা—আপনার চরণে যেন আমার মতি থাকে চিরকাল।'

ঠাকুর বলেছিলেন, 'তথাস্তু'।

এরপর আর বেশিদিন ঠাকুর ছিলেন না পৃথিবীতে।

কল্পতরু চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর সেই পবিত্র স্মৃতিটুকু আজও রক্ষা করে চলেছেন তাঁর ভক্তমণ্ডলী।

প্রতিবৎসর জানুয়ারীমাসের প্রথমদিনে যদি কেউ দক্ষিণেশ্বরে যান তো দেখতে পাবেন অগণিত নরনারীর মহামহোৎসবের মেলা।

পুরাতন পাতা

বাংলার বৈশিষ্ট্য

বিপিনচন্দ্র পাল

বাঙালী বাংলার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণ বাংলার যে চিন্তা ও ভাবকে ভিলে ভিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন আজিকার বাঙালী যুবকেরা কেবল নহেন অনেক বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত সে বাংলাকে চেনেন না। বাংলার চিন্তারাজ্য আজ নিস্পন্দ, ভাবের স্রোত বন্ধ, বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য চিরদিন ছিল এখনও আছে, যে বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত চিন্তা, ভাব ও কর্মচাতুরে বাংলার আর কিছুই দিবার থাকিবে না, সে বৈশিষ্ট্যের কথা আজিকার বাঙালী কেবল ভুলিয়াছেন তাহা নহে, তাহার উল্লেখমাত্র তাঁহাদিগকে অধীর করিয়া তুলে।

তাঁরা বলেন, আমরা প্রাদেশিকতাকে আবার বাড়াইয়া তুলিয়া ভারতের বিরাট জাতীয় জীবনের ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দিব! বাঙালী যদি বাঙালীত্বের অভিমানে কাঁদিয়া উঠে, মারাঠা ও পাঞ্জাবী যদি আপন আপন প্রাদেশিক ইতিহাসের গৌরবে মুগ্ধ হইয়া ভারতে আবার নিজকে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, রাজপুত যদি পাঠান হইতে, তামিল যদি তৈলঙ্গী হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে; তবে ভারতে আমরা যে বিরাট জাতীয় জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহার সফলতার সম্ভাবনা কই? প্রাদেশিকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে, জাতীয়তার যুগ আসিয়াছে, এযুগে আবার বাংলার কথা লইয়া অত বাড়াবাড়ি কেন?

যাঁরা এভাবে ভারতের নূতন জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন, তাঁরা যেমন বাংলাকে চিনেন না, সেইরূপ ভারতবর্ষকেও চিনেন না। তাঁহারা এখনও ইউরোপের ইতিহাসের মোহে পড়িয়া আছেন। ইউরোপ যে পথে তার আধুনিক জাতীয়তা বা Nationalism গড়িয়া তুলিয়াছে ইহারা সেইভাবেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ নানা জাতিকে ভাঙিয়া চুরিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া একটা নূতন ভারতীয় জাতি বা Indian Nation গড়িয়া তুলিতে চাহেন।

ইহারা ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহাদের এই ভাবের মধ্যে ইংরাজের ভাবই অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। ইংরাজ কহেন ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে, কিন্তু একটা মহাদেশ, ভারতবর্ষের এক পর্য্যায়ে আমরা ইতালী বা ফরাসী, ইংলণ্ড বা জার্মানীকে বসাইতে পারি না। ভারতবর্ষের এক পংক্তিতে বসাইতে হইলে গোটা ইউরোপকেই বসাইতে হয়। ইউরোপের মধ্যে যেমন ইংলণ্ড আছে, ফরাসী আছে, ইতালী আছে, অষ্ট্রিয়া আছে, জার্মানী আছে, রুশ আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষে বাংলা আছে, গুজরাট আছে, পাঞ্জাব আছে, অন্ধ্র আছে রাজপুতানা আছে, কর্ণাট আছে, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ আছে। এসকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যতটা পার্থক্য ও প্রভেদ আছে, ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রেও সেইরূপই প্রভেদ আছে। এদের ইতিহাস, ভাষা,

সাহিত্য, প্রকৃতি এমন কি সমাজ গঠন পর্য্যন্ত পরস্পর হইতে বহুবিষয়ে বিভিন্ন। গোটা ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে মোটামুটি ধর্ম্মের একটা ঐক্য আছে বটে, ঐরূপ ঐক্য ইউরোপেও আছে। তুরস্ককে বাদ দিলে ইউরোপের সর্ব্বত্র একই খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। আর প্রটেস্টেণ্ট, ক্যাথলিক, গ্রীক বা রাশিয়ান চার্চ্চ—সকলের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, মাদ্রাজের স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্রের শৈব ও পাণপত্য বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব, এছাড়া নানকপন্থী, কবীরপন্থী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কম নহে। এসকলের উল্লেখ করিয়া ইংরাজ কবেন যাহাকে জাতি বা নেশন কহে, তার উপাদান ভারতে এখন বিদ্যমান নাই। ইংরাজ ভারতের একচ্ছত্র রাষ্ট্রপতি হইয়া এক শাসনশৃঙ্খলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে বাঁধিয়া একধাতে ভারতের আধুনিক ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের প্রবাহকে চালাইয়া দিয়াছেন। এই পথেই যদি সম্ভব হয় ভবিষ্যতে একদিন ইউরোপের মত ভারতবর্ষেও একটা বিরাট জাতির সৃষ্টি হইতে পারে। হইবেই যে এমনও বলা যায় না। এই অজুহাতেই ইংরাজ এ পর্য্যন্ত আমাদের আধুনিক জাতীয়তার স্পর্দ্ধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার শাসন শৃঙ্খলাকে সর্ব্বথাই নানাভাবে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজ কহেন, আমরা চিরদিনের জন্য তোমাদের শাসনভার বহন করিতে আসি নাই। আমাদের দেশ যেমন এক হইয়াছে, এক শাসনে শাসিত, এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক ভাবের ও ঐতিহাসিক গৌরবের বন্ধনে আবদ্ধ, তোমরা যেদিন সেইরূপ হইবে অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন এক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ এক ভাষা প্রচলিত, এক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত, এক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, মোটের উপর একই আচার পদ্ধতি, একই রীতিনীতি একই আদর্শের প্রেরণা গড়িয়া উঠিবে, সেদিন ভারতে জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে, সেদিন তোমাদের নেশনত্বের দাবী মাথা হেঁট করিয়া মানিয়া লইতেই হইবে। সেদিন আমরা অম্লানবদনে তোমাদের দেশ ও তোমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভার তোমাদের হাতে অর্পন করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব। কিন্তু যতদিন না তোমরা একটা জাতি হইয়াছ, ততদিন আমরা যদি না থাকি তোমাদের ছাড়িয়া যাই; তোমরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া দেড়শত বৎসরে দেশে যে শান্তি শৃঙ্খলা হইয়াছে তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিবে এবং আমাদের পরিত্যক্ত রাজদণ্ড অন্য কোন প্রবলতর প্রতিবেশী আসিয়া নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আবার তোমাদিগকে নূতন পরদেশী শাসনের অধীন করিবে। যাঁরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক জীবনকে সত্য করিয়া ভারতের একতার নামে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করিয়া ইউরোপের ছাঁচে ভারতের জীবনকে গড়িয়া তুলিবার কল্পনা করেন, তাঁরা ইংরাজের এ আপত্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁরা জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনে, ইউরোপে যে আদর্শে আধুনিক জাতীয়তা বা Nationality'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহাদের ইউরোপ বিদ্বেষ যতটা প্রবল হউক না কেন; এই বিদ্বেষের ভিতর দিয়াই তাঁহারা সর্ব্বদা "শত্রুভাবে" ইউরোপকেই সাধন করিয়া ইউরোপকেই পাইতেছেন। তাঁরা বলেন বটে, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই ভারতের নূতন জাতীয়তার লক্ষ্য কিন্তু ভারতের এই বৈশিষ্ট্য কি,—এ প্রশ্নটা সমাক অনুধাবন করিয়া দেখেন না।

---

* বিপিনচন্দ্র রচিত 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

বাংলার অবহেলিত গ্রাম

মহাত্মা গান্ধী তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়া ও হরিজন পত্রিকায় বহুবার গ্রাম সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা ছিল গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন। তিনি দেশের লোকের মনে এই সত্যই বদ্ধমূল করে দিতে চেয়েছিলেন যে গ্রামই আমাদের দেশ, আর গ্রামেই পড়ে আছে আমাদের প্রাণধন, প্রাণবহ্নি গ্রামের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি কোন দিনই হবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর, তিনি দেশ-প্রেমিকদের বারংবার নির্দেশ দিয়েছিলেন গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতে ও তাদের দুঃখ কষ্ট নিজেদের করে নিতে এবং সর্বশক্তি দিয়ে তা দূর করতে। কিন্তু তা কেউ করলে না। কেউ শুনলে না তাঁর কথা তার ফলে আজ গ্রাম মরে গেল, আর গ্রামের মানুষ পথে এসে দাঁড়ালো।

কলকাতা বাংলা দেশ নয়; বাংলা দেশও কলকাতা নয়। বাংলা তথা ভারতের প্রকৃত পরিচয় তার হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ গ্রামে। গ্রাম আমাদের দেশের সভ্যতার ধারার গবেষ্ট্রী। গ্রামই আমাদের প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৃত জাদুঘর। জনশিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য—আমাদের সকল উদ্যমের শুরুতে আছে গ্রাম। তাই গ্রামকে অবহেলার অর্থ আত্মহত্যা। এই অবহেলার জন্যই আমাদের দেশ আজ মৃতপ্রায়। পৃথিবীর অন্য সভ্য দেশগুলি কিন্তু গ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সোভিয়েট রাশিয়া জানে তার শক্তির প্রকৃত উৎস কোথায়। আমেরিকার পণ্ডিত নেহেরু যখন গিয়েছিলেন তখন আইসেনহাওয়ার তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রামের বাড়িতে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি গ্রামকে গৌরবের বিষয় ব'লেই জানে। আমরাও যতদিন গ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলাম, আমাদের উন্নতি ছিলো অব্যাহত। গ্রামকে অবজ্ঞা করার পর থেকেই শুরু হলো আমাদের পতন।

তাই, আর নগরের দিকে অন্ধভাবে ছুটে যাওয়া নয়, এবার আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে গ্রামের দিকে। তার জীর্ণ পঞ্জরে আবার সঞ্চারিত করতে হবে নতুন প্রাণ। স্বাস্থ্যে, সম্পদে, সৌন্দর্যে সংস্কৃতিতে আবার সাজাতে হবে গ্রামের মানুষ আর প্রকৃতিকে। তবেই আবার আমরা বেঁচে উঠবো। এই পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে 'গল্প-ভারতী' ধারাবাহিক ভাবে নিবেদন করছে বাংলার বিভিন্ন জেলার বিচিত্র গ্রামের বিস্ময়কর বিবরণ। এই বিবরণ পুঁথিগত নয়; লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত।

অবহেলিত গ্রাম ঃ হাবড়া

গৌরীশঙ্কর দে

কাছাকাছি রয়েছে শ্রীকৃষ্ণপুর, ইছাপুর, গোবরডাঙ্গা, চাঁদঘাট, বস্তুপুকুর ইত্যাদি অঞ্চল। প্রত্যেকটি অঞ্চলেই ইতিহাস কম ক'রেও তিন চার শ' বছরের। পৃথিবী ঘিরে গেলে মাত্র মাইল আটেক দূরে চন্দ্রকেতুগড়ের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ। হাবড়ার অবস্থানের কথা বলছি। হাওড়া? না, হাওড়া নয়; চব্বিশ পরগণা জেলার গোবো—হাবড়া। বনগাঁ লাইনে।

হাবড়ার প্রধান কিংবদন্তী এর নদী। বহুকাল অবশ্য সেই নদী মৃত, তবু তার ধারা হারায়নি জনমানস থেকে। এখানে এসে অবধি শুনি এক যে ছিলো নদীর কাহিনী। মাটি কাটার সময়, পুষ্করিণী সংস্কার করাতে গিয়ে অনেকে পেয়েছে নৌকার কাঠ, মাস্তুল ইত্যাদি। একটা নিচু জমা থেকে একবার না কি একটা কুমীরও ধরা পড়েছিলো। নদী ম'রে গেছে কতকাল আগে, তবু তাকে ভুলতে পারেনি কেউ হাবড়ার নূতন যারা এসে বসেছে সকলেই প্রায় পূর্ববঙ্গের লোক, নদীর দেশের মানুষ। প্রত্যেকেরই চোখে নদীর স্মৃতি, মনে নদীর স্বপ্ন, বুকে একটি নদীর কামনা। তাই মৃত নদীর তীরে দাঁড়িয়েই শুনতে পা অতীতের কল্লোল।

কি নাম ছিলো নদীর? পদ্মা বা পদ্মা। এ আবার কোন পদ্মা? না, পূর্ববঙ্গের পদ্মা এ নয়। পদ্মা ছিলো যমুনার শাখা এবং চব্বিশ পরগণার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। এর তীরে ছিলো প্রাচীন জনপ দেবপদ্মা, দীর্ঘপদ্মা, ছিপদ্মা বা এখানকার দেগঙ্গা-র অবস্থান।* দেগঙ্গার কাছেই চন্দ্রকেতুগড়ের ব্যা ধ্বংসাবশেষ। চন্দ্রকেতুগড় ভারতের প্রাচীনতম স্থানগুলির একটি।+ অনেক মনে করেন এই চন্দ্রকেতুগড় টলেমী এবং পেরিপ্লাসের অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখক বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী গঙ্গে নগরী। যদি তা হয় তবে পদ্মার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কেন না এই নদীই ছিলো সেই সুপ্রাচীন জনপদ সভ্যতার ধাত্রী।

১৯৩১ সাল বা তারও আগেকার সেটলমেন্টের নক্সা থেকে হাবড়া মৌজায় পদ্মার গতিপথের একটা ধারণা করা যায়। যমুনা থেকে বেরিয়ে, নগর উথরা রোডের ধার ঘেঁসে, হাবড়া ডাকঘরের পেছন দিয়ে মদনা বাড়ি হয়ে Esso—কোম্পানীর দোকানের কাছে রেলওয়ে কালভার্ট ও যশোর রোডের কালভার্টের তল দিয়ে দক্ষিণ হাবড়ার মধ্য দিয়ে, আক্রামপুর ও নগরপুরা দুধারে রেখে পদ্মা গিয়ে পড়ে খাড়ো বিলে। সেখা থেকে বেরিয়ে নাংলা বিলে। এরপর পদ্মার প্রবাহিত ধারা কোলসুরের কাছে এসে বিভক্ত হয় দু'টি ধারায় একটি ধারা বাঁ দিকে গিয়ে আবার মেশে যমুনায়। দ্বিতীয় শাখা বেলিয়াঘাটার (বেড়াচাঁপার কাছাকাছি

---

* যশোহর, খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮২।

+ চন্দ্রকেতুগড়—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাছে গিয়ে মিলিত হয় বিদ্যাধরীর সঙ্গে। হাবড়া মৌজার পদ্মা প্রবাহিত হতো যথাক্রমে ৫১৪, ১১০৯, ১২৫৩ ইত্যাদি দাগের জমির ওপর দিয়ে। *

বাংলা দেশে মানসিংহের অভিযানকালেও (১৫৯৪—১৬০৫ খ্রীঃ) পদ্মা সজীব ও প্রশস্ত ছিলো; কেন না মহলন্দপুর ছাড়িয়ে কোলসুর ও সিমুলিয়ার মাঝখানে তাঁকে পদ্মা নদী পার হতে হয়। † পদ্মা ছিলো যমুনার শাখা। অনুমান করছি পদ্মার মৃত্যু হয় যমুনা নির্জীব হওয়ার পর থেকে। পদ্মা মরে যাওয়ার পর হাবড়া জলা অঞ্চলে পরিণত হয়।

অনেক জায়গা বুজে গেছে, কেউ পুকুর কেটে আপনার ক'রে নিয়েছে, কোনো কোনো অংশে এখন ধানক্ষেত। তবু এখনো একটু নজর ক'রে দেখলেই বুঝা যায় পদ্মার ধারা কোন পথে প্রবাহিত হতো। যাদে ঢাকা নিচু জমি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, সঙ্গী স্মরণ করিয়ে দিলো এটা সেই মরা পদ্মার খাত। কোথাও সারি-সারি, পাশাপাশি পুকুর। নদীর খাত থেকে সামান্য আয়াসে জলাশয়ের সৃষ্টি। আর কোথাও জলজ উদ্ভিদে ভরা একটানা জলা। এ-রকম দৃশ্য চোখে পড়বে নগর উখড়া রোডের পাশে কিংবা বাণীপুর জুনিয়র বেসিক স্কুলের ছাড়িয়ে গেলে। স্পষ্টতঃই নদীর রেখা। কেবল এই জল জোয়ার-ভাঁটা খেলে না। কেবল এ জলে স্রোত নেই। তবু এখনো নদীর ধর্ম ত্যাগ করে নি; এর জলে মাছ ধরে জেলেরা। ম'রে গিয়েও নদী লালন-পালন করে তার জীবন সন্তানদের। ১৯৪৫—৪৬ সালে একবার পদ্মা সংস্কারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা পরিকল্পনার স্তরেই থেকে যায়। নদী—সংস্কারের কাজ যুক্তফ্রন্ট সরকার অবিলম্বে শুরু করবেন শুনেছি। যাদের বাড়ি বা জমি পদ্মার আওতায় পড়েছে সরকারের তরফ থেকে তাদের বিজ্ঞপ্তিও দে'য়া হয়েছে।

এই সংস্কার-পরিকল্পনা কার্যকরী হ'লে হাবড়ার পক্ষে তা খুবই উপকারী হবে। বিশেষ ক'রে চাষী ও জেলেদের পক্ষে। আর, যদি নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা হয় তাহ'লে সাধারণের পক্ষেও সুবিধা হবে। অবশ্য এই গতির যুগে নৌকার অবস্থা গোরুর গাড়িরই মতো। জলপথে যাতায়াতের সুবিধা যেমন পশ্চিমবঙ্গে কম, তেমনি নানা কারণে জলপথ অবহেলিতও বটে। কিন্তু জলপথে ভ্রমণ অন্তত বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দিতে পারে। এবং তার একটি উপায় জলপথের পুনরুদ্ধার। জলসেচের সুবিধার কথা তো বলা নিষ্প্রয়োজন।

মরা পদ্মার খাত সংস্কার করতে গিয়ে ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা। পদ্মার খাতে অবস্থিত দু-একটি পুকুর নতুন ক'রে কাটতে গিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ হাবড়ার উদ্ধারপ্রাপ্ত এ-রকম একটি বিষ্ণুমূর্তি বর্তমানে সংরক্ষিত রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায়। বছর কয়েক আগে 'যুগান্তর' পত্রিকায় এই মূর্তি-প্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। অবশ্য, এই মূর্তি স্থানীয়, না নদী স্রোতে বাহিত হয়ে এসেছিলো তা সঠিকভাবে বলা শক্ত।

পদ্মা ছাড়াও হাবড়া অঞ্চলে আরো দু'টি নদী ছিলো। আগে "কোর" নদী নামে একটি বড়ো নদী ছিলো হাবড়ার নিকটবর্তী বেড়গুমের উত্তরে। পরে তা খালে পরিণত হয়। বালিয়ানী গ্রামের নিচে যমুনা থেকে বেরিয়ে এই নদী বেড়গুমের উত্তর ভাগে দুই শাখায় বিভক্ত হয়। একটি শাখা গ্রামের দক্ষিণ দিকে

* সেটলমেন্ট নক্সা—হাবড়া মৌজা নং ৭২, সিট নং ২।
(প্রফুল্ল কুমার ধর মহাশয়ের সৌজন্যে)

† [illegible] ইতিহাস—যদুনাথ সিরকার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫১।

ক'রে যথাক্রমে হাবড়া, মাণিক নগরের মধ্য দিয়ে গুমার কাছে 'পদ্মা' নামক নদীতে মিলিত হয়। "এই পদ্মা নদী পূর্বে অত্যন্ত প্রশস্ত ও প্রবল ছিল।" *

হাবড়া সংলগ্ন অশোক নগরের পাশেও চোখে পড়ে আরেকটি মজা নদীর খাত। এই নদী বিদ্যাধরী। জিরাট রোডের কাছে হিজলিয়ার পাশ দিয়ে চ'লে গেছে গুমার মধ্য দিয়ে কুলটির দিকে। আসলে এখন যেটা গুমার খাল তা-ই বিদ্যাধরী।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সভ্যতা ও জনপদ গ'ড়ে উঠেছে নদীকে আশ্রয় ক'রে। হাবড়ার ভিতর দিয়ে দুটি ও কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ছিলো একটি নদী। সেদিক থেকে হাবড়ার সংস্থান তাৎপর্যময়। লোকালয় হিসেবে হাবড়ার অস্তিত্ব কতদিনের? অনুসন্ধানের বিষয় সন্দেহ নেই।

স্থানের নামের মধ্যে অনেক সময় লুকিয়ে থাকে লুপ্ত ইতিহাস। অন্তত ইঙ্গিত তো থাকেই। হাবড়ার কয়েকটি অঞ্চলের নাম এদিক থেকে তাৎপর্যময়। এর উত্তরাংশে পাশাপাশি তিনটি পল্লী : কামারখুরা, হাটখুরা এবং ভহরখুরা। 'খুরা' দিয়ে আরো একটি নামও আছে—নগরখুরা। শেষ অঞ্চলটি অবশ্য আগেকার পল্লীগুলি থেকে কিছু দূরে। এই অঞ্চলের অনেকেরই ধারণা 'খুরা' শব্দটি এসেছে 'স্তূপ' শব্দ থেকে। যেমন 'পকস্তূপী' থেকে বিকৃত হয়ে একটি গ্রামের নাম হয়েছে 'পাঁচখুপী'। + যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই এই অঞ্চলে ব্যাপক বৌদ্ধ প্রভাব ছিলো। নাম থেকে অনুমান করা যায় নগরখুরাই হয়তো ছিলো সেই বৌদ্ধ জনপদের কেন্দ্র। একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো—'খুরা' যুক্ত প্রতিটি পল্লীরই অবস্থান মজা পদ্মার তীরে। হয়তো এইসব পল্লীর মৃত্তিকাতলে প্রোথিত রয়েছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন। এই অনুমানের স্বপক্ষে আরো বলা যেতে পারে পার্শ্ববর্তী বেড়গুম অঞ্চল থেকে বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। গোবরডাঙ্গাতেও প্রাচীনকালে ছিলো একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ কেন্দ্র।

কৃত্তিবাস পত্রিকার 'স্থানীয় সংবাদ' স্তম্ভে একটি ছোট্ট খবরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—"বুদ্ধমূর্তি—বেড়গুম হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন এখানে সেখ দাদু মণ্ডল এক পুষ্করিণী খনন করাইতেছেন, তাহাতে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা এখানে যত্নপূর্বক রাখা হইয়াছে।" ** গোবরডাঙ্গায় যে বৌদ্ধপ্রভাব ছিলো সে বিষয়েও সুস্পষ্ট প্রমাণ—আবিষ্কৃত হয়েছে। সতীশ মিত্র লিখেছেন —"যমুনা তীরে বর্তমান গোবরডাঙ্গার সন্নিকটবর্তী কোন স্থানে···পূর্বে বৌদ্ধনিবাস ছিল বলিয়া সন্দেহ হয়। গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে যমুনাগর্ভে সুন্দর ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে এবং উহা এখনও বনগ্রামের সন্নিকটে এক গ্রামে রক্ষিত আছে।" ++ এ ছাড়া, আরো প্রমাণ আছে। গোবরডাঙ্গা বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তা হাজির করার ইচ্ছা রইলো। মনে হয়, প্রাচীনকালে হাবড়াও ছিলো ওই ব্যাপক বৌদ্ধ অঞ্চলেরই একটি অংশ। তারই শেষ স্মৃতি জনমানসে টিঁকে আছে 'কামারখুরা', 'হাটখুরা', 'নগরখুরা'—এই নামগুলির মধ্যে।

হিন্দু আমলের কয়েকটি নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে নানা জায়গা থেকে। বছর কয়েক আগে কামারখুরায় হাজী সাহেব নামে এক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির পুকুরিণী সংস্কার করাতে গিয়ে একটা নৌকার পলুই পান। পলুইয়ের ভিতরে ছিলো স্বর্ণালংকার পরিহিত একখানি কংকাল—হাত, পাথরের

---

* কৃত্তিবাস, কার্তিক, ১৩১৮।

+ বাঙ্গালীর ইতিহাস (সংক্ষেপিত সংস্করণ)—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৩৫০।

** কৃত্তিবাস, ভাদ্র, ১৩১৮।

++ যশোহর—খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৪।

একটি গণেশ মূর্তি এবং আরো কিছু জিনিস। মনে হয় নৌকাডুবি বা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় করুণ স্মৃতি। হাতখানি, বলাবাহুল্য, কোনো মহিলার। হাজী সাহেব পূর্ববঙ্গে চ'লে গেছেন তাই এ বিষয়ে কৌতূহল তৃপ্ত করার উপায় আজ আর নেই। হাজী সাহেব বলতেন বহুকাল পূর্বেও তাঁরা ছিলেন হিন্দু। তাঁর কথা থেকেও মনে হয় হাবড়ার প্রাচীনকালে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের বাস ছিলো। পরে তারা ধর্মান্তরিত হয়।

কামারখুলা গ্রামে রাম মজুমদার নামে একজন কৃষক তার বাড়ির পুরনো পুকুর নতুন ক'রে কাটাবার সময় কালো পাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তি, মাটির একটি ঘট, শংখ ইত্যাদি পেয়েছেন। মূর্তিটি এখন পূজিত হচ্ছে ওই গ্রামেরই হরেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। মূর্তিটি ছোট হ'লেও অভগ্ন ও সুন্দর। রাম মজুমদারের বাড়িটিও প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো। চারদিকে বহুদূর বিস্তৃত নিচু ধানক্ষেত। এর মাঝখানে অবস্থিত বাড়িটি আসলে একটি উঁচু, বিস্তীর্ণ ঢিবি। এই বাড়ি ও পুরনো পুকুরটি খনন করালে আরো অনেক জিনিস আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা।

রাম মজুমদারের বাড়ির কাছে আরেকটি উঁচু জমি 'শিববাড়ি' নামে পরিচিত। কোনো মন্দিরের বা বাড়ির চিহ্নও নেই। কেবল চোখে পড়ে কিছু পুরনো আর পাতলা ইট। পূর্ববঙ্গবাসীদের আসার আগে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা ছিলো সকলেই মুসলমান। অথচ তারাই উঁচু জায়গাটাকে মনে রেখেছে 'শিববাড়ি' ব'লে। খুবই তাৎপর্যময়। এই নাম থেকেও মনে হয় এই অঞ্চলে একদা ছিলো হিন্দু বসতি। লক্ষ্য করার বিষয় রাম মজুমদারের বাড়ি ও 'শিববাড়ি' থেকে মরা পদ্মার দূরত্ব খুবই কম।

দক্ষিণ হাবড়ায় আবিষ্কৃত ও রাজ্য সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত বিষ্ণুমূর্তির কথা আগেই বলা হয়েছে। হাবড়া সংলগ্ন মাশিকতলার কাছে বছর দশ-বারো আগে পাথরের দেব দেবী মূর্তি পাওয়া গেছে। সম্প্রতি আরো একটি প্রস্তর—মূর্তি পাওয়া গেছে শুনেছি।

মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যশোহরের দিকে যাত্রা করেন তখন তিনি হাবড়ার ভিতর দিয়েই গিয়েছিলেন। 'যশোহর—খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, "জাগুলিয়া একটি প্রধান পল্লী, তথা হইতে বাদশাহী সড়ক সোজা দক্ষিণে বারাসত পর্যন্ত গিয়াছিল। কিন্তু মানসিংহ সম্ভবতঃ সে রাস্তায় না গিয়া আর যে একটি ক্ষুদ্র পথ দক্ষিণ-পূর্ব মুখে হাবড়ার দিকে গিয়াছিল, বিলের মধ্য দিয়া সেই রাস্তা উচ্চ করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে অগ্রসর হইলেন। সৈন্যদল শ্রীকৃষ্ণপুরের মধ্য দিয়া হাবড়া ডান দিকে রাখিয়া বর্ত্তমান মহলন্দপুর স্টেশন বা রাজবল্লভপুরের নিকট পৌঁছিল…" * এই বর্ণনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে—হাবড়া অঞ্চল সেই সময়ে জলা ও বিলময় ছিল। সম্ভবতঃ জনবসতিও কম ছিল; আর সেই কারণেই প্রবীণ ও চতুর মানসিংহ বারাসতের দিকে না গিয়ে হাবড়ার ভিতর দিয়ে সোজা গিয়েছিলেন। আর একটা বিষয়ও পরিস্ফুট—এখনকার জিরাট রোড যা ছিলো সামান্য সরু পথ মানসিংহ তাকে প্রশস্ত রাজপথে পরিণত করেছিলেন। বাংলাদেশে মানসিংহের অভিযানকালে (১৫৯৪—১৬০৪) পদ্মা সজীব ও প্রশস্ত নদী ছিলো; কেননা মহলন্দপুর ছাড়িয়ে কোলদুর ও সিমুলিয়ার মাঝখানে তাঁকে পদ্মা নদী পার হতে হয়।

ইংরেজ আমলে হাবড়া ছিলো নিতান্তই অখ্যাত গ্রাম। জল-জঙ্গলময় এই স্থানটি হঠাৎ কোলাহল-মুখর হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। আশোকনগরে তৈরী হয় প্রকাণ্ড এরোড্রাম। তার রানওয়ে আগের মতো বড়ো না থাকলেও এখনো দর্শকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এখনো খ্রীষ্টেন্দ্র কলেজের

* যশোহর—খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪১।

হোস্টেল ছাড়িয়ে তাকালে চোখে পড়ে বিমান আক্রমণের ভগ্নাবশেষ। মনসাবাড়ির কাছে বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্রের কাছে ছিলো পেট্রল মজুত রাখার জায়গা। বাণীপুরে ছিলো মিলিটারী অফিসারদের ক্যাম্প। ষ্টাফ কোয়ার্টারে থাকতেন ইঞ্জিনীয়ারিং স্টাফ। এখনো সেই আমলের খানকয়েক ঘর-বাড়ি, ভিত ইত্যাদি আছে। এখনকার হাসপাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল স্টাফ কোয়ার্টার। যশোর রোড ও হাবড়া স্টেশনের মাঝখানে যেখানে এখন উদ্বাস্তুরা ঝুঁড়ে-ঘরে কষ্টে-সৃষ্টে জীবনযাপন করে সেখানে ছিল মিলিটারী হাসপাতাল। এখনো সেই সব বাড়ির ভিত রয়ে গেছে। ওষুধবাড়িতে ছিলো মিলিটারীদের গাড়ি রাখবার জায়গা। গাছ-পালার নিচে সেগুলি থাকতো, যাতে আকাশপথ থেকে শত্রুর চোখে না পড়ে।

যুদ্ধ শেষ হলো। আবার খাঁ-খাঁ করতে লাগলো হাবড়া। লোকজন তেমন নেই। থাকার মধ্যে —বুনো বাগদীরাই ছিলো বেশি। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। বাড়িঘর তেমন ছিলো না। ফাঁকা জায়গা ব'লে সারাদিন বইতো একটানা শো-শো হাওয়া। মুখে লাগতো এসে বালি। আর কাটা রোদ। বেশীর ভাগই ছিলো খড়ের ঘর। হাবড়া স্টেশনটাও ছিলো নেহাৎ-ই ছোট। টিমটিমে আলো। কাছাকাছি দোকানপত্র তেমন নেই। শেয়ালদা থেকে হাবড়ার ভাড়াও ছিলো অনেক কম। আনা ছয়েকের মতো।

হাবড়ার নির্জনতা আবার ভেঙে গেলো দেশ-বিভাগের পর থেকে। এবার আর অস্থায়ী সামরিক শিবির নয়, ধীরে-ধীরে হাবড়া নিলো স্থায়ী শহরের চেহারা। লোকজন, বাড়ি-ঘর, হাট-বাজার, দোকান-পত্র, স্কুল-কলেজ, সিনেমা সবই হলো। গোড়ার দিকে সিনেমা হতো তাঁবুতে। তারপর এক নম্বর রেলগেটের কাছে বাড়ি তৈরী হলো। নাম দেওয়া হলো 'রূপকথা'। প্রথম যে ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়েছিলো তা অশোক কুমার ও কানন দেবী অভিনীত 'চন্দ্রশেখর'।

হাবড়াতে এখন লোকসংখ্যা অনেক। বস্তুত, এক চাপে এত লোক খুব কম জায়গাতেই আছে। লোকসংখ্যা যদি শহরের সংজ্ঞা হয়, তবে হাবড়াকে এখন গ্রাম না ব'লে শহর বলাই উচিত। 'মানুষই লক্ষ্মী'—মায়ের মুখে শুনেছি ছেলেবেলায়। লোকসংখ্যার প্রাচুর্য হাবড়ার উন্নতির অন্যতম কারণ। ভালো ব্যবসায়ের জায়গা হাবড়া। বাঙালী ব্যবসায়ী তো আছেই, মারোয়াড়ী বস্ত্র ও খাদ্য ব্যবসায়ীরাও জাঁকিয়ে রয়েছে এখানে। এখানে ধীরে-ধীরে গ'ড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। আছে ছেলে ও মেয়েদের স্বতন্ত্র বেশ কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। স্থাপিত হয়েছে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি কমার্স কলেজ, একটি স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি মহাবিদ্যালয়। রাধা কেমিক্যাল নামে একটি ছোট কারখানা অনেক বছর আগে-থেকেই ছিলো। সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে একটি স্পিনিং মিল, অশোকনগর স্টেশনের কাছে। কৃষিজীবি হাবড়া ক্রমশই পদার্পণ করছে কল-কারখানার আধুনিক যুগে। তবু আইনানুগ অর্থে হাবড়া আজো শহরের মর্যাদা পায় নি। এখনো এখানে হয়নি মিউনিসিপ্যালিটি; নেই একটি প্রকৃত হাসপাতাল, রাস্তায় জ্বলে না আলো। রেলপথ এখনো সিংগল।

বাণীপুরের ট্রেনিং কলেজ চলে যাচ্ছিলো ময়মনসিংহে। মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী তখন শিক্ষামন্ত্রী। ময়মনসিংহের লোক। তখন চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের সভাপতি ছিলেন অসীমউদ্দিন। হাবড়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বসুকে বললেন—"একটা ভালো জিনিস ময়মনসিংহ চ'লে যাচ্ছে। এখানে রাখা যেতো জায়গা দিতে পারলে। জায়গা পাওয়া যায়?"

মিলিটারীরা তখন চ'লে গেছে। বাণীপুরের পরিত্যক্ত ক্যাম্প দেখানো হলো শিক্ষা-বিভাগের

লোকজের। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এই জায়গা। থানা, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন কাছে। তাঁরা জায়গা পছন্দ করে গেলেন। আগেকার নাম ছিলো আলমকাবাদ ও আড়িয়া। এখন নাম রাখা হলো বাণীপুর। হলো স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়।

শ্রীচৈতন্য কলেজ স্থাপনের ইতিহাসও কম রোমাঞ্চকর নয়। স্থাপিত হলো ১৯৫৬ সালে। প্রথমে ক্লাস হতো হাবড়া হাই স্কুলে; কিছুদিন খ্রীষ্টীয় পরিষদে। নিজের জায়গা কোথায় হবে তা নিয়েও ছিলো যোরতর মত-পার্থক্য। অশোকনগরের অধিবাসীরা চাইলেন কলেজ হোক বর্তমান স্পিনিং মিল যেখানে সেখানে। তখন অবশ্য অশোকনগর স্টেশন ছিলো না। কেউ-কেউ চাইলেন হরিপুর সেবাশ্রমের কাছে। বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্রের কাছেও কলেজ করবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু অল্প জমি বলে প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কলেজ এলো বর্তমান জমিতে। তখন এখানে ছিলো শ্মশান। জমিটা ছিলো রিলিফ ডিপার্টমেন্টের। মনোরম পরিবেশে নির্মিত হলো দ্বিতল কলেজ ভবন। তারপর বিজ্ঞান-বিভাগের বাড়ি এবং কলেজ হোস্টেল। কলেজটিকে সুন্দর করতে হ'লে এখনো দরকার একটি সুন্দর বাগান।

অযত্ন ও অবহেলায় থাকলেও হাবড়ায় এখনো কয়েকটি দর্শনীয় জিনিস আছে। প্রথমত, সাহেব বাগান। এর অবস্থান হাবড়া বাজার সংলগ্ন শিববাড়ির পেছনে। এই ছোট সুন্দর বাগানটি আসলে টার্ণার অ্যাণ্ড মরিসন কোম্পানীর শিকার-শিবির (Shooting Camp)। কয়েক বছর আগেও সাহেবরা হাবড়ায় শিকার করতে আসতো। তখন এখানে ছিলো প্রচুর বুনো শুয়োর। রেলওয়ের বগিতে ক'রে ঘোড়া আনা হতো। পাছে কষ্ট পায় এইজন্য পায়ে হাঁটিয়ে আনা হতো না। এমন কি হর্স ঘাটকর্ম পর্যন্ত হয়েছিলো হাবড়া স্টেশনে। ঘোড়াগুলো ছিলো সত্যি দেখবার মতো। সাহেব বাগানে এখনকার মতো তখনো ছিলো খড়ের ঘর। রাত্রি বেলাটা কাটিয়ে ভোরে বেরিয়ে পড়তো শুয়োর মারতে। ঘোড়ায় চ'ড়ে। কুলীরা জঙ্গল পিটিয়ে বের করতো। সাহেবরা কিন্তু বন্দুক ব্যবহার করতো না। শিকার করতো—বর্শার সাহায্যে। নিহত শুয়োরগুলি বুনো কুলীদেরই দিয়ে দিতো। কেবল তারা দিয়ে যেতো শুয়োরের দাঁত। মেম-সাহেবরাও আসতো সাহেবদের সঙ্গে। শিকার শেষে রেলওয়ের বগিতে আবার তুলে দেওয়া হ'তো ঘোড়াগুলি। সাহেব আর মেম-সাহেবরা চ'লে যেতো মোটরে ক'রে। সেই সাহেব বাগান এখানো আছে; কিন্তু সেই শ্রী এখন আর নেই। তবু এখনো আছে বড়ো-বড়ো কয়েকটি রপালি-কাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি এবং কিছু বিদেশী দুষ্প্রাপ্য গাছপালা। Hut-গুলিও আছে। কিন্তু প্রতি রবিবার এখন আর শিকারীরা আসে না। হাবড়াতে ভালো পার্ক নেই। সাহেব বাগানকে কি সে-রকম একটি পার্ক করা যায় না?

আরো একটি সুন্দর বাগান আছে হাবড়ায়। এর নাম 'ললিতা দেবীর বাগান।' প্রায় ৭০।৮০ বিঘা জমি নিয়ে। এই বাগানে আছে চিনা পেয়ারা, বিলাতী ডুমুর নানারকম কলমের সুন্দর সুন্দর আম ইত্যাদি নানা ফল ও নানা দুষ্প্রাপ্য ফুলের সমাবেশ। একটি সুন্দর পুকুরও আছে বাগানের মধ্যে। শ্রীচৈতন্য কলেজের কাছে দু' নম্বর রেলগেট থেকে যে পাকা রাস্তাটা চ'লে গেছে মসরার দিকে ওই রাস্তায় মাইল দেড়েক হাঁটলে বাগানটিতে পৌঁছানো যায়। বাগানের মালিক ছিলেন বাসুড়িয়ার দাউবাবুরা। পরে মেয়েকে উপহার দিয়েছেন। ফুলে-ফলে ভরা এমন সুন্দর বাগান কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হাওড়াবাসীদেরও অনেকে এই বাগানটির কথা জানেন না।

হাবড়া অঞ্চলের একটি অবশ্য স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান 'হাটখুরা গ্রাম সেবাসংঘ।' এই প্রতিষ্ঠানের নির্মাতা ও প্রাণবহ্নি বিপ্লবী শচীন্দ্রলাল করগুপ্ত। পল্লী অঞ্চলে এমন একটি সুন্দর ও আদর্শ প্রতিষ্ঠান খুব কম

গ্রামেই চোখে পড়ে। এতে আছে মোটা কয়েক প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেয়েদের একটি উচ্চ বিদ্যালয়, ছাত্রী-আবাস, একটি সুসজ্জ গ্রন্থাগার, একটি মাতৃসদন ও ভিসপেনসারী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি বহোরম হল ঘর। 'কালীবালা' স্কুল থেকে দুটি মেয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম ও একাদশ স্থান অধিকার করেছে। বাংলা দেশের বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি, সাংবাদিক ও লেখক নানা উপলক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানে এসেছেন ও ভাষণ দিয়েছেন। বারো মাসে তেরো পার্বনের মতো এই প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লেগেই আছে। গ্রামের নিরক্ষরতা ও নিদানজের মাঝখানে 'গ্রাম সেবা সংঘ' একটি বাতিঘর। এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র হাবড়ার গৌরব।

হাবড়া অঞ্চল মোটামুটিভাবে মুসলমান প্রধান ছিলো ব'লে এখানে প্রাচীন কোনো মন্দির চোখে পড়ে না। তবে কয়েকটি মসজিদ চোখে পড়ে। সব চাইতে পুরোনো জয়পাছির মসজিদ। তা ব'লে অবশ্য খুব বেশি পুরোনো নয়। কেন না এতে সিমেন্টের ব্যবহার রয়েছে। এক সময়ে কিছু কারুকাজ ছিল এখন আর তেমন কিছু নেই। ওই মসজিদে এখন এক দুঃস্থ উদ্বাস্তু পরিবার বাস করে। মসজিদ সংলগ্ন পুকুরটির অস্তিত্ব এখনো আছে।

যশোর রোড থেকে যেখানে জয়পাছির রাস্তা ভিতরে চ'লে গেছে তার কোণাতেই যে পুকুর ও ভাঙা ঘাট এর মালিক ছিলো এক ধনী মাপিত। কলকাতায় থাকতো। ব্যবসা ছিল। পুকুর পাড়ে তার একটা ভালো আমের বাগানও ছিলো। পরে সে বিক্রি ক'রে দেয়।

কাষায়খুরার বাঁধানো রাস্তার ধারে কিছুদিন আগেও চোখে পড়তো বাঁশঝোপের ভিতরে ছোট ছোট ইটের তৈরী একটি ভাঙা দেয়াল। এটা ছিলো ঈদগাহ। ঈদের সময়ে এখানে নামাজ পড়া হতো। এটা মনে হয় দু তিন শ বছর আগেকার ছিলো। এখন আর এর কোনো অস্তিত্ব নেই। বাণীপুরে জঙ্গলের মধ্যে এখনো চোখে পড়ে একটি মসজিদের মিনার। এর বয়েস ৫০।৬০ বছরের বেশি না হ'লেও মসজিদটির আপাতত ভগ্নদশা।

ভালো অবস্থায় রয়েছে হাবড়া হাসপাতালের বহির্বিভাগের কাছাকাছি ছোট মসজিদটি। প্রতি বছর একে রং করা হয়। মসজিদটি অবশ্য অল্প কয়েক বছর আগেকার। স্থাপিত হয়েছে ১৯৩১ সালে। এর নির্মাতা হরিবুর রহমান শেখ। চামড়ার ব্যবসা ক'রে একবার তিনি প্রচুর টাকা পান; তাই দিয়ে মসজিদ তৈরী করেন। এখনো তার বংশধরেরা ওখার বসবাস করছেন।

হাবড়ায় কয়েকটি পুরনো পুকুর আছে। এর একটি ২ নং রেলগেটের কাছে, বাণীপুরের রাস্তা আর মশয়ার রাস্তার মাঝখানে। পুকুরের ঘাট পুরনো ইটের তৈরী। পুকুরটি কাটানো হ'লে পুরনো অনেক জিনিস পাওয়া যেতে পারে।

আরেকটি প্রাচীন জলাশয় অশোকনগর বয়েজ সেকেণ্ডারী স্কুলের পেছনে। এই পুকুরের মাঝখানে নাকি একটি মন্দির আছে। এই পুকুরে জলজ গাছপালা জমে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছিলো যে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যেতো। সরকার থেকে পুকুরটি সংস্কার করাবার চেষ্টা করা হয়। জমাট ঘাস কাটবার পর নিচ থেকে হু হু করে জল উঠতে থাকে। অথচ আগে মনে হতো পুকুরে জল প্রায় নেই। সংস্কার করার সময় দেখা যায় পুকুরের তলদেশে কয়েকটি গভীর কূপ; তাই দিয়েই জল উঠছে। আট-দশটি পাম্প লাগিয়েও ওই জল নিঃশেষ করা সম্ভব হয়নি। সেই যে জল বেড়ে গিয়েছিলো, আর কমেনি। বারোমাস এখন সেই পুকুরে গভীর জল। সেকালের পূর্ত বিদ্যা যে খুব অনুন্নত ছিলো না, পুকুরটি তারই প্রমাণ। আজকাল

যে সব পুকুর কাটা হয় তাতে জল থাকে না; অথচ দেকালের প্রায় পুকুরের মতোই জল। এর একটি কারণ পুকুরের তলায় একাধিক কূপ খনন করা হতো। অশোকনগরের এক্তমঠ জলাশয়টির পাড়ে এক পীরের আস্তানাও আছে।

পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে নানা জেলার নানা লোক। বিচিত্র তাদের সামাজিক ও পারিবারিক ঐতিহ্য। অনেকেই দেশ থেকে আসার সময় পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বা রক্ষিত কিছু জিনিস এবং দলিলপত্রাদি নিয়ে এসেছেন। খোঁজ ক'রে দেখছি কয়েক বাড়িতে আছে মুসলমানী আমলের স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা; দু-তিনশ বছর আগেকার কাঠের, তামার বা পিতলের তৈজসপত্র, পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ, কাঁথা ইত্যাদি। এই সব জিনিসের ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে সকলে সচেতন নন। ইতিহাস যে কেবল রাজা-রাজড়ার কাণ্ড-কারখানা নয়, সাধারণ মানুষের কথা, ঘরে সাধারণ জিনিসও যে কালক্রমে ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণের মর্যাদা লাভ করে এ ধারণা অনেকেরই নেই। তাই ব্যবহারিক প্রয়োজন শেষ হ'লে অনেকেই এই সব জিনিস উচ্ছৃঙ্খলভাবে বা অবহেলায় নষ্ট ক'রে ফেলেন। কিন্তু তা না ক'রে, এই সব জিনিস সংগ্রহ ক'রে হাবড়াতে একটি সুন্দর সংগ্রহশালা গ'ড়ে তোলা সম্ভব। যে অঞ্চলে এতগুলি স্কুল—কলেজ সেখানে এ-রকম একটি স্থানীয় সংগ্রহশালার খুবই প্রয়োজন।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

রোঁদা আমাকে যা শিখিয়েছিলেন

স্টিফান জোয়াইগ

অনুবাদ : নীলাদ্রি সোম

তখন আমার বয়েস সবে পঁচিশ। প্যারিসে থেকে পড়াশুনো করছি। সাহিত্য-চর্চাও। ইতিমধ্যেই বহুলোক আমার প্রকাশিত লেখার তারিফ করেছে। কিছু লেখা আমার নিজেরও ভালো লাগতো। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে মনে হতো এর চাইতে ভালো লেখার ক্ষমতা আমার আছে ; কিন্তু দোষটা যে কোথায় ধরতে পারছিলুম না।

এই সময়ে একজন মহৎ মানুষ আমাকে একটি মহৎ শিক্ষা দিলেন। আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ ঘটনা মনে হ'লেও ওই ঘটনাই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলো।

সন্ধ্যাবেলা। বেলজিয়ামের বিখ্যাত লেখক ভেরহেরেনের বাড়িতে ব'সে একজন বন্ধু চিত্রশিল্পী দুঃখ ক'রে বলছিলেন, "ভাস্কর্য শিল্পের খুব অবনতি দেখা যাচ্ছে।" আমি তরুণ। তাঁর তীব্র বিরোধিতা ক'রে বললুম, "কেন, এই শহরেই তো একজন ভাস্কর রয়েছেন যিনি মাইকেল এঞ্জেলোর সমগোত্রীয় ?"

আমার উত্তেজনা প্রশমিত হতে ভেরহেরেন আমার পিঠ চাপড়ে হাসতে-হাসতে বললেন, "আগামী কাল আমি রোঁদার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। চলো আমার সঙ্গে। যে একজন মানুষের প্রশংসায় এ-রকম পঞ্চমুখ তার অধিকার আছে সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা করার।"

আমার খুবই আনন্দ হলো। কিন্তু পরদিন ভেরহেরেন যখন প্রখ্যাত ভাস্কর্যের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না। তাঁরা পুরোনো দুই বন্ধু গল্প করছিলেন। নিজেকে আমার মনে হচ্ছিলো অপরাধী, অনধিকার প্রবেশকারী।

যাঁরা মহৎ মানুষ তাঁরা সহৃদয়ও বটে। বিদায় নেবার কালে রোঁদা বললেন, "আপনি বোধ হয় আমার তৈরী দু-একটা মূর্তি দেখতে চান। দুঃখের বিষয় এখানে কোনো মূর্তিই নেই। শনিবার দুপুরে মিউজনে আসুন। আমার সঙ্গে খাবেন। নিমন্ত্রণ রইলো।"

রোঁদার গ্রামের বাড়িখানা বেশ সাদাসিধে। ছোট একটা টেবিল। তার উপরে খাবার। অনাড়ম্বর। তাঁর চোখের কোমল দৃষ্টি এবং সরল স্বাভাব আমার আড়ষ্ট ভাব দূর করলো।

রোঁদার স্টুডিয়ো দেখেলে ধরণের একটা বাড়ি। জানালাগুলো বেশ বড়ো-বড়ো। ভিতরে দেখলুম বহু মূর্তি। তা ছাড়া রয়েছে বাহু, হাত কিংবা আঙুল। আরম্ভ ক'রেও শেষ করেন নি এ-রকম অনেক মূর্তি। ওখানে ঢুকলেই বোঝা যায় একজন মানুষ কী ভাবে মরিয়া হয়ে সাধনা করেছেন, কি অধ্যবসায়!

রোঁদা লিনেনের তৈরী একটা চিলে আলা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। মনে হলো একজন মজুর। একটা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললেন,

"আমার একেবারে হালের কাজ।". ভেজা কাপড় সরাতেই বেরিয়ে পড়লো একটি নারী মূর্তি "শেষ হয়ে এসেছে।"

তারপর সুবক্ষত, স্বাস্থ্যবান বুড়ো ভদ্রলোক কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। ভালো ক'রে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, প্রায় শেষ ক'রে এনেছি।"

কিন্তু একটু নজর ক'রে দেখে বললেন, "কিন্তু ঘাড়ের কাছে রেখাগুলো একটু কড়া হয়ে গেছে। একটু মাফ করতে হবে…"

একটি মসৃণ কাঠ তুলে নিয়ে নরম মাটির ওপর আলতো ভাবে বুলিয়ে নিলেন। মূর্তিটিকে আরো সুকুমারী দেখালো। শিল্পীর শক্ত সবল হাত তখন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো জ্বলছে। "আর ওখানটা…ওখানটা…"

আবার বললালেন। আবার কয়েক পা পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গলায় কী রকম ঘর-ঘর শব্দ উঠলো। চোখে ফুটে উঠলো হাসির ঝিলিক। আবার ভ্রু কুঞ্চিত হলো বিরক্তিতে। কখনো মূর্তির গায়ে মাটি লাগাচ্ছেন; আবার কখনো কেটে নিচ্ছেন।

এই কাণ্ড চললো আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা ধ'রে। আমার সঙ্গে আর একটি কথাও বলছেন না। যে আশ্চর্য মূর্তি তিনি রচনা করতে চান তা ছাড়া আর কোনো কিছুর কথাই তাঁর মনে নেই। তাতেই তিনি ডুবে আছেন। তিনি এবং তাঁর রচিত মূর্তি এছাড়া আর কিছুর অস্তিত্বই এ-মুহূর্তে তাঁর কাছে নেই। সৃষ্টির প্রথম দিনে ঈশ্বর বুঝি এমনিই মগ্ন ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে মসৃণ কাঠের টুকরোটি নিচে ফেলে দিলেন। ভেজা কাপড় দিয়ে মূর্তিটির শরীর আলগোছে ঢেকে দিলেন যেমন ক'রে প্রেমিক তার প্রিয়ার দেহে জড়িয়ে দেয় শাল। তারপর যেন বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন ঘরের দরজার দিকে।

দরজার কাছে গিয়ে তাঁর নজর পড়লো আমার ওপর। প্রথমটা ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন। আমাকে চিনতে পারলেন। চিনতে পেরেই তাঁর মুখে বিচলিত ভাব ফুটে উঠলো। তাই তো! অভদ্র ব্যবহার ক'রে ফেলেছেন! "মাফ করবেন। আপনার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। কিন্তু জানেন…" আমি কৃতজ্ঞ ভাবে তাঁর হাতখানা তুলে নিয়ে তাতে একটু চাপ দিলুম। তিনি আমার মনের ভাব ধরতে পেরে জড়িয়ে ধরলেন। সেই অবস্থায় নিয়ে গেলেন দরজা অবধি।

সারা বছর স্কুলে গিয়ে যা শিখতে পারিনি; ওই এক সন্ধ্যায় মিউজন-এ তা শেখা হয়ে গেলো। সেই থেকে জেনেছি স্থায়ী এবং ভালো কাজ করতে গেলে মানুষের কী করা উচিত।

একজন মানুষ যে অমন ক'রে খাদ্য পাত্র ভুলে যেতে পারে এই অভিজ্ঞতা আমাকে সব চাইতে বিস্মিত করেছিলো। সেই মুহূর্তে আমি যেন দেখলুম সমস্ত শিল্প ও মানুষের কৃতিত্বের গোপন রহস্য। আর কিছু নয়, একাগ্রতা। মানে একটি কাজের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ; সে কাজ ছোটই হোক আর বড়োই হোক। প্রায়ই যা ছড়ানো থাকে সেই ইচ্ছাশক্তিকে একটি বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করা।

উপলব্ধি করলুম। এ-পর্যন্ত এ জিনিসটিরই অভাব ছিলো আমার মধ্যে। একজন মানুষকে ডুবে যেতে হবে তার কাজে। সার্থকতার আর দ্বিতীয় কোনো দাদুমন্ত্র নেই।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

কুমার মিত্র

আগামী পরশু বাইশে চৈত্র।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল অতনুর, একেবারে হঠাৎ। অথচ সকালে উঠেও তারিখটা মনে পড়েনি। পোষাক পরে বাসকটে যেতে গাছপালা ভরা রাস্তাটা ধরে কয়েক মিনিট হাঁটতে হাঁটতেও না। এটা যে চৈত্র, তাই তো মনে ছিলনা. আজকাল মনে থাকে না। চৈত্র এখনও ঠিক আসে, দক্ষিণ বাতাস ফুরফুর করে বয়, উদাস গলায় পাখীরা গান গায়, গাছে গাছে নবপল্লবের প্লাবন আসে। কিন্তু ওরা আসে আর চলে যায়। অতনুর অন্যমনস্ক মন তাদের ঠিকানা রাখেনা – আসা-যাওয়ার। কেবল গোধূলির রাঙা ঘরে আত্মময় হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সহসা যখন মধুর দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়া গায়ের জামাকাপড় এলোমেলো করে দিয়ে যায়, পাশ দিয়ে যুবক-যুবতীর দল অপ্রাজ্ঞ গলায় হাসি আর কথা ছড়াতে ছড়াতে চলে যায়, কিংবা রাস্তার পাশের টকটকে লালফুলে ছাওয়া কৃষ্ণচূড়ার ওপর চোখ পড়ে, তখন কেমন চমক লাগে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়—এটা চৈত্রমাস, সবকিছুতে তাই এত রঙের ছড়াছড়ি। কিন্তু এই হঠাৎ মনে পড়াটাও নিতান্তই হঠাৎ। বছর ফুরিয়ে গেলে. বাড়ীতে যখন নতুন ক্যালেণ্ডার আসে তখন সহসা মনে পড়ে যায়, নতুন বছর এল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'তাহলে আর একটা চৈত্র চলে গেল!'

চৈত্র চলছে, খেয়াল ছিলনা। স্কুলে এসে ক্লাসে একটা কবিতা পড়াতে পড়াতে কেন যেন মনে পড়ে গেল, আগামী পরশু বাইশে চৈত্র। আর তারিখটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকগুলো মানুষের মুখ মনে পড়ে গেল। মালিমা, অশোক, মাধবী, মল্লিকা এদের মুখ। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যমনস্ক হয়ে গেল অতনু। ভাল করে পড়াতে পারল না।

সময়ের ঘনে ধুয়ে মুখগুলো স্মৃতিতে অনেকখানি ঝাপসা, পুরনো পুঁথির অক্ষরের মতো অস্পষ্ট। অথচ এমন কিছু বেশীদিনের কথা নয়। মনে হয় এই যেন সেদিনের কথা। হিসেব করে দেখলে বড় কম দিনের কথাও নয়। দেখতে দেখতে কেটে গেল বৈকি বছর দশ। অথচ এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানটাকে কত সংক্ষিপ্ত মনে হয় অতনুর। চোখ বুজে একটুখানি মনস্ক হলেই সব একে একে মনে পড়ে যায়। মালিমার পানের রসে ভেজা কোলাকোলা মুখ, মাধবীর দুই ভুরুমিলন্ত বড়বড় দুটো কালো চোখ, মল্লিকার চাপা মৃদু হাসি এবং গুঞ্জনের মতো মৃদুলো কণ্ঠস্বর, সব অনুভব করতে পারে।

বেশ ছিল দিনগুলো, আড্ডার আমেজে ভরা দিনগুলো। আসর বসত কখনও ঘরে, কখনও ছাদে, কখনও বাড়ীর পুবপাশের একখানি ঢেওয়াল ঘেরা জমিটায় কণকচাঁপা গাছের তলায় ঘাসের জাজিমের ওপর। মালিমা চা করে পাঠিয়ে দিতেন, চা নিয়ে আসত বেশীর ভাগ মাধবী, কখনও মল্লিকা, ফেভারঅলা চায়ের সঙ্গে মজাদার গল্প মিশে কণকচাঁপা গাছের ছায়ায় চৈত্রসন্ধ্যা কিংবা বৈশাখী রাতগুলো চমৎকার হয়ে

উঠত। কখনও কখনও মাধবী রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনাত; গলা তেমন সুরেলা নয়, রেওয়াজের অভাব, কিন্তু তাতে আটকাত না। সেই আমেজী আসরে যে কোন গানই যথেষ্ট ছিল। মল্লিকার গানের গলা মিষ্টি ছিল, কিন্তু সে কখনও গান গেয়ে শোনাত না। অনুরোধ করলে বলত গান গাইতে জানেনা। অথচ যার গলার স্বর অতো মিষ্টি সে গান গাইতে জানে না, কেউ বিশ্বাস করত না। কিন্তু বিশ্বাস করুক বা না করুক, মল্লিকাকে কখনও গান গাওয়ানো যায়নি। তবে সে মাঝেমধ্যে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাত। তার রিণরিণে রূপোলী গলায় আওয়াজ কণকচাঁপার গন্ধ ভরে উঠত। চারপাশের বায়ুমণ্ডল সুরে ভরে উঠত যেন।

এত তাড়াতাড়ি সেই দিন ফুরিয়ে যাবে, কে জানত!

অশোক অতনুর ছেলেবেলার বন্ধু নয়, এমন কি স্কুল-কলেজেরও নয়। অশোক আর অতনুর মাঝামাঝি এক বন্ধু হল অমিত—যে উভয়েরই বন্ধু। অশোক আর অতনুর পরিচয় অমিতের মধ্যস্থতায়। অশোকদের বাড়ী অমিতই নিয়ে গিয়েছিল অতনুকে।

একথা-ওকথার পর অতনুকে দেখিয়ে অমিত বলেছিল: 'এ আমার নতুন বন্ধু অশোক। আজ থেকে তোরও। এর একটা বিশেষ গুণ আছে। লিখতে পারে।'

'আপনি লেখক?' অশোকের মুখে একটা প্রচ্ছন্ন হাসি ছিল।

অতনুকে এমনিতে দেখলে একটু ভাবাগোবা নিরীহ ধরণের মানুষ মনে হয়। কথাবার্তায় সে পটু নয় তা নয়, তবে লোকজনের সামনে কেমন একটু নির্বাক হয়ে যায়। একপাশের চেয়ারে চুপচাপ বসেছিল সে, কথাবার্তা প্রায় বলছিল না বললে হয়। অশোকের প্রশ্নে সে লজ্জা পেয়েছিল। কোনরকমে ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিয়েছিল।

'কি লেখেন?'

'গল্প।'

'কোথাও বেরোয়?'

'বেরোয় বৈকি।' উত্তরটা দিয়েছিল অমিত, 'অনেক কাগজে লেখে ও। বেশ ভাল লেখে। অশোককে তোমার লেখাগুলো একটু পড়তে দিও তো অতনু।'

'দেব।' সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল অতনু।

ঘরের ভেতর মল্লিকা মাধবীও ছিল। ওদের সঙ্গে অতনুর কোন কথা হয়নি। এমনকি চোখা-চোখিও না। কিন্তু এত কাছ থেকে একজন লেখককে দেখে, যার লেখা নাকি বিভিন্ন কাগজে ছাপা হয়, ওদের চোখে যে বিস্ময় ঘনিয়ে এসেছিল সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি অতনুর।

প্রথমদিন এই পর্যন্ত।

তারপর ছাড়াছাড়া যাতায়াত। আড্ডা জমে, কথা আর হাসির ফোয়ারা ওঠে। কিন্তু তাতে অতনুর অংশ একটু কম থাকে। কিন্তু ক্রমে থেকে যে সেটা ঘনঘন আসা যাওয়ায় পরিণত হল সে খেয়াল না হইল ওদের, না অতনুর। ক্রমশঃ আরেকটি সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল। সেটা এই যে অতনু কথাবার্তায় খুব চৌকস। বাকচতুর বলতে যা বোঝায়, তাই। হাসিয়ে বেদম করে দিতে ওর জুড়ি নেই।

পরে এই নিয়ে তাকে খোঁটা খেতেও হয়েছে মল্লিকা মাধবীর কাছে।

মল্লিকা বলত, 'প্রথম প্রথম তো মনে হত কথাই বলতে জানেন না। কি বলতে কি বলে ফেলবেন এই ভয়ে মুখ খুলতে নারাজ। পরে দেখা গেল মুখ খুললে বোজাতে জানেন না।'

'এইরকম মানুষকে কি বলে জানিস দিদি?' মাধবী মল্লিকার দিকে তাকাত।

'কি?'

'ডিজেনেরেট বলে।'

এমনি আরো সব নানা কথা বলে ওরা খোঁচাত ও অতনুকে। অতনুও কম যেত না। এটা সেটা নিয়ে রাগাত ওদের।

যেমন চলছিল তেমনি চলবে, সকলেরই ধারণা ছিল। হঠাৎ বিপর্যয় এল। অথচ এ সম্পর্কে অতনু কিংবা আরো দুজন বন্ধু পুলক আর সমীরণ—যাদের নিত্য যাতায়াত ছিল ওখানে, আগে থেকে কিছুই জানতে পারেনি।

সেটা চৈত্রমাসের মাঝামাঝি একটা দিন। সন্ধ্যাবেলা অশোক অতনুদের বাড়ী এলো। উস্কোখুস্কো চুল, শুকনো মুখ, পোষাকও তেমন পরিপাটি নয়। বিনা ভূমিকায় বলল, 'তোর সঙ্গে কিছু কথা আছে অতনু।' যেমন কেমন অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বলল অশোক।

'বল।'

'এখানে নয়। চল পার্কে কিংবা ময়দানে গিয়ে বসি।'

সামান্য একটু রাত হয়েছে। ময়দানে তখনও লোকের ভীড। একটা নির্জন কোণ বেছে নিয়ে বসল ওরা।

'তোকে যেন কেমন দেখাচ্ছে অশোক, কি ব্যাপার বল তো?'

'আমরা খুব শীগগির এখানে থেকে চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছিস, কেন?' অতনু বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

'ফ্যামিলি অ্যাকেয়ার্স তোকে তো প্রায় কিছুই বলা হয়নি। তুই তো জানিস বাবা একটা স্কুলের হেডমাষ্টার। ওঁর আয়েই সংসারটা এতদিন টিকে আছে। বাবা কিছুদিন হল রিটায়ার করেছেন। এবার সম্পূর্ণ আমার ওপর সংসারটা এসে পড়ছে।' একটু থেমে বলে, 'আমি তো মাত্র শ' তিনেক পাই চাকরী থেকে। এত বড় সংসারের পক্ষে টাকাটা কিছুনা। বাড়িভাড়াই তো শ'খানেক। তার ওপর সকলের খাওয়া-দাওয়া, পোষাক, লেখাপড়া। আমি তো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে অশোক আবার বলতে সুরু করে, 'আয় কম অথচ খরচ কম নয়। তবু চালাতে তো হবে। এখানে তো শ'খানেক বাড়িভাড়া লাগে। ওটা কমিয়ে যদি পঞ্চাশ-ষাটে আনতে পারি, সেটাই বা কম কি? তাই প্রথম কর্তব্য হল বাড়ি বদলানো। তোদের ছেড়ে যেতে আমার খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু উপায়ই বা কি?'

'কোথায় যাবি ঠিক করেছিস?'

'ঠিক এখনও হয়নি। তবে হমহমের দিকে চলে যাব ভাবছি। ওদিকে বাড়িভাড়া কিছুটা সস্তা। একটা বাড়িও দেখা হয়েছে। খান তিনেক ঘর, মেঝে দেওয়াল পাকা, উপরে টালি। লাইটও বোধকরি নেই। তবে ষাট টাকায় এর চেয়ে ভাল আর কি পাওয়া যাবে? ভাল বাড়িতে এতকাল বাস করে এসেছি, এখন ওখানে থাকতে অসুবিধেই হবে। তবে চল্লিশটা টাকা বেঁচে গেল, এটাও তো ভাবতে হবে।'

কথাগুলো খুব সহজ ভঙ্গীতেই হয়তো বলতে চাইছিল অশোক। কিন্তু কেমন ভিজেভিজে শোনাচ্ছিল। ধরা-ধরা লাগছিল। একটা সূক্ষ্ম ব্যথার আর্দ্রতা ওর স্বরকে আলতো ভাবে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে

দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তা কিছুটা দূর, লাইটপোস্টের যেটুকু অবশিষ্ট আলো ময়দানের অগভীর অন্ধকারে এসে পড়েছিল তাতে আঁধার যেন কুয়াশার আকার নিয়েছিল: সেই ফিকে অন্ধকারে অশোকের অনন্ত মুখের আভাস এবং আর্দ্র স্বর কেমন যেন অলৌকিক লাগছিল অতনুর। জায়গাটা জনহীন এবং নিঃশব্দ। ফলে একটিমাত্র স্বর তার গাঢ় বাথাময়তা নিয়ে অতনুর মনোভূমিতে তীব্র আঘাত হেনে যাচ্ছিল। কিন্তু অতনুর বিশেষ কিছু বলার ছিল না, ফলে বেশীর ভাগ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল কেবল।

'চিরকাল আলো হাওয়ার ঘরে থাকা অভ্যাস। তুলেই গেছি আমরা ভাড়াবাড়ীতে আছি।' অশোক বলে যাচ্ছিল, 'তাই ওই এঁদো ঘুপচি আলো-বাতাস না থাকা ঘরে প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হবে। কিন্তু আমার কথা ভাবছিনা অতনু; আমি পুরুষ মানুষ, সব সয়ে যাবে। তাছাড়া দেখছি তো আর পাঁচজন কেমনভাবে আছে। আমি ভাবছি মায়ের কথা, বোনগুলোর কথা। ওদের মনের ওপর খুব চাপ পড়বে, শরীরটা সামলাতে দেরী হবে।'

'কোনরকমে এখান থেকে যাওয়াটা ম্যানেজ করা যায় না অশোক?' একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিল অতনু।

'সে কি করে হয় বল? মেজ ভাইটাকে অত আশা করে বি. ই. পাশ করান হল। ওর যদি একটু যাবস্থা করা যেত তাহলে তো যাবার কথা ভাবতেই হত না। চেষ্টার তো ত্রুটি নেই, কিন্তু চাকরী আর জুটছে কোথায়?' সামান্যক্ষণ নীরব থেকে আবার বলতে সুরু করে অশোক, 'বাড়ীতে কদিনই বেশ একটা থমথমে আবহাওয়া চলছে। একমাত্র বাবাই দেখলাম এখন পর্যন্ত হাসিখুশী। মা আর বোন দুটো কদিন ভাল করে কথা বলে না, হাসে না পর্যন্ত। সকলেই যেন কেমন দুঃখী-দুঃখী।' বলতে বলতে বোধহয় অস্ফুট গলায় হাসে অশোক, 'একটা উপমা মনে পড়ছে রে অতনু। যাযাবর পাখী দেখেছিস্ তো! আসন্ন এ:বুলুক, কাল অন্তমুলুক। ভাড়াটেরা হল ওই সিজন্যাল বার্ডদের মতো। এক ধরণের যাযাবর বলতে পারিস আমাদের।'

হয়তো আবহাওয়াটাকে একটু লঘু করবার জন্যেই অশোক বলেছিল কথাটা। অতনু কিন্তু সেই কৌতুকের সুরে নিজেরা সুর মেলাতে পারেনি। হয়তো স্পষ্ট করে সে কিছু ভাবছিল না, কিন্তু নানাধরণের ভাবনা পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলীকৃত হয়ে তার বুকটাকে টনটনিয়ে দিচ্ছিল।

'তবে যাযাবরদের সঙ্গে আমাদের একটু তফাৎ আছে। যাযাবররা যখন দেশান্তরে চলে যায় তখন পেছনের দিনগুলোকে স্মৃতি থেকে বরাবরের জন্যে মুছে দিয়ে যায়। আমাদের তা হয় না, পেছনের দিনগুলোই আমাদের সোনালী দিন। চলে যাবার পর তোদের কথা বড্ড মনে পড়বে রে।' পূর্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধরে অশোক বলে।

'তুই অতো ভাবছিস কেন?' অতনু নরম গলায় বলে, 'আগের মতো অতো ঘনঘন না হোক, আড্ডা আমাদের মাঝেমাঝে জমবে ঠিকই। আমরাই কি মনে করছিস চুপচাপ থাকতে পারব? ছুটিছাটার দিনে ঠিকই দলবল নিয়ে ছুটব।'

'কথাটা মনে থাকবে তো।'

'তুই কি বলছিস অশোক! আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড কথাটা আমাদের ক্ষেত্রে খাটে না, বুঝলি?'

'সে বিশ্বাস আমার আছে।' আবেগপূর্ণ গলায় কথাটা বলে অশোক অতনুর হাতের মুঠিতে একটা অনাবশ্যক চাপ দেয়।

তারপর আর কোন কথা হয় না। দুই বন্ধু অত্যন্ত নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে।

যাইশে চৈত্র অশোকরা চলে গিয়েছিল। তার দিন দুই তিন আগে—সেটা চৈত্রমাসের উনিশ কিংবা বিশ তারিখ হবে—অতনু গিয়েছিল অশোকদের বাড়ি। অশোকই যাবার জন্যে বিশেষ করে বলে দিয়েছিল। বলেছিল—'একবার আমাদের বাড়ী যাস, কথা আছে। তাছাড়া চলে যাবার আগে তোর সঙ্গে ওদের একটু দেখা হওয়াও বোধহয় দরকার।'

এইসব নানাপাঁচ ভেবে এবং কিছুটা নিজের মনের তাগিদে একদিন সন্ধ্যাবেলা সে গিয়েছিল অশোকদের বাড়ি। অশোক বাড়িতে ছিল না। কোথায় যেন গিয়েছিল। বাড়ীতে ছিলেন না মেসোমশাইও। মাসিমা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মাধবী গিয়েছিল তার কোন এক বন্ধুর বাড়ি। পাওয়া গিয়েছিল মল্লিকাকে।

পুবধারের কনকচাঁপা গাছের তলায় ঘাসের জাজিমের ওপর বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছিল মল্লিকার সঙ্গে।

'দাদার মুখে সব শুনেছেন বোধহয়? আমরা তো চললাম।' মল্লিকা বলেছিল।

'হ্যাঁ, সব শুনেছি।' অতনু আস্তেআস্তে উত্তর দিয়েছিল।

'আপনাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে, ভাবতেই যেন কেমন লাগছে। দাদা যখন প্রথম বলল কথাটা বিশ্বাসই হতে চায়নি! মনে করেছিলাম তামাসা করছে। দাদা অমন মাঝেমাঝে করে থাকে। পরে যখন বুঝলাম এর ভেতর একবিন্দু মিথ্যে নেই তখন যা কষ্ট হয়েছিল! নতুন ঘরবাড়ি, নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষজন—কি জানি কেমন লাগবে!'

'প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হবে। পরে ধীরে ধীরে সয়ে যাবে। সয়ে যায় আস্তে আস্তে।'

'হয়তো ঠিকই বলছেন আপনি। সয়ে যায়। ভুলে যাওয়া আর মানিয়ে নেওয়াই তো মানুষের স্বভাব। কিন্তু তার তো অনেক দেরী। তার আগে এই বাড়ী, আপনারা, বিশেষ করে আপনার কথা বারবার মনে পড়বে।' বলতে বলতে মল্লিকার গলা কেমন চাপা আর অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। গলায় যেন কি একটা বেধে গিয়েছে, এমন মনে হচ্ছিল। তারপর ঈষৎ আবেগ এনে বলেছিল, 'কিন্তু আমাদের কথা কি আপনার মনে থাকবে? হয়তো ভুলেই যাবেন আমাদের কথা। লেখকদের যা ভুলো মন!'

'থাকবে, থাকবে। লেখকরাও সামাজিক জীব মল্লিকা, আর পাঁচজনের মতো সাধারণ মানুষ। সুখদুঃখের বোধ তাদেরও আছে। তাছাড়া সব ঘটনা কি মন থেকে মুছে ফেলা যায়? 'যায় না।' 'যায় না' শব্দটাকে একটু জোর দিয়েই উচ্চারণ করেছিল অতনু। সেদিনের সেই উজ্জ্বল চৈত্রবাতাসের আবেগ কখন যে তার কণ্ঠেও এসে ভর করেছিল খেয়াল করেনি অতনু!

'জানেন, আমাদের বাড়িতে আপনাকে নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়। বাবা তো আপনার নাম করতে অজ্ঞান। বলেন—ও খুব ব্রাইট ছেলে, খুব প্রমিজিং। দেখিস, ও একদিন বড় হবেই। আপনার কিছু কিছু লেখা বাবা পড়েওছেন। একেবারে উচ্ছসিত পড়ে। দাদাও মস্তো ভক্ত আপনার। আপনার নাম করে বলে—ও যা পরিশ্রমী আর আত্মবিশ্বাস, ও বড় হবেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মল্লিকা বলে, 'সকলেই আপনার প্রশংসা করে। আপনি বড় হবেন, নাম করবেনই, সবারই তাই ধারণা।'

'তোমারও?' অতনু অভিভূতে জিজ্ঞাসা করে বসে।

'হ্যাঁ, আমারও। আমি তো আপনার লেখার সব বুঝিনা। তবু আমারও ধারণা সকলে একদিন আপনাকে চিনবে। তাছাড়া—' সামান্যক্ষণের নীরবতার পরে বলে; 'তাছাড়া আমিও চাই আপনি বড় হোন।'

অতনু কোন উত্তর করতে পারেনি। আসলে উত্তর দেওয়ার মতো মানসিক ভারসাম্য তখন ছিল না। একটা বিস্তীর্ণ সরোবরের মতো অপরিমিত সুখ তার বুকের মধ্যে তরঙ্গিত হয়ে উঠছিল। প্রশংসা পেলে সকলেরই ভাল লাগে। কিন্তু এ ভাললাগা যেন সেটুকুই শুধু নয়। কদমতলার তলায় পর্যাপ্ত আলো ছিল না। লঘু অন্ধকারে অত্যন্ত নিকটবর্তী মল্লিকার নারীশরীর তার মধ্যে তারই অজ্ঞাতে একটা আবছা মোহাবেশ এনে দিয়েছিল বোধহয়। এমন একান্ত নিরালায় মল্লিকার সঙ্গে কথা বলা এই বোধহয় প্রথম। মোহাবেশের সঞ্চার কি শুধু অতনুর মনেই হয়েছিল? মল্লিকার মনে নয়? অন্তত সেই মুহূর্তে অতনুর মনে হয়েছিল মল্লিকার মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নারীর পরিচয় সে আবিষ্কার করে ফেলেছে। পাঁচজনের মাঝখানে শত তরলতার মধ্যেও যাকে একটু রহস্যময়ী মনে হয়েছে, শত সংলাপের প্রগল্ভতার ভেতরেও যার সত্তা কোনদিন বিন্দুমাত্র অনাবৃত হয়নি, আজ যেন সে নিজেকে অনেকখানি মেলে ধরেছে। নির্জন কদমতলার ঢাকনির নীচে মৃদু অন্ধকারে মল্লিকার অর্ধস্বচ্ছ নিকট-সংলগ্ন শরীর যেন আত্মসমর্পণের বাগ্রতায় উন্মুখ। মল্লিকার নিবিড়, প্রায় আত্মগত শব্দোচ্চারণ যেন সুরভিত সংবেদনময় হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি।

'যখন নাম-যশ হবে, প্রকাশকরা দরজায় ধর্ণা দেবে, গল্পের কিম্ন হবে, তখন গরীবদের বাড়িতে মশাটয়ের পায়ের ধুলো পড়বে তো?' ঈষৎ প্রগল্ভ স্বরে বলেছিল মল্লিকা।

মল্লিকার কথার ভঙ্গীতে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল অতনু খানিকটা কৌতুকও অনুভব করেছিল। মল্লিকা যে এমন পাকাপাকা কথা বলতে পারে জানা ছিলনা তো! অতনু হাল্কা গলায় অল্প শব্দ করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'তোমার কল্পনাটা অসম্ভব রকম লম্বা-চওড়া মল্লিকা, ওর নাগাল হয়তো আমি কোনদিনই না পাবোনা।'

'যদি পান?' তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেছিল মল্লিকা।

'যদি পাই?' মুহূর্তখানেক বিরতির পর অতনু বলে ওঠে; 'সেদিনও তোমাদের কথা ভুলে যাব না।'

এমনি ধরনের আরো সব কথা হয়েছিল। আজ আর কোনটাই গোটা করে মনে নেই। টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন অবশেষ ধরে রেখেছে স্মৃতি। তাদের ঠিকমতো জুড়ে নিতে পারলে হয়তো সম্পূর্ণ একটা ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু টুকরোদের মধ্যেও কোন কোনটা যে হারিয়ে গেছে! শুধু এখনও যা মনে আছে তা হল—চৈত্রমাসের সেই সন্ধ্যাবেলা ওদের বাড়ি যাওয়ার নির্জন গলিপথটুকু পার হয়ে আসতে আসতে মনটাকে পাখীর পালকের মতো হাল্কা বোধ হয়েছিল। চৈত্র বাতাসের সমস্ত মোহাগ বুকের মধ্যে উথলে উঠছে, কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার সব রঙ হৃদয়ে এসে জড়ো হয়েছে, এমনি মনে হয়েছিল। আর একটি প্রশ্ন বিদ্যুৎ চমকের মতো মনের মধ্যে সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে গিয়েছিল—মল্লিকা কি আমায় ভালবাসে?

দিন দুই তিন পরে মল্লিকারা চলে গেল। না, যাওয়ার আগে আর দেখা হয়নি কারো সঙ্গে। মাধবী কিংবা মল্লিকার সঙ্গেও না। ইচ্ছে করে দেখা করেনি। কি হবে কতকগুলো বেদনাদায়ক মুহূর্তকে ডেকে এনে? ওরা চলে গিয়েছিল দুপুরে, অমিতের মুখে শুনেছে সে। সন্ধ্যায়, ডায়েরীর বুকে লিখে রেখেছিল—আজ বাইশে চৈত্র মল্লিকারা চলে গেল।

তারপর?

তারপর অশোকদের নতুন বাসায় বার দুই তিন গিয়েছিল বৈকি অতনু। অমিত এবং অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছিল, একবার একলাও গিয়েছিল। অশোক নানা ব্যথাবেদনা আর গাঢ় অনুভবে ভরা কয়েকটা চিঠিও দিয়েছিল। তারপরই মুছে যেতে থাকল স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা, ফিকে হয়ে যেতে থাকল বন্ধুত্বের ঘন রঙ। হাওড়া থেকে দমদম যে অনেক দূর! ব্যবধানটা মাত্র কয়েক মাইলের হলে কি হবে! জীবনের হাজারো সমস্যা যন্ত্রণা জটিলতা এড়িয়ে এত দূরে কি ঘনঘন যাওয়া সম্ভব।

সুতরাং যা হবার তাই হল। হাওড়া আর দমদমের মধ্যে, অতনু আর অশোকদের মধ্যে গড়ে উঠল একটা বিচ্ছিন্নতার নদী, যার ওপর কোন সাঁকো রইল না।

শেষবারের মতো কতদিন আগে যেন গিয়েছিল? তা বছর সাত হবে বৈকি। এতদিন পরে যাওয়া কি ঠিক হবে? ওরা ঠিক আগের মতো আছে, না পাল্টে গেছে? দেখলে চিনবে তো? চিনলেও আগের মতো সহজে গ্রহণ করবে তো? মল্লিকা মাধবীর কি বিয়ে হয়ে গেছে? অশোক কি বিয়ে করেছে?

কিন্তু এত সব সে ভাবছে কেন? আর এর উত্তরই বা পাবে কি করে? তবে মন যখন চেয়েছে তখন যাওয়াই যাক একবার।

দমদম থেকে শেয়ালদামুখো ট্রেনখানায় চড়ে বসতেই একরাশ অবসন্নতা ছেঁকে ধরল সারা শরীরকে। অতনুর মনে হল সে বড় ক্লান্ত, অতিরিক্ত ক্লান্ত। অত ক্লান্ত কোনদিন মনে হয়নি নিজেকে। প্রত্যেকটা অস্থিগ্রন্থি যেন অবসাদে টনটন করছে, মাথার ভেতর অপরিমিত শূন্যতা। একটা শীতল ঘর এবং একটি নরম বিছানার বড় দরকার। কিন্তু বাড়ী তো এখনও অনেক দূরের পথ।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেন। তখন প্রায় দুপুর। কম্পার্টমেন্টে যাত্রীসমাগম অত্যন্ত কম, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দু-পাঁচজন। একটা নির্জন কোণে বেশ হাত-পা ছড়িয়েই বসতে পেরেছে অতনু। মাথার ওপর পাখাটা ফুলস্পীডে চালিয়ে দিতেই জোরাল হাওয়া চারপাশ ভরে দিল। অতনু একটা আরামসূচক নিঃশ্বাস ছাড়ল. তারপর এলোমেলো ভাবনার হাতে নিজেকে সঁপে দিল।

প্রথমেই মনে হল—না এলেই ভাল হত। সে ভেবে পেল না এতদিন পরে এখানে আসার দুর্মতি হল কেন তার। ছেঁড়া সুতো কি জোড়া লাগে? অতীত আর বর্তমানকে মিলিয়ে নেবার জন্যে কে-ই বা বসে আছে?

সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়ে ধোপদোস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আশঙ্কা-উদ্বেগে ভরা দুরুদুরু বুক নিয়ে বাসে চড়া থেকে সুরু করে ও-বাড়ী থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তের ছবির ওপর চোখ বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করল অতনু।

গত দুদিন ধরে কতরকম ভাবনা আর কল্পনা। বাসে চড়েও কত উদ্বেগ! ওরা সবাই ভাল আছে তো! কোন দুর্যোগ বয়ে যায়নি তো ওদের সংসারের ওপর দিয়ে! মাসিমা আর মেসোমশাই বেঁচে আছেন কিনা এই সংশয়ও দেখা দিয়েছিল। ভাবনাটাকে কোনরকমে তাড়িয়েছে মাথা থেকে। অশোকরা কি এখনও সেই পুরনো বাড়ীতেই আছে! সে বাড়ীতে ভালো হাওয়া নেই, আলো নেই, বয়স জীর্ণ হওয়ার জন্যে যার চুন বালি সর্বদা খসে পড়ছে, আর পেছন দিকে কাঁচা নর্দমা থাকার জন্যে যার ভেতরটা সর্বদা বুক ঘুলিয়ে ওঠা দুর্গন্ধে ভরপুর থাকে, সেই বাড়ীতে? সত্যি ওদের বড় কষ্ট। আলো আর হাওয়ার ঘর থেকে ওখানে গিয়ে ওরা বড় কষ্টে আছে। অশোকদের সকলের জন্যে কেমন একটা সহানুভূতিতে মন ভরে গিয়েছিল অতনুর। অশোকের বি. ই. পাশ করা বেকার ভাই কি চাকরী পেয়েছে,

নাকি এখনও বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? মল্লিকা এবং মাধবীর কি বিয়ে হয়ে গেছে ? অশোক কি ওদের পাত্রস্থ করতে পেরেছে—অন্তত সুপাত্র ? কত বয়স হল ওদের ? দশবছর আগে মল্লিকা তো ছিল সতের, আর মাধবী ষোল। এখন তাহলে মল্লিকা সাতাশ আর মাধবী চব্বিশ। মল্লিকা কি এখনও রুপোলি গলায় কবিতা আবৃত্তি করে ? মাধবী কি এখনও ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যখন তখন রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে ওঠে ?

এমনি অজস্র ভাবনা বিব্রত করেছে অতনুকে। একসময় ভেবে ভেবে পরিশ্রান্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছে ভাবনা।

কিন্তু যেসব ভাবনা সে ভাবল তার সঙ্গে কি বিন্দুমাত্র মিল হল ঘটনার ? কোনটাই কি মিলল ? সত্যি, সবটাই বড় আশ্চর্যের।

প্রথম যা তো গেল বাড়ী খুঁজতে গিয়ে।

বাড়ী তো জানাই ছিল। কিন্তু কড়া নাড়তে বেরিয়ে এল একটা অজানা মুখ। মাসিমা, মেসো-মশাই, মল্লিকা বা মাধবী, কেউ নয়।

'কাকে খুঁজছেন ?' একটুখানি কপাট ফাঁক করে প্রশ্ন করল একজন মাঝবয়সী লোক।

'মল্লিকা কিংবা মাধবী, এদের কাউকে একটু ডেকে দেবেন ?'

'মল্লিকা ! মাধবী !' লোকটার ভুরু কুঁচকে ওঠে, 'এ বাড়িতে তো কেউ ও নামে থাকে না।'

'থাকে না !' অতনুরই অবাক হবার পালা।

'না। এবাড়ীতে আমরাই থাকি। বছর দুই হ'ল এসেছি। আপনি বোধ হয় বাড়ী ভুল করেছেন।'

'না, না, তা কি করে হয় ! আমি যে এর আগে এখানে এসেছি। আমার ভুল হয়নি।'

লোকটা কি যেন ভাবে, তারপরে বলে ; 'আমার আগে অবিনাশবাবু বলে এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর দুটো মেয়ে আছে দেখেছি। নাম অবশ্য জানিনা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবিনাশবাবুর বাসাই তো আমি খুঁজছি।' তাড়াতাড়ি বলে ওঠে অতনু। অশোকের বাবার নাম তো অবিনাশবাবুই।

'তাঁরা তো এখানে থাকেন না। বাড়ী করে উঠে গেছেন।'

'বাড়ী করে !' অতনু চেষ্টা করেও বিস্ময় চাপতে পারেনি।

'হ্যাঁ। এই দমদমেই। তাঁর ঠিকানাটা মোটামুটি রকম জানি আমি। বলে দিচ্ছি।'

তখান থেকে ঠিকানা নিয়ে বাড়ী খুঁজে পেতে অবশ্য বিশেষ বেগ পেতে হয়নি অতনুকে। কিন্তু বাড়ী দেখে সে হতবাক। এ যে একটা বিজনেস্ ম্যাগনেটের বাড়ী রীতিমতো। সুন্দর ছিমছাম দোতলা। হাল্কা পাঁচটে রঙের মায়া স্নেহের আমেজ এনে দিয়েছে। সামনে কোলাপসিব্‌ল গেট। জানলা, বারান্দার রেলিংয়ে সুদৃশ্য রঙীন গ্রীল। জানলায় জানলায় দামী পর্দা। এক নজর দেখলেই মনে হয় কোন সৌখীন ধনীর বাড়ী।

এ বাড়ী অশোকরা কেমন করে করল ?

কিন্তু বিস্ময়টাকে সে বেশী উচ্চারিত হতে দেয়নি। বুকের মধ্যে সেটাকে চেপে রেখেই খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।

চিনতে অবশ্যই পারল সকলে। কিন্তু গত কয়েকটা দিন ধরে যা সে ভেবেছিল—হঠাৎ দেখা দিয়ে

সকলকে চমকে দেবে, সেটা কি ঘটল? মাসিমা আর মেসোমশাইয়ের মুখ কি খুশীতে আলো হয়ে উঠল? ওঁরা কি অভ্যর্থনার উচ্ছ্বাসে কেটে পড়লেন?

মাসিমার প্রথম কথাটাই কি মনটাকে অস্বস্তিতে ভরে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না?

'অতনু যে! কি মনে করে?'

যা লেগেছিল। নিজেকে খুব অবাঞ্ছিত মনে হয়েছিল বৈকি। মনে হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যায়। কিন্তু সেটা ছিল অত্যন্ত অসম্ভব। মনের ইচ্ছে মনে চেপে ঠোঁটে একটা শুকনো হাসি চাপিয়ে বলেছিল, 'এই এলাম আর কি! কি মনে হল, এসে পড়লাম।'

'বেশ, বেশ। তোমরা তো কেউ আসো না।' একটা আলতো হাসি ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে কোন আপ্যায়নের ভাব লক্ষ্য করেনি অতনু।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলেছিল, 'অশোক কোথায় মাসিমা?'

'ও তো এখানে নেই। বেড়াতে গেছে মধুপুর।'

'ও আচ্ছা। ফিরবে কবে?'

'ঠিক নেই! কেন, কিছু দরকার আছে?'

কি নীরস আর কাঠখোট্টার প্রশ্ন। মাসিমা কি এমন কর্কশ গলায় কথা বলতেন তার সঙ্গে? নিজেকে ভারী অসহায় মনে হয়েছিল অতনুর।

ঘুরেফিরে বাড়ীটার এধার ওধারই চোখ পড়ছিল অতনুর। কাকে সন্ধান করছিল তার চোখ। মনের ভিতর একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছিল—মাধবী মল্লিকা গেল কোথায়? এখানে নেই নাকি? এবাড়ী কি ওদের পর করে দিয়েছে? কখনও মনে হচ্ছিল এই বুঝি দশবছর আগেকার মতো হাসিখুশীর কল্লোল তুলে দুবোন ছুটেএল। তারপর হাজারো প্রশ্ন: এতদিন আসেননি কেন? আমাদের ভুলে গেলেন নাকি! এতকাল পরে বুঝি আমাদের মনে পড়ল? কিন্তু এসবের কিছুই ঘটলনা। কেউ ছুটে এলনা আর প্রশ্নে প্রশ্নে ঝর্ণার মতো কলকল করে উঠলনা। অতনুও বলতে পারলনা, 'মল্লিকা আর মাধবী কোথায় মাসিমা?' কেন বলতে পারলনা সে নিজেই জানেনা। মল্লিকারা কি বাড়ীতে ছিলনা? ছিল বৈকি, কিন্তু সেটা সে জানতে পেরেছে। অনেক পরে।

এই বাড়ী হওয়ার সব ইতিহাসই শুনল, মাসিমাই বললেন। বাড়ীখানার অলি গলি সব দেখাতে দেখাতে, তন্নতন্ন করে বোঝাতে বোঝাতে বলে ফেললেন বাড়ী তৈরীর ইতিহাস, এক নাগাড়ে বাড়া একঘণ্টা ধরে বললেন তিনি। কত টাকা মোট খরচ হয়েছে, কে প্ল্যান করেছে, কোথা থেকে ফার্নিচার কেনা হয়েছে—সব। দেখাগেল এ ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই। তিনি অনর্গল বলে গেলেন, আর প্রশ্ন মুখভাব নিয়ে সে শুনেগেল। কিন্তু শুনতে শুনতে তারনক ক্লান্ত লাগছিল না কি তার? কানদুটো দুহাত দিয়ে চেপে ধরতে ইচ্ছে করছিল না?'

বাড়ী দেখানো শেষ করে বলেছিলেন, 'চল, মল্লিকার সঙ্গে দেখা করবে চল।'

'ও এখানে আছে নাকি?' মুখ ফস্কে প্রশ্নটা বেরিয়েয়ে এসেছিল।

'আছে। তোমাকে একটা কথা এখনও বলা হয়নি অতনু। মল্লিকার বিয়ে হয়েগেছে।'

'বিয়ে হয়েগেছে!'

'হ্যাঁ। তোমাদের জানাবার সুযোগ হয়নি। আর যোগাযোগটা হঠাৎ হয়ে গেল।' তারপর

নিজেই জামাইয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে ভাল জামাই-ই পেয়েছেন। দিল্লীতে সেক্রেটারীয়েটে কাজ করে। অফিসার র‍্যাঙ্কে কাজ করে। চেহারা বেশ ভাল, অবস্থাপন্নও। মল্লিকা এতদিন দিল্লীতেই ছিল, দিনকয় হল এসেছে। আবার চলে যাবে সপ্তাখানেক পরে। কিছুদিন পরে এলে আর দেখা হতনা মল্লিকার সঙ্গে।

নামটা শুনে বুকের ভেতর কি একটু কাঁপন লাগেনি অতনুর! আবছা স্বপ্নের মধ্যে কে যেন মধুর গান শুনিয়ে চলেগেল। অথবা একরাশ চমকা হাওয়া যেন তার নরম অনুভূতির পল্লবগুলোকে শিরশির করে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। এমনি মনে হয়েছিল।

ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েই মাসিমা চলে গেলেন। কি যেন তাঁর কাজছিল। ঘরের নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যে সে আর মল্লিকা। একেবারে মুখোমুখি, কতদিন পরে দেখল মল্লিকাকে? বছর ছয় সাত হবেনা।

'কেমন আছ মল্লিকা?' অতনুর প্রথম সম্বোধন।

'ভাল। আপনি কেমন?'

'আমি! ভালই বলা যায়।' একটু থেমে বলে, 'আমি তো ভাবলাম তুমি এখানে নেই। মাসিমা না বললে জানতেও পারতামনা। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?'

'বাড়ীতেই।'

'বাড়ীতেই! তাহলে এতক্ষণ দেখতে পাইনি যে!'

'মা আপনাকে বাড়ীঘর দেখাচ্ছিলেন তাই দেখা করিনি আর কি!'

'মাধবী কোথায়?'

'বাড়ীর ভেতরেই আছে কোথাও।'

'তাহলে—'কি বলতে গিয়ে কথাটা আর শেষ করেনা অতনু। হঠাৎ বোধহয় বুঝতে পারে তাকে দেখেই যে মাধবী হুড়মুড় করে ছুটে আসবে সেদিন আর নেই। বুঝতে পারে এই বাড়ীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোও পাল্টে গেছে।

এরপর কিছুক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতা। অতনু কি বলবে বুঝে উঠতে পারেনা। কেবল নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়েচেয়ে দেখে মল্লিকাকে। আগের চেয়ে অনেকখানি পুষ্ট হয়েছে মল্লিকা। সর্বাঙ্গে পরিমিত যৌবনের লালিত্য; মাজা মাজা কর্সা রঙে উজ্জ্বল সবুজতার আভাস। হয়তো একদিন আগে শ্যাম্পু করেছিল, তাই ঈষদ চুলে এখনও ঈষৎ রুক্ষতা, ঝাঁপানো চুলের রাশের মধ্যে ভরাট গোলাপ মুখমণ্ডল। সব মিলিয়ে একটা সজীব সবীর, একখানা সুশ্রী সম্পন্ন সুখী মুখ। দশবছর আগেকার সেই স্বল্প গম্ভীর, সহজ, সাধারণ, কিছুটা বা রুক্ষ মেয়েটির চিহ্ন পর্যন্ত এর মধ্যে কোথাও নেই।

বুকের ভেতরকার একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস কোন রকমে রোধ করেছিল অতনু।

তারপর মুখে একটা অনিচ্ছুক হাসিকে টেনে এনে বলেছিল, 'মাসিমার মুখে সব শুনলাম। দিল্লী কেমন লাগছে তোমার?

'ভালই তো।' খুব সংক্ষেপে উত্তর দেয়েছিল মল্লিকা।

'বেশ ফাঁকতালে বিয়েটা সেরে নিলে যা হোক, আমরা জানতেও পারলাম না।' আবহাওয়াটা একটু তরল করবারই বোধহয় চেষ্টা করেছিল অতনু।

কিন্তু ও নিবিকার। আশ্চর্য অনায়াসে বলেছিল মল্লিকা, 'জানবেন কি করে? পুরনো বন্ধুদের কাউকে বলা হয়নি।'

কথাটা শুনেই হয়তো চুপ করে যাওয়াটা উচিত ছিল অতনুর। কিন্তু করেনি। তারপরও জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

'দাদার মত ছিলনা।'

'মত ছিলনা!' খুব অস্পষ্ট গলায়, অতি ধীরে কথাটা উচ্চারণ করেছিল অতনু। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল মুখে একবিন্দু রক্ত নেই, ভেতরটা কাঁপছে, গলায় কি যেন আটকে গেছে।

এরপর আরও কিছুক্ষণ ঘরের ভেতর ছিল অতনু, কিন্তু সে কেবল অস্বস্তি অস্থিরতা আর আত্মযন্ত্রণার হাতে জব্দ হবার জন্যে। কথাবার্তা বিশেষ হয়নি। যেটুকু হয়েছে তার ভাষা যত আটপৌরে, একেবারে ব্যঞ্জনাহীন। অথচ অতনু আকণ্ঠ তৃষ্ণায় উদগ্রীব ছিল যে মল্লিকা হয়তো এমন কথা বলবে যার ভেতর অতীতের গন্ধ আছে, রঙ আছে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল এখুনি হয়তো বর্তমানের খোলস খুলেফেলে অতীতের মল্লিকা বেরিয়ে আসবে।

অথচ সেই নিরালা ঘরে তার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতীতের রঙে হুবহু দশবছর আগেকার সেই মেয়েটি হয়ে উঠতে পারত নাকি? সেই মেয়েটি, থাকে দশবছর আগের এক চৈত্রসন্ধ্যায় কনকচাঁপার তলায় হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছিল? অন্তত হাসিতে উজ্জ্বল, খুশীতে উজ্জ্বল আর এলোমেলো কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারতনা?

বলতে পারতেনা, 'উঃ, কতদিন পরে আবার আমাদের দেখা, তাইনা অতনুদা?'

বলতে পারতনা, 'দশবছর আগেকার সেই দিনগুলোর কথা তোমার মনে পড়ে অতনুদা? আমার কিন্তু সব মনে আছে। একেবারে অমরমাই আদর ছিল। আর আপনি যা হাসির গল্প বলতে পারতেন: উঃ, ভাবলেও কেমন লাগে এখন। কি ছেলেমানুষই না ছিলাম আমরা!' না, এসব কথার ধারকাছ দিয়েও যায়নি মল্লিকা।

অতনু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। মনে পড়েছিল সেই ঘটনাটা দশবছর আগে কনকচাঁপার তলায় আধো অন্ধকারে খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে এক ভাবাবেগে উদ্বেল সপ্তপদী বলেছিল, 'আমিও চাই আপনি বড় হোন।' সেটা কি নিতান্তই একটা অপরিণত মেয়ের ক্ষণস্থায়ী আবেগ; তার পেছনে কোন সত্য ছিলনা? যদি সত্যি থাকবে তাহলে মল্লিকা কেন একবারও বললনা, 'এখনও লিখছেন তো অতনুদা? আপনার লেখা একখানা বই কিন্তু আমাকে প্রেজেন্ট করতেই হবে। দেখাসাক্ষাৎ তো হবার সম্ভাবনাই নেই আর। বইখানা পড়তে পড়তে শুধু আপনার কথা মনে পড়বে।'

না, এমন কথা বলেনি মল্লিকা এগুলো তার মনের মধ্যে রচিত এক মল্লিকার কথা। যা বাস্তবের মল্লিকা বললেও বলতে পারত। কিন্তু বলেনি। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বারবার মাথা নেড়ে অতনু নিজেকেই নিজে বলেছে—না, অতীতের সব রঙই এরা লোপ করে দিয়েছে, চিহ্নটুকুমাত্রও অবশিষ্ট নেই কোথাও।

হেলোমশাইয়ের কথাই কি কম হতবাক করেছে তাকে?

বোধহয় অতনু আসার জন্যেই নতুন করে চায়ের টেবিল পাতা হয়েছিল। অবশ্য চায়ের বেলাও অধরদা উঠবে যায়নি। ঘরের মধ্যে বসিয়া ছিলেন, ছিলেন, হেলোমশাই। মল্লিকা এবং মাধবীও ছিল।

একথা সেকথার পর মেসোমশাই শুধোলেন, 'কি করছ এখন ?'

'যা করছিলাম।' সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল অতনু।

'মানে স্কুলের চাকরী।' একটু অবজ্ঞার আভাসই যেন ছিল মেসোমশাইয়ের গলায়, 'শিক্ষকতা। শব্দটা বেশ গালভারী, বুঝলে অতনু। জাতির মেরুদণ্ড, মানুষ গড়ার কারিগর—এসব কেতাবী বুলিও অনেকের মুখে শুনে থাকি আজকাল। কিন্তু আমি তো জানি সমাজে শিক্ষকদের জায়গাটা কোথায়। দেখ, এই হল একটা চাকরী যাতে পেটও ভরেনা, মর্যাদাও থাকেনা। আমি তো সারাজীবন ধরে স্কুলের মাস্তরই শুনে এলাম। এ চাকরীর ভবিষ্যৎ কোথায় বল ?' একটু থেমে কি যেন মনে পড়ে গেছে এমনি ভঙ্গীতে বলেছিলেন, 'বিয়ে থা করেছ নাকি ?'

'না।'

'একরকম ভালই করেছ। আজকের যুগে স্কুলে ছেলে পড়িয়ে দুজন মানুষের সুখেস্বচ্ছন্দে বাঁচা চলেনা।'

আশ্চর্য আয়াসহীন ভঙ্গীতে কথাগুলো বলছিলেন মেসোমশাই। মেসোমশাই সারাজীবন স্কুলের চাকরীই করেছেন না ? নিজেকেই প্রশ্নটা শুধিয়েছিল অতনু। এ প্রশ্নের উত্তর এবং তার পিঠোপিঠি অনেক কথাই তার জানা। কিন্তু সে ইচ্ছে করেই সেগুলোকে ভাবার চেষ্টা করেনি ভেবে কি লাভ ?

'তোমার এখনও বয়স আছে বলেই বলছি অতনু, অন্য চাকরী বাকরীর চেষ্টা কর।'

'কোথায় পাব ? তাছাড়া নতুন করে চাকরী পাবার বয়স তো আর নেই।' ধীরে ধীরে বলেছিল অতনু।

'তা বটে।' গম্ভীরভাবে মাথা নেড়েছিলেন মেসোমশাই, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'লিখছ টিখছ আজকাল ?'

প্রশ্নটাতে বেশ বিদ্রূপ বোধ করেছিল অতনু। যেটা তার ক্ষতস্থান সেখানেই যেন খোঁচা মেরে দিয়েছেন মেসোমশাই। তার লেখক হওয়ার স্বপ্ন সে তেমন সত্যি হয়ে ওঠেনি, লেখা যে প্রায় ছেড়েই সে দিয়েছে আজকাল, এ ব্যাপারগুলো লুকিয়ে রাখতে পারলেই সে খুশী। এ নিয়ে তার আত্মযন্ত্রনা বড় কম নয়। কিন্তু না জেনে মেসোমশাই সেই পুরনো যন্ত্রনাটাকে হঠাৎ জাগিয়ে দিয়েছেন। টেবিলের তিনধারে মেয়ে মাসিমা, মল্লিকা আর মাধবী। অতনুর মনে হয়েছিল তার উত্তরের প্রত্যাশায় সকলেই তার মুখের দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে।

না, কিছুতেই সে মিথ্যে বলতে পারেনি। বলতে পারেনি লিখে নাম হয়েছে তার, প্রকাশকরা তার বই প্রকাশ করবার জন্য উদগ্রীব। এসব ছিল তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন, কিন্তু ভবিষ্যৎ একসময় অতীতের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলল, কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হলনা। নিজের লেখকজীবন নিয়ে একটা ফাঁপানো গালভরা গল্পফেঁদে বসতে পারলেই হয়তো উদ্ধত অহঙ্কারী মানুষগুলোকে মুখের মতো জবাব দেওয়া হত, সে ইচ্ছেও ক্ষণেকের জন্যে দুর্বার হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মিথ্যে বলে নিজেকে খাটো করতে কিছুতেই তার মন চায়নি।

'লিখি অল্প-স্বল্প।' শুকনো গলায় উত্তর দিয়েছিল সে।

'প্রকাশক-টকাশক পেলে ?'

'না। তরুণ লেখকদের বই ছাপাতে প্রকাশকরা তেমন উৎসাহী নয়।'

মেসোমশাই এক মুহূর্ত চুপ করেছিলেন, তারপর ঈষৎ অবহেলার সঙ্গেই বলে উঠেছিলেন, 'তুমি

অশোকের একালের বন্ধু। তাই বলছি কথাটা, কিছু মনে কোরোনা। লেখার ভূতটুত মাথা থেকে নামাও ওসব লিখেটিখে কিছু হবেনা।'

অতনুর বুকটা কেমন ছাঁৎ করে উঠেছিল, কিন্তু মুখে কোন ভাবান্তর প্রকাশ পায়নি। স্থির নিষ্পলক চোখে কিছু শোনার প্রত্যাশায় মেসোমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল সে।

'স্কুলের চাকরী তো করছই। ছেলেদের পড়ার বই কিছু লেখনা। জুৎসই একটা লিখে ফেলতে পারলে ভালই পয়সাকড়ি আসবে। এই আমার কথাই ধরনা। রিটায়ার করে বসেছিলাম, ভাবলাম স্কুলপাঠ্য বই লিখিইনা এক আধখানা। সারাজীবন ধরেই তো দেখলাম এই করে কতজনে কত কিছু গুছিয়ে নিল। যেমনি ভাবা অমনি কাজ সুরু. তা ভাগ্য আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এই বাড়ীখানা দেখেই বোধহয় সেটা বুঝতে পারছ।' বলতে বলতে আত্মপ্রসাদের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল মেসোমশাইয়ের মুখ তারপর আগের কথার জের টেনে বলেছিলেন, 'তোমার লেখার যখন হাত আছে তখন ক্ষমতার বাজে খরচ না করে ছেলেদের বই-ই লেখনা। আমার মনে হয় বাংলা নোটবই লিখলে ভালই হবে তোমার, বুঝলে?'

বুঝেছে বৈকি অতনু, ভাল করেই বুঝেছে। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলার তার উৎসাহও ছিলনা, ইচ্ছেও না। শুধু দশবছর আগে এক আশাবাদী প্রৌঢ় লেখক হিসেবে তার সম্ভাবনা সম্পর্কে কতখানি আশাবাদী ছিলেন সেইকথাই সে ভেবেছিল বারবার। কানের কাছে বারবার একটি স্নেহকোমল স্বর গুঞ্জন করে ফিরেছিল, 'ডেরী ব্রাইট অ্যাণ্ড প্রমিসিং বয়। দেখে নিও তোমরা, একদিন সাইন করবেই।' তিনি আর আজকের এই মানুষটি কি একই? কেমন করে মানুষ এমন পাল্টে যায়?

চায়ের টেবিলে যা কিছু কথাবার্তা সবই মেসোমশাইয়ের সঙ্গে। মাসিমার বলার কথা সবই বোধহয় ফুরিয়ে গিয়েছিল, তিনি নীরব, মল্লিকা নিজের মনে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল, কোন কথায় তার কান ছিল মনে হচ্ছিল না। মাধবী কখনও তাকাচ্ছিল বাবার দিকে কখনও অতনুর। কিন্তু কোন মন্তব্য করতে তাকে শোনা যায়নি। তার মুখের ওপর একটা গাঢ় গাম্ভীর্যের ছায়া দেখেছিল কিন্তু তা দেখে তার মনের ভেতর কোন ভাবনা তরঙ্গিত হচ্ছে তা বোঝা সম্ভব ছিলনা।

সবচেয়ে অবাক-করা ঘটনাটা ঘটল আরো কিছু পরে।

অশোকদের বাড়ী থেকে বাস-রাস্তা বেশ কিছুটা পথ। মিনিট চারেক হাঁটলে তবে রাজপথ, ওখান থেকে বিদায় নিয়ে গলিটা ধরে হাঁটছিল অতনু, কিছুটা অন্যমনস্ক সে, বুকের মধ্যে যেন একটা গভীর মহরাজনিত বিষাদের আচ্ছন্নতায় সে আবিষ্ট। এইমাত্র দেখে আসা একটি বাড়ী এবং কতকগুলো মানুষের কথাই সে ভাবছিল নিশ্চয়। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু ভাবতে পারছিল না। সব ভাবনা ছাড়িয়ে একটা গাঢ় বিষাদ তার চৈতন্যের আপাদ মস্তক আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল।

হঠাৎ মনে হল কে যেন ডাকছে পেছন থেকে খুব পরিচিত স্বরে।

'অতনুদা।'

কে ডাকে। খানিকটা অনিশ্চয়তা নিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল অতনু।

'সেই কখন থেকে ডাকছি। শুনতে পাননি?'

উত্তর দেবে কি, অতনু বিস্ময়ে তখন পাথর।

মাধবী অল্পস্বল্প হাঁপাচ্ছিল। বেচারা,বোধহয় অনেকখানি রাস্তা জোরে পা চালিয়ে আসছে।

'তুমি!' চেষ্টা করেও বিস্ময় চেপে রাখতে পারেনি অতনু।

'হ্যাঁ, আমি। সন্দেহ আছে নাকি? ওকি, অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? মনে হচ্ছে আমাকে যেন কখনও দেখেন নি। চলুন, বড় রাস্তা পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'যাবে? চল।'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাধবী বলে, 'আপনি খুব রাগ করেছেন, না?'

'রাগ! না তো।'

'রাগ না করুন অবাক হয়ে তো গেছেন?'

'তা একটু হয়েছি বৈকি। কিন্তু অবাক হয়েই বা লাভ কি? পরিবর্তন আসাই তো স্বাভাবিক। মানুষ পাল্টায়, এ তো জানা কথা।'

'স্বাভাবিক! একদম না।' মাধবী সজোরে মাথা ঝাঁকায়, 'পাল্টে যাবার মতো কি-ই বা ঘটেছে? অবস্থা না হয় একটু বদলেছে, তার জন্যে মনের দিক থেকে বদলে যাবার কি আছে? এতদিন টাকা পয়সায় ছিল গরীব, এবার ওরা মনের দিক থেকেও গরীব হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে সেইজন্যে ওদের একটুও বনে না।' একটু নীরব থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'আজ ওদের ব্যবহার আমার খুব খারাপ লেগেছে, খুব খারাপ। সব চেয়ে খারাপ লেগেছে দিদির ব্যবহার। আজ আর গোপন করে লাভ কি! আপনি হয়তো জানেন না, আমি জানি—এক সময় আপনার ওপর ওর একরকম টান ছিল। এখানে আসার পর ও প্রায়ই আপনার কথা বলত। আগে তো আপনি আমাদের বাড়ী আসতেন, এলে ও কত খুশী হয়ে উঠত। অথচ আশ্চর্য! আজ ওর ব্যবহার আমাকে রীতিমতো অবাক করেছে।'

'তোমার মনটা এখনও খুব নরম আছে দেখছি মাধবী। একেবারেই ও বাড়ীর মনগুলোর মতো না।' বলতে বলতে অতনুর ঘনীভূত বিষণ্ণে যেন লঘু হয়ে আসছিল।

'যাবার কথাও খুব মিষ্টি লেগেছে আমার। মানুষ যখন নিজেকেই ঘৃণা করতে সুরু করে তখনই ও ধরণের কথা বলতে পারে। বাবা আর আগেকার মানুষটি নেই। আমি হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতাম। হয় কড়ায় গণ্ডায় পাওনা মিটিয়ে দিতাম, নয় উঠে পালিয়ে আসতাম এক মুহূর্ত দেরী না করে।'

'কিন্তু সেটা কি ভাল হত?'

'হয়তো হত না। কিন্তু আমি যা ভালবাসি তার অপমান কিছুতেই সইতাম না। সে রকম কিছু না করে আপনি অবশ্য ভালই করেছেন। ঘৃণার প্রতিবাদ সবসময় ঘৃণা দিয়ে হয় না। তবু আমার দুঃখ রয়ে গেল যে আমাদের বাড়ী থেকে আপনাকে বাধা নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

'কে বললে বাধা নিয়ে যাচ্ছি! শুধু দুঃখই তো মানুষের জন্যে থাকেনা। অন্তত এই সান্ত্বনাও তো নিয়ে যাচ্ছি যে ও বাড়ীতে তোমার মতো একটি মেয়ে আজো আছে। মল্লিকা না থাক, মাধবী তো রইল।'

'তাহলে কথা দিন, আবার আপনি আসবেন।'

'সে কি আর হয়?'

'কেন হবে না? আসতেই হবে আপনাকে। কথা দিন অন্তত মাধবীর জন্যে আবার আপনি আসবেন?'

'আসব।'

চলন্ত গাড়ীর একেবারে নিরিবিলি কোণে বসে মাধবীর বিষণ্ণ মুখের ছবি স্পষ্ট দেখতে পেল অতনু। তার কানের কাছে নিজেরই স্বর অলৌকিক ধ্বনির মতো বেজেবেজে উঠতে লাগল—আসব, আসব, আসব।

কিন্তু আসব বললেই কি আসা যায়? পারাপারের সেতু কোথায়? মাধবীর স্বর, মুখের অভিব্যক্তি বলে দিয়েছে—সে সেতু মাধবী। কিন্তু মাধবী কি সেতু হতে পারে? অতনু মাথা নাড়ল—না, না, না।

বাড়ী পৌঁছতে দুপুর পেরিয়ে গেল। শরীর ধূলিধূসর, দেহের রক্তেরক্তে অবসাদ, মাথা জ্বলছে। স্নানের দরকার সর্বাগ্রে। এক গাদা শীতল জলে পোড়া শরীরটাকে অনেকক্ষণ ধরে ভিজিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু অতনু বিশ্রামের জন্যে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল না, স্নানেও গেল না। ঘর্মাক্ত অবসন্ন বস্ত্র শরীরটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর একটার পর একটা পোর্টম্যাণ্টো সুটকেশ খুলে আতিপাতি করে কি যেন খুঁজতে লাগল, লেখার খাতা, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ের নোট, চিঠি এবং আরো অজস্রবিধ টুকরো খাতা আর কাগজে মেঝের তলানি জমে উঠল। দশ বছরের বিস্মৃতি জমে উঠেছে, সুতরাং পাওয়া কি সহজ?

অবশেষে প্রার্থিত বস্তু মিলল।

একটা মোটা সোটা ডায়েরী বই। মলাটটা ছিঁড়ে গেছে একবারে, পাতাগুলোর ওপর সময়ের জোতের দাগ; লালচে বিবর্ণ। খুঁজতে খুঁজতে ঠিক জায়গাতেই দৃষ্টি পৌঁছে গেল।

পাতার এককোণে দশ বছর আগেকার একটি তারিখ। সাত সমুদ্র কালিতে এক জায়গায় লেখা—আজ বাইশে চৈত্র মল্লিকারা চলে গেল।

সুদূর দিনের স্মৃতির সকারে অতনু কি একবার চৈত্র হাওয়ার মতো কেঁপে উঠল? বারেকের জন্যে ভিজে আসতে চাইল তার চোখের পাতা? একটি সেতুর প্রার্থনায় কি আকুল হয়ে উঠল তার মন?

কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে সবুজ কালির স্মৃতি চিত্রিত কাগজখানা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে, দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে জানলার বাইরে ছুঁড়ে দিল অতনু।

• • • •

"তোমার দ্বারা নাচ চলবে না,"—মোটা সিগারটা দাঁতে চেপে ধরে বললেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের ম্যানেজার এক তরুণী নৃত্যশিল্পীকে।

—কারণটা কি জানতে পারি?—বিনীতভাবে বললেন তরুণী।

—কারণটা হচ্ছে, তোমার পা আড়ষ্ট,—ব্যালে নাচে ওটা একেবারেই অচল।

অবশ্য তোমাকে হতাশ করতে চাই না,—তুমি একমাস পরে আমার কাছে এসো।

ঠিক একমাস পরে তরুণী এলেন ম্যানেজারের কাছে, নাচও দেখালেন।

এবার ম্যানেজারের মুখ গম্ভীর হোল। তিনি বললেন: আরও একমাস পরে এসো।

আরও একমাস পরে তরুণীর নাচ দেখে ম্যানেজার বললেন: আরও একমাস পরে!

এবার কিন্তু নাচ দেখে তিনি হাসিমুখে বললেন আর্ট থিয়েটারের লোকজন তরল করতে হবে, নইলে সামলাবে কে?

মানে?—বিস্মিত হইয়েই তরুণী প্রশ্ন করলেন। ম্যানেজার হেসে বললেন: মানেটা খুবই পরিষ্কার আমার প্যাকলতা,—সারা ইউরোপ ছুটে আসবে কিন্তু।

দুর্ঘটনার আলোয়

বিজনকুমার ঘোষ

বেলা দশটা। যাকে বলে পিক আওয়ার।

চাকুরিয়া স্টেশন সরগরম। আমরা কয়জন যাচ্ছি সবাই অফিস যাত্রী। আমরা, অর্থাৎ আমি, সুদেব, সুজিৎ, অরবিন্দ আর শেখর। শেখর গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্র। সুদেব কবি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে এম. এ. পড়েছে। অরবিন্দের এবার এম. এ. দেবার কথা ছিল ইকনমিক্সে। কিন্তু কাই ক্লাস পাবার আশায় ডুপ দিয়েছে। সুজিৎ ভাল নম্বর পেয়ে কিজিক্সে এম. এস. সি. পড়ছে কলকাতায়। আমি ফুল টাইম বেকার। ফলে শিল্প সাহিত্য রাজনীতি অর্থনীতি—সব বিষয়ে দুঃসাহসিক মতামত প্রকাশ করে থাকি। আগে আগে ওরা অবাক হত সে সব শুনে। এখন হয় না। অভ্যাস হয়ে গেছে।

চাকুরিয়া স্টেশনে মেজদার চায়ের দোকান বহু পুরোনো। মেজদার মুখেই শুনি সাউথ সেকশনের লাইন খোলা হলে মেজদার ঠাকুরদাদা প্রথম চাকুরিয়া স্টেশনে চায়ের দোকানের ইজারা নিয়েছিলেন। সে কতকাল আগেকার কথা। চাকুরিয়া বলতে এই স্টেশন আর খান কয়েক বাড়ি মাত্র বোধহয়। রাস্তায় আলো দেবার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। ফলে সন্ধে হলেই অন্ধকার ঘট ঘট করত পথে ঘাটে। গা' ছমছম করত এই অন্ধকার ভেঙে কলকাতা শহরে গিয়ে দোকানের মালপত্র আনতে। সে একদিন গিয়েছে বটে। আর আজ? সাউথ সেকশনে রানিগঞ্জের পরেই বুঝি চাকুরিয়ার স্থান। দিনে রাতে চল্লিশের খানা গাড়ি আপ ডাউনে চলাচল করে। এখন এক কাঠা জমির দরই দু'হাজার টাকা। আর যারা চাকুরিয়ার লোক তো বটেই, ড্রাইভার গার্ডসাহেব পর্যন্ত ট্রেনটাকে মিনিট খানেক দাঁড় করিয়েও মেজদার দোকানে চা নিতে ছুটে আসে। তাছাড়া আড্ডা দেবার পক্ষেও সবচেয়ে সুবিধে। বেল কোম্পানির পাখা দিবারাত্র মাথার ওপরে ঘুরছে। নিচে লম্বা লম্বা বেঞ্চ। এক কাপ চা নিয়ে সারাদিন বসে থাকলেও মেজদার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠবে না। এই সব কারণে মেজদার চায়ের দোকানকেই আমরা আড্ডা দেবার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম।

সেদিন পিক আওয়ার, অর্থাৎ বেলা দশটায় আমরা যখন সবে জমিয়ে বসেছি এমন সময় সেই কাণ্ডটা ঘটল। দেখি সবার চোখে মুখে একটা পরম কৌতূহল খেলা করে করে বেড়াচ্ছে। একটু আগে ক্যানিং লোকাল চলে গেছে শিয়ালদার দিকে। স্টেশন এখন অনেক ফাঁকা। তবু জনা পঞ্চাশেক লোক ইতস্তত বিচরণশীল। কিন্তু প্রত্যেকেই দেখি লাইন পেরিয়ে ওপারে যাবার চেষ্টা করছে। ওপারের প্ল্যাটফর্মে ততক্ষণে একটা গোলাকৃতি ভিড় তৈরী হয়েছে; কলকাতা শহরে এই ধরণের ভিড়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত। সেখানে একটা ভাঙ্গা টিন বাজালেও পাঁচশো লোক দাঁড়িয়ে যায়। আমরা তাই প্রথমে

গা লাগাইনি। কেননা, চাকুরিয়া স্টেশনে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর এমনি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এখানে একটু স্বতন্ত্র ব্যাপার ঘটল। প্ল্যাটফর্মে যত লোক ছিল সব তো ওদিকে চলে গেলই, এমন কি বিপুল দেহ নিয়ে যখন স্টেশন মাস্টারও লাইন পেরিয়ে ওপারে পৌঁছলেন, তখন আমাদের আড়াআড়ি ভাবটাই হল। গিয়ে দেখি প্ল্যাটফর্মের ওপাশে একটি কচি ফুট ফুটে ছেলে। খুব বেশী হলেও দিন তিনেক বয়েস। কুতকুতে চোখ মেলে করে নীল আকাশ দেখছে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভিড় নামক এক অদ্ভুত জন্তুকেও লক্ষ্য করছে। কার্বিডল বাঘের মত ভিড়ের অসংখ্য মুখ থেকে বিচিত্র ধ্বনি উঠছে—'আহা বেচারা', 'ওর মা কই গো', 'দুধের শিশু', 'ওর মা পালিয়েছে', 'পাষণ্ড', 'পুলিশ'—ইত্যাদি। আমরা হতবাক। একটি তিন দিনের শিশুকে নিয়ে কি করা যায়—আমরা ভেবেই পেলাম না। স্টেশনে অনেক বয়স্ক ভদ্রলোক ছিলেন। স্টেশন মাস্টার, টিকট বাবু। বললেন, 'আজকাল প্রায়ই এরকম ঘটেছে। এখানে সেখানে ছেলেমেয়ে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। পুলিশে খবর দেওয়া দরকার'। আরেকজন বললেন, 'খবর দেওয়া হয়েছে। ওই যে—এসেও গেছে'। তাকিয়ে দেখি, একজন সাব-ইন্সপেক্টর, দু'জন সেপাই। ভিড়টা এবার বেশ জমজমাট হল। প্রত্যেকেই ঠেলে গুঁতিয়ে নবজাতকের কাছে পৌঁছতে চাইছে। নবজাতক কিন্তু নির্বিকার। ওর মা যে এই মাত্র পথরের প্ল্যাটফর্মে ফেলে কাদিং দোকানে চড়ে কোথায় মিশে গেল—সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক। বাচ্চাটার হীরের মত টলটলে চোখ দেখে ভিড়ের বরফ-মন গলতে শুরু করল। তারক সুধের গম্ভীর হয়ে বলল, 'কে বলতে পারে এই ছেলেই একদিন রবি ঠাকুর হবে না?' সঙ্গে সঙ্গে হীরক নিজের কোলে ঝোল টানল,' কিম্বা নজরুল বসুও হতে পারে।' কিন্তু দু'জনকেই থামিয়ে দিল আমেদের দু'দে অর্থনীতিবিদ অরবিন্দ। তাঁর সুচিন্তিত অভিমতে প্রকাশ পেল : একটা দেশের অর্থনীতি যখন ধসে পড়ে তখন এই ধরণের উৎপাত দেখা দেয়।' কিন্তু এসব তো গেল একটু আলাদা ধরণের কথাবার্তা। এবার আরেক ধরণের কথাবার্তাও সমুদ্রের ঢেউ-এ মোচার খোলার মতন ভিড়ের শরীর জুড়ে পাক খেতে লাগল। নানান সরস মন্তব্যের তীর উতল আকাশে—যেন পলাতক মাকে ধরে বেঁধে আনতে। তাছাড়া বাচ্চাটির মুখের আদলের সঙ্গে কারও মিল থাকতে পারে—এই ভেবে জোড়া জোড়া চোখগুলি কৌতূহলে শান দিয়ে পরস্পরকে সন্দেহ করতে লাগল। সেই সঙ্গে চাপা হাসির ফোয়ারা।

পুলিশ এসে গেছে। সুতরাং জমাট বাঁধা ভিড়টা এবার নিশ্চিন্ত। পুলিশের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ নির্বিঘ্নে চিত্তে লক্ষ্য করাই যেন একমাত্র কাজ। কিন্তু এই সময় হঠাৎ একটি কাণ্ড ঘটে গেল। আমরা ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব। স্টেশনে এক পাগলী বাস করছিল গত পাঁচ বছর ধরে। স্টেশনের পাশে মেসকোম্পানির কিছু উদ্বৃত্ত মাল মজুত ছিল। সেখানে সিমেন্টের এক মস্ত বড় পাইপের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল সেই পাগলী। কিছু ময়লা ছেঁড়া কাপড় আর কতগুলি খালি টিন নিয়ে সংসার। পাগলী সবাইকে কেষ্ট ভাবত। আমাকে একদিন বলেছিল, 'তুই আমার কেষ্ট'। হীরককেও একদিন বলেছিল। এই তো সেদিন, ফার্স্ট ক্লাস কামরার এক মেমসাহেব তার বাচ্চাকে নিয়ে বসেছিল। পাগলী হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেই কামরায় উঠে লাফালাফি শুরু করে ; 'ছেলে খাকী আমার কেষ্টরে নিয়া গেল, ধর ধর—ও রেলের বাবু, আমার কেষ্টরে ফিরাইয়া দাও—'। মেমসাহেব অবাক। রেলের বাবুরা ওকে টেনে নামাতে পারে না—এমনি অবস্থা। আমরা হাসাহাসি করি ; পাগলীর পাগলামীর স্ট্যাণ্ডার্ড বেড়েছে যাহোক। আমাদের ছেড়ে এখন মেমসাহেবের ছেলেকেই কেষ্ট ঠাওরেছে। ওর একমাত্র ছেলে কেষ্ট পঞ্চাশ সনে পাকিস্তানের

হাজার মারা যায়। তারপর ছাওলার মত যখন উদ্বাস্তুর দল ভাসতে ভাসতে এদিকে চলে আসে তখন পাগলীও ওদের সঙ্গে মিশে যায়? তারপর থেকে ঢাকুরিয়া স্টেশনে সবাইকে কেউ ভাবা এবং সেই ভাবার মধ্য দিয়ে কেইকে বাঁচিয়ে রাখাই ওর একমাত্র পাগলামী হয়ে দাঁড়ায়। সেই পাগলী কোথা থেকে বড়ের মত ভিড়টাকে কাটিয়ে নবজাতকের উপর কাঁপিয়ে পড়ল, 'আমার কেই—এ্যাদ্দিন পর আমার কেই আইছে—'

ভিড়টা এতক্ষণ সমাজ, অর্থনীতি, পলাতক পিতামাতার সন্তান, নবজাতকের ভবিষ্যৎ ইত্যাদির দুরূহ চিন্তায় ঝেমে উঠেছিল। এইবার যেন জিনের গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগল; হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই এবং কৌতুকে চিক চিক করে উঠল চোখগুলি। 'পাগলী খেপেছে'; 'আর ওকে রাখা যাবে না'; 'এইবার ছেলেটা মরবে'। পুলিশের দলটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কাছে এগুতেই দিচ্ছে না! ওদের ওটুকু ছিল প্রকৃত মা খুঁজে বের করা। কোন মূল রেখে গেছে কিনা, আশেপাশে খোঁজ করা—ইত্যাদি। না পেলে বাচ্চাটিকে নিয়ে সরকারী অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে দেওয়া। কিন্তু পাগলীর কাণ্ড দেখে পুলিশ দলও মজা পেয়ে গেছে। 'তোরা সর, তোগো হাতে আমার কেইরে কিছুতেই দিমু না। তোরা একবার আমার কেইরে খাইছস, বার বার খাইতে দিমু না। তোরা মুখপোড়া, তোরা—।' পাড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, বললেন, 'ওকেই ছেলেটাকে দিয়ে দিন। পাগলী হলেও মা তো। দেখবেন ঠিক মানুষ করে তুলবে। সরকারী আশ্রমে অতটুকু শিশুকে বাঁচানো শক্ত। তাছাড়া আমরা তো রয়েছি—' পুলিশদল দেখলাম বেজায় খুশি হল এ কথায়। ওরাও বাজে ঝামেলা পোয়াতে চায় না। উপস্থিত প্রত্যেকেই মা-ছেলের চিরন্তন সম্পর্কে অভিভূত হয়ে সায় দিলেন এ কথায়। প্রত্যেকেই আশ্বাস দিলেন, 'আমরা রয়েছি।' অভিজ্ঞ স্টেশন মাস্টার বললেন, ছেলে হারিয়ে পাগল হয়েছে, দেখবেন এবার ছেলে পেয়ে ঠিক হয়ে যাবে। আর মেমসাহেবের ছেলে নিয়ে টানাটানি করবে না।'

—'ব্যাপারটা খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের মত হল নাকি?'

—'হোক, ক্ষতি নেই। ওর এখন একটা ছেলে দরকার। তা হলেই সুস্থ হয়ে উঠবে।'

এরপর পুলিশদল বহুমূল্য জীবন, রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং সর্বোপরি জনসাধারণের সহযোগিতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিল। পরবর্তী আপ এবং ডাউন ট্রেন এসে পড়াতে ভিড় এবার অনেকটা পাতলা হল। পাগলীও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সত্যিই ও ক্ষেপে উঠেছিল। যেন আমরা প্রত্যেকেই ওর কেইকে কেড়ে নেবার জন্যে ভিড় করেছি। ওর চোখের তারা অস্বাভাবিক ঘুরছিল। যেন কেইকে একবার হারানো যায়, বার বার হারানো যায় না। ভিড় পাতলা হতেই পাগলী সেই পার্মেন্ট মাতৃত্ব রূপ ধারণ করে বাচ্চাটাকে দুধ দিতে লাগল! দৃশ্যটা আমরা উপভোগ করলাম। তবে দীপঙ্কর আর সুদেবের চোখ দুটো যেন গভীর হয়ে উঠল অনুরাগে আর মমতায়। ভাবলাম, দেখুক ওরা। ওরা শিল্পী।···অবাক কাণ্ড! বাচ্চাটাও নীল আকাশ ভুলে গিয়ে চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে। যেন এবার পাগলীর বুকের মধ্যেই নীল আকাশ দেখছে। পাগলী! আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে সংশোধন করে নিলাম—মা! কেইর মা!

শিল্পীর চোখ সর্বদা সাধারণের মধ্যে অসাধারণ খুঁজে বেড়ায়। সুতরাং প্রতিপদে তাদের সঙ্গে আমাদের দেখার পার্থক্য ঘটবেই। সেই যে গভীর হয়ে মাতৃত্ব রূপ দর্শন করেছিল দীপঙ্কর আর আর সুদেব কিছুদিনের মধ্যেই তার ফলশ্রুতি দেখা দিল। প্রত্যেকবার শীতের সময় গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ছাত্রদের

বাৎসরিক প্রদর্শনী হয়ে থাকে। তাতে দীপঙ্করের আঁকা একটি ছবিই প্রথম পুরস্কারের সম্মান লাভ করল। পুরস্কার বিতরণ করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। দৈনিক কাগজে দীপঙ্করের ছবির প্রশংসা বেরুল। আমরাও দেখেছি। মা ছেলেকে দুধ দিচ্ছে। ছবির বিষয় বস্তু যদিও পুরোন তবু স্বীকার করতেই হয়, প্রকাশভঙ্গী একেবারে নতুন। মা যে উন্মাদ, তা চোখের শূন্যদৃষ্টি এবং দেহের প্রতি রোম কূপের অস্বাভাবিকতায় সুস্পষ্ট। তবু শূন্যদৃষ্টি এবং রোম কূপের অস্বাভাবিকতা ছাপিয়ে উবলে উঠেছে মাতৃত্বের কান্তিধারা। ভারী সুন্দর ছবিটা। দেখলে মনে আশা জাগে।

সুদেব সেবার যেমি একটা আশাবাদী কবিতা লিখেছিল। কবিতাটি একটি বিখ্যাত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বানকয়েক চিঠিও বুঝি পেয়েছিল। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সর্বোপরি ভাবের গভীরতায় কবিতাটি সত্যিই অনবদ্য ছিল। বর্তমান পৃথিবীতে আমরা সবাই যেন উন্মাদ। কেউ সুস্থ নই। তবু এই দুঃসহ দিনে নতুন শিশুর জন্মের ভিতর দিয়ে, নতুন শিশুকে ভালবাসার মন্ত্র দিয়ে আমরা বহুমূল্য সুস্থতা ফিরে পাব। জীবনের মানে অসুস্থতা হতে পারে না। তা সাময়িক। পাথরের গ্রাটকর্মে ফুলের ফসলের গান আলোড়িত হবে – ইত্যাদি।

সময় যে নদীর স্রোতের মতন তা সুন্দরভাবে বোঝা যায় চাকুরিয়া স্টেশনে দু'দণ্ড দাঁড়ালে। কেননা, এখান থেকেই বহু পুরোনো মুখ অজানা স্টেশনের পানে যাত্রা করেছে। তার বদলে অন্য ট্রেনে বহু নতুন মুখের আমদানী ঘটেছে এখানে। যে সমস্ত মুখগুলি প্রত্যহ নতুন প্রেমের তাড়নায় উজ্জ্বল হত, তা এখন লোলচর্মে আচ্ছন্ন। আমারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আগে আমি ছিলাম ফুলটাইম বেকার। এখন একটি দৈনিক পত্রিকায় যাত্ত পার্ট টাইমার রিপোর্টার। চাকুরিয়ারও এখন সেদিন নেই। অনায়াসে শ্যামবাজারের যে কোন গিন্নি গলিকে হার মানাতে পারে। মেজদার দোকানটি ঠিক আছে। তবে মেজদার শরীরে কিছু মহাকালের চিহ্ন দৃশ্যমান। আমাদের ভাবুক কবি সুদেব একদা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল গ্রাটকর্মে পরিত্যক্ত শিশুটি নাকি কালে রবি ঠাকুরও হতে পারে। ওকে থামিয়ে দিয়েছিল দীপঙ্কর : নক্ষলাল বসু হতেই বা বাধা কোথায়? শিল্পের মতা পাবিদে নাকি এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এই সব মূল্যবান ভবিষ্যদ্বাণীকে কলা দেখিয়ে কেষ্ট বর্তমানে চোর হয়েছে। রেল কোম্পানির ওপরেই কেষ্টর অহরাগ প্রবল। সাউথ সেকসনের যে কোন ট্রেনে চড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শত অসুবিধাতেও কীণ আলোয় রেখা মিলবে না কিম্বা ভ্যাপসা গরমের ভিতে পাখার বাতাস। এ সমস্তের মূলে কেষ্টর অবদানই সর্বাধিক। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ে কেষ্টর প্রতিভা লক্ষনীয়। যেমন হিন্দী গানের চর্চায়, স্কুল-কলেজের মেয়েদের উত্যক্তে সিদ্ধ প্রদানে, অথবা চলমান ট্রেণের কোন জানলার প্যাসেঞ্জারকে বক দেখানোয়। আমরা সুদেব দীপাঙ্করকে কিছু বলি না আহা বেচারা! ওদের শিল্পীমন কঠ বাস্তবের সম্মুখে আহত হবে যাত্র। তবে কেষ্টর ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলাম ক্রমশ। পাইপের পাগলী বিগত দশ বছর ধরেই প্রায় শান্ত হয়েছে। বেশ বোঝা যায় প্রীমান কেষ্টই সেই শান্তির মূল উৎস। বাজার কুড়িয়ে, ভিক্ষে করে নিজে না খেয়ে কেষ্টমনকে খাওয়ায়। অক্ষিসে যেতে কতদিন দেখেছি বাড়ী ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। কেষ্টর পেছনে লাগলে আর কথা নেই। পারলে চিবিয়েই খেয়ে ফেলবে। ও যে পাগল তখনি সেটা মালুম হয়। সে দিন মেজদার দোকান থেকে একটা আস্ত পাউরুটি চুরি করাতে মেজদা একটু ভারী ওজনের থাপ্পড় মেরেছিল। ফলে পাগলী দাঁত কিড়মিড়ি করতে করতে বকেটের মেপে

ছুটে এসে একটা কাচের বয়ম-টয় ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে। সুবেরের কথা মনে পড়ে। ও লিখেছিল, নতুন শিশুকে ভালবাসার শুভ্র দিয়ে আমরা বহুমূল্য সুস্থতা ফিরে পাব। কিন্তু এ কি ভয়ংকর ভালবাসা! কবিতাটি ভালই হয়েছিল। তবে আমরা ভুলেও সুবেরকে সেই কবিতাটি কখা স্মরণ করাই না। বেচারা হয়ত নিজেই বুঝতে পারে। ...

আমরা আগের মত সময় পাই না আর। অদ্ভুত সময়ের ভারে ভর্জরিত হওয়া কাকে বলে ভুলেই গেছি। আমাদের দিনের পথে স্বাস্থ্যহী-অফিসের বড্ড কড়া নজর। তবে ছুটিছাটা আছে। অথবা কোন কোন রবিবারের সকালে পুরোন আড্ডার মেসার এখনো হেদোর দোকানে গিয়ে হাজির হই। সেই পুরোন কোনটিতে এক কাপ চা নিয়ে বসি। ডুবে যাই। রেলিং-এর বাইরে যেখানে পাইপগুলি অনন্তকাল ধরে পড়ে আছে, সেখানে পাগলীর ঘরসংসারের দিকে দৃষ্টি চলে যায় কখনো কখনো। মনে পড়ে দশ বছর আগের এক অনিদ্রুক মা তার সদ্যোজাত শিশুকে ফেলে রেখে পালিয়েছিল। অধুনা শান্ত কিন্তু দশ বছর আগে দুরন্ত টিচার জলে ওঠা এক মাকেও আমরা দেখতে পেয়ার: উপর্যুপরি কয়েক কাপ চা সিগারেট সহযোগে নিঃশেষিত হবার পর, এমনি পুরোন দিনের কিছু ছবি দেখার পর, আমাদের হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ে। আমরা গতানুগতিক ব্রত বাড়ি ফিরি।

সেদিন এই গতানুগতিকতা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। যেন চাকুরিয়ার শান্ত পুকুরে ঢিল পড়ল। আমরা জীবনে এত অবাক কখনো হইনি। পুলিশ কুকুরের সাফল্যমণ্ডিত কার্যকলাপ এতকাল খবরের কাগজেই শুধু পড়তাম। এবার সেই কুলীন কুকুর চাকুরিয়াতেই এল। শেষ রাতে কে বা কাহারা কেষ্টকে নৃশংস ভাবে খুন করে রেল লাইনের ধারে ফেলে গেছে। আমরা রক্তের নদীতে ভাসমান কেষ্টকে দেখে চোখ ঢাকলাম। এই সেই কেষ্ট! চাকুরিয়া স্টেশনের কালাপাহাড়। তবু মনটা কেমন করতে লাগল। আহা বেচারা! যে পরিবেশে ও মানুষ, সেখানে চোর-বাটপাড় ছাড়া আর বেশী কি হতে পারে। দুঃখ হয় পাগলীর জন্যে। বিয়ে হলেও কেষ্টকে নিয়ে ঘুলে ছিল। এইবার কেষ্টকে হারিয়ে দ্বিতীয় দফায় পাগল হবে।

লোকে লোকারণ্য। বহু দূর থেকে মানুষ এসেছে খুন দেখতে, কুকুরের কারিকুরি দেখতে। স্টেশন ছাপিয়ে অলিগলিতে আগ্যছার মত মানুষের জঙ্গল নেমে গেছে। আমরা অতিকষ্টে পাগলীর কাছে পৌঁছলাম। পাগলী পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন। চোখে একটুও জল নেই। যেন চোখের জলের সঙ্গে মাতৃত্ব বোধটাই শুকিয়ে গেছে। দুঃখ হয় বেচারা পাগলামী করবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। কাঠখোট্টাই বুদ্ধিমতি।

পুলিশ কুকুর দেখে নয়ন সার্থক করলাম। ঐ, ওদিকের পুলিশ অফিসারের মতই চেহারা। এত লোক দেখে একটুও ঘাবড়াল না। অনেকক্ষণ ধরে রক্তাক্ত কেষ্টর দেহটাকে শুকল। এদিক ওদিক লক্ষ্য করে, তারপর গম্ভীর হয়ে কি যেন চিন্তা করে। সাবাস কুকুর! মনে মনে বাহবা দিলাম। যে রকম ভাব, নিশ্চয়ই শুধু কোন গন্ধের সাহায্যে আসল হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে ফেলবে। কিছুক্ষণ পরে কুকুরটা দৌড়তে আরম্ভ করল লাইন ধরে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত পেছনে পেছনে। সেলিমপুর রোড ছাড়িয়ে পাশের বাজারের কাছাকাছি একটা জায়গা। শেষে একটা ডোবার ধারের নরম মাটি আঁচড়াতে থাকে। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বুকের অদ্ভুত শব্দ শুনতে শুনতে ব্যাপার লক্ষ্য করি। চোখের নিমিষে পুলিশের দল মাটি খুঁড়ে একটা ছোরা বের করে ফেলল। ছোরার গায়ে কালো রঙের রক্ত। আহা! হৃদয়গুলি জ্বলে উঠল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুলিশের দল দেখল। ঠিক ছোরা নয়। একটা লোহার পাতকে অনেক দিন ধরে পাথরে

মনে মনে ছোরার মত রূপ দেবার চেষ্টা। কুকুরটা যেন সুন্দর বনের বাঘ। কি রকম অস্বাভাবিক— চেহারে প্রাণে কি রকম ভয়ংকর ভয়ে উঠেছে। কুকুরটা ছোরার গন্ধ-ভালকরে শুকল, তারপর ঝিল রোড ধরে আবার টাকুরিয়ার দিকে ছুটতে লাগল। সেই থেকে ওটা আমাদের চকিত রাত্রির মত ঘোরাচ্ছে। আমাদের স্নায়ুগুলি দীর্ঘস্থায়ী উৎকণ্ঠায় শ্রান্ত, কিন্তু কৌতূহলের আকর্ষণ-এ চাঞ্চল্য রাখছি অনুভব। কেননা আমাদের জীবনে কোন রহস্যময়তা নেই। অফিসে একঘেয়ে বড়বাবু, পথে ঘাটে অতি পরিচিত জনতা। তবু আজকের সকালে ফেরার বিভৎস মৃত্যু, পুলিশ কুকুরের আবির্ভাব, রক্তমাখা ছোরা—রহস্য রোমাঞ্চ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কেউ কেউ দূরে বোমকেশ-পার্কে হোমসের পথে যাত্রা করেছিলাম।

হাঁফাচ্ছিলাম। কুকুরটা এক ছুটে ফের টাকুরিয়া স্টেশনে চলে এল। মেজদার দোকানের আশপাশ দিয়ে কি যেন খুঁজছে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। এক লাফে রেলিং পার হল। কিন্তু এ কি? চোখের পলকে পাগলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পুলিসরা তৎপর হয়েই ছিল। তারা চোখের জলহীন, পাথরের বুদ্ধমূর্তির পাগলীকে কালো গাড়িতে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘোর কিছু কিছে হলে মেজদার দোকানে চা খেতে খেতে আমার দশ বছর আগেকার দিনগুলিতে ফিরে যেতে কোন কষ্টই হল না। ভিড়-সওগোলের মধ্যেও সেই সব প্রাচীন স্মৃতিরা আমার বুকের ঘরো রাস্তিরের বানে পাওয়া নদীর মত ডাকতে শুরু করল। জানি, ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠবে। এখন থামানো প্রয়োজন। আমি আমার বিমর্ষ বন্ধুদের দিকে তাকালাম। হালকা আলাপের ভিতরে ব্যাপারটাকে গড়িয়ে দিলে কেমন হয়। হীপঙ্কর পাশে বসেছিল, ওকেই তাই পয়লা খোঁচাটা দিলাম, 'সেবার খুব তো ছবি এঁকে প্রাইজ পেয়েছিলে। আঁকো দেখি এবার পাগলীর একটা ছবি?'

হীপঙ্কর চমকে উঠল আমার কথায়। বোধ হয় ঠিক এই মুহূর্তে ওই কথাটাই ভাবছিল। আমি যে হঠাৎ তা জিজ্ঞাসা করে বসতে পারি, বেচারা বুঝতে পারেনি। একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'আমার ক্ষমতা নেই।'

—'কেন নেই? তুমি তো ভাল আঁক আজকাল—'

—'হ্যাঁ, তা এঁকেছি এতদিন। তবে কি জান, কোন্ গহীন অন্ধকারে ভালবাসা জন্মায়, কোন্ অন্ধকার থেকে আরেক ইচ্ছে এসে সেই ভালবাসাকে গলা টিপে মারে—এমন অন্ধকারের রূপ দি' তেমন রং তুলি আমার নেই। হয়ত ভবিষ্যতে কোন শিল্পী আসবে। ও ছবি তাঁর জন্যেই তোলা থাক।'

এবার সুদেবের পালা।

আমার চোখ ওর দিকে তাকিয়ে পিট পিট করতে থাকল।

- কি হে সুদেব, হীপঙ্কর তো জবাব দিল। তুমিই লিখবে নাকি কবিতাটা?'

—'আমিও জবাব দিলাম।'

—'সে কি! পৃথিবীতে শিল্পের আয়ু ফুরিয়ে গেল নাকি?'

—'না ফুরোয় নি। সাময়িক বন্ধ্যাত্ব মাত্র। অতি ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে আমরা বহুদূর এগিয়েছি। অনেক মণিমুক্তা তুলেছি। আর পারছি না।'

—'তাহলে হীপঙ্করের কথাই ঠিক?'—আমার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

—'হ্যাঁ ঠিক। মনের কামনা বাসনাগুলি কোন্ নিরেট আঁধারে জোনাকির মত একবার জ্বলেই চির দিনের জন্যে নিভে যায় তার হদীস পাওয়া বড় শক্ত।'

ছোটকাটা অরবিন্দ এতক্ষণ পাশে বসে চুপ করে বসে চুপ করে শুনছিল। এইবার সে লাফিয়ে উঠল, 'পৃথিবীতে শিল্পের আয়ু ফুরিয়ে যাক, কি সামরিক বন্যাই হোক, তা হোচনের তার শিল্পীদেরই। কিন্তু আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব না। অন্ধকারে কামনার জোনাকিগুলি ফুলের মত প্রস্ফুটিত হতে পারে শেষ পর্যন্ত। নূতন অর্থনীতিই সেই নতুন সমাজের ভিত গড়বে।'

—'নূতন অর্থনীতির প্রধান সহায় হবে বিজ্ঞান'—সুস্মিত এগিয়ে এসে অরবিন্দের হাত ধরল।

কলকাতা থেকে একখানা ট্রেন এই মাত্র ক্যানিং-এর দিকে চলে গেল। আষাঢ়ের দ্বিতীয় চক্কর চা-ও তখন শেষ হয়ে গেছে।

* * *

ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলেটির অঙ্কের খাতা দেখে শিক্ষক প্রশ্ন করলেন—এ অঙ্কের নিয়মটা কে বলেছেন, বলত ?

ছেলেটি বলল আমাদের এক প্রতিবেশী, লোকটা বুড়ো, আর মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

এ নিয়ম ত দেখছি একেবারে নূতন। আচ্ছা, তাঁকে এই অঙ্কটা কষতে দিওত।

পরদিন সে অঙ্ক দেখে শিক্ষক অবাক। তিনি আবার সব চেয়ে শক্ত এমন একটা অঙ্ক দিলেন যেটা কষতে খাতার পাঁচ-ছয় পাতা লাগে।

পরদিন শিক্ষক ত হতভম্ব। পাঁচ পাতায় অঙ্ক পাঁচ লাইনে। তাও আবার আশ্চর্য্য নিয়মে।

শিক্ষক বললেন: চলত তোমার সেই প্রতিবেশীকে দেখে আসি। এমন গণিতজ্ঞ যে পৃথিবীতে আছেন তা' ত জানতাম না!

ছাত্র শিক্ষককে নিয়ে এলেন তাঁর কাছে। তাঁকে দেখেই শিক্ষক চমকে উঠলেন,—তারপর হেসে বললেন: আমি আন্দাজে আপনার কথাই ভাবছিলাম ডঃ আইনষ্টাইন,—আপনি ছাড়া এমন কে আর আছেন যিনি এইভাবে সকলকে অবাক্ করে দিতে পারেন!

জনৈক নাগরিক

সুশীল সিংহ

কেউ কেউ চেনে। অনেকেই চেনে না। না, এই ট্রামটায় কেউ চেনে না। বাঁ হাতে মাংসের দোকানটা পার হয়ে গেল। অবনীশ ট্রামটায় উঠেছে মিনিট দেড়েক। ওঠার আগে সে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল হয়তো পনেরো মিনিট। ইচ্ছে করলে অনেক আগেই সে উঠতে পারত। ওঠেনি। শিথিলভাবে সিগারেটই খেয়েছে। আর—কিছু কি ভেবেছে? কিছুই ভাবেনি। এমন কি কিছু দেখেওনি। অথচ চোখ তার খোলাই ছিল। যেতে যেতে বাঁ হাতে মাংসের দোকানটা চোখে পড়তে সে টের পেল গত দুতি মিনিটে এই প্রথম সে কিছু দেখল।

মাংস জিনিষটার মজাই এই। মাংসের চোখ মাংস দেখলেই দেখে। হ্যারিসন রোড ধরে বরাবর হাওড়া যেতে বড়বাজার যেমন সুনিশ্চিত জানা ভবিষ্যতের মত দাঁড়িয়ে আছে, মেডিক্যাল কলেজ থেকে এস্প্লানেড যেতে তেমনি এই মাংসের দোকান। ছাল ছাড়ান একটা গোটা ছাগ দেহ নির্বিকার ভাবে ঝুলছে। লাল, কালচে লাল দেহটা কয়েকটা মাছি ছেকে এনেছে। হয় তো সকালের দিকের কিম্বা দুপুরে কাটা। তাজা মাংসের স্বাদ এবার চলে যেতে বসেছে। কিন্তু দেখতে বেশ। মাসের যে রোববারটায় মাংস হয়, সুষমা যখন রোঁয়া বাছার জন্য—টুকরোগুলোকে আলাদা আলাদা করে, সুষমার আঙুল আর মাংস যখন মাখামাখি হয়ে যায় তখন অবনীশ কাঁচা মাংসের একটা গন্ধ যেন টের পায়। দোকানটা পার হয়ে যাবার পর সেই চেনা, পুরোনো, কোন কোন রোববারে ওলোট-পালট করা—সুষমার হাতের কাঁচা মাংসের গন্ধটা যেন অবনীশের নাকে এসে লাগল। দৃশ্যে ঘ্রাণে কাঁচা মনটা ও সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল 'স্লাই হ্যে' উঠল পথ, লোকজন। কিছুটা ছাই পাঁশ ভাবনা ও কল্পিত চেনা গন্ধ হঠাৎ, হঠাৎই যে তাকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে এনে দিল, এতে সে খুশী হল। খুশীতে সে ঘাড় ফিরিয়ে ট্রামের ভেতরটা যতটা দেখা যায় দেখল। না, তার চেনা মানুষ কেউ - নেই এতে।

ছাই পাঁশ ভাবনা ছাড়া আর কি! অবনীশের চেনা মানুষ যেমন পোনা তার ভাবনাও তেমনি শুনে বলা যায়। সকাল বিকেলে ট্রামে বাসে উপচে পড়া ভীড়, পাবলেডের বাঁকা কথা, বাজার দর, দেশলাই-এর বাক্সর মত দেড়খানা ঘরের ফ্লাটে আলোর অভাব, সুতোর মত কলের জল, কোন কোনদিন সিনেমা যাবার ইচ্ছে যা একা একা কাটলেট খাওয়া কিংবা পুরোনো কথা ভাবা, এইসব ইত্যাদি ইত্যাদি তার নানা ভাবনার নমুনা। মাংস, কাঁচা মাংসের গন্ধ এইসব সে কোনকালেই ভাবে না। খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে ঘন্টা ট্রামটা রোবাজারের টান ছাড়িয়ে গেল তার মন এখনও সেই কোলান ছাল ছাড়ান ছাগ শরীরটা দেখছে।

সুষমা এখনও ঘুমোচ্ছে। আসলে অচেতন। শরীরের সহ্যের একটা সীমা আছে, সেটা অতিক্রান্ত

হলেই মানুষ সজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। সুষমাও ফেলেছে, পাশে বেবি কটে (যদি কই কি দেখে? একবারটাও জিজ্ঞাসা করা হয়নি, নাম অবশ্য জেনা। সদ্যজাত মানবকও ঘুমোচ্ছে এখন। অবনীশ আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারত। অপেক্ষা করলে এক সময়—সে তার ঘুমন্ত স্ত্রী, (সুষমা যদি তখনও না জাগত) দ্বিতীয় সন্তানের জননী ও সেই নবাগতকে একবার দেখে আসতে পারত। কিন্তু অবনীশ অপেক্ষা করেনি। কি করে করবে? সমস্ত আবহাওয়াটা তার বুকের ওপর কেমন একটা ভারের মত চেপে ছিল, উৎকণ্ঠা? তাহলে সে তো বেঁচে যেত। চারবছর আগে যখন তাদের প্রথম সন্তান হলো সেবারের মত এবারও যদি সে উৎকণ্ঠায়, ভাবনায় ছটফট করত,—অসহ্য যন্ত্রণায় সুষমার মুখখানা কেমন অসহায়, নীল হয়ে যাচ্ছে—এসব কল্পনা করে সে যদি আগের বারের মত হাসপাতাল করত, তাহলে সে সব শেষে খানিকটা ঘুমিয়ে অন্ততঃ বাঁচত। তাতো হয়নি। একটু আগে হাসপাতাল থেকে আসার সময় যেমন সে অভ্যাস সংস্কারে-ট্রাম ধরেছে, ওঠার আগে সিগারেট ফেলে দিয়ে নিয়ম রক্ষা করেছে তেমনি ভাবেই সে সুষমাকে হাসপাতালে এনেছে। অপেক্ষা করেছে ও তার ছেলে হয়েছে এ'কথা জেনে আবার ফিরে যাচ্ছে।

ছেলে। এই কথাটাই তো সহজ, সোজা। অথচ এই সহজ কথাটার আগে আরো কত প্রতিশব্দ না এল। মানবক, সদ্যোজাত, নবাগত, সন্তান। অবনীশের হাসি পেল। এককালে সে গল্প লেখার চেষ্টা করত আর তাই মানুষের মন, জীবনের ঘটনাকে নানা দিক থেকে বোঝারও চেষ্টা করত। সেই এককালের চেষ্টার জেরই কি তার মনে এতগুলো প্রতিশব্দ টেনে আনল! একবার দেখে এসে কিন্তু সে সুষমার পাশে সম্পূর্ণ নতুন, নির্বোধ খানিকটা মাংস দেখতে পেতো, যার অপর নাম ছেলে। কি নাম রাখবে ছেলেটার?

রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে একটা বেলুনওয়ালা যাচ্ছে তার পসরা নিয়ে। বোধ হয় ময়দানে যাবে। নানা আকারের কোলাপ বেলুন সুতোয় বাঁধা হয়ে হাওয়ায় ভাসছে। এক সঙ্গে পরপর পাঁচ-সাতটা বেলুন যদি হাতে টিপে ফাটিয়ে দিতে পারত তাহলে বেশ লাগতো। মনে হতেই যেন পাতলা, তুলতুলে, নরম, ফাটা বেলুনের চোপসানো চামড়া অবনীশের হাতে লেগে গেল।

কতদিন পর এলে কলকাতায়?

দু' বছর পরে।

অবনীশের সিটুনের আসন বেটা খালি ছিল—এক ফাঁকে শুয়ে গেছে। কথা বলছে সুজন ভদ্রলোক।

—কেমন লাগছে কলকাতা?

—ভালো না।

—সে কি হে ভাল লাগছে না কি বলো? আগে তো কলকাতা ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পারতে না।

—এখন তো দুদিনেই হাঁপিয়ে গেছি।

—কেন বৌকে সঙ্গে আনোনি বলে?

—না। কাল বিকেলে দোতলার বসে দক্ষিণ থেকে উত্তরে—গিয়েছিলাম।

—বেশ তো—।

—গোটা রাস্তাটা বস্তির চোখ নামালুম—কাঁঠালের কোঁয়ার মত থিক-থিক করছে লোক। ঘিন্ন।

—যা বলেছো। আর হবে নাই বা কেন? প্রতি মিনিটে কটা করে জন্মাচ্ছে জানো?

—বয়সে কটা ?

—বয়সের চেয়ে অনেক কম।

দুই বন্ধু (বন্ধু ছাড়া আর কি,—অবনীশ আন্দাজ করল) নিজেদের মধ্যেই বেশ উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল। তার পর খাটো গলায় ওরা কোন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে নেমে এল। অন্যদিন হলে অবনীশ নিশ্চয়ই কান দিত না। কিন্তু এখন সে তার সর্বাঙ্গ সজাগ করে ওদের কথাগুলি ধরার চেষ্টা করতে লাগল।

একজন বলল আর এক জনকে, তোমার ছেলে মেয়ে ক'টি ?

—দুটি। একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে। তোমার ?

—একটি।

—ব্যাস ?

– যথেষ্ট। আর চাই না ভাই। পথ বন্ধ করে চলি—

—আমিও।

ওরা দুজনে আবার হেসে উঠল। অবনীশের ইচ্ছে হল ওদের হাসির ওপর গলা তুলে খুব জোরে—সে হেসে ওঠে। পথ বন্ধ করে চলি,—কত সহজে কথাটা বলা হল, তাকি অত সহজে বলার মতো। দাঁড়াও, দাঁড়াও অচেনা বাবু বাছাধন একদিন তুমিও অবনীশের অবস্থায় পড়বে আর ভাববে। তখন—ভাববে। কোন ফুল ফিনায়া পাবে না।

ট্রামটা সেই বিখ্যাত বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গেল। ডাক্তারী শাস্ত্রে সুবিধার প্রতিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত বাড়ীর মালিক জগদ্বিখ্যাত ; কি মুস্কিল ! ডাক্তার শব্দটাও অবনীশ মনে মনে উচ্চারণ করতে চাইছে না, অথচ বাড়ীটা সেই শব্দটাই টেনে আনছে। আর সেই শব্দটার পিছু পিছু মেডিক্যাল কলেজ, ওষুধের গন্ধ, ট্যাক্সীর মিটার, যন্ত্রণাকাতর সুষমা, এই সব সার বেঁধে আসছে। সুষমার, তাদের একটি ছেলে হয়েছে। কি নাম রাখা যাবে ছেলেটার ?

বাঁহাতি পার্কটা পার হলেই ট্রামটা এবার মোড় নেবে। এই পার্কে তিনটে জনসভায় অবনীশ যোগ দিয়েছে। একবার সে অনেক দিন আগে সুভাষ বক্তৃতা। আর দুবার প্রতিবাদ জানানোর জন্য। সভা. - তা সে. উৎসবের হোক, অথবা প্রতিবাদের, সভার একটা শক্তি আছে, অবনীশ জানে। সভার মধ্যে একটা মুক্তিও আছে। নিজেকে সকলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার মুক্তি। এখানে যদি এখন কোন সভা হত বা যদি ময়দানে হয় তাহলে অবনীশ তাতে যোগ দেবে।

মোড়ের মাথায় ট্রাম দাঁড়াতে পিছনের সেই দুজন নামল বটে কিন্তু যেন তারও আগে পাঁচটি ছেলে কলরব করতে করতে ও তাদের পিছনে তাদের বাবা উঠে এলেন। ওধারে জানালার পাশে একটি আসন সম্পূর্ণ খালি ছিল। তিনটে ছেলে তাতেই কাড়াকাড়ি করে বসে পড়ল। সবচেয়ে শান্তটি ও আর একটি বাবার পাশে, অবনীশের পিছনের আসনে বোধ হয় বাবার মতই গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

মোড়ের মাথায় যতক্ষণ দাঁড়াল ট্রামটা ততক্ষণ সেই ভদ্রলোক তার তিন চঞ্চল ছেলেকে উদ্দেশ্য বলতে লাগলেন—

—দুদু হাত বার করবে না।

—মুকুল বোস সোজা হয়ে। বাবলুকে বসতে দাও।

পাঁচটি ছেলে ভদ্রলোকের। যেন দাবানো। অবনীশ যদি ভালো করে লক্ষ্য করত

তাহলে এ্যালুমিনিয়ামের দোকানে সাজান ডেচকি বা হাঁড়ির কথা মনে পড়ত। উপমাটা চালু ছিল ছাত্র বেলায়।

ট্রামটা যতক্ষণ দাঁড়াল, সেই ভদ্রলোক যতক্ষণ তাঁর ছেলেদের ওই সব বললেন—ততক্ষণ অবনীশ ওই পাশের ফুটে টাঙান একটি সরকারী ইস্তাহার পড়ল। ইস্তাহার মানে পরিবার পরিকল্পনার পরামর্শ। তার পরেই বে-সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের একটি বিজ্ঞাপন। পরিকল্পনায় যে সুনিশ্চিত ভাবে সাহায্য করবে সে কথাই বিজ্ঞাপনে ইঙ্গিতে জানান হয়েছে।

ফুরো, ফাঁকি, মিথ্যে। বিজ্ঞাপনে কেবল লোক ভুলোনো কথার বাহার। একেবারে বাজে। রীতিমত ডাক্তারের নির্দেশ মেনেছিল অবনীশ। তবে?

ছি, ছি, ছি। এতক্ষণে নিজেকে ধিক্কার দিল অবনীশ। অনেক আগেই তার তাই হওয়া উচিৎ ছিল। এতটুকু বিরক্তি নেই, অতৃপ্তি নেই, কিছুই নেই। আর ছেলে পাঁচটা অসভ্য একম চঞ্চলতা করছে না বটে, তবে নিজেদের মধ্যে কথা বলে, পরস্পরকে কিছু দেখিয়ে ও বেখে, বাবার নির্দেশ শুনে, মাকে ডেকে ট্রামখানা যেন তাদেরি হকলে এনে ফেলেছে। আসলে—কথাটা মানতেই হল—সুখ এমন কি স্বস্তিও তোমার মন নির্ভর, নিরপেক্ষ কিছু। সুখী হতে, স্বস্তি পেতে জানা চাই। যদি মনে সুখী, তাহলে সুখ তোমার। আর না হলে গোলাপের বিছানায় শুয়েও তা নেই, কোথাও না। খুব চেনা বাউলের গান তার মনে এসেও এলো না। আনতে পারল না।

হিসেবী অবনীশ আর তার চেয়েও হিসেবী তার স্ত্রী সুষমা, এরা দুজনেই দ্বিতীয় কোন সন্তান চায়নি। একটি নিয়েই তারা পূর্ণ ছিল। কিন্তু তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার মুখ চেয়ে জগৎ সংসারের যেমন অনেক কিছুই চলেনা, এটাও চলল না। কেননা, প্রকৃতির রহস্য আছে। প্রকৃতির অপচয় (অপচয়? এত দ্রুত, এত সহজে অপচয় কথাটা ভাবতে পারল সে?) আছে। গৃহস্থকে গাঢ় ঘুমে অচেতন জানলে চোর চুরি করার চেষ্টা করে। কখনো বা সফলও হয়।

যাঃ, এছাড়া কি ভাল কোন তুলনা মনে হল না তার। যখন ট্রামে বসে সে ওই ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাচ্ছে—বিবাহিতা ভদ্রমহিলা যিনি অত্যন্ত দ্রুত চৌরঙ্গীর দিকে হেঁটে চলেছেন। বোধ হয় পয়সা বাঁচাচ্ছেন? আচ্ছা, উনি কি কোন চাকরী করেন? ওর ছেলে মেয়ে কটি? কে বলবে? হতেও তো পারে, সুষমার সঙ্গে ওর আলাপ আছে।—তখন গাঢ় ঘুমের পরিস্থিতি ছাড়া চোর আসার অন্য কোন কারণ তার মনে এল না? হ্যাঁ আসতে পারে। দিনের বেলাতেই ছলনা করে আসতে পারে ও হরণ করতে পারে। নাঃ। প্রকৃতির রহস্য বা কৌতুকটা যে সম্প্রতি ঐ কথাটা নিজে ভালো করে বোঝার জন্য যতই সে চেনা কোন ছবি বা ঘটনার আশ্রয় নিতে চাইছে ততই রহস্যটাকে আড়াল করে অন্য কোন রহস্য যেন তাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে।

কি ভাবে কি হয়; নিয়ম এবং নিয়মের ফাঁকি, কি তারা চেয়েছিল ও কি চায়নি ঐ সব কথা এখন সম্পূর্ণ অবান্তর। সুষমা দ্বিতীয়বার জননী হয়েছে এটাই হল ঘটনা। এবং তার এই দ্বিতীয় মাতৃত্বকে সম্মানিত করার জন্য অবনীশের উচিৎ ছিল হাসপাতালে অপেক্ষা করা। সুষমার জ্ঞান ফিরলে তার সঙ্গে দেখা করা ও সদ্য ভূমিষ্ঠ সেই শিশুর শিয়রে একবার দাঁড়ান। এমনিতেই বেলা তিনটে বাজায় স্নান-খাওয়ার কোন মানে হয় না। খায়ওনি। আর ঘণ্টা তিনেক হাসপাতালে বসে থাকলে কিছুই যেতো আসতো না। একটা নতুন প্রাণ এ পৃথিবীতে এসেছে, তারা এনেছে—, সেই নবাগত'র প্রাপ্য-সবার আগে।

না, তার প্রথম প্রাপ্য অবনীশ মিটিয়ে দেয়নি। এখনো সময় আছে। অবনীশ কি নেমে যাবে? ফিরে যাবে আবার?

একটা ভূত যেন অবনীশের ঘাড়ে চড়ে ছিল। চকিতে নেমে গেছে। সুষমার জন্ম সমবেদনায় তার মনটা টন্‌টন্ করছে। অবনীশ আর কতটুকু আর কিই বা করেছে। তাদের সংসার যাতে যতটা সম্ভব স্বচ্ছলে চলে তাই সহস্র সংখ্যা মাপা রাখতে হবে। তা ঠিক, এ নিয়ে সুষমার সঙ্গে তার কোন মনান্তর তো হয়নি। অন্যদিকে সুষমা বরং তাকে সাহায্য করবার জন্ম নিজেকে প্রস্তুত করেছে। সেলাই-এর স্কুলে প্রথম দিকে কাজ শেখার জন্ম অবনীশের কিছু খরচা হয়েছে বটে, সুষমাকেও বিনা পারিশ্রমিকে বেশ কিছু কাজ করে দিতে হয়েছে, কিন্তু গত দুবছর সুষমা তো রীতিমত উপার্জন করেছে বলা চলে। বেতের চারটে চেয়ার আর টেবিল নগদ টাকায় কিনে কেমন চমকে দিয়েছিল তাকে। এখন তো বাড়ী ফিরে গিয়ে সে তারই একটায় বসে অন্যটায়—পা তুলে দিয়ে আয়েস করে নিজের মনে সিগারেট টানবে। বেচারা সুষমা তখনো ঘুমোবে হাসপাতালে। পাশে বাচ্চাটাও ঘুমোবে। চারদিকে—শুধুই শব্দ—, কি নাম হবে ছেলেটার?

অবনীশের মনে পড়ল মিনতির (তার দ্বিতীয় সন্তান লাভ-মিনতি ছাড়া অন্য কিছু নয়) মত যা ঘটেছে সুষমা একে এড়াতে চেয়েছিল, বেচারা। আবার মনে হল অবনীশের। নিজের দিকে (ডাক্তারের বাড়ীর মেয়ে তো, প্রয়োগ করেও মিনতিকে রুখতে চেয়েছিল। নিজের শরীর, সংসার কোনটাই গ্রাহ্য করেনি। কিছুই করা যায়নি অবশ্য। দিন সাতেকের জন্ম বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। ডাক্তারও আনতে হয়েছিল। সুষমা বাথরুমে হঠাৎ পিছলে পড়ে গিয়েছিল এই মিথ্যে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করে শোনাতে হয়েছিল ডাক্তারকে। এছাড়া আর কিই বা করেছে সে। দিব্যি অফিস গেছে। নিজের অন্যান্য কাজ করে গেছে নিয়ম মত। সাতদিন একটানা বিছানায় শুয়ে সুষমাই কেবল কাগজের মত পানসে হয়ে গিয়েছিল। সেলাই-এর স্কুলে কি যেন একটা জরুরী কাজ তার জন্ম অপেক্ষা করছিল। তখন একটানা সাতদিন বিছানায় ও তারপর আরও সাতদিন একঠায় বাড়ীতে থাকতে হয়েছিল বলে সুষমা মিনমিনে গলায় অনুযোগ করেছিল। সুষমা যখন তার সেলাই-এর স্কুলে যাবে বলে পথে আসে তখন সেও বোধহয় ওই ভদ্রমহিলার মত যতটা সম্ভব হাঁটে। পয়সা বাঁচায়।

একটু আগে ট্রামের জানালা দিয়ে যে বিবাহিতা ভদ্রমহিলাকে অবনীশ দেখেছে, তিনি নিশ্চয়ই আসছেন।

সুষমা হিসেবী, সুষমা পরিশ্রমী, সুষমা সুন্দর স্ত্রী, হাসপাতালে তার চেতনা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি বলে নিজেকে অপরাধী মনে হল অবনীশের। নিজের ওপর রাগ হল তার।

এসপ্লানেড ট্রামস্টপে লোকটা যেন ওৎ পেতেছিল অবনীশকে ধরবে বলে। বাসতে না বাসতেই মুখোমুখী দেখা। আপ্যায়ন করার ভঙ্গীতে একগাল হেসে বলল, নমস্কার অবনীশ বাবু।

অবনীশকে প্রতি নমস্কার করতেই হল।

গিলে করা খোলা হাতা পাঞ্জাবী, ধুতি, গলায় একটা সোনার চেন, মাথার চুল সুশীল বালকের মত আঁচড়ান, হাতে পান তিনেক কাটল। বাবু অবশ্য ব্যস্ত, সেই চিরাচরিত ভাব ভদ্রলোকের। অবনীশের মনটা বেশ নরম, ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। লোকটিকে দেখেই বুকের মধ্যে সেই সন্দেহের কণা তাকে ছোবল দিল। সারা অঙ্গ বিষে জর জর হয়ে গেল অবনীশের।

—সুষমা দেবী বেশ কিছুদিন আসেননি। কেমন আছেন?

লোকটার স্পর্দ্ধায় মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল অবনীশ, মায়ের পাশে বসে দেবী ঘোষ করলেই অন্যের স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকার অধিকার হয় না যে, তা ওকে জানানো দরকার। কিন্তু ওর বা দোষ কি! অধিকার তো এমনিই পাওয়া যায়। কলকাতার চারটে শাখা আছে এমন একটা সেলাই শেখানোর প্রতিষ্ঠান চালান উনি। সুষমা ওঁর স্কুলেই কাজ শিখিয়ে কিছু উপার্জনও করেছে। সেলাই ওর নেশা। অধিকার অর্জনের তো হয়তো আপনিই পেয়েছেন।

—তিনি···। এখন তাঁর পক্ষে কোন কাজ করাই সম্ভব নয়।

- ওহ্ হো। তাই তো। তাঁকে বলেছি, আপনাকেও বলছি আমাকে ডরপেট খাওয়াতে হবে। কোথায় আছেন তিনি, বাড়ীতে?

—মেডিক্যাল কলেজে।

—বেড নাম্বারটা দেবেন? সুষমাদেবীর কয়েকজন ভক্ত ছাত্রী ওঁর নামে অজ্ঞান। যদি ওদিকে যাই, সুবিধা ঘটে তাহলে আমিও একবার উঁকি দিয়ে আসব।

এতক্ষণে অবনীশের খেয়াল হল যে বেড নাম্বারটাও সে নিয়ে আসেনি। অপ্রতিভের মত এক নিঃশ্বাসে বলল, তাড়াতাড়ি আমি ওটা আনতে ভুলেছি। বড় ক্লান্ত লাগছে।

—সত্যিই তো অবনীশবাবু। আপনার দেরী করে দিলাম। বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন। ওঁকে বলবেন, আমি, আমরা সবাই খুব খুশী হয়েছি। আচ্ছা, নমস্কার।

লোকটি চলে গেল। কিন্তু যেন অত্যন্ত কৌশলে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে অবনীশের ধৃতির কোথাও আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে জেনে যাচ্ছে। হাতের পাতা খস্ খস্ করছে। পাঞ্জাবীর বুকে চন্দন কাঠের বোতাম (সুষমার পছন্দ করে কেনা) যেন বিঁধে যাচ্ছে। বিশ্রী, বিশ্রী, বিশ্রী। রীতিমত অন্যায়। এমন একটা ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোন মানে হয় না। এ যে মনে মনে পাপ করা। অথচ উপায় নেই। নিরুপায়, অসহায় অবনীশ। ট্রামে আসতে সেই দুটি বন্ধু যারা একজন দুটি অন্যজন একটি সন্তান পেয়ে পথ বন্ধ করে চলে তাদের মত অবনীশও চলেছিল। কিন্তু—

চায়নি। অবনীশ চায়নি। সুষমাও না। যে এসেছে, সে অবাঞ্ছিত (হায়! স্বামী-স্ত্রী তারা) এবং সে জোর করে এসেছে। তার আসার সংবাদে কোন রোমাঞ্চ, কোন গান জাগেনি। বরং অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য উৎপাতকে অনাগত রাখার জন্য তার বাবা আর মা কোমর বেঁধেছিল। এরপর সুষমা তাকে দুধ দেবে, কোল দেবে, হাত জাগবে। যার কাছে সব পাওনা সে আদায় করে নেবে।

কি করে পারল সুষমা? নিজের পেটের ছেলেকে নষ্ট করার জন্য কি করে মা পারল বিষে প্রয়োগ করে ওষুধ নিজেকে? মা, ও মা রে।

অবনীশের চোখের সামনে ঝিলে হাতা পাঞ্জাবী, হাতে কাইল,—সেই লোকটার চেহারাটা ঘন্ ঘন্ করে জ্বলছে। এত বড় মহানগরী, কত খনি, কত ডরপ। কতশত প্রয়োজনের চাকা চলছে, কেবলই চলছে। একের সঙ্গে অন্যকে নানা সম্পর্কের সুতোয় বাঁধছে। ট্রাম চারমিনারে দাঁড়িয়ে অবনীশ। তার স্ত্রী, তার দ্বিতীয় সন্তান হাসপাতালে। তার নিজের স্ত্রী, তার নিজের সন্তান। মাঝখানে একটা ছায়া। সেই ছায়াটার ওপর মনে মনে ঘুঁসছে সে।

—আরে অবনীশ যে।

—মিত্র মশাই কোথা থেকে, অবনীশ সরসরে হয়ে হাসার চেষ্টা করল।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

—না। ঠিক দাঁড়িয়ে নয়। যাবো এক জায়গায়।

—কোথায়?

—চা খেতে।

—চল, আমিও যাব।

ওরা পা চালাল।

অবনীশ বলল, তুমি মদ খেয়েছ মনে হচ্ছে।

—খেয়েছি।

—এই দিনের বেলাতেও?

—উপায় নেই। একটু না চাপলে আগে রাত্রে লিখতে পারতাম না। আজকাল ডিজিয়ে যাবি। না হলে চিন্তা করতেও পারি না।

—কি ভাবো অত?

সৌখীন দোকানে ততক্ষণে ওরা ঢুকে পড়েছে।

—কি ভাবি? হাসালে। ভাবি এই শতাব্দীর কথা। তোমার—আমার কথা।

—ভেবে কিছু কি পেলে? পাও কিছু?

—পাই বইকি। তবে রোজ যে এক জিনিস পাই, তা নয়। একটা জিনিস কেবল কমন থাকে। সেটা অবিশ্বাস বা বিশ্বাসের অভাব।

—মানে?

—মানে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। বিজ্ঞান বা ঈশ্বর কোনটাতেই আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় নয়। তাই আমাদের গোটা জীবনের ভিতটাই আলগা। আমাদের জীবনের কোন কিছুর সম্পর্কেই আমরা নিশ্চিন্ত নই। নয় কি?

অবনীশের সমস্ত মন গায় দিয়ে উঠল, ঠিক। ঠিক। ঠিক।

কিন্তু সে কথা না বলে সে বলল, আমার তো তাই মনে হয়—

—বাদ দাও, তর্কে কোন মীমাংসা হবে না। কি খাবে বল, কোল্ড কফি?

—তাই হোক, অবনীশ এক কথায় সায় দিল।

—আমরা কিন্তু চা খাব বলে দু'জনেই ভেবেছিলাম।

এই বলে মিত্র মশাই হাসতে লাগলেন।

—গিয়েছিলে কোথায় অবনীশ?

—হাসপাতালে।

—হঠাৎ?

—মানে, আমার—

—পুত্র? না কন্যা?

—পুত্র।

—বেশ। বেশ। ওই একই।

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। পাইপ গুছিয়ে ধরাবার আগে অবনীশ বলল, তোমার গল্পে লেখা হয়ে খুব ভালো হয়েছে। সাহিত্যিক তুমি, আমার ছেলের একটা নাম দাও।

—নাম?

—হ্যাঁ। একটা নাম।

এক মিনিট ভেবে একটা নাম বলতে গিয়ে অবনীশের বন্ধু বলল, না। ও নাম চলবে না। সাঁওতালরা সোমবার সম্বন্ধে বলে—সোমা, সোমড়, মঙ্গলে, মংগড়, বুধে বুধন্—এর মধ্যে বেশ একটা সহজ মীমাংসা আছে। নামে কি যায় আসে? পরে বিবেচনা। যা মনে ধরে তাই দাও। ভেবে নাম দেওয়া খুব কঠিন, অনেক ঝামেলা।

—না, না। ভেবেই নাম দেবো। একটা আধটা বলো না।

—ভেবে দেবে? তবে···আচ্ছা অবনীশ একটু আগে যা বলছিলাম কোন কিছুর সম্পর্কেই আমরা নিশ্চিন্ত নই। যা ঘটে তা নিজের জোরে ঘটে। তোমার ছেলের নাম দাও—

—কি নাম?

—আগত। পছন্দ হয়?

অবনীশ তার মনের সব ভাবনাকে আড়াল করে, হেসে বলল, খুব।

দুজনেই কফির দিকে হাত বাড়াল।

* * *

সহরের শেষ প্রান্তে গল্‌ফ্, খেলার মাঠের এক পাশে বেদের দল এসে তাঁবু ফেলেছে।

ম্যাথু আরনল্ড প্রাতঃভ্রমণে গেছেন সেদিকে! একজন আধবুড়ো বেদে তাঁকে দেখে হাসি মুখে বললেন—"আচ্ছা মশাই, এখানে লাইব্রেরী কোথায় আছে বলতে পারেন? আমার একখানি বই পড়বার খুব ইচ্ছা।"

—"কি বই?" প্রশ্ন করলেন ম্যাথু আরনল্ড! একটু বিস্মিত হয়ে।

—"এমন কিছু নয়,—সেকস্‌পীয়ারের জুলিয়াস সীজার।"

আশ্চর্য হলেন আরনল্ড। কিন্তু আরও আশ্চর্য হলেন তিনি যখন সেই বেদে অমর্ষল সেকস্‌পীয়ার, মিলটন প্রভৃতি আবৃত্তি করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আলাপের পর আরনল্ড বাড়ী ফিরে এসে নূতন একখানা উপন্যাস লিখতে বসলেন তার নাম দিলেন—"The Scholar Gipsy."

আমাদের সাহিত্যে যেমন আছে, তেমনি আছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যে এমন সব কালজয়ী গল্প-উপন্যাস-কাব্য-নাটক যাদের আবেদন সার্বজনীন এবং সর্বকালের। পাশ্চাত্যদেশে World's Classics Condensed এবং World's Great-Books in Outline ধরনের বই-এ সেই সব দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টিগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ পাওয়া যায়। যাতে সেই সংক্ষিপ্ত রচনা পড়ে মূল গ্রন্থ পড়বার আগ্রহ পাঠকদের মনে জাগে সেই উদ্দেশ্যেই এই ধরণের গ্রন্থগুলি রচিত এবং তাদের চাহিদাও প্রচুর। আমাদের দেশে সে-ধরণের কোন সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা আজো হয় নি। যাই হোক, আমরা আমাদের পত্রিকার মাধ্যমে এদেশের ও ওদেশের কয়েকটি কালজয়ী কাহিনীর সংক্ষেপিত রূপ পরিবেশন করবার আয়োজন করেছি। আশা করি, এইগুলি পাঠকদের ভাল লাগবে।

—সম্পাদক

যে কাহিনী চিরকালের

দি ডেকামেরন : বোকাসিও

সুজন রায়

ইতালীর কথাসাহিত্য জগতের আদিপুরুষ ছিলেন জিওভ্যানি বোকাসিও। জন্ম ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের কাছে এক গ্রামে। তাঁর রচিত দি ডেকামেরন (দশ রাত্রের উৎসব) একটি গল্প-চক্র, অর্থাৎ বহুজনের বলা বহু গল্প ছড়িয়ে আছে এর মধ্যে। বইটিতে এমন অনেক কাহিনী আছে যা চূড়ান্ত আদি-রসাত্মক, আবার এমন কয়েকটি কাহিনী আছে যারা মনুষ্যত্বের মহিমায় শাশ্বতকালের রসলোকে উত্তীর্ণ। তেমনি একটি কাহিনী এখানে পরিবেশিত হল।

॥ এক ॥

অত্যন্ত খামখেয়ালী এক জমিদার। মার্কুইস্ অফ সালুজ্জো। একদিকে যেমন দরাজ মন, ফুর্তিবাজ, শিকারের প্রচণ্ড নেশা, প্রজাবৎসল, অন্যদিকে তেমনি জেদী আর কঠিন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

অনুগত রাজভক্ত প্রজারা তাঁকে খুবই ভালবাসে। কিন্তু প্রজাদের মনে সুখ নেই।

কেন? প্রজাদের তো কোন অভাব রাখিনি আমি! তবে তারা সুখী নয় কেন?

এক অমাত্যের মুখে প্রজাদের মনে সুখ নেই শুনে মার্কুইস্ তাকে ওই প্রশ্ন করলেন।

অমাত্য সবিনয়ে বললে, প্রভু, প্রজারা বলছে, আপনি এখনো বিবাহ করলেন না। আপনার বয়স হোয়ে যাচ্ছে। এর পর আর আপনার বিবাহ করবার ইচ্ছে একেবারেই থাকবে না।

অমাত্যের কথা শুনে মার্কুইস্ দরাজ গলায় হেসে উঠলেন,

এই কথা! তা, নাই বা হল বিয়ে! তাতে প্রজাদের কিসের অত দুঃখ?

অমাত্য বললে, দুঃখ হবে না হুজুর। এত বড় ঐতিহ্যসম্পন্ন জমিদারবংশ, শেষ পর্যন্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে লোপ পাবে! এই চিন্তায় প্রজারা খুবই বিমর্ষ!

বেশ সময় কাটছিল, শিকারে, খেলা-ধূলায়, আমোদ-প্রমোদে! বিবাহ! উত্তরাধিকারী! বংশ রক্ষা! প্রজারা সহসা মার্কুইসের মনে এক নতুন ভাবনা চুকিয়ে দিল! শুধু তাই নয়, তারপর থেকে প্রজাদের অনুরোধ উপরোধ পীড়াপীড়ি সুরু হল।

এ তো এক আচ্ছা উড়ো ঝঞ্ঝাট এসে পড়ল তাঁর জীবনে, মার্কুইস মহা অসন্তিষোধ করতে লাগলেন! বিয়ে করবার কোন পরিকল্পনা তো এতদিন ছিল না! আচ্ছা, বেশ, এখন যদি বিয়ে করতেই হয়, পাত্রী কই?

পাত্রীর অভাব কি প্রভু। হুকুম করলে হাজার হাজার পাত্রী এনে হাজির করতে পারি?

না, না, হাজার হাজারে দরকার নেই। সে তো আরও বিপদ! একটা হলেই হবে। দেখা যাক, নিজেই যদি খুঁজে পেতে নিতে পারি!

• • •

একদিন শিকারে বেরিয়েছেন মার্কুইস!

একটা মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন একটি মেয়েকে। চাষীর মেয়ে। কিন্তু ভারী সুশ্রী দেখতে: আর সেদিনকার সেই সকালের সোনালী আলোয় সেই চাষীর মেয়ের রূপলাবণ্য যেন মার্কুইসের মনে এক নতুন স্পন্দন জাগালো।

ঘোড়া থামালেন তিনি।

মেয়েটি কুয়ো থেকে জল আনতে যাচ্ছিল! সে দু'চোখ মেলে অবাক হয়ে মার্কুইসের দিকে তাকালো! ঘোড়ার পিঠে যেন রূপকথার রাজপুত্র চলেছেন মৃগয়ায়।

মার্কুইস ঘোড়া থেকে নামলেন। কাছে ডাকলেন মেয়েটিকে হাতের ইশারায়।

মেয়েটি এসে দাঁড়ালো তাঁর সামনে!

তোমার নাম কি খুকু?

মেয়েটি অস্ফুটে বললে, গ্রিজেল্‌ডা!

সুন্দর নাম! গ্রিজেল্‌ডা! আচ্ছা, গ্রিজেল্‌ডা, তোমায় একটি কথা বলব। রাগ করবে না তো?

মেয়েটি বিস্মিত!

কি কথা?

তুমি আমায় বিয়ে করবে?

মার্কুইসের কথা শুনে গ্রিজেল্‌ডা হকচকিয়ে গেল।

কি! কথা বলছ না যে! দেখ, আমি দেখতে শুনতে মন্দ নই। বয়সও বেশি নয়। আর আমার পয়সাকড়ি আছে। তোমার কষ্ট হবে না। কি বল, রাজী?

গ্রিজেল্‌ডা কথা না বলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

কিন্তু, একটি সর্ত আছে গ্রিজেলডা!

কি সর্ত?

সর্ত এই যে, যদি আমায় বিয়ে কর তাহলে আমি যখন যা বলব, তোমায় বিনা প্রতিবাদে বিনা দ্বিধায় আমায় খুশী করবার জন্যে তাই করতে হবে, আমার কথা শুনতে হবে। দেখ, বেশ করে ভেবে নাও। পারবে কি না।

নম্রকণ্ঠে গ্রিজেল্‌ডা বললে—পারবো।

ব্যস! বিয়ে হোয়ে গেল। ধুমধাম, আলো, আতসবাজী, সমারোহ। প্রজাদের আনন্দ আর ধরে না। জমিদার তাঁর রাজকোষ খুলে দিয়েছেন। যে যত পারো নিয়ে যাও। সাতদিন ধরে অহোরাত্র আনন্দে মেতে থাকো।

॥ দুই ॥

বিবাহের পর অল্পদিনের মধ্যেই গ্রিজেল্‌ডা নিজের গুণে সবাইকে বশ করল। প্রজারা তার মাঝে অজান, আত্মীয়-কুটুম্বরা মোহিত, জমিদার স্বয়ং পরম চরিতার্থতায় বিগলিতচিত্ত।

দিন কাটছিল সুখে, অনাবিল আনন্দে। কিন্তু খেয়ালী জমিদারের বুঝি টনক নড়ল। তাঁর মাথায় খেয়াল চাপল, গ্রিজেল্‌ডাকে যেকথা তিনি বলেছিলেন, তার পরীক্ষা তো করা হয়নি। অতএব গ্রিজেল্‌ডাকে অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হোতে হল :

• • •

একটি মেয়ে হয়েছে গ্রিজেল্‌ডার!

জমিদারির চারিদিকে উৎসব। প্রজারা মোচ্ছব লাগিয়েছে! রাজ্যময় আনন্দের স্রোত বইছে। এমন সময় একদিন মার্কুইস এসে স্ত্রীকে বললেন, দেখ গ্রিজেল্‌ডা, একে তো তুমি চাষার ঘরের মেয়ে, সেজন্যে প্রজারা সব ছিছিক্কার করছে, তার ওপর প্রথম সন্তান প্রসব করলে, মেয়ে। আমার তো মুখ দেখানো ভার হোয়ে উঠেছে।

মাথা হেঁট করে গ্রিজেল্‌ডা বললে, প্রভু, আমি অতি দীন। যে মর্যাদা আপনি আমায় দিয়েছেন, আমি জানি আমি তার যোগ্য নই। এখন আপনার মান যাতে রক্ষা হয় সেজন্যে আপনি যা করবার করুন, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।

মার্কুইস আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরে এলো এক ভৃত্য। সে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

তুমি কাঁদছ কেন? বল, কি তোমার দুঃখ। আমার সাধ্য থাকলে আমি নিশ্চয় তোমার দুঃখ দূর করব।

গ্রিজেল্‌ডার কথায় ভৃত্যটি আরও আকুল হল। শেষকালে বললে, মা, কর্তার আদেশ না মানলে পর্যান যাবে, তাই বাধ্য হয়ে আমায় আসতে হয়েছে।

কেন এসেছো বল!

আমি এসেছি আপনার মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্যে।

গ্রিজেল্‌ডা এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললে, বুঝেছি। তারপর মেয়েটিকে শেষ একটি চুমু খেয়ে ভৃত্যের হাতে তুলে দিল।

সে মনে করেছিল, বাচ্চাটিকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হবে। কিন্তু তবুও সে একটি কথা বললে না, এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না। স্বামীর ইচ্ছাই তার কাছে সব।

মার্কুইস কন্যাটিকে অন্য এক শহরে তাঁর ভগ্নীর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আগে থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু সে কথা গ্রিজেল্‌ডাকে জানালেন না।

আরও কিছুদিন পরে গ্রিজেল্‌ডা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল।

প্রজারা আবার আনন্দে মেতে উঠল। এবার আনন্দ শত গুণ বেশী। জমিদারির উত্তরাধিকারী জন্মালো। মার্কুইসও খুব খুশী।

কিন্তু গ্রিজেল্‌ডার কাছে গেলেন মুখ কালো করে, বললেন, দেখ, আমি আর প্রজাদের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। তারা সব টিটকারি দিচ্ছে। বলছে, চাষার নাতি হবে আমাদের জমিদার, এ আমাদের সহ্য হবে না।

গ্রিজেল্‌ডা নীরবে স্বামীর কথা শুনছিল। অস্ফুটে বললে, কি করবেন তাহলে?

বাধ্য হোয়ে, মেয়েটার বেলায় যে ব্যবস্থা করেছি, এবারও তাই করতে হবে।

করুণ মৃদু হাসল গ্রিজেল্‌ডা, বললে, আপনার মন যাতে ভাল থাকে, আপনার মান যাতে বজায় থাকে তা আপনি নিশ্চয়ই করবেন। আমার জন্যে মোটেই ভাববেন না! আপনার সুখের কাছে আমার সুখ একেবারেই তুচ্ছ বলে আমি মনে করি।

অবাক হোয়ে কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে রইলেন খেয়ালী জমিদার। তার পর চলে গেলেন।

পরের দিন কচি শিশুকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এলো এক ভৃত্য। মার্কুইস আগের মত ছেলেটিকেও পাঠিয়ে দিলেন দিদির কাছে।

সবাই মনে করল, মতিচ্ছন্ন জমিদার তাঁর ছেলে মেয়ে দুটিকেই মেরে ফেললেন। প্রজারা হায়-হায় করতে লাগল। কি দুষ্কণেই তারা তাদের 'রাজাকে' বিয়ে করতে বলেছিল! গ্রিজেল্‌ডার মতো রমণী পৃথিবীতে আর হয়! এমন স্ত্রীকে এই অনাদর, তার প্রতি এত নিষ্ঠুরতা। প্রজারা অনেকে প্রকাশ্যেই জমিদারকে গাল দিতে লাগল!

কিন্তু গ্রিজেল্‌ডার মুখে এতটুকু বিরাগের চিহ্ন নেই। কেউ তাকে সান্ত্বনা দিতে এলে বলত, না, না, আমার কোন দুঃখ নেই। স্বামী যে ব্যবস্থায় মনে শান্তি পেয়েছেন সে ব্যবস্থায় তার কিছু বলবার নেই, বরং স্বামী যে সুখী বোধ করছেন তাতে সেও সুখী মনে করছে নিজেকে।

॥ তিন ॥

মার্কুইসের কিন্তু এতেতেও আশ মিটল না। শেষ পরীক্ষা করলেন তিনি! চরম আঘাত হানলেন, পতিগতপ্রাণা স্ত্রীর বুকে। কিছুদিন পরে একদিন গ্রিজেল্‌ডার মহলে গিয়ে বললেন, দেখ, অনেক ভেবেচিন্তে আমি স্থির করলাম যে আমার আবার বিয়ে করা উচিৎ। এবং তার আগে তোমার ত্যাগ করা দরকার।

অশ্রুচোখ তুলে গ্রিজেল্‌ডা বললে, বেশ তো, সেই মতো ব্যবস্থা করুন। আপনাকে তো বলেছি, আপনার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা।

মার্কুইস বললেন, হ্যাঁ, আমি আবার বিয়ে করব এবং আমার যোগ্য ঘর থেকে মেয়ে আনবো, রূপে বল, বংশ মর্যাদায় বল, সে সব সেরা হবে। তাহলে আর কেউ কোন বিরূপ কথা বলতে পারবে না।

সে তো বেশ ভালই হবে।

হ্যাঁ। তুমি কালই তোমার বাপের বাড়ী চলে যেও।

এবার বুঝি গ্রিজেল্ডার চোখে জল এসে গেল। তাড়াতাড়ি হাসি দিয়ে কান্না ঢেকে বললে ভাই যাব!

পরের দিন চলে গেল গ্রিজেল্ডা! সঙ্গে নিল না একটিও গয়না, নিল না কোন ভাল পোষাক। মোটা চটের মতো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে সে বাপের কুটীরে ফিরে গেল!

দিন যায়। গ্রিজেল্ডা নিত্য নতুন খবর পায়। কখনো শোনে, রাজবাড়ি রং করা হচ্ছে, কেউ এসে খবর দেয়, এবার যার সঙ্গে জমিদারের বিয়ে হচ্ছে, তার বাপও মস্ত জমিদার, কেউ জানায়, এবার যে বউ হয়ে আসছে, সে তো মেয়ে নয়, যেন তারাকাটা পরি!

দিন যায়। বছর যায়। গ্রিজেল্ডার কাছে নানা খবর আসে। একদিন এলো জমিদারের পেয়াদা, সঙ্গে লোক লস্কর, পাল্কি।

কি ব্যাপার?

প্রভু ডেকেছেন গ্রিজেল্ডাকে।

বেশ তো। তাঁর আদেশ যখন, তখন যাব বৈকি!

গ্রিজেল্ডা এলো স্বামীর কাছে।

মার্কুইস বললেন, দেখ, শিগগিরই আমার নতুন স্ত্রীকে ঘরে আনবো। তখন একটা উৎসব করতে হবে তো?

তা হবে বৈকি!

হ্যাঁ, তাইতো বলছি। তুমি এত দিন এ বাড়ির গিন্নি ছিলে! কোথায় কি আছে তুমি সবই জানো! তাই তোমার পক্ষেই উৎসবের আয়োজন করা সহজ হবে। তাছাড়া কাদের নেমন্তন্ন করা দরকার তাও তুমি জানো। এ সবের ভার তোমাকেই নিতে হবে। বিয়ের হাঙ্গামা চুকে গেলে, নতুন বৌকে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে তুমি আবার বাপের বাড়ি চলে যেও।

ক্ষণেকের জন্যে গ্রিজেল্ডার বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেল। বুকের ভিতরটা যেন কেটে চৌচির হোয়ে যাচ্ছে! কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।

কাজে লেগে গেল গ্রিজেল্ডা। ঘর দুয়ার সাজালো, ঘসে মেজে চারিদিক ঝকঝকে করে তুললো। নিজের হাতে ঘরের মেঝে মুছলো, দেওয়াল পরিষ্কার করল। তার পরণে কিন্তু সেই মোটা কাপড়, সেই নিরাভরণ দেহ।

বাড়ির বড় বড় কর্মচারীরা তার দুঃখে আড়ালে কাঁদলো! প্রজারা কাতর হল তার অবস্থা দেখে। কিন্তু গ্রিজেল্ডার মুখে সেই মৃদু মধুর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি লেগেই আছে।

বিয়ের দিন এলো। প্রথা অনুযায়ী বধূ আসবে স্বামীগৃহে। সেখানে সম্পন্ন হবে বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান। তারপর, মধুযামিনী, ফুলশয্যা!

গ্রিজেল্‌ডা স্বামীর আগমন অপেক্ষা করছে। বুকের মধ্যে তার যে কী হাহাকার উঠেছে, মুখ দেখে তা বোঝবার উপায় নেই।

মার্কুইস এলেন। সঙ্গে একটি সতেরো ষোলো বছরের পরমাসুন্দরী মেয়ে।

গ্রিজেল্‌ডা তাকে অভ্যর্থনা করল।

সবাই রূপবতীর রূপে মুগ্ধ! আর শুধু কি রূপ! কী তার চমৎকার নম্র কথাবার্তা। কী সুন্দর ব্যবহার! বোঝা গেল, শিক্ষিতা মেয়ে।

এক সময় মার্কুইস গ্রিজেল্‌ডাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, কেমন দেখলে মেয়েটিকে?

গ্রিজেল্‌ডা বললে, চমৎকার! খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে নিশ্চয়। আমার মত দুঃখীর মেয়ে এয়! তাহলে আমি এবার যাই!

এখনি যাবে?

হ্যাঁ: সব কাজ শেষ হয়েছে। আর তো আমার কিছু করবার নেই। যাবার আগে একটি প্রার্থনা জানাই প্রভু!

উৎসুকচিত্তে মার্কুইস বললেন, বল, বল, কি প্রার্থনা!

প্রার্থনা এই, আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, এর সঙ্গে তা করবেন না। এ মেয়েটি তা সইতে পারবে না। আমি গরীব, দুঃখ কষ্টে মানুষ, তাই, আমি যা সইতে পারলাম, এ-মেয়ে তা পারবে না।

আর স্থির থাকতে পারলেন না মার্কুইস। অভিনয় শেষ হল। ব্যাকুল হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রিজেল্‌ডাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠলেন, গ্রিজেল্‌ডা, গ্রিজেল্‌ডা, আমায় ক্ষমা কর। তোমার সঙ্গে এত দিন ছলনা করেছি। তুমি বিজয়িনী! আমি হেরে গেছি তোমার কাছে।

বিহ্বল কণ্ঠে গ্রিজেল্‌ডা বললে, কি বলছেন প্রভু! আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

শোন প্রিয়ে! আমার ধারণা ছিল, দুঃখে কষ্টে পড়লে, মেয়েদের স্বামীভক্তি বল, সহিষ্ণুতা বল কিছুই আর থাকে না। তাই তোমায় পরীক্ষা করে দেখছিলাম!

পরীক্ষা করছিলেন! এত দিন ধরে?

হ্যাঁ গো! তাই তো করছিলাম এই দীর্ঘ ষোল বছর ধরে। যে মেয়েটি আমার সঙ্গে এসেছে সে কে জানো? সে আমাদেরই মেয়ে। আর তোমার ছেলে, সে আছে বাইরে। যাও তাকে নিয়ে এসো। এবার আনন্দে সংসার কর। আর তোমায় কোথাও যেতে হবে না। এ সংসার তোমার! এ রাজ্য তোমার। আমি তোমার অনুগত স্বামী। যে শিক্ষা তুমি আমায় দিয়েছো তা আমার মর্মে চিরকাল গাঁথা থাকবে। তুমি মহিয়সী! তুমি অনন্যা।

ছেলেমেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। গ্রিজেল্‌ডা দু'জনকে বুকে চেপে ধরল। তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। দুঃসহ আবেগে কাঁপতে লাগল তার সর্বাঙ্গ।

আর, তারপর চারিদিকে আনন্দ-কোলাহলে মুখর হোয়ে উঠল। উৎসব চলল সারা রাত ধরে।

মাক্‌লা

সরিৎশেখর মজুমদার

ছেলেটার নাম মুকুন্দ। একটু বোকা বোকা বয়সের। বেশ বড় বয়সে লেখাপড়া শুরু করেও পিছিয়ে রয়েছে আর সব ছেলেদের তুলনায়। কোঁদে কুঁকিয়ে ঠেলে-ঠুলে এই সবে ক্লাস এইট-এ উঠলো। এদিকে—বয়স কতো?—না, মাষ্টার মশাইদের ভাষায় এইট্ টুন্‌টু টু, অর্থাৎ ষোলো। যাকে বলে, পালের গোদা। সভায় মুকুন্দ মাথা হেঁট করে থাকতো। সত্যি, সারা ক্লাসটায় বসে আছে বাচ্চা বাচ্চা দুধের ছেলে সব। কতো আর বয়স হবে ওদের? এগারো-বারো খুব জোর তেরো। ওদের মধ্যে সব চেয়ে যে-ছেলেটা লম্বা সে-ই মুকুন্দর কাঁধ বরাবর।

সবচেয়ে বয়সে বড়, সবচেয়ে ঢ্যাঙা—কিন্তু সব চেয়ে কম নম্বর পায় মুকুন্দ। অথচ চেষ্টা করে না তা নয়। সকাল-সন্ধ্যে দুবেলা ঠিক সময়ে বই নিয়ে বসে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দুলে দুলে ইতিহাস পড়ে, ভূগোল পড়ে—ক্লাসে যা-যা পড়া থাকে প্রত্যেকটি পড়ে নেয়। কিন্তু আশ্চর্য অভিশাপ মা-সরস্বতীর। মাষ্টারমশাই পড়া ধরলে কিছুই বলতে পারে না। হাত তালের 'ন' তাল তার ফাঁপা খুলিটার মধ্যে বাঁই বাঁই শব্দে ঘুরপাক খেয়ে ঘোলাটে হয়ে যায়, আর বাকি এক তাল ঠোঁটের কাছে এসে বিড়বিড় করে।

—কি বাবা মুকুন্দ! তাইনি মস্তর আওড়াচ্ছিস নাকি? চিবিয়ে চিবিয়ে মন্তব্য করতেন—রাখহরি মাষ্টার। হো হো শব্দে হেসে উঠতো সারা ক্লাস। মুকুন্দ ধপাস্ করে বসে পড়ে টেবিলে আঁচড় কাটতো, আর গলার-কাছে ঠেলে-আসা কান্নাটাকে টুঁটি টিপে মিচে মেরে দিতো ঘন ঘন ঢোঁক গিলে।

রাখহরিবাবু অঙ্কের মাষ্টার। বড় রুক্ষ নিষ্ঠুর লোক। ওঁর পিরিওড শুরু হবার আগেই মুকুন্দর বুকটা ধড়াস ধড়াস করতো। থার্ড পিরিওডের সমাপ্তি ঘোষণা করে রঘুনন্দন যখন লোহার হাতুড়ির তিনটে বাড়ি মারতো টং টং টং তখন সে-হাতুড়ি লোহা দিয়ে গড়তো মুকুন্দর পাঁজরায়। এইবার অঙ্কের ক্লাস। রাখহরি বিদ্যির আসবেন। কড়া খুরখুরে লোকটার কি ক্ষুরধার জিহ্বা। এক একটা টিপ্পনি ছুঁচের মত গিয়ে বিঁধবে বেচারা মুকুন্দর বুকে। খড়ি দিয়ে বোর্ডে একটা আঁক লিখে রাখহরি সারঙ্গের মত সবাইকার ওপর তীব্র দৃষ্টির সার্চলাইট ফেলতে ফেলতে শান্ত বেঞ্চে এক জায়গায় থমকে তাক ছাড়বেন—বাবা মুকুন্দ! ব্যস্, অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবে। ওকে যেতেই হবে বোর্ডের কাছে। তার আঙুলের মধ্যে সাদা চক, বাঁ হাতে ডাষ্টার, চোখের সামনে কতকগুলো অর্থহীন সংখ্যা আর ব্লাকবোর্ডের রসলিপ্ত মৃত্যুতা। অভ্যাসদোষে শুষ্ক ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যাবে বেচারার।

—হাঁ-করা মুকুন্দরায়! বাপ আমার।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে এক আচমকা গাঁট্টা। রাখহরি মাষ্টার তাঁর সবচেয়ে হৃদয়হীন আক্রমণ করে বসলেন একদিন এইভাবে:

—বাবড়া ছেলে! বয়স কতো হলো?

মুকুন্দ মুখ নীচু করেই ছিলো। ক্লাসের দু'চারটে ছেলে এ-কোন ও-কোন থেকে সমস্বরে জানালো—ষোলো স্যার, ষোলো।

—ষোলো! তা এদিকে কাজ গোছানো। বেশ, বেশ, বেশ···, বলে এগিয়ে গেলেন মুকুন্দর কাছে। তারপর ভ্রু কুঁচকে মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে বললেন: হুম্, যা ভেবেছি ঠিক, তাই। মংকুণ!

—সে আবার কি স্যার? সবচেয়ে চালাক চতুর ছেলেটা রাখহরি মাষ্টারকে উৎসাহিত করে তুললো।

—মংকুণ জানিস্ না মাকুন্দ, মাকুন্দ—যে পুরুষের গোঁফ দাড়ি হয় না!

হো-হো, হি-হি, খুক-খুক, খিল-খিল—নানা জনির দুষ্ট ও দীর্ঘ হাসি মিল চক্র হুতো-লাটিম মত অবিরাম ঘর্ষিত হতে লাগলো বেচারা মুকুন্দর লজ্জাবনত মাথাটার ওপর।

ক্লোর্থ পিরিওড শেষ হতে যা দেরী। তারপর ক্লাসের ছেলেদের সুরু হয়ে গেল ছড়া কাটা; মুকুন্দ মাকুন্দো, মুকুন্দ মংকুণ।

সত্যি মুকুন্দ মাকুন্দ। একদিন না একদিন একথা আপনা থেকেই লোকে জানতে পারতোই। যা-বলার বলতো লোকে তাই নিয়ে। কিন্তু রাখহরি মাষ্টারই প্রথম সে-আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করে ছাত্রমহলে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। আর, তিনচার বছর পরে যা-নিয়ে মুকুন্দর জীবন অতিষ্ঠ করতে পারতো সহপাঠিরা, তা ক্লাস এইট্-এই পেয়ে গেলো তারা।'

ক্লাসের পড়া জানবার দরকার হলে বেচারা মুকুন্দ বন্ধুদের বাড়ী সকালবেলা যেতে সাহস করতো না।

—ওরে, সকালবেলা মাকুন্দের মুখ দেখলে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়। মুকুন্দ ওদের বলতে শুনেছে অনেকবার। তাই ভয়ে ভয়ে যেতোনা কারুর বাড়ী। এমন কি ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে রাস্তায় বেরোতো না পর্যন্ত। সবার আগে ক্লাসে গেলে ছেলেরা ক্ষেপাবে, বলবে—এ-হে-হে, আজ দিনটা খারাপ যাবে, মাষ্টারের গাঁট্টা খাবো, ক্লাসে ঢুকেই মুকুন্দের মুখ দেখেছি!

পরীক্ষার সময় ত' কথাই নেই। সে যেন চোর। কার কি চুরি করে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। বোকা হাঁদা মুকুন্দ. আরো বোকা আরো হাঁদা হয়ে যেতে লাগলো দিন দিন। বাইরের জগৎ থেকে শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগলো খোলার চালের ঘুপসী ঘরের খোলের মধ্যে।

—তুই অমন ঝুনো ব্যাং হয়ে যাচ্ছিস কেন দিন দিন? যেগে গিয়ে মা তার প্রায়ই বলতেন একথা।

মুকুন্দ চুপ করে থাকতো।

হাড় বোইমের ছেলে মুকুন্দ। তার অনেকদিন মারা গেছে। তা, বছর দশ হলো। মা বুদ্ধিমতী মুড়ি ভাজে, বিক্রী করে, কোন রকমে সংসার চালায় মুকুন্দর পড়ার খরচ পর্যন্ত। সম্ভাবনার আকাশচুম্বী সৌধরচনা করে মায়ের মন, গরম খোলায় তাতাল বালির ওপর মুড়ির চালগুলোকে নাড়ে চাড়ে, ওলটায় পালটায় আর ভাবে: মুনু আমার বড় হবে, অনেক লেখাপড়া করবে, অনেক রোজগার করে আনবে। ফুলমণির মেয়ে রাধীকে আমার মুনুর বৌ করবো। তখন আর আমি এমন করে মুড়ি ভাজবো না।

সেই মুকু, মানে মুকুন্দ, একদিন কাঁদো কাঁদো স্বরে মাকে এসে বলো—মা! আমি আর স্কুলে যাবো না।

—সে কি কথা? কেনরে?

মুকুন্দর কথা শুনে একেবারে সাততলার সিঁড়ি থেকে যেন পা পিছলে গড়াতে গড়াতে নৈরাশ্যের সবচেয়ে নিচের ধাপে এসে ঠেকলো বৃন্দাবনী।

—ওরা আমায় যাতা বলে, ক্ষেপায় ···।

মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে অনেক কষ্টে মুকুন্দ আজ বললো সব কথা। এদিন সে সহ্য করেই ছিলো। কিন্তু আজ কে নাকি বলছে—মাকুন্দ ছেলে অলক্ষণে ছেলে, সেইজন্যেই হাফ বোর্ডিংএতো অল্প বয়সে মরে গেল!

বৃন্দাবনী মুকুন্দকে কোল থেকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো কোমর বেঁধে। তারপর তারস্বরে চীৎকার করে চতুর্দশ পুরুষকে গালাগালি দিয়ে বৃন্দাবনী ভবিষ্যদ্বাণী করলো, মুকুন্দকে যে একথা বলেছে তার বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না।

কিন্তু বৃন্দাবনী নিজেই থাকলো না বেশীদিন। মাকুন্দ ছেলে মানেই অলক্ষণে ছেলে, পাঁচজনকে এই কথা বলার আর এক রকম সুযোগ দিতে একবছরের মধ্যেই বৃন্দাবনী কালাজ্বরে মারা গেলো। চুকে গেল ইস্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক। চুকে গেল রাখহরি মাষ্টারের সেই "বাবা মৎকুণ" বলে নির্মম সম্বোধন করার সুযোগ। অসহায় হাবাগোবা মুকুন্দ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো আকাশের দিকে। আকাশটা যেন আর এক বিরাট ব্ল্যাকবোর্ড! ভগবান যেন আর এক রাখহরি মাষ্টার! এমন শক্ত অঙ্ক কেমন করে কষবে, ভেবেই পায় না বেচারা মা-হারা মুকুন্দ।

পৃথিবীটা যে অতো নিষ্ঠুর নয়, এই দুঃসময়ে মুকুন্দর এ-ধারণা বটের ঝুরির মত প্রলম্বিত রইলো একটি মাটির আশায়। সে মাটি রাধী। রাধী বড় ভালো মেয়ে। কাজের মেয়ে। কি দয়ামায়া তার। মা মারা যাওয়ায় কি দুর্দশা হয়েছিল মুকুন্দর, এ-খবর রাধী ছাড়া আর কেউ কি জানতো? ওদের সমাজের আর কে অমন করে খোঁজ নিয়েছিল তার? কেউ না। কোথায় চাল, কোথায় ডাল, কোথায় কি, এসব কোনদিন মুকুন্দ কি জেনেছে এর আগে, যে মা মরে গেছে বলে আজ জানবে সে? ঐ রাধী কৌচড়ে লুকিয়ে কোনদিন এনেছে মুড়ি, কোনদিন চিড়ে গুড়, আবার কোনদিন বা আঁচলে ঢেকে সামকিভরা ভাত তরকারি।

—নাও মুকুন্দদা! খেয়ে নাও। ছিঃ, বুড়ো বাড়ি ছেলের আবার অত কান্না কি? মুকুন্দ চোখ মুছে মিটিয়েছে পোড়া পেটের তাগিদ। আর কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হয়ে শুধু ডেকেছে রাধি!

এই পৃথিবীর আর একটি লোক এই সময়ে মুকুন্দকে সাহায্য করলেন তার হারানো আত্মবিশ্বাসকে ফিরেপেতে। তাঁর নাম দীনদয়াল অবন্তী। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। পিওনের চাকরী করে দিলেন মিউনিসিপ্যালিটিতে। হাজকে তিনি জানতেন অনেকদিন থেকে। বৃন্দাবনীকেও। তাদের ছেলে মুকুন্দ, বিপদে পড়েছে শুনে দয়া হলো তাঁর। ছমাস পরে পার্মানেন্টও হলো মুকুন্দ। এইসময় কথাটা পাড়লো সমাজের দু'একজন।

—নিতাই

—বলো।

—মুকুন্দ ত' চাকরী-বাকরী করছে। পার্মানেন্টও হলো। রাধীর বিয়েটা এবার·····

নিতাই গম্ভীর উত্তর দিল : দাঁড়াও ভাই, বিষয়টা ভেবে দেখার আছে।

যারা কথাটা পেড়েছিলো তারা চুপ করে গেল। ভেবে দেখার কি আছে! সকলেই জানে, হারু বোষ্টম আর নিতাই বোষ্টম এই দুই বন্ধুর মধ্যে অনেকদিনের কথা দেওয়া ছিল, এর ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে হবে। তাই, আগে থাকতেই বেয়াই পাতানো হয়েছিল দুজনে।

কথাটা মুকুন্দরও কানে এলো। কেমন ভয় পেলো শুনে। সেও ত' শুনেছে মাকে বলতে, রাধী ওর বৌ হবে। রাধী ছাড়া আর কে তার দুঃখ বুঝবে!

কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ বিষয়টার পূর্বচ্ছেদ টেনে দিলো রাধীর মা ফুলমনি।—ভাখো মুকুন্দ! তুমি বাপু আর আমার রাধীর পিছু পিছু ঘুরোনা। সকলেই বলছে, ভোরে উঠেই যোল যার মুখ দেখতে হবে সেই যখন 'অমন', তখন ও-বিয়ে আর দিয়ে দরকার নেই!

ফুলমনি আর যাই হোক অভদ্রতা করলনা। সোজাসুজি 'মাকুন্দ' না বলে 'অমন' শব্দটি ব্যবহার করা হোলো বোধহয় আঘাতটা হাল্কা করার চেষ্টায়। রাধী উঠোন থেকে সরে গেল। ফুলমনিও। মুকুন্দর পায়ের নিচে থেকে যেন পৃথিবীটাও সরে গেল। মুখখানা হাঁ করে বোকা-হাঁদার মত দাঁড়িয়ে রইলো মুকুন্দ, ঠিক যেমন থাকতো সে রাধাহরি মাষ্টারের ক্লাসে। এতক্ষণে বুঝতে পারলো বেচারা, নিতাইকাকা সেদিন বিষয়টা ভেবে দেখার কথা বলেছিলো কেন! মানুষের প্রতি তার ক্রমবর্ধিষ্ণু বিশ্বাসের ঝুরিটা মাটিতে পৌঁছেও পৌঁছতে পারলোনা। শুকিয়ে মরে শূন্যে ঝুলতে লাগলো, রাধীদের উঠোনে থেকে ছুটে পালিয়ে এসে আবার হাউ হাউ করে কাঁদলো মুকুন্দ মায়ের জন্য। আবার যেন স্কুলের সহপাঠিরা তাকে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরেছে, কেউ জামা ধরে টানছে, কেউ বা কাচা ধরে। আর ছড়া কাটছে মুকুন্দ মৎকুন! মুকুন্দ মৎকুণ।

মুকুন্দ কাঁদে আর ভাবে। প্রতিবছর সারা বৈশাখ মাস রাধীকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছি পুণ্যিপুকুরের ফুল তুলতে। চোখ মেলে আমারই মুখ দেখেছে সে কতোদিন। কই, তখন ত কোনো অমঙ্গল হয়নি! তবে কেন এসব কথা ওঠে?

এসব প্রশ্নের কেউ জবাব দিলনা। লজ্জায় ঘৃণায় এতটুকু হয়ে গেল মুকুন্দ। ধিক্কার এলো জীবনে। বিতৃষ্ণা জন্মালো এই শহরে, এই বস্তীতে। এখানকার মানুষে আর ধুলোমাটিতে। একদিন পালিয়েই গেল মুকুন্দ অমন পার্মানেন্ট চাকরীও মায়া কাটিয়ে।

কাটিহারের একটা জুট মিলে কোনরকমে আড়াইটা বছর কাটালো মজুর মুকুন্দ। দেশ ছেড়ে পালাবার মূলে ছিল তার সরল মনের ধারনা, অন্য দেশে কেউ তাকে চিনবে না, জানবেনা—অতএব কেউ তাকে নিয়ে করবেনা বিদ্রূপ। প্রথমটা তাই স্বস্তির শ্বাস ফেলেছিলো। মিশে গিয়েছিল কুলি-কাবারিদের সঙ্গে। কিন্তু এখানেও সেই একই অভিজ্ঞতার বেদনা পেল মুকুন্দ। আর কোথায় পালাবে বেচারা? তবে কি মনে যাবে? যে মনে মানুষ থাকেনা, থাকেনা রাধাহরি মাষ্টার আর নিতাইকাকার মত লোকেরা?

মনকষ্টে মুখ লুকিয়ে থাকতে থাকতে একদিন সত্যি সত্যি মনজগলের নিমন্ত্রণ পেলো। বসেছিল চায়ের দোকানে। দুটো ডেলেডাজা আর এক ভাঁড় চা নিয়ে। পাশে এসে বসে গরম পুরি আর আলুর দমের অর্ডার দিল একজন। নাম মঙ্গল। আলাপ জমে গেল খুব। করেই অফিসারের আর্দালী মঙ্গল। সাহেবের সঙ্গে এখানে এসেছে। আজই ফিরে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা একেবারে মরিয়া হয়ে চলে গেল মুকুন্দ কাটিহার ইস্টিশনের ওয়েটিং রুমে। হাতে ছোট পুঁটলি।

—মঙ্গল! আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো।

—সে কি? সে যে বন-জঙ্গলের দেশ। সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে?

—না ভাই, আমি যাবো। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় নিয়ে চলো। আমি ভাত্তা দোবো। তোমার সাহেবকে বলো, আমায় সঙ্গে নিতে।

সেকি কাকুতি-মিনতি তার। মঙ্গল মুস্কিলে পড়ে গেল। মায়াও হচ্ছে লোকটার ওপর। আশ্চর্য আকুলতা এক অচিন মুলো দেশের জন্য। বিস্ময়ের সীমা নেই মঙ্গলের। মুকুন্দও নাছোড়বান্দা! শেষপর্যন্ত সে তাকে সাহেবের কাছে এনে হাজির করলো।

মঙ্গলের সাহেব তপোবন মিশ্রকে দেখে ভয়ে শুকিয়ে গেল মুকুন্দর বুক। অশ্বত্থের গুঁড়ির মত বিরাট বড় দেহ। পুরু গোঁফ-জোড়া ক্রুদ্ধ বৃশ্চিকের দুটো শুঁড় যেন। ঘুমোচ্ছেন। নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ইজিচেয়ারের ডান হাতলে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম্ভে একটা পোষমানা বনটিয়া।

—হুজুর! একটু দূর থেকে ডাকলো মঙ্গল।

ভয়ে আর একবার দুরদুর করে উঠলো মুকুন্দর বুক। ঘুমন্ত অবস্থাতেই কোলের কাছে রাইফেল আঁকড়ে রয়েছেন ভদ্রলোক।

—কি মঙ্গল!

বাঃ, আশ্চর্য মিষ্টি স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর ত! অবাক হয়ে গেল মুকুন্দ।

—এই লোকটির সঙ্গে আজ আমার আলাপ হয়েছে এখানে। বড় ধরেছে আমাকে, আমাদের সঙ্গে যাবে। ওখানে চাকরী করবে, থাকবে।

তপোবন মিশ্র চোখ মেলে চাইলেন। আপাদমস্তক দেখলেন মুকুন্দকে।

—তোমার নাম?

নাম জানালো সে।

—তোমার আত্মীয়স্বজন কোথায় থাকেন?

—কেউ নেই হুজুর।

—কেউ নেই? প্রশ্নটার পরতে পরতে স্নেহ। মুকুন্দ ভিজে গেল।

—বেশ মঙ্গল, ওকে নিয়ে চলো সঙ্গে।

বেচপ খাঁকি প্যান্টের পকেট নামক গভীর গহ্বরে হাত ডুবিয়ে মনিব্যাগ বার করলেন তপোবন মিশ্র।

—মঙ্গল! ওর একটা টিকিট কেটে আনো।

কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে পড়লো মুকুন্দ, কি করবে সে? তপোবন মিশ্রের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে? না মঙ্গলের পায়ে? ধপাস্ করে মাটিতে বসে পড়ে মুকুন্দ পুঁটলির গিঁট খুলতে লাগলো।

—হুজুর। ভাড়াটা আমিই দি।

মিশ্র একবার আড়চোখে তাকালেন।

—ভাড়াটা আমিই দিলাম মুকুন্দ। যাও, মঙ্গলের সঙ্গে এক গাড়ীতে বোসো।

উঁচু জমিটা বেড়ের দক্ষিণে গোকমারা স্যাংচুয়ারি। তপোবন মিশ্র এখানকার অফিসার। বনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যাকে বলে, অরণ্যপাল। অনেক বন পেরিয়ে মিশ্র, মঙ্গল আর মুকুন্দ যখন এসে পৌঁছলো, তখন চারিদিকে ঘেরে আসছে অন্ধকার। কেমন গা ছমছম্ করছে মুকুন্দর। তবু ভালো লাগছে, মঙ্গলের গা ঘেঁসে বসে ও। কেন ভালো লাগছে জানে না। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে, পুরু খাকি জামাটা খুলে ফেলে দিয়ে অনাবৃত বোমশ দেহখানা ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিয়েছেন তপোবন মিশ্র। একটু দূরে টেবিলে লণ্ঠন জ্বলছে। কয়েকজন এসে নমস্কার করে দাঁড়িয়েছে মিশ্রের কাছে।

—কি মুকুন্দ! ভয় লাগছে?

হারিকেনের পলতে উস্কে দিতে দিতে প্রশ্ন করলো মঙ্গল। একটা গর্বের গমক ওর গলার স্বরে। অরণ্যজীবনের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার গর্ব।

—না, না, ভয় কেন! বড়ো চড়ে বসে জবাব দিল মুকুন্দ। খিদে পেয়েছে বেচারার।—মঙ্গল ভাই! চলো, কিছু খাবার· ···

—হো হো করে হেসে উঠলো মঙ্গল। এই তোমার কাটিহারের বাজার যে ছুটে গিয়ে খাবার কিনে আনবে? সুখনলাল আমাদের জন্য রাঁধছে। বসো একটু।

ঠিক কথা। মুকুন্দ জড়সড় হয়ে বসলো। মঙ্গল টেনেটুনে টুকরো কাপড় জোড়া দিয়ে বিছানাটা বাড়ালো। কাজ এগিয়ে রাখা আর কি! একটু মশারীর নীচে এক বিছানায় শোবে আজ দুজনে।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে রেষ্ট হাউসের চারপাশে। মুকুন্দ শুয়ে শুয়ে দেখতে পাচ্ছে দরজার সার্সির ওপর নেই আগুনের আভা।

—আগুন জ্বলছে কেন ভাই মঙ্গল?

—বাঘ সিংহ যাতে এদিক ওদিকে না আসে তাই। নির্লিপ্ত উত্তর মঙ্গলের ঘুমঘুম কণ্ঠস্বরে। মুকুন্দর বুকটা ধড়াস করে উঠলো। বাঘ সিংহ!

কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকলো মুকুন্দ।

—মঙ্গল ভাই।

—হুম্।

—তোমাদের এখানে কি করতে হয়?

এর উত্তর আর এলো না। এইবার, বোধ হয় এইবার উত্তর আসবে এই অপেক্ষায় রইলো। মুকুন্দ অনেকক্ষণ। মঙ্গল ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘন পুরু ঘুমের ভাঁজ তার বোধে। গাঢ় আরামের শব্দ তার ভারী নিঃশ্বাসে। উপুড় হয়ে কনুইয়ে মুখ লুকিয়ে একাই জেগে রইলো বেচারা। তারপর এলোমেলো অজস্র কথা মনের সঙ্গে। এরা এখানে কি করে? এই বনে? এদেরও কি কেউ নেই? আমি না হয় এসেছি এক জ্বালায়, কিন্তু এরা? কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই মঙ্গল আবার রাঘবরি মাষ্টারের মত তাকে আবিষ্কার করে বসবে না ত! তখন?

চমকে উঠলো বনের মধ্যে। তারপরই আর এক শব্দ: আঁক—আঁক—কা-আঁক-আঁক··· খিস্রী একটানা এক অপরিচিত কর্কশ ধ্বনি বাইরের বনভূমিতে ছড়িয়ে শেষে আছড়ে পড়লো আগুন-রাঙা কাটা সার্সির ওপর।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলো মুকুন্দ।

কয়েকজন ফরেষ্ট গার্ড, বীট্ অফিসার, রেঞ্জ অফিসার আর মাহুত,—নিভৃত অরণ্যের এরাই কয়েকজন মাত্র মানুষ বাসিন্দা। এদের সকলের সঙ্গেই পরিচয় হয়ে গেছে মুকুন্দর। বেশ লেগেছে। এ-যেন এক একান্নবর্তী পরিবার। কর্তা তপোধন মিশ্র আশ্চর্য নরম মন লোকটার।

—কোথায় বাড়ী এঁদের? একদিন বীট অফিসারের সঙ্গে আলাপ করতে জিজ্ঞেস করেছিলো মুকুন্দ।

—বিহারে, ছাপরাজ জেলায়।

—এঁ্যা উনি বাঙালী নন?

—না।

—কি সুন্দর বাঙলা বলেন যে!

—শুধু বলেন? সুন্দর কবিতা লেখেন বাঙলায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা এঁরা কণ্ঠস্থ। বাঙলা ভাষার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। বলেন, যে-ভাষা পাখীর নাম দেয় 'বৌ-কথা-কও,' 'চোখ গেল'—সে-ভাষা শিখবো না!

শেষের কথাগুলের গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি মুকুন্দ। তবে 'ক্লাস-এইট-এর বাঙলা বইয়ে রবীন্দ্রনাথের যে-কবিতাটি ছিল, সেটাও হয়তো তপোধন মিশ্রের জানা আছে এই ভেবে শ্রদ্ধাপ্লুত হয়েছিল সে।

একদিকে মহানদী। অন্য দিকে তোর্সা। উত্তরে শাল সমাহিত তরাগড়ের মত ফুটান রাজ্যের পর্বতমালা। এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সরকারী বনবিভাগ। তারই একাংশে আংচুয়ারী। গভীর অরণ্যের ঘাড়ালে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। নিজেদের মনের মত পরিবেশে বাড়ছে বুনো সংসার। একপাশে রেঞ্জহাউস। তারই আশ-পাশে পাল কাঠের গুটি কয়েক বাড়ী। গাছ, গাছ আর গাছ। কত রকমের, কত জাতের। শাল সেগুন, বাবলা জারুল, পুতি, কাশ, হোগলা উলুর ঝোপ। এতো কি ছাই জানতো মুকুন্দ! না, শুনেছে এর আগে! তেমনি বটে পাখীর ভিড়। কত যে, তার ইয়ত্তা নেই। ছোট বড় মাঝারি; রঙের বেগনে লাল কালো সবুজ নীল ছেন রং নেই যা নিয়ে পাখীর পালকে মাখামাখি প্রকৃতি। মঙ্গল এক নিঃশ্বাসে বলে যায় তাদের নাম। এক একটা পাখীর ডাক যেমন মিষ্টি তেমনি কমন। মোচড় দিয়ে ওঠে মুকুন্দর বুকের ভেতর! কে যেন তার বুকের হাড় কখানা কি-এক বিচিত্র রসে জারিয়ে ভিজিয়ে হঠাৎ নিংড়াতে সুরু করে তখন।

রাত্রিবেলা সেদিনও পাশাপাশি শুয়ে কথা হচ্ছিল মঙ্গলে আর মুকুন্দে।

—আজ ঐ তোমার উঁচু মতটায় উঠেছিলাম মঙ্গল। যেখান থেকে তোমরা বুনো জন্তুদের তাখো···

—কি দেখলে?

—কই তেমন ত' কিছু নজরে পড়লো না!

—সে কি? গণ্ডার, ভাল্লুক সম্বর, বুনো মোষ কিছু না?

এক সঙ্গে অতগুলো জন্তুর নাম মুকুন্দর হাত কাঁপিয়ে দিল যেন।

—হাতি?

এবারও 'না' বললো মুকুন্দ।

—হুম্, তোমার চোখ নেই। কাল আমার সঙ্গে উঠো ঐ মতে, অনেক জন্তু দেখিয়ে দেবো। গণ্ডার, প্যান্থার, বাইসন, বুনো মোষ, ভাল্লুক, সম্বর আরও কতো। কিছুদিন থাকো ওখানে, এখানে বসেই হাতি দেখতে পাবে।

—কেমন করে ?

—কেমন করে আবার ! এখানে ঢুকে পড়ে তাণ্ডবলীলা শুরু করে দেবে ওরা। সে-এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। শেষ পর্য্যন্ত বন্দুকের আওয়াজ করতে হবে। ফাঁকা আওয়াজ। তখন পালাবে।

মুকুন্দ অবাক হয়ে যায়। এই যে খাল কাটা হয়েছে—এরা বাধা দুপায়ে মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বে ওরা ! সর্ব্বনাশ ! সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা কল্পনা করে রীতিমত ঘাবড়ে উঠলো মুকুন্দ। একেবারে চুপ মেরে পাশ ফিরে শুলো।

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল হৈ-হল্লায়। কিসের হল্লা প্রথমটা ভাবারও চেষ্টা করেনি মুকুন্দ। ভারি মিষ্টি স্বপ্ন দেখছিলো সে এতক্ষণ। রাধীর স্বপ্ন। গভীররাত্রে এই শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি অতিক্রম করে সে চুপি চুপি পালিয়ে গিয়েছিল তার বৈশোরের খেলাঘরে। গিয়েছিল পা টিপে টিপে সোজা রাধীর ঘরে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে রাধী। কি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে ! মুগ্ধ হয়ে গেছে মুকুন্দ। কেমন বড়সন্ত পরিপূর্ণ তনু। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে মুকুন্দ, এমন সময় কোলাহল উঠলো। মিষ্টি স্বপ্নে নিষ্ঠুর ছেদ পড়ে গেল তার। তবে কি জেগে গেলো নিতাইকাকা ? জেগে গেলো রাধীর মা ফুলমণি ? হল্লা করে কেন ওরা ? তবে কি তেড়ে আসছে ওরা সকলে মুকুন্দকে মারবে বলে ? অমনক্ষণে মুকুন্দকে কি তারা ধেয়ে তাড়াবে বলে ছুটে আসছে লাঠি নিয়ে ?

……চপ্ চপ্ চপো চপো……চপ চপ্ চপোচপো আওয়াজ হচ্ছে ভীষণ। চোখ রগ্‌ড়ে চেয়ে দেখে মুকুন্দ। মঙ্গল পাশে নেই। কোথায় গেল সে ? ভয়ে ছুটে বাইরে এসে দাঁড়ালো মুকুন্দ।

লাঠি সড়কি নিয়ে জেগে উঠেছে আদিবাসী। কাকে যেন তাড়াচ্ছে সকলে ? হা-হা ··হিও-হিও ···হা-হা-হা · । বিচিত্র ধ্বনি সকলের কণ্ঠে। ক্যানেস্তারা পিটছে একজন।

—মঙ্গল ! ও ম-ং-গো-ল !

—এই যে এদিকে। চলে এসো, এ-দি-কে।

ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো মুকুন্দ। বাঘ এলো ? না ভালুক ? না সম্বর ?

—কি হয়েছে মঙ্গল ?

—মাক্না, মাক্না এসেছে। ঐ যে—

চোখ কালা-কালা করে তাকিয়ে দেখে মুকুন্দ, একটা হাতি। রেইহাউসের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওদিককার ঘুঁটে বাঁধা গোবা হাতি বন্ধারাণীর দিকে তেড়ে-ফুড়ে এগোচ্ছে সে। কোনো বাধা মানছে না। সামনের সব কিছু মাড়িয়ে দুমড়ে মেঁৎলে একাকার করে চলেছে হাতি। চপো চপো খ্যান্ খ্যান্ কোনো শব্দেই কানে যাচ্ছেনা তার। ভ্রুক্ষেপই নেই। যাবেই সে বন্ধারাণীর কাছে। অনেক ব্যর্থকাম বসন্তের উপবাসে জরজর দেহ তার।

চেঁচাচ্ছে সুখনলাল, ঢোলের মত কি বাজাচ্ছে ভাওরা ওরাং, ক্যানেস্তারা পিটছে মঙ্গল। একপাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তপোবন মিশ্র। কে যেন জোরালো টর্চ ফেলছে মাক্নার গায়ে।

বন্ধারাণী অচঞ্চল। যৌবনমদগর্বিতা কামিনীর গ্রীবাভঙ্গীর মত মৃদু মৃদু দুলছে তার শুঁড়। —এই সব সরে যাও— হুঙ্কার ছাড়লেন তপোবন মিশ্র।

—গুলি হবেনা ! বলে, রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন। পরক্ষণেই বনভূমি কেঁপে উঠলো রাইফেলের গর্জনে। ডানা-ঝাপটা দিয়ে কলরব করে উঠলো হাজার হাজার পাখী। থমকে দাঁড়ালো মাক্না।

আরও দুটো কাঁকা আওয়াজ। তীব্র কর্কশ। দু'পা এগিয়েও আর সাহস হলোনা। বাধা হয়ে ফিরে দাঁড়ালো মাক্‌না। রাগে ফুলে ফুলে উঠলো। নাগালের মধ্যে যে মস্ত ডালটা ছিল শুঁড় দিয়ে জাপটে মড়মড় শব্দে তাকে টেনে ফেললো মাটিতে। আছড়ে ভাঙ্গিতে লাগলো ডালটা। তার অভিশাপে বাধা দেয় যারা, তছনছ করে রেখে মাক্‌না তাদের সব কিছু। এতো রাগ!

বনতল কাঁপিয়ে আবার শব্দ তুললো তপোবন বিজ্ঞের হাইফেন। এবার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই হেলেদুলে ফেরার পথ ধরলো মাক্‌না হাতী। একবার ঘুরে দেখে নিলো নিষ্ঠুর মানুষগুলোকে। যেন অভিশাপ দিতে দিতে মিলিয়ে গেল অরণ্যে।

সবাই তখন ফিরলো।

– এসো, ওটপে। মুকুন্দকে ডাকলো মঙ্গল। ভয়ে জুবুথুবু হয়ে পিছু পিছু ফিরলো সে। মুখে কথা সরেনা বেচারার।

—শালা মাক্‌না! প্রায়ই বিরক্ত করবে এইরকম। বাহাদুরীর ওপর আচ্ছা মোহ ওর। গজ্‌গজ্‌ করছিলো মঙ্গল। মুকুন্দ কিন্তু হতবাক।

বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করলো মুকুন্দ। তাহলে সত্যি সত্যি নিতাইকাকা বাধা দিতে ছুটে আসেনি তার অভিসারে। ওই কোলাহল মাক্‌না হাতীর অভিসারের বিরুদ্ধে! কিন্তু কেন?

—মঙ্গল ভাই!

—কি?

—মাক্‌না মানে কি?

—মাক্‌না জানিস না?

—না তো।

—আরে, মাক্‌না মানে যে-হাতীর দাঁত থাকেনা। দেখনি না লক্ষ্য করে?

মুকুন্দ চুপ করেই শুনছিলো। মঙ্গল একটা বিড়ি ধরিয়ে লম্বা মৌজ টান দিয়ে আরও ব্যাখ্যা সুরু করলো—

এ বনে দাতটা হাতী আছে। সাতটাই একসঙ্গে থাকে। এ-ব্যাটার দাঁত নেই, সেইজন্যে ওরা একে দলে মিশতে দেয়না।

এঁ্যা-আঁ। কেমন একটা বিশ্রী কান্নাকরুণ শব্দ করে বলে উঠলো মুকুন্দ, মিশতে দেয়না? মঙ্গল কানও দিলেনা সেই বিলাপধ্বনিতে। তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে যেতে লাগলো—না, মিশতে দেয়না। মাক্‌না আর করে কি। অগত্যা মাঝে মাঝে ছুটে আসে ঐ বস্তীবাসীর টানে। ঢুকে পড়ে কম্পাউণ্ডে। জ্বালাতন করে আমাদের……।

মাক্‌না। মানে, যে-হাতীর দাঁত থাকেনা। যে-হাতী একা একা থাকে। যে হাতীকে অন্য হাতীরা দলে মিশতে দেয়না। মঙ্গলের কথাগুলো হাতুড়ি পেটাতে লাগলো মুকুন্দের পাঁজরায়।

বিষয়টা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। এতো পরিষ্কার যে সারারাত ধরে টস্‌টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়লো মুকুন্দর দুগাল বেয়ে।

———

এই প্রথম

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সবত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সাহিত্যে স্থান পাবেন তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে দেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

সম্পাদক গল্পভারতী

রক্ত-সন্ধ্যা

—শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলামনা। তাই জানি না যে, ব্যাপারটা নিয়ে কোন কেস-টেস হ'ল কিনা।

• • •

ছোট্ট সংসার। মা, বাবা, আর কৈশোরে পরিণত ছেলে রঞ্জিৎ। বছর ষোল বয়স। তারই পাশে ১০।১২ মাইল দূরে থাকেন শ্রীনীহারকান্তি রায়। তিনি বিয়ে-থা করেন নি। নানা-জায়গায় যান কাজের জন্য।

• • •

হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা হয়ে গেল। বাবা ঠিক করেছেন সিল্কী কলেজে ভর্ত্তি করবেন। তাই যান মাঝে মাঝে ওখানে যোগাযোগ করে রাখেন বিশিষ্ট প্রফেসরদের সঙ্গে। গেছিলেন সেদিনও।

জায়গাটার নাম নাকি 'মাঞ্জা'। বাবা ফিরে আসছেন বাসে করে। ক্যা-চ্-চ্·· থেমে গেল বাসটা। সামনে কোনও স্টপেজ নেই। সামনে যাচ্ছিল একটা লরী আর তারও আগে একটা "রাজদূত"। দূতের মতই চলেছিল তাড়াতাড়ি কিন্তু একটা খবর নিয়ে ঘটর সাইকেলটা। বিরাট লরী আসছে একটা ওদিক থেকে। সরু রাস্তা। রাজদূতের সওয়ারী নীহারবাবু। পাশ কাটবার জন্য সরে গেলেন রাস্তা থেকে। হাতে হাটের থলি নিয়ে ভদ্রমহিলাটি যাচ্ছিলেন। তাঁর ওপর পড়ে গেল "রাজদূত"। বোধ হয় শেষ খবর

নিয়েই 'রাজদূত' আসছিল এত তাড়াতাড়ি। ভদ্রমহিলাটি চলে গেলেন সেই লোকে—যে পুণ্য-লোকের ঠিকানা পাওয়া যায় না।

জমে গেল মুহূর্তে অগুনতি লোক। কার দোষ বুঝল না তারা। বেদম প্রহার দিয়ে নির্দোষ, নিরুপায় নীহারবাবুকে মেরে ফেলে।

'রাজদূত' মটর সাইকেল বাঁচাতে পারলো না তার প্রভুকে, বাঁচাবার সুযোগ পেলনা সে নিজেও। আর, আর বাঁচলেন না সেই ভদ্রমহিলাও। তখন সমবেত লোকে নীহারকান্তি রায়কে ফেলে দিল পাশের ঝোঁপে, আর রক্তে ভেজা জামাগুলো চাপিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলাকে রেখে দিলো রাস্তার ধারে মটরসাইকেলটার পাশে।

তারপর ?···জিজ্ঞেস করলো মলয়। বললাম, প্রথম থেকেই বলি, শোন। বলতে লাগলাম—

সিল্লীর দাহা পরিবারের ছেলে রঞ্জিৎ। বাবা শ্রীসুশীল কুমার দাহা। তার ১০।১২ মাইল দূরে থাকতেন নীহারবাবু।

রঞ্জিতের মা প্রণতি দেবী। রঞ্জিৎ বাড়ির একমাত্র ছেলে। আদর প্রচণ্ড। যখন-ই কিছুর বায়না ধরত তখন-ই তাকে সেটা করে দিতেই হ'ত। মাঝে মাঝে আব্দার করে জ্বালাতন করতো ওর মাকে। মা সবই সহ্য করতেন হাসিমুখে। কিন্তু এখন আর সে মাকে জ্বালাতন করেনা। সে বড় হয়েছে। ওর মা বলেন সেদিনের রঞ্জু আজ কত বড় হয়েছে। সত্যিই সে এখন ইয়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিচ্ছে। সে কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করে। বাবা-মা থাকেন সিল্লীতে। পড়াশোনায় ভালই রঞ্জিৎ। পড়ে পড়ে শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে। মাকে বলেছে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলে বোর্ডিং খরচা বাঁচিয়ে একটা শাড়ী কিনে আনবে তাঁর জন্য।

কাল পদার্থ-বিদ্যা। সে একবার করে তাপ-আলোক-এর খণ্ডগুলো দেখে নিচ্ছে। পরের দিন বেরিয়ে মা-বাবাকে মনে মনে স্মরণ করে আর ঠাকুরকে প্রণাম করে লিখে এলো। বুকল ভালই হয়েছে। এখনি পরীক্ষার সব কটা দিন শেষ হ'ল। শেষ দিনে সে বিকেলের ট্রেনে এল ধানবাদ। তারপর সিল্লী।

• • •

পরীক্ষার ফল বেরুবার কথা বেরুল কাগজে। চলে এল কলকাতা। এসেই খুলে গেল। গিয়ে জিজ্ঞেস করলো একটু দেখুন না, রোল নং—ক্যাল, (এস, সি) ২৭৯। উত্তর এল। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ঐ রোল নম্বরে ছেলেটি। এখন রঞ্জিতের আনন্দ দেখে কে? ফিরে এলো বোর্ডিংএ আর তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাজারে। মায়ের জন্য ভাল দেখে একটা শাড়ী কিনে আনল। তারপরে ফিরে এল হোস্টেলে। সেখানে এখন বিস্তর কাজ। বিছানা-পত্র বাঁধতে হবে। নিয়ে যেতে হবে সিল্লীতে। তারপর ভর্তি হবার বন্দোবস্ত করবে কোথাও। এবার বিদায়ের পালা। প্রত্যেক বন্ধুই পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে লাগলো। জীবনে কোনদিন দেখা হবে কিনা কে জানে?

যাক্! মনটা খারাপ লাগছিল। তবুও বেরিয়ে পড়লো রঞ্জিৎ। সকালের গাড়ীতে বেশ আনন্দেই আসছিল সে। বেলা দশটা। ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, হাতে একটা শাড়ীর প্যাকেট আর বাক্স-প্যাটরা। হঠাৎ সে কান্নার রোল শুনতে পেল ঘরের মধ্যে। কিন্তু কেন? কি জন্যে?? কোন প্রশ্নেরই জবাব পেলনা, সে কিন্তু তার জবাব রাখা ছিল অন্তপুরে। ঘরে ঢুকেই দেখল কাটা হাত আর পা সমেত তার মা শুয়ে আছেন। পায়ে রয়েছে রক্তের আলতা। দুধে-আলতা যেখানো রঙ—রক্তে-রাঙা হয়ে গেছে। কপালে সিঁদুর।

সে চেঁচিয়ে উঠলো—মা! মা!! কোন সাড়া নেই। তার আশা ছিল জেগে উঠবেন। কিন্তু না। এতক্ষণে বুঝতে পেরে ডুকরে কেঁদে ওঠে রঞ্জিৎ। তার মায়ের আদরের রঞ্জু। বলে উঠল—মা—মা—ওমা! কিন্তু চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা খান্ খান্ করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। মনে পড়ল আগেকার কথা। তাকে কেউ চুপ করাতে পারলো না। এমন কি তার বাবাও পারলেন না। তার মন কিছুতেই হাল্কা হ'ল না। তার কান্না বাঁধ মানল না কিছুতেই।

কয়েকদিন পরে সমস্ত ঘটনাটাই শুনল সে। কিন্তু শুনেই বা সে কি করবে। তার মা, যাঁর কাছে তার যত আবদার-আব্দার, তাঁকে তো আর বাঁচাতে পারবে না।

সে যে হায়ার সেকেণ্ডারীতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে আর, আর যে শাড়ীটা আনবে বলেছিলো এনেছে তা তো তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

মলয়কে এই ঘটনা বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল আমারও। দেখলাম ওর চোখও বাষ্পাকুল।

• • •

এখন যদি কেউ 'মাওধার' কাছাকাছি গিয়ে এই ঘটনাটার ব্যাপার কাউকে জিজ্ঞেস করে তবে সে দেখিয়ে দেবে এই দুর্ঘটনার নিদর্শন সেই 'রাজদূত'কে। একটা ভাঙ্গা পা নিয়ে পড়ে আছে। যদি কেউ পারে তো তাকে যেন সারিয়ে তুলবার চেষ্টা করে।

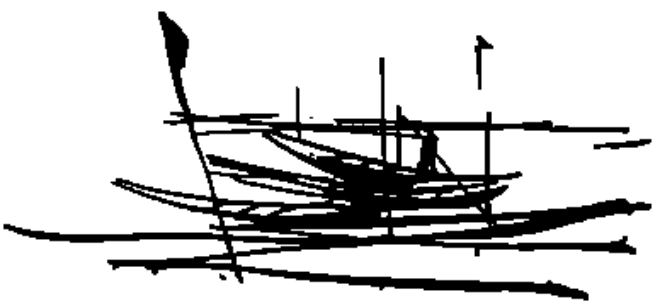

পুরোনো দিনের কথা

হেমন্তবালা দেবীচৌধুরাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম দিন তাঁকে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' হল-এ আমার কেদারায় অর্ধশায়িত ভাবে প্রথম দেখলাম। লাল সাটিনের তাকিয়ার উপর তাঁর চরণদ্বয় ন্যস্ত ছিল এবং একটি টিপয়ের উপরে রাখা কয়েকখানি নূতন প্রকাশিত বই (সমালোচনার জন্য প্রেরিত) দেখতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে বলেছিলেন যে এই ধরণের অজস্র পুস্তক তাঁর কাছে আসে এবং সমস্তগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখে ওঠা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে। কয়েকখানি পুস্তকের দিকে আমি অন্যমনস্কভাবেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলাম, তিনি এইগুলি আমাকে দিতে চেয়েছিলেন আমি তা নিতে অসম্মত হয়েছিলাম, কেন না, আমার মনে হয়েছিল যাঁরা তাঁকে এইগুলি সশ্রদ্ধ উপহার রূপে অর্পণ করেছেন, আমি নিলে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হবে না, আমি কেন তাঁদের ইচ্ছার বাধা স্বরূপ হই? সেদিন তিনি আমার পড়াশুনার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। কতটুকু পড়েছি, তাই কি আমি জানি? যা পড়েছিলাম তাও তো ভুলে গিয়েছি। আমার পুত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হোল। চার বৎসর পূর্বে আমার পুত্র একদিন আমার জ্যাঠতুতো 'বড় দা' কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে কবি সম্বর্ধনে জোড়াসাঁকোয় এসেছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হোলো। আমার ভ্রাতা শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং বিপ্লবী ৺বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কথাও উঠলো। স্বদেশী আন্দোলনের কথা, পুলিশের সন্দেহের কথা, শান্তি নিকেতনের প্রতি সরকারের মনোভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কথা হোলো। রাখী বন্ধনের কথা হোলো। জল আহ্নিকের কথা উঠলে কবি বললেন, আমিও জল করি। তারপর অতি বিশুদ্ধ দেবভাষায় সংস্কৃত বেদমন্ত্র এমন চমৎকার ভাবে আবৃত্তি করলেন যে আমি চমৎকৃত হোলাম কিন্তু মনে মনে ভাবলাম যে ইনি যদি জপই করেন তবে অচলায়তনের মন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে লিখলেন কেন? তখন বুঝিনি, এখন বুঝতে পারি যে তিনি পৌরাণিক তান্ত্রিক রহস্যানুষ্ঠানগুলির পক্ষপাতী ছিলেন না, তৎসম্বন্ধীয় শাব্দেতিক শব্দ বা মন্ত্রগুলির সম্বন্ধেই তাঁর যা কিছু আপত্তি, কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনাত্মক মন্ত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যথেষ্টই ছিল। সেদিন আর কি কি কথা হয়েছিল, আমার মনে নাই।

আরেকদিন—আমি প্রণাম করলে তিনি "আমিও প্রণাম করি" বলে প্রতি প্রণাম জানিয়ে হাত জোড় করায় আমি কাতর ভাবে বাধা দিলে তিনি বলেছিলেন তিনি কারো প্রণাম গ্রহণ করেন না, সমস্ত প্রণাম শ্রীভগবানকে নিবেদন করে দেন। অবশ্য পরে স্বাভাবিকভাবেই প্রণাম গ্রহণ করেছেন।... অন্য একদিন তাঁর জন্মতী সভায় যাবার প্রাক্কালে আমি মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম যে সভায় বহুলোকের ভিড় হয়ে থাকে, তার মধ্যে সকলেই যে অনুকূল পক্ষ, তা' নাও হতে পারে। একটা বিপক্ষ দল, একদল কৌতূহলী

একদল অতি সাধারণ মানুষ, এরাও থাকে সুতরাং বিশুদ্ধ অনুগত শ্রেণীর একটা বৈঠক এবং একটি বৃহৎ জনসভার মধ্যে পার্থক্য আছে। এরূপ অবস্থায় জনসভার অভিনন্দনকে অকৃত্রিম অভিনন্দন বলে মনে করা যায় কি? সুতরাং জনসভার উদ্যোগ করে লাভ কি? এরূপ সভা সমিতিকে তিনি প্রশ্রয় দেন কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, এটা সমিতিরই দোষ। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এই যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন, সুতরাং এর ভালোমন্দ উভয় প্রকার ফলই ভোগ করতে বাধ্য হয়েছেন। সভায় অনেক বিপক্ষদল থাকলেও আবার অনুকূল দলও তো অনেক আছেন। আমি তথাপি এরূপ বাহাদুরির যে অকৃত্রিম নয় তাই বলতে চেষ্টা করেছিলাম। তিনি সে কথা অস্বীকার করেন নি, কিন্তু এই পরিস্থিতিকেই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আর একদিন "নটির পূজার" অভিনয় কালে তিনি অগ্নিবর্ণ উষ্ণীষ, রৌদ্রবর্ণ পোষাকে ভিক্ষু উপালির বেশে সজ্জিত হয়েছিলেন। আমি অভিনয় দেখিনি তখন আমি প্রকাশ্য স্থানে যেতাম না।

আর একদিন জোড়াসাঁকোয় "শাপমোচনের" রিহার্সাল হয়, শ্রীযুক্তা মীরা দেবী উপরের বারান্দা থেকে আমাকে তা' দেখিয়েছিলেন। একদিন শ্রীমতী হৈমন্তী দেবী আমাকে বলেছিলেন আমি যেন লোকের মুখে শান্তিনিকেতনের নিন্দা শুনে বিশ্বাস না করি। তাঁকে খালি পায়ে চলাফেরা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এতে তাঁর অসুবিধা হয় কি না। বলেছিলেন প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হলেও এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। হৈমন্তী দেবীর পিত্রালয় ডেনমার্ক আমাদের দেশের মধ্যে কোনটি তাঁর ভালো লাগে এই প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন দুই জায়গাই তাঁর ভালো লাগে, দুইটি দুই প্রকার। টিগার সাহেবের বীণা সহযোগে নৃত্য অতি অপূর্ব ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। তেমন নৃত্য আর দেখিনি।

একবার বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে চার আনার টিকিট বিক্রী হচ্ছিল, আমি তখন কুড়ি টাকা দিয়েছিলাম, সে টাকা তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন আমি তাঁর নিকটের লোক, আমার দান তিনি নিতে পারবেন না। তারপর বললেন, স্ত্রীলোকের দান গ্রহণ পুরুষের পক্ষে অসৌরবের বিষয়। স্ত্রীলোক সেবা করবে, সে অধিকার আছে তার, কিন্তু দান? "আমরা দেব, তোমরা নেবে। তোমরা আবার দেবে কী!" এই প্রসঙ্গেই শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কথা উঠলো। এই মহিলার পরিচয় এখন সুবিদিত। ইনি কোনো উপায়ে জানতে পেরেছিলেন বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের কথা। নিজের দুই লক্ষ টাকা তিনি দান করতে উৎসুক ছিলেন, কবি জানতে পেরে নিবৃত্ত করলেন। তখনকার নিয়ম অনুসারে তাঁর পক্ষে দান করার কিছু বাধা ছিল এবং সেই বাধা অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন তিনি। একথা জানতে পেরে কবি তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, নারীর সেবা পুরুষের সাদরে গ্রহণীয় হলেও নারীর দান কোনো পুরুষের পক্ষে গ্রহণীয় নয়, তাতে পৌরুষের অবমাননা ঘটে। এই গল্পটি শুনিয়ে আমার নোট দু'খানি আমাকে দিলেন ফিরিয়ে। পরে যখনই আমি তাঁর জন্য কিছু ফুল ফল বা মিষ্টান্ন বা কোনো ধাতুপাত্র উপহার পাঠিয়েছি, তার পরেই তাঁর কাছ থেকেও এসেছে নানা রকম উপহার।

তাঁর কথা ছিল হাস্য পরিহাসে ভরা, ছিল কিছু তির্যক দৃষ্টি। আর পূর্বেই বলেছি তর্ক করতে বসলে কারোই মনে থাকতো না যে, কার সঙ্গে তর্ক করছি। সেই রকম এক তর্কের মুখে আমি বলেছিলাম, "আমরা শ্রীকৃষ্ণ পূজা করি বলে তার সমালোচনা করেন কিন্তু ধরুন, যদি একশো বছর পরে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব থাকে, আর তারা যদি আপনাকে সূর্য্যের বা ইন্দ্রের অবতার ভেবে নিয়ে পূজো করে, তাহলে আপনি কী করবেন?" তিনি কণ্ঠে একটু উত্তেজনা এনে বললেন "আমি ভূত হয়ে তার ঘাড়

ভাঙবো!" আমি রাগ করে বললাম "আপনার কপালে তাই আছে, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তাই হবে। হবে কী, এমনি তো হচ্ছে। আপনি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখুন না, সব ঘরে আপনার ছবি ঝুলছে, আর তার গলায় ফুলের মালা দেওয়া হচ্ছে। অত কেন, এই যে সেদিন "প্রবাসীতে" দেখলাম, ক্ষিতিমোহনবাবু বেদমন্ত্র পড়ে আপনার পুজো করছেন? পাদ্য, অর্ঘ্য, আরো কত কী? এসব কী? তখন তো দিব্যি সহ্য করে যান আপনি, যত দোষ শ্রীকৃষ্ণের বেলায়।" কবি বললেন, "আরে আমি তো বারণ করি, ওরা শোনে না যে।" আমি বললাম "শুনবেন কেন? মানুষের স্বভাব, সে পুজো না করে থাকতে পারে না। আর মানুষ মানুষকেই পুজো করতে চায়। নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষকে কল্পনা করেই হোক আর যা করেই হোক সে ভক্তি শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারে না। আপনি যে বলেন, পরিচিত বন্ধু হলে দোষ নেই, অপরিচিত বা কল্পিত হলেই দোষ; তা' একশো বছর পরে আপনিও তো পরিচিত থাকবেন না। এখন যেমন হচ্ছে, তখনও সেই রকমই হবে। এখন আমাদের চোখের সামনেই কেউ আপনার কথা শুনছেন না, তখন আরো তো কেউ শুনবেন না। আপনি বারণ করলে কী হবে, মানুষের এই স্বভাব।" ··আর একদিন গেছি সন্ধ্যের পরে,—বললেন "তুমি এখনো বেঁচে আছো? এখনো মরো নি? যমে তোমাকে ছোঁয়নি, ছুঁতে বুঝি ঘেন্না করে?" আমি বললাম "যা, আপনি বেশ লোক যো. এমনি করে বুঝি মানুষের অভ্যর্থনা করে! আপনার জীবন চরিতে এটা লিখে রাখতে হবে।" তিনি বললেন, "দেখ, আমি 'তোমাকে' বলিনি 'তোমাদের' বলেছি। তোমরা সনাতনীরা এখনো বেঁচে আছো? আমার এত লেখালেখির পরেও তোমরা মরো নি?" আমি বললাম, "মরব কেন? আমরা তো দিব্যি আছি।" মুসলমান, ইংরেজ আমাদের মারতে পারেনি, এখন মরব কী?" অন্য একদিন বলেছিলাম. "আপনি যে গুপ্তপ্রেস পত্রিকার নিন্দে করেন, একদিন ওই পত্রিকায় আপনারো নাম উঠবে। আপনি যে সব নতুন নতুন উৎসব করছেন, সেগুলোও ঐ পত্রিকাতেই উঠে পড়বে। ভালই হোল, আমাদের কিছু ভিনিষ লাভ হোল। আমাদের যা আছে তা তো থাকবেই, আরো নতুন জিনিষ পেয়ে যাবো আমরাই।"

একদিন গিয়ে দেখি লাল বেনারসী জরিদার চেলীর জোব্বা পরে বসে আছেন। নাতনী রত্ন সম্পর্কে, পরিহাসটা ঠোঁটের আগায় না এসে পারে না। বেশ বর সেজে বসে আছেন, কনে কোথায়? বিয়ে কখন? ইত্যাদি। উত্তরে একটু অপ্রস্তুত ভাব, ওঁর বেশভূষা নির্বাচনের ভার বধূমাতা প্রতিমাদেবীর উপর, ওঁর কোনো হাত নেই। কিন্তু চোখ দুটির ভাষা মুখের ভাষার সঙ্গে মেলে না। অপাতদৃষ্ট বাঙ্ময়কে সে হার মানিয়ে দেয়। তখন যারা পরিহাস করতে আসে, তাদেরই পরাজয় মানতে হয়।

একবার তিনি বরাহনগরে ছিলেন। আমি তখন অতদূরে একা যেতে পারতাম না, অথচ তখন আমার সঙ্গে আর কেউ সঙ্গী হিসাবে থাকতেনও না। প্রথম প্রথম পিসশাশুড়ী, জ্যাঠশাশুড়ী অথবা পুত্র-কন্যাদি থাকতেন বটে, পরে আমি প্রায় একাই যেতাম। তিনি জোড়াসাঁকোয় এলে তাঁর দর্শনলাভ আমার পক্ষে সহজসাধ্য হোতো, কিন্তু বরানগর যে অনেক দূর। অনেক দুঃখ জানিয়ে তাঁকে একখানা চিঠি লিখলাম। তিনি লিখলেন একটা নির্দিষ্ট দিনে (বোধহয় শনিবার) তিনি বেলা চারটে পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত থাকবেন। আমি ঐ সময় গেলেই দেখা হতে পারবে। তদনুসারে আমি যাবার আয়োজন করছি, এমন সময় পিসশাশুড়ী ৺হরসুন্দরী দেব্যা বাধা দিলেন। আমার জীবন যাত্রায় ঘড়ির কোনো স্থান নেই এবং স্নানাহারের সুনির্দ্দিষ্ট সময় আমি সবসময়ই লঙ্ঘন করে থাকি। আমার ইচ্ছা ছিল বেলা দুটোয় যাবার জন্য প্রস্তুত হব এবং সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এসে স্নানাহারের ব্যবস্থা হবে। পিসিমা কিছুতেই শুনলেন না।

তাঁর কথামত স্নান জপ সেরে খেয়ে দেয়ে যেতে হবে, এই তাঁর জেদ। অগত্যা তাঁর সঙ্গে আপোষ হোল এই যে, আমি কিছু ফল-টল খেয়ে যাব। এইসব গোলমালে বেলা চারটে বেজে গেল। যখন গেলাম তখন তাঁর দু'ঘণ্টা সময় নষ্ট হওয়াতে কাজের ক্ষতি হয়েছে। তিনি তাঁর অভ্যাসমত কথা, সেমিকোলনহীন, দাঁড়ি বর্জিত একটানা ছন্দে সেই ক্ষতির প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করে যেতে লাগলেন। "তোমার কী, তোমার কোনো কাজকর্ম নেই, অখণ্ড অবসর; কাজের লোকের যে কাজের ক্ষতি হলে যে কী হয়, তা তুমি কেমন করে বুঝবে?" এইভাবে তো একটানা বলে চললেন, এদিকে আমি তাঁর বক্তৃতায় কর্ণপাত না করে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছি তাঁর পীতোত্তরীয় ভূষিত বেশমী জপোলী চুলদাড়ি শোভিত দেবোপম মূর্তি। কথাগুলো কানেও যাচ্ছে না। হঠাৎ এক সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, যার উদ্দেশ্য কথাগুলো বলা, সে ওদিকে কর্ণপাত করছে না, কথাগুলো নিতান্তই মাঠে মারা যাচ্ছে। "কী গো, কী হোলো তোমার, চুপ করে রয়েছ যে?" তখন ঘটনা-টা বুঝিয়ে বললাম। এ-ও বললাম, ডাক্তার তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেন, কিন্তু তাঁর কাজের আর শেষ হয় না। এ রকম অবস্থায় আমি যে তাঁকে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করবার সুযোগ দিয়েছি। সেটা ভালো করিনি কি?—কিন্তু সেই ঘুলতুবি কাজ তো আর পড়ে থাকবে না, সেগুলো তো তাঁকেই এক সময় সেরে তুলতে হবে, পরিশ্রমের মাত্রা তাতে কমবে না। কিন্তু আমি বলি, তবু তো একটু জিরিয়ে নেওয়া হোলো। সব শুনে বললেন, "যাক্ তবু তো কিছু পাওয়া হয়েছে, এটা মন্দের ভালো, এর জন্যে পিসিমাকে ধন্যবাদই দেওয়া যেতে পারে।"

আমার পরিচারিকা নলিনী দাসীর বাড়ি ছিল বাঁকুড়ায়, কলিকাতায় মানিকতলার বস্তি বাড়িতে সে বাস করতো, দু'বেলা এসে আমার কাজ করে দিতো। একদিন বলল, "হ্যাঁ গো বৌমা, তুমি তো চিৎপুরে কাদের বাড়িতে যাও, আমরা যে রবিঠাকুরের পাঁচালী শুনেছি, ঐ যিনি পাঁচালী বাঁধেন, সেই রবিঠাকুরের কাছে যাও কি?" পাঁচালী! রবি ঠাকুর আবার পাঁচালী বাঁধলেন কবে! "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি শোনোনি বুঝি? আমরা অনেক শুনেছি।" একবার জোড়াসাঁকোয় গিয়ে ঐ পাঁচালীর কথা বললাম। খুব হাসলেন রবিঠাকুর, একদিন নলিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বললেন। একদিন নিয়ে গেলাম ওকে, পাঁচালীকার "রবিঠাকুরকে" দেখাতে। ও প্রণাম করে মাথার ঘোমটা টেনে জড়োসড়ো হয়ে একপাশে বসলো। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কী গো, রবিঠাকুরের পাঁচালী শুনতে খুব ভালবাসো বুঝি?" নলিনী আর লজ্জায় কথা কয় না। বাড়িতে এসে আমাকে বলল, "হ্যাঁ গা বৌমা, তুমি সেই কথা ওঁকে বলে দিয়েছ বুঝি? যাগো, কী লজ্জার কথা।"

আর একদিন "তুমি কেমন করে জানলে, আমি আজ এখানে আসব?" "আপনি যে চিঠিতে লিখেছিলেন?" "কী, আমি লিখেছিলাম চিঠিতে? আমি?" "বাঃ আপনিই তো লিখেছেন, আবার আসতে বলেছেন।" "আমি তোমাকে লিখেছি এই তারিখে আমি উপস্থিত থাকছি, আবার তোমাকে আসতে বলেছি, কই, কোথায় সে চিঠি?" আমি বললাম "সে কি আমি সঙ্গে করে এনেছি? আমি জানি নাকি যে আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে,—আপনি আচ্ছা মানুষ তো! আচ্ছা, আপনি নিজে খবর না দিলে আমি জানলাম কী করে বলুন তো! কী করে আমি এলাম!" "তাই তো, আমি না লিখলে তুমি জানবেই বা কেমন করে! তা আমি কি তোমাকেই আসতে বলেছি, তোমার ছেলেমেয়েকে এখানে আনো না কেন? ওরা তো আমার ভক্ত, আমার দলের লোক।" (আর একদিন বলেছিলেন—"ওরা আমার স্বজাতি, স্বগোত্র, সমধর্মী। তারাও ভক্ত-ভক্তী, আমিও ভক্ত। তুমি তো দাত যাদের সমধর্মিনী"।) তারা এখানে এলে

আমার সঙ্গে বোধ হয় খাবে, তাতে তাদের বোধ হয় জাত যাবে না। তুমি কী করে আসো এখানে? এই যা দেখছ, এই সব এঁটো, বাড়ি গিয়ে এত রাত্তিরে আবার স্নান করবে তো?" (আর একদিন—"আমি পতিত, আমি জাত্যা, সমাজচ্যুত, এই যা দেখছ, এই সব এঁটো, সব অশুচি, ঘরে গিয়ে স্নান কোরো, বুঝলে? স্নান করবে তো?") আমি স্থির হয়ে বলি, "দেখুন, ও রকম করে বলাটা কি আপনার উচিত? আমি গাড়িতে চড়লেই কাপড় ছাড়ি বা দিনের বেলায় হলে স্নানও করি। আমার বাবার ওখানে গেলেও ঐ রকম করি। গাড়ির কাপড়ে থাকি না আমরা। আমাদের যেটা নিয়ম, তার উপরে অমন করে বলাটা কি আপনার উচিত?"···ছেলেমেয়েদের কথায় বলি, "আপনার ভক্তদের তো বলেছি আসতে, তারা কেউ এলো না, তাই আমি একা এসেছি। তাদের বললে তারা আসে না, তার আমি কী করব?" "আসবে কেমন করে, তুমি এসে তোমার সাক্ষাতে কথা বলতে তাদের সঙ্কোচ হয় না?" "বেশ তো, আমি যখন না আসি, তখন এলেই পারে।" "তাই বা আসবে কেমন করে? তুমি আগেই এসে জুড়ে বসেছ, এখন তারা তাই আসতে সঙ্কোচ বোধ করে। তুমি যে আগেই জায়গা জুড়েছ।" "দেখুন, এর আর আমি কী বলব? ওদের ইচ্ছা থাকলে ওরাই তো আগে আসতো। রুচি তো ইচ্ছা করলেই আসতে পারে।"··· "আচ্ছা একদিন আমি আসব না, শুধু ভক্তদেরই পাঠিয়ে দেব।"

রোজই উনি বলেন যে ওঁর ভক্তদের কেন ওঁর কাছে পাঠাচ্ছি না, কেবলি নিজে এসে ফিরে যাই ওর স্বজাতীয় স্বগোত্র সমবয়সীদের (আমার পুত্র-কন্যা) বঞ্চিত করে। একদিন ভাবলাম এ কথার উত্তর দিতে হবে। মেয়েকে সঙ্গে করে পূর্বাহ্ণ বেলায় বরানগরে। ওকে নামিয়ে দিয়ে আমি না নেমেই চলে গেলাম কুঠীঘাটে আমার জ্ঞাতি ঠাকুরমার ওখানে। পরে ওখান থেকে গেলাম আলমবাজার পাঠ বাড়িতে। সেখান থেকে ফিরে প্রায় মধ্যাহ্নে ওঁর ওখানে এসে না নেমেই খবর পাঠালাম মেয়েকে পাঠিয়ে দেবার জন্য। ডেকে পাঠালেন আমাকে। "এ তোমার কী রকম ব্যবহার।" কেন আমি ওঁর নাম করে বেরিয়েও বাড়িতে না নেমে মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে গেছি জানতে চাইলেন। "কেন, আপনার ভক্তদের দেখা করার, আলাপ করার সুযোগই তো করে দিলাম"। তবে আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম? কেন, বরানগরে কি ওঁর বাসা ছাড়া আর আমার দ্রষ্টব্য স্থান নেই? আমি ঠাকুরমার বাড়ি, পাঠবাড়ি, গঙ্গারঘাট, কত জায়গায় বেড়িয়ে এসেছি।" "তা বেশ তো, কিন্তু এই মেয়েটিকে কেন শাস্তি দিলে বিনাদোষে নির্বাসনের?" "কেন, অমলে অমলে তো ফেলিনি। তাঁর সঙ্গে অসঙ্কোচে অবাধে কথাবার্তা কইতে পারবে, —আমি কাছে থাকলে যদি ওর মন যাবা বোধ করে সেই জন্যেই তো আমি ওকে রেখে অন্য কাজে সরে গেছি। "তা বলে এত দেরি!" এ তো আমার মতো নয়, খবর না দিয়ে আসবে, আর একবার বললে উঠতে চাইবে না। এ হ'ল আধুনিকা মেয়ে, এর যা কথা, তা' তো দু'মিনিটেই সারা হয়ে গেল, তারপরে এ করে কী! একেবারে বেকার। একবার এদিকে একবার ওদিক একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখে এলো, কিন্তু তারপরে? বড় জোর না হয় আধঘণ্টাই বলে থাকুক, এ যে এক ঘণ্টারও বেশী! এদিকে দুপুর হয়ে গেছে, খাওয়া হয়নি।···"তা একটু খিদে সহ্য করতে অভ্যাস করা তো ভালো। হিন্দু ঘরের মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গেলে ব্রত উপবাস করতে হবে তো!" ওঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত হচ্ছে বলে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম, উনি বললেন, উনি দিনে ঘুমোন না। "এই তো বিশ্রাম করছি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, এই আমার বেশ ভালো লাগে।" তবে বাসন্তীর খাওয়া হয়নি বলে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, উদ্‌খুস করছিলেন বারবার বলছিলেন গৃহকর্ত্রীকে আগাবেন কিনা। আমি বলায় "ওর অনেক বেলায় খাওয়া অভ্যাস

আছে, সকালেও কিছু খেয়ে এসেছে।" তবু তিনি থেকে থেকে প্রশ্ন কিছু খাওয়াতে না পেরে অস্বস্তি প্রকাশ করছিলেন। দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। গৃহকর্ত্রী উঠলেন, বাসন্তীকে চা খাওয়ালেন, একঝুড়ি আম ও অন্যান্য ফল দিয়ে দিলেন সঙ্গে। আমগুলি কিন্তু বাড়িতে অকালেই সৃষ্টিত হয়েছিল। আমার ছেলে উৎসুক হয়েছিল পথের দিকে তাকিয়ে। আমের ডালিটি দেখেই—"এ আমার" বলে কেড়ে নিয়ে নিজেরা বন্ধু-বান্ধব মিলে সদ্ব্যবহার করেছিল। শুনেছি শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশের বাগানের সেই আমগুলি সত্যই খুব মিষ্টি ছিল।

চুঁচুড়ার ৺অক্ষয় চন্দ্র সরকারের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কন্যা শ্রীমতী অনিমা ছিল বাসন্তীর বান্ধবী। তার পুতুল ছেলের সঙ্গে বাসন্তীর পুতুল মেয়ের বিয়ে। নিরীহ কুমারের সঙ্গে অচেতনার। শ্বেত হস্তীতে চড়ে (পাবনের) বর আসবেন পাশের বাড়িতে। তদুপলক্ষ্যে খুব ছোট্ট ছোট্ট রসমুড়ি আর সন্দেশ ফরমাস করা হোলো। কাঁসার থালায় এইগুলি সাজিয়ে পাঠানো গেল পুরনীর কবি গুরুর উদ্দেশে। প্রার্থনা করা গেল পত্রযুক্তে একটি আশীর্বাণী। চিঠিতে উত্তর দিলেন "আশীর্বাদ করে যাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারব না তাদের প্রতি ও জিনিষটার অপব্যয় করে কী হবে, তারচেয়ে আমার অন্তরের আশীর্বাদ তুমিই গ্রহণ করো।" তাঁর নিজের থালা এখন নাকি প্রায় নিরীহ কুমারেরই মতো। প্রতিবেশী রজনীকান্ত দিয়েছিলেন বৃহদাকার ফুলের ডালি এবং একটি সুদীর্ঘ কবিতা। তাঁর পুত্র শ্রীমান রঞ্জনের প্রাণে চড়ে বরকনে বিদায় নিলেন। অনেক তত্ত্ব বিনিময়, বাসবাসীর বকশিস, আলো, ফুল, খাওয়া-দাওয়া। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়েছিল।

১৩৪২ সালের ২রা ফাল্গুন বাসন্তীর বিবাহ হয়। কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আমি আর আমার ছেলে কবিকে নিমন্ত্রণ করতে গেলাম। তিনি বল্লেন, বিয়ের যে তারিখ ধার্য্য হয়েছে, সেদিন তাঁর অন্যত্র কাজ আছে তিনি আগের দিন একবার যেতে চেষ্টা করবেন, তবে কথা দিতে পারছেন না। বাড়ির সবাই বল্লেন "দেখো, উনি কখনোই আসবেন না।" বিবাহের তিন দিন আগে আমরা ৺কমল চন্দ্রের ৮০নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে এলাম, গোছগাছ কিছুই হয় নি, বিয়ের আগের দিন দুপুরে কতক জায়গায় নিমন্ত্রণ সেরে করে বাড়ি ফিরে স্নানের উদ্যোগ করছি, বাড়ির কর্ত্তা এবং পুত্র বাজার করতে গেছেন। অন্য পুরুষেরাও নেই কেউ, ঘরদোর অপরিষ্কার, অতিথি অভ্যাগতদের বসবার জায়গাও করে রাখা হয়নি, হঠাৎ শুনলাম কবি এসেছেন। তাড়াতাড়ি এসে দেখি আমাদের আত্মীয় টেনুবাবু অন্য স্থানাভাবে কবিকে যে ঘরে এনে বসিয়েছেন, সেখানে এক ইঞ্চি পুরু ধুলো; বড় বড় অজগরের মতো গালচেগুলো একপাশে গুটোনো পড়ে আছে। আসনাভাবে বিবাহের যৌতুকের জন্য আনা একটা পড়িমাঁটা চেয়ারে বসিয়েছেন এবং সম্মুখে বিবাহেরই যৌতুকের টেবিল একটি; কোথা থেকে একটা ফুলের তোড়া এনে ফুলদানিতে করে সেই টেবিলে বসিয়ে দিয়েছেন। লজ্জায় ভয়ে সম্ভ্রমে এবং আনন্দে আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। একটি গোলাপ নিয়ে পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে নিজেদের ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে যেতেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি তো আর পর নন। আমাদের ঘরের লোক, তাতে কী হয়েছে। ইত্যাদি। তারপর আমার ভাতৃবধূ ইন্দিরা এসে দাঁড়াতেই তাকে বললেন "দেখ তোমার দিদিমণিকে কিছু বলব না, কেন না উনি সংসার দেখেন না। কিন্তু তোমাকে বলব। হী হী হী, তোমার ভাগনীর বিয়ে, তুমি বাড়ির গিন্নি, অথচ একখানা ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখোনি, আমি তো তোমাদের ঘরের লোক, কিন্তু যদি আজ আমি না এসে ঘরের বাবা আসতেন তাহলে কী ছোতো বল দেখি!" ইন্দিরা হাসতে লাগলেন।

এমন সময় টেমুবাবু কবির হস্তাক্ষরে লাল কালিতে মুদ্রিত তাঁরি লেখা আশীর্বাণী একখণ্ড এনে তাঁর হাতে দিলেন। তিনি "দেখি দেখি, এ বুঝি বিয়ের কবিতা ছাপা হয়েছে, কে লিখেছে, কেমন লিখেছে" বলে যেন কিছুই জানেন না এমনি আগ্রহ ভরে আবৃত্তি করে খানিকটা পড়লেন, তারপরে বললেন "বেশ লিখেছে তো, লিখতে জানে লোকটা, কী গো, কী বলো, তোমার কী মত?" বলে বাসন্তীর দিকে তাকালেন, সে লজ্জিতভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন এখানা তাঁকে একেবারে দান করা হয়েছে তো, তিনি রাখতে পারেন? জিজ্ঞাসা করে নিয়ে পকেটে পুরলেন। তারপরে বললেন তাঁর পিপাসা বোধ হচ্ছে, একটু পানীয় জল চাই। তখনো কি আসে নি, কলতলায় এঁটো বাসন এক ডাই পড়ে রয়েছে, একটি গেলাস নেই বাড়ন্ত। মহা মুশকিল! বহুক্ষণ সময় নষ্ট করে টেমুবাবু কোথা থেকে একটা কাঁচের গেলাস এনে ধুয়ে তাতে জল ভরে আনলেন, এখন শুধু জল কী করে দেওয়া যায়। তখন কী বা যোগাড় করা যেতে পারে! সেইদিনই আমার বাবার মামীমা বাসন্তীকে 'আইবুড়ো ভাত' দিয়েছিলেন, একটা কাঁসার থালায় সাজানোই ছিল চারদিকে ঘেরা কয়লালেবু কয়েকটা, আর মাঝখানে কিছু সন্দেশ। থালাটি ধরে ঐ টেবিলের উপরে দেওয়া গেল। তিনি বললেন অসময়ে এত কী করে খাবেন তিনি, খেলে অসুখ করবে, বুড়ো মানুষ বলে কি কথা হয় না?

বলা হোলো "সঙ্গে করে নিয়ে যান তবে।" অন্য পাত্র অভাবে ছোট একটা পিতলের জোয়াদাবাজী মীনে করা চাকনাযুক্ত বাটিতে কয়েকটি সন্দেশ ভরে দেওয়া হোলো, এক পকেটে পুরলেন বাটি, আর দুটি কমলা আর এক পকেটে। এখন জল খাবেন কী উপায়ে! আমাদের বাড়ির বা'র মহলে কোনো শুচিবায়ু ছিল না যদিও;—অন্দর মহলে আচার নিষ্ঠা থাকায় বেশ খানিকটা ইতস্ততঃ করার অভিনয় দেখালেন। যতই বলা হয় "আপনি চুমুক দিয়া জল খান, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না" ততই উনি বলতে থাকেন "তুমি জানো না, আমি ব্রাত্য, আমি পতিত, আমি সমাজচ্যুত; চুমুক দিয়ে খেলে সমস্ত এঁটো হয়ে যাবে, এ ঘর অশুচি হয়ে যাবে" ইত্যাদি—আর টেমুবাবু কৃতাঞ্জলি পুটে পাল্টা জানতে থাকেন তাঁর একবিন্দু উচ্ছিষ্ট জলের প্রসাদ পেলে টেমুবাবুর চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবেন। অনেক বাদানুবাদের পরে অনেক কষ্টে যদি বা জল খাওয়ানো গেল, তখন সেই গেলাস রাখবেন কোথায়, এই এক বিপত্তি। যেখানে রাখবেন সে জায়গাতো অশুচি হয়ে যাবে। অনেক করে বোঝানো গেল যে এ বাড়ির কর্তৃপক্ষ ও সব মানেন না, এই টেবিলের উপরেই গেলাসটা রেখে দিন। ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েই মনোগত হয়েই মনে পড়লো গাড়িতে ওঁর সঙ্গী ডা: ধীরেন্দ্রমোহন সেন আছেন, তাঁকে একটু মিষ্টিমুখ করানো দরকার। যেন তাঁর নিজেরই বাড়িতে উনি অতিথি, এই ভাব বাজার থেকে কী আনতে হবে তাও বলে দিলেন টেমুবাবুকে। আবার জিজ্ঞাসা করলেন "পয়সা আছে তো?" কিন্তু না থাকলেই বা কী, তাঁহার নিজের পকেটেও তো পয়সা নেই যে ধার দেবেন। তখন কাছাকাছি জানাশোনা দোকান থেকে আনতে পরামর্শ দিলেন। এই সমস্ত পরামর্শ দিয়ে আবার মনে পড়লো গাড়ির ড্রাইভারও তো আছে। টেমুবাবু ওঁকে চিন্তিত হতে নিষেধ করে দ্রুত দোকানে গেলেন। এতক্ষণে সবাই ধাতস্থ হয়েছেন, আগেকার হঠাৎ বিস্ময়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় ভাবটা কেটে গেছে, একটা অস্বস্তি আবহাওয়া এসে গেছে এতক্ষণে। আমি বললাম "তাহলে আপনি বসুন আরেকটু।" তিনি বললেন "না, একেবারে গাড়িতে গিয়েই বসি।" তাই বললেন, ইতিমধ্যে আমার ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্থানীয় এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক ৺শরৎচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় এসে উপস্থিত। এসেই বললেন, "বড়খুকী, তোমার এখানে রবি ঠাকুর আসছেন, আমার সঙ্গে পরিচয়

করাইয়া দিলা না?" তিনি মোটর গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালেন "ইনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান, ইনি ব্রাহ্মণ-সভার সম্পাদক, আর আপনার কী পরিচয় দেব?" কবি বললেন "আমি অ-ব্রাহ্মণ সভার কর্ণধার।" ড্রাইভার এসে গেল, বাসন্তীর হাতে একটি গোলাপ ফুল দিয়ে কবি বিদায় নিলেন।

বিবাহের কিছু পূর্বে কবির কাছে আমার কন্যার জন্য তাঁর ব্যবহৃত জোব্বা একটি, কলম একটি এবং পোর্টফোলিও একটি চেয়েছিলাম, তিনি সেগুলি দিয়ে সহাস্যে বললেন "আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলে?" কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন ঐ কলমে তাঁর অনেক রচনা লিখিত হয়েছে, "চয়নিকাও" লেখা হয়েছে ঐ কলমে। বললেন বাসন্তীকে স্নেহ করেন বলেই এতসব দিচ্ছেন, অন্য কেউ হলে (এ ক্ষেত্রে আমি) এত দিতেন না। "এত অহঙ্কার ভালো নয়।" তিনি বললেন তাঁর একটুও অহঙ্কার নেই, কেন না এ মহিমা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর নয়, তাঁর মধ্যে যে "কবি" আছেন, তাঁরই। তিনি আপন জীবন দেবতা বা ইষ্টদেবতাকে আপনার মধ্যেই অনুভব করতেন, আপনার বাহিরে নয়। অতএব তাঁর মতে, মানুষের যা কিছু মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ, তা' মনুষ্যদেহী অহংএর নয়, তা' পরমাত্মার। ব্যষ্টি পরমাত্মা, সমষ্টি বিশ্বাত্মারই প্রকাশ। তিনিই ভক্তের ভগবান। কথাগুলি অবশ্য আমার ভাষাতেই লিখলাম, কবির ভাষায় নয়। জোব্বার একটা অংশে কাটার দাগ ছিল, কবি বললেন "ওটা কোনো রাজার পশুর কীর্তি"—অর্থাৎ পালিত মৃগশিশুর (অথবা বেজিরও তো হতে পারে, আমার মনে হয়!)। বললেন ঐ চিহ্নটি থাকায় জোব্বাটা নিঃসংশয়ে কবির স্মৃতি চিহ্ন বলেই লোকে বুঝবে মনুষ্য হয়ত কৃত্রিম বলে মনে করত। তিনি ব্যবহৃত চটিও একজোড়া দিয়েছিলেন, আমার পুত্র সেটি দখল করেছিল। পরে ডাক যোগে কবি বাসন্তীর জন্য আরো কিছু চামড়ার কাজ পাঠিয়ে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

আমার নাতি (দৌহিত্র) ছোটবেলায় দাঁড়াতে শিখবার আগেই খুব নাচতো বলে ওর ডাক নাম হয়েছিল 'নাচনচন্দ্র'। তার জন্ম সংবাদ পেয়ে কবি আনন্দ জ্ঞাপন করে পত্র লিখেছিলেন। নাচনচন্দ্রের বাল্যলীলার কথা পরে যখন জানালাম, তখন লিখেছিলেন নাচনচন্দ্রের লীলায় তো ওঁর তেমন লাভ নেই, যদি নাচনী হোতো তাহলে ওঁর কিছু আশা থাকতো। একদিন কথায় কথায় সেই কথা উঠলো। নাচন সবে বছর ছেড়েছের হয়েছে বোধহয়। নাচনের কথা উঠলো, নাচনীর কথাও। কবি নাচনের মাকে জিজ্ঞেসা করলেন, "কী গো, আমার মত জামাই তোমার পছন্দ হবে তো?" বার বার প্রশ্ন করায় সলজ্জ হাস্যে মা সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আমি জানালাম যে কবিদের কখনোই বয়স বাড়ে না, কাজেই পছন্দ না হবার কারণ কী আছে। বেশ লাল চেলিটুকু জড়িয়ে, দু'চার খানা গয়না পাঁটি পরিয়ে রূপোর থালায় করে সাত পাক ঘুরিয়ে দিলেই হোলো। এমন তো কত কুলীন কন্যার হয় শুনেছি। কবি বললেন "সে এসেছে নাকি?" বললাম "বা এখনি আসবে কি? এই তো ছেলে সবে এক বছরের হোলো।" "ও, তবে সে আসে নি, আসবে কিনা তার ও ঠিকানা নেই, সমস্তই তবে অনুমান।" বললাম "আসবে, সে তো জানা কথাই, নাচন যখন এসেছে, নাচনীও তখন আসবেই। তবে একটু সবুর করতে হবে, অত উতলা হলে চলে কি?" বললেন "ও, তবে এখনো দেরি আছে, ততদিন প্রতীক্ষা করতে হবে।" একটু পরে বললেন আচ্ছা একটা কাজ করলে না? তার তো এখনো আসতে দেরি আছে, ততক্ষণ একবার ঘুরে এলে হয় না?" বললাম "হয়, তবে এত তাড়াতাড়ি কিসের? একটু অপেক্ষা করুন না, আমারো তো বুড়িতে পঞ্চাশ বছর লিখেছে, বেশ এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।" "সে কী গো, তুমি এখনি যাবে কী! তুমি যে ছেলেমানুষ! তোমার চুল এখনো কাঁচা, তোমার দাঁত পড়েনি, এখনি তুমি যাবে

কী! ও বৃষ্টির লেখায় কিছু হয় না, না হয় একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করালেই হবে। তোমাদের তো শান্তি-স্বস্ত্যয়নও সব হয়ে থাকে।" তারপর আবার সেই কথায় ফিরে এলেন, "একবার পুরে এলে হয় না?" বললাম "তা হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে যদি নাচনী ওসে পড়ে, তাহলে তো সে আপনার বয়োজ্যেষ্ঠা হয়ে যাবে।" বললেন "আজকাল ওরকম হয়, ওতে কোনো বাধা হবে না। ওসব দেশে তো হয়ই, আমাদের দেশেও তাড়াতাড়ি চল হয়ে যাবে।" বললাম "তাহলে ঠিকানা রেখে যান। নাচনী এলে আপনাকে খবর দিতে হবে তো। কোন ঠিকানায় দেব, কেমন করেই বা তখন চিনব আপনাকে? কিন্তু আপনার ঠিকানা তো রেখে যাওয়া সম্ভব নয়, জানা যাবে কেমন করে? কাজেই ও সঙ্কল্প ত্যাগ করুন, এত ব্যস্ত কেন? দু'দিন সবুর করেই দেখুন না সে আসছে কি না।" নাচনী এলো। এলো ২৩শে বৈশাখ ১৩৪৮-এ। তাঁকে খবর দেওয়া হোলো। তখন নিজের হাতে লিখতে কষ্ট হয়, শ্রীযুক্তা রাণী চন্দকে দিয়ে লেখালেন আনন্দ জ্ঞাপন করে। তারপর লিখলাম সে খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠছে, ইতিমধ্যেই হাসতে ও পাশ ফিরতে শিখে গেছে, কবিও শীগ্‌গির শীগ্‌গির নিজেকে সারিয়ে তুলুন। এই শুভ বসন্তকালেই সাত পাক ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর সবুর সইলো না। অন্য সঙ্কল্পলোকের অন্য নাচনীর ডাকে সেখানে তাঁকে যেতে হোলো। আমাদের নাচনীর ও নাচনের জন্য আশীর্বাদ রেখে। সেই বাইশে শ্রাবণের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে।

সমুদ্রের তীরের স্বাস্থ্যনিবাসে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল হে রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনকে।

সারাদিন শুধু সমুদ্রের হাওয়া খাওয়া আর বালুর উপর বেড়িয়ে আসা। ভালই লাগছিল তাঁর দিনগুলি।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক এলেন সেই স্বাস্থ্যনিবাসে। চমৎকার মিশুকে লোক। সকলের সঙ্গে বেশ আন্তরিক ভাবে মিশতে লাগলেন। সকলে ভাবল লোকটি অতি মহৎ, অতি উদার।

কিছুদিন পরে পাশের স্বাস্থ্যনিবাসে একজন চোর ধরা পড়ল। কি ভীষণ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির সেই চোর। অনায়াসে দু'চারটা খুন করে পালাবার চেষ্টা করছিল।

লোকটিকে দেখে ষ্টিভেনসন অবাক্। এ সেই উদার মহৎ ভদ্রলোক! ভাবতে লাগলেন তিনি, তা'হলে প্রত্যেক লোকের দু'রকম রূপ থাকে।

এবার সৃষ্টি হোল তাঁর "Dr. Jekyll and Mr. Hyde."—বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস।

"পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণেতা গত যুগের স্বনামধন্য লেখক দুর্গাদাস লাহিড়ীর একটি দুষ্প্রাপ্য রচনা গত সংখ্যায় পরিবেশন করা হয়েছে। এ সংখ্যায় তাঁর কয়েকটি চুইকি সংগ্রহ করে দেওয়া হল।

পঞ্চাননক্ষেত্র পঞ্চ রঙ

দুর্গাদাস লাহিড়ী

সম্পাদকের দারোগাগিরি।

অনেক লেখালেখি করিয়া কয়েকজন সম্পাদক পুলিশের চাকরিতে বহাল হইলেন। সম্পাদক মহাশয়েরা, পুলিশের কাজকর্ম অতিশয় খারাপ হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই (তাঁহাদেরই মুখে) তাই স্বয়ং সম্রাট তাঁহাদিগকে অনুরোধ করায় তাঁহারা অগত্যা স্বীকৃত হইয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থানায় গিয়া কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্পাদক হারাধনবাবু হরিপুর থানার দারোগা হইয়াছেন, একদা প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, তাঁহার এলাকাস্থিত হিরণপুর গ্রামে ভীষণ দাঙ্গার সূত্রপাত হইয়াছে। একপক্ষে হিন্দু, অপরপক্ষে মুসলমান। দুই পক্ষেই লোক জখমেৎ হইয়াছে।

হারাধনবাবু সংবাদ পাইবামাত্র তাড়াতাড়ি ডাইরি লিখিতে বসিলেন। সংবাদদাতা চৌকিদারকে কহিলেন—দূত, তুমি মেঘনাদবধের রামদূতের মতো পা বাঁকা হাতযোড় করে ঘটনার বিবরণ বলতে থাকো, আমি লিখে নিচ্ছি।

হারাধনবাবু লিখিতে লাগিলেন—পঁচিশে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, বেলা অনুমান দু'টা। (হায়, দুর্ভাগ্য! থানার ঘড়িটা ভাঙিয়া গিয়াছে) অকস্মাৎ সমরক্ষেত্র হইতে রামদূত আসিয়া সংবাদ দিতেছে। প্রভাতের তরুণ তপন এখনো জগৎ সংসার আলোকিত করেন নাই। এখনো ধেনুবৎস হাম্বারবে গোষ্ঠে যায় নাই। এখনো গৃহস্থের কুলবধূরা শয্যাত্যাগ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করেন নাই। এখনো দিগম্বরী ঠাকরুণ কোমর বাঁধিয়া পাড়ায় কোন্দল করিতে বাহির হন নাই। এখনো বাঙালী বীরবৃন্দের চা-এর দুধ লইয়া গোয়ালা হাজির হয় নাই। এই সময় অকস্মাৎ অশনি-সম্পাত! দূত মুখে একি কথা শুনি?

লিখিতে লিখিতে হারাধনবাবু চৌকিদারকে জিজ্ঞাসিলেন—অতঃপর কিবা হৈল, কহ বিবরণ।

বাবুর ভাবগতিক দেখিয়া চৌকিদার হতভম্ব হইয়া গেল। কহিল, হুজুর, আপনার কথা বুঝতে পারছি না। শীঘ্র সেপাই দিন। এতক্ষণে হয়ত কত মাথা কাটাকাটি হোয়ে গেল।

হারাধন কহিলেন—কি? তার মাথা কাটল? বাঙালীর! আহা! বাঙালীর একটা মাথার দাম লাখ টাকারও বেশি! আহা! সেই মাথা কাটল! তবে কে আর রাজনীতির চর্চা করবে? তবে কে আর সমাজ সংস্কার করবে? তবে কে আর ইংরেজকে সুমন্ত্রণা দেবে? বাঙালীর মত মাথা পৃথিবীর আর কোন জাতের নেই! সেই বাঙালীর মাথা—কাটা!

চৌকিদার বলিল—হুজুর! আপনি একবার অন্দরমহলে চলুন। দেখবেন, এতক্ষণে ভীষণ মাতা বেধেছে।

হারাধনবাবু পুনরায় ডাইরি লিখিতে বসিলেন। লিখিতে লিখিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইল। তারপর উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বৈকালে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অনেক লোক জমায়েৎ হইয়াছে। কাহারো মাথা কাটিয়াছে, কাহারো হাত-পা ভাঙিয়াছে। তিন চারটি মৃতদেহ সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।

হারাধনবাবু দেখিয়া বলিলেন—আচ্ছা, বেশ হয়েছে। ডাইরিটা ভাল করে লেখা চলবে।

তিনি পুনরায় ডাইরি বই লইয়া লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—দিন যায় দিন আসে। এমন শুভদিন কি আর আসিবে? ভাগ্যে আমি সময়মত ঘটনাস্থলে যাই নাই। তাহা হইলে এই সুন্দর দৃশ্য বোধ হয় দেখিতে পাইতাম না। ইত্যাদি।

এই ডাইরির দ্বিতীয়াংশ পড়িয়া পুলিশ সাহেব আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং সসম্মানে হারাধন-বাবুকে ঘরে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

চুটকি।

বাবু। ওহে পরামাণিক, তোমার ক্ষুর এমন ভোঁতা কেন? বড় জ্বালা করে যে।

পরামাণিক। তা করুক মশায়! তাতে এসে যাবে না। দারোগা ক্ষুর হোলে এখুনি রক্তারক্তি হোত।

• • •

শ্বশুর। (জামাতার প্রতি)। বাপু হে, আজীবন আমার কন্যার ভার বইতে পারবে তো?

জামাতা। (নম্রভাবে) আজ্ঞে, আমি যে বেশ বিখ্যাত পালোয়ান।

• • •

ডাক্তার। আপনার স্ত্রী আরোগ্য লাভ করবেন বটে, কিন্তু তাঁর বাক্‌রোধ হবে!

পীড়িতার স্বামী। আহা! ভগবান কি এতটা করুণা করবেন?

• • •

বাড়ীওয়ালা। কেমন? বাড়ীর উপরতলায় আজকাল জল পাচ্ছেন তো?

ভাড়াটে। আজ্ঞে হ্যাঁ। বৃষ্টির সময় যথেষ্ট।

• • •

"আচ্ছা ভাই, তুমি কেন রামবাবুর কাছে টাকা ধার চাইলে? তোমার তো টাকার অভাব নেই।"

"অভাব নেই সত্যি! কিন্তু পাছে উনি আমায় ধার চান তাই সে পথ বন্ধ করলাম।"

• • •

"ভাই, বন্ধ্যা-রমণী কি কখনো গর্ভবতী হয় না ?"

"হয় বৈকি ! যখন তার স্বামীকে রাত্রে শ্বশুরবাড়ীর ভয়ে কেউ তাড়ে ।"

• • •

একটি কেরাণী, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আপিসে আসিয়া, আবার তিনটা বাজিতেই, চেয়ার হইতে চাদর খুঁজিতে লাগিলেন। দেখিয়া, বড়বাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"এলে বারোটার পর, আবার তিনটের আগেই যে চাদর খুঁজছো ?"

কেরাণী। একটু সকাল সকাল যাব।

বড়বাবু। এলেও দেরীতে, আবার যাবেও সকালে !

কেরাণী। তা না হলে দেরীটা পুরণ হবে কি করে ? এলাম দেরীতে, যাবোও দেরীতে—একদিকে দু'বার দেরী। মাইনে কাটা যাবে যে।

• • •

সাতকড়িবাবুর পুত্রদ্বয় বালকস্বভাবসুলভ ঝগড়া বিবাদ করিয়া থাকে। একদিন সাতকড়িবাবু বলিলেন—দেখ, অমন ভাইএ ভাইএ ঝগড়া করতে আছে কি ?

অষ্টম বর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লাননে কহিল—ভাইএ ভাইএ ঝগড়া করব না, তবে কি রাস্তার লোক ডেকে ঝগড়া করব ?

• • •

রসিকবাবু। (আগন্তুককে) মশায়ের বাড়ী কোথায় ?

আগন্তুক। কলকাতার কাছেই—খানাকুল কৃষ্ণনগর ! আর মশায়ের ?

রসিকবাবু। এই গঙ্গার পোলের উপর—সাঁত্রাগাছি।

আগন্তুক। কী রকম ! সাঁত্রাগাছি তো গঙ্গার পোল থেকে অনেক দূরে শুনেছি।

রসিকবাবু। দূর বটে ! তবে আপনার খানাকুল-কৃষ্ণনগর যদি কলকাতার কাছে হয় তাহলে সাঁত্রাগাছি তো পোলের উপরই হবে।

• • •

স্ত্রী। (স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে)। আমি এখনই নদীর জলে ডুবে মরব।

স্বামী (ধীরভাবে)। আচ্ছা, বেশ, যেতে পার। আপত্তি নেই।

স্ত্রী। বড়বৃষ্টি হচ্ছে, পরণের কাপড় ভিজে যাবে যে ! জল ছাড়লেই আমি যাচ্ছি। দেখো, ডুবতে পারি কিনা।

———

এলো যে শীতের বেলা

আমাদের দেশের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যে লিখেছিলেন—'এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি' সত্যিই তাই এমন কি ঋতুর পরে ঋতু এসে ও তার সংকেত জানিয়ে যায়। প্রকৃতিদেবী নিজেও যেমন বৈচিত্র্যময়ী মানুষের মনকেও তেমনি ভাবেই গড়েছেন। কোনো একঘেয়ে কাজ বা এক জিনিষ বেশিদিন চলাফেরা করতে করতে আমাদের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এক রকমের খাবার রোজ খেতে এমন কি এক জায়গায় বেশিদিন বসবাস করতেও ভালো লাগে না। এখন তো শীতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সবাই বেশ অনুভবও করছেন। ঘনাবাহলা শীতে পরিবেশের চাকচিক্য মনে প্রাণে একটা অনন্ত সুরের সূচনা করে। তাই সব মানুষের শীতেই - যতো পারিপাটা শীতেই। প্রকৃতির অন্যতম সমারোহের সূচনা সেজন্য শীতেই। শীত এসেই তো বসন্তের আগমনী বার্তা রেখে যায় নতুন দিনের খবর ছড়িয়ে দেয় আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সর্বত্র। শীতকে ঘিরে আমাদের তাই নানা আয়োজন। নানা কারণেই বিচিত্র উৎসব পার্বণ, বিচিত্র মেলা ইত্যাদি কি সহর জীবন কি গ্রামীণ পরিবেশ সর্বত্রই শীতেই নতুন আবহাওয়ায় মুখর হয়ে ওঠে। শীতকে ঘিরে সহর কলকাতার সেজন্য উৎসবেরও অন্ত নেই। শীতের বিষন্ন কুয়াশাকে এক হাতে সরিয়ে রেখে সহরের পথঘাট আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠে।

আবার কি সহরে কি গ্রামে এই শীতের দুপুরে মা ঠাকুমার দল রোদে বসে পুরণো দিনের গল্প করতে করতে বৌ-বেয়ানের বড়ি দিতে বসে যান—ছাঁচি কুমড়ো দিয়ে বিউলি ডালের বড়ি, মটর ডাল ও কালো জিরে দিয়ে বড়ি, কড়াইশুঁটির বড়ি, মুসুর ডালের বড়ি, মুলো বড়ি, কপি বড়ি, এছাড়া ভাজা বড়ি—আবার কেউ কেউ নানা রকম সূক্ষ্ম কারুকার্য করে অলঙ্কার, পদ্ম, গাছ, বাড়ী, বাসনপত্র ইত্যাদি এই ডাল দিয়ে করে থাকেন। চাটাইয়ের উপর এঁরা এমন বড়ি দেন দেখলে মনে হয় সত্যিই আমাদের মেয়ের আলপনাশিল্পী। এই সব বড়ি এত হালকা যে সাবধানে ব্যবহার করতে হয় এগুলি তুলোর উপর শাজিয়ে তখনকার দিনের মায়েরা মেয়ের শ্বশুরবাড়ী পৌষালীর তত্ত্ব পাঠাতেন—সঙ্গে থাকতো নতুন গুড়ের পাটালী আর সন্দেশ। তাই মনে হয় শীতকালটা যেন শুধুই নতুন নতুন জিনিষের আমদানী।

এ তো হল প্রাত্যহিক জীবনের কথা—এই রুক্ষ, কঠিন ঋতুর শীতকে কিন্তু কবিও আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর কাব্যে, গানে—"এলো যে শীতের বেলা।" এ যেন মানুষের অন্তরের আহ্বান তাই একান্ত শীর্ণ শীতঋতুও এত আমাদের ভাল লাগে। তাই মেয়ে মজলিশের মা বোনেদের বলছি যদি শীতের পাকদন্ত বা কোনো উল বোনার প্যাটার্ন লিখে পাঠান তাহলে আমরা 'মেয়ে মজলিসে'র মাধ্যমে সেগুলি প্রকাশ করব অন্যান্য পাঠিকার সুবিধার জন্য।

—বেলা দে

শীতে রূপচর্চা

অনুপমা ও মঞ্জরী

আজকালকার দিনে হাজার রকমের প্রসাধন সামগ্রী বাজার ছেয়ে ফেলেছে। অফুরন্ত রকমের ক্রীম, স্নো, ভ্যানিশিং ক্রীম, বিউটি ক্রিম, সোপান, পাউডার, লিপষ্টিক আরো কত কি যে বলে শেষ করা যাবেনা। সেদিন পর্যন্ত বিদেশ থেকেই এইসব প্রসাধনদ্রব্য আসতো। দেশের অবস্থা খারাপ হওয়ায়, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে, এখন তা আসা বন্ধ হয়েছে। তবে, দেশে আজকাল সবই তৈরী হচ্ছে কারখানায় ও ঘরোয়াভাবে। অভাব কোনটিরই নেই। চাইলেই পাওয়া যায়, আর তার জন্য পরিশ্রম করতে হয়না—সবই একেবারে তৈরী। বাটা, ঘষা, গুঁড়োকরা কোন কিছুরই বালাই নেই। বসে বসে শুধু মাখতে ও লাগতে হবে। আধুনিক মেয়েদেরও তা মাখবারে কোন বিরক্তি নেই। দিন রাত, সকাল সন্ধ্যা, বসে বসে শুধু প্রসাধনই চলেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে অনেকেই সত্যিকার সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী এখন আর হতে পারছেন না। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ অনেক ক্ষেত্রেই আজ আর হয় না। কাজেই আধুনিক মেয়েদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে স্বাস্থ্য চর্চা আগে তার পর রূপচর্চা। Health first then Beauty। আর এই নীতিবাক্য যদি অনুসরণ করেন, তবে শুধু সৌন্দর্য্য নয় অফুরন্ত আনন্দের অধিকারিণীও হতে পারবেন তারা।

সৌন্দর্য্য চর্চ্চার প্রশস্ত সময় শীতকাল, শুধু সৌন্দর্য্য নয় শরীর চর্চ্চাও। এই সময় সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য এই দুই চর্চ্চাই চলে অন্য সব ঋতুর চেয়ে ভাল ভাবে। আর স্বাস্থ্য ছাড়া সৌন্দর্য্য তো লাভ করা যায় না, কাজেই দুয়েরই প্রয়োজন সমান তালে। আজকাল মেয়েরা অনেকেই ভুলে যান যে স্বাস্থ্য হচ্ছে সৌন্দর্য্যের ভিত্তি অর্থাৎ Base। কাজেই আগে স্বাস্থ্য তারপর আসবে সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হতে হলে আগে স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হতে হবে। "Health is Beauty" "স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য।" একথা অতি সত্য।

রূপচর্চা, প্রসাধনের দ্বারা সৌন্দর্য্যকে অটুট রাখার প্রয়াস সব ঋতুতেই মেয়েরা করে থাকেন বিভিন্ন উপাদান সহযোগে। তবে দেখা গেছে, সেকালে এবং একালও, মেয়েরা বিশেষ করে শীতকালেই মুখশ্রী ও দেহ-সৌন্দর্য্যের প্রতি বেশী লক্ষ্য দিতেন ও দেন। তার কারণ সহজেই অনুমেয়। শীতের প্রকোপে মুখের শ্রী ও লাবণ্য যেভাবে নষ্ট হয়, তা সকলেরই জানা। তাই শীতকালে এই বিষয়ে বেশী যত্ন নিতে হয় স্বভাবতই। বর্তমান সংখ্যাটি যখন বেরুবে তখন—"এলো যে শীতের বেলা।" তাই এই সংখ্যায় "শীতকালে রূপচর্চা" শীর্ষক নিবন্ধটির মধ্যে সেকালের এবং একালের শীতকালীন প্রসাধন সম্বন্ধে কিছু সময়োপযোগী আলোচনা করা হল।

রূপচর্চা আমাদের দেশে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। সেই বৈদিকযুগ থেকে তার বর্ণনা আমারা যুগে যুগে বহু গ্রন্থে পেয়েছি। এখানে যে-সেকালের কথা বলছি তা আমাদের ঠাকুমা দিদিমার আমলের কথা। সে সব দিনের রূপচর্চা আজ যুগবদলের সঙ্গে বিলীন হয়েছে। তখন দিদিমা ঠাকুমারা অল্প মাত্র নিজের নিজে সকালবেলায় রোদে পিঠ মেলে দিয়ে এই চর্চা সুরু করতেন। একই সঙ্গে Sunbath

ও প্রসাধন দুইই চলত। তার মধ্যে বিদেশ থেকে আনা কোন প্রসাধন সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া যেত না। সবই দেশজাত সহজে সুলভে পাওয়া জিনিষ। যেমন, কিছু সরষের তেল তার সঙ্গে কিছু হলুদবাটা মিশিয়ে যে প্রলেপ তৈরী হ'ত, ত্বকের উপর তার ক্রিয়া সম্বন্ধে বৃদ্ধারা বিশেষ অবহিত ছিলেন। এই প্রলেপ ত্বককে শুধু সর্বপ্রকার মালিন্য থেকে মুক্ত করত তাই নয়, ত্বকের সজীবতা বৃদ্ধি করত, তাকে উজ্জ্বল করত। তারপর স্নানের শেষে ব্যবহৃত হত সর-ময়দা। দুধের সরের সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে সেই প্রলেপ মুখে হাতে লাগাবার পর আস্তে আস্তে ঘসে ঘসে যখন ময়দার আস্তরণকে তুলে ফেলা হত তখন সেই অল্প-তৈলাক্ত ত্বকের যে সুষমা পরিস্ফুট হ'ত তা হালআমলের কোন সৌন্দর্য-সহায়ক দ্রব্যের দ্বারা সম্ভব নয়। তখন পাউডার ছিলনা। তার পরিবর্তে ছিল পাউডারের মতোই মিহি শাঁখের গুঁড়োর সঙ্গে তেমনি মিহি চন্দনকাঠের গুঁড়োর সংমিশ্রণে এক অপূর্ব এবং উপকারী চূর্ণ। রাত্রিকালে দ্বিতীয়বার সর-ময়দা লাগাবার পর সেই চূর্ণের প্রলেপ দিতেন মেয়েরা। বিপ্রহরে বা সায়াহ্নে সরষের তেল দিয়ে অঙ্গ সংবাহনও ছিল আর একটি নিত্যকর্ম: চন্দনের প্রলেপ আর মুহুরির ডাল বাটাও ছিল আর দুটি উপকরণ।

এখন যুগ বদলেছে। কর্মব্যস্ততার যুগে বাস করছি আমরা। সেদিনের মতো অঢেল সময় মেয়েদের নেই। তাঁদের হাতে অনেক কাজ। অনেকেই চাকুরীজীবী। কাজেই অল্প সময়ে প্রসাধন সারতে হয়। অন্য বস্তুতে যেমন তেমন করে রূপচর্চা চলে। কিন্তু শীতকালে একটু বেশি নজর দিতে হয় এদিকে। শীত এলো কি না এলো, হাতের ও মুখের চামড়ায় টান ধরতে লাগল, ঠোঁট ফাটতে শুরু করল, সকালবেলা মুখশ্রী রুক্ষ বিবর্ণ দেখতে লাগল। কাজেই একটু বিশেষ যত্ন নিতে হবে বৈকি এবং এ যুগে তাতে সাহায্য করছে বাজারে প্রচলিত নানারকমের সৌন্দর্যবর্ধক রূপচর্চার উপাদান। সকালবেলা মুখ হাত ধোবার পর লাগাতে হবে তৈলাক্ত কোন ক্রীম। তারপর স্নিগ্ধকারিণ সাবান মেখে স্নান সেরে প্রয়োজন হবে প্রথমত ফাউনডেশন ক্রীমের, তারপর ভ্যানিশিং ক্রীম এবং সর্বশেষে কেস পাউডার। দিনের শেষে কর্মের অবসানে মুখ ধুয়ে ফেলে লাগানো হবে কোল্ড ক্রীম, রাত্রে শোবার সময় বিউটি মিল্ক বা সারা রাত ধরে ত্বকের উপর ক্রিয়া করে তাকে সতেজ ও সজীব করে রাখবে।

উপরে যে সব উপাদানের কথা বলা হল, সেগুলি ভালো কোয়ালিটির যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে সুফল পাওয়া যাবে সুনিশ্চিত। কিন্তু রূপের চর্চা যতই হোক তার ভিত যদি ভাল না হয়; অর্থাৎ স্বাস্থ্য যদি ভাল না থাকে তাহলে কোন চর্চাই সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হবে না। কথায় বলে স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা এ তত্ত্বটি ভাল করেই জানতেন। তাই খাওয়া-দাওয়া শ্রম-বিহার অবসর যাপন সমস্তই তাঁরা করতেন সেইদিকে লক্ষ্য রেখে। শরীর যাতে স্নিগ্ধ থাকে, হজম যাতে ঠিক মতো হয়, সুনিদ্রার ব্যাঘাত যাতে না হয়, আলস্যে যাতে শরীরের মেদ বৃদ্ধি না পায়—এ সব বিষয়ে তাঁদের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি থাকতো। তাঁরা পরিশ্রম করতেন নিয়মিত। তাতে করে তাঁদের স্বাস্থ্য ভাল থাকতো। সেই পরিশ্রম ব্যায়ামের কাজ করত। ফলে তাঁদের শরীর থাকতো প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত অটুট, সৌন্দর্য লাবণ্য থাকত অমলিন। এবং তাঁদের কালে তাঁদের নাতনি, কন্যা ও পুত্রবধূরাও ঠাকুমা-দিদিমার নির্দেশ অনুসরণ করে নয়নানন্দকর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের অধিকারিণীরূপে থাকে বলে ঘর আলো করে থাকতেন।

সুতরাং শীতকালে রূপ চর্চার প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে ভুললে চলবে না।

এই অতি প্রয়োজনীয় কাজে কতটুকুই বা সময় লাগে? বর্তমানে যুগে সময় আমাদের অনেকেরই কম ঠিকই, কিন্তু এটা তো মনে রাখা দরকার, মেয়েদের সৌন্দর্য শুধু নিজের কাছেই নয়, অপরের

কাছেও। সৌন্দর্য শুধু সৌখিনের অধিকারীকেই আনন্দ দেয় তা নয়, পরকেও আনন্দে ভরিয়ে তোলে। তবে হ্যাঁ, সেদিকে একটু নজর দিতে হবে। দৈনন্দিন ঝামেলা, কাজ, অসুবিধে মিটিয়ে ও কাটিয়ে যতটুকু পারা যায় নিজেদের শরীরের ত্বকের যত্ন নিতে হবে বৈকি।

আমাদের ত্বক পোষাক পরিচ্ছদে অনেকখানি ঢাকা থাকলেও খানিকটা খোলা থাকেই। বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন প্রভাব পড়ে—সেই খোলা অংশের ওপর তো বটেই, এমন কি ঢাকা অংশের ওপরেও। তাছাড়া সারা দিনে রোদ্দুর, ধুলো প্রভৃতিতেও দেহত্বকের ক্ষতি হয়। সেই কারণে ত্বকের যত্ন সব সময়েই চাই।

বর্ষাকালে হাওয়াটাই থাকে খানিকটা ভিজে, আর্দ্র। তার ফলে গায়ের ত্বকও কিছুটা ভিজে নরম থাকে। বর্ষার পর শীতকালে হাওয়ার আর্দ্রতা খুব কমে যায়, হাওয়ায় টান ধরে—তারও প্রকোপ পড়ে গায়ের ত্বকে। চামড়াতেও টান ধরে, গা চড়চড় করে, ত্বকের আর্দ্রতা কমে গিয়ে কাটতে সুরু করে। মানুষের দেহের যে স্বাভাবিক তেল তার—অবশ্য প্রকৃতিগত কারণে এর পরিমাণটা কারো কম, কারো বেশি কারো মাঝারি ধরণের হয়—তা অনেক সময়েই শীতের প্রভাব কাটিয়ে দেহত্বককে নরম রাখতে পারে না।

তাই, শীতকালে শুধু নয়, শীতের গোড়া থেকেই ত্বকের যত্ন মোলায়েম রাখবার প্রচেষ্টা। সাধনাও বলতে পারেন। ওদিকে শীত চেষ্টা করবে আপনাকে রুক্ষ ক'রে তুলতে—এদিকে আপনার থাকবে সেই চেষ্টা প্রতিরোধ করবার সাধনা। আর এ সাধনায় আপনারই জয় হওয়া চাই।

কেননা নারী মানেই কোমলতা, নারী মানেই স্নিগ্ধতা। নারীকে কেবল পুরুষই যে এই রূপে দেখতে চায় তা নয়, নারী নিজেও চায়। এবং নারীত্বকে সুন্দর, সজীব ও মসৃণ ক'রে তুলতে ও সেইভাবে রাখতে খুব বেশি একটা চেষ্টার দরকার হয় না।

বলছিলাম শীতের প্রভাব কাটিয়ে দেহত্বককে নরম রাখবার কথা। এটা হল প্রসাধনেরও একটা অঙ্গ স্বাস্থ্যচর্চারও একটা অঙ্গ। খুব বেশি তৈলসিক্তিল বা ঘর্মসিক্ত ত্বক (যেটা সাধারণত বেশি দেখা যায় গ্রীষ্মঋতুর প্রভাবে) যেমন স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, তেমনি তৈলবর্জিত শুকনো খসখসে ত্বকও অস্বাস্থ্যকর মাত্রাটা ঠিক থাকা চাই। আমাদের দেহের তৈলগ্রন্থিগুলোর নিঃসরণক্রিয়া শীতকালে স্বাভাবিকভাবে কম থাকে, তাই বাইরে থেকে তৈলাক্ত পদার্থের প্রয়োগে ত্বক নরম রাখতে হবে।

এটা দুভাবে করতে পারেন। সাধারণ প্রচলিত বিদেশী প্রথায় তৈল ক্রীম, ভেজলীন ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক মোলায়েম থাকবে, শীতের আঁচড়েও অটুট থাকবে। আর করতে পারেন সাবেকি দেশী প্রথায় —দুধের সর (একালে দুধে সর পড়া যদিও প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার) এবং তেল গায়ে মেখে, কাঁচা দুধ গায়ে মাখলেও দেহের চামড়া নরম হয়। সর বা দুধ মাখতে হয় মালিশ করার মত ধীরে ধীরে ঘষে ঘষে, তবেই সবচেয়ে বেশি উপকার। ঐ সঙ্গে হলুদ বাটা মিশিয়ে নেন যদি একটু, তাহলে ত্বক আরো বেশি উজ্জ্বল আর চকচকে হয়ে উঠবে।

কাঁচা দুধ বা সরের সঙ্গে অল্প ময়দা মিশিয়ে মাখলেও উপকার। মলটা দেহে শুকিয়ে যাবার পর আস্তে আস্তে সর্ষের তেল দিয়ে উঠিয়ে ফেলা যায়—ময়দার সঙ্গে ত্বকের ওপরকার ও লোমকূপের ময়লা উঠে আসবে, ত্বকও মোলায়েম হবে।

ভাল ঘি আজকাল পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু তবু যদি যোগাড় করা সম্ভব হয়,—অথবা মাখন ব্যবহারও চলতে পারে—তাহলে ভিম-কোটানর মত আচ্ছা ক'রে কেটিয়ে নিয়ে মুখে, গলায়, হাতে ও অন্যান্য স্থানে লাগাম দেতে পারে ক্রীমের মত। রুচি অনুযায়ী তাতে এসেন্স মিশিয়ে নিতে পারেন।

শরীরে মেখে আনতে মিহিদানা সর্ষের তেল মাখা অদ্বিতীয়। অনেকের অবশ্য সর্ষের তেলে ভারি বিতৃষ্ণা, সর্ষের তেলের গন্ধটাকে ঘেন্না করেন। কিন্তু সর্ষের তেলের গন্ধটা কোন সমস্যা নয়; বেশ ক'রে জলে জলে তেল মেখে পরে চানের সময় সাবান দিয়ে সে তেল তুলে ফেলা যায়, গন্ধও থাকে না, ত্বকও নরম থাকে।

বিবর্ণ ত্বকে খড়ি ওঠা—বিশেষত মেয়েদের বেলায়—সৌন্দর্যকে ভীষণভাবে নষ্ট করে। অঘ্রাণের গোড়া থেকেই যদি নিয়মিত তেল-ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় গায়ে, তাহলে পৌষ-মাঘ আর আক্ষেপ বা দুশ্চিন্তা করতে হয় না। দুধ-সরের মত সর্ষের তেলের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে মাখা উপকারী—স্নানের আগে। হলুদের আরেকটা বিশেষ গুণও আছে—ঘোস, পাঁচড়া, চুলকানি ইত্যাদি নিবারণ করে।

কারও কারও নাকি সর্ষের তেল মেখে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয়না। সর্ষের তেলেও যাদের গা কাটে, তাদের নারকোল তেল উপকার করে।

অলিভ অয়েল খরচ বেশি, কিন্তু ত্বক মসৃণ রাখতে এর উপকারিতা অপরিসীম। তাছাড়া অলিভ অয়েল ত্বক এবং মাংসপেশীতে অনেকটা টনিকের মত কাজ করে।

আর একটি চমৎকার জিনিষ হল গ্লিসারিণ। পরিমাণমত জলের সঙ্গে মিশিয়ে পাতলা ক'রে নিয়ে মুখে, গলায়, ঘাড়ে, দুই বাহু ও পায়ের পাতায় মাখা যায় দিনরাতে যে কোন সময়—সুন্দর নরম থাকে চামড়া। শীতের তিনটে মাস গ্লিসারিণ সাবান ছাড়া কোন গায়েমাখা সাবান ব্যবহার করে না। এই সাবানটি তৈলাক্ত সাবান হিসেবেই তৈরি করা হয়, সেই কারণে শীতকালে ব্যবহারের পক্ষে সাধারণ গায়েমাখা সাবানের চেয়ে গ্লিসারিণ সোপই উপযুক্ত।

পায়ের গোড়ালি অনেকেরই বেশি ক'রে ফাটে শীতের সময়। হেমন্তের শেষভাগ থেকে এদিকে নজর দিলে বেশি শীতে বেশি করে আর গোড়ালি ফাটবে না। নারকোল তেল খুব ভাল ক'রে গোড়ালিতে মাখান উচিত, তাতে ওখানকার মোটা চামড়া নরম থাকে। রাত্তিরে শোবার আগে গ্লিসারিণ লাগিয়ে শোন পরদিন—গোড়ালি নরম থাকবে, বিছানাও নোংরা হবার ভয় নেই।

শীতের হাওয়া যতই শিরশিরানি জাগাক না দেহ, এতগুলি প্রতিষেধক নিলে—অন্ততঃ এর মধ্যে কতকগুলি নিলেও—আপনি সুরক্ষিত থাকছেন: আপনার আর ভয় কি? উত্তুরে হাওয়া আপনাকে কখন বিবর্ণ ক'রতে পারবে না এখন—আপনি শীতের প্রকোপ জয় করে নিজেকে লাবণ্যময়ী করে তুলতে পারবেন।

• • • •

"I honestly think it is every woman's business to seem beautiful—to create the illusion of, to move in an aura of beauty. It can be done by any one. It is being done every day, by women with nothing extraordinary in the way of faces and bodies. There aren't many "born beauties"—most of them are developed. If you have the determination and will power you can achieve a glow, a freshness, a charm that will very well attract people around you.

—Anita Colby—*A renowned Hollywood Beauty expert*

জয়পুরী শিল্পের উৎস

হেমপ্রভা মল্লিক

ছোট বেলায় যখন নানারকম শিল্পকাজ শিখেছিলুম তখন মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগতো, এই সমস্ত শিল্পকাজ কোথা থেকে এলো? কোথায় এর উৎস?

গঙ্গা কোথা থেকে এসেছে তার সন্ধান কোরেছেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা, দিনের পর দিন। অনেকগুলি দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা, কিন্তু এসেছে কোথা থেকে? এই চিন্তা তাঁরা দিনের পর দিন কোরেছেন। চিন্তা কোরেছেন, খুঁজেছেন তবে পেয়েছেন। তারপর চলে গেছেন একেবারে সেই হিমালয়ে যেখান থেকে নেমেছে গঙ্গার ধারা। তাঁরা গিয়ে দেখলেন বিরাট এক গহ্বর থেকে স্বচ্ছ হিমধারা বেরিয়ে এসে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে বয়ে চলেছে। যেখান দিয়ে ঐ জলের ধারা বেরিয়ে এসেছে সেইখানের মুখগহ্বরটি গরুর মুখের মত বলে তার নাম হয়েছে গোমুখী। অতএব জানা গেল গঙ্গার উৎস ঐ গোমুখী।

গঙ্গার মত শিল্পকলারও উৎস আছে। এমন সুন্দর জয়পুরী শিল্প কোথা থেকে এলো? স্বতঃই প্রশ্ন জাগতো মনে। ছোট বেলায় জয়পুরী কাজটি শিখেছিলুম। পিতলের থালার উপর খোদাইএর কাজ। তখন মনে হত, এতো থালার উপর নক্সা! এর নাম জয়পুরী কাজ হল কেন; কোথা থেকে এবং কোন শিল্পকে কেন্দ্র করে এর উৎপত্তি? চিন্তাটা যেন মন থেকে মুছতে চায় না। আবার দোকানে দেখি পিতলের থালা কুঁদে নিয়ে তার ভিতরে লাল, নীল সবুজ, হলদে রং দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখে মন বেশ মুগ্ধ হয়! এই শিল্প কাজটির বৈশিষ্ট্য আছে যা কোন কাজ কার্বের বা দেশের শিল্পের সঙ্গে ঠিক মিলে যায় না। এটা আমার চোখে পরিষ্কার পড়েছে ও মনে হয়েছে।

তারপর একদিন বহুদিনের ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পেলুম জয়পুর এসে। দুর্গটীর বস্তুগুলি দেখে, গেলুম অম্বরের যশোরেশ্বরী দেবী ও প্রাসাদ দেখতে। পাহাড়ের উপরই অবস্থিত। দেওয়ান-ই আম, দেওয়ান-ই খাস সম্মুখেই পড়লো। তারপর গেলাম অন্দরমহলে। রাণীদের সুন্দর সুন্দর হর্ম্য। কোন্ ঘরে তাঁরা থাকতেন শুনতেন, কোন ঘরে তাঁরা বসতেন আবার কোন ঘরে তাঁরা বসে বাইরের দৃশ্য উপভোগ কোরতেন। ঘরের চারদিকেই খালি মিনার কাজ। রকম রকম ফুল, রকমারী পাতা.—তাতে রংএর বাহার লাল, সবুজ, হলদে রং দিয়ে পাতা ফুলগুলিকে ভরিয়ে তোলা হয়েছে। দেওয়ালের কয়েকটি অংশ জুড়ে রয়েছে পাখী। সে আবার কয়েক রকম। পাখীর গায়েতে রং দিয়ে শ্রীসৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সেও মিনার কাজ। খুব দূর থেকে একটি চমৎকার রংএর ছবি চোখে পড়লো। কাজটি ছাড়া ছাড়া ভাবে করা রয়েছে। একটু দূরে গিয়ে খুব প্রখর দৃষ্টি মেলে দেখলে দেখা যায় দুটি মূর্ত্তি—রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। রং বেরংএর কাপড় পরা। বোঝা গেল বাঁধরা ও ওড়না জড়িয়ে রাধা দাঁড়িয়ে আছেন আর বাঁধরা পরে মাথায় পাগড়ি ও হাতে বাঁশি নিয়ে কৃষ্ণ। বেশ একটা সুন্দর বাহারে রং মূর্ত্তি দুইটির মধ্যদিয়ে খেলে যাচ্ছে।

যেখানে যেখানে রং পড়েছে তার মধ্যে কিছু কাটা কাটা দাঁচরও আছে। এটা জয়পুরী কাজের একটা বিশেষত্ব। আমার রংএর মধ্যে আর একটা বিশেষত্ব দেখলাম, খুব কড়া রংএর সমাবেশে কাজগুলি ফুটে উঠেছে। যেমন লালফুল, গাঢ় হলদে ফুল, ঘন সবুজ পাতা। পাখীর গায়ের রং সেও বেশ ঘন গাঢ় রং দিয়ে মিনা করা হয়েছে। রঙগুলি রং সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়—লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বৈদিক পার্টকিলে, কাল, সাদা। গাঢ় রং দিয়েই অনেক লতাপাতা নানারকম নক্সা দেওয়ালে খোদাই করা হয়েছে। হাল্কা রং—গোলাপী, ফিকে সবুজ, কচি কলাপাতা, ফিকে হলদে, চাঁপা রং, আকাশী নীল ইত্যাদি রং দিয়েও নক্সাগুলিকে রং ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লো। নক্সা, পাখী, মাছ, প্রজাপতি ইত্যাদির ধরণ অর্থাৎ যাকে ডাঁচ বা (Motif) একটু অন্য। অন্য কোন নক্সার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। জয়পুরী কাজগুলি নিজের বৈশিষ্ট্যেই নিজে ছন্দোময় ও লীলায়িত। আগ্রাকোটের মধ্যে রংদার পাথরের ফুল, পাতা, পাখী সুন্দরভাবে সেট করা ও রং মিলিয়ে পাথরগুলি দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তার রূপ আর একপ্রকার আর জয়পুরী কাজের রূপ আর একপ্রকার। দুটো কাজের সঙ্গে ঠিক তুলনা চলে না। ঘরের দেওয়ালে ও ঘরের বাইরের দেওয়ালে চার দিকেই কাজ। ছাদের নীচের অংশও (সিলিং) কাজ দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয়েছে। কোন কোন দেওয়ালে শিল্পকাজগুলি কেবলমাত্র সাদা রং দিয়ে মিনা করা আছে। যেমনটি ঠিক জয়পুরী ফুলদানি থালা বাসনে দেখা যায়। একটি ঘর সম্পূর্ণ কাচের মত মনে হতে লাগলো। ছোট ছোট টুকরো কাঁচবসিয়ে তৈরী করা হয়েছে। চারদিকের দেওয়াল ছাদের নীচের দেওয়াল—সবেতেই কাঁচ বসানো মনে হল। কিন্তু বোধহয় তা নয়, চকচকে মিনার কাজ, এমন চকচকে যে সবগুলির মধ্য দিয়েই সকলকে দেখা যাচ্ছে। যেমন আয়নায় আমরা নিজেকে দেখি।

যাই হোক জয়পুরী কাজ জয়পুর থেকেই এসেছে এটা সকলেই জানেন। কিন্তু কারুকার্যগুলি বিশেষ ভাবে প্রাসাদগুলিতে এবং তার ঘর বারান্দায় শোভিত হয়ে সৌন্দর্য বিস্তার করছে এবং ঐ কারুকার্যগুলিকে কেন্দ্র করে বিশেষ একটা শিল্পকাজের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাসাদের এই শিল্পকাজগুলি দেখলে শিল্পীমনের একটা উত্তর মেলে। থালা, গ্লাস, ছোট ছোট প্লেট ফুলদানি, মাথনদানি, পাউডারদানি, পানখালা, পাতা-থালা, মাছ আকারের ছাইদানি, চোট্ট নাগরা জুতার সেপের ছাইদানি সিদুর কৌটা, ইত্যাদি জিনিষগুলির উপর ঐ জাতীয় নক্সা কোরে বাজারে খুবই ছাড়া হয়েছে। জিনিসগুলি সত্যই মনোরম এবং শিল্প হিসাবে বেশ উচুদরেরই শিল্প।

শুনুন, একটা অভিনব খাদ্যের কথা

সুরঞ্জনা সেন

গ্রীষ্মে আর শীতে—দুই ঋতুতেই চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষের ব্যাঙের ছাতা (ছত্রাক) চাষের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে। অতীতে দুর্ভিক্ষের সময় যখন দেশে খাদ্যের অনটন বিশেষভাবে দেখা দিতো, বিশেষ ক'রে মাংসের অভাব তখন ওই দেশের লোকেরা মাংসের পরিবর্তে ছত্রাকের ব্যবহার শুরু করে। অবশ্য, মাংসের বিকল্প খাদ্য ছত্রাক কখনোই হতে পারে না। তবে ভোজনের উপযোগী ছত্রাকে আছে প্রচুর বি ওয়ান, বি টু এবং ভি ভিটামিন, যা বিশেষ রোগের প্রতিরোধক এবং ছত্রাক ছাড়া অন্য উদ্ভিদের দুর্লভ। এমন দিনও গেছে যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার লোকেরা শুধু ভুঁই-কোঁড় বা ছত্রাক খেয়েই দিন কাটিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশেই একটি উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ছত্রাক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রায় দেড় হাজার রকম ছত্রাক জন্মায়। এদের মধ্যে আশি রকম ছত্রাক বিষাক্ত। বাট রকম ছত্রাক বেশ উপাদেয় এবং নিশ্চিন্তে খাওয়া চলে। বাকি সব ছত্রাক খেতে হ'লে একটু দেখে শুনে নিতে হয়। কোন ছত্রাক খাদ্য আর কোন ছত্রাক বিপজ্জনক তা নির্ণয় করার জন্য ওই দেশে অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন। তাছাড়া, ছত্রাক বাছাই করার সময় যে কথাটা মনে রাখা উচিত তা হলো যে ছত্রাকটি আপনার অপরিচিত এবং যার সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত নন তা কক্ষনো খাবেন না। চেকোশ্লোভাকিয়ার বহু শহরে বাগান করার মতো ছত্রাকের চাষও অনেকের শখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির গায়ে একফালি জমি থাকলেই হলো; ওই জমিতে তারা চাষ করবেন ছত্রাক।

চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ রাস্তা-ঘাটে বা ট্রামে-বাসে চলতে গিয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সময়ও ছত্রাক-প্রসঙ্গের অবতারণা করে। যেমন: "তিনদিন ধ'রে তো বৃষ্টি হয়ে গেলো। গতরাতে বেশ গরম পড়েছিলো। অথচ বাতাস ছিলো না। ছত্রাকগুলো বোধহয় মাটি ফুঁড়ে ফনফন ক'রে উঠেছে।" বেলা পড়ে এলে হয়তো দেখা যাবে এক বুড়ি চমৎকার ছত্রাকার ছত্রাক নিয়ে এক বুড়ো ট্রামে ক'রে বাড়ি ফিরছে। সেই বুড়ির দিকে ট্রাম-যাত্রীদের সবার চোখ। অনেকের জিভে বোধ হয় জলও এসে গেছে। "মাফ করবেন, এমন সুন্দর ছত্রাক কোথায় পেলেন?" এই একই প্রশ্নের জবাব বুড়োকে অন্তত বার তিরিশেক দিতে হয়েছে। ওই দেশের লোকেরা রাতে যে বিচিত্র কার্পেটের স্বপ্ন দেখে তা হয়তো ছত্রাকের। ও-দেশের প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই যে দৃশ্য দেখে বহিরাগতরা অবাক হয়ে যান তা হলো প্লাটফর্মের এখানে-ওখানে বেতের বড়ো-বড়ো ঝুড়িতে নানা রঙের, নানা আকারের ছত্রাক।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে ভেজা ঘাসের উপরে ছত্রাকগুলি যেন উৎসুক মুখ বাড়িয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। সংগ্রাহকেরা টর্চের আলোর সাহায্যে তাদের খুঁজে বের করে এবং ঝুড়িতে তুলে নেয়। কোনো কোনো সংগ্রাহক ছত্রাকের সন্ধানে বনের মধ্যে দশ-পনেরো মাইলেও ঢুকে পড়ে। ক্লান্তি বোধ করেনা, কিংবা ছত্রাক তেমন পরিমাণে না পেলেও দুঃখিত হয় না। গাড়িতে ক'রে গিয়ে ছত্রাক কুড়োনো কিংবা পেশাদার সংগ্রাহকদের কাছ থেকে ঝুড়ি ক'রে কেনা তা নিজের আবিষ্কৃত ব'লে চালিয়ে দেয় ওদেশে খুবই নিন্দা এবং লজ্জার বিষয়। পায়ে হেঁটে এবং কষ্ট ক'রে সংগ্রহ করতে হবে তবেই না আনন্দ। সারাদিন সন্ধানের পর বিকেলে সংগ্রাহকেরা বাড়ি ফেরে। যে ছত্রাক সে সংগ্রহ করেছে তা নিজেদের জন্য কিছু রেখে বাকি সব আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে ঝুড়ি ভরে পাঠায়।

কোন বাড়ির নিচে ছত্রাক মাথা তুলবে ব'লে অপেক্ষা করছে, কোনটা খাস আর কোনটা বিষাক্ত ইত্যাদি বিষয় বাড়ির বুড়ো-বুড়িরা অতি আগ্রহের সঙ্গে বাচ্চাদের শেখায়।

ওদেশের একজন অভিজ্ঞ সংগ্রাহক চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় বসে এবং তিরিশ গজ দূর থেকে চোখে দেখে ভোজনের উপযোগী ছত্রাক চিনে নিতে পারে ; এমনকি তা সংগ্রহ করার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলে চেন টেনে হয়তো গাড়ি থামিয়েই বসে। ছত্রাক-সংগ্রাহকের স্বপ্নই হলো বিরাট আকারের ছত্রাক খুঁজে বের করা। সে-রকম ছত্রাক খুঁজে পাওয়া গেলে তা প্রদর্শনীতে দেয়া হয়, সংগ্রাহকের ছবি এবং তার সম্পর্কে লেখা বেরোয় দৈনিক সংবাদপত্রে।

ছত্রাক-চাষ ও ছত্রাক সংগ্রহ সম্পর্কে লোককে শিক্ষা ও নির্দেশ দেবার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়াতে একটা সমিতি পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছে। এর সদস্য-সংখ্যা বর্তমানে চার হাজার।

ওদেশে ছত্রাক সংগ্রাহককে সকলেই সমীহ করে। ছত্রাক সম্পর্কে স্কুলে নানা কথা শেখানো হয়, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে।

আর ছত্রাক যখন রান্নাঘরে এসে হাজির হয় তখন তা থেকে যে কত রকম মুখরোচক খাবার তৈরী হয় তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের দেশেও তো কেউ-কেউ ছত্রাক-ভোজী। এ-দেশে যে-রকম খাদ্যের অভাব তাতে ছত্রাকের চাষ ও খাবার হিসেবে তার ব্যবহার ব্যাপক হলে ভালোই হবে আশা করা যায়।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিগত যুগের যবনিকায়ক

ভূমেন রায়

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য নাটকের অভিনয় হচ্ছে। সৌখিন সম্প্রদায়ের অভিনয়। তার মধ্যে 'রম্ভা' নামে ইউরোপীয় সৈনাধ্যক্ষের ভূমিকায় অভিনয় করছে একটি বাঙালী তরুণ! অদ্ভুত তার অভিনয়। চলন-বলন ভঙ্গী আর অভিব্যক্তি—কে বলবে এ অভিনেতা বাঙালী!

তাকেই আবার দেখলাম অনেকদিন পরে পেশাদার মঞ্চে নাট্যনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের নাট্যরূপে গোরার ভূমিকায়।

নানা ধরনের বিভিন্ন চরিত্রে সমান দক্ষতার ছাপ রেখেছেন প্রাগ্রোজ্জ্বল শিল্পী ভূমেন রায়।

ভূমেনের জন্ম ১৮৯৯-এর ডিসেম্বরে রংপুর জেলার কাকিনার গ্রামে।

১৯১৬ সালে কলকাতার মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে ৪৯ বেঙ্গলী রেজিমেন্টে যোগ দেন। সৈনিক হিসেবে ভূমেন রায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

পেশাদার মঞ্চে যোগ দেন কতকটা ঘটনাচক্রে এবং অগ্রজ রবি রায়ের (খনামখ্যাত অভিনেতা) আগ্রহে।

১৯২৭ সাল। শিশিরকুমার পরিচালিত নাট্যমন্দিরের অবস্থা ভাল নয়। শিশিরবাবু অসুস্থ হয়ে বায়ু পরিবর্তনে গিয়েছেন। থিয়েটার চলছে না।

এহেন অবস্থায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী এবং রবি রায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন এবং রম্ভার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে ভূমেন রায়কে ডেকে আনলেন। ঐ পার্ট ভূমেন সৌখীন অভিনয়ে আলিয়ে দিয়েছেন।

১৯২৭ সালের মার্চ মাসে রম্ভার ভূমিকায় ভূমেনের পেশাদার মঞ্চে পদার্পণ। তখন ছিলেন অ্যামেচার। ১৯২৮ সালে যখন মিনার্ভায় স্থায়ীভাবে যোগ দিলেন তখনো তিনি অ্যামেচার। ঐ বছরই নাট্যমন্দিরে সাজাহান নাটকের এক সম্মিলিত অভিনয়ে যশোবন্ত সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করে ভূমেন রায়ই সবচেয়ে বেশি করতালি পেয়েছিলেন দর্শকদের কাছ থেকে।

যুদ্ধের শেষে ভূমেন কাস্টমস-এর প্রিভেনটিভ অফিসারের চাকরি পেয়েছিলেন। তাই যখনকে তিনি ছিলেন অবৈতনিক শিল্পী। কিন্তু ঐ থিয়েটার করা নিয়েই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

১৯৩০ সালে মনমোহন থিয়েটারে মেঘনাদে মেঘনাদ, কারাগারে কংস, ১৯৩১-এ অপেরায় চন্দ্রকেতু, ১৯৩২-এ সতীতীর্থে শোভনলাল, আঁধারে আলোর বৃত্ত, তারপর ১৯৩৩ সালে রবি রায়ের আহ্বানে রঙমহলে যোগ দিয়ে মহানিশা নাটকে রজরাজের চাটপ-চরিত্রটি অভিনয় করে দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন।

রঙমহলে পরপর অনেকগুলি নাটকে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের আনন্দ দেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অশোকে বীতশোক, পতিব্রতায় বিমল, কারাগারে শিবরাম, বাংলার মেয়েতে অনিল, রাবণে রাবণ, পথের সাথীতে নরেন্দ্র।

রঙমহল থেকে ভূমেন রায় নিকেতনে যোগদান করেন এবং কেদার রায় নাটকে কার্ভালোর ভূমিকায় অপূর্ব নাট-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। গোরা নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেও প্রভূত যশ লাভ করেন।

তারপর স্টার, রঙমহল, নাট্য নিকেতন প্রভৃতি মঞ্চে বহু নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্রে ভূমেনের অভিনয়-প্রতিভা আরও ব্যাপ্তি লাভ করে। তাঁর শেষ মঞ্চাবতরণ ১৯৪৩ সালের ২৮শে এপ্রিল। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে সাজাহান নাটকের যশোবন্ত সিংহের ভূমিকায় তাঁর শেষ অভিনয়।

শ্রীরঙ্গমে অভিনয়ের পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাস দুই রোগ ভোগের পর ১৯৪৩ সালের ২৯শে জুন সন্ধ্যায় পরলোক গমন করেন।

চলচ্চিত্রেও তিনি বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। চিরকুমার সভা, মহুয়া, বিদ্রোহী, সাড়ে বাহাত্তর, বরযাত্রী, পথের শেষে, পরপারে, বিষবৃক্ষ, মহানিশা, সোনার সংসার, নরনারায়ণ, পথ ভুলে, অবতার, পতিব্রতা, সমাধি প্রভৃতি ছবিতে তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয়ের স্বাক্ষর আছে।

মঞ্চে, পর্দায়, গোরা সেনানায়ক, ইউরোপীয় নায়কের ভূমিকায় ভূমেন রায়ের অভিনয় ছিল তুলনাহীন।

যাঁরা তাঁর প্রতাপাদিত্যে রঙ্গা, কেদার রায়ে কার্ভালো, টিপু সুলতানে মীরসাহেব, প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছেন তাঁরা তাঁকে কোনদিন ভুলবেন না।

ভেতোদীপ্ত বেপরোয়া ভাবে তিনি অভিনয় করতেন আর তার ভিতর থেকে ফুটিয়ে তুলতেন চরিত্রটির মধ্যে লুকনো ঘরবাসী মানুষটিকে।

রাশিয়ার রঙ্গালয়

এলসার রাইস্

রঙ্গালয় সোভিয়েট রাশিয়ার এত জনপ্রিয় যে আসন সংগ্রহ করাই একটা সমস্যা। আমি আমার পরিচিত প্রভাবশালী আলাপীদের সাহায্যেই কোনো রকমে বেশির ভাগ প্রদর্শনীর জন্য টিকিট সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। রঙ্গালয়গুলি বৎসর অনুক্রমে চলে, টিকিট মাসাধিক কাল পূর্বে বিক্রি হয়ে যায়, এবং বিক্রি হয় কতকগুলি সুসংগঠিত দলের ভিত্তিতে। যেমন এক রাত্রিতে ইস্পাত কারখানার কর্মীদের কাছে বিক্রি করা হল টিকিট, পরের রাতে ফিনল্যাণ্ড রেল রোড স্টেশনের কর্মচারীদের কাছে কিংবা কোনো শাখা পোস্ট অফিসে বিক্রি করা হল। মস্কোতে রোধকরি প্রায় ত্রিশটি রঙ্গালয় আছে। প্রত্যেকটিরই তৈরী নাটক আছে অনেকগুলি। নাটক, অপেরা, ব্যালে আছে— সেগুলি সাবেকিও হতে পারে, হালআমলেরও হতে পারে,

খাঁটি রুশ বা বিদেশী হতে পারে। মেজাজের দিক দিয়ে এর মধ্যে ভাবিজী বা হাসির, তুচ্ছ কিংবা অর্থপূর্ণ—সবকিছুই পাওয়া সম্ভব।

সোভিয়েট নেতারা যে কেবল প্রচারের হাতিয়ার কিংবা অবসরবিনোদন অবলম্বনের মাধ্যম হিসাবে রঙ্গালয়ের গুরুত্ব স্বীকার করেন তা নয়, সাংস্কৃতিক সংযোগের ক্ষেত্রেও এর ব্যাপক প্রভাবকে তাঁরা ধরতে পেরেছেন। শিল্পের প্রতি এই যে আসক্তি তা সোভিয়েট রাশিয়া পেয়েছে প্রাক্-বৈপ্লবিক যুগের উত্তরাধিকার হিসাবে। উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত যে কোনো লোকই জানেন যে সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের জন্যে দেশের বুদ্ধিজীবীদের আকৈশব কত মর্মন্তুদ ছিল সেদিন এবং জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্যে কত গভীর ছিল তাঁদের আগ্রহ। ঠিক সেই ধরণের আকুলতাই আজকের বৈরাচারীদেরও উজ্জীবিত করে তুলেছে। তাঁরা সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি যত শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্ষণ করুন আর শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উৎপাদনের জন্যে যত পুরস্কারই অর্পণ করুন, আসলে শিল্প এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন অবদানেই তাঁদের মন গর্বে ভরে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, দাবা খেলার মতো অকেজো কাজে সোভিয়েত দেশের সর্বজনীন উৎসাহ এবং দক্ষতা। চল্লিশ বছর আগেও দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক ছিল নিরক্ষর। আজকে নিরক্ষরতা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। শিক্ষা এখন বাধ্যতামূলক এবং সর্বব্যাপক। বই আজ এক এক সংস্করণে প্রকাশিত হয় লাখ লাখ সংখ্যায়। যেমন চিকেন্স, বালজাক স্টেইনবেক-এর বই। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় রঙ্গালয়গুলি দর্শকের ভিড়ে প্রায় উপচে পড়ে, আর প্রদর্শনীরও এত বৈচিত্র্য যা যে-কোন দেশেরই গৌরবের বিষয়ে।

চরম কথা বলার ঝোঁকে আমরা যদি বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রাশিয়ার সমস্ত নাটককেই অযোগ্য বলে নস্যাৎ করে দিই, তাহলেও অভিনয়, মঞ্চ কৌশল, পরিচালনা এবং আঙ্গিক নৈপুণ্যের তারিফ না করে পারি না, তা যতই দুর্বল হোক তাদের বিষয়বস্তু কিংবা অক্ষম হোক নাটকীয় কাঠামো। সব থেকে বড় কথা হল রঙ্গালয়গুলিতে রুশ এবং বিদেশী প্রগতী নাটকগুলির প্রদর্শন আজকাল অনেক বেড়ে গেছে। প্রগতী নাটকগুলিও রাশিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে রফতা করানো হয়। এদের মধ্যে আছে সোফোক্লিস, শেক্সপীয়র, মলেয়ার, শীলার এবং ইবসেন। নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে সোভিয়েট রঙ্গালয়ের গড়পড়তা দর্শকেরা সাধারণ মার্কিন দর্শকদের চেয়ে শেক্সপীয়রের সঙ্গে বেশী পরিচিত। অন্তত প্রয়োজনার ক্ষেত্রে তো বটেই। সোভিয়েট ইউনিয়নে আমার যাত্ত দিনগুলোতে ওথেলো ছাড়াও মস্কোতে হ্যামলেটের দুটো প্রদর্শন দেখেছিলাম। তার একটি উজবেকিস্তান থেকে আগত দল অভিনয় করেছিল, অন্যটি অভিনীত হয়েছিল বিখ্যাত ভাকটানগভ (Vockangov) রঙ্গালয়ে। দুটোর মধ্যে সোভিয়েট রঙ্গালয়ের দুটো বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় ফুটে উঠেছিল। উজবেকদের প্রযোজনার ধারা ছিল অনেক সুন্দর এবং নীরস। কারণ সবে তারা যাযাবর জীবন কাটিয়ে সভ্য জীবনে পা দিয়েছে, তাদের কোনো রঙ্গালয়ের পটভূমিকা ছিল না। অভিনয়ের পর আমি পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। লোকটি রুশ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে হ্যামলেটের মতো উঁচু পর্যায়ের নাটকের বদলে তাঁদের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত কোনো সরল সাধারণ নাটক তিনি বাছাই করেন নি কেন। তিনি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিলেন, প্রথমে রঙ্গালয়ে ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের মিশে যেতে হবে। তার পরেই, তখন তারা এ নীতিগুলি আত্মসাৎ করতে পারবে, তখনই তারা নিজের জীবনের চারপাশের ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারবে ভাল ক'রে। এই মতের সঙ্গে একমত হই বা না হই তাহলেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে রাশিয়ানরা রঙ্গালয়কে কতো গভীরতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

পশ্চিমের সঙ্গে তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়ায় বেতনের হার অপেক্ষাকৃত কম, আয়ের অন্তর এবং

ব্যক্তিগত বিধি-নিষেধ শুরুতর। কিন্তু এই শিল্প যাঁদের পেশা, সমাজের চোখে তাঁরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাভাজন। জনসাধারণের স্বীকৃতি ও সরকারী খেতাব অনেক এসে পড়ে তাঁদের কাছে। এঁদের কেউ কেউ গাড়ি এবং শহরের বাইরে বাড়ী পর্যন্ত পায়। আমি আমার নাট্যকার বন্ধু এফিনেসেনভের বাড়ী গিয়েছিলাম। মস্কোর কাছেই পাইন বনের মধ্যে সুন্দর বাড়ী। বাড়ীর মধ্যে গাড়ি রাখার গ্যারেজ, টেনিস কোর্ট এবং অন্যান্য অনেক সুবিধা আছে, যা অনেক সোভিয়েট নাগরিকের নেই। অবশ্য পৃথিবীর অন্য সব কিছুর মতই এরও একটা মূল্য আছে। সে দামটা হল সরকারী মতের সমর্থন। আর শিল্পীরা যেহেতু নিজের বিশেষ ব্যক্তিত্বকে জাহির করতে চান, তাই তাঁদের পক্ষে এটা একটু বেশী খেসারতই বলতে হবে। কিন্তু এ দাম পশ্চাত্যেও দিতে হয় বৈ-কি। হলিউডের লেখকরা ছায়াছবির মোগল বাদশার হুকুমে জনসাধারণ কি চায়, না চায় মেনে নিয়েই লিখে দেন কাহিনী। এমন অভিনেতাও আছেন, টেলিভিশন অনষ্ট্যাক্ট রাখতে গেলে যাঁকে সুপ (Soup) বা সাবানের বিক্রি বাড়াতে সাহায্য করতে হয়। অবশ্য বড় একটা পার্থক্য হচ্ছে এই যে, পশ্চিমের আওতায় শিল্পীর নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ বলে একটা বস্তু আছে, একনায়কতন্ত্রে তা নেই।

তাহলে দেখা গেল যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতই রাজনীতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সোভিয়েট ইউনিয়নেও আপন আপন বৈশিষ্ট বিস্তার করেছে রঙ্গালয় শিল্পের উপর।

রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল চিরজীবন সঙ্গীতের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য বলিয়া মুক্তমুখে প্রশংসা করিতেন। সুর বা তালের কোনরূপ অঙ্গহানি তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এক রাত্রে অভূতপূর্ব মিত্র বিরচিত সাবিত্রী সত্যবান গীতিনাট্যের অভিনয় হইতেছে। রামতারণবাবু সত্যবানের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। পতিবিয়োগে সাবিত্রী শোক-সঙ্গীত গাহিতেছে।

নেপথ্যে যিনি হারমোনিয়ম বাজাইতেছিলেন, হঠাৎ কেমন তাঁহার সেদিন বেফাঁসভাবে হাত পড়িয়া গিয়া শোক সঙ্গীতটি বেসুরা হইয়া গেল। আর যায় কোথায়। রামতারণবাবুর কানে গিয়া তাহা তীরের মতো বিঁধিল। আর কি রক্ষা আছে! তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া, তিনি যে সত্যবানের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছেন—সমস্ত ভুলিয়া গেলেন—তাড়াতাড়ি উঠিয়া সবেগে হারমোনিয়ম বাদকের দিকে ধাবিত হইলেন। সহসা মৃত সত্যবানকে জীবিত মূর্তিতে দেখিয়া প্রেক্ষাগারে একটা ভীষণ হাসির রোল উঠিল।

থিয়েটারের ভিতরে বিশিষ্ট অভিনেতারা সান্যাল মহাশয়কে বলিলেন, "রামতারণবাবু, আজ এ কি একটা ছেলেমানুষী করলেন!"

রামতারণবাবু সেদিকে কর্ণপাত করিলেন না—তিনি তখন হারমোনিয়ম-বাদকের নিকট কৈফিয়ৎ লইতে ব্যস্ত—কেন গান বেসুরা হইল?

নাট্য আন্দোলন ও গ্রুপ থিয়েটার

কালবিহারী সরকার

একদিকে যেমন গ্রুপ থিয়েটারগুলির অধিকাংশের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি সুস্থ সচেতন শিল্প মানস, বাংলার নাট্য আন্দোলনকে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের দিকে প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছে, তেমনি আবার অন্যদিকে একদল অতি আধুনিকতার দাবীদার জীবনকে না দেখে, জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির সঙ্গে পরিচিত, বা জীবনদর্শন সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে, বাস্তবতার নাম করে একমাত্র জৈবিক দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে নাট্যাঙ্গনে আবর্জনা ছিটিয়ে চলেছেন।

অবশ্য এ ধরণের শিল্পবিচ্যুতি সব যুগেই কম বেশী দেখা দেয়। নৈরাশ্যবাদ, অপরাধ-প্রবণতা, উগ্র ও বিকৃত যৌনচিন্তা, মোহভঙ্গজাত নিষ্ঠুরতা, বিচার বিমুখতা প্রভৃতি থাকে এর মূলে। স্বীকৃত সামাজিক মূল্যবোধের অস্বীকৃতি এদের আনন্দ বর্ধন করে। এই ধরনের সামাজিক দায়িত্বহীনতা, অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত মনের পরিচয়, আধুনিক উপন্যাস বা গল্পসাহিত্যে যেমন দেখতে পাওয়া যায় তেমনি নাটকেও এ ধারা অনুপস্থিত নয়।

আমার ধারণা, সমাজ বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরকে বুঝতে না পারলে এবং তার প্রধান ও অপ্রধান দ্বন্দ্ব সমূহের পার্থক্যকে ধরতে না পারলে দ্বন্দ্ব নিরসনের ধ্রুব পন্থাটি থাকে অজ্ঞাত। ফলে জটিলতার অন্ধকার জালে জড়াতে জড়াতে এক সময় ক্লান্তি, হতাশা ও লক্ষ্যভ্রষ্টতার শিকার হতে হয়। অসুস্থ যৌন চেতনাকে শিল্পজাত করার অন্তর্নিহিত কারণগুলির মধ্যে যেমন আছে একদিকে সচেতন অপপ্রয়াস তেমনি আবার ক্ষেত্রবিশেষে আছে সমাজ বিন্যাসের অসম গতি প্রবাহ। পূর্ব যুগের সাহিত্য বা নাটকে সংশয়, বিদ্রূপ বা নৈরাশ্যের মধ্যেও গাম্ভীর্য বা সততার অভাব ছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু বর্তমানে মানব-জীবন বিরোধী অসুস্থতার উৎকট প্রকাশ ঘটছে। এ সম্বন্ধে সতর্ক হবার সময় তো এসেইছে, তাছাড়া তীব্র প্রতিবাদে এ বিষবৃক্ষের মূল অচিরেই উৎপাটিত করার প্রয়াসের দিনও আজ উপস্থিত। না হলে যা কিছু মহৎ ও কল্যাণকর, যা কিছু শ্রেয় এবং প্রেয় তা এই অবক্ষয়ের গ্লানিকর পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

এই প্রসঙ্গে, নাট্যকার ও নাট্যমঞ্চের দায়িত্ব কী—এই ছোট অথচ সর্বগ্রাসী প্রশ্নটি এসে পড়ে। থিয়েটার এমন একটি পবিত্র মঞ্চ যেখানে জনসাধারণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা মনে করানো যেতে পারে। "লোকশিক্ষার জন্য যত রকম আয়োজন সকল জাতির মধ্যে আছে তার মধ্যে রঙ্গমঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ—" বলতেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার।

একটা জাতির জীবনে নাট্যমঞ্চ ও নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম। নাট্যকারকে হতে হবে সমাজ সচেতন, তাঁর দৃষ্টি হবে দিগন্ত প্রসারিত, জাতীয় জীবনের নতুন অঙ্কুরের মধ্যে তিনি খুঁজে পাবেন ভবিষ্যতের সম্ভাবনের পরিচয়, অনাগতকে আহ্বান জানিয়ে সমাজ বিকাশের সহায়ক হবেন তিনি। জীবনের মহোত্তম মূল্যবোধগুলিকে যেমন তিনি সযত্নে লালন করবেন তেমনি আবার বর্তমানের পটভূমিকায় আগামী দিনের নতুন শ্রেয়তর মূল্যবোধগুলিকে এগিয়ে আনার বোধনের তিনি হবেন পুরোহিত।

বাস্তবের অনুকরণ মাত্র নয়, বাস্তবানুসারী মহোত্তম জীবনোপলব্ধি নাট্যকারের সাধনা। তাই তিনি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা।

নবনাট্যের উপর প্রত্যাশা ছিল সমাজ-মানসের সামগ্রিক চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটবে তার নাট্য-রচনায়। কিন্তু নবনাট্য কতকগুলি আংগিক ও রূপনির্মিতির বেড়াজালে আটকে পড়ে আছে। কারণ

বোধহয় "টনিক" বা বিশেষ মতবাদ প্রচারের অতি উৎসাহ। ফলে নাটক হয়ে উঠছে প্রচারধর্মী। সময় সময় স্লোগান-সর্বস্ব। এ সম্বন্ধেও সতর্কতার সময় এসেছে। আজকের বাংলার অজস্র নাট্যসৃষ্টির মধ্যে দু'চারজন শক্তিমান লেখকের আবির্ভাবের সূচনা দেখা যায়। কিন্তু সঠিক পথের দিশারীর অভাবে এঁদের অনেকের সৃষ্টিই প্রচার সর্বস্বতায় পরিণত।

এ ছাড়াও আর এক ধরণের শিল্পবিচ্যুতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বাংলা নাট্যজগতে। যাকে বলা যায় আত্মসচেতনতা বা প্রকারান্তরে আত্মসচেতনতা। এই গ্রুপগুলির ধারণায় নাটকের দর্শক বুদ্ধিজীবি ও অর্ধবান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অর্থবানদের অবশ্য বুদ্ধিহীন বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। এঁদের ধারণা, এঁরা সব ইনটেলেকচুয়াল নাটক করেন অর্থাৎ মস্তিষ্ক নিস্তর নাটক বা তথাকথিত বুদ্ধিজীবি ছাড়া আর কারো বোধগম্য হবার কথা নয়। শিক্ষার অভিমান, জ্ঞানের বড়াই প্রভৃতি নীতিগতভাবে শিল্পসৃষ্টির সহায়ক নয়। কারণ সর্বব্যাপক ও সর্বগামী হবে যে শিল্প তা সাধারণ অসাধারণ সকলের হৃদয়কেই কোন না কোন ভাবে নাড়া দেবে। মানুষের মনকে যদি মানবিক আবেগসমূহ স্পর্শই করতে না পারে তবে তার কারুকৃতি যাই হোক না কেন, লোকশিক্ষার বাহন নাট্যকর্ম হিসাবে তা অপ্রয়োজনীয়। আমাদের এই সকল বন্ধুরা যদি আত্ম-সমালোচনার দিকে একটু নজর দেন তবে আশা করি এ বিচ্যুতি মুক্ত হতে দেরী হবে না।

নাট্যপ্রবাহ

গিরিশ নাট্যসংসদ। গত মাসে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে এঁরা 'বাঁশের কেল্লা' নাটকটি অভিনয় করে বহু দর্শকের প্রশংসা ভাজন হয়েছেন। প্রত্যেক শিল্পীই নিজ নিজ চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে অভিনয় করলেন। ফলে সমগ্র নাটকটি আগাগোড়া পরম উপভোগ্য হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ পাল, বিমান সরকার, কেষ্ট সিংহ, গৌর পাল, সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্লিকা দাস, দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, সুধা সরকার, ও নিখিল দাস। নাটকটি পরিচালনা করেন, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

যান্ত্রিক। পূজার সময় যান্ত্রিক সংঘ পর পর দু'দিন দুটি একাঙ্কিকা অভিনয় করেন। প্রথম দিন অভিনীত হয় নবগোপাল রায়চৌধুরীর 'ধনী কারা', দ্বিতীয় দিন, অরুণকুমার দের 'আগন্তুক'। দুটি নাটকের শিল্পীরাই প্রাণবন্ত অভিনয় করেন। অজিত দে, অমর হালদার, রাজেন দাস, দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়, উদয়শংকর মুখোপাধ্যায়, অমর দে প্রমুখ শিল্পীরা দুটি নাটকে অংশগ্রহণ করেন। নাটক দুটি পরিচালনা করেন 'যন্ত্রনির্দেশক'।

আংগিক। সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে এই সংস্থার সভ্যরা বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলামের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। নাট্যরূপকার—তাপস সে। নির্দেশনা—সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সামগ্রিক অভিনয় সুন্দর। তার মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, শিপ্রা সাহা, ভূমিকা ভট্টাচার্য, নমী চৌধুরী ও জয়বন্ধু রায়।

আর্টিস্ট আর্স রিক্রিয়েশন ক্লাব। কয়েকদিন আগে স্টার মঞ্চে এই ক্লাবের সভ্যরা মঞ্চস্থ করেন নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বহ্নিশিখা'। পরিচালনায় স্নেহময় রায়চৌধুরী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। শিল্পীদের মধ্যে দেবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমনাথ রায় চৌধুরী এবং স্ত্রী চরিত্রের প্রত্যেকটি শিল্পী সুঅভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন।

যুবনাট্য সমাজ। চন্দননগর। সম্প্রতি এঁরা স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কালের হৈনাক' নাটকটি অভিনয় করলেন। পরিচালনায় সাধনা প্রসাদ বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

অভিনয়ে অরুণ নন্দী ও মায়া মৈত্র সর্বাধিক প্রশংসা অর্জন করলেও অন্যান্য ভূমিকায় শান্তি নন্দী, নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহাস গুহ, বরুণ নন্দী, রবীন দত্ত, সুকুমার শুভ ও শ্রীলেখা দত্ত প্রমুখ শিল্পীরাও যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের চরিত্রগুলি রূপায়িত করেন।

বাণী বিতান। গত ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় উক্ত সংস্থার সভ্যরা হেমন্তদার কাছে লাহাভবনে একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড পত্রিকার সম্পাদক সুধাংশু কুমার বসু। আলোচনা, স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ উমা রায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎ মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুশীতল দত্ত, প্রশান্ত মিত্র, ডাঃ শৈলেন ভট্টাচার্য, উমা দে শীল, শিবাজী চক্রবর্তী, সত্যবতী রায়, মীরা সিংহ, তপন বসু, কালীপদ দাস ও শিবাজী বসু। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন নির্মলেন্দু বসু, প্রভাস চক্রবর্তী, শম্ভু অধিকারী ও কার্তিক বসু।

টেগর সোসাইটি (জামশেদপুর)

বিষ্ণুপুরস্থিত 'মিলনী' মঞ্চে টেগোর সোসাইটী সম্প্রতি তাঁদের প্রথম নাট্যপ্রয়াস রবীন্দ্রনাথের "ল্যাবরেটরি" মঞ্চস্থ করেন। প্রথমে কাহিনীর নাট্য-রূপকার শ্রীদিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটী ভাষণ দেন। টেগোর সোসাইটি রবীন্দ্রনাথের এই দুরূহ কাহিনীকে জনসমক্ষে রূপায়িত করার দুঃসাহসের জন্য সাধুবাদ পাবার যোগ্য। নাটকের যেখানে সূচনা সেখানে আমরা 'সোহিনী'কে কতকটা নিষ্প্রভ দেখি। যৌবনের উদ্দামতা, তার চরিত্রগত বিশ্বিক উদ্বেগ ও প্রাণ-চঞ্চল গতিবেগ কিছুটা স্তিমিত। অতি অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মনে আলোড়ন ও শিহরণ জাগিয়ে তোলার যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও সংযত মর্যাদাপূর্ণ অভিনয়ের তাৎপর্যপূর্ণ আঙ্গিককে বেছে নিয়েছিলেন শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়। নীলার ভূমিকায় শ্রীমতী গীতা বসুর প্রাণবন্ত অভিনয় উচ্ছ্বাসের, বিশেষত তরুণ-বন্ধুর পক্ষে এমন চটুল চঞ্চল অভিনয় বিস্ময়কর। শ্রীশিশির সেনের সাবলীল অভিনয়ও দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল আর আর আনন্দ দিয়েছিল বাঙ্ময় ম্যানেজার ব্রজেন হালদাররূপী শ্রীপুণ্যব্রত সিংহ রায়ের স্বচ্ছগতি ও বাচন ভঙ্গী। শ্রীপ্রদীপ চক্রবর্তীর অভিব্যক্তি ও রূপায়ণ চরিত্রোপযোগী। শ্রীদীপেন মুস্তাফির ছোট ভূমিকা সুঅভিনীত। অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হোয়েছিলেন সর্বশ্রী মলয় ঘোষ (বসু—এটর্ণী), সলিল ঘোষ (প্রমোদরঞ্জন), প্রদীপ দে (বয়) পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম মহিলা), শাশ্বতী মুখোপাধ্যায় (২য় মহিলা), ও আভা দত্ত (পিসিমা)।

নৃত্য নাট্য শ্যামা। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে আংগিকে, সংগীতে, এবং কাহিনীর মানবিক আবেদনে নিঃসন্দেহে শ্যামা সর্বশ্রেষ্ঠ। এই নৃত্যনাট্যের সার্থক রূপায়ণ সহজ নয়। বলতে আনন্দ বোধ করছি, চলোমি সংঘের তরুণ সভ্যদের দ্বারা সম্প্রতি কালী বিশ্বনাথ মঞ্চে পরিবেশিত এই নৃত্যনাট্যের অভিনয় দেখে আমরা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পেয়েছি। একক সংগীতে শিবনাথ মুখোপাধ্যায়, চরিত্র-সংগীতে গীতা দাস, সোমনাথ সান্যাল, হিমাদ্রি মিত্র ও সঞ্জয় সেনগুপ্ত প্রমুখ, চরিত্র-রূপায়ণে সুলেখা রায়, সুস্মিতা দাস, শংকর ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী সরকার প্রমুখ, নৃত্য-পরিচালনায় সুলেখা রায়, সংগীত পরিচালনায় গীতা দাস, যন্ত্র সংগীতে নিখিলেশ রায়, প্রভৃতি সকল শিল্পীই সুষ্ঠুভাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। হিমাদ্রি মিত্রের সুচারু ব্যবস্থাপনাও উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতির্ময়

অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফর : তৃতীয় টেস্ট ॥

ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ার ভারতের মাটিতে দর্পচূর্ণ : অস্ট্রেলিয়ার বিল লরীর দম্ভোক্তি এবং অশালীন আচরণ : ভারতের ৩য় টেস্ট জয়ের জন্য কার পর বেশী, রাষ্ট্রপতির না বেগম সাহেবার ? দুই ভারতীয় খেলোয়াড়ের জীবন-সঙ্গিনী লাভ।

এক্যাধিক কারণে ১৯৬৯ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই টেস্ট-এ ভারত যে-ভাবে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে তা বোধ হয় কেউই কল্পনা করতে পারেনি। দ্বিতীয় ইনিংস-এ দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং শক্তিকে পর্যুদস্ত করে মাত্র ১০৭ রানে সকলকে আউট করে দেওয়া রীতিমতো চমকপ্রদ ঘটনা, তাতে সংশয় নেই। এই ইনিংস-এ প্রসন্ন আর বেদীর বোলিং অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটস্‌ম্যানরা বোধ করি কোনদিন ভুলতে পারবে না। এই খেলায় বল করে ভারতের এই দুই বোলার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠ আসনের দাবীদার রূপে স্বীকৃত হয়েছেন।

তারপর দ্বিতীয় ইনিংসএ ভারতের শেষ দানে ব্যাটিং ! কী হয়, কী হয়। অস্ট্রেলিয়ায় তুখে আছে যেমন ফাস্ট বোলিং তেমনি স্পিন বোলিং। অতএব ঘুণ ধরা পিচে ভারত কি ১৮১ রান তুলতে পারবে ? ভারতের ব্যাটসম্যানদের যে বোকা ভার ! প্রথম ইনিংসে কীভাবে ছ'সাতজন আউট হলেন তা তো দেখল সবাই ! তাই সকলেরই মনে যেন সন্দেহ। খেলা শুরু হল। অতি অল্প রানের মধ্যে দুই নির্ভরযোগ্য ওপেনিং ব্যাটসম্যান ইঞ্জিনিয়ার আর মানকড় আউট হয়ে গেলেন ! দর্শকদের বুক দুর দুর করতে লাগল। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী যেন ম্যাচ জিতে গেছি এই ভাবে আক্রমনাত্মক ফিল্ড সাজাতে লাগলেন। দিনের শেষে সব শেষে যিনি ব্যাট করতে নামেন সেই বিষেণ সিং বেদীকে পাঠানো হল। যেন তিনি সহীদ হতেই নামলেন মাঠে ; কিন্তু তিনি করলেন সেদিন। পরের দিনও অনেকক্ষণ খেললেন। খেলার মোড় যেন ঘুরে গেল ! তারপর খেলা দেখালেন দুই তরুণ তুর্কী, ওয়াদেকর আর

বিশ্বনাথ ! বিল লরীর সব আপিলই দু'জনে খণ্ডন করলেন। দু'জনের কেউ আউট না হয়ে রানলাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে দিলেন। সংকটের মুখে এমন প্রত্যয়দৃপ্ত, সাবলীল, নির্ভীক খেলা টেস্ট ক্রিকেটে খুব কমই দেখা গেছে। এই ম্যাচে ভারতের জয় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, তারুণ্যের জয় !

তারপর, এই টেস্ট-এ অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরীর অশোভনপূর্ণ আচরণের জন্যেও ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ক্রিকেট এক মহান অনিশ্চয়তার খেলা। চিরকালের এই আপ্তবাক্য ভুলে গিয়ে বা গ্রাহ্য না করে তৃতীয় টেস্ট-এর প্রাক্কালে অস্ট্রেলিয়ার উদ্ধত অধিনায়ক ঘোষণা করলেন, তিনি যদি এই টেস্ট-এ টসে জেতেন তাহলে খেলাতেও নিশ্চয়ই জয়লাভ করবেন সহজে তিনদিনেই। এ রকম অসতর্ক অহংকৃত উক্তি কোন ক্রিকেট অধিনায়কের মুখেই বোধ করি কোনদিন শোনা যায় নি। টসে তিনি জিতলেন। তারপর ? তারপর সবাই জানেন কী শোচনীয় ভাবেই তিনি হারলেন ! শেষ পর্যন্ত যেন ছেড়ে দে যা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। আর শুধু উক্তিই নয়, মাঠের মধ্যে ব্যাটিংএর সময় আচরণেও এই অধিনায়ক অত্যন্ত অশালীনতার পরিচয় দিয়েছেন ! ক্রিকেটের মহৎ ঐতিহ্যসম্পন্ন খেলার প্রতিনিধিরূপে কোন অধিনায়ক বিদেশ নগরে এসে সেখানকার ক্রিকেট মাঠের পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে বিপক্ষ দলের উইকেট-কীপারকে ভেংচি কেটেছেন, ক্লাউনের মতো অঙ্গভঙ্গী করেছেন, অসভ্য উক্তি করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত ক্রিকেটের ইতিহাসে নেই। ভারত সফরে এসে বিল লরী যে লজ্জার রেখিয়ে গেলেন তাতে তাঁর দেশের মুখ উজ্জ্বল হল না।

এই টেস্ট-এর শেষে ভারতের রাষ্ট্রপতি বললেন, তিনি যখনই কোন খেলার উদ্বোধন করেছেন তখনই সেই খেলায় ভারত জিতেছে। ১৯৫৯ সালে কানপুরে অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের টেস্ট ম্যাচ তিনিই উদ্বোধন করেছিলেন উক্ত প্রদেশের রাজ্যপাল রূপে আর সেই টেস্টএ ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। এবারেও এই তৃতীয় টেস্ট তিনিই উদ্বোধন করেছিলেন আর এই ম্যাচে ভারত আবার জিতলো। অর্থাৎ পাকে প্রকারে রাষ্ট্রপতি বললেন, তিনি পয়মন্ত মানুষ, তাঁর পরেই ভারত জিতেছে। এই কথা শুনে নবাব-বহিনী আয়েষা (শর্মিলা ঠাকুর) বলেন, বললেই হল আর কি ! কার পরে ভারত জিতল ? আমার পরে। আঁচলে গিঁট বেঁধে সারাদিন বসেছিলাম না ! মনসুরকে তো আগের রাত্রে বলে দিয়েছিলাম, এ ম্যাচ তুমি জিতবে।

এই খেলায় ভারতের গৌরবময় জয়লাভে সারা দেশে যে প্রবল আনন্দের বন্যা বয়ে গেল তাও বোধ করি এর আগে আর কখনো দেখা যায় নি। ভারতের তরুণতম খেলোয়াড় বিশ্বনাথ-ই বোধ করি সবাইকার মনে সবচেয়ে বেশী আনন্দ জাগিয়েছেন। তাঁর প্রতি দেশের মানুষের অনুরাগ এমন প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল যে তৃতীয় টেস্টএ ভারতের জয় ঘোষিত হবার অব্যবহিত পরে উত্তর কলকাতায় নার্সিং হোমে যে ছেলেটি জন্মালো তার নাম রাখা হল বিশ্বনাথ। নবজাতক বিশ্বনাথের পিতামাতাকে অভিনন্দন জানাই, ভারতের এক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনার স্মৃতিকে তাঁরা নিজেদের পুত্রের মধ্যে ধরে রাখলেন।

এই টেস্ট-এর প্রাক্কালে এবং পরে আমরা খবর পেলাম, দুই ভারতীয় খেলোয়াড়ের জীবনে পরম পরিপূর্ণতার লগ্ন এসেছে ! বিয়ের শাঁখ বেজেছে ! বিষেণ সিং বেদীর সঙ্গের সঙ্গে তাঁর বাকদত্তা অস্ট্রেলিয়ার কন্যা গ্রেনিথের বিবাহ ইতিমধ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে। আর অশোক মানকড় জানিয়েছেন, ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় মিরুপমা বসন্তের সঙ্গে তাঁর শুভ বিবাহ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। নূতনযাত্রীদের নতুন জীবনযাত্রা সর্বার্থকতা লাভ করুক, এ কামনা সকল ভারতবাসীর। বোলিংএ বিষেণ সিং আর ব্যাটিংএ অশোক ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত : খেলোয়াড় পরিচিতি ও তথ্যাদি।

কলকাতায় চতুর্থ টেস্ট হয়ে গেল। এই খেলার ফলাফল, এই ম্যাচকে ঘিরে অকুণ্ঠপুর উদ্দীপনা, মর্মবিদারক ট্র্যাজেডি, কেচ্ছা—You bloody Indian বলে অস্ট্রেলিয় খেলোয়াড়দের ভারতীয় প্রেস ফটোগ্রাফারকে প্রহার—এসব পাঠকরা ইতিমধ্যে দৈনিকপত্র মারফৎ সবিস্তারে জেনেছেন, আমরা সেসব প্রসঙ্গের পুনরবতারণা না করে এই সূত্রে দু'দলের খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কিছু তথ্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে পরিবেশন করছি।

অস্ট্রেলিয়া দল :

উইলিয়ম মরিস লরি! দলের অধিনায়ক! ভিক্টোরিয়া দলে খেলেন! বয়স বত্রিশ। হাটা ওপেনিং ব্যাট। এ পর্যন্ত ৪৩ টেস্টএ ৪০৭৮ রান। সর্বোচ্চ রান ২১০। ২২টি সেঞ্চুরি! গড় ৫০'৮৮।

আয়ান মাইকেল চ্যাপেল। সহ অধিনায়ক। বয়স ছাব্বিশ। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলে খেলেন। ২২টি টেস্ট। ৩টি সেঞ্চুরি। সর্বোচ্চ রান ১৩৫। গড় ৩৮'৬০। ভাল বলও করেন।

কেভিন ডগলাস ওয়ালটারস। বয়স চব্বিশ। নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর খেলোয়াড়। এঁকে বলা হয় দ্বিতীয় র‍্যাডম্যান। ১৮টি টেস্ট। মোট রান ১৭০৬। গড় ৭৪'১৭। ৬টি সেঞ্চুরি; সর্বোচ্চ রান ২০২। বোলার হিসেবে ১১টি উইকেট। গড় ৩৮'৮১। ১৯৬৮-৬৯ সালে ওয়েস্ট ইনডিজের বিরুদ্ধে তাঁর ৬৯৯ রানের গড় দাঁড়ায় ১১৬'৫০।

আয়ান রিচি রেডপাথ। ভিক্টোরিয়া দলে খেলেন। বয়স আটাশ। ২৮ টেস্ট। ১৬২৩ রান। গড় ৩৬'০৯। সর্বোচ্চ রান ১৩২। লেগ স্পিন বোলার এবং দক্ষ ফিল্ডার।

গ্রাহাম ডগলাস ম্যাকেঞ্জি। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। বয়স আটাশ। দুর্দান্ত বোলার। ৫৯টি টেস্ট। ২০৭ উইকেট। গড় ২৮'১৪। ১৯৬৫ সালে মাদ্রাজে ইনিংসে ৯১ রানে ১০টি উইকেট লাভ তাঁর স্মরণীয় কৃতিত্ব।

কিথ রেমণ্ড স্ট্যাকপোল। ভিক্টোরিয়ার খেলোয়াড়। বয়স ২৯। ১২ টেস্ট। ৪৭১ রান। গড় ৩০'৩৫। লেগ স্পিন বোলার।

জন উইলিয়ম গ্রীসন। নিউ সাউথ ওয়েলস দলে খেলেন। বয়স একত্রিশ। বাঁ হাত স্পিন বোলার। ১৩টি টেস্ট। ৪৭টি উইকেট। গড় ৩২ ৪১। ৬০ সালে ইংলণ্ড সফরে ২০'৬৭ রান গড়ে ৫৮ উইকেট এবং ৬৯ সালে ও ইনডিজ সফরে ৩২'৬১ রানে ২৬টি উইকেট পেয়েছেন।

অ্যালান নরম্যান কনোলি। ভিক্টোরিয়ার খেলোয়াড়। বয়স ত্রিশ। মিডিয়ম ফাস্ট্ বোলার। ১৯টি টেস্ট। ৬৪ উইকেট। গড় ৩০'৬৭।

অ্যাশলি অ্যালেকজানডার ম্যালেট। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলে খেলেন। বয়স চব্বিশ। অফ-স্পিন বোলার। নতুন টেস্ট খেলছেন। ভারতে এসে ভাল বল করছেন। ৬৮ সালে ইংলণ্ড সফরে ২৮'৩৬ রান গড়ে ৪৫টি উইকেট পেয়েছেন।

হেডলি ব্রায়ান টেবার। নিউ সাউথ ওয়েলসএ খেলেন। বয়স উনত্রিশ। উইকেটকীপার। ৭টি টেস্টে খেলে ২৭ জনকে ক্যাচ আউট এবং একজনকে স্টাম্প আউট করেছেন। ৬৯ সালে সেপ্টিক ইংলণ্ডের খেলায় ১২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৯ জনকে ক্যাচ আউট এবং এক জনকে স্টাম্প আউট করে বিশ্বরেকর্ডের সীমানায় পৌঁছানোর কৃতিত্ব অর্জন করেন।

অ্যানড্রু পল নীহান। ভিক্টোরিয়ার খেলোয়াড়। বয়স তেইশ। ১০টি টেস্ট। ৭৮৮ রান। গড় ৩৫'১৭। ভারতের মাটিতে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি।

এরিক ওয়ালটার হীথম্যান। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। বয়স পঁচিশ। ব্যাট ও বলে সমান দক্ষ। মিডিয়ম ফাস্ট্ বল করেন।

ভারতীয় দল :

নবাব পতৌদি। অধিনায়ক। হায়দরাবাদের খেলোয়াড়। বয়স উনত্রিশ। বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক। ১৯৬২ সালে ২১ বছর বয়সে দলের অধিনায়কত্ব করেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের অন্যতম। কভার পয়েন্ট-এ অতুলনীয় ফিল্ডার। ৩১টি টেস্ট। সর্বোচ্চ রান ২০৩ নট আউট। ৪টি সেঞ্চুরি।

ফারুক ইনজিনীয়ার। বোম্বাইএর খেলোয়াড়। বয়স তেত্রিশ। উইকেটকীপার ও ওপেনিং ব্যাট। ২৩টি টেস্ট। সর্বোচ্চ রান ১০৯। ৩৭টি ক্যাচ বিহাইণ্ড। ৯টি স্টাম্প আউট। ব্যাটসম্যান হিসাবে চোখ ধাঁধানো খেলার অনুরূপ।

অশোক মানকড়। বোম্বাইএর খেলোয়াড়। বয়স তেইশ। প্রখ্যাত খেলোয়াড় বিনু মানকড়ের ছেলে। বাপকা ব্যাটা বাকে বলে। ভাল খেলছেন। ১৯৬৩ সালে রণজি ট্রফিতে খেলা শুরু। বর্তমানে ভারতের নির্ভর-যোগ্যতম ওপেনিং ব্যাট।

অজিত ওয়াদেকর। বোম্বাই দলে খেলেন। বয়স ত্রিশ। ডাটা ব্যাটসম্যান। ১৩টি টেস্ট। সর্বোচ্চ রান ১৪০। ১টি সেঞ্চুরি।

একনাথ সোলকার। বোম্বাইএর খেলোয়াড়। বয়স একুশ। ডাটা ব্যাটসম্যান। সুদক্ষ ফিল্ডার। ভাল বলও করেন। রণজি ট্রফিতে ৩৯টি উইকেট পেয়েছেন।

জি. আর. বিশ্বনাথ। মহীশূরের খেলোয়াড়। দলের তরুণতম ব্যাটসম্যান। বয়স উনিশ। এ বছর প্রথম টেস্টএ নেমেই সেনচুরি করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ৬৭ সালে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে ২৩০ রান করে চমক লাগান।

এস. ভেংকটরাঘবন। মাদ্রাজের খেলোয়াড়। বয়স পঁচিশ। ৬টি টেস্ট। ভাল বোলার। ৬৪ সালে দিল্লীতে নিউজীলাণ্ডের বিপক্ষে ৭২ রাণে ৮টি উইকেট পান।

ই. এ. এস. প্রসন্ন। মহীশূরের খেলোয়াড়। বয়স ত্রিশ। এঁকে বলা হয় বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার। ১০টি টেস্ট। এবছর অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন।

সুব্রত গুহ। বাংলার খেলোয়াড়। বয়স চব্বিশ। মিডিয়ম ফাস্ট ওপেনিং বোলার। ৬৭ সালে ইংলণ্ডে গিয়ে মাত্র ১টি টেস্ট খেলেন তারপর মালাই চাকিতে আঘাত পেয়ে দেশে ফিরে আসেন।

বিষেণ সিং বেদী। দিল্লীর খেলোয়াড়। বয়স তেইশ। ডাটা স্পিন বোলার। ১১টি টেস্ট। ৩৪টি উইকেট। গড় ৩১'২০। এবছর খুব ভাল বল দিচ্ছেন।

বি. এস চন্দ্রশেখর। মহীশূরের তরফে খেলেন। বয়স পঁচিশ। ১৩টি টেস্ট। বিশেষ কৃতিত্বের নজির—৬৬ সালে বোম্বাই ওয়েস্ট ইনডিজের বিরুদ্ধে ১৪৭ রানে ৭ উইকেট।

অম্বর রায়। বাংলার খেলোয়াড়। বয়স চব্বিশ। খ্যাতনামা ক্রিকেটার পংকজ রায়ের ভাইপো। ডাটা ব্যাটসম্যান। ভাল স্ট্রোক প্লেয়ার। কিছুক্ষণ টিঁকতে পারলে মন ভোলানো খেলা দেখাতে পারেন।

সুবিন্দর অমরনাথ। উত্তর পাঞ্জাবের খেলোয়াড়। প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন ব্যাটস্‌ম্যান। বিখ্যাত ক্রিকেটার লালা অমরনাথের ছেলে।

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট তথ্য।

দু'দেশের মধ্যে মোট টেস্ট খেলা হয়েছে ২০টি। তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৫টি। ভারতের ২টি। ৩টি অমিমাংসিত।

ভারতের পক্ষে অধিনায়কত্ব করেছেন লালা অমরনাথ, ৪৭-৪৮ অস্ট্রেলিয়ায়। পলি উমরিগড় ৫৬ সালে ভারতে। জি. এস রামচাঁদ ৬০ সালে ভারতে। পতৌদি ৬৪ সালে ভারতে। চাঁদু বোরদে, পতৌদি ৬৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায়। ভারতের বিপক্ষে অধিনায়কত্ব করেছেন ডন ব্র্যাডম্যান, আই ডবলু জনসন, রিচি বেনো, রবি সিমসন ও বিল লরি।

ব্যক্তিগত সেঞ্চুরি। ভারতের পক্ষে

১৯৪৮ সালে মেলবোর্ণে ৩য় টেস্টএ মানকড়	১১৬
" এডিলেডে ৪র্থ টেস্টএ হাজারে	১১
" এডিলেডে ৪র্থ " কাদকার	১২৩
" এডিলেডে ৪র্থ " হাজারে (২য় ইনিংস-এ)	১৪৫
" মেলবোর্ণে ৫ম টেস্টএ মানকড়	১১১
৫৬ সালে বোম্বাইএ ২য় টেস্টএ রামচাঁদ	১০৯
৬০ সালে বোম্বাইএ ২য় " কনট্রাক্টর	১০৮
৬৪ সালে মাদ্রাজে ১ম " পতৌদি	১২৮০
৬৭ সালে ব্রিসবেনে ৩য় " জয়সীমা	১০১

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

৪৮ সালে ব্রিসবেনে ১ম টেস্টএ ব্র্যাডম্যান	১৮৫
৪৮ সালে মেলবোর্ণে ৩য় " ব্র্যাডম্যান	১৩২
৪৮ সালে মেলবোর্ণে ৩য় " মরিস	১০০৩
৪৮ সালে মেলবোর্ণে ৩য় " ব্র্যাডম্যান	১২৭৩
৪৮ সালে এডিলেডে ৪র্থ " বার্ণস	১১২
৪৮ সালে এডিলেডে ৪র্থ " ব্র্যাডম্যান	২০১
৪৮ সালে এডিলেডে ৪র্থ " হ্যাসেট	১৯৮৩
৪৮ সালে মেলবোর্ণে ৫ম " হ্যাসেট	১৪৩
৫৬ সালে বোম্বাইএ ২য় " বার্ক	১৬১
৫৬ সালে বোম্বাইএ ২য় " হ্যাসেট	১৪০
৬০ সালে দিল্লীতে ১ম " হ্যাসেট	১১৪

৬০ সালে বোম্বাইএ ৩য়	„	হাবডে	১০২
৬০ সালে বোম্বাইএ ৩য়	„	ওনীল	১৬৩
৬০ সালে মাদ্রাজে ৪র্থ	„	ক্যাডেল	১০১
৬০ সালে কলকাতায় ৪র্থ	„	ওনীল	১১০
৬৮ সালে এডিলেডে ১ম	„	সিম্পসন	১০৩
৬৮ সালে	১ম	„ কাউপার	১০৮
৬৮ সালে মেলবোর্ণে ২য়	„	লরী	১০০
৬৮ সালে মেলবোর্ণে ২য়	„	সিম্পসন	১০৯
৬৮ সালে মেলবোর্ণে ২য়	„	চ্যাপেল	১৫১
৬৮ সালে সিডনিতে ৪র্থ	„	কাউপার	১৬৪

ভারতের পক্ষে ৯ জন। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ২১ জন।

এক ইনিংসএ সবচেয়ে বেশী রান :

ভারত, ৫৮ সালে, এডিলেডে ৪র্থ টেস্টএ ৩৮১। অষ্ট্রেলিয়া, ঐ সালে ঐ মাঠে ঐ টেস্টএ ৬৭৮।

এক ইনিংসএ সবচেয়ে কম রান :,

ভারত, ব্রিসবেনে ৪৮ সালে ১ম টেস্টএ ৫৮, অষ্ট্রেলিয়া ৬০ সালে কানপুরে ২য় টেস্টএ—১০৫।

উল্লেখযোগ্য বোলিং :

ভারতের ভেঙ্কু প্যাটেলএর ৬০ সালে কানপুরে ২য় টেস্টএ ৬৯ রানে ৯টি উইকেট।

অষ্ট্রেলিয়ার লিণ্ডওয়াল, ৫৮ রানে ৭ উইকেট, ৪৮ সালে এডিলেডএ ৪র্থ টেস্টএ। রিচি বেনো, ৫৬ সালে মাদ্রাজে ১ম টেস্টএ ৭২ রানে ৭ উইকেট। ডেভিডসন, ৬০ সালে কানপুরে ২য় টেস্টএ ৯০ রানে ৭ উইকেট। ম্যাকেনজি, ৬৮ সালে মেলবোর্ণে ২য় টেস্টএ ৬৬ রানে ৭ উইকেট।

বর্তমান লক্ষরের খেলা এই তথ্যে ধরা হয়নি।

গল্পভারতী

পৌষ ১৩৭৬

রজত জয়ন্তী বর্ষ
পঞ্চবিংশতি বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এখন থেকেই ছেলেরা বেরিয়েছে সরস্বতীপুজোর চাঁদা আদায় করতে।

ছেলেরা বেরিয়েছে দলে দলে। কারও হাতে ছাপানো খাতা, কারও হাতে সাদা বই। দশপয়সা থেকে চার আনা আট আনা একটাকা যা দেবে দাও, তারা তক্ষুনি একটি রসিদ লিখে দিয়ে সরে পড়বে।

ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

একটি ছেলে বলেছিল, সরস্বতীর পুজো করবো ভাল করে।

বলেছিলাম, না, পুজো করা তোমাদের বৃথা। তোমরা শুধু চাঁদার টাকা আদায় করে ফুর্তি করবে। পুজো তোমাদের সার্থক হবে না।

শুনেই একজন পালিয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় বলে গিয়েছিল—চলে আয়। এ দেবে না।

আর-একটি দলের একটি ছেলেকে বলেছিলাম—'সরস্বতী' বানান করে বলতে পার তো তোমাকে চাঁদা দেবো।

ছেলেটি নির্ভুল বানান বলতে পারেনি।

তাদেরই উদ্দেশ করে আজ আমাদের এই সম্পাদকীয় লিখে দিলাম।

সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী।

আজকাল এই যে বিদ্যার্থী জনগণ শ্রীপঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করে থাকেন, এই পূজার সর্বপ্রথম প্রচলন কোথায় হয়েছিল অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম—পুরাকালে উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী কোনও একটি জনপদে নৃত্যগীতপটিয়সী কিছু সংখ্যক সুন্দরী যুবতী শহরের জনকোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে কোনও একটি নির্জন স্থানে পৃথক একটি বসতী স্থাপন করতে চেয়েছিল।

অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে শেষে নির্বাচিত হলো সরস্বতী নদীর তীরে মনোরম একটি সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর।

দেখতে দেখতে আট পনেরদিনের মধ্যে জনহীন সেই প্রান্তরে গড়ে উঠলো স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সুন্দর

জনপদ। প্রাকৃতিক সুষমামণ্ডিত নবনির্মিত এই জনপদটি শোভার সৌন্দর্যে এমনি মনোরম হয়ে উঠলো যে বহু দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে এখানে তাদের মনোমত কুটীর নির্মাণ করে বাস করতে লাগলো।

অদূরে স্বচ্ছতোয়া সরস্বতী নদী এই প্রমিলারাজ্যটিকে বেষ্টন করে প্রবাহিত। নদীর উত্তর তীরে পদ্মপুষ্পশোভিত তরঙ্গশ্রেণী, অপরাহ্ণবেলায় অস্তসূর্যের রাঙা আলো যখন নদীর জলে প্রতিফলিত হয় সুন্দরী রূপসীরা তখন দলে দলে ছুটে এসে নদীর সেই স্ফটিকস্বচ্ছ জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদিকে তখন হাস্যপরিহাস মুখরিত নদীর বাঁধানো ঘাটে বসে মেয়েদের সঙ্গীতচর্চ্চার আসর। নৃত্যে গীতে এবং বাদ্যযন্ত্রের মূর্চ্ছনায় স্বর্গের সুষমা নেমে আসে ধূলার ধরণীতে।

তাদের সেই আনন্দোজ্জ্বল জীবনে সহসা একদিন তারা অনুভব করলে একটি নিদারুণ অভাব। অভাব অনুভব করলে তাদের এই গতানুগতিক জীবনের আনন্দকে পরিপূর্ণ ভাবে নিবেদন করে দেবার মত একটি স্থানের। তাদের এই পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য্য অপরিমেয় প্রাচুর্য্যের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে—কোন্ অদৃশ্য উর্দ্ধলোক থেকে তারা এসে গেল উচ্চতর দিব্যজীবনের দিকে নবজাগরণের। তাদের চেতনার মধ্যে এসে পৌঁছোলো দিব্যজীবনের আলোর বার্ত্তা—অন্ধকারের জীবন থেকে আলোর জীবনের দিকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত।

অন্তরের পূজা নিবেদন করবার জন্য চাই তাদের সাধনালব্ধ কলাবিদ্যার এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রতিমা।

তাদের নিত্যসহচরী স্রোতস্বিনী সরস্বতী নদীর নামে নাম হলো তার দেবী সরস্বতী।

বাগীশ্বরী সর্ববিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর মৃন্ময়ী প্রতিমা তৈরি হলো। প্রতিমার মন্দির তৈরি হলো। পূজক ব্রাহ্মণ এলো। এই সব ব্রাহ্মণদের আজও আমরা বলে থাকি সারস্বত ব্রাহ্মণ।

সরস্বতী পূজার প্রবর্ত্তন হলো সেই সরস্বতী নদীর তীরে।

নৃত্যগীতবিদ্যার পারদর্শিনী এইসব নটীদের দ্বারাই প্রথম প্রবর্ত্তিত হলো দেবীসরস্বতীর পূজা উৎসব।

জনপ্রবাদ নাকি সেই তখন থেকেই বিদ্যার্থী জনগণ এই পূজা করে আসছে।

প্রতিমার পরিকল্পনা হলো শ্বেতশুভ্র, শুভ্রবরণা, শুভ্রবসনা—দেবীমূর্ত্তির কোথাও এতটুকু কালিমার লেশমাত্র নেই। এমন কি তাঁর বাহন যে মরাল—সেও শ্বেতপক্ষবিশিষ্ট। কল্পনার আকাশে—দূর দিগন্তে—স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে স্বচ্ছন্দবিহারী সে মরাল আপনার আনন্দময় মনটিকে দিতে পারে সর্ব্ব সুখ এবং সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের আস্বাদন।

শ্বেতশুভ্র বরণ কেন—এই প্রশ্ন যদি কেউ করে, তার জবাব হলো—শ্বেত শুভ্র মানে বিশুদ্ধ আলো—জ্ঞানের আলো—আনন্দের দীপ্তি। সত্যের প্রদীপ্ত প্রকাশ। কালো মানেই অন্ধকার। সেইখানেই যত মিথ্যা, যত অন্যায়, যত ব্যভিচার, যত গোপন বাসনা।

কাজেই এই সরস্বতীর পূজা যারা করবে, যারা বিদ্যার্থী—দেবী সরস্বতী যাদের আরাধনার বস্তু, তারা তাদের জীবন থেকে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাচারের কালিমাকে বর্জ্জন করবে, পরিহার করবে। তারা হবে প্রাণে মনে সত্যাশ্রয়ী, মহিমাময় বিদ্যার গৌরবে উজ্জ্বল, আনন্দময়ী মায়ের সন্তান—সব সময়েই আনন্দময়।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। বিদ্যার্থী তোমরা সরস্বতীর সেবক—তোমরা সব সময়েই হবে বিনীত এবং নম্র, চরিত্র হবে সৎ এবং সত্যাশ্রয়ী, মিথ্যা থেকে সব সময়েই দূরে থাকবে, মিথ্যাচার করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না। তখন দেখবে মন তোমার আনন্দে ভরে উঠবে, সরস্বতীর পূজা সার্থক হবে।

দেবী সরস্বতীকে যদি তুমি তোমার আরাধ্যা দেবী বলে অন্তরের পূজা নিবেদন করতে চাও, দুটো ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো না করলেও তোমার চলবে। তুমি শুধু ভাববে তুমি মায়ের সন্তান, দেবী সরস্বতী তোমার সঙ্গেই রয়েছেন। তাঁর কৃপা তোমার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তোমার তরফ থেকে সেই কৃপাকে গ্রহণ করতে পারার উপযোগী তোমাকে হতে হবে। তোমার সত্তার মধ্যে তাঁর কৃপাকে ধরে রাখবার মত আধারটিকে প্রস্তুত করতে হবে। নইলে অঞ্জলি পাতলেই যদি কৃপা এসে পড়ে, তাতে তোমার কাজ হবে না, তা আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যাবে। তোমার অন্তরের মধ্যে রয়েছে কৃপা ধারণের মত পাত্র, কিন্তু সে পাত্র আবর্জনায় পরিপূর্ণ, কালো কালিতে ভর্তি। আগে সব আবর্জনা সাফ করে পাত্রটিকে বিশুদ্ধ করে ফেলতে হবে, তবে তার মধ্যে কৃপার অবতরণ স্থায়ী হতে পারবে।

দেবী সরস্বতীর কৃপা পেতে হলে তোমাকে হতে হবে তাঁরই মত শুভ্র নিরঞ্জন—তাঁরই মত সর্ব কালিমামুক্ত বিশুদ্ধ এবং পবিত্র। তবেই তুমি হতে পারবে সরস্বতীর বরপুত্র। সরস্বতী পূজা তোমার তখনই সার্থক হবে—তোমার বিদ্যা অর্জন হবে সত্যকার আনন্দের বস্তু।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভজন গান

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবৎ আরাধনা, দেবদেবীর আরাধনা প্রভৃতি ভক্তিমূলক গান মাত্রেই ভজন নামে অভিহিত। ধ্রুপদ সঙ্গীতও ভজন পর্য্যায়ে পড়ে, কারণ অধিকাংশ ধ্রুপদই ভগবৎ বিষয় রচিত। কীর্ত্তন, ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতিও ভজন শ্রেণীভুক্ত। যে বাণী, ভাব ও সুর দ্বারা মানুষের মনকে ভক্তিমার্গে নিয়ে যায় তাইই ভজন।

তবুও ভজন গান, ভারতীয় সঙ্গীতে একটি পৃথক শ্রেণীরূপে স্বীকৃত আছে। এই বিশেষ শ্রেণীর ভজনে টপ্পা ঠুমরীর সুর ও ছন্দ সাধারণতঃ ব্যবহার হয়। এই শ্রেণীর গানে কথা ও ভাবের প্রাধান্য বেশী। ধ্রুপদ সঙ্গীতে, সুর তালের বৈচিত্র্যের জন্য অনেক সময় আরাধনার ভাব ব্যাহত হয় কিন্তু প্রকৃত ভজনে এবং কীর্ত্তনে ভক্তি ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। সেইজন্য ভারতীয় সঙ্গীতে ভজন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

ভারতের সাধক গীতিকারগণ যুগ যুগে, সহজ, সরল গানের মাধ্যমে সত্যের আদর্শকে মানব সমাজে প্রচার করে গেছেন। ভক্ত শিরোমণি কবীর এইরূপ রাম রহিমের ঐক্যের মীমাংসা এনেছিলেন এবং অন্তরকে সাচ্চা রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কবীর ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সাধক, বিশেষতঃ রহস্যবাদী কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সর্ব্বপ্রধান বলে স্বীকৃত।

কবীরের সঠিক জীবনী দুষ্প্রাপ্য। তিনি কাশীর এক ব্রাহ্মণীর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন এবং এক দয়ালু প্রতিবেশীর দ্বারা তিনি লালিত পালিত হন। এই শিশুই ভবিষ্যতে মহাত্মা কবীর রূপে খ্যাত। সে যুগে ধর্ম্মের মূল রূপ বিকৃত হয়, বাহ্য আড়ম্বর ও অন্ধ সংস্কার প্রবল হয়ে উঠে। ধর্ম্মের আদর্শ প্রেম, শান্তি ও সাধনাকে হারিয়ে মানব সমাজ পরস্পর সংঘর্ষে প্রবৃত্ত ছিল। প্রেম ও সহিষ্ণুতার প্রতীক কবীরের আবির্ভাবে মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। কবীর নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর কবিতা খুব মার্জিত না হলেও, তার স্বাভাবিকত্ব, সরলতা, গভীরতা এবং মধুর অনুভূতি অতুলনীয়। অহিংসবাদ, তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। হিন্দু, মুসলীম একতাই তাঁর বাণী। আচার্য্য রামানন্দ এবং শেখ তকীর মতবাদ। তিনি যথেষ্ট অনুশীলন করেছিলেন। তিনি নিজে লিখতে জানতেন না। শিষ্যেরা তাঁর বাণী সংগ্রহ করে রেখে গেছেন। কবীর প্রণীত কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে 'বীজক' এবং 'আদি-গ্রন্থ' কবীরপন্থীদের বিশেষ প্রিয়।

বন্যাকন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : নরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই বহরম-বহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে। সে কিনা বড়লোকের মেয়ে সরিৎকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। নরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু ঘোষ নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?]

অতঃপর নরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার ফার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। নরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের

সুবিধের জন্যেই তারিখটা লেখা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুধীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুধীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুধীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুধীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে দলিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বন্ধু দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুধীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুধীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুধীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুধীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সাহিত্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুধীরের জন্যে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুধীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার অজ্ঞাতে মধুর সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুধীরের জন্যে

আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিযোগকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্যাতন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। তাবল কোথাও গিয়ে ছবির ছুটাই। সন্দীপের কথা মনেপড়ল। সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা দিতে। হিমাংশু নিলনা, বললে, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে দেবে সেদিন খাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভয় ঢুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে ভুল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বস-এর পাল্লায় পড়ে সুবীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে শেখাল মদ খেতে। একটা কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুবীর আর নিজের গর্ভ পালন করল না। বিরোধ ঘুমায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুবীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু মাতলামির পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে নষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হলনা। তখন কুমারী মেয়ে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কললেশ তার কি বাবদ এমন এক জিনিস দাবি করল যাতে বনছায়া রাজি হতে পারল না।

দেবার্চনের পার্টিতে হিমাংশু বেশিকরে মদ খাইয়ে সুবীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম সাবণি, তাকে বলে দিল যেন সুবীরকে একেবারে তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুবীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুবীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্দীপ সেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে। নিজে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চটে গিয়ে সুবীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুবীর বনছায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে তারপর অনুরোধ করল হিমাংশুকে ধরে তাকে বম্বেতে উচ্চতর পদে বদলি করিয়ে দিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্দীপের অন্তরলোকে দ্বন্দ্ব সুরু হল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শান্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সে উদাসীন থাকতে পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে সুবীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্দীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের বাঁটোয়ারা হয়ে গেল—এক ঘরে সুবীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুবীর তার ঘরে একটা ফ্লাব বসাল যাতে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। লেখার জন্যে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্দীপেরই দ্বারস্থ হল। দেখল সন্দীপ সযত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠায় সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্দীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্দীপের বাড়িতে বসে উপন্যাস নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক পীযূষ দত্তের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল পীযূষ। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখে গিয়েছি।

বনছায়া পীযূষের সঙ্গে হোটেলে মদ খেল, এক ট্যাক্সিতে বেড়াল। তার উপন্যাস 'অবচনা' 'প্রবাহ' পত্রিকার জন্যে মনোনীত হল। তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে সুবীর গর্জে উঠল: তুমি মদ খেয়েছ? বনছায়া বললে, তুমিই তো শিখিয়েছ মদ খেতে।]

॥ আটাশ ॥

ঘোষণাটা কারু তেমন নজরে আসেনি, কিন্তু 'অবগুণ্ঠনা'-র প্রথম কিস্তি বেরুতেই সাহিত্যিক মহলে ছোটখাট একটি সোরগোল উঠল—কী ভীষণ দুঃসাহস লেখিকার। তারপরেই প্রশ্ন উঠল: কে এই বনছায়া?

চিহ্নিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না—আধুনিক কবি সুবীর রায়ের স্ত্রী।

এ অবস্থায় খবরটা হাওয়ার বেগে সুবীরের কানে না এসে ছাড়ল না। অফিস-ফেরৎ বাড়ি আসবার পথে মোড়ের স্টল থেকে একখানা 'প্রবাহ' কিনল। কাগজ খুলে দু-এক পৃষ্ঠা উল্টেই দেখল 'অবগুণ্ঠনা'—লেখিকা বনছায়া দেবী।

যেন মুখের উপর একটা চড় যেন সুবীর। অপমানে মুখ-চোখ কালো হয়ে উঠল। সন্দেহ কী, এই সেই উপন্যাস যার পাণ্ডুলিপি সে ছিঁড়ে দিয়েছিল। নতুন করে লিখল কবে, কোথায় বসে? আর সম্পাদক পীযূষ গুপ্তকে বশ করল কী উপায়ে?

রাগে ঈর্ষায় জলতে লাগল সুবীর।

বাড়ি ফিরে এসে দেখল বনছায়া তার একেবারে তার ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে আছে। মনে হল ঘরে যে আছে এই যেন তার প্রতি অশেষ অনুকম্পা।

দরজায় ধাক্কা মারল সুবীর।

'কে?'

'আমি?'

এ উত্তর বুঝি বনছায়ার কাছে আর যথেষ্ট নয়। বনছায়া তাই নিলিপ্ত স্বরে বললে, 'কে আমি? নাম নেই?'

কী অহঙ্কারের ভুরু এসে উঠেছে কণ্ঠস্বর! সুবীর এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। পরে বললে, 'আমি—আমি সুবীর।'

কেন অমন করে বললে কে বলবে? আমি আমি—এই বজ্রোচ্চার পরিচয়ই তো যথেষ্ট ছিল। আমি এ বাড়ির কর্তা, প্রভু, মনিব, অভিভাবক, সর্বত্র আমার গতিবিধির অধিকার—আমার হুকুমের আওতা – এমনি করে বললেও বেমানান হত না। কিন্তু বলবার বেলায় বলতে গেল কিনা আমি সুবীর।

কথার সুরে যেন অতীত দিনের টান লাগল।

ইচ্ছে ছিল না তবু উঠে দরজা খুলে দিল বনছায়া। দেখল সুবীরের হাতে এ সপ্তাহের 'প্রবাহ'। বুক উছলে উঠল সুবীর হয়তো তাকে অভিবাদন জানাতে এসেছে। এসেছে সাহিত্যের জয়গান করতে। কে জানে হয়তো আবার এই সাহিত্যের মধ্য দিয়েই তাদের সাহিত্য গড়ে উঠবে। কিন্তু সুবীর তো আর সাহিত্যে নয় সে এখন শুধু সমালোচনায়। সাহিত্যে যে ব্যর্থ সেই তো সমালোচক হবে।

ঘরে উঠেই হুমকে উঠল সুবীর, 'এই বনছায়া কে?'

'কোন বনছায়া?' মুহূর্তে বনছায়ার মেজাজ বিগড়ে গেল।

'এই যে 'প্রবাহে' উপন্যাস লিখেছে—'অবগুণ্ঠনা' ?' পত্রিকাটা সুবীর বনছায়ার চোখের সামনে মেলে ধরল।

'তার আমি কী জানি!' বনছায়া মুখ ফিরিয়ে নিল।

'এ তো তুমি।' যেন অভিযুক্ত করছে এমনি সুরে বললে সুবীর, 'এ তোমার সেই উপন্যাস।'

'এ যদি আমিই হই তবে আবার ঘটা করে প্রশ্ন করছ কেন, কার লেখা?' বনছায়া মুখিয়ে উঠল: 'আমি ছাড়া আর কেউ বনছায়া আছে?'

'নামে তবে দেবী লিখেছ কেন?'

'তা নইলে কি দাসী লিখব?'

'নিজের যা পদবী তাই লিখবে—'রায়' লিখবে।'

'আমার নিজের পদবী তো বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'সে তো বিয়ের আগেকার পদবী। বিয়ের পরে, বর্তমান পদবী তো রায়।'

বনছায়া কথা বলল না, চোখ ফিরিয়ে নিল। ঠোঁটের কোণায় ফুটল বুঝি বা বিদ্রূপের খোঁচা।

'তার মানে তুমি জানাতে চাও না যে তুমি বিবাহিতা!' সুবীর তপ্ত হয়ে উঠল।

'অবিবাহিতা জানাতে চাইলে তো বন্দ্যোপাধ্যায়ই লিখতাম।'

'অন্তত জানাতে চাওনা যে তুমি আমার স্ত্রী। তারই জন্যে রায় লেখনি।'

'সংসারে তুমিই একমাত্র রায় কিনা, সবাই একেবারে এক ডাকে তোমাকে চিনবে! আর তোমাকেও বলিহারি,' বনছায়ার মুখ-চোখ থেকে ঘৃণা ঝরে পড়ল: 'তুমি কিনা নিজের পরিচয়ে নয়, একজন লেখিকার স্বামীর পরিচয়ে মর্যাদা পেতে চাও!'

যেন মুখের উপর মার খেল সুবীর।

'ঐ কে যায়? চিনিস না ওকে?' কাটা ঘায়ে আবার নুন ছিটোল বনছায়া: 'ওই তো লেখিকা বনছায়া দেবীর স্বামী।' তারপর ক্রূর দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল সুবীরকে: 'নিজের নামে ধন্য হতে না চেয়ে স্ত্রীর নামে ধন্য হতে চাও তোমার লজ্জা করে না?'

সুবীরের ইচ্ছে হল হাতের পত্রিকাটা বনছায়ার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে। যা না লেখা তার জন্যে আবার অহঙ্কার!

'কিন্তু এই কুৎসিত ছবিটার মানে কী?'

উপন্যাসের হেডপিসে পত্রিকার আর্টিস্ট যে ছবিটা এঁকেছে তার দিকে লক্ষ্য করল সুবীর।

'ছবিটা তো খুবই স্পষ্ট—একটা মেয়ে মদ খাচ্ছে। মদ খাওয়া তো আর কুৎসিত নয়!' সরল গলার মত করে বললে বনছায়া।

'কিন্তু মেয়েটার বেশবাস এত শিথিল কেন?'

'তার আমি কী জানি! আর্টিস্ট ভেবেছে খোলতাই হবে তাই অমনি করে এঁকেছে। সবচেয়ে বিচ্ছিরি হয়েছে টেবলের উপর ঐ বোতলটা। ওটা দেখলে মদ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায়না। নইলে বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট আর তান হাতে একটা ফুটন্ত পেয়ালা দিলে অনায়াসে ভাবা যেত মেয়েটা নেহাতই চা খাচ্ছে। কিন্তু আর্টিস্টের সঙ্গে ঝগড়া করার আমার ঝোঁক কোথায়?'

'তোমার উপন্যাসের নায়িকা সিগারেটও খায় নাকি?'

'মদ-সিগারেট না খেলে সে আবার অবন্তনা কী!'

সুবীর একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। পরে দৃঢ়স্বরে বললে, 'তুমি উপন্যাসটা পুড়িয়ে ফেলেছিলে না?'

'পুড়িয়ে ফেলেছিলাম!' মর্মমূল থেকে চমকে উঠল বনছায়া।

'মানে আমি ছিঁড়ে ফেলার পর ছেঁড়া টুকরোগুলো উনুনে ফেলে দিয়েছিলে না?'

'ও! হ্যাঁ—' চকিতে ঘুরে দাঁড়াল বনছায়া: 'তা দিয়েছিলাম, কিন্তু আগুনে দিয়েও আকাঙ্ক্ষার বন্ধ্যাকে নিঃশেষে ধ্বংস করা যায় না।'

'আকাঙ্ক্ষার—কোন আকাঙ্ক্ষার?'

'লেখবার আকাঙ্ক্ষার। তাই আগাগোড়া আবার নতুন করে লিখলাম।'

'নিজে লিখলে, না, আর কেউ লিখে দিল?'

'আর-কেউ লিখে দিলেও সে তুমি নও।' আপাদমস্তক জ্বলে উঠল বনছায়া 'তোমার সাধ্যি কী এমন গল্প লেখ? গল্প উপন্যাস লিখেছ কোনোদিন? জানো লিখতে? জানো তো শুধু কটা অর্থহীন কথার অসংলগ্ন লাইন সাজিয়ে আধুনিক কবিতা বলে চালাতে! তাও পুঁজিপাটা বেশি নেই বলে সে ব্যবসায়ও ফেল মেরেছ। এখন শুধু—' চেয়ারে বসেছিল, কথাটা শেষ না করেই উঠে পড়ল বনছায়া, দুয়ে দু পা সরে যেতে-যেতে বললে, 'বলে কিনা আর কেউ লিখে দিয়েছে! ছোটলোকের মতো সেদিন যে পাণ্ডুলিপিটা ছিঁড়ে দিয়েছিলে সেটা কে লিখেছিল? যাও না 'প্রবাহের' প্রেসে গিয়ে দেখে এস না 'অবন্তনার' কপি কার লেখা?'

'তদন্ত করতে হলে প্রেসে যাব কেন, খোদ সম্পাদকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।' সুবীরও তপ্ত হল: 'কপি আমি নিজের চোখে চেক করব।'

'তুমি? অসম্ভব। তোমাকে আমার কপি দেখাতে বারণ করে দিয়েছি।' রাগের মাথায় বলে বসল বনছায়া।

'কাকে বারণ করেছ?'

'সম্পাদককে—পীযূষবাবুকে।'

'এরই মধ্যে এতটা ঘোরাপড়া হয়ে গিয়েছে?' সুবীর এবার বিষ ঝরাল।

'নিশ্চয়ই হয়েছে। সম্পাদক ছাড়া আর কে লেখককে প্রটেক্ট করবে? তাই আমি পীযূষবাবুকে বলে দিয়েছি, খবরদার, আমার স্বামীকে যেন আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেখতে দেবেন না। ও তা হাতে পেলেই ছিঁড়ে দেবে। একবার ছিঁড়েছিল, চান্স পেলে আরো একবার ছিঁড়বে। আমার ওপর ওর নিদারুণ বিদ্বেষ। অক্ষমের আক্রোশ।' বনছায়াও বিষ ঢালল।

'বললে? পীযূষ তবু জানতে চাইল না একবার নষ্ট হয়ে যাবার পর পাণ্ডুলিপিটা আবার গজাল কী করে?' এবার সুবীর ব্যঙ্গ করল।

'সে তো তোমার মতো মিরেট নয়,' বনছায়া ব্যঙ্গের চেয়ে বেশি ঝিনিয়ে দিল: 'সে বুঝেছে আমি বিশুণ পরিশ্রম করে বইটা আবার নতুন করে লিখেছি।'

'নতুন করে লিখেছ? কোথায় বসে লিখেছ?'

এভাবে প্রশ্নটা আসবে ভাবতে পারেনি বনছায়া। বাড়িতে লিখেছি এ অসম্ভব কথাটা মুখে আনতে পারল না। ফস করে বলে বসল: 'অফিসে বসে লিখেছি।'

হাসিতে ফেটে পড়ল সুধীর: 'অফিসে বসে লিখেছ? শুধু মাথাই ধরনি, পাতাও ধরেছ দেখছি। অফিস-টাইমে বসে উপন্যাস লেখা!'

'কেন, অফিস-টাইমের পরে নিরিবিলিতে বসে লেখা যায় না?'

'দাঁড়াও, আমি তোমার বসকে গিয়ে জিজ্ঞেস করব কতদিন সে তোমাকে অফিসে ওভার-টেম করতে অনুমতি দিয়েছে? দিনে ক'ঘণ্টা খাটলে এই অল্প সময়ের মধ্যে ঐ প্রকাণ্ড উপন্যাসটা আবার নতুন করে লিখে ফেলা যায়?'

বনছায়া মরীয়ার মতো চেঁচিয়ে উঠল: 'তা হলে তুমি বলতে চাও এ উপন্যাস আমি লিখিনি?'

'না, তুমি লেখনি।' সুধীর বলল ক্রুরকণ্ঠে: 'এ সন্দীপ সেনের লেখা। শুধু তোমার বেনামীতে ছাপছে।'

মুহূর্তের জন্যে থ হয়ে রইল বনছায়া। কোথায় তার এই দুঃসাধ্যসাধন কীর্তির জন্যে তাকে প্রশংসা করবে, তা নয় উল্টে এই নীচাশয়তা!

'নাম ভাঁড়িয়ে সন্দীপ সেনের লাভ?' বনছায়া এতক্ষণেও তর্কে নিরস্ত হবে না।

'কার কোথায় লাভ তার আমি কী জানি?' আবার সুধীরের সেই ক্ষুব্ধ মনের ইঙ্গিত।

'আর এতে 'প্রবাহের' স্বার্থ?' বনছায়া আবার যুক্তি দেখাতে চাইল: 'যেখানে সন্দীপ সেনের নাম পেলে কাগজের দাম বাড়ে সেখানে একটা অজানা লেখিকার নামের প্রতি কেন তার আকর্ষণ হবে?'

'আর কোনো আকর্ষণ হয়তো।' কঠিনতর কটূক্তি করল সুধীর।

'বেশ, তবে তুমি যাওয়ার গিয়ে প্রচার করো, তুমি যা পারোনি তাই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দীপ সেন পেরেছে।'

'আমি কী পারিনি?'

'একটা উপন্যাস লিখে নিজের স্ত্রীর নামে চালাতে। আর সে ক্ষেত্রে স্বনামধন্য সন্দীপ সেন উপন্যাস লিখে পত্নীর নামে চালালো! লোকে তাই শুনে বিশ্বাস করবে, তোমাকে বাহবা দেবে, চাইকি গলায় মালা দিয়ে মানপত্র দেবে। ইনিই সেই কীর্তিমান স্বামী—'

'তবে তুমি বলতে চাও এই উপন্যাস তোমার?'

'একশোবার আমার।'

'আর তাই শীষুষ দত্ত তার সাপ্তাহিকে নিয়েছে?'

'যা, তোমার হাতেই তো তার জীবন্ত প্রমাণ।'

'কী দেখে নিল?'

'কী আবার দেখবে!' বনছায়া হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল: আজকাল কোনো চাকরিই তদবির ছাড়া হয় না। তাই এখানেও তদবির লাগবে সেটা আর বেশি কথা কী। নইলে অখ্যাত এক লেখিকার উপন্যাসে তার কিসের আকর্ষণ?'

'কিন্তু শীষুষ দত্তের রুচি তো শুনেছি কিছু মোটা।'

কথাটা বিশ্বাস যোগ্য! সেই জন্যেই মুখের উপর বেপরোয়ার মতো বলে বসল বনছায়া: 'তাই তদবিরটা কিছু মোটা করেই করেছি।'

এক মুহূর্ত যেন পাথর হয়ে রইল সুধীর। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: 'তুমি এতদূর অধঃপাতে গিয়েছ!'

'অবঃপাত!' সুধীরের হাতে-ধরা 'প্রবাহে'র দিকে তাকাল বনছায়া: 'দেখ না লাবণ্যের কোন চূড়ায় এসে উঠেছি। তুমি পারবে কোনো দিন? আরো তিরিশে আরো উঁচুতে গিয়ে উঠব। তখন তুমিই অবঃপাতে।'

'তোমার পেটে না আমার সন্তান?'

'সন্তান নয়, টিউমার।' বনছায়া মুখ ফেরাল: 'আর সন্তান হলেই বা কী। আমী সন্তান সংসার সব কিছুর চেয়ে আমার কেরিয়র বড়।'

'বেশ, এই যখন তোমার মতি-গতি তখন তোমার সঙ্গে আমার একত্র থাকা চলবে না।' সুধীর গলা শীতল করে আনল।

'একত্র কে থাকছে? আমি তো আলাদা হয়েই আছি।'

'এক বাড়িতে থাকলে চলবে না। তুমি অন্যত্র বাড়ি দেখ।'

'এই-ই তো আমার আলাদা বাড়ি—আলাদা ঘর—আলাদা এলাকা।' বনছায়াও কঠিন হল। 'তুমিই বরং অন্যত্র ডেরা বাঁধো।'

'মোটেই নয়। এ আমার অফিসিয়াল কোয়ার্টার্স।' সুধীর দৃঢ়তর হল: 'তুমি তোমার নিজের কোয়ার্টার্স খুঁজে নাও গে।'

'তাই নেব।' বললে বনছায়া, 'তার আগে তোমার বসকে একবার জানাই কী করে স্ত্রীকে বাদ দিয়ে তুমি কোয়ার্টার্সে এনটাইটলড হও।'

'স্ত্রী! পেটে টিউমার, সে আবার স্ত্রী!'

'না, সে শুধু নারী। তুমি এখন দয়া করে আমাকে আমার ঘরে একলা থাকতে দাও। আমি এখন—' কী যেন একটা গোপন কাজ করবে তারই ইঙ্গিত করল বনছায়া।

যেতে-যেতে একটু বুঝি থামল সুধীর।

শুধু গোপন নয় মহৎ কাজ করবে বনছায়া এমনি ব্যঞ্জনা আনল ভঙ্গিতে। বললে, 'আমি এখন লিখব।'

'রাবিশ! রাবিশ! লেখা না ছাই—ছাইয়ের পাতা, অজ্ঞানের ডিপো—' 'প্রবাহ'টা দু'হাতে ছিঁড়ে টুকরোগুলো ঘরময় ছড়িয়ে দিল সুধীর: 'এ নিয়ে আবার অহঙ্কার!'

শব্দ করে হেসে উঠল বনছায়া: 'যতো পারো স্টল থেকে 'প্রবাহ' কিনে এনে প্রাণের সুখে ছেঁড়—মূল বই তো আর নষ্ট করতে পারলে না।'

তারপর যখন শুনল সুধীর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে তখন সেই পদশব্দগুলি লক্ষ্য করে বললে, 'তুমিই তো নেমে যাচ্ছ অবঃপাতে, শুধু অক্ষর বলে নয়, অপদার্থ বলে—'

অভিরামকে ডাকল। বললে, 'যত শিগগির পারো আমাকে কিছু খেতে দাও, আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। শরীরটা ভালো নেই।'

অভিরাম এক পায়ে খাড়া। এখুনি করে দিচ্ছি মা।

'আর শোনো, একটু সজাগ থেকো—'

'ডাক্তার ডাকতে হবে মা?

'না, তার জন্যে নয়। তোমার বাবু আজ রাতে কী অবস্থায় ফেরেন একটু লক্ষ্য রেখো। দেখো আমার ঘুমের যেন ব্যাঘাত না হয়—'

'দেখব যা।'

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যেতেই বনছায়ার মনে হল সে যেন আরেক রাজ্যে চলে এসেছে। যা অনুমান করেছিল তেমনটি নয় বলেই আরেক রাজ্য। চারদিক কেমন নিঃশব্দ, নিবিবাদ। অনেকক্ষণ তা হলে শান্তিতে ঘুমুতে পেরেছে বনছায়া। কোনো হৈ হল্লা কোলাহল হয়নি, মাতলামি হয়নি, হয়নি কোনো কেলেঙ্কারি। এ বুঝি কল্পনারও বাইরে। এ কেমনতরো প্রতিশোধ নেওয়া? তবে কি সুবীর বাড়ি ফেরেনি? ওর ঘর অন্ধকার?

না, ফিরেছে. দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর একটি রেখা দেখা যাচ্ছে। কী করছে আলো জেলে? অনন্ত আলোতেই ঘুমিয়ে পড়েনি তো? না, নড়ছে-চড়ছে, ছোটখাটো আওয়াজ হচ্ছে। প্রতিটি শব্দই বুঝি বনছায়ার চেনা। তবে—তবে কি সুবীর বই পড়ছে?

রাত জেগে কবে আবার সে বই পড়ল? বই পড়তে বসা অর্থই তো ঘুমকে ডাকতে পাঠানো। তবে—তবে, অসম্ভবের অসম্ভব, সুবীর কি কবিতা লিখছে? আর তারই মন্ত্রে অন্ধকার পুড়িয়ে-পুড়িয়ে শব্দের আগুন সৃষ্টি করছে? লিখনরত কবির সেই তন্ময় মুখটা একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করল বনছায়া, কিন্তু এক ঈর্ষাস্থপাবিদ্ধ মাতালের মুখ ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না।

তবু কৌতূহল হল, দেখে সত্যি এখন সুবীর কী করছে! লেখা ছাড়া আর কী-ই সে করতে পারে এ সময়! কে জানে কী! কৌতূহলকে প্রশ্রয় দেবার কোনো উপায় নেই। তার চেয়ে আরেকজনকে ডাকা যাক। ভাবতে গেলেই এক আকাশ তারার ছবি চোখে ভেসে ওঠে—একটা নীলাম্বরীতে গাঁথা অগণন নক্ষত্রের চুমকি। তেমনিই বুঝি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় গাঁথা অগণন কাগজের টুকরো। আর সেই তার আশীর্বাদের তর্জনিটি কী প্রশান্ত! হ্যাঁ, একটা উত্তাল স্মৃতিও তার শরীরের রক্তে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু সেই আলিঙ্গনে কামার্ততার চেয়েও বুঝি বেশি ছিল স্নেহ আর তার অবারিত আত্মনিবেদনের মধ্যেও বুঝি সম্ভোগলোভের চেয়ে বেশি ছিল কৃতজ্ঞতা! কী তা কে বলবে? তবে অনুভবে মধ্যে এটা খুব স্পষ্ট যে শুধুই বিহ্বল যৌবতা নয়, এক পারে ছিল মমত্ববোধ অন্য পারে সম্মানবুদ্ধি। স্নেহ আর শ্রদ্ধা ও দুই মশলা না মিশলে প্রেমের বুঝি পরিপাক হয় না। তাই আলোর রেখা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে লাভ নেই। তা কোনোদিন আশার রেখা হয়ে তাকে নতুন সাম্রাজ্যের ঠিকানা দেবে না। তার চেয়ে অন্ধকার ভালো, সেই বিশাল-অতল স্নেহসমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া ভালো। যেন আলোর রেখা চোখে না পড়ে, চোখ বন্ধ করল বনছায়া, কাগজ নাড়াচাড়ার খস খস আওয়াজ কানে না আসে, ঘুমিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি।

ঘুম থেকে উঠে বনছায়া সুবীরের মুখে নতুন কোনো স্তুতিবচন আশা করেছিল নাকি? সুবীর অভিরামকে নিয়ে পড়ল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে পক্ষপাতী, সে বনছায়াকেই আগে মানছে, বনছায়াও সুবসুবিধেই বেশি দেখছে, তার যত দরদ বনছায়ার প্রতি। সে যেন মনে রাখে সে সুবীরের লোক, সুবীর ইচ্ছে করলেই তাকে যে কোনো দিন বিদায় দিতে পারে। তাই সুবীর দেখে, যেন প্রস্তুত থাকে অভিরাম। নয়তো সুবীরই অন্য কোথাও উঠে যাবে। তখনো অভিরামের এ বাড়িতে থাকবার এক্তিয়ার থাকবে না। তখন পীযূষ দত্ত লোক পাঠাবে, নয়তো সন্দীপ সেন।

'অভিরাম!' ঘরের মধ্যে থেকে ডেকে উঠল বনছায়া।

'যাই মা।' অভিরাম এক ডাকে সাড়া দিল।

'আমার দরজার পরদাটা ঠিক করে লাগিয়ে দিয়ে যাও।'

'এখুনি যাচ্ছি।' হাতের কাজ ফেলে ছুটল অভিরাম।

মালিশ নিয়ে হিমাংশুর কাছে অভিরামই আগে পৌঁছল। এখন ঝগড়া হচ্ছে কী একটা লেখা ছাপানো নিয়ে। গিন্নি কোন কাগজে কি একটা বই লিখছেন তাইতেই বাবুর রাগ। গিন্নি বলছেন, বেশ করেছি লিখেছি, তোমার ক্ষমতা নেই কিনা তাই হিংসেয় অমনি জ্বলে মরছ। বাবু বলছেন, যা লিখেছ তা বাবিশ, তার ছাপাও ভাটবিন। তাই নিয়ে তুলকালাম। শেষে ও বলছে, আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও, ও বলছে, আমি যাব কোথায়, তুমি পথ দেখ।

'লোকটা কি নপুংসক?'

চমকে উঠল অভিরাম।

'চাকরের সামনে স্ত্রী অপমান করল আর লোকটা তাই সহ্য করল? স্ত্রীকে বাড়ির বার করে দিয়ে তার মুখের উপর সদর বন্ধ করে দিতে পারল না?'

'কিংবা নিজেও তো খেতে পারত বেরিয়ে, আর ফিরত না।'

'না, না, তাহলে মেয়েটার শিক্ষা হবে কী করে? মেয়েটা তো তাহলে একা বাড়ি আরামে ভোগ করবে, বাড়ির আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবকে ডেকে আনবে। না, ওকে আরামে থাকতে দেওয়া নয়—' বলতেই হিমাংশুর নিজের কানে কেমন নগ্ন শোনাল, তাই ঢাকবার চেষ্টায় বললে, 'স্বামী নিরুদ্দেশ হলে কোন স্ত্রী আরামে থাকতে পারে? দাঁড়াও দেখি কী করতে পারি। তার আগে লেখাটা পড়া দরকার।'

খুঁজে-পেতে লেখাটা বার করতে হিমাংশুর বেশ পেতে হল না। আর, এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে আরো পড়বার জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল।

হিমাংশু সাহিত্যিক নয়, সমালোচক নয়, সাধারণ পাঠক, কিংবা তার চেয়ে একটু বেশি। কিন্তু পড়ে মনে হল এমন সুন্দর করে লেখা বুঝি আর হয়নি কোনোদিন। মেয়েটা সত্যিই গুণী। বক্তব্যে কেমন স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র। প্রায় উচ্ছৃঙ্খল। তার মানে মেয়েটা রূপে সুন্দর, ব্যক্তিত্বে সুন্দর। যদি তাকে হিমাংশু পেত, তাহলে এই সাহিত্যটাই কত বড় একটা ঐশ্বর্য হয়ে সম্ভোগ্য হত তাদের জীবনে। আনন্দের তো শুধু একদিক নয়—অনন্ত দিক। অনন্ত দিকে অনন্ত প্রদীপ জ্বলত। হিমাংশু মজুরের মত বিচিত্র দীপভাও তৈরি করে আনত আর বনছায়া শিল্পীর নিপুণ স্নেহে তাতে শিখা ধরিয়ে দিত—সে কী রাজকীয় উৎসবের জীবন হত দুজনের! কিন্তু এখন? এখন তার লেখবার একটা ঘর নেই, সহানুভূতিময় পরিবেশ নেই। এখন তাকে বলা হচ্ছে কিনা, লিখবে তো অন্যত্র ঘরভাড়া নাও।

বাস্ত কী, আরো কত কিছু হবে।

এক মুহূর্তের জন্যেও হিমাংশু ভুলতে পারছে না বনছায়া তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সরল প্রত্যাখ্যান হলে এত মর্মান্তিক হয়তো হত না। সেই প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে প্রবঞ্চনা মিশিয়েছে। আর সমস্তটাই কিনা একটা পাছতলার প্রেমের জন্যে!

যাকে আকাঙ্ক্ষা করা যায় তাকে না পেলে মানুষ কী করে? আকাঙ্ক্ষিত জনের সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাকেও ছেড়ে দেয়। আকাঙ্ক্ষা ম্লান হতে হতে মরে যায় একদিন। কিন্তু হিমাংশুর বেলায় অদ্ভুত ব্যতিক্রম ঘটল। সে না পেয়েও ছাড়ে না। তার না পাওয়ার পিছনে যে ছোট একটি অপমান আছে। আর এই অপমান ছোট বলেই তার জ্বালা অসহ্য। তার ক্ষমা হয় না।

হ্যাঁ, আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা একটি সোনার মুদ্রা, তার একপিঠে ভালোবাসা অন্যপিঠে ঘৃণা। যাকে

আপ্রাণ ভালোবাসা যায়, আন্তরিক ঘৃণাও করা যায় তাকেই। তুমি সুখী হও, তাতেই আমি সুখী—এ যেমন প্রেমিকের কথা, তেমনি তুমি কষ্ট পাও, তোমার কষ্ট দেখিয়ে আমাকে আনন্দিত করো এও প্রেমিকেরই প্রার্থনা। যাকে বিচিত্র করণে-উপকরণে সাজাবার সাধ তাকেই আবার পীড়নে-অপমানে পরাভূত করার ইচ্ছে—সোনার মুদ্রার দুয়েরই এক বাজার-দর।

কিন্তু যাই বলো, কী সুন্দর লিখেছে: 'সতীশ শুধু একটা পার্সন্যাল হাইজিন।' বটে? শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিপালন? শুধু পরিষ্কার থাকার কৌশল? নির্লজ্জ সাহস তো মেয়েটার।

সুবীরকে ডাকাল হিমাংশু।

'অবন্তনা আপনার স্ত্রীর লেখা?'

সুবীর হাঁ-না কিছু না বলে চুপ করে রইল।

'আপনি পড়েছেন?'

'না।'

'কী অদ্ভুত লেখা! বাজারে কাল পাওয়া যায় না। এ কি কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলার রচনা? এই দেখুন কী লিখেছে—আমি লাল কালিতে দাগ দিয়ে রেখেছি।' লাইনটা সুবীরকে দেখাল হিমাংশু।

সুবীর বললে, 'মোটে একটা কিস্তি তো বেরিয়েছে—'

'হ্যাঁ একটু সাবধান করে দেবেন—অশ্লীল যেন না লেখে। শেষকালে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার কার্যের না বদনাম হয়। আর শুনুন, যার জন্যে আপনাকে ডেকেছি। অভিরামকে আর আপনাদের বাড়িতে রাখা সঙ্গত হবেনা, ওকে ছেড়ে দেবেন।'

'এখুনি?' সুবীরের গলায় যেন হতাশার সুর।

'কেন এখুনি অসুবিধে কী?'

'ওর শরীরটা তো ভালো নেই।'

(ক্রমশঃ)

যে-কাহিনী চিরকালের

স্বর্ণলতা : তারকনাথ

সুজন রায়

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বঙ্কিমের সর্বজনচিত্তজয়ী প্রভাবের মধ্যেও নিজস্ব লিখনশৈলী ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের অন্যতম রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর স্বর্ণলতা বইটিকে বলা হয় বাংলার প্রথম বাস্তবধর্মী সামাজিক উপন্যাস। এই কাহিনীতে গ্রাম-বাংলার গার্হস্থ্যজীবনের যে চিত্র বিধৃত তা যেমন নিখুঁত তেমনি হৃদয়গ্রাহী, লিখনভঙ্গীর কারুকৃতিতে প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত। স্বর্ণলতা বাংলা কথা-সাহিত্যের একটি কালজয়ী সৃষ্টি। তিনি আরও কয়েকটি বই লেখেন, যথা, 'হরিষে বিষাদ', 'অদৃষ্ট' এবং 'তিনটি গল্প'। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে স্বর্ণলতা-ই নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।

এক

কৃষ্ণনগরের কাছে এক গ্রামে দুই ভাই থাকতেন। অল্প বয়সেই তাঁদের পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়েছিল। বড় শশিভূষণ তরুণ বয়সেই গ্রামের জমিদারি সেরেস্তার কাজে ঢুকে কিছু দিনের মধ্যেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। যাহিনা অল্প হলে কি হয়, টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা কিন্তু ভালই ছিল তাঁর। ছোট ভাই বিধুভূষণ লেখাপড়া শিখলেন না। সংসারে তেমন আসক্তি নেই। গানবাজনা, আমোদ-আহ্লাদ করেই দিন কাটান। কোন আয় তাঁর নেই। ভাইয়ের পোষ্য হয়ে আছেন বললেই হয়।

পয়সাওয়ালা স্বামীর স্ত্রী বলে প্রমদার খুব অহঙ্কার! এই নিয়ে ছোট জা সরলাকে সে খোঁটা দিতে ছাড়ে না। সরলা যেমন শান্ত তেমনি নিরীহ। মুখ বুজে বড় জায়ের যখন তখন মুখ নাড়া সহ্য করে, অহোরাত্র সংসারের যাবতীয় কাজে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, কিন্তু বড় জায়ের মন কিছুতেই পায় না।

প্রমদা মাঝে মাঝেই স্বামীকে বলে, এমন করে সর্বস্ব খরচ করে আর কতকাল চলবে, তাদের ছেলেমেয়ে আছে, তাদের মুখ চাইতে হবে তো। অতএব এখন পৃথক হওয়াই ভাল।

শশিভূষণ সেকথায় কান দেন না। বিধুভূষণকে তিনি ভালবাসেন। সরলার প্রতিও তাঁর মমতার অন্ত নেই।

কিন্তু একদিনের একটা ব্যাপারে শশিভূষণ আত্মবিস্মৃত হলেন এবং তাইকে পৃথক করে দিলেন। সেদিন এক ফেরিওয়ালা এসেছিল পাড়ায়। প্রমদা তার কাছ থেকে নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি করে বাঁশি কিনে দিল। সরলার ছেলে গোপাল ম্লানমুখে অদূরে দাঁড়িয়েছিল। সে মায়ের কাছে গিয়ে বায়না ধরল তারও একটি বাঁশি চাই।

সরলার কাছে একটিও পয়সা ছিল না। সে প্রমদার কাছে গিয়ে বললে, দিদি, একটা পয়সা ধার দেবে? উনি এলেই তোমায় দিয়ে দেব।

প্রমদা মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিল, দিদি তো মহাজন নয় যে ধার দেবে!

সরলা বললে, যদি ধার না দাও তো গোপালকেও একটা বাঁশি কিনে দাও।

প্রমদা অম্লান বদনে বললে, আমি তো আর কল্পতরু হয়ে বসিনি যে, যে যা চাইবে তাই দেব। আমার কি আর সে কপাল! ওঁর যদি বুদ্ধি থাকতো, এতদিন টাকার বস্তার ওপর বসে থাকতেন।

এই বলে প্রমদা যেন কান্না রোধ করতেই চোখে আঁচল চাপা দিল। সরলা তো অবাক।

এদিকে ফেরিওয়ালা ব্যাপার বুঝে এবং গোপালের ম্লান মুখ দেখে তার হাতে একটা বাঁশি দিয়ে পয়সা না নিয়েই চলে গেল। তাই দেখে প্রমদা মনে মনে জ্বলতে লাগল।

স্বামী বাড়ী আসতেই লাগানো করে লাগালো প্রমদা। সরলা অত্যন্ত ঝগড়াটে, অত্যন্ত ছোট তার মন। শুধু তাই নয়, সে আজ তাদের যাচ্ছেতাই অপমান করেছে!

শশিভূষণ আশ্চর্য হলেন, বিরক্তিও বোধ করলেন, বললেন, কি বলেছে সে?

প্রমদা তখন বেশ কলাও করে বলতে লাগল, তুমি শুনলে প্রত্যয় করবে না। আজ একজন মনিহারি দোকান নিয়ে এসেছিল। বিদিন কামিনী ছাড়ে না, তাই তাদের দুটি পয়সা দিয়ে দুটো বাঁশি কিনে দিলাম। ছোট গিন্নি অমনি গোপালকেও একটা বাঁশি দিলে। দাম দেবার সময় বললে, 'দিদি আমায় একটা পয়সা ধার দাও, আমি সুদ দেব।' আমি বললাম, 'এক পয়সায় আবার সুদ কি ভাই, তা তো আমি জানি না।' ছোট বউ বললে, 'চিরকাল মহাজনী করছ, জান না কেন?' আমি শুনে অবাক। তারপর ছোট বউ যা মুখে এলো তাই বললে।

শশিভূষণ স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করলেন।

দুই

গানের আসরে বসে বাহবা দিয়ে, যাত্রার দলে বাজনা বাজিয়ে আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিলেন বিধুভূষণ, হঠাৎ পৃথক হয়ে যেন দিশাহারা হলেন। প্রথম প্রথম দোকানে ধার পাওয়া যাচ্ছিল, বন্ধুদের কাছেও ধার করছিলেন, কিন্তু সেভাবে আর কতদিন চলে? তারপর ঘটিবাটি গয়নাগাঁটি বন্ধক দিয়ে, বিক্রি করে কিছুদিন চালালেন। ক্রমে প্রত্যহ দু'সন্ধ্যা আহার বন্ধ হল। পরিবারে চারজন লোক। নিজে, সরলা, গোপাল আর দাসী শ্যামা। সে আগে দু'ভাইয়ের সংসারে ছিল। পৃথক হবার সময় বিধুভূষণের দিকে এসেছে। এক বেলা খেয়েও সে সরলাকে ছেড়ে যেতে পারেনি! বলত, গোপালের মত তার একটি ছেলে ছিল। আদর করে সে তারও নাম রেখেছিল গোপাল। তাই গোপালকে ছেড়ে সে আর কোথাও যাবে না।

একদিন বিধুভূষণ সজল চোখে স্ত্রীর কাছে বললেন, আর তো কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না, সরলা। কী হবে?

শ্যামা কাছেই ছিল, এগিয়ে এসে বললে, তুমি অত ভাবছ কেন, ঠাকুর। আমার কিছু টাকা আছে। সে টাকা তো গোপালকেই দেব ঠিক করে রেখেছি। আমার একটা পরামর্শ শোন। তুমি কোন

যাত্রার দলে কাজ নাও। কাজ তুমি পাবেই। যতদিন না পাও আমি যেমন করে পারি, পরের বাড়ি খেটেও চালাবো। এর পর যখন সচ্ছল হবে, তখন আমায় দিও। দিদি পোপালেরই থাকবে।

আমার কথা শুনে বিধুভূষণ অবাক হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে আমার কাছ থেকে কয়েকটি টাকা নিয়ে বিধুভূষণ ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন। গন্তব্যস্থল কলকাতা।

তিন

সরলাকে পৃথক করে দিয়ে প্রমদা তিন চার দিন মহা আনন্দে রইল। কিন্তু অষ্টপ্রহর ঝগড়াঝাঁটি করা যার স্বভাব তার অত নির্বিবাদে থাকা সইবে কেন? প্রমদার সংসারে রান্না করত ঠাকরুণ দিদি। আর কাউকে না পেয়ে প্রমদা তাকে নিয়ে পড়ল। সকাল বিকেল তার কাজের খুঁত ধরতে লাগল, বকাবকি সুরু করল। ঠাকরুণ দিদি তো আর সরলা নয়। দু'দিন সহ্য করে তিন দিনের দিন, এই রইল তোমার কাজ, বলে চলে গেল।

কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে না পেয়ে প্রমদা কাঁদতে শুরু করল! এখন সংসারের কাজগুলো করে কে? কাজের নামে যে প্রমদার গায়ে জ্বর আসে! ফলে, সময় মত আহার পাওয়া শশিভূষণের পক্ষে দুষ্কর হল! স্ত্রীর উগ্রচণ্ডা মেজাজের পরিচয় তাঁর অজানা ছিল না, তিনি নীরবে কোন মতে কোনদিন নিজে রেঁধে খেয়ে কোনদিন হলার খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

তারপর একদিন কাছারি থেকে বাড়ি ফিরে দেখলেন বাড়িতে যেন মোচ্ছব লেগেছে। ছেলেমেয়ে দু'জন কলরব করছে! অন্য মানুষেরও গলা পাওয়া যাচ্ছে।

কী ব্যাপার! শুনলেন, প্রমদা তার মাকে আনিয়েছে। মা না হলে সংসার চালাবে কে? শুধু মা নয়, সঙ্গে এসেছে প্রমদার ভাই। তার নাম গদাধরচন্দ্র! গদাধরচন্দ্র ঈশ্বরের এক বিচিত্র সৃষ্টি। যেমন তার আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি। তার ওপর তার আবার জিভের আড় ভাঙেনি। সে 'ত' উচ্চারণ করতে পারে না বলে 'ট', নিজের নাম বলে, গতাধর চক্কু।

আকাট মূর্খ হলে কি হয়, গদাধরচন্দ্রের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি! দিদির কাছে সরলাদের কথা জেনে নিয়ে সে যখন তখন তাদের ঘরের সামনে গিয়ে আস্ফালন করতে লাগল। একদিন বিনা কারণে আমার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। আমাও কম যায় না। বাড়ির ভিতর থেকে একটা আঁশ বটি নিয়ে বেরিয়ে এসে সে গদাধরকে তাড়া করল। তখন গদাধর বীরবিক্রমে পশ্চাদাপসরণ করে সোজা গিয়ে থানায় হাজির হোয়ে আমার নামে নালিশ করল। থানার দারোগা বাবু দু'চার কথাতেই গদাধরকে বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি তাকে দিলেন প্রচণ্ড এক ধমক। ধমক খেয়ে গদাধর পালাতে পথ পেল না।

এদিকে শশিভূষণ নিজ বাসভূমে পরবাসী হোয়ে দিন যাপন করতে লাগলেন। গদাধরের হাকডাক, শাশুড়ীর গৃহিনীপনা, মা আর ভাইকে নিয়ে প্রমদার আদিখ্যেতা—দেখে শুনে শশিভূষণ মনে মনে শুধু বললেন, হায় ভগবান!

শেষ পর্যন্ত এমন হল যে তাঁর থাকবার ঘরখানিও বেদখল হবার জোগাড়। গদাধরের শোবার ঘর চাই, বৈঠকখানা চাই, শাশুড়ীর শোবার ঘর চাই. পুজোর ঘর চাই।

উপায়ান্তর না দেখে শশিভূষণ নিজেদের ভদ্রাসনের কাছে জমি কিনে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরী করালেন এবং সপরিবারে নতুন বাড়িতে চলে গেলেন। সরলা, গোপাল আর তারা পুরনো বাড়িতে রইল।

চার

কলকাতায় যাবার পথে বিধুভূষণের একটি সঙ্গী জুটলো। তার নাম নীলকমল। পাগল পাগল চেহারা। খালি পা, ছেঁড়া জামাকাপড়, কাঁধে একটা বেহালা। নীলকমল জানালো, তার মতো বেহালা বাজাতে সাতখানা গাঁয়ে একজনও নেই এবং সে কলকাতায় চলেছে কোন যাত্রার দলে বেহালা বাজিয়ে টাকা রোজগার করবে বলে। বিধুভূষণকে সে তার বেহালা আর গান শুনিয়ে দিলে। ভাঙা বেহালায় কর্কশ আওয়াজ তুলে বেসুরে ভাঙা গলায় সে গান ধরল :

পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব
আনিয়ে সে নীলপদ্ম চরণ-পদ্মে দিব।

তার গান আর বেহালা শুনে হাসি সংবরণ করা বিধুভূষণের পক্ষে কঠিন হল, কোন রকমে হাসি চেপে বললেন, চমৎকার। কলকাতায় গেলে যে-কোন যাত্রার দল তোমায় লুফে নেবে। চল, আমার সঙ্গে। প্রথমে কালীঘাটে গিয়ে মাকালী দর্শন করা তারপর কোন পাণ্ডার বাসায় উঠে যাত্রার দলের খোঁজ করা যাবে।

কিন্তু কলকাতায় পৌঁছে কালীঘাটে গিয়ে একদল পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে তাঁরা এমন নাস্তানাবুদ হলেন যা বলবার নয়। পাণ্ডাদের টানাহেঁচড়ায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নীলকমল তাদের হাত ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। অনেক চেষ্টা করেও বিধুভূষণ তাকে খুঁজে পেলেন না!

শেষ পর্যন্ত একটি সজ্জন পাণ্ডা পেয়ে বিধুভূষণ তার বাসায় গিয়ে উঠলেন এবং পাণ্ডাটির কাছ থেকেই এক পাঁচালী দলের সন্ধান পেলেন। তারা নাকি একজন বাজনদারের খোঁজ করছে।

বিধুভূষণ পাঁচালীর অধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন। বিধুভূষণের কথাবার্তা আর বাজনা শুনে অধিকারী যেন হাতে স্বর্গের চাঁদ পেল। সঙ্গে সঙ্গে বিধুভূষণ কাজ পেলেন। আর তিনি সেই দলে যোগ দেবার পর থেকেই দলের অদৃষ্টও যেন ফিরে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই সেই দলের নাম ছড়িয়ে পড়ল। দেশ বিদেশ থেকে বায়না আসতে লাগল। বিধুভূষণের আয়ও দিন দিন বৃদ্ধি পেল।

কিছু টাকা হাতে পাবা মাত্রই বিধুভূষণ সরলাকে রেজেস্টারি করে একটি চিঠি এবং সেই সঙ্গে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

বিধুভূষণের ভাগ্য বুঝি ফিরল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, বেশ কিছু অর্থের সঞ্চয় না করে তিনি দেশে ফিরবেন না। কিন্তু সেখানকার খরচপত্র চলা চাই তো? তাই তিনি মাঝে মাঝে বাড়ীতে টাকা পাঠাতে লাগলেন। বাড়ি থেকে তাঁর চিঠির কোন জবাব পেতেন না বটে, কিন্তু গোপালের স্বাক্ষরিত রসিদ দেখে মনে করতেন, টাকা ঠিকই সরলার হাতে পড়ছে, গোপাল ছেলেমানুষ, ভাল করে লিখতে শেখে নি বলে তাঁকে পত্র লেখে না।

কিন্তু সেই সব টাকা সরলা পায় নি। বিধুভূষণের প্রথম চিঠিটা গদাধরচন্দ্রের হাতে গিয়ে পড়ে। গদাধর চিঠি খুলে তার মধ্যে নোট দেখে প্রমদাকে গিয়ে জানায়। প্রমদা তাকে বসিদ সই করে চিঠি রাখবার পরামর্শ দেয়।

এই ভাবে প্রথম চিঠির পর দ্বিতীয় চিঠি তারপর সমস্ত চিঠি আর টাকা গদাধর আত্মসাৎ করতে লাগল।

পাঁচ

মাস গেল। বছর গেল। দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল। সরলা বিধুভূষণের কাছ থেকে কোন পত্র পেল না। ভাবনায় তার শরীর জীর্ণ হোয়ে পড়ল। ক্রমে কঠিন রোগে আক্রান্ত হল সে।

এতদিন পর্যন্ত শ্যামার যে টাকা ছিল তাইতে কোন রকমে চলছিল। ক্রমে সে বলও ফুরিয়ে এলো। সরলা আরও ভেঙ্গে পড়ল। রোজ বিকেলে তার জ্বর হয়। বুকের মধ্যে যেন খাঁ খাঁ করে। সরলা আজকাল আর বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না।

শ্যামা সকালে উঠে সরলার সেবা শুশ্রূষা করে পাড়ায় বেরোয়। কোন বাড়ীর কাজকর্ম করে দিয়ে নিজের খাবার জন্যে যা পায় তাই এনে গোপালকে আর সরলাকে খাওয়ায়। তারপর নিজে আর এক বাড়ী গিয়ে তাদের কাজ করে দিয়ে খেয়ে আসে।

এমনি করে আরও এক বছর কাটলো। এলো এক শ্রাবণ সন্ধ্যা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পথঘাট জনশূন্য। সেই বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় বিধুভূষণ দেশে ফিরে নিজের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু বাড়ী এত নিস্তব্ধ কেন? ছেলে-মেয়েদের কথা তো শোনা যাচ্ছে না! বিধুভূষণ আতংকিত হলেন। গোপাল, শ্যামা, সরলার নাম ধরে ডাকলেন।

কে? কে? বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে এলো শ্যামা। বিধুভূষণকে দেখে অবাক হয়ে বললে, ঠাকুর, সত্যিই কি তুমি ফিরে এলে এত দিনে!

বিধুভূষণ বললেন, কেন, আমি তো তোমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম যে আজ আমি দেশে এসে পৌঁছবো।

শ্যামা বিস্মিত হোয়ে বললে, তোমার চিঠি! এত দিনের মধ্যে একখানা চিঠিও তোমার পাইনি।

শুনে হতবাক হলেন বিধুভূষণ। এ কী বলছে শ্যামা!

শ্যামা বললে, চিঠির কথা থাক। ভিতরে এসো।

ভিতরে ঢুকে সরলাকে দেখে কেঁদে ফেললেন বিধুভূষণ! এ কী অবস্থা হয়েছে সরলার। সোনার প্রতিমা যে কালী হয়ে গেছে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, সরলা, তোমার যে এভাবে দেখবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

কোন মতে বিছানা থেকে উঠে স্বামীকে প্রণাম করে মৃদু করুণ হেসে সরলা বললে, তুমি এসেছো, এবার আমি ভাল হোয়ে উঠবো।

পরদিন সত্যিই সরলাকে অনেক ভাল দেখালো। সে চলে ফিরে ঘরের কাজকর্ম করল কিছুক্ষণ! বিধুভূষণের পাশে বসে স্বামীর কাছে কলকাতার অনেক গল্প শুনল। তারপর বললে, এবার আমি শুয়ে পড়ি। বড় ঘুম পাচ্ছে।

সরলা সেই যে শুল আর উঠল না। শেষ রাত্রে স্বামীর কোলে মাথা রেখে চিরদুঃখিনী সরলা শেষ সময়ে পরম সুখে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ল!

ছয়

সরলার মৃত্যুর পর একদিন শ্যামার সঙ্গে সাংসারিক কথা আলোচনা করতে করতে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, শ্যামা, তোমরা আমার একখানাও চিঠি পাও নি?

শ্যামা উত্তর দিল, একখানাও পাই নি।

বিধুভূষণ বললেন, তাহলে রেজেষ্টারি চিঠিতে গোপালের নাম সই দিত কে?

শ্যামা বললে, গোপালের নামে কোন রেজেষ্টারি চিঠি আসেনি, সে সইও দেয়নি। মাঝে মাঝে গদাধর রেজেষ্টারি চিঠি পেতো, সে রসিদ-টসিদ দিত। বলত, তার মামা নাকি তাকে টাকা পাঠায়।

শ্যামার কথা শুনে বিধুভূষণ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, শ্যামা, টের পেয়েছি। সব চিঠি আর টাকা ওই গদা-ই নিয়েছে। আমি চললাম থানায়।

থানার দারোগা বিধুভূষণের নালিশ শুনে তখনি তদন্ত করলেন। ডাক হরকরাকে ডেকে পাঠিয়ে তার মুখে গোপালের চেহারার যা বর্ণনা শুনলেন, তাতে তিনি এবং বিধুভূষণ দুজনেই বুঝলেন, চেহারার সঙ্গে গদাধরের হুবহু মিল!

দারোগা শশিভূষণের বাড়ী তল্লাসী করবার ব্যবস্থা করলেন। ব্যাপার জানতে পেরে শশিভূষণ গদাধরকে মেরে সাজিয়ে অন্যত্র পাঠাবার চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু কৃতকার্য হলেন না। গদাধর ধরা পড়ল। এবং বিচারে সেসনজজ তাকে চৌদ্দ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

গদাধরের শাস্তি হল বটে কিন্তু তাতে বিধুভূষণ মনে শান্তি পেলেন না। তাঁর আর এ বাড়ীতে থাকবার ইচ্ছা রইল না। নানা প্রকার চিন্তা করে তিনি শ্যামা আর গোপালকে নিয়ে আবার কলকাতায় গেলেন এবং গোপালকে আর শ্যামাকে একটি বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করলেন। সেই বাড়ীতে ঘাঁধুনির কাজ করে গোপাল ডাক স্কুলে ভর্তি হোয়ে পড়াশোনা করতে লাগল। বিধুভূষণ তখন এক ডেপুটি কলেকটারের সঙ্গে ঢাকায় চলে গেলেন।

ডেপুটি কলেকটারটির গানবাজনার খুব শখ। তিনি বিধুভূষণের গান বাজনা শুনে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং ঢাকায় গিয়ে তাঁকে একটি মুহুরির কাজ দিলেন। কাজ সামান্যই। কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় মনিবকে নিয়ে সংগীত চর্চা করেই তাঁর সময় কাটতে লাগল।

ঢাকায় গিয়ে পরম সুখে রইলেন বিধুভূষণ! নিজের খরচপত্র সামান্যই। যে টাকা উদ্বৃত্ত হ'ত তা গোপালকে পাঠিয়ে দিতেন।

সাত

চাকা ঘুরলো। একদিকে বিধুভূষণ এতদিন পরে সুখ শান্তির সন্ধান পেলেন আর অন্যদিকে শশিভূষণের জীবনে দারুণ অশান্তি আর বিপদ ঘনিয়ে উঠল।

কোন খবর পেয়েই হোক বা নিজের থেকেই হোক, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শশিভূষণের কর্মস্থলে এসে তাঁর কাছে জমিদারির কাজকর্মের হিসাব চাইলেন।

শশিভূষণের মাথায় যেন বাজ পড়ল! হিসাব কেমন করে দেবেন? অনেক টাকার গরমিল যে! একমাত্র উপায় আছে। যদি তাঁর চারজন সহকর্মী তাঁকে সাহায্য করে তাহলে হাতাহাতি খাতাপত্র পাল্টে ফেলা যায়! তিনি কাতর ভাবে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তারা প্রথমে রাজী হল না। অবশেষে বললে, শশিভূষণ যদি এখনি তাদের চার হাজার টাকা দেন তো তারা আজ রাত্রের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলবে।

শশিভূষণ রাজী হোয়ে টাকা আনতে বাড়ী গেলেন! চার হাজারের অনেক বেশী টাকাই আছে প্রমদার কাছে। সে নিশ্চয়ই স্বামীর এই বিপদে টাকা বার করে দিতে দ্বিধা করবে না।

কিন্তু স্ত্রীর কাছে টাকা পেলেন না শশিভূষণ। সব শুনে প্রমদা বললে, টাকা দিলেও তুমি রক্ষা পাবে না। আর টাকা গেলে আমাদের কি হবে?

শশিভূষণ স্ত্রীকে অনেক বোঝালেন, অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, এমন কি তার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু প্রমদা যেমন শক্ত কাঠ হয়ে বসেছিল তেমনি রইল, টাকা বার করল না।

তখন শশিভূষণ পাগলের মতো বলতে লাগলেন, প্রমদা, এতদিনে তোর সব সৎপরামর্শের অর্থ বুঝতে পারলাম। তুই আমায় বোকা বলতিস। আমি যথার্থই বোকা। তা নইলে তোর মতো পাপীয়সীর কথায় আমার প্রাণের ভাইকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব কেন। আমার ঘরের লক্ষ্মী সরলাকেই বা ছেড়ে ফেলবো কেন? এ সবই আমার কর্মফল! শেষ পর্যন্ত তুই আমাকেও মারলি।

এই বলে শশিভূষণ উন্মাদের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন এবং তাঁর সব অপরাধ স্বীকার করলেন। হাকিম তাঁর স্বীকারোক্তি লিখে নিলেন এবং টাকা আদায়ের জন্যে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আটক করবার আদেশ জারী করলেন।

আট

বিপ্রদাস চক্রবর্তী বর্ধমানের একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি। তাঁর একটি ছেলে, নাম হেমচন্দ্র, একটি মেয়ে, নাম স্বর্ণলতা। হেমচন্দ্র কলকাতায় বাসায় থেকে পড়াশুনো করে। স্বর্ণলতা তার দাদার কাছে লিখতে পড়তে শিখেছে। ভাই বোনে খুব ভাব। বিপ্রদাস বিপত্নীক।

কলকাতায় হেমচন্দ্র যে বাসায় থাকতো, তার সামনেই গোপালের বাসা। হেম প্রায় প্রত্যহই গোপাল স্কুল যাবার সময় তাকে দেখতে পেতো এবং গোপালের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করত। ক্রমে গোপালের সঙ্গে তার আলাপ হল এবং শীঘ্রই সে আলাপ গভীর স্নেহ ও ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। গোপালের সব কথা শুনল হেমচন্দ্র। শুনে তার মন মমতায় ভরে উঠল। সে তখন গোপালের কাছে প্রস্তাব করল, গোপাল আর তামা তার বাসায় এসে থাকুক, অনেক ঘর দুয়ার আছে, কোন অসুবিধা হবে না। হেমচন্দ্র আরও বললে যে সে গোপালকে নিজের ছোট ভাই-এর মতো মনে করে।

গোপাল তামার সঙ্গে পরামর্শ করল। হেমচন্দ্র প্রতিদিন তাদের চলে আসবার জন্যে বলতে লাগল। গোপাল সে অনুরোধ এড়াতে পারলো না। দু'জনের সম্পর্ক আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ হল।

পূজোর সময় হেম গোপালকে দেশের বাড়িতে নিয়ে গেল। স্বর্ণলতার সঙ্গে গোপালের পরিচয় হল। কিশোরী স্বর্ণলতা গোপালকে দেখে তার দুঃখের কথা জেনে তার প্রতি গভীর মমতা বোধ করল,

সর্বক্ষণ সে গোপালের সঙ্গে গল্প করে কাটাতে লাগল, দাদাকে ছেড়ে সে গোপালের কাছে বই নিয়ে বসে পড়তে লাগল প্রত্যহ।

বিপ্রদাসবাবুর স্ত্রী অনেকদিন আগেই মৃত হয়েছিলেন। তিনি উইল করে সমস্ত সম্পত্তি ছেলে-মেয়ের নামে সমান ভাগ করে দিয়েছিলেন।

স্বর্ণলতা ইতিমধ্যে বড় হোয়ে উঠেছে। একদিন বিপ্রদাসবাবু হেমের কাছে স্বর্ণর বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, গুরুদেব শ্রীরামপুরের একটি পাত্রের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু পাত্রটি আমার তেমন মনোমত নয়।

পাত্রের বিবরণ শুনে হেমচন্দ্রও আপত্তি করল। তারপর বললে, গোপালকে আপনার কেমন লাগলো?

বিপ্রদাস বললেন, খুব ভাল ছেলে, সৎ বংশ, ঘাঁদুরেরা, আমাদের পাল্টি ঘরও বটে। কিন্তু বড় গরীব।

হেম বললে, আপনি তো স্বর্ণকে যথেষ্ট টাকা আর সম্পত্তি দিচ্ছেন। সুতরাং তাদের অভাব থাকবে না। আমার মনে হয় স্বর্ণও খুব সুখী হবে।

বিপ্রদাস বললেন, ভেবে দেখি।

কিন্তু ভেবে দেখবার আর অবসর পেলেন না তিনি। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করলেন।

বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না। পিতার শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে হেমচন্দ্র কলকাতায় গিয়ে বসন্ত রোগে শয্যাশায়ী হোয়ে পড়ল। গোপাল আর শ্যামা আহার নিদ্রা ছেড়ে হেমের শুশ্রূষা করতে লাগল এবং শ্যামার পরামর্শে গোপাল হেমের ভগ্নী স্বর্ণলতাকে পত্র লিখে দাদার অসুখের কথা জানালো।

গোপালের চিঠি পেয়ে স্বর্ণলতা আর তার ঠাকুমা অত্যন্ত চিন্তায় পড়ল। ঠাকুমা বললেন, চল, আমরা কলকাতায় যাই। কিন্তু হেমের বাসা তো চিনে যেতে পারবো না। তাই শ্রীরামপুরে গুরুদেবের কাছে যাই। সেখান থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে কলকাতা যাব।

গুরুদেবের নাম শশাঙ্কশেখর মুস্তিগিরি। লোকটার মনে মনে মতলব ছিল, তাঁর প্রতিবেশী হরিদাসের ছেলের সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহ দিয়ে তিনি হরিদাসের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবেন। হরিদাস তাঁকে সেই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। এখন সেই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে দেখে তিনি উল্লসিত হলেন এবং স্বর্ণলতা ও তার ঠাকুমাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

স্থির হল, প্রথমেই স্বর্ণলতার কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই। ঠাকুমা আগে গিয়ে দেখুন সেখানকার অবস্থা, তারপর অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

সেই পরামর্শ মতোই কাজ চলল। শশাঙ্কশেখর স্বর্ণলতার ঠাকুমাকে নিয়ে কলকাতা চলে গেলেন। স্বর্ণ শশাঙ্কশেখরের বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর কাছে রইল।

তিন চার দিন পরে ফিরে এসে শশাঙ্কশেখর বললেন, হেম অনেকটা ভাল আছে। গোপাল নামে ছেলেটি খুব সেবা করছে। কোন ভয় নেই। ঠাকুমা সিগগিরই ফিরে আসবেন।

শুনে স্বর্ণলতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হল এবং গোপালের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল।

এদিকে শশাঙ্কশেখর চক্রান্ত করে স্বর্ণলতার বিয়ের দিন স্থির করে ফেললেন। জানতে পেরে স্বর্ণলতা ভয়ে যাদুদ হয়ে পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। শশাঙ্কশেখর তাকে বন্দী করে রাখলেন।

স্বর্ণলতার অবস্থা দেখে শশাঙ্কশেখরের ধর্মপরায়ণা স্ত্রীর মনে বেদনা জাগল। তিনি কৌশল করে স্বর্ণলতাকে দিয়ে গোপালের নামে একটি চিঠি লিখিয়ে নিজেদের দাসীকে দিয়ে সেই চিঠি ডাকে ফেলিয়ে দিলেন।

যথাসময়ে সেই চিঠি গোপালের হাতে পড়ল এবং গোপাল উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাউকে কিছু না জানিয়ে তৎক্ষণাৎ শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করল।

ছয়

আজ স্বর্ণলতার বিবাহ। বরের বাড়ীতে মহাধুম। স্বর্ণলতা বন্ধ ঘরে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। সন্ধ্যা হয়ে এলো। এখনো তো কেউ কলকাতা থেকে এলো না।

রাস্তায় ইংরাজী বাজনা বাজছে। বর আসছে। শাঁক বাজল! চারিদিকে সোরগোল। বর এসে সভায় বসল। পুরোহিত এলেন। শশাঙ্কশেখর একটু আড়ালে গিয়ে হরিদাসের কাছ থেকে টাকা গুণে নিতে লাগলেন।

হঠাৎ বারবাড়িতে প্রকাণ্ড আলো দেখা গেল। শশাঙ্ক শেখর বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, তাঁর বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লেগেছে। তিনি পাগলের মতো সেই দিকে ছুটলেন।

আগুন, আগুন! চারদিকে গোলমাল। স্বর্ণলতার ঘরের দরজা ইতিমধ্যে শশাঙ্কশেখর খুলেছিলেন তাকে বিবাহবাসরে আনবার জন্যে। সেই খোলা দরজা দিয়ে স্বর্ণলতা ঘর থেকে বেরিয়ে খিড়কির দরজার কাছে গিয়ে দেখল, দরজা খোলা। সে দ্রুতপদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলতে লাগল।

হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়ালো একটি স্ত্রীলোক। সে শশাঙ্কশেখরের বাড়ির ঝি! তাকে ধরতে এসেছে ভেবে স্বর্ণলতা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। দাসী বললে, ভয় নেই, ভয় নেই, আমি তোমাকে ধরতে আসিনি। আমিও তোমার মতো পালাচ্ছি। এই দেখ, বাবুদের টাকার বাক্স নিয়ে এসেছি।

এই বলে কাপড়ের ভিতর থেকে একটি ক্যাশ বাক্স বার করে দেখালো। স্বর্ণলতা বললে, তুমি কোন্ দিকে যাবে?

দাসী বললে, নদীর দিকে। নদীর ওপারে আমার এক মাসীর বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে আজ রাতটা থাকবো। তুমিও চলনা আমার সঙ্গে।

স্বর্ণলতা রাজী হয়ে তার সঙ্গ নিল।

পরদিন ভোরে গোপাল শ্রীরামপুরে পৌঁছে দেখল, শশাঙ্কশেখরের বাড়ি পুড়ে ছাই হোয়ে গেছে। স্বর্ণলতাকে সে খুঁজে পেল না। পুলিস এসে পড়েছিল। তাদের মুখে শুনল, বাড়ির কর্তা আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। অন্য আর কেউ মরেনি।

কিন্তু স্বর্ণলতা কোথায়? অনেক খোঁজাখুঁজি করল গোপাল। কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশ হোয়ে সে নদীর ধারে গিয়ে বসল।

তার কাছ থেকে একটু দূরে কয়েকজন মাঝি বসে তর্ক বিতর্ক করছিল। গোপালকে দেখে তারা তার কাছে এলো এবং একটি আংটি গোপালের হাতে দিয়ে বললে, দেখুন তো বাবুমশায়, আংটিটার কত দাম হবে?

আংটি দেখে গোপাল চমকে উঠল। এ আংটি যে সে স্বর্ণলতার আঙুলে দেখেছে। বললে, কোথায় পেলে তোমরা এ আংটি?

একজন মাঝি বললে, কাল সন্ধ্যার পর আমি দু'জন স্ত্রীলোককে নদী পার করে দিয়েছিলাম। তাদের কাছে পয়সা ছিল না। পয়সার বদলে আমায় এই আংটি দিয়েছে।

গোপাল ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, সেই স্ত্রীলোক দু'জন কোথায় গেছে তা যদি তোমরা কেউ দেখিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমাদের পাঁচটাকা করে বকশিস দেব।

যে মাঝি স্বর্ণলতাকে পার করে দিয়েছিল সে বললে, তারা ওপারে গিয়ে কোন্ বাড়িতে গেছে তা আমি জানি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

ওপারে গিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে একটি বাড়ি দেখিয়ে মাঝি বললে, ওই সেই বাড়ি। আমায় বকশিস দিন।

মাঝির হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে গোপাল সেই বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

ওই যে দাওয়ার উপর বসে আছে স্বর্ণলতা। তার পাশে আর একটি স্ত্রীলোক। গোপাল বলে উঠল, স্বর্ণলতা!

আবেগে আনন্দে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল।

দশ

হেমচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠেছে, চলে ফিরে বেড়াবার শক্তি পেয়েছে। সকালে উঠে সে বারান্দায় বসে আছে, ভাবছে গোপালের কথা। কোথায় গেল সে? তিনদিন পার হয়ে গেল, কোন খবর নেই, কি হ'ল তার?

হেমচন্দ্রের চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে একটি গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নামল গোপাল। হেম মহানন্দে বলে উঠল, গোপাল, এসো, এসো, কোথায় ছিলে এই তিন দিন ধরে?

গোপাল কোন জবাব দেবার আগেই গাড়ীর ভিতর থেকে আরও দু'জন নামল। স্বর্ণলতা আর শশাঙ্কশেখরের কৃতপূর্ব দাসী। গোপাল তাকেও সঙ্গে এনেছিল। বলতে গেলে, সে-ই তো স্বর্ণলতাকে বাঁচিয়েছিল, চিঠিখানা সে-ই চটপট তাকে দিয়েছিল আর তারপর স্বর্ণলতাকে পথে দেখে তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। তাই গোপাল আর স্বর্ণলতা দু'জনেই তার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

স্বর্ণলতাকে দেখে হেমচন্দ্র সবিস্ময়ে বলে উঠল, একী, স্বর্ণ, তুমি কোথা থেকে এলে! এস, দিদি, এসো।

স্বর্ণলতা এগিয়ে এসে অশ্রুপ্লাবিত চোখে দাদাকে প্রণাম করল।

* * *

কয়েকদিন পরের কথা। গোপাল এবং হেমচন্দ্র একত্রে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ কথা বন্ধ করে হেমচন্দ্র কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল তারপর ঈষৎ হেসে বললে, গোপাল, তোমার একটা কথা বলতে চাই।

গোপাল বললে, কি কথা?

তোমার সঙ্গে স্বর্ণলতার বিয়ে দিতে বাবার বিশেষ আপত্তি ছিল না। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন

তাহলে এতদিনে তোমাদের বিয়ে হোয়ে যেতো। বাবার হঠাৎ মৃত্যু হ'ল বলেই বিয়ের কথাটা এতদিন পাড়া হয়নি। বাবার ইচ্ছে আমি জানতাম, তাই এখন আমার কথা এই, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে তোমার বাবাকে চিঠি লিখে আনিয়ে শুভকাজ শেষ করি। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছে, স্বর্ণকে তুমি গ্রহণ কর।

হেমচন্দ্রের কথা শুনে গোপালের দু'চোখ জলে ভরে গেল। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল। বারবার চেষ্টা করেও সে কোন কথা বলতে পারল না।

হেমচন্দ্র হেসে বললে, আর তোমার কোন কথা বলতে হবে না। আমি সব বুঝেছি। তাহলে এখনি তোমার বাবাকে চিঠি লেখা যাক! কী বল?

গোপাল শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল

এগারো

গোপাল এবং স্বর্ণলতার বিবাহের পর প্রায় দু'বছর কেটে গেছে!

ইতিমধ্যে শশিভূষণের মোকর্দমার নিষ্পত্তি হয়েছে। তিনি সত্য কথা বলেছেন বলে অব্যাহতি পেয়েছেন, তবে তাঁর সম্পত্তি নিঃশেষে বিক্রি করে জমিদারির তহরুপ করা টাকা মিটিয়ে দিতে হ'য়েছে। তিনি এখন ছেলে বিপিন আর মেয়ে কামিনীকে নিয়ে গোপালের কাছেই আছেন। শান্তিতেই আছেন তিনি।

প্রথমা বাপের বাড়ি থাকে। কিন্তু তার ভরণপোষণের সব ভার গোপালকেই বহন করতে হয়। এজন্যে গোপাল তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শশিভূষণ গোপালকে সে চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করেছেন।

বিধুভূষণ ডেপুটি কালেক্টারের কাজ থেকে অবসর নিয়ে বাড়িতে এসে বসবাস করছেন। অল্প বয়সেই তাঁর মাথার সব চুল পাকা হ'য়ে গেছে, তাঁকে এখন যেন শশিভূষণের চেয়ে বড় দেখায়।

স্বর্ণলতার একটি ছেলে হয়েছে। বিধুভূষণ সারাদিন নাতিকে কোলে নিয়ে খেলা দেন।

হেমচন্দ্র বছরে দু'মাস স্বর্ণলতার কাছে এসে থাকে। সে এলে সকলেই খুব আনন্দিত হয়। বিশেষ গোপাল আর স্বর্ণলতা। সকলেই হেমচন্দ্রকে তার মধুর স্বভাবের জন্যে ভালবাসে।

তারা এখন এ সংসারে গৃহিণী! স্বর্ণলতা তাকে নিজের খাশুড়ীর মতোই ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

বিধুভূষণ মাঝে মাঝে নীলকমলের কথা ভাবেন। সেই আধপাগল লোকটির উপর তাঁর অত্যন্ত স্নেহ জন্মেছিল। তাঁরা একই সঙ্গে বহু দুঃখে অর্থ উপার্জনের আশায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। কলকাতায় প্রথম বার হারিয়ে যাবার পর আরও একবার দু'বার বিধুভূষণ নীলকমলের দেখা পেয়েছিলেন কিন্তু তাকে কাছে রাখতে পারেননি, নীলকমল প্রতিবারই কয়েকদিনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। বাড়ি এসে বসবার পর বিধুভূষণ নীলকমলকে সুখী করবার অভিপ্রায়ে নানা স্থানে তাঁর খোঁজ করেছেন। কিন্তু কোথাও আর তার দেখা পান নি।

পিছনের জানালা

(কার্ত্তিক দাস ও দত্ত)

রামপদ মুখোপাধ্যায়

একেবারে গায়ে গা লাগানো দু'খানা বাড়ী—প্রথমটি প্রাসাদ তুল্য দ্বিতল চকমিলানো ; এ বাড়ীর দুটি মহল, প্রথম মহলে বৈঠকখানা—, সুপরিসর ঠাকুর দালান – বহুবৎখানা আর প্রকাণ্ড সিংদরজা যার ভিতর দিয়ে দুর্গা প্রতিমাকে বহুবার বাহিরে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় মহলটি অন্তঃপুর—একেবারে অন্তর্ম্পশ্যাদের উপযোগী করে তৈরী! এই বাড়ীটির কথা পরে আসবে—তার আগে রাজপথের সঙ্গে গলাগলি ভাব জমানো খাটো পাঁচীল ঘেরা একতলা বাড়ীটার আসা যাক। এই বাড়ীর ঘর মাত্র ২।৩ খানা—একটার মধ্যে দিয়ে আর একটায় যেতে হয়—, সামনের ঘরখানার দক্ষিণ দিকে যা দুয়োর জানালা মিলিয়ে তিন—আর তিনদিকে দেওয়ালে ঠাস বুনি অবরুদ্ধ। উঠোন খানিকটা আছে—আলো হাওয়া আসে, কিন্তু ঘরের মধ্যে ওরা অন্যায়ৎ। দুই বাড়ীর মালিকের নামই কার্ত্তিক চন্দ্র। একজন দাস অন্যজন দত্ত। একজন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বড় ব্যবসায়ী. অন্যজন কপর্দকশূন্য কেরানী। হাঁ কার্ত্তিক দত্তকে আমি প্রথম দেখেছিলাম কুষ্টিয়ায়। তাঁকে সবাই জানতো কেরানীবাবু বলে। পোস্টাপিসের কেরানী। বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার। একটা পাকা ইমারতের সামনের অংশটা অপিস—, পিছন দিকটা পোস্ট মাস্টারের কোয়ার্টার। সামনে বেড়াবেরা জায়গায় ফুলবাগান। বাগানের বলতে যে রূপটা চোখের সামনে ভাসবে তার ধারে কাছে যায় না—বরং গোয়াল বললেই রূপের সাদৃশ্য ধরা সহজ। মাতিপরিদর বেড়ার মধ্যে অবা করবী গন্ধরাজ টগর থেকে গোলাপ বেলা রজনীগন্ধা গাঁদার ঝাড়গুলি এমনই গলাগলি করে আছে—যাকে ফুলের গোয়াল বললেই শোভন হয়। ওই গোয়ালের ওধারে কেরানীবাবুর কোয়ার্টার—হাওয়া সমেত দুখানা চার ইটের দেওয়াল। পাকা বাড়ীর চেয়ে ওই বাড়ীটাই আমার কিন্তু ভাল লাগতো—দিনের বেশীর ভাগ ওখানেই থাকতাম। তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। কিন্তু সেই সময়ের ছবিগুলো বড় উজ্জ্বল—, সেই সময়কার খুঁটিনাটি অনেক ঘটনা মনের আনাচে-কানাচে জড়ো হয়ে আছে—; চৌষট্টি বৎসরের দুরন্ত জীবন-স্রোত ঠেলে—তাদের সামনে উঁকিয়ে যেতে একটু বাধা পাই না।

সেই আলোয় কার্ত্তিক দত্তের চেহারাটা সামনে দেখছি। দু'ফুট লম্বা দীর্ঘ বলশালী পুরুষ,—গৌরবর্ণ গোলগাল মুখমণ্ডল, তাদন্ত বড় বড় দুটো চোখ—অধরে প্রশান্ত হাসি - ; এই চেহারার মানুষ কেমন করে কেরানী হয়—এই বিস্ময় তখন জন্মায়নি—বয়সভাবে তা ভেবেছিলাম। আমাকে কাঁধে চাপিয়ে বাড়ীর পাশ দিয়ে একটা পড়ো জমির বুক চিরে পাওটি রাস্তা ধরে গোরাই নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতেন বেশ মনে পড়ে। গোরাই নদীর পাড়ে ইলিশ মাছের সারা পাহাড় চক চক করত—ছোট ছোট অসংখ্য ডিঙ্গী নৌকো জলের কিনারে ঘর ঘর করে কাঁপত—সুদূর পরে মাঝিরা হৈ হৈ গোরগোল তুলত, ছায়াছবির সবটা আলোছায়ায় কিন্তু কার্ত্তিক দত্ত অতিদূর স্পষ্ট। কখনো বা গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে কখনো খাবার কিনে আমার হাতে দিতেন। ছেলেরা খাবার পেলেই খুসি—আমারও ভাল লাগতো মানুষটিকে।

তার পর বাবা কুষ্টিয়া থেকে বদলি হয়ে এলেন চুয়াডাঙ্গায় আমরা এলাম দেশের বাড়ীতে। কার্তিক ঘর হারিয়ে গেলেন। আমরা কিন্তু এক গ্রামের একই পাড়ায় বাসিন্দা। ওঁর বাড়ী থেকে আমাদের বাড়ীর দূরত্ব মাত্র দু'মিনিটের। উনি আমার সামনে থেকে হারিয়ে গেলেন। কারণ দেশের বাড়িতে উনি আসতেনই না।

তারপর···আরো পাঁচবছর পেরিয়ে ওঁকে দেখতে পেলাম। সেই মূর্তি—দীর্ঘ গৌরবর্ণের দশাসই পুরুষ পাঁচটি বছর আগেকার সেই মানুষ। তেমনি সৌম্য প্রশান্ত মুখ একদিন আমাকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে লেখা-পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

বললেন, লেখাপড়া শিখে কি করবি? চাকরি? চাকরি মানে জানিস? চাকর গিরি। ইংরেজ আমাদের মনিব আমরা চাকর। বলে হা হা করে খুব জোরে হেসে উঠলেন।

আমি খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলাম—ওঁর হাসিতে মুখ নীচু করে হাসতে লাগলাম। উনি বললেন, কথাটা মনে রাখবি—এটা আমাদেরই দেশ—অথচ আমরা মনিব নই—আমরা চাকর।

আরও অনেক কথা বলেছিলেন। মনে নেই।

ওঁর বাড়ীতে মাঝে মাঝে অচেনা মানুষ আসতো—কেউ ওঁর চেয়ে বয়সে বড় কেউ ছোট—কেউবা সমবয়সী। তাদের কথাবার্তা ভাবভঙ্গী চালচলন কেমন যেন আলাদা। বেশ ভদ্র, বিনীত, হাসি হাসি মুখ, শান্ত চেহারার মানুষগুলি।

একদিন পাড়ার অশ্বত্তলা দিয়ে চলেছি ওইখানে ধাবলা কাঠের কাটা গুড়ির উপরে বসেছিলেন এক কৃষ্ণ চেহারার শ্যামবর্ণের যুবক—সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাকে ডাকলেন হাত ইসারায়—খোকা শোন।

কাছে আসতেই নাম জিজ্ঞাসার পর বললেন, তোমার বয়স কত? পৈতে হয়েছে কতদিন?

বললাম এগারো বছর—। একবছর পৈতে হয়েছে।

বা খুব ভাল। সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী জপ প্রতিদিন কর তো?

মাথা নাড়তেই খুসি হয়ে বললেন, হাঁ— ওগুলো মন দিয়ে করবে। সর্বদা মনে রাখবে—আমরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাত। ব্রাহ্মণের পক্ষে—গায়ত্রী জপ করলে মনের তেজ বাড়বে—দেহের শক্তি বাড়বে—দেহ মন পবিত্র হবে। মাঝে মাঝে গীতা পড়বে। নিজে বুঝতে না পার বুঝিয়ে নেবে।

অনেক উপদেশ দিয়ে শেষ পরে বললেন, কিন্তু ভাই পৈতেটা মালার মত করে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছ কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে—ওভাবে পৈতে পরা উচিত নয়। এমনি করে রাখবে। বলে নিজের বুকে হাত দিলেন।

লজ্জিত হয়ে বললাম, রাখছি।

ভাল ভাল। সর্বদাই এই দেশের যোগ্য ছেলে হবার চেষ্টা করবে। দেশ মাতাকে ভালবাসবে।

ঠিক পরের দিন নতুন হাট ভাঙ্গির সামনে দিয়ে বন্ধু পাড়ায় চলেছিলাম—ভাঙ্গির মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক সুন্দর কান্তি গৌর বর্ণ বলশালী যুবক—তিনি আমার কাছে এসে বললেন, কোথায় যাচ্ছ ভাই? আমি এখানে নতুন এসেছি—পথঘাট তেমন চিনি না—কৃষ্ণকালীতলাটা কোন দিকে বলতে পারো?

বললাম, ওই খালের ধার বরাবর। চুহুরি পাড়া পীরের হাট পেরিয়ে—

উনি হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, না, না, অতদূর যাব না—এই কাছাকাছি,—তুমি কোথায় যাবে?

আমাদের বাড়ীর নম্বরটা কৃষ্ণকালিতলা রোডের, থাকি ছুতোর পাড়ায়।

ঠিক-ঠিক কার্ত্তিকবাবুর বাড়ীর কাছে নয়? আচ্ছা তোমাদের পাড়াতে আবার দু'জন কার্ত্তিকবাবু আছেন না? একজন পেন্নায় বড়মানুষ আর একজন, একটু ভেবে নিয়ে মাথা চুলকে বললেন, কি যেন করেন ঠিক মনে পড়ছে না।

বললাম, কার্ত্তিক দত্তের কথা বলছেন তো? উনি তো কিছু করেন না?

একেবারে কিছু করেন না? একেবারে কিছু না? তাই কখনো হয়! অবস্থা তো ওঁদের ভাল নয়, সংসার চলে কেমন করে? পরিবারে কে-কে আছেন?

বললাম, সে তো জানি না। ওঁর মা আছেন, মাসী আছেন, বউ আছেন—

ভাল ভাল, আর কেউ নেই? কোন আত্মীয় স্বজন? বন্ধুবান্ধব? মাঝে মাঝে অনেক বন্ধু তো আসেন শুনেছি। বলতে বলতে উনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

ওঁর প্রশ্নের ধরনে আমি ঘাবড়ে যেতে উনি নিজেকে সামলে নিলেন তৎক্ষণাৎ। হেসে বললেন, থাকগে ওদের কথা—তুমি দত্ত পাড়া থেকে ঘুরে এসো। তুমি ফিরে এলে—তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামটা ঘুরে দেখব। চমৎকার গ্রাম তোমাদের, তোমাকে ভারি ভালো লাগছে, আসবে তো?

সেদিন আর দত্ত পাড়া থেকে ফিরিনি—আত্মীয় বাড়ীতেই ছিলাম। ফিরলাম পরের দিন বিকেল বেলায়। ফিরে দেখি গ্রামে হুলস্থুল ব্যাপার। ভোর রাতে নাকি ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে—লাল পাগড়ীর ফাঁক এবে কার্ত্তিক দত্তর বাড়ী ঘেরাও করে ঘরের জিনিস পত্র তছনছ করে হাঁড়ী কলসী উনুন ভেঙে—বিছানাপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে সে এক মহাপ্রলয় কাণ্ড করে গেছে! কি সমাচার? না দত্ত বাড়ীতে নাকি কেরায়ী আসামীরা আছেন, তারা বোমা তৈরী করে নিরীহ মানুষকে গুলি করে মারে, আর টাকাকড়ি লুটে পুটে নেয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করে। কিন্তু তাকাতরাও কম চালাক নয়—তার আগেই উধাও। কার্ত্তিক দত্তও সেই সঙ্গে পালিয়েছে। খবর শুনে কালো রোগা মত শান্ত নিরীহ চেহারার সেই লোকটিকে মনে পড়ল যিনি আমাকে গীতা পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর দীর্ঘকাল কার্ত্তিক দত্তের কোন খবর পাইনি। একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষের অভাবে তিনটি বৃত্তিহীন নিরীহ মহিলা কি ভাবে সংসার চালাতেন সে সন্ধান রাখার বয়স তখন নয়—তবে দেখতাম আর পাঁচজনের মত খেয়ে পরে ওঁরা দিব্যি বেঁচে রয়েছেন। তারপর একদিন ওরাও দেশের বাড়ী ছাড়লেন।

দু'মাস পরে আবার খবর এলো কার্ত্তিক দত্ত তার পাঁচজন সঙ্গীর সঙ্গে তেলেনিপাড়ার ডাকাতির কেসে ধরা পড়েছেন এটা নাকি স্বদেশী ডাকাতি। ডাকাত ধরেছেন যে পুলিশ ইন্সপেক্টর উনি আত্মীয়। আত্মীয়টি মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসতেন—কার্ত্তিক দত্তকে ভালভাবেই চিনতেন—কারণ দুই বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে সেই মহাপ্রসাদ গোছ পাতানো একটা সম্বন্ধ ছিল যার ফলে প্রায় প্রতিদিন দুই বাড়ীর মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে মিলতেন। কার্ত্তিক দত্ত ডাকাতি করার পর সৈতে নিয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরেন কিন্তু আত্মীয়ের চোখে ধুলো দিতে পারেন নি। এই ঘাবলার ফলে কয়েক বছরের জন্য জেল হয় ওদের।

জেল থেকে খালাস হয়ে মুঙ্গের চলে যান দত্ত। শোনা গেল সেইখানে ইস্কুল মাস্টারি নিয়েছেন। অতঃপর তিনি মুঙ্গেরেই বাস করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন সুরু করলেন কংগ্রেস অহিংস উপায়ে স্বরাজ লাভে ব্রতী

হল, বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হতে লাগল। কার্তিক দত্তরাও সংগ্রাম নীতির পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। ক্রমে ওঁর কথা আমরা ভুলে গেলাম।

তারপর কবে কোথায় কি ভাবে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি নিভে গিয়েছিল সে বিবরণ এখনও আমাদের অজানা।

কার্তিক চন্দ্র দাস ছিলেন অন্য পথের যাত্রী। ধনী ব্যবসায়ী, তোপচাঁদপুরে চিনির কারখানা আছে—এজেন্সি আছে কয়েকটি পণ্য দ্রব্যের। তামিজমা বাগ বাগিচাও প্রচুর, কলকাতার বড়বাজারে আড়ত আছে—বাড়ী আছে—খাস কলকাতায় বিপুল সম্পত্তির মালিক। বিবিধ সূত্রে অর্থ সমাগম হলেও ওর মনে একচিন্তা—কেমন করে নিজের গ্রাম উন্নত হবে—স্বীয় কীর্তিকলাপের দ্বারা বংশের মুখোজ্জ্বল করবেন, নিজে যশ খ্যাতির শিখরে উঠবেন। সেকালে ইংরেজ রাজপুরুষকে তুষ্ট করে রায়সাহেব রায়বাহাদুর খেতাব লাভ ছিল একটা মস্তবড় সম্মানীয় পুরস্কার, সেই পথে সম্মান আহরণের চেষ্টাও উনি যথাসাধ্য করেছেন। সেটা ঠিক দরকার তোষণের পর্যায়ে ফেলা যায় না—যশের মধ্যে গণ্য হয়ে দেশ সেবার সুযোগ লাভের একটা পন্থাও বটে। প্রথম ইস্কুলের সেক্রেটারি হয়ে রাজপুরুষদের সংস্পর্শে আসেন। ইস্কুল সংলগ্ন জমিতে নিজ নামে একটি পাঠাগার স্থাপন (কার্তিক লাইব্রেরী) ওঁর কয়েকটি কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। তার আগে স্বর্গত পিতার নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করেন—যার উদ্বোধন করেছিলেন, সেকালের বিভাগীয় কমিশনার কলিন্স (মাণিকচন্দ্র দাস দাতব্য চিকিৎসালয়)। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন গণেশ মন্দির, কাশী থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আনিয়ে মহাধুমধামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় বিনায়ক মূর্তি। অতঃপর গ্রাম প্রান্তে মায়ের নামে বৃহৎ একটি জলাশয়ের খনন (কেদারেশ্বরী কুণ্ড)। গ্রামের পথে কয়েকটি নলকূপ দান করেছিলেন একসময়ে। ইস্কুলের প্রকাণ্ড একটি হল তাঁরই দানে সম্পূর্ণ হয় এবং প্রশস্ত সুদীর্ঘ একটি রাজপথ তাঁরই অর্থানুকূল্যে প্রশস্ত পাকা সড়কে পরিণত হয়েছে। দানের তালিকায় দেশের মধ্যে তাঁর নামটি যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নিরহঙ্কার সদাশিব মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের মালিক হয়েছে, নিজের দক্ষতায় সেই সম্পদ বহুগুণ বাড়িয়েছেন—কিন্তু সম্পদের অহঙ্কার তাঁকে কোনদিনই স্পর্শ করেনি। এমনকি সমাজের শীর্ষস্থানে বসেও সমাজ পরিচালনার কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন নি।

কার্তিক চন্দ্রের দানের তালিকা সুদীর্ঘ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হাসপাতাল পাঠাগার দেবমন্দির জলাশয় রাজপথ সবগুলিই সেকালের প্রজারঞ্জক ভূস্বামীদের কথা স্মরণ করায়, তাঁদের দানের মত অচিরস্থায়ী। এগুলি অপরের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গীকৃত-স্বত্ব খানিকে গণশক্তি সমর্পিত নয়। অর্থাৎ নিজের স্বত্ব সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে সাধারণের হাতে তুলে দেওয়ার ঔদার্য থেকে বঞ্চিত। ফলে অল্প কালের মধ্যে প্রাণ শক্তি থেকে কোনটা বা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

এর জন্য একা দায়ী নন কার্তিক চন্দ্র তাঁর মন্ত্রণাদাতা পরিষদবর্গ তুল্যাংশে দায়ী।

কার্তিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর পাঠাগারটির অবস্থা যখন খুবই শোচনীয় হয়ে ওঠে তখন আমরা কয়েকজন মিলে চেষ্টা করেছিলাম যাতে ওটি সর্বসাধারণের সম্পত্তিভুক্ত হয়, কিন্তু তাঁর মুখ্যসচিব ও উত্তরাধিকারীরা এতে সম্মত হন নি। ওঁদের বক্তব্য ছিল- পাঠাগারটিকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে রেখে সাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা। এ যেন সেইরকমের ব্যবস্থা ঘরটা তোমার টাকায় মেরামত করিয়ে ভোগদখল কর, কিন্তু সাবধান ঘরের আসবাবপত্রে হাত দিয়ো না, কিংবা আলো হাওয়াকে অবাধ করার জন্য

নতুন করে ধরজা জানালা বসিয়ে নেবা। মালিকপক্ষের অনুমতি ছাড়া তোমাদের খুশিমত কোন সংস্কারই চলবে না। এক কথায় সর্বস্ব তোমার চাবি কাঠিটি আমার এই সর্তে সাধারণের সাহায্য মেলেনি ; পাঠাগার শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে।

হাসপাতালের অবস্থাও অনেকটা এই রকম—একদালীন দানের অর্থমূল্য আজ যৎকিঞ্চিৎ, সেই অর্থে বর্তমানে হাসপাতাল চলতে পারে না—তেমনভাবে চলার অর্থ দাতার সদিচ্ছাকে উপহাস করা। পরিচালকরা যদি মনে করে থাকেন নির্বাপদীপে কিন্তু তৈল দানং তাহলে তৈলহীন দীপে নির্বাণের মুহূর্তটি অত্যাসন্ন। পুষ্করিণীও সংস্কার অভাবে পঙ্ক সৈবালে পূর্ণগর্ভ, নিয়মবিকারের গতি পথে সব কীর্তিই মিশ্চিহ্ন হয় এইটাই কালবিধি।

দাতার সদিচ্ছা সত্ত্বেও দানের পরিণাম এমন শোচনীয় হয় কেন, এই প্রশ্ন বহুবার মনে হয়েছে। হয়তো দাতারই দুর্বলতা এর অন্যতম কারণ, পরামর্শদাতাদের অংশও নিতান্ত গৌণ নয়। সর্বশেষে উত্তরাধিকারীদের দায়িত্ব ও পিতৃবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। দাতা হয়তো জিজ্ঞাসা করলেন, মনে করছি একটা হাসপাতাল দেব—কি রকম খরচ পড়বে বলতো ? পরামর্শদাতারা একটা আন্দাজ দিলেন। কিন্তু কি ভাবে দান করলে দানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না—যাদের উদ্দেশ্যে দান—তারা কি পরিমাণ উপকৃত হবে এবং এই উপকারের স্থায়িত্ব কাল কোন উপায়ে করা সম্ভব-এ সব কিছুই না ভেবে—আন্দাজ মত অর্থে কর্তাকে খুশি করার জন্য অর্থের পরিমাণ যথা সম্ভব কমিয়ে দিলেন নগদ মূল্যে কেনা একটা সম্পত্তির মত···ব্যাপারটাকে মেওয়ার ফলেই, উপকারক ও উপকৃত সাময়িক আত্মতুষ্টি ছাড়া আর কিছুই লাভ করে না। সুস্পষ্ট ধারণার অভাবেও মহৎ কর্মের বিনষ্টি ঘটে। সর্বোপরি অর্থনীতি এবং সাধারণের অভাব অভিযোগ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে রীতিমত অভিজ্ঞতা থাকলে তবে সাধারণের কল্যাণ কর্মটি সর্বাংশে সার্থক হয়। পাঠাগার কেন উঠে যায়, দাতব্য চিকিৎসালয় কেন রোগীকে প্রসূত করে না, পুষ্করিণীতে কেন ভাওলা জমে, টিউবওয়েল কেন বিকল হয় এই সব প্রশ্ন শুধু তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে মীমাংসা করা সম্ভব নয়। যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেও মন ভরে না, কালোপযোগী সুব্যবস্থা এর একমাত্র উপায়।

কার্তিকচন্দ্র তাঁর কীর্তির মধ্যেই জীবিত থাকবেন—এই আশাই হয়তো একদা করেছিলেন—, হায় আশা—কীর্তির পরমায়ু যে কাল নির্ভর এই সত্য তাঁকে কেউ জানিয়ে যেননি।

পাশাপাশি দুটি বাড়ীই আজ কালের প্রহারে জর্জরিত—মূর্ছিত। বিরাট দত্তের বাসগৃহ ভগ্ন ইটের স্তূপ—বন জঙ্গলে ভরা ওয়ারিশ বিহীন পড়ো ভিটায় রূপান্তরিত—দানবীর দানের চকমিলানো বাড়ীটি বাহ্য দৃষ্ট অটুট আছে—কিন্তু অন্তঃপুর, বৈঠকখানা ও ঠাকুর দালান গলকুষ্ঠ কলিঙ্গবৎ মহাকাল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আপন গতিপথে এগিয়ে চলেছেন। মুখে তাঁর কৃপা-কুটিল হাসি।

এই তো মানুষ !

নির্মলেন্দু মাহা

নির্জন গির্জা। সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। শুধু কাঠের খিলানের নীচে শুধুতা। আলসেসের এক প্রোটেস্টান্ট গির্জার অভ্যন্তর অন্ধের রহস্যে থম্‌থম্ করছে।

একটি আলো যেন জ্বলছে এক কোণে, অতি কোমল তার দীপ্তি, অতি সীমায়িত তার রশ্মি বিস্তার। একটি বৃহৎ ও পুরাতন অর্গ্যানের কী-বোর্ড শুধু দেখা যাচ্ছে—আর দেখা যাচ্ছে দুখানি হাত, ঐ কী-বোর্ডের ওপর ন্যস্ত।

হঠাৎ ধ্বনি উঠল, উঠল সুর, উঠল সঙ্গীত। আসন্ন সন্ধ্যার শুব্ধতা কেঁপে কেঁপে উঠল, সুউচ্চ গির্জার বিপুল অন্ধকার যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল ঐটুকু আলোর কাছে। শুধু অঙ্গুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছে অর্গ্যানের কী-বোর্ডে, যেন আর এক আপনাতে আপনি মগ্ন দীপ্তিমান কম্পমান অগ্নিশিখা ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

অর্গ্যান বাজাচ্ছেন আলবার্ট সোয়াইৎসার, সম্মুখে একক অনন্য শ্রোতা য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রঁলাঁ রিউইগ।

জন্ সিবাস্টিয়ান বাখ বাজাচ্ছেন সোয়াইৎসার, মুখে অপার্থিব দীপ্তি, সমস্ত ভাবঘন ভক্তি যেন শিল্পীর শরীরে মূর্তি ধরে মূর্ত হয়ে উঠেছে, একটি পরম প্রেমে, একটি দীর্ঘ প্রণয়তায় সমস্ত যেন নতনম্র হয়ে পড়েছে, জীবনের অজস্র আঘাতের অপমান আর বেদনার ক্ষত সেই সুরের প্রলেপে একটি উদার ক্ষমায় বিরাজমান হয়ে উঠেছে, মানবাত্মার আকুল প্রার্থনারূপে আকাশ স্পর্শ করেছে সেইসুর—সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

আলসেসের এক নির্জন গির্জায় আপন মনে বাখ বাজিয়ে চলেছেন আলবার্ট সোয়াইৎসার···

• • •

উনিশশো তেরো সালের শুরু ফ্রাইডে···

ফ্রান্সের বর্দো বন্দরে একটি অপেক্ষারত জাহাজ···তার হালে মাস্তুলে অনেক দূর দেশের স্বপ্ন·····

এক নবদম্পতি চলেছেন সেই জাহাজে গন্তব্যস্থল আফ্রিকার কেপ লোপেজ, তাঁদের চোখে আরো দূর দেশের স্বপ্ন—আফ্রিকার গহন অরণ্য অঞ্চল—আদিবাসী অঞ্চল—তাঁরা চলেছেন সেখানের আদিম অধিবাসীদের হৃদয়ে পৌঁছতে। তিনি জানেন আফ্রিকানদের কাছে পৌঁছবার একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত আছে—সে পথ প্রেমের পথ—সেবা আর সহানুভূতির পথ—বড় জটিল, বড় উপলবন্ধুর, বড় দীর্ঘ সেই পথ, বোর্দো থেকে কেপ লোপেজের চেয়েও দূর—উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ·····

জাহাজ ছাড়ল।

ঘোর্দো বন্দর অস্পষ্ট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

সঙ্গীত সোয়াইৎসার চলেছেন সেবা আর শ্রদ্ধা দিয়ে মানবতাকে পেতে……

• • •

পেছনে রইল পড়ে একটা সোটা জীবনের ইতিহাস। সুরু হল এমন একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন যে সেই ফেলে আসা নিটোল, পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের সঙ্গে কোথাও রইল না এতটুকু মিল, এতটুকু সংযোগ সূত্র সামঞ্জস্য।

বন্ধুরা নিষেধ করেছিল, বাধা দিয়েছিল এক জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ধর্মতত্ত্ববিদ্ ও অর্গান বাদককে, বলেছিল, এই সভ্যতা ছেড়ে কোথায় কোন্ নরখাদকদের মধ্যে যাবে? কোথায় থাকবে তোমার সঙ্গীত—তোমার ধর্মতত্ত্ব, দর্শন?

সত্যিই, প্রায় অকল্পনীয়, তাবা যায় না কতখানি আন্তর ঐশ্বর্য থাকলে খ্যাতি ঐশ্বর্যের বিপুল সমারোহ ত্যাগ করে আফ্রিকার অন্ধকার নিভৃতে যাওয়া যায়।

পেছনের সে ইতিহাস মানুষের জ্ঞান সাধনার বিস্ময়কর ইতিহাস। সাত বছর বয়সেই স্তোত্র রচনা করলেন। আট বছরের ছোট বালক, হাত পৌঁছয় না রীডে, তখন থেকেই অর্গান বাজাতে শিখলেন। ন'বছর বয়েস থেকেই নিয়মিত অর্গান বাজাতে বেরোলেন।

ক্রমে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে এলো। তারুণ্যের প্রথম থেকেই সুরু হল ত্রিধারা সাধনা। জ্ঞান সাধনার ইতিহাসে এমন বিপুল ও ব্যাপ্ত সংগ্রাম চিরকালের পথচলা মানুষের মনে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে কাণ্টের ওপর থিসিস রচনা করে লাভ করলেন প্রথম ডক্টরেট উপাধি। ক্রমে ধর্মতত্ত্ব ও সঙ্গীতে আরো দুটি ডক্টরেট। বয়েস তখন কত? বড় জোর পঁচিশ।

ততক্ষণে জ্ঞানী সোয়াইৎসার লেখক সোয়াইৎসার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বই লিখে চলেছেন।

এই ভাবে কাটল আরো পাঁচ বছর।

তারপরে এলো সেই পরম সন্ধিক্ষণ—জীবনের তিরিশ বছর। তিনি তখন খ্যাতি প্রতিপত্তির উত্তুঙ্গ শিখরে। পৃথিবী স্বীকার করে নিয়েছে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সঙ্গীত, অর্গান নির্মাণ—এর যে কোন একটি বিভাগে তাঁর যা দান তা একটি মানুষের সারা জীবনের শ্রম বিনিময়েই মাত্র সম্ভব।

কিন্তু শুধু মাত্র জ্ঞান আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে যদি না থাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যোগে সত্যকে পাবার জন্যে এই জগৎ আর জীবনকে কেবলি খণ্ড খণ্ড করে দেখলাম। শুধু বিশ্লেষণ ভাঙো-ভাঙো—শতেক টুকরো করে ফেলো যা ছিল এক তা হোক সহস্রাংশ। তারপর—তারও পরে—একটি সময় এলো যখন আমাদের মধ্যে থেকেই জ্ঞানী মানুষ উপলব্ধি করলেন এইবার সময় হয়েছে, সত্যকে পেতে হবে সমন্বয়ের যোগে, আর বিয়োগ বিশ্লেষ নয়, এবার মিলন সংশ্লেষ, একেবারে গোটা মানুষকে পরিপূর্ণরূপে পেতে হবে।

আমরা যখন আত্মস্বার্থে মত্ত হয়ে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের চক্রান্তে যোগদান করলাম তখন আমাদের এই পৃথিবীতে বাস করে জ্ঞানী মানুষটি ভাবলেন, আমি তিরিশ বছর অবধি বাঁচলাম কেন? কেন এই কলা ও বিজ্ঞানের যুক্ত সাধনা? এর পরেও কি কিছু নেই? আছে—বহুতরের সাধনা, মানব সেবার সাধনা। কিসের জন্যে এই জ্ঞানার্জন? মানুষের সেবার জন্যে, সেইখানেই জ্ঞানের সার্থকতা।

আত্মপ্রশ্নে মুখর হলেন সোয়াইৎসার, শুধু ব্রত নয়, সেবাকর্মে কি উপযুক্ত হয়েছি আমি ?

য়ুনিভার্সিটি অ্যাকাডেমিক সম্মানিত সমস্ত ছাত্র হয়ে প্রবেশ করলেন ছাদকমে। উদ্দেশ্য—চিকিৎসা বিদ্যা শিখবেন। উত্তর-তিরিশ সোয়াইৎসার সবচেয়ে উঁচু থেকে সবচেয়ে নীচুতে নেমে এলেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে, তপস্যার ক্ষেত্রে তো উচ্চনীচ নেই, কর্মী আপনাকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন, সেই প্রস্তুতিপর্বেই তিনি প্রথম বার্ষিক ছাত্রদের পাশে বসে সকলের চেয়ে মহানরূপে প্রতিভাত হলেন।

উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো বারো—সুদীর্ঘ আট বছর ধরে এক পরিণত প্রাজ্ঞচিত্তের চলল শিক্ষাগ্রহণ, এ যেন জীবনের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-মননকে নতুন করে ছেলে সাজানো।

এই প্রস্তুতিও কর্ম। এই কর্মের মধ্য দিয়েই তাঁর জীবন-দর্শনটি ধীরে ধীরে বাস্তবে পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

কেন এই পৃথিবীতে তুমি এসেছ ? তুমি তো বিশ্ববিজিগীষু নও, তুমি তো আলাদা করে ঘর বাঁধোনি, তুমি সমগ্র মানব সমাজের, মানব সেবার মোগে তোমার জীবনের উত্তরণ। সেবার দ্বারা তুমি অপরকে ধন্য করবে না, ধন্য হবে তুমি নিজে—কেননা তুমি বাঁচতে শিখবে। যেন একটি গভীর দায়বোধ তোমার থাকে—মনুষ্যত্বের দায়, চিন্তা ও কর্মের দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধনের দায়।

অধ্যয়নকাল শেষ হয়ে এলো। আরো দুটি বিষয়ে ডক্টরেট লাভ করলেন—ডক্টর অব মেডিসিন, ডক্টর অব সার্জারি। বয়েস প্রায় চল্লিশ। বলতে কি জীবনের এই তো সুরু। কর্মের গতিপথ তখন যে আদর্শের অনুসারী তার ভাষা প্রকাশ ঘটেছে ছোট্ট কটি কথায় : জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। এ যুগের স্বার্থান্ধ পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব-সাধনের ধারাবাহিকতা যেন এই ছোট্ট দুটি কথায় নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। বেথেফোঁর দা ভিঞ্চি আর গোটে—উনবিংশ শতাব্দীর টলস্টয়—এবং তাঁরই উত্তরসূরী বিংশ শতাব্দীর রঁলা ও গান্ধিজী—এইসব মহামানব বিশ্বমানবতের আপাতঃ শেষ প্রতিনিধিরূপে দাঁড়িয়ে আছেন আলবার্ট সোয়াইৎসার।

তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন, কিন্তু এত বৃহৎ যে চিনতেই পারলাম না। এই হয়তো এ যুগের বৃহত্তম ব্যর্থতা।

তিনি চলেছেন শ্রদ্ধা দিয়ে প্রীতি দিয়ে মানবতাকে পেতে। এই-ই হলো এ যুগের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম—একক—অনন্যসাধারণ···

• • •

সব কিছু ধোঁয়াচ্ছন্ন—আবছা—অস্পষ্ট—ঘুমায়িত—যেন বিশ্বসৃষ্টির উষালগ্ন···

সদ্যজাত নিবিড় অরণ্য—অনিরুদ্ধ আদিম নদীরেখা সব যেন মিলিত গলিত। এক নিবিড় কুয়াশায়, এক ঊর্ধ্বমুখী বাষ্পোচ্ছ্বাসে সমস্ত আচ্ছন্ন—দুর্গম—দুর্ভেদ্য—মনুষ্যবাসের অযোগ্য··· ··

এই হলো ল্যাম্বেরিন—ওগোউই নদীর তীরভূমি—ফ্রেঞ্চ ইকোয়েটরিয়াল আফ্রিকায়—বিষুব রেখার চল্লিশ মাইল দক্ষিণে · ···

এক নৌকো চলেছে সেই নদীর ওপর দিয়ে।

সোয়াইৎসার চলেছেন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করতে।

পৃথিবীতে এত স্থান থাকতে ল্যাম্বেরিন কেন ? কারণ এই অঞ্চলটি হলো পৃথিবীর অন্যতম দূর দুর্গম আদিম অঞ্চল, সভ্যতার আলো এখানে কখনো প্রবেশ করেনি, পাঁচশো মাইলের মধ্যে চিকিৎসার নেই এতটুকু ব্যবস্থা।

সম্মুখে কঠোর বাস্তব, বাইরে কোথাও নেই একটু আখাস, অন্তরে শুধু আদর্শের অচকল দীপ্তি : আঘাত থেকে নিজেকে যে বাঁচাতে চাইবে, যে চাইবে সকলের ক্ষতির বিনিময়ে স্বার্থপরের মতো বাঁচতে জীবন তার কাছে ধরা দেবে না, আর যে করবে আত্মোৎসর্গ—ঈশ্বরের কাছে, মানুষের সেবায়—সেই লাভ করবে প্রকৃত জীবন।

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে জীবনকে পেতে চলেছেন শোয়াইৎসার।

• • •

ধীরে ধীরে হাসপাতাল গড়ে উঠল, দীর্ঘ দিনের চেষ্টায়, অতি কঠোর পরিশ্রমে। প্রায় অসাধ্য সাধন শোয়াইৎসার। নানা বিভাগে তাঁর অসামান্য জ্ঞান প্রকাশ পেতে লাগল। কৃষি, যন্ত্রশিল্প, ছুতোরের কাজ পশু চিকিৎসা, উদ্যান রচনা—আশ্রমের সব বিষয়ে হাত লাগালেন তিনি। এ যেন যুদ্ধ হাতে স্বর্গ রচনা। নিয়ত হাতে সংগ্রাম। পরিখা অজস্র অধ্যুষিত জঙ্গল অরণ্য থেকে প্রতিটি ইঞ্চি জমি উদ্ধার করতে হয়েছে, শরীরকে রক্ষা করতে হয়েছে অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর আক্রমণ থেকে।

এ সবের চেয়েও পরিশ্রমসাধ্য মানুষকে পাওয়া, তাদের অন্তরের বিশ্বাসকে পাওয়া। সেখানে প্রত্যাশা সীমাহীন বলেই বোধহয় অবসাদ আর আশাভঙ্গ সুপ্রচুর। মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছেন শোয়াইৎসার : কী মূর্খ আমি! আমি কি না এসেছি এই সব বন্য বর্বরদের চিকিৎসা করতে।

অতীত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর স্মরণে আসত। রোগী মারা গেল। আফ্রিকানরা ভাবলে ডাক্তার আসলে চিতাবাঘ, মানুষের প্রাণ নিচ্ছে। একবার মলম দিলেন ঘায়ে লাগাতে, সবটা খেয়েই বসল রোগী। আর একবার এক বোতল তরুণ দিলেন সপ্তাহ ভোর খেতে, এক চুমুকে তৎক্ষণাৎ সাবাড় হয়ে গেল সেটা।

এই অবিশ্বাস আর অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চললেন শোয়াইৎসার।

ওদিকে প্রশ্ন জাগল মনে : সংগ্রামের মধ্যে কি ঈশ্বরকে স্মরণ করবো না? বিস্মৃত হবো কি আরাধনা সঙ্গীত? জন সিবাস্টিয়ান বাখের ওপর বই রচনা সুরু করলেন : জাঁ সিবাস্তিয়েঁ বাখ, লা মিউজিসিয়ান পোয়েতে।

মাঝে মাঝে অর্থাভাব ঘটল। ইউরোপ আমেরিকায় অর্গ্যান কনসার্ট আর বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন শোয়াইৎসার। মানব সেবার জন্যে ঈশ্বরের গান গেয়ে ভিক্ষে চাইলেন মানুষের দুয়ারে।

মনে হয় দ্বিধাবিভক্ত জীবনধারা—একদিকে ইউরোপ, আমেরিকা—সংগীত, বক্তৃতা—অন্যদিকে আফ্রিকা—অরণ্য—অস্বাস্থ্য। কিন্তু ভেতরে নিবিড় সামঞ্জস্য। ঐ সংগীত—ঐ কথামালা—সব আফ্রিকার জন্যে।

তাই জীবন বিভক্ত হয়েও হলো না। পূর্ণ সাধনা হইল অক্ষুণ্ণ। জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় জয়লাভ করলেন। সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যে. জীবনের নানা বিরোধী বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করলেন। অব্যাহত গতিতে বই লিখে চললেন। খণ্ডে খণ্ডে রচনা করলেন কিলসফি অব সিভিলাইজেশন। প্রথম খণ্ডের নাম দিলেন সভ্যতার ক্ষয় ও পুনরুদ্ধার। দ্বিতীয় খণ্ড—সভ্যতা ও নীতিশাস্ত্র।

নানা অপ্রত্যাশিত দিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত এলো। প্রথম মহাযুদ্ধে ফরাসীভূমিতে জার্মান হিসেবে বন্দী হলেন, বিনষ্ট হল হাসপাতাল, উনিশশো চল্লিশে ফিরে এলেন আফ্রিকায়, আগের চেয়ে বড় হাসপাতাল গড়ে তুললেন—ধ্বংসকে অতিক্রম করে ধ্বংসাতীত মানবতা মাথা তুলে দাঁড়াল। এতো শুধু হাসপাতাল নয়, আশ্রমের পবিত্র গভীর পরিবেশ এর সর্বাঙ্গে। সর্বত্র আশ্রমের সাধনা—সকল জটিলতামুক্ত জীবনযাত্রা—

সার সার নীচু নীচু পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশটি বাড়ী সভ্যজগতের যে উপকরণে আমরা একান্তই অভ্যস্ত সেখানে তা নিতান্ত দুর্লভ—দুষ্প্রাপ্য। এমন কি প্রতিটি সেক্‌টিগিল পর্যন্ত সেখানে হিসেব করে সযত্নে ব্যবহার করতে হয়। এর ওপর আছে উষ্ণ মণ্ডলের জলবায়ুর মারাত্মক আক্রমণ—হট ওয়াটার ব্যাগ এক সপ্তাহের বেশী টেকে না, ব্যাণ্ডেজ উইপোকায় খেয়ে ফেলে। এই পরিবেশের মধ্যে শত শত মাইল দূর থেকে আসা সহস্র সহস্র মানুষের চিকিৎসা করে চলেন সোয়াইৎজার। দুরারোগ্য ব্যাধি সব—নানা ধরণের অসুখ—প্রায় অলৌকিক শক্তি নিয়ে তাদের তিনি আরোগ্যের পথে পরিচালিত করেছেন।

উনিশশো তিপ্পান্নর অক্টোবরে এই মানুষটিকে বাহান্ন খ্রীস্টাব্দের শান্তি পুরস্কার দিয়ে নিজেদেরই সম্মানিত করলেন নোবেল কমিটি। অসলো সহরে পুরস্কার প্রদানের সভায় উঠে দাঁড়ালেন উনআশী বছরের সত্যদ্রষ্টা পুরুষ, দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: বিজ্ঞানের আশ্রয়ে আমরা যতই অতিমানব হবার চেষ্টা করছি ততই অমানুষ হয়ে পড়ছি। এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আমাদের বিভ্রান্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করুক। আমরা যেন পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত করার জন্যে আমাদের আশা ও কামনাকে চালনা করতে পারি।

আজকের পৃথিবীতে বাস করে আর এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছেন সোয়াইৎজার।

রাত গভীরের ল্যাম্বেরিনে পিয়ানো বাজে। বাইরে অরণ্যের নিবিড় অন্ধকার। নীরব নিস্তব্ধ আফ্রিকা। সারাদিনের পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত। আমাদের এই সভাতা থেকে অনেক দূরে এক ভাঙা পিয়ানোর ধারে বসে প্রার্থনা সংগীতের সুর বাজিয়ে চলেন সোয়াইৎজার।

শুনতে কি পাও একটি সংগীত উঠেছে আফ্রিকা অতিক্রম করে, একটী সুর উঠেছে পৃথিবী ঘুরে, এক মানবাত্মার আকুল প্রার্থনা স্পর্শ করেছে ঈশ্বরের পদতল · ···

তিনি অপেক্ষা করে আছেন...

কবে আমরা শুনব সেই সুর···সেই সংগীত···

আমাদের অন্তর দিয়ে···অন্তরের উজাড় করা আকুতি দিয়ে···

আমাদের খাওয়া-পরায় বিজাতীয় প্রভাব

গৌতম

[জাতি হিসেবে ভারতবর্ষের বিশেষ এক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আছে, যা সে আজ হারাতে বসেছে। আজ আমাদের অনেকেরই আচারে-ব্যবহারে এমনি পরিবর্তন এসেছে যে, তার ফলে আমাদের বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে বসেছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতা—হয়তো এই কারণে বাইরের প্রভাব এসে পড়েছে আমাদের ওপর, কিন্তু সেই প্রভাবকে অতিক্রম করবার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছি ব'লেই আমরা আজ এমন ক'রে আমাদের জাতীয়তাকে বিসর্জন দিতে বসেছি। অনুকরণপ্রিয় জাতির অবনতি ও বিলুপ্তি তো এমনি করেই আসে। এই একই কারণে ভারতবাসী হারিয়েছে তার অনেক কিছু—তার শিল্প বাণিজ্য, এমন কি, তার সামাজিক পরিবেশ পর্যন্ত। এই মানসিক অপমৃত্যুর হাত থেকে জাতিকে বাঁচাতে হ'লে আজ তাকে ফিরে যেতে হবে তার অতীতের আদর্শের মধ্যে, খুঁজে দেখতে হবে, কি ছিলো আর কি সে হারিয়েছে। আজ আমরা ভুলে গিয়েছি কি ছিলো আমাদের রীতি-নীতি, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা আর আমাদের খাওয়া-পরা ; সেইসব কথাই—বিশেষ ক'রে আমাদের খাওয়া-পরার সম্বন্ধে অতীতের চিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলাই হল এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।]

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পথ দিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলেছেন। গায়ে চাদর, পরণে ধুতি, পায়ে কটকী চটিজুতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর মূর্তিমান বিদ্রোহ! কারণ সে যুগ ছিলো ইংরিজিয়ানার যুগ। সাহেবি খানা আর সাহেবী পোষাকে জেন্টা-দুরস্ত বাঙালী!

একখানা জুড়ি-গাড়ী সশব্দে এসে দাঁড়ালো, তাঁর সামনে। গাড়ী থেকে নামলেন সে যুগের নতুন সাহেব মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম ক'রে তিনি বললেন, গাড়িতে উঠুন।

পথের লোক দাঁড়িয়ে দেখলো সাহেবের কাণ্ড। পণ্ডিত মশাই হেসে বললেন, এইটুকু পথ যাবো, তার জন্যে আর গাড়ী কেন?

মধুসূদন বললেন, তাহলে যে আমিও গাড়ীতে উঠতে পারি না।

সেদিন পথের দু'ধারের লোক দাঁড়িয়ে যে-দৃশ্য দেখেছিলো, সে-দৃশ্য আজকের মানুষের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু। আজ যাঁর কথা বলছি, সমগ্র জাতির প্রণম্য তিনি। তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

একবার এক মুসলমান মৌলবীকে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, সবাই কোট-প্যাণ্ট পরেছে, তুমি পরলে না কেন?

মৌলবী সাহেব হেসে বললেন, আপনিই বা ধরেন কি কেন ?

বিদ্যাসাগর বললেন, আমাকে ও-পোষাকে মানাবে না।

মৌলবী ও হাসলেন। বললেন, আমাকেও মানায় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মৌলবীকে জড়িয়ে ধরলেন।

এঁরা ছিলেন জাতির প্রতীক। তাই জাতীয় পোষাক কোনদিন কোন কারণেই পরিত্যাগ করেন নি।

এই ধুতি-চাদর-চটিজুতো-পরা ভারতের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একবার কোনও বিশেষ কাজে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ধুতি-চাদর-চটিজুতো পরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখে লাটসাহেবের প্রাসাদের ফটকে-সেপাইরা তাঁকে যেতে দিলে না। বিদ্যাসাগর অমনি ফিরে চললেন। সেই খবর হঠাৎ কেমন ক'রে লাটসাহেবের কানে গেলো। তাড়াতাড়ি লাটসাহেব ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। খানিকটা গিয়েই বিদ্যাসাগরকে তিনি বিশেষ অনুরোধ ক'রে নিজের প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলেন।

কথায় কথায় লাটসাহেব বিদ্যাসাগরকে বললেন, সাহেবী পোষাক পরা থাকলে ফটকে সেপাইরা আপনাকে রুখতো না—সহজেই পথ ছেড়ে দিতো।

লাটসাহেবের সেই কথায় বিদ্যাসাগর সতেজে উত্তর দিলেন, লাটসাহেবের বাড়ীতে যেতে হ'লে তাঁকে যদি নিজের জাতীয় বেশ ত্যাগ ক'রে বিদেশী পোষাক পরতে হয়, তাহলে কিছুতেই তিনি আর লাট-সাহেবের বাড়ী যাবেন না। নিজের দাপঠাকুর্দার ধারা তিনি কিছুতেই বদলাবেন না।

জাতির জাতীয়তাই তার অস্তিত্ব। যতদিন জাত আছে, ততদিন সেও আছে। এ কথা পৃথিবীর সকল জাতিই জানে। তাই জাতির জন্যে তারা প্রাণ দেয়।

আমরা দেখেছি, রাজনৈতিক বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ইংরাজ পৃথিবীর সর্বত্র গিয়েছে, কিন্তু কোনদিনই তারা নিজের দেশকে এবং জাতিকে ভোলেনি। এই দেশ-প্রীতি এবং জাতীয়তার সচেতনতাই আজ তাদের এত বড় করেছে। তারা হাজার অসুবিধা ভোগ ক'রেও অপরদেশের একটি ছুঁচ পর্যন্ত ব্যবহার করে না। তারা জানে, এ ক্ষতি শুধু তার নিজের দেশের নয়, তার জাতির। ইংরাজদের মতন আমেরিকান জার্মান ফরাসী ইটালিয়ান রাশিয়ান জাপানী চীনা সব দেশের লোকেরাই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। জাতির সঙ্গে দেশের শিল্প এমনি করেই বড় হয়।

খাদ্য বিষয়েও তাদের মানসিক দৃঢ়তা অনুকরণীয়। এতকাল ভারতবর্ষে বাস ক'রেও, তারা ভারতের খাদ্য গ্রহণ করে নি—যা আমরা নিত্য ক'রে থাকি। আমরা অনেকেই চীনা হোটেলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে আসি, আর সাহেবি-খানা না হ'লে আজ আমাদের অনেকেরই চলে না। আমাদের মতন কসমোপলিটন জাত পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

আজকের মানুষ বিদ্যাসাগরের দানশীলতা, বিদ্যার পরিমাপ নিয়ে হয়তো বিচার করবেন, কিন্তু ভাবতেও পারবেন না—সেযুগে তাঁর এ কত বড় বিলাস! যদিও তিনি বিদ্যা ও অশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন, তবু বিদ্যার জন্যেই শুধু নয়, দয়ার সাগর ব'লেও উনিশ শতকের জাতীয় প্রতীক হিসাবে আজ তিনি সকলের নমস্য।

একদিন মাইকেল মধুসূদন বলেছিলেন, ওঁর মত সরল উদার মানুষ আমি দেখিনি, কিন্তু ঐ গোঁড়া পণ্ডিতের ভেতরে আগুন আছে—যে-আগুনকে আমি ভয় করি। আমার তাঁর মতো পরম বন্ধুও আমার নেই। সে অভিজ্ঞতা আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি।

বিদ্যাসাগর রান্না ক'রে, বাপ-মাকে খাইয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেছেন; একথা তিনি কোনদিনই ভোলেন নি। এই বাপ-মা ছিলেন তাঁর কাছে দেবতা। একবার পাড়াপ্রতিবেশীরা দলবেঁধে কাশী যাচ্ছেন বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করতে। বিদ্যাসাগরকে তাঁরা যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তিনি তার উত্তরে তাঁর বাপ-মাকে দেখিয়ে বললেন, এঁরাই আমার বিশ্বেশ্বর-বিশ্বেশ্বরী।

এ কথা আজকের দিনের কে বিশ্বাস করবে! কিন্তু এই আদর্শের মধ্যেই পাবো আমরা ভারত-আত্মাকে।

সেদিন আমরা ছিলেম পরাধীন কিন্তু খাওয়া পরায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য আমরা ষোলআনা বজায় রেখেছি। সে স্বাধীনতা কেউ আমাদের হরণ করতে পারেনি এবং পারেনি বলেই জাতীয়তা বোধে আমরা অত গৌরববোধ করেছি। কিন্তু আজ—আজ আমরা স্বাধীন (যদিও নামেমাত্র) কিন্তু খাওয়া-পরায় আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন—আমরা আমাদের স্বাদেশিকতা হারিয়েছি। এবং এই জন্যই আজ আমাদের জাতীয়তা বোধ লোপ পেতে বসেছে।

শুধু বিদ্যাসাগর নন, সেদিন নারী বাঙালী মাত্রই আর বাঙালীই বা শুধু কেন, ভারতবাসী মাত্রই ছিলেন খাওয়াপরায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। আশুতোষ গুরুদাস, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, মালব্যজী, গান্ধীজী এবং কে নয়।

আজিকার এই পরানুকরণপ্রিয়তা থেকে মুক্ত হয়েছে আমাদের পতন। আমাদের জাতীয়তাবোধ যতদিন না ফিরে আসবে ততদিন আমরা কিছুতেই মানুষ হতে পারবোনা। আর মানুষ না হলে আমাদের কেউ রোধ করতে পারবে না।

রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই কংগ্রেসে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের "বন্দেমাতরম্" গানটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সঙ্গীতটির স্বরলিপি রচনা করিয়া জাতীয় মহাসভায় গান করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি মন্ত্ররূপে সংগ্রামী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাণে উদ্দীপনার ও শক্তির সঞ্চার করেছিল এবং অন্যদিকে ইংরাজশাসকদের ও তাদের কর্মচারিগণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। অসংখ্য শহীদ বন্দুকের গুলিতে অথবা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ ত্যাগ করার সময় এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করে অমর হয়েছেন এবং দেশবাসীকে গৌরবময় মৃত্যুর প্রেরণা দান করে গিয়েছেন।

মানুষ চেনা

মহেশ ন্যায়রত্ন

মহারাজ বিক্রমাদিত্য একদিন কারাগার পরিদর্শনে এসেছেন। একটা বড় কারাকক্ষে ঢুকে দেখলেন, কয়েকজন কয়েদী এক জায়গায় বসে গুলতানি করছে। মহারাজকে দেখে তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। মহারাজ তাদের কাছে জানতে চাইলেন, কী অপরাধে তারা কারাবাস করছে। তারা সমস্বরে বললে, মহারাজ, আমাদের কোন অপরাধ নেই। বিনা দোষে আমাদের দণ্ডিত করা হয়েছে।

শুনে আশ্চর্য হ'য়ে বিক্রমাদিত্য বললেন, সে কী! আমার রাজ্যের বিচারকরা সকলেই শ্রেষ্ঠ নীতিবিদ এবং ন্যায়নিষ্ঠ! তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না?

তারা বললে, তা ছিল মহারাজ। আমাদের কাউকে উৎকোচ নেবার দায়ে, কাউকে দুর্নীতির অপরাধে, কাউকে বা রাজকোষের অর্থ অপহরণের জন্যে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছিল।

মহারাজ প্রশ্ন করলেন, তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না?

তারা বললে, তা ছিল মহারাজ! কিন্তু সেসব সাক্ষ্য প্রমাণ ভুল। আমরা প্রকৃতই নির্দোষী?

তোমরা তাহলে তোমাদের অপরাধ স্বীকার করছ না?

তারা আবার সমস্বরে বললে, না, মহারাজ, স্বীকার করছি না।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আচ্ছা, তোমাদের কথা ভেবে দেখবো।

এই বলে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে দেখলেন, একধারে কোণের দিকে আর একটি লোক হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি কি ওই দলের নও?

ঘাড় নীচু করে লোকটি বললে, না, প্রভু, আমি ওদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হই নি। আমি ওদের পরে এসেছি।

কী অপরাধে এসেছো?

চুরির অপরাধে?

তুমি অপরাধ স্বীকার করছ?

হ্যাঁ, মহারাজ স্বীকার করছি।

এমন কুপ্রবৃত্তি হ'য়েছিল কেন?

লোকটি কাতরভাবে বললে, অভাব অনটনের তাড়নায় মহারাজ! নিজের জন্যে নয়, স্ত্রী আর চারটি ছেলেমেয়ে দিনের পর দিন অনাহারে কাটাচ্ছিল। অনেক চেষ্টা করেও যখন কোন কাজ যোগাড় করতে পারলাম না তখন চুরি করতে আরম্ভ করলাম। প্রাণ ধারণের কোন উপায় পেলে এ পথে আসতাম না।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিয়ৎকাল লোকটির পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, তাহলে তুমি স্বীকার করছ যে তুমি একজন চোর?

ঘাড় হেঁট করে লোকটি বললে, হ্যাঁ, মহারাজ, আমি স্বীকার করছি, আমি একজন চোর। কিন্তু……

মহারাজ বললেন, কোন কিন্তু নেই। বিচারক আইন মতো কাজ করেছেন। হ্যাঁ, তবে একটা কথা। তুমি চোর, আর, এই ঘরে অন্য যারা রয়েছে, তারা বলছে, তারা সকলেই সাধুপুরুষ। তাহলে

এই সব সাধু পুরুষদের সঙ্গে তো একজন চোরকে রাখা ঠিক হ'বে না। সঙ্গ দোষে সাধুরা খারাপ হ'য়ে যেতে পারে। তাই তোমার এখানে না থাকাই ভাল।

এই বলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তিনি লোকটিকে মুক্ত করে দেবার আদেশ দিলেন এবং তাকে এই কারাগারেরই কোন ছোট কর্মীদলে একটা কাজ দেবার জন্য কারাধ্যক্ষকে বলে দিলেন।

পরবর্তীকালে এই লোকটি অত্যন্ত নিষ্ঠা বিশ্বাস ও কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে কারাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হ'য়েছিল এবং মহারাজের একজন বিশ্বস্ত প্রিয় অনুচররূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। মানুষ চিনতেন বিক্রমাদিত্য।

* * *

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের একবার খেয়াল হ'ল, রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদীকে তিনি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন। অমাত্যদের নিয়ে তিনি সভায় বসবেন আর তাঁর সামনে এসে এক একজন করে এক একটা মিথ্যা কথা বলবে। যার মিথ্যা ভাষণ সবচেয়ে বড় মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে, সে-ই পুরস্কার পাবে।

পুরস্কারের লোভে নির্ধারিত দিনে অনেক 'মিথ্যাবাদী' এসে জড় হ'ল। কেউ বললে, মহারাজ স্বচক্ষে দেখে এলাম একটা তালগাছে সোনার তাল ফলেছে। কেউ বললে, মহারাজ স্বকর্ণে শুনে এলাম, একটা গাছের ওপর বসে এক হোমাপাখী মহারাজের গুণগান করছে। কেউ বললে, মহারাজ, আমাদের গাঁয়ে তিনজন মানুষ এসেছে, প্রত্যেকের তিনটি করে মাথা।

কোনটাই মহারাজের মনঃপুত হ'ল না। শেষে একজন পঞ্চকেশ বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মহারাজ, ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব?

মহারাজ বললেন, নির্ভয়ে, তোমার মিথ্যা কথার জন্যে তোমার কোন শাস্তি পেতে হবে না। বল তুমি।

বৃদ্ধ বললে, মহারাজ, আপনার মতন এমন গুণহীন, অবিবেচক, কৃপণক, দয়াহীন, প্রজাপীড়ক রাজা আর কোন দেশে নেই। আপনার রাজত্বে প্রজারা অত্যন্ত অসুখে আছে, তারা নিরন্তর আপনার অমঙ্গল কামনা করছে। তারা বলছে, আপনি বেশিদিন রাজত্ব করলে সারা দেশটা অবনতির চরম সীমায় পৌঁছবে।

বৃদ্ধের কথা শুনে অমাত্যরা ক্রোধে চীৎকার করে উঠল। একজন তাকে তেড়ে মারতে গেল। মহারাজ হেসে বললেন, আরে কর কি অমাত্য! ভুলে যেও না, লোকটা মিথ্যা ভাষণের পরীক্ষা দিচ্ছে!

তারপর অমাত্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বল তোমরা। এই লোকটার মতো মিথ্যাবাদী বোধ করি আর কেউ নেই।

অমাত্যরা সকলেই এক বাক্যে মহারাজের কথা স্বীকার করল। সত্যি, লোকটা কি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী!

বৃদ্ধ লোকটি পুরস্কার নিয়ে মহারাজকে প্রণাম করে হাত জোড় করে বললে, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মহামহিম মহারাজ, আমার উক্তির বিপরীতার্থক শব্দগুলি আপনার চরণে নিবেদন করে গেলাম।

এই বৃদ্ধ ছিলেন রাজ্যের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের অন্যতম। মহারাজ তাঁর পরিচয় জেনে তাঁকে নিজের একজন অন্তরঙ্গ পারিষদরূপে নিযুক্ত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেই বৃদ্ধ তাঁর বাকচাতুর্যে এবং গভীর বিচক্ষণতায় বহুদিন পর্যন্ত মহারাজের মন্ত্রণাদিরূপে বিরাজ করেছিলেন।

প্ল্যাঞ্চেটের আসরে

বাসন্তী বাগচী

শুভশ্রী আর জয়শ্রী দুইবোন এসে বল্লো, "তুমি তো আমাদের কথা কিছু লিখছো না? আমরা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাব ইতিহাস থেকে?"—কী লিখবো, আমি কি সত্যিই একজন সার্থক লেখিকা, যে সব কিছুই গুছিয়ে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবো আমার লেখনী দিয়ে? তবু একথা লিখবো না যে অনেকের চোখেই তারা দুইবোন "মূর্তিমতী জ্যোৎস্না রূপিনী" অর্থাৎ জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ শান্ত শ্রীমণ্ডিত তাদের রূপ, চাঁদ ঘেরা মেঘের মতই তাদের কালো চুলের ঢেউ, স্নোকাম থেকে খোঁপা কিনে না আনলেও তাদের চলে। এ কথা লিখবো না, চালে চলনে ব্যবহারে আভিজাত্যের তারা তাদের পরিবারের প্রাচীন ঐতিহ্যই বহন করে চলেছে, যুগের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেয়নি তারা। এ কথাও লিখবো না, রূপ, গুণ বংশ যা পরমর্যাদায় শ্রীযুক্ত কৃপাল প্রসাদ এবং অমরনাথের সুযোগ্যা সহধর্মিণীই তারা। লিখবোনা—কারণ, বিশেষ কোনো কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবে লিখলে তাদের ছবি ঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবেনা। অনেক কিছুর সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে তাদের অস্তিত্ব—তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিশেষ এক একটি, সেতো অনেকের মধ্যেই পাওয়া যাবে, বর্তমান বাঙালী ঘরেও সেসব যে নিতান্ত দুর্লভ, সে কথা বলবোনা। রাজসিকতা আর সাত্ত্বিকতার মেশানো তাদের প্রকৃতি। তবু শুভশ্রী যেন ঈষৎ উগ্র ম্যাগনোলিয়া আর জয়শ্রী স্নিগ্ধ শ্বেতপদ্ম। শিশুকাল থেকেই শুভশ্রী ছিল ঈষৎ চঞ্চল, এবং জয়শ্রী ছিল ধীর শান্ত প্রকৃতি। তারপর ষোড়শী শুভশ্রী চলেগেল স্বামী গৃহে, নতুন পরিবেশে নতুন করে গড়ে তুলতে লাগলো নিজেকে। জয়শ্রী অনেক বছর কাটিয়ে দিলো চিত্রাঙ্কণের মত—শিকার, অশ্বারোহন, ড্রাইভিং, সেতার বাজনা। জ্যোতিষ চর্চা, সমাজ সেবা, কবিতা, পিতামহীও দাদাদের সেবা যত্ন এইসব নিয়ে। তারপরে হঠাৎ একদিন অমরনাথের ধরনী ছোড়ে। দুই বোন রইলো দুই প্রান্তে, পশ্চিমে আর পুবে। অবশ্য মাঝেমাঝেই আকাশ পথে উড়ে এসে তারা মিলিত হয় দাদাদের সুখ দুঃখের ভাগ নিতে আর বৃদ্ধা পিতামহীকে একটু সান্ত্বনা দিতে। মৃতপ্রায় নাটোর ভবন ক'দিনের জন্য 'শ্রীমণ্ডিত' হয়ে ওঠে। তাদের ঘিরে আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কোহিনুর-দীঘি, আর শিপ্রা-রেবার পাশে পুলকিত হয় নীপ কানন। বেবী, জয়ন্তী, কল্যাণী, প্রতিমাদেরও আবির্ভাব ঘটে মাঝে মাঝে। প্রায়ই সন্ধ্যার পরে বৈঠক খানায় জড়ো হয় সকলে, শুভশ্রী এসে বসে ভজন গান অসমাপ্ত রেখেই, জয়শ্রী আসে সন্ত রক্ষিত ইলিশ পাতুরীর পাত্রটি মাঝিমার জিম্মায় রেখে দিয়ে, নীপা আসে তাড়াতাড়ি তার ছাত্র ছাত্রীদের ছুটিয়ে। রেবা ও নীপা পালাক্রমে হাতে তুলেনেয় কাগজ পেন্সিল, পরলোক রহস্য উদ্ঘাটনে বিভিন্ন রূপে।·· নীপার চোখ অর্ধ নিমীলিত, রেবার হাত কাঁপছে, ঠুংরি গায়িকা রেবার এখন যোগিনী মূর্তি, জয়শ্রী অভিভূত, শুভশ্রী প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে অলক্ষ্যে আবির্ভূত বিদেহী কোনো আত্মাকে। বেহুলা আর কোহিনুর বৌদি উপস্থিত

আছেন পরীক্ষকের ভূমিকা নিয়ে। "কে আপনি? সত্যটি যদি কেউ এসে থাকেন। লিখুন আপনার নামের প্রথম অক্ষর।" পেন্সিল চললো এঁকেবেঁকে। বেহুলার কী একটা ঠাট্টার ফলে তীব্রবেগে বেরিয়ে এলো হিজিবিজি দাগ কেটে, কাগজ ছিঁড়ে। হঠাৎ বেহুলা চমকে উঠলেন, "একী, একী!" "কী হোলো, কী দেখলেন?" "সাদা পোষাক পরা, গৌরবর্ণ, অস্পষ্ট মূর্তি—"খুকুদি বলো, "ইন্দ্রজিৎ নয়তো?" বেহুলা বলেন, "শুধু আমি কেন, বহু বছর ধরে এ বাড়ীতে অনেকেই তো দেখেছে।" দেখেছে পুরাতন ভৃত্য, নবাগতা দাসী, নতুন জামাই সুব্রত পর্যন্ত। ছোটকাই অরুণ সাহিত্যিক শ্রী টিটি বৌদি বলেন "দিদির অসুখের সময় একলা অন্ধকারে যাতায়াত করেছি, কিছু তো দেখিনি।" "বাবার অসুখের সময় আমরা সকলে একই সঙ্গে জানলাদিয়ে দেখেছি ছাদের সমুখের ধারে আজানুলম্বিত মুসলমানের মূর্তি। এতগুলি মানুষ একসঙ্গে কি ভুল দেখলাম আমরা?" "শুভশ্রী বলো।" নীপা সেদিন কী কাণ্ড করলো অর্ধ অচেতন অবস্থায়? সে কী উত্তেজিত, কিন্তু মূর্তি তার! ঠেলে ফেলে দিলো আমায় পরে যখন সুস্থ হোলো, তখন মনে করতে পারলো না কিছুই।" বলো শুভশ্রী। "নীপার হাতেই তো গ্র্যাফেটে বলা দিয়েছিলেন কবি সুকান্ত, নতুন কবিতা রচনা করেছিলেন লেখিকা বিভা সরকারকে লক্ষ্য করে। বিভাদি স্তম্ভিত, বাক্ শক্তিহীন! বাংলাসাহিত্যের কতটুকু খোঁজরাখে নীপা, যে সে নিজে নিজে অমন কবিতা বানাবে! অসুস্থতা হলে না হয় সে কথা বলা যেতে পারতো, একালে নিয়মিত লিখতেন, কবিতার বইও একখানা আছে তাঁর। লেখা অভ্যাস আছে, বই আছে ইন্দ্রজিতেরও, কিন্তু নীপা- অসম্ভব!" কবিরা, শঙ্করদা, বাগচী ও সান্যাল সাহেবেরা তবুও বিশ্বাস করতে চাননা এসব, হেসে উড়িয়ে দেন। বিশ্বাস করেনা বুবুন-টুটুন রুমা রাখী অন্তরী প্রভৃতি মেয়েরা, নিমাই লালকী, সৌভন, কিশোরকাকা, ছুচে প্রভৃতি ছেলেরাও। খুকুদি হাজির হোলো দিদার মহলে। দিদা তখন তাঁর তর্জনী চর্বণরতা (দাঁতির সাহায্যে) নবাগতা মন্ত্রীকে শুধোচ্ছিলেন, "তুই কে এসেছিস বলতো? আমার সঙ্গে এত ভাব কেন?" "দিদা, আপনি কখনো ভূত দেখেছেন?" "দেখেছি একবার মহারাজের আশ্রিত এবং বিশেষ স্নেহের পাত্র একটি ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর পরে তাকে। ঘুমের উপর দিয়ে যেন দুলতে দুলতে আসছে। আর একবার হঠাৎ শুনেছিলাম একজনের গলার স্বর। আমার ছেলের বৌ দেখেছিল কয়েকবার।" "আমার দিদিমা, মাসিমা এঁরাও বহুবার অনেক কিছু দেখেছেন, অনুভব করেছেন। বাবা তো বিশেষ ভাবে চর্চা করেছেন এসব নিয়ে মাসীমার মৃত্যুর পরে কিছুদিন। আমার বাবও চিরদিনের অভ্যাস একা অথবা আর একেজনকে নিয়ে টেবিল চালানো অথবা শুধু কাগজ পেন্সিল নিয়েই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো। মনে পড়ে, ছোট বেলায় একদিন সকালে দাদুর গিরিডির বাড়ির ছাদে শীতের রৌদ্রে বসে আছি, মা আলগোছে ধরে আছেন একটি ছোট তেপায়া। মা বলেন, "আপনি যদি এসে থাকেন, তবে টেবিলের পায়া দিয়ে তিনবার শব্দ করুন।" ঠক্ ঠক্ ঠক্—সত্যিই শব্দ হোল তিনবার। তারপর আমি ঠাট্টা করে কী যেন বলেছিলাম, টেবিল তাড়া করে চললো আমার পিছনে। আমি ছুটে পালাতে লাগলাম, খানিকটা জায়গা জুড়ে এইভাবে দু'তিনবার চক্কর দিল টেবিল আমার পিছনে। মা অবশ্য আলগোছে ওটা ধরেই রেখেছিলেন কিন্তু তাঁর পক্ষে ঠাট্টা করে ওটা নিয়ে আমার অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। আর একবার গ্র্যাফেটে বর্ণদিদি এবং শিবুদিকে মা বসিয়েছিলেন আমার ঠাকুরদাদার একখানা ছবি সামনে রেখে। দু'জনেই ছিল নিরক্ষরা শিবু তো ঠাকুরদাদাকে কখনো দেখেনি, নামও জানতো না। গ্র্যাফেটে কিন্তু তারা ঠিক লিখেছিল ঠাকুরদাদার নামের প্রথম অক্ষরটি। এই বর্ণদিদি তাঁর শেষ রোগে আক্রান্ত হবার আগে এক রাত্রে আমরা তিনজনেই

পৃথকভাবে নানারকম বিভীষিকা দেখেছিলাম। মারা যাবার পরে মা ওঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন পরলোকের নানা খবর বর্ণনা করতেন। শিশু মারা যাবার ক'দিন আগে তার অসুস্থতার খবরই শুধু পেয়েছিলাম, দুপুরে ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে যেন দেখেছিলাম শিশু এসে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, "মরা মানুষকে এত ভয় করা উচিত নয়।" এছাড়া আর কোনো ঐ ধরণের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়নি। মা'র হাতে পেন্সিল দ্রুত চলতো এবং অনেক কথা স্পষ্টভাবে লেখা হয়ে যেত, মা নিজে কিন্তু সংশয়ী ছিলেন এবিষয়ে এ সত্যি বিদেহী আত্মারই লেখা না নিজেরই অবচেতন মনেরই কাজ! শুভশ্রী বলো, "যাই বল তোমরা, ব্ল্যাকেট থেকে খবর পেয়েই আমি যে আসানসোল গিয়ে আমার বাচ্চা পুষ্পার মৃত পিতার একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল যাকে কাগজের গাদা থেকে উদ্ধার করে দিলাম, যা খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে কখনোই সম্ভব হোত না, এতে তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।"

"কী জানি, ঈশ্বর এবং পারলৌকিক বিভূতির মত ভূতও বুঝি এমন কিছু, যা নানা লোকে নানা জনে দেখেছেন, কিন্তু দেখাতে পারেননি। আজো প্রমাণ সিদ্ধ নয় এঁদের অস্তিত্ব। সত্যি, 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলেনা, এঁরা তাই।" তবে ঈশ্বর, ভূত বা বিভূতি আমার নিজের জীবনে 'অঘটন না ঘটালে' আমি মানতে চাইনা কাউকেই।

• • • •

হেলেন কেলারকে একবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা, আপনি অন্ধ হয়ে নিজে কি কোন রকম কষ্ট অনুভব করেন না?

—কিছুমাত্র নয়,—উত্তর দিলেন সেই মহীয়সী নারী।

—কেন বলুন তো?

—কারণ, অন্ধ যেসব অন্যব্যক্তি পৃথিবীতে আছেন, তাঁদের কথা ভেবে ভেবে আমার অতটা সময় যায়, যে নিজের কথা ভাববার আর সময় থাকে না।

নক্ষত্রের জন্য

উমা দে শীল

'বাগানের কোণ থেকে এলোমেলো বাতাসে মিশে মাধবীলতার গন্ধ ভেসে আসছে। তোমার পোস্টকার্ড উড়ে পড়েছে ওই জানলার পাশে যেখানে নানা পাতাবাহারের মেশামেশি। আমার মনটাও বাতাসের মতোই এলোমেলো হয়ে কার্ডখানা ছুঁয়ে আসছে বার বার।' অতি সাধারণভাবে লেখা রেডিওতে স্বরচিত গল্প শোনার ছোট্ট অনুরোধ।

রাত সাড়ে দশটা। গেটের আলো নিবল, বারান্দার উজ্জ্বল বাতির বদলে মৃদু আলোর বেশ শুধু শুকনো ঝরাপাতার শব্দ আর এ্যালসেশিয়ানের নিঃশব্দ উপস্থিতি।

অনেক রঙিন করে অনেক আবরণ দিয়ে কিছু বা বদল করে তুমি যে গল্প লিখেছো সৌমেন, তার নায়িকা যে আমি সেটুকু বুঝতে আমার এতটুকুও অসুবিধে হয়নি। আমার কাকীমাও আজ রেডিওতে শুনলে বুঝতে পারতেন। কারণ রঙিন করে ঢেকেছো তুমি শুধু তোমাকেই আমাকে তো নয়। কিন্তু আমাকে তুমি কতটুকু জেনেছো? জানি না কতখানি জানলে তাকে নিয়ে গল্প লেখা চলে। শুনে মনে হল তোমার গল্পটা বড়ো একতরফা, বড়ো অসম্পূর্ণ। তুমি তোমার সুজাতাকে শুধু চোখ দিয়েই দেখেছো, হৃদয় দিয়ে নয়।

আসল জায়গার নাম ঘাটশিলা। তুমি অন্য নাম দিয়েছো। সেখানের মতো এখানেও আছে পাথর বিছানো নদী আর শালবন, আরো আছে তেমনি শীতের কুয়াশা ঢাকা মায়াজড়ানো সন্ধ্যা।

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ফুলঝুরি পাহাড়ে। সকালের আলোয় দূর শালবনের ছেঁচ নেবার জন্যে সবেমাত্র তোড়জোড় করছি এমন সময়ে আমার মুগ্ধ দৃষ্টিকে আড়াল করে তুমি এসে দাঁড়ালে। একা নও, সঙ্গে আমার কাকীমা। তিনিই পরিচয় করিয়ে দিলেন—

—মিতা, ইনি সৌমেন ব্যানার্জি, মস্ত লেখক। আমাদের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হয়ে ছুটিটা কাটিয়ে যাবেন। এটি সুমিতা চ্যাটার্জি, আঁকিয়ে, গাইয়ে বি. এ. পরীক্ষা দেবে।

তুমি নমস্কার করলে, কিন্তু আমার নমস্কার করা হল না। তুমি লেখক? বিস্ময়ে বরফের মতো আমার মন উদাস হয়ে উঠল হঠাৎ। নিশ্চুপে শালবনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কাকীমার বিরক্তি ঝরে পড়ল—

—যচ্ছো খেয়ালী, আপনি কিছু মনে করবেন না।

আমাদের বাড়িতেই তুমি থাকলে। অনেক সন্ধ্যা বেড়িয়ে, পিকনিক করে, ব্যাটমিন্টন ও ক্যারাম খেলে, মার্কেটিং করে মিলন ঘোষালদের মনোরঞ্জন করলে। আর সব কিছু থেকেই তোমার গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করলে।

প্রথমের দিকে আমি তোমাদের হাসিখেলায় বিশেষ যোগ দিতাম না। যেদিন থাকতাম সেদিন তুমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে। আমার ছবি আঁকার ছড়ানো সরঞ্জামের পাশে বসে একমনে কথা বলে যেতে। আমি প্রায়ই হোতাম নিঃশব্দ শ্রোতা। তোমার মন তাতে হয়তো ভরতো না। কাকীমাকে আমার সম্বন্ধে নানা প্রশ্নে ব্যস্ত করে তুলতে। তবু এমনি করেই আমাদের আলাপ পরিচয় এগিয়ে গেল।

তুমি জানো, ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছি। মনীশকাকা আর বাবা একই অফিসে কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর মনীশকাকাই আমার সব ভার নিলেন। তাঁর আশ্রয়ে কাকীমার স্নেহে, সুভাষদা মণিদির মোন হয়ে থাকলাম কলকাতার এই বাড়িতেই। কাকীমার স্নেহ শুনে খুব আশ্চর্য হলে? আমার সবটুকু জানাবার মতো এতদিন কাউকে খুঁজে পাইনি। তোমাকে সব বলব বলে ঠিক করলাম। তুমি লেখক, তোমাকে আমি অন্যচোখে দেখলাম। ভাবলাম মানুষের মনের গোপনতম কোনার সমঝদার হয়েই তোমার অবাধ আনাগোনা। কিন্তু না—

একদিন তোমার একান্ত আগ্রহে বেড়াতে গেলাম। শুধু তুমি আর আমি। রাতমোহানা ছোট বড়ো অজস্র পাথরের পর পাথর পেরিয়ে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেলাম। সুবর্ণরেখার ওপারে পাহাড়ের কোলে সূর্য ডুবছে। তারি পড়ন্ত আলোয় এপারের বালুর তীরে রুমাল পেতে আমরা বসলাম। তুমি অনুরোধ জানালে—মিতা, গান আমার বড়ো ভালো লাগে। তোমার সেই ভালোলাগাটুকুর আমি অসম্মান করতে পারলাম না। কি যে গাইলাম জানি না—সেই সূর্যডোবা লালআভা আরো লাল হল। রাতমোহানার দিগন্তজোড়া নির্জনতা আরো নির্জন হয়ে উঠল। তুমি সরে এলে আমার কাছে, হাত ধরে আমায় টেনে নিলে, আলতোভাবে আমার চিবুক ছুঁয়ে বললে—আশ্চর্য সুন্দর। আমি বোধহয় খুব চমকে উঠেছিলাম। আশ্চর্য সুন্দর?—আমি না আমার গান। না তোমার ভালো লাগা? অনুর, মণিদি, কাকীমার আশ্রয়ের ভিক্ষুতা সব কিছু মিলিয়ে আমার কেমন গোলমাল হয়েগেল। দিশেহারার মতো আমার লুটিয়ে পড়া হাতের প্রান্ত আঁকড়ে ধরে হঠাৎ বলে বসলাম—মানা, আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না।

আমি তো ভুল বুঝি না। আমার হাতের ওপর হাত রেখে নেবে আসা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে স্থির শান্ত স্বরে কিছুটা অসংলগ্নভাবে বললে—আর কিছুই ভালো লাগে না, আমার জন্যে কি কোথাও এতটুকু শান্তি নেই?

এবার আর চমক নয়। হাত সরিয়ে নেবার প্রশ্নও আর উঠল না। তুমি যে ভুল বোঝনি—এক নিমেষেই মিতার সমস্ত মন ভরে উঠল। ততক্ষণে নদীর ওপর ম্লান জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি শুরু হয়ে গেছে।

সারাপথ নিস্তব্ধ। নীরবে ফিরে এলাম। ফিরতে অনেক সময় লাগল। সেই বুনোপাচাকা মাদলভরানো শীতের সন্ধ্যাটি চিরকালের জন্য আমার জীবনের একটি পরম সান্ত্বনা হয়ে রইল—এই কথাই তখন মনে হল। সেদিন তোমাকে আমি কতখানি দিলাম তুমি জানলে না, জানল শুধু ওপরের অন্ধকার পাহাড় আর—পাথর ছড়ানো সুবর্ণরেখার তীর যেখানে একটি প্রাণ পরম নির্ভরে তোমার বন্ধুত্ব স্বীকার করেছিল একটি মাত্র আশ্বাসে—আমি তো ভুল বুঝিনি।

বাড়ির গেটের সামনে এসে তুমি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে। দুপুরেই বাড়ির সকলের কোথায় যাওয়ার কথা ছিল, কেউই তখনো ফেরেনি। মালী লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল।

একটা কথা মনে রেখো আজ তুমি কিন্তু একলাই বেড়াতে গিয়েছিলে, কেমন?

তোমার বিধাভরা ঘরে আশ্চর্য হলাম। কিছু উত্তর দেবার আগেই তুমি চলে গেলে। লণ্ঠনের আলোয় বড়ো বড়ো ছায়া ফেলে ঘরে এসে শুতে বললাম। পড়া কিন্তু হল না। খাতার ওপর অজন্ত পেন্সিল স্কেচ করলাম আর তোমার অর্থহীন লুকোচুরির কথা মনে করে 'বন্ধু' শব্দটার বিরাট আর সুন্দর সংজ্ঞা খুঁজতে লাগলাম।

দিন পনেরো কেটে গেছে। হরিণটুপী, ফুলকুরি, ধারাগিরির ঝরণার ধারে মিসেস ঘোষালদের সঙ্গে পিকনিক করে দিনগুলো তোমার ভরিয়ে নিয়েছো। সেই আনন্দময়তার কখনো তখনো আমার ডাক পড়ত। কখনো বা শুধুই আমরা। মাঝে মাঝে তোমাকে বড়োই শান্তিহীন ক্লান্ত বলে মনে হত। একটিমাত্র আশ্রয় অবলম্বন করে বন্যায় ভেসে যাওয়া দুটি আর্তের মতো আমাদের বন্ধুত্ব ক্রমে নিবিড় হয়ে উঠল।

একটু পিছনে তাকাই—

মৃত্যুর সময়ে বাবা এমন কিছু রেখে যান নি যা নিয়ে কেউ স্বেচ্ছায় আমার ভার নিতে রাজী হতে পারেন। কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে মনীশকাকা আমায় নিয়ে এলেন। ঐ স্বাধীনতা উনি কিভাবে গ্রহণ করেন তাঁর সংসারের দিকে একবার তাকালেই বেশ বোঝা যায়। আমি তখন নতুন করে পরীক্ষার জন্যে তৈরি হলাম। মণিদির সেকেণ্ডইয়ার। সুভাষদা এম্, এস্ সি পাশ করে বিলেত যাবার কল্পনায় মশগুল। আমিও যেন ওদেরই মতো হয়ে উঠতে পারি সেদিকে তাঁদেরই প্রখর দৃষ্টি ছিল। বিকেলে খোঁপার ওপর আধফোটা গোলাপ না হয় একগুচ্ছ মরশুমী ফুল গুঁজে ঘুরো ফুলফুল ডুরেসের শাড়ি পরা মিতা অতিথি অভ্যাগতদের নিখুঁত কায়দায় কফি পরিবেশন করতে শিখল। মনটা কিন্তু পড়ে থাকত বাগানের শাড়ি সারি গাছের আড়ালে যেখানে রোজ সেই সময়ে সন্ধ্যা নামত বা বাদলাদিনে তালগাছের মাথায় লাগত ছোঁড়া হাওয়ার স্পর্শ।

তখন পর্যন্ত আমার ছবি আঁকায় মিতা খুব অল্পই ছিল। কাকী মা প্রায়ই সেই সব ছবি নিয়ে আদরে গর্ব করতেন। সেই ছবির সূত্রেই অজয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়।

আর্টিস্ট অজয় ব্যানার্জি সুভাষদার বন্ধু। সুভাষদার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে তার প্রায়ই যাওয়া আসা ছিল।

আমি সেবার বি. এ পরীক্ষা দেব। একদিন ছবি নিয়ে খুব আলোচনা চলছে—কলকাতায় এক প্রদর্শনী হবে। অজয় সোজাসুজি রায় দিল—মিস চ্যাটার্জির মন যতটা আর্টিস্টিক, হাতটা ততো তৈরি নয়।

মণিদির বাঁকাহাসি কাকীমা অবাক। মিতার ছলোছলো চোখের দিকে তাকিয়ে অজয় কি যেন ভাবল, আন্দাজ যে সেই আমাকে পথ দেখাবে হাত ধরে নিয়ে যাবে ছোট আঁকিয়ের দরবারে। ওর তখন খুব নাম।

আরম্ভ হল ছবি আঁকা নতুন উদ্যমে। তালগাছের তলায় যাকে আমাদের স্টুডিও বলত, যাদের ওপর। কফির আসর থেকে মিতার নাম কাটা গেল। তখন যে কাকীমার স্নেহেও ভাঁটার টান লাগল—এই সহজ কথাটা মা যাওয়া মিতা বুঝতেই পারল না।

যেদিন চৌধুরীর ছোট্ট প্রদর্শনীতে আমার ছবি প্রথম ঝুলল ঠিক সেই দিনই খবর যায় হল পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছে মিতা চ্যাটার্জির নাম কোথাও নেই।

মণিদির হাসি আরো তীক্ষ্ণ হল। বৈকালিক আসরে গুঞ্জন উঠল। আমার তাতে যেন বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই।

অজয় ব্যানার্জির তুলির এক টানেল থেকে এতদিনে মিতার মনে ঘর বেঁধেছে।

সেইসব রঙিন দিনগুলো রঙিন ফানুসের মতোই উড়ে চলল। সৌমেন তুমি যা ভাবছো ঠিক তাই। অজয়ের অন্তরঙ্গ ব্যবহার, চোখের ভাষা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অতীত আর বর্তমানকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে অজয় ভবিষ্যতের কত স্বপ্নময় ছবি আঁকল আমার মনে। ভুলে গেলাম আমি পরাশ্রিতা। ভুলে গেলাম আমাকে আত্মনির্ভর হতে হবে।

নিজেকে বিলিয়ে দিলাম অজয়কে।

এমন সময়ে সুজাতাদার সঙ্গে অজয়ের একরকম হঠাৎই বিলেত যাওয়ার ঠিক হল। নিজেকে বোঝালাম নানাভাবে।

ওরা রওনা হল—পরে কিন্তু জেনেছি ওর বিদেশ যাওয়ার ঠিক ছিল অনেক আগেই। প্রথম প্রথম ঘনঘন চিঠি কেবলের বাহুল্য তারপর কিছুদিনের মধ্যেই সুর বদলে গেল। যা ছিল সাহিত্য, চিত্রময় তা পরিণত হল রিপোর্টিংয়ের নীরস রিপোর্টে। কাকীমা, মণিদির অকারণ স্নেহ শুরু হল। চারিদিকের অবহাওয়া দুর্বিসহ হয়ে উঠল। আমি নিরুত্তরে সমস্ত অবস্থা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলাম। রমীশকাকা অনেক সময়েই কি যেন বলতে চাইতেন আমাকে। শেষে তাঁর কাছ থেকেই সব শুনলাম।

এরপর খুব দ্রুত পটপরিবর্তন। এই সময়ের মিতাকে তুমি চেন।

সম্প্রতি খবর পেয়েছি যাওয়া ওদের সার্থক হয়েছে। এ পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্থানে বিশেষ করে সসম্মানে লাকলালাভের কথা তুমি তো শুনেছো। ধারাগিরির ঝরণার ধারে সেদিন এই উপলক্ষ্যেই পিকনিকের ব্যবস্থা ছিল। আমি যাই নি। কেন যাই নি তুমি তা জানো না কিন্তু ধারাগিরির ছায়াময় শালবনের ঘুমায়িত চায়ের পেয়ালাতে প্যাটিস্ খেতে খেতে তুমি বেশ একটা কারণ বার করেছো এবং সেই কারণের সূত্রধরে তোমার গল্পের নায়ককে পাঠিয়েছো নিরালায় সুজাতার কাছে। এরপর হরিণধুপীর সেই রহস্যময় দৃশ্যপট বেশ কিছু অদলবদল করে বসিয়ে দিয়েছো সেখানে। সুজাতার চরিত্র এমন ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছো ওই অংশে—যে কোন শ্রোতা শিউরে উঠবে আর আপন ঘরে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাবে।

হরিণধুপীতেই তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তোমার গল্পেরও শেষ এই খানেই।

বলেছি তো তোমার গল্পের নায়িকা যে আমিই তা খুব সহজে বোঝা যায়। কিন্তু হরিণধুপীতে সেদিন বুকের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়া সুমিতাকে তুমি কি ভুল বুঝেছিলে? না হাত ধরে যাকে নামাতেই চেয়েছিলে—সেই সুমিতা তোমাকে চিনতে পারে নি?

তোমার গল্পটুকে সুজাতা সমীরকে বঞ্চনাই করে এসেছে, শেষের দিকে বুঝি বা প্রতারণাও। সুজাতা নাকি তার কাছে ছিল খেয়ালী, দুর্লভ, দুর্বোধ্য। শুধুমাত্র এই অপরাধে সুজাতাকে এভাবে চিত্রিত করবার কোন দরকার ছিল না।

এতে তুমি নিজে যে সুমিতার কাছে বড়ো ছোট হয়ে গেছ।

এতদিন হরিণধুপীর সেই পাথুরে রাস্তায় কত শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে, অনেকবার চাঁদ উঠেছে আর ডুবেছে, সেই ছোট চিলাটি হয়তো বুনোগাছে ঢেকে গেছে, তবু এখনো বোধহয় তোমার নিজের হাতে কুঁড়িয়ে দেওয়া সুমিতার বিশ্বাস পাথরের বাঁকে বাঁকে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে।

না পাওয়ার ক্ষোভে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে সুমিতাকে সেদিন আঘাত করেছো। ঠিকই কিন্তু সৌম্য—হিসেবে বড়ো ভুল করেছো। শূন্যে আঘাত করলে সে কি বাজে? আমি সেই মহাশূন্য।

অন্তরের বিনিময়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল কাকীমার নিরন্ন অর্থের আনুকূল্যে আর মণিদির উপযুক্ত হয়ে আসবে এই সঙ্কল্পে। আমাকে তো কোনদিন জানতে চেষ্টা করনি তাই এটুকু তোমায় বলা হয়নি।

আমি যীশু নই, সমিতা, সুজাতা—খেলাশেষে যাদের নিয়ে গল্প লিখে তুমি তৃপ্তি আর খ্যাতি পেয়েছো আমি তাদের কেউই নই। তোমার উদ্দেশ্য এবারের মতো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এই কথা মনে করে আমার এত হাসতে ইচ্ছা করছে। রাত শেষ হয়ে এল সৌম্য, চলি।—

গল্পটি পড়া শেষ করে সম্পাদক সৌম্যেন বাসোত্তির মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। দুটি একটি পংক্তি যোগ করে দিতে তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষা হল।

—সুমিতার অজান্তে সেই মহাশূন্যেই আবার নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়েছিল। চোখের জলে ধুয়ে যাওয়া লেখার অস্পষ্ট অংশটুকুই তার সংপ্রাপ্তীত প্রমাণ।

• • • •

জার্মানী ও ফ্রান্স থেকে কয়েকজন সাহিত্যিক দেখা করতে গেছেন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের সঙ্গে।

তাঁকে তাঁর বাড়ীতে না পেয়ে তারা চলে আসছিলেন, হঠাৎ রাস্তায় এক ল্যাম্প পোষ্টে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে তাঁদের ডিকেন্স বলে সন্দেহ হোল।

কাছে গিয়ে তাঁরা দেখেন সত্যিই তিনি ডিকেন্স। তবুও একবার জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা —ক্ষমা করবেন, আপনিই কি চার্লস ডিকেন্স?

তিনি আপন মনে কি ভেবে বললেন—আমার নাম নিকোলাস নিকল্‌বি—

—সে কি!

বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন আগন্তুকেরা।

এবার ডিকেন্স হাসলেন, বললেন—আপনারা আমায় অপরাধ নেবেন না। আমি আমার আগামী উপন্যাসের এক চরিত্রের কথা ভাবছিলাম আর তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমার নামটাও ভুলে গেছি।

◀এই প্রথম▶

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সবত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেনা তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে যেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

সম্পাদক গল্পভারতী

ছেঁড়া তার

বিমান বসু

রবীন আর সুরমা। স্বামী-স্ত্রী। ভালবাসাবাসি করে এদের বিয়ে হয়। কত গল্প, কত গুঞ্জন এদের নিয়ে সিনেমার নায়ক-নায়িকার মত। কত নতুন নতুন প্রেমিক রোমাঞ্চিত হয় এদের প্রাক্ বিবাহ কোর্ট-শিপে। কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে যায়, বিয়ের দু'বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতে-গলিতে অন্যরকম গুঞ্জন কানে আসে, 'এদের বিয়ের বাঁধ ভেঙে গেছে।' কত গলাগলি, কত ভাব, কত প্রেম-প্রণয় নানা কাণ্ড কারখানা সবই কি উবে গেল!

'সবই কি ভেঙে যাবে?'—এ প্রশ্ন সুরমার মনে সবাই একটা কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। চোখে তার ঘুম নেই। অন্তরে নেই শান্তি। ছেলেমেয়ে পড়িয়ে সারাদিন কেটে যায় স্কুলে। নানা চিন্তা মাথায় আসে, কিন্তু কোনটাই তেমনভাবে স্থান বাঁধতে পারে না। সেটাও একপ্রকার শান্তি মনে হয় তার কাছে। কিন্তু বাড়ী এলেই যত রাজ্যের চিন্তা-দুর্ভাবনা, ভয়-আশংকা এসে ভর করে। কখনও বা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে, কখনও বা রবীনের প্রতি ঘৃণা। কিন্তু ঘৃণারই তো সব শেষ হয় না। প্রেম লুকিয়ে থাকে

অবজ্ঞা আর অবহেলার পেছনে—নির্মমতার স্পৃহায় মন বার বার ছুটে যায় রবীনের কাছে। স্থান পায় না, আঘাতে আঘাতে ফিরে আসে। এ কী হল তাদের জীবনে! ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারাই পায় না সুরমা। পৃথিবীটাকে যেন কি বিরাট-ই না মনে হয়—মনে হয় নিষ্ঠুর, কঠিন বর্মে আবৃত এক বিশাল মরুভূমি।

কি কোথায় চললে?—কথাটি বলে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল সুরমা। আজ্ঞা মেয়ে আপি, রবীন যেন অনিচ্ছার সুরে কথাটি ছুঁড়ে দিল। সুরমা আঘাত পায়। বলল, তাড়াতাড়ি এসো। তা, কথা দিতে পারি না—বলেই রবীন দ্রুত বেরিয়ে যায়।

কী যে হয়েছে রবীনের! সুরমা কিছুই বুঝতে পারে না। কথা জিজ্ঞেস করলে কানেই দেয় না। বিষাদে মন ভরে যায়। এমনি করেই আঘাত পেয়েছে সুরমা। প্রেমে বৈকল্য দেখা দিয়েছে ক্রমে ক্রমে। কত ভালবাসত রবীন। কিন্তু আজ যেন ওর সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। না কি সুরমারই দেবার মত কিছু নেই!

বাড়ীতে শুধু শ্বশুর-শাশুড়ী। অন্য কোন প্রাণী নেই। পুত্রবধূর প্রতি একটা সু-নজর আছে তা তাঁদের ব্যবহারে কখনোই মনে হয় না। দাম্পত্য জীবন ব্যতীত অন্য জগতেও সে একা। দুঃখী, স্নেহহীন।

দুঃখী, স্নেহহীন লোকও মাঝে মাঝে কোথাও গিয়ে আশ্রয় পায় এমন কাহিনী আমাদের জানা আছে। সুরমার জীবনেও তেমনি ঘটনা ঘটেছে। প্রবীর নামে ছেলেটি তার কাছে আসে প্রায়ই। ছেলেটি বয়সে সুরমার থেকে বছর দুই ছোট হবে। উদ্দাম যৌবন তার, সুখ চপলতায় ভরপুর সে। পাঠকবর্গ হয়ত মনে করতে পারেন, এ ছেলেটিই বোধহয় রবীন সুরমার প্রাথমিক দাম্পত্য-কলহের নায়ক। কিন্তু আখ্যানটি তেমন নয়। কলহ বহু আগেই শুরু। সুখী জীবন ভোগ করতে করতে চরম নিস্পৃহতা আসে অনেকের মনে! তেমনি এসেছে রবীনেরও। স্ত্রীকে অবজ্ঞা করতে থাকে; অবহেলার চরমে উঠে যায়। মনে করে সবই বুঝি সমান্তরাল রেখায় চলবে। কিন্তু চিন্তা ও বাস্তবের তীরে একই সুর বাঁধা যে কঠিন ব্যাপার।

সুরমার তবু একজন সঙ্গী জোটে। আকাশের ঈশান কোণে মেঘ, তবু তো বিহঙ্গী মুক্ত আকাশে কিছুক্ষণের জন্য পাখা মেলে আনন্দে।

প্রবীরের সঙ্গে সুরমার পরিচয় হঠাৎ। পাড়ার এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবীরের কর্মতৎপরতা, ছেলেমানুষী, আকর্ষণী চারিত্রিক গুণ সুরমাকে আকর্ষণ করে। অনেক কাল পরে যেন সুরমার মনের ওপর দিয়ে একটা ঝড়, ঝিঞ্চ হাওয়া বয়ে যায়। তখন থেকেই সুরমাদের বাড়ী প্রবীরের যাতায়াত। ও যখনই সুরমার কাছে আসে, তখনই সুরমার মনে একটা প্রশান্তি নেমে আসে। আসে ঝড়ের মত, চলে যায় হঠাৎ। উদ্দামতা চরিত্রের একটি সহজাত অংশ তার।

এই যে, বসে বসে কি ভাবছ!—প্রবীর মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে। কি করব একলা একলা—সুরমা যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাটা বলে। কতক্ষণ চুপচাপ। কিন্তু এ জিনিসটা প্রবীরের একেবারেই ধাতে সয় না। সুরমার হাতে একটা বই। প্রবীর সেটাকে সরিয়ে ফেলে বললে, খুব তো, কি চুপচাপ বসে আছ। এস, গল্পকরা যাক্। প্রবীর বইটাকে রেখে দিল পাশের টেবিলে। সুরমা বিক্ষিপ্ত চুলগুলো ঠিক করতে করতে হাই তুলে আলস্যটা দূর করল। প্রবীরের সামনে এসে বসে বলল, নাও, শ্রীমান্, তোমার গল্প আরম্ভ কর। প্রবীরের মুখে দুষ্টুমিতে ভরা হাসি দেখা দিল। বলে ওঠে, তবু গল্প করলেই চলবে। আগে চা খাওয়ান, তেষ্টা পেয়েছে। তারপরে অন্য কথা।

সুরমা চা আনে। সঙ্গে তেল-মুড়ি। প্রবীর বলে, বৌদি এসবের আবার কি দরকার ছিল। খা-হা, শুকামি রাখো। যে চা চাইতে পারে, তার মুড়িতে লজ্জা সুরমা কথাটা বলেই হেসে ফেলল। প্রবীরও হাসিতে যোগ দিল। সরস হাসি—যেন জলে তরঙ্গ দোলায়।

এমনি করেই সুরমার দিন কাটে। রবীন অফিসে যায় ভোরে, ফেরে রাত করে। রাত করার প্রয়োজন হয় না, ইচ্ছাকৃত সেটা, বুঝতে সুরমার কষ্ট হয় না। বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা যেন রবীনকে সবাই ঘিরে রেখেছে। সেখানে থেকে মুক্তি পায় না। বাড়ী ফিরলে সুরমা ক্ষোভের সঙ্গে রবীনকে জিজ্ঞেস করে। আচ্ছা, তুমি তো সারাদিন বাইরে বাইরে থাক, আমি কিভাবে কাটাই বলো তো?

এর থেকে বেশি সময় দেওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এটা কি সময় দেওয়া হ'ল, রাতে ফিরতে হয়, তাই আস।

এটাও কি অনেক নয়?

তুমি নিজেকেই জিজ্ঞেস কর না—সুরমা আহত স্বরে অনুযোগ করল। সুরমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রবীন কি একটা বই নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল।

সুরমা কাছে এসে স্বামীর কাঁধে হাত রাখল। কত অভিযোগ তার। কিন্তু কার কাছে বলে, কে-ই বা শোনে!

আমি কি তোমার সু-নজরে নেই?—সুরমা জিজ্ঞেস করে। রবীন সুরমার হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল ক্রোধের সঙ্গেই। বলল কিন্তু চাপা স্বরে,—এর থেকে বেশি সময় তোমায় আমি দিতে পারব না।

কিন্তু আমি কিভাবে থাকি সারাদিন একা একা। দিন যেন কত দীর্ঘ মনে হয়—দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাথে সুরমার সেগুলো বেরিয়ে আসে।

মনে শান্তি নেই সুরমার, তাই তো সবকিছু অসার, সব কিছু নিরানন্দে মনে হয়। রবীন শুনেছে প্রবীর তার স্ত্রীর কাছে আসে। গল্প করে। ছেলেটিকে রবীনও বেশ পছন্দ করে।

প্রবীর তো আসে, তার সঙ্গে তো সময় কাটে—রবীন বিছানায় শুতে শুতে কথাটা বলল।

স্বামীর কাছে সঙ্গ না পেলে কি স্ত্রী থাকতে পারে—কাছে এসে আহ্লাদের সুরে কথাটা বলতে যায়। কিন্তু উত্তর পায় কঠিন সুরে।

বারবার একই কথা ঘ্যান্ ঘ্যান্ কোরো না, ভাল লাগে না।

তুমি কি অন্য মেয়েকে ভালবাস?

প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে।

কেন, আমি কি দোষ করেছি? কেন আমায় ভাল লাগে না?—

রবীন ওকথার কোন উত্তর দেয় না। সব চুপচাপ। পাশের ঘরও অন্ধকার। সকলের ঘরেই হয়ত শান্তি। সুরমার মনেই শুধু সুখ নেই। দু চোখের পাতা এক হয় না।

এমনিভাবেই প্রতিঘাতে সুরমার মন ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায়, ক্ষোভে-দুঃখে বিরূপ হয়ে সরে যেতে চায়। স্বামীর ঘরের কেউ তাকে দেখতে পারে না—সেও কাউকে সু-নজরে দেখবে না। স্বামীকে তার আর কোন দুঃখের কথা শোনাবে না। বেশি আগ্রহে স্বামীর মন তাহলে গর্বে-অহঙ্কারে আর অহমিকায় ভরে উঠবে নারী এসে পায়ে মাথা কুটবে—এটা দেখে কত আনন্দ হবে তার! দরকার নেই স্বামীর অহমিকার দাবানলকে বৃদ্ধি করে!

প্রবীর সুরমাকে প্রায় নিজের বৌদির মতই মনে করে। তার দুঃখের কাহিনী শোনে সেদিনই প্রথম। বলতে বলতে সুরমার দু'চোখের পাতা ছলছল করে উঠেছিল, দু'এক ফোঁটা যে না পড়েছিল তাও নয়। সুরমার দুঃখে সে আহত হয়ে ওঠে। কি ভাবে বৌদির দুঃখ অবসান করবে, চিন্তা করে অহর্নিশি। প্রবীর ভাবপ্রবণ তাই মনে পাবে সব সহজেই। শিক্ষিত স্বামী স্ত্রীর প্রতি এমনতরো ব্যবহার করতে পারে প্রবীরের জানা ছিল না। ওর মন তথাকথিত শিক্ষিত লোকেদের এই জঘন্যতম আচরণে ছিঃ ছিঃ করে উঠে।

তুমি কিন্তু রোজ এসো—সুরমা যেন যেন আদেশ করে প্রবীরকে।

রোজ কি আসা যায়?

কেন, আসা যাবে না?

আফিস তো আছে?

'আহা চুল বাঁধলে আর দাঁধা যাবে না যেন।'

বিপরীতও হতে ত' পারে—প্রবীর ঠাট্টার সুরে কথাটা বলল।

'হবে না কেন, তোমার দাদাকেই দেখনা। আসলে তোমরা সবাই সমান।—সুরমা কৌস করে আর একদিকে সরে বসল। প্রবীরের মনটা সরল, তাই কোন ব্যাথা-ভরা কথা সহ্য করতে পারে না; বিশেষ করে বৌদির। যার দুঃখ একবার সে জেনেছে, তাকে কি ভাবে ফেলে যায়। সে যদি শুধু একটু আসে, বৌদিদি আনন্দ পায় তাতে, তবে রোজ কিসের? মনে মনে কথাগুলো ভেবে নিল প্রবীর।

আচ্ছা আসব, তবে— প্রবীর কথাটা টেনে ছেড়ে দিল।

তবে কি?

নিজের হাতে চপ বানিয়ে খাওয়াবে? শুধু একটু কাজ! প্রবীর একেবারে ছেলেমানুষ একটু বা পাগলাটে। সুরমার এটাই যেন ভাল লাগে। কাছে এসে তার সাথী হেবরের নাকটি চেপে বলল চপ কেন, মতাও খাওয়াব। তুমি একবার দয়া করে এসো।

প্রবীরের সকলের সংগেই ভাব। ছেলে-মেয়ে সকলেই তাকে পছন্দ করে। প্রবীর একদিন একটি মেয়ের সংগে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। দূর থেকে সুরমা তা দেখতে পায়। মেয়েদের মন, নিজের লোককে বুঝি হারিয়ে ফেলে সবাই তাই আশংকা। সন্ধ্যায় প্রবীর গেছে বৌদির কাছে। বুঝতে পারে অভিমান হয়েছে। মুখভার। জিজ্ঞেস করে প্রবীর. কি হয়েছে, দাঁত ব্যাথা নকি? বলেই মুচ্‌কি হাসতে থাকে।

কাজলামো রেখো না। অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় পাও, এখানে আসতে পারনা?

ও হোঃ তাই, তাই, আচ্ছা আচ্ছা। রোজই আসব। অন্যের সংগে কথা বললেই কি আপন লোক হারিয়ে যায়। সুরমা আশ্বস্ত হয়। বেদনা-ভরা নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে বের হয়ে যায়। কিছুটা বা হাল্কা বোধ করে।

এমনি করেই সুরমার জীবনের আর একটি অধ্যায় শুরু হয়। প্রবীরের মনও যে সুরমার জন্য আনচান না করে তা নয়। সেও নিজেকে বাধোর মধ্যে রাখতে পারে না। সময় পেলেই এক চিন্তা, বৌদি। অনেকদিন গেছে, তারা প্রায় সারাদিনই গল্প করেছে, উত্তরে নিরুত্তর হয়েছে। তারা দু'জনেই শোনে পাড়ার গুজন শুরু হয়েছে তাদের নিয়ে। রসালো গল্প করে মহিলারা। সুরমা কিছুতেই কান দেয় তার যেন সংকা নেই কিছুতেই। প্রবীর শুধু মনে মনে হাসফাস করে।

বহুদিন রবীন স্ত্রীর দিকে মন দেয় না। তারাস্তর সকলেরই আসে। প্রবীরের সংগে সুরমার

অবাধ মেলামেশার খবর কানে আসে। তাঁর মন মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবে, সত্যিই তো সে যেন একযুগ পরে ঘুম থেকে উঠেছে। তার স্ত্রী যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তার কাছে। আসতে চেষ্টা রবীন। কিন্তু সেদিকে মন নেই সুরমার। সে সুরমা নেই, যে একটু ভালবাসার জন্য কিছুদিন আগেও কাঙালের মত স্বামীর কাছে মাথা কুটে ছিল হন্তে হয়ে। সুরমা এখন প্রবীরকে নিয়েই মশগুল। প্রবীরই ধ্যান-ধারণা। স্বামীর প্রতি মন নেই কি করে হবে। তাদা মন জোড়া লাগে কি ভাবে।

প্রবীরের কানে আসে রবীনদার মনে ভয় ঢুকেছে। সুরমার নিঃস্পৃহতা রবীনকে যেন দুঃখী করে তোলে। তাই প্রবীর ভাবে, দাদা বুঝি বৌদিদিকে আবার ফিরল। প্রবীরের মন দো-টানায় দুলে ওঠে। দাদার জন্য সুখী হয় বৌদির সঙ্গ হারিয়ে ফেলবে তাতেও দুঃখী হয়। মনের জ্বালায় ঠিক করে ফেলে বৌদি কাছে আসবে না। প্রবীরের বৌদির কাছে আসার আগে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া ছিল অন্য কারণে কিন্তু নতুন অশান্তি তাকে নিয়েই। প্রবীর ভাবে রবীনদার মনটা তো যা করেই হোক্ ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এদিক দিয়ে কৃতিত্বটা তারই।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও বৌদির কাছ থেকে সরে যাওয়া হয় না। অদম্য ইচ্ছা জোর করে ঠেলে রাখে, তবু যেন পারে না। বৌদি ডেকে পাঠায়। কি করবে ভেবে পায় না। রবীনদার বাড়ীর কেউ-ই ওর যাওয়া-আসা পছন্দ করে না। বৌদি চিরদুঃখী দেখে—যদি সে না আসে তবে না খেয়ে থাকবে। বৌদি কষ্ট পাবে—প্রবীর কোনদিনই সহ্য করতে পারে না। ছুটে যায়। প্রবীর নিজেকে ক্রমশঃ কঠিন করার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে কি?

ভয় পেয়ে পালাতে চাইছ?—সুরমার শ্লেষাত্মক প্রশ্নে প্রবীরের পৌরুষে যেন আঘাত লাগে বলতে যায়, আমি কাপুরুষ নই কিন্তু তা না বলে শুধু না-সূচক শব্দ করে। প্রবীরের মনে হয় সে যেন অজানা-অন্ধকার-ভয়ঙ্কর একঘূর্ণির আবর্তে ডুবে যাচ্ছে! মুক্তি খোঁজে—শান্তি পেতে চায়, দিতেও চায়।

রবীন ঠিক করে এ অনাচার শেষ করতেই হবে। রাত্রিতে সুরমাকে একা পায়। রবীন বসে ছিল। সুরমা বলে, কি বসে রইলে যে, শুয়ে পড়। রাত জাগলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। রবীন কোন কথার উত্তর দেয় না। শুধু তাকে একটু উদ্‌ভ্রান্ত মনে হয়। সুরমা সেটা লক্ষ্য করে—কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর দেয় না।

আমাদের কি ছেড়া তার এক করা যায় না—রবীন কোন প্রকারে টেনে টেনে কথাটা বলে।

না, এক করলেও সুর বের হবে না—দৃঢ়স্বরে সুরমা কথাটি বলে শুয়ে পড়ে।

কেন হবে না? কথাটি বলে রবীন সুরমার গায়ে হাত রেখে আদর করার চেষ্টা করে।

সুরমার বহুদিন আগের একটি রাত মনে পড়ে। সেদিন সেও আদর চাইতে গিয়ে রবীনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

না, আমি পারব না। যেখানে মনের কোন সম্পর্ক নেই, সেখানে দেহের সম্পর্ক রাখতে চাও না। আমি পছন্দ করিনা, আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

তাহলে কি বুঝব, তুমি আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চাও না—রবীন হতাশার সুরে জিজ্ঞেস করে। সুরমা দৃঢ়ভাবে উত্তর দেয় না।

তুমি কি প্রবীরকে ভালবাস?

হাঁ।

সে ?

সুরমা এক মুহূর্ত চিন্তা করে নেয়, তারপরে যেন একটু দ্বিধাহীন ভাবে বলে, সেও আমায় ভালবাসে।

তাঁর ভালবাসা তুমি যেমন ভাবে দেখছ, তেমন তো নাও হতে পারে—রবীন জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল।

ভালবাসা তেমন না হলে, ওর এ বাড়ী আসতে দোষ কি ?—সুরমা প্রশ্ন করে।

রবীন এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না, দিতে পারে না। কিছু করতে ইচ্ছে করে, পারে না। শুধু আক্রোশে চিৎকার করে ওঠে, ওকে এ বাড়ী আসতে নিষেধ করে দাও।

নিষেধ করলেও আমাদের দেখা-শোনা আটকাবে না।

তুমি কি তাকে বিয়ে করবে ?

হ্যাঁ, তাই করব।—দাঁতে দাঁত চেপে সুরমা কথাটা বললে।

কথাগুলো বলতে কি যে বেদনা বোধ হয় তা কে বুঝবে। এই ধরনের জন্যই সুরমা একদিন পাগল হয়েছিল। তা হোক্, যে ইচ্ছে করে এক গভীর প্রেমকে হাতে ধরে ঠেলে ফেলেছে তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক—কি জন্যই বা চোখের জল।

আইনে আটকাবে জানো—রবীন প্রশ্নটা করে তাকে এতে বুঝি একটা পথ পাওয়া যাবে।

তিনবছর আলাদা থাকব, তারপর। আলাদা থাকতে তো কোন দোষ নেই, কেননা তোমার আমার মনের মিল নেই।

রবীন আহত ব্যাঘ্রের মত গর্জে উঠল : কি করবে ঠিক করতে পারে না। কিন্তু সে দুর্বল। স্ত্রীকে মিনতি করে বলে, আমায় ক্ষমা করে দাও। কথাটা বলে যেন রবীন যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়ে ওঠে। সুরমা কঠিন ; বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হয় না। শুধু বলে, যেখানের মনের গড়ন-ভাঙনের খেলা, সেখানে ক্ষমার প্রশ্ন নেই। এমনি করে দু'জনে তর্কবিতর্ক করতে করতে দু'দিকে ঘুমিয়ে পড়ে কিনা ঠিক বোঝা যায় না। দুজনেই চুপচাপ রবীন হয়ত যন্ত্রণায় আহত। তার প্রাণের পাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে গেল। সুরমা যেন অনেক দিনের ব্যাথার ক্ষত মুছতে কোথাও শান্তি পেতে চাইছে।

• • • •

কয়েকদিন প্রবীরের দেখা নেই। সুরমার মন আতঙ্কে শিউরে ওঠে। অস্থিরতার জমাটবাঁধা অন্ধকার যেন সুরমাকে গ্রাস করতে আসছে। অস্থির হয়ে ওঠে। কি করবে ভেবে পায় না। তারপিয়ন হঠাৎ একদিন একটা চিঠি দিয়ে গেল। হাতের লেখায় বুঝল প্রবীরের চিঠি। অসুখ হয়নি তো—খামটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে অজানা আশংকায় গভীর একটা কাঁটা যেন সুরমার মনে বিদ্ধ হতে লাগল। চিঠি খুলে যা দেখল, তাতে সুরমার পায়ের নীচের মাটি সরে যেতে আরম্ভ করল। হাত কেঁপে উঠল—চোখ যেন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। এ কি হ'ল ? প্রবীর চাকরী নিয়ে চলে গেছে দক্ষিণে। টিনের চাল থেকে দু'টো কাক কর্কশ স্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। জীবনের সব সুখাদ, আশা-আকাঙ্খা তরদা সুরমার কাছে বিস্বাদময় হয়ে উঠতে থাকে। চিঠিটাকে দলে-মুচড়ে হাতের মধ্যে নিয়ে নেশা করা লোকের মত হেলতে দুলতে পায়ের জোর বিছানার দিকে আসতে লাগল। সুরমা ভাবে, তাই রাগে অভিমানে চোখের জলের তর্বার গতিকে

রাখতে পারল না। শুধু বিছানায় বালিশে মাথা কুটতে থাকে। বহুদিনের পুঞ্জীকৃত বেদনার কান্না প্রবলবেগে বেরিয়ে এল। কেঁদে কেঁদে শুধু বললে—আমায় তো তুমি বলে যেতে পারতে। এ তুমি কি করলে। শেষে তুমিও কাপুরুষের মত পালিয়ে গেলে! সমস্ত কষ্ট আমায় দিয়ে পালিয়ে গেল—

রবীন দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, আহত হরিণীর কি করুণ পরিণাম। মনে মনে রবীন বড় বেদনা বোধ করল। তার ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিহীনতা স্ত্রীকে কোথায় দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। মন বিষণ্ণতায় ভরে যায়। স্ত্রীর কাছে মুখ দেখাতে আজ সত্যই লজ্জা পাচ্ছে। স্বামী হয়ে সে স্ত্রীর মনকে ধরে রাখতে পারল না। কি লজ্জা! ঠিক করে আর কোনদিনও সে এমনটি করবে না। সুরমাকে ডাকতে যায়, কিন্তু এগোতে পারে না। কে যেন তার পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে! পিছিয়ে আসে। ভাবে, সুরমা দুঃখ পেয়েছে; কাঁদুক, কিছুটা তো নিরসন হবে। রবীনের শংকাও হয় ডাকতে গেলে ওর মনের নাগাল যদি না পায়! এই চিন্তাই তাকে অষ্টোপাশের মত জড়িয়ে ফেলতে চাচ্ছে। আস্তে আস্তে ফিরে যায় সে ঘরের দিকে। শুধু ভাবে, বীণার তীরে তো সুরের ছন্দ কোন মতেই আসে না। আসবে কি?

———

• • • •

হোটেলের কোনের ঘরটায় সামনে এসে এক তরুণী বললেন,—ভিতরে আসতে পারি?

—নিশ্চয়ই—পর্দার ওপাশ থেকে উত্তর এল। তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকেই রাগত স্বরে বললেন—আপনিই কি মিঃ সমারসেট মম্?

—আপনি কি তাঁকেই খুঁজছেন?

—হাঁ। লোকটাকে আমি চাপকে দিতে এসেছি।

—কেন বলুন ত?

—কারণ যা সত্যি নয়, এমন অপবাদ নারীজাতির উপর তিনি যেন কেন?

—আপনি কি নারীজাতির প্রেম সম্বন্ধে বলছেন?

—আজ্ঞে হাঁ। আপনি কি সত্যিকারের নারী দেখেন নি?

—এই মাত্রই দেখছি,—আপনার মত নারীর দেখা পেয়ে সত্যিই আমি ধন্য—আপনার হাতের চাবুক খেতেও আমার আপত্তি নেই।

এক গাল হেসে তরুণী তখন ঘরের পাশে এসে বললেন।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিগত যুগের নট-নাট্যকার

তুলসী লাহিড়ী

বাগবাজারে নিবেদিতা লেনে যখন থাকতেন তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। হাসিখুশী মানুষ। নাট্য-শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ। নাটকের আর অভিনয়ের আলোচনা শুরু হলে থামতে চাইতেন না তুলসী লাহিড়ী। নাটক আর অভিনয় যেন তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে গিছল।

রংপুর জেলার বদরডাঙ্গায় বাংলা ১৩০৩ সালের ২৩শে চৈত্র তুলসী লাহিড়ীর জন্ম। লেখাপড়ায় ভাল ছাত্র ছিলেন। রংপুর জ্ঞানদাপ স্কুলে কিছুদিন পড়বার পর পিতা সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন এবং তিনি সারদাচরণ ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন।

তারপর বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করে রংপুরে চলে যান এবং সেখান থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আবার কলকাতায় এসে রিপন কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন।

আইন পাস করে তিনি প্রথমে রংপুরে তারপর আলীপুর কোর্টে আইনজীবী রূপে জীবন অতিবাহিত করেন।

আইনের কচকচি আর নীরসতা তুলসী লাহিড়ী কোনদিনই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি।

নাটক লেখা, নাটকাভিনয় এবং সঙ্গীত—এই ছিল তাঁর প্রাণ। পিতা ছিলেন তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর কাছেই তুলসী লাহিড়ীর গান শেখার হাতে খড়ি। তারপর তাঁর সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন ওস্তাদ খেলাৎ হোসেন।

সৌখীন অভিনয়ে বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত অনুরাগ। রংপুরে পরপারে নাটকে ভবানীপ্রসাদের ভূমিকায় তাঁর প্রথম রঙ্গাবতরণ এবং সেই অভিনয়ে তিনি প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন।

গান রচনাতেও তাঁর পারদর্শিতা সামান্য ছিল না। ১৯২৯ সালে এইচ. এম. ভি-তে তাঁর দু'খানা গান রেকর্ড হয়। সেয়েছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব।

সুরকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি কলকাতাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁকে আহ্বান করে অনেকগুলি নাটকের সুর সৃষ্টির ভার দেন।

স্টার মঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে তিনি চিরকুমার সভায় চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করে প্রমাণ করেন যে টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি কারুর চেয়ে খাটো নন।

তুলসী লাহিড়ী একাধারে ছিলেন, নাট্যকার, অভিনয়-শিল্পী, গীতিকার, সুরস্রষ্টা ও নাট্য পরিচালক। নাট্যশিল্পের অন্তর্গত এতগুলি গুণের সমন্বয় একটি মানুষের মধ্যে কদাচিৎ দেখা গেছে।

তাঁর রচিত ষোলোটি কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এগারো খানি বাংলা ছবি তিনি পরিচালনা করেন। পঞ্চাশটির অধিক ছবিতে অভিনয়ও করেন।

অশিকের অতিথি তাঁর শেষ ছবি।

তাঁর নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দুঃখীর ইমান, ছেঁড়া তার, বাংলার মাটি, পথিক, তিতি, লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার ও নায়ক।

এই গুণী শিল্পীকে শিশিরকুমার চিনেছিলেন এবং তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। বহু দিন বহু সময় তিনি তুলসী লাহিড়ীকে নিয়ে যাপন করেছেন এবং নানা আলোচনার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে মতামত বিনিময় করেছেন।

শিশিরকুমারের সম্বন্ধে তুলসী লাহিড়ীর একটি মন্তব্য আজো মনে পড়ে। বন্ধুদের একটি ঘরোয়া বৈঠকে নানা আলোচনার মধ্যে শিশিরকুমারের কথা উঠতে তুলসী লাহিড়ী বলেছিলেন, শিশিরবাবু শুধু অভিনেতা নন, তিনি স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা, তিনি কবি এবং দার্শনিক। থিয়েটার জগতে তিনি এক আশ্চর্য মানুষ।

তাঁর শেষ অভিনয় ১৯৫৮ সালের শেষ ভাগে বিশ্বরূপা মঞ্চে তাঁরই নাটক লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসারে। শরীর তখন অসুস্থ, তাহলেও তিনি মঞ্চে অনুপস্থিত থাকতে পারেন নি।

সেই অসুস্থতা থেকে তিনি আর মুক্তি পান নি। ১৯৫৯ সালের ২২শে জুন (৭ই আষাঢ় ১৩৬৬) তুলসী লাহিড়ী পরলোক গমন করেন।

রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সুবিখ্যাত অভিনেতা মতিলাল সুর নাট্যামোদী মাত্রেরই সুপরিচিত। কপালকুণ্ডলার কাপালিক, নীলদর্পণে তোরাপ, বিবাহে মাধব প্রভৃতি কতকগুলি ভূমিকায় এ পর্যন্ত বোধ হয় কেহ তাঁহা অপেক্ষা যশ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তিনি যেরূপ প্রতিভাবান অভিনেতা সেরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু, সুবিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ রঙ্গরহস্য করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে রাগাইতেন।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে বেঙ্গল থিয়েটারে নাটকাভিনয়ে মতিলালবাবু বিভীষণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত নাটকের ড্রেস রিহার্সাল হইয়া যাইবার পর মতিবাবু অমৃতলাল বসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অভিনয় তোমার কি রকম লাগলো ?"

অমৃতবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "অভিনয় চমৎকার করেছো, কিন্তু গ্রাচারাল হয়নি।" মতিবাবু বলিলেন, "কী রকম ? আন্‌গ্রাচারাল হলে কি শিশিরবাবু বলতেন না।" অমৃতবাবু বলিলেন, "কি জানি, বোধ হয় তিনি অতটা খেয়াল করেন নি।" মতিবাবু বলিলেন, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, ভেঙেই

বল না।" অমৃতবাবু আরো গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ, বিভীষণ যে ধার্মিক, শান্ত, শিষ্ট তা সকলেই জানে। কিন্তু জাতিতে তো সে রাক্ষস বটে। তোমার অভিনয়ে সেই জাতীয় ভাবের একেবারে অভাব দেখলুম। যেমন উৎকৃষ্ট অভিনয় করলে, সেই সঙ্গে যদি রাক্ষসের ভাব দেখাতে পারতে, তাহলে অভিনয় খুবই স্বাভাবিক আর সর্বাঙ্গ সুন্দর হোত।" মতিবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছো, দেবতা আর রাক্ষসের অভিনয়ের ভাবভঙ্গী মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত, এটা আমার প্রায়ই মাথায় ঢোকে। যাই হোক, একথা নিয়ে আর পাঁচ কান কোরো না, আমি অভিনয়ের রাত্রিতে একেবারে রাক্ষসের জাতিগত ঠিকঠাক ভাবভঙ্গী দেখিয়ে, দর্শক তো দূরের কথা, গিরিশবাবুকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দেব।" অমৃতবাবুও নির্জনে তাঁহাকে এই ভঙ্গী শিক্ষাদানে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

অনাকীর্ণ রঙ্গালয়ে মেঘনাদ বধ অভিনয় হইতেছে। রামচন্দ্রের শিবিরে আসিয়া চিত্ররথ ইন্দ্রজিত বধার্থে ইন্দ্র-প্রেরিত অস্ত্র দিয়া প্রস্থান করিল। রাম ও লক্ষ্মণ সবিস্ময়ে অস্ত্রাদি দেখিতেছেন। এমন সময়ে বিভীষণ বেশী মতিবাবু এমন এক ভীষণ রাক্ষসের হুঙ্কার ছাড়িলেন যে সম্মুখে রামচন্দ্র বেশী গিরিশবাবু ও লক্ষ্মণ বেশী মহেন্দ্রলাল বসু পর্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পরে—"হের বক্ষঃ রঘুমণি, অগ্নিশিখা সম ধাঁধিছে নয়ন এ ঘোর নিশীথে"—বলিয়া বাঁকিয়া চুরিয়া চক্ষু দুইটি বিকট করিয়া এমনি অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন যে দর্শকদের মধ্যে একটা হাস্য-কোলাহল উঠিবার উপক্রম হইল। গিরিশচন্দ্র মতিবাবুর এই অদ্ভুত অভিনয়-তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া উপস্থিত কেরোসিন নিবারণের নিমিত্ত, যে সময়ে মতিবাবু হুঙ্কার ও অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, তিনি ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে দর্শকগণ দেখিতে না পান, এইরূপ ভাবে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় করিলেন।

সে দৃশ্য অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া গিরিশবাবু মহাক্রুদ্ধ হইয়া মতিবাবুকে বলিলেন, "নেশা করে এসেছো নাকি! কি মাতলামিটে আজ করছিলে? যদি আড়াল করে না থাকতুম, তাহলে তো আজ কেরোসিনের চরম করতে।" মতিবাবু কোনরূপ অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "কি দোষ হয়েছে বলুন? বিভীষণ তো রাক্ষস—রাক্ষসের জাতিগত ভাবভঙ্গী দেখিয়ে অভিনয় সাচারাল করবার চেষ্টা করেছি।"

মতিবাবুর এই নির্ভয় উত্তর এবং নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে এইরূপ আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া গিরিশবাবুর সন্দেহ হইল, ইহার মধ্যে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে, বোধ হয় ভূনিবাবু কি একটা ফাও বাধাইয়াছে। তিনি তখন ভূনিবাবুকে (অমৃতলাল বসুর ডাক নাম) ডাকিলেন। ভূনিবাবু তখন কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন।

মহেন্দ্রবাবু, অমৃত মিত্র প্রভৃতি অন্যান্য অভিনেতাদের হাসিতে দেখিয়া এবং অমৃত বসুর সন্ধান না পাইয়া, তখন মতিবাবু বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে দাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ করিবার জন্য ভূনিবাবুর এই কারসাজি! ক্রোধে তিনি গিরিশবাবুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। গিরিশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি ভূনিবাবুর কথা শুনলে কেন? কই, অমৃতকে (অমৃত মিত্র) তো সে কিছু বলে নি। অমৃত তো রাবণ সেজেছে, সেও তো রাক্ষস,—সে তো কই হুঙ্কারও ছাড়লো না—এঁকেবেঁকে রাক্ষসের জাতিগত ভাবভঙ্গীও দেখালো না।"

তখন মতিবাবু নিজের বোকামি বুঝিতে পারিয়া বিষম লজ্জিত হইলেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত অমৃতবাবুর সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন না। পরে অবশ্য আবার সব ঠিক হইয়া যায়।

নাট্য আলোচনা

মেলোড্রামা (অতি নাটক)

সরোজ দত্ত

'(মেলোড্রামা' সাধারণতঃ ট্রাজিডির অপভ্রংশ হিসাবেই বিবেচিত। কারণ, Melodrama really deals in escape, where at a more serious level, escape is impossible. The essence of tragedy is the inescapability of the issue...' একটি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে, যে ক্ষেত্রে নীতিগত ভাবে 'Escapism' বা 'পলায়ন তৎপরতাই' মেলোড্রামার ধর্ম, সে ক্ষেত্রে কোন নাট্যকারই সজ্ঞানে তাকে অস্বীকার করেন কি না? যদি, "সজ্ঞান পলায়ন তৎপরতাই মেলোড্রামার ধর্ম হয়, তবে সে নাট্যকার প্রবঞ্চক, এবং মেলোড্রামা নাটারূপটি প্রতারণার উপর নির্ভরশীল"—এমন সিদ্ধান্ত অশোভন। স্বীকার করা ভাল, আকাঙ্ক্ষা এবং সামর্থ্যের ব্যবধান চিরকালই দুস্তর। এতে অন্ততঃ নাট্যকারের 'সততা'টুকু কলঙ্কিত হবে না।

মূলতঃ ট্রাজিডি একটি কেন্দ্রীয় সত্যকে অবলম্বন করে; সেই সত্যবন্ধনই তার 'Moral order;' এবং যেহেতু ঐ কেন্দ্রানুসারিতা বিশ্বায়ত সত্যেরই স্ব-জাতি, সেই অর্থেই ট্রাজিডি 'More philosophical, 'More universal'। নিরাসক্ত জীবনদ্রষ্টার দৃষ্টিতে সমস্যা সঙ্কুলতার যবা দিয়ে যে মুহূর্তগুলি অক্ষয় হয়ে ওঠে, নাটকের পরিভাষায় তাকেই বলব 'সিচুয়েশন্'। এবং ঐ 'সিচুয়েশন্'গুলিই ক্রমে অধিষ্ঠ হয়ে পরিণামকে আসন্ন করে তোলে। এই 'সিচুয়েশন্' থেকে নিষ্কৃতিলাভের সুযোগ চরিত্রের নেই, নিষ্কৃতি দেবার অধিকারও নাট্যকারের নেই। এই সিচুয়েশনের মধ্যে নায়কের আভিজাত্য (Magnitude) পারিপার্শ্বিকের সঙ্গতিকে অস্বীকার করে ট্রাজিক হয়ে ওঠে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে নাট্যকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে মৌল সমস্যাটিই অস্বীকৃত হয়—তখনই মেলোড্রামার সৃষ্টি। এই হস্তক্ষেপের সুনিশ্চিত কারণ নাট্যকারের উত্তেজনার ভয়াবহ অপরিমিতি।

যে শিল্পপ্রয়াসের মর্মমূলে এই ভয়াবহতার শর্তহীন প্রাধান্য বিস্তার, তার আঙ্গিকও অনুরূপ অ-সংযমে ক্ষত-লাঞ্ছিত। ঠিক সেই কারণেই চরিত্র উপস্থাপনার প্রাথমিক শর্তকে অস্বীকার করে নাট্যকার বহিরঙ্গ সজ্জায় তৎপর। ফলে মেলোড্রামা উপকরণ-সর্বস্ব হয়ে ওঠে। এর অঙ্গে অঙ্গে তখন অতিরঞ্জনের অমিত বিস্তার। কোন একটি ঘটনাও কোন প্রতীক অর্থ বহন করে না। তদুপরি মেলোড্রামা যদি আবেগপ্রবণ (sensational) হয়, তবে সেই আবেগমত্ততা সত্ত্বেও, এই রূপটি হয়তো ট্রাজিডিকে আভাসিত করে থাকে; কিন্তু মেলোড্রামা 'spectacular' হলে নাট্যকার স্বয়ং অবলম্বনটুকুর জন্যে তৎপর হয়ে ওঠেন। ফলে, সর্বাত্মক আত্মঘাতের পুতির জন্য আলোক সম্পাত আর দৃশ্য সজ্জায় অহেতুক অতিশয়োক্তি ঘটে থাকে। অধিকন্তু, 'Psychological representation' অনুপস্থিত বলেই শেষ পর্যন্ত মেলোড্রামা 'means nothing', এই মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনার অনুপস্থিতিতে রসিকচিত্ত যতই কুণ্ঠিত হোক না কেন, সাধারণ পাঠক-শ্রোতাদর্শকের কাছে এই রূপটি পরম প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে 'আদিমতা' আমাদের জন্মগত সংস্কার। অপরিশীলিত মনে এই আদিম বৃত্তিরই দুর্মর প্রখরতা। এবং মেলোড্রামাতে সেই আদিম চৈতন্য পরিতৃপ্তির বিপুল উপকরণ, তা নগ্নতা অথবা সঙ্গীতই হোক, কিম্বা বীভৎস হত্যা আর রোমহর্ষক ঘটনা সন্নিবেশই হোক। সেই অর্থেই মেলোড্রামার আবেদন অনেকখানিই 'Physical'।

মেলোড্রামার প্রায়ানুরূপ দ্বিতীয় আরেকটি শাখা সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত—ইংরাজীতে যাকে বলে problem play, বাংলায় বলব সমস্যাশ্রয়ী নাটক। এ সমস্যার একটি ব্যাপক সামাজিকরূপ আছে। মেলোড্রামায় যে ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনা অনাবশ্যক গুরুত্ব অর্জন করে সে ক্ষেত্রে এই সমস্যাশ্রিত নাটকে অধিকতর শিল্প নৈপুণ্যের আভাস। উদাহরণস্বরূপ 'প্রফুল্ল' এবং 'নীলদর্পণ' নাটক দুইটির উল্লেখ করা চলে। 'নীলদর্পণ' নাটকে যখন কোন সামগ্রিক ফলশ্রুতি নেই, সেখানে 'প্রফুল্ল' নাটক 'সাজানো বাগান শুকিয়ে' যাবার মধ্যে অন্ততঃ একটি সমাজ চিন্তাধারা প্রকাশ হতে পেরেছে। ঈশ্বরগুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেকেরই চেতনায় একটি ব্যাপক আশঙ্কার পদধ্বনি। সে আশঙ্কা সামাজিক সংহতি বিনষ্টির আশঙ্কা, এবং প্রত্যেকেরই প্রবণতা সেই প্রাচীনেরই অনুবর্তনে। একমাত্র উত্তরপর্বে রবীন্দ্রনাথই এ 'ঘোর' কাটিয়েছিলেন। সেই একই সূত্রে গিরিশচন্দ্রও সমাজ ধ্বংসে আত্মনাশের কল্পনাতেই বিবশ। ট্রাজিডি, সমস্যাশ্রয়ী নাটক এবং, মেলোড্রামা—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সিচুয়েশন্‌ই উপজীব্য। প্রথমক্ষেত্রে সিচুয়েশনে চরিত্রকে স্থাপন করেই নাট্যকার নীরব, ঘটনাপ্রবাহ এবং চরিত্র পরস্পরকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলবে, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে নাট্যকার অধিক সক্রিয় ঘটনাকে তিনিই স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসুক আর তৃতীয় ক্ষেত্রে 'সিচুয়েশন্'-এর কাছেই নাট্যকারের আত্মসমর্পণ।

আমাদের সিদ্ধান্ত, মেলোড্রামাকে উন্নত শিল্পকীর্তি হিসাবে স্বীকার করা যায় না, বরং বলব: মেলোড্রামা ট্রাজিডির অসবর্ণ এবং, অসমর্থ আত্মীয়—রীতিতে অতিচারী, নীতিতে হীন। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে মেলোড্রামা এখনও কৌলীন্যে অনধিকারী।

নাট্য-প্রবাহ

ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস :

মঞ্চের ওপর নাট্য-শিল্পীরা যেমন অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁদের জীবনের কার্যকলাপকে উদ্ঘাটন করেন, সার্কাসের উন্মুক্ত মঞ্চে সেখানকার শিল্পীরাও তেমনি নানাভাবে জীবনেরই প্রাণস্পন্দন বিচিত্র নাটকীয় দুঃসাহসিক এবং চাতুর্যপূর্ণ কাজের ভিতর দিয়ে রূপায়িত করেন। সার্কাস এক বিরাট জীবন-নাট্যশালা। এর পাত্রপাত্রীরা কথা বলে না, কেবলমাত্র অ্যাকশনের ভিতর দিয়েই জীবনের নানা দ্বন্দ্ব, নানা লীলা, নানা কর্মপ্রগতির পরিচয় দিয়ে দর্শকদের উচ্ছকিত বিমুগ্ধ করে।

সম্প্রতি টালা পার্কে ইন্টারন্যাশনাল সার্কাসের অভিনয় দেখে এই সত্যটি অনুভব করা গেল, মঞ্চ নাটকেও যেমন প্রতিদৃশ্যে আছে নাটকীয় উপাদান, সার্কাস-নাট্যেও তেমনি আছে, প্রতি অধ্যায়ে প্রতি খেলায় জীবন নাটকেরই প্রকাশ। উপস্থাপন সৌকর্যে ইন্টারন্যাশনাল সার্কাসের সমগ্র অনুষ্ঠানটি যেমন

সুখতোষ তেমনি নয়নাভিরাম ও চিত্তস্পর্শী। এই সার্কাসের প্রত্যেকটি নাট্যাংশের অভিনয়ে শিল্পীরা যে বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা দেখে দর্শকবৃন্দ শুধু চমৎকৃত হন নি, এক নতুনতর অনুভূতির আবেশে স্পন্দিত হয়েছেন। এই সার্কাস নাটো শিশুশিল্পীরাও আশ্চর্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছে। আর শুধু কি মানুষ! বহু রকমের জন্তু জানোয়ারও এর মধ্যে অংশ গ্রহণ করে সমগ্র অনুষ্ঠানকে এক প্রাণময় বিচিত্রতর দান করেছে।

ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস একটি আন্তর্জাতিক সার্কাস। এর শিল্পীদের মধ্যে আছেন, ইউরোপ, আমেরিকা, ইতালী, চীন, ফিলিপাইনস, মালয়, মহারাষ্ট্র, নেপাল, প্রভৃতি বহু দেশের দক্ষ ক্রীড়াকুশলী আর আছে বাংলার বয়েল বেঙ্গল, আসামের চিতা, মিশরের উট, সাঁওতাল পাহাড়ের হাতী, হিমালয়ের ভালুক, সিংগাপুরের তোতাপাখী, জার্মানী ও জাপানের কুকুর এবং আফ্রিকার সিংহ।

যেমন অগণিত স্ত্রী ও পুরুষ শিল্পীর ও কলাকুশলীর সমাবেশ তেমনি বিরাট এই সার্কাসের পশু সংগ্রহ শালা। সব মিলিয়ে এ এক বিপুল বিশাল আয়োজন। যেমন অভিনব তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। একজন বাঙালীর একক চেষ্টায় সামান্য আরম্ভ থেকে এই সার্কাস আজ এক বৃহৎ গৌরবদীপ্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা বর্ষীয়ান কর্মবীর শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালীর সার্কাসের পুনরুজ্জীবন করে যে জীবনব্যাপী সাধনার পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালীর কাছে তা চিরকাল কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কৃতী বঙ্গসন্তান রূপে আমরা যাঁদের গণ্য করি সুবোধচন্দ্র নিঃসংশয়ে তাঁদের মধ্যে পরিগণিত হবেন। তিনি বাঙালী, বাংলাদেশ তথা সারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন ইন্টারন্যাশনাল সার্কাসের মাধ্যমে। এই সার্কাস বাঙালীর এক মহৎ কীর্তি, তাতে সন্দেহ নেই।

যাযাবর। কয়েকদিন আগে এঁরা অভিনয় করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্যের বিশ বছর আগে। পরিচালনায় ও মুখ্য ভূমিকায় সুনীত কুমার দাস কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন, অরুণ সেনগুপ্ত, মুকুল রায়, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, বাসুদেব দাস, প্রতিমা দাশগুপ্ত, শিপ্রা সাহা, কল্পনা মুখোপাধ্যায় ও চিত্রিতা মণ্ডল।

স্টুয়ার্ট লরেন্সস। এই অফিসের স্টাফ ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে তাঁদের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে বিমল মিত্রের সাহেববিবি গোলামের নাট্যরূপ প্রশংসনীয় দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেন। ভূতনাথের ভূমিকায় প্রশান্ত বিষ্ণু, পটেশ্বরীর ভূমিকায় দীপিকা দাস, ভৈরবের ভূমিকায় মৃণাল চক্রবর্তী, বংশীর ভূমিকায় শক্তি ঘোষাল ও মনীলালের ভূমিকায় কল্যাণ নিয়োগী দর্শকদের কাছ থেকে সর্বাধিক সুখ্যাতি অর্জন করেন।

টেগোর সোসাইটি (জামশেদপুর)। জামশেদপুরের উক্ত সংস্থা তাঁদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মহা সমারোহে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শ্যামা মঞ্চস্থ করেন স্থানীয় বেঙ্গল ক্লাবের রবীন্দ্রসদনে। সংস্থার সভ্য সভ্যারা ছাড়া দু'জন অতিথি শিল্পী এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন, নরেশ কুমার ও শক্তি নাগ। ভূমিকায় মনিদীপা সেনগুপ্তা (শ্যামা), নরেশ কুমার (বজ্র সেন), শ্যামলী মুখোপাধ্যায় (উত্তীয়), শক্তি নাগ (কোটাল), তাছাড়া ছিলেন, ইন্দ্র মহান্তি, বাসবী মিত্র, লীনা দত্ত, শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসবী সেন চৌধুরী, মধু শাস্ত্রী, প্রভা দাশগুপ্ত, সুমিতা কানুনগো, অনুরাধা পালিত, নীলিমা প্রসাদ, মনিদীপা ঘোষ, ও তপতী মিত্র। নৃত্যপরিচালনায় ছিলেন নরেশ কুমার।

নাট্যদর্শন : ইতিহাসের পুনরাবিষ্কার : বিশ্বরূপায় বেগম মেরী বিশ্বাস : একটি বিশিষ্ট নাট্য প্রযোজনা।

১৭৫৭ সালের বাংলাদেশ, সেই দেশের নবাব সিরাজদ্দৌল্লা এবং সেই সময়কার ইতিহাসের বিপক্ষ বিস্তারী পটভূমিকায় বিমল মিত্র রচনা করেছেন এক অনন্যতন্ত্র বিপুলায়তন উপন্যাস : বেগম মেরী বিশ্বাস। সিরাজের ট্র্যাজেডি এই উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য উপাদান হলেও, এর মধ্যে ঔপন্যাসিক পুনরাবিষ্কার করেছেন ওয়াট ক্লাইভকে, বাংলার মাটির এক পান-পাগল জীবনধার্মিককে, আর সেই সঙ্গে এক আশ্চর্য বাঙালীর মেয়েকে। বাংলার গ্রামের মানুষ সোভারাম বিশ্বাসের মেয়ে ফয়জী কেমন করে বেগম মেরী বিশ্বাসে পরিণত হল, কেমন করে তার অদ্ভুত কর্মকুশলতার মাধ্যমে সে নিজের অসাধারণত্বকে চিহ্নিত করল, তারপর কেমন করে জীবনের সবচেয়ে বড় অনুভূতির স্পর্শনে সে নিজের জীবনকে পূর্ণাহুতি দিল—বেগম মেরী বিশ্বাস সেই নারীর চরিত্রের এক বিস্ময়কর উন্মোচন।

এই বিরাট, বহু ঘটনা ও চরিত্র সম্বলিত ঐতিহাসিক কাহিনীকে নিয়ে যে কোনদিন নাটক রচিত হতে পারে তা ভাবা যায় নি। তাই বলতে দ্বিধা নেই, অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন এর নাট্যরূপদাতা শ্রীদাস বিহারী সরকার। একটি বিটোল অনিন্দ্যসুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে এই নাটক নাট্যরূপদাতার অসামান্য মুনসিয়ানায়।

ঐতিহাসিক নাটকের প্রযোজনায় তার দৃশ্য, পোষাক, রঙ্গোপকরণ, সঙ্গীত এবং মঞ্চকৌশল—সবই বহু অর্থব্যয়ের ব্যাপার। এবং এই ব্যাপারে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ যে কর্মকুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা দেখে দর্শকবৃন্দ রীতিমত অবাক হয়েছেন। সর্বাংশে সার্থক হয়েছে এই নাট্যপ্রযোজনা। দৃশ্যসজ্জা, আলোক-সম্পাত আবহ সঙ্গীত, অভিনয় এবং গান—সব মিলিয়ে এই নাটকে যে মায়ালোকের সৃষ্টি হয়েছে বহু রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে, শিশির কুমার প্রযোজিত বিধিলিপী নাটকের অভিনয় ছাড়া, তেমনতর দৃষ্টান্ত চল্লিশ বছরের মধ্যে আর চোখে পড়ে নি। ঐতিহাসিক নাটকের পরিচালনায় যে সব বিশেষ সর্ত এবং দাবী আছে, এই নাটকের পরিচালক সে সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ সচেতন তার প্রমাণ তিনি নিঃসংশয়রূপে দিয়েছেন এর প্রতিটি নাট্য মুহূর্তে, নাট্য সংঘাতে, পাত্র-পাত্রীর ক্রীয়াকলাপে, যার মধ্যে দৃষ্ট এবং মননশীল পরিচালনকর্মের ছাপ সর্বত্র সুপরিস্ফুট।

এই ধরণের বহুবাবিস্তৃত দুর্বার গতিবেগসম্পন্ন নাটকের অভিনয়ে দলগত সংহতিই শেষ কথা এবং সেদিক থেকে এর অভিনেতৃবর্গ এবং কলাকুশলীরা সকলে মিলে এই নাটকে এমন একটি অখণ্ডরূপ দিয়েছেন যা যেমন শ্রবণাভিরাম তেমনি নয়নলোভন। গান এই নাটকের এক বিশেষ সম্পদ। সবিতাব্রত দত্তের উদাত্তকণ্ঠে গাওয়া গানগুলি শ্রোতাদের সম্মোহিত করেছে বলা চলে। সিরাজরূপে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্লাইভের নতুনতর চরিত্র চিত্রণে শেখর চট্টোপাধ্যায় দর্শকচিত্তে রীতিমতো আলোড়ন তুলেছেন। নাম ভূমিকায় ফয়জী সেন তাঁর আবেগপুত অভিনয়ে এবং অভিব্যক্তিতে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। লীলাবতীর ভূমিকায় একটি সার্থক সৃষ্টি, যেমন স্বাভাবিক তেমনি স্বাচ্ছন্দ। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা দর্শকদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা হলেন, তরুণকুমার, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, মহু মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, নিমু চৌধিক, কনিকা বসুদার, বেলা দেবী, সংগীতা কর এবং গীতা নাগ।

সংগীতে অনিল বাগচী, মঞ্চ সজ্জায় সুরেশ দত্ত এবং আলোক সম্পাতে তাপস সেন তাঁদের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন এই নাটকে।

ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ে এবং প্রযোজনায় বিশ্বরূপার বেগম মেরী বিশ্বাস বাংলা মঞ্চের একটি দিকচিহ্ন রূপে পরিগণিত হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

জ্যোতির্ময়

ক্রিকেটের মরণ মহোৎসব।

কলকাতায় ক্রিকেট উপলক্ষে যে মৃত্যু-মহোৎসব হোয়ে গেল তার বিশদ বিবরণ সবাই জেনেছেন।

এ রকম মর্মান্তিক ঘটনা পৃথিবীর আর কোন খেলার মাঠে কখনো ঘটেছে কিনা জানি না।

মানুষের পায়ের তলায় পিষ্ট হোয়ে কয়েকটি অমূল্য তরুণ প্রাণ নষ্ট হয়ে গেল—এই ঘটনার ভয়াবহতা আর কারুণ্য আমাদের দেশের লোক সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা জানিনা, তবে, ক্রিকেটের প্রেমে যারা প্রাণ দিল তাদের আমরা যেন না ভুলে যাই। তাদের স্মরণে একটি স্মারক স্তম্ভ রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

৬১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সকালে ইডেনের সামনে যেখানে নিষ্করুণ ভাগ্যদেবতা এক অভাবনীয় মর্মন্তুদ নাট্যলীলার অবতারণা করলেন, সেখানে একটি স্মারক স্তম্ভ রচিত হোক, সেই স্তম্ভের গায়ে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণের সঙ্গে তাদের নামগুলি উৎকীর্ণ থাকুক, তাহলে আগামী দিনে ইডেনে ক্রিকেট ম্যাচে আবার যখন লাইন পড়বে, অথবা ইডেনের সেইদিক দিয়ে যেসব পথিক আনাগোনা করবে তারা মুহূর্তের তরে স্তব্ধ হয়ে স্মরণ করতে পারবে সেই সম্ভাবনাপূর্ণ যৌবনোজ্জ্বল প্রাণগুলিকে যারা ক্রিকেটকে ভালবেসে ক্রিকেট মাঠের সংলগ্ন মাটিতে মানুষের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে!

ক্রিকেটের বিশ্ব রেকর্ড

এই সূত্রে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক রেকর্ড লিপিবদ্ধ হল।

টেস্ট খেলায় সবচেয়ে বেশী সেঞ্চুরী করেছেন ডন ব্র্যাডম্যান, সর্ব সমেত ২৯টি। ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯, ৪: আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৪, ভারতের বিপক্ষে ৪, ওঃ ইনডিজের বিপক্ষে ২।

একটি সিরিজে সর্বাধিক তিনশ ও ট্রিপল সেঞ্চুরির রেকর্ডও ব্র্যাডম্যানের। তিনশ সেঞ্চুরি ৩। ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সালে, ২৩৪ (হেডস), ৩০৪ (লীডস), ও ৩৩২ (ওভ্যাল)। ট্রিপল সেঞ্চুরি ২টি। ৩০৪ (লীডস) ১৯৩০। ৩০৪ (লীডস), ১৯৩৪। দু'বারই ইংলণ্ডের বিপক্ষে।

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের রেকর্ডও করেছেন ডন ব্র্যাডম্যান। ৯৭৪ রান, ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে। খেলা ৫, ইনিংস ৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩০৪, সেঞ্চুরি ৪, গড় ১৩৯·১৪।

একদিনের খেলায় সবচেয়ে বেশী রান করবার কৃতিত্ব ডন ব্র্যাডম্যানের, ১৯৩০ সালের ১২ই জুলাই ইংলণ্ডের বিপক্ষে লীডস মাঠে তিনি একদিনেই ৩০৯ রান করেন।

টেস্ট খেলায় সাকের আগেই সেঞ্চুরি করেছেন তিনজন অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়, ভিক্টর ট্রাম্পার, ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯০৯ সালে। চার্লস ম্যাকার্টনি ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯২৬ সালে এবং ডন ব্র্যাডম্যান ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সালে।

একটি খেলায় উভয় ইনিংস-এই হাট্রিক করবার গৌরব মাত্র একজনেরই। ইংলণ্ডের টি কে ম্যাথুস। ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেষ্টার মাঠে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ভারতের টেস্ট রেকর্ড।

ভারতের দুটি বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে। প্রথম উইকেট জুটিতে ৩১৩ রান। নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৪৪-৪৬ সালে মাঞ্জরেকর ও পঙ্কজ রায় এই রেকর্ড করেন। দু'জনেই শতাধিক রান করেছিলেন।

একটি টেস্ট সিরিজে প্রত্যেক ম্যাচেই কোন না কোন ইনিংসে ৪০০ বা তার চেয়ে বেশি রান করবার রেকর্ডও ভারতবর্ষের তরফে আছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারত এই রেকর্ড করে। একটি ছাড়া অন্য চারটি টেস্টেই ভারত মাত্র এক ইনিংস ব্যাট করে। নীচে সেই সিরিজের ভারতের রান দেওয়া হল :

১ম টেস্ট : ৪৯৮ (৪ উইকেট ডিক্লেয়ার)

২য় " : ৪২১ (৮ " ")

৩য় " : ৪৩১ (৮ " ")

৪র্থ " : ১৩২ ও ৪০৮ (৭ " ")

৫ম " : ৪৩১ (৩ " ")

• • • •

ইংলণ্ডের ক্রিকেটের জনক তবলু. জি. গ্রেস ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। কঠিন নিয়মানুবর্তিতা আর খেলোয়াড়ী মনোভাবের নিয়ামক ছিলেন তিনি। কিন্তু একবার একটি খেলায় বড় বিচিত্র খেয়ালের পরিচয় দেন। একটি কাউনটি খেলায় বহু দর্শক এসেছে তাঁর খেলা দেখতে। কিন্তু কোন রান করবার আগেই আম্পায়ার ডাকে এল. বি. তবলু আউট দিলেন। তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, না, আমি আউট হইনি। আম্পায়ার আর কী করেন, কোন কথা বলতে সাহস করলেন না। গ্রেস খেলতে লাগলেন এবং সেঞ্চুরি করলেন। খেলার পর আম্পায়ারকে বললেন, তোমার সিদ্ধান্ত হয়ত নিভুল কিন্তু এত দর্শককে নিরাশ করা কি আমাদের উচিৎ হোত ?

আমরা মেয়েরা

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

"ডাইভিং" (জলে ঝাঁপ দেওয়া) জিনিসটাকে খুব রপ্ত করে নিয়েছেন ইংলণ্ডের মূনা এবং এথেলিকা হিলবার্ট দুজনেই। মেয়ে-মহলে, বিশেষ কোরে জার্মানীতে, এরা দুজনেই সুপরিচিত। শ্রীমতী মূন 'হাই ডাইভিং'-এ জার্মান চ্যাম্পিয়ান। এই ক্রীড়াটি এঁর জীবনের অন্যতম প্রধান নেশা। ডাইভিংএর অনুশীলনে এঁর কখনো ক্লান্তি বা ক্লান্তি নেই। ম্যানহাইম অঞ্চলের অধিবাসীনী এই মহিলা এই সেদিনও ২৯১·৪৪ পয়েন্ট পেয়ে জয়লাভ কোরেছেন—তাঁর দ্বাবিংশতম (২২নং) চ্যাম্পিয়ানশিপে।

হিলবার্ট হোচ্ছেন গৃহিণী, জননী ও ক্রীড়াজনা। টোকিও অলিম্পিকে অষ্টম স্থান দখল কোরেছিলেন। এঁর শিশুকন্যাটির বয়স দু'বছর। ডাইভিং এঁর ভীষণ প্রিয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দেও জার্মান চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন। ক্যাম্পি-ডাইভিংএ ইনিও সম্প্রতি ৪০৯·৪৭ পয়েন্ট পেয়ে ইংলণ্ডকে হারিয়ে জয়ী হোয়েছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে দুজনেই দুজনকে হারাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু জলের বাইরে, অর্থাৎ ডাঙ্গায়, দুজনে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। এথেলিকা যখন ডাইভিং কোরতে গেছেন, সেই সময়ে ইংলণ্ডের দেখাশোনা কোরছেন এথেলিকার শিশুকন্যাকে—এমনটা হামেশাই দেখা যাবে।

• • • •

বিলিতি গিন্নিরা কিন্তু রেগে গেলে দুর্বার হোতে পারেন। এবং মারমুখীও।

মাঠে ফুটবল খেলা হোচ্ছিল। তারই একটি দলের অন্যতম প্রবল সমর্থক ছিলেন মিসেস মীনা ওয়েস্ট। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন দুই সন্তানকে। খেলা শেষ হোল কিন্তু কোন মীমাংসা হোল না। ফলাফলটা তিরিশ বছর বয়স্কা শ্রীমতী ওয়েস্টের মনঃপূত হোল না। নিজের পছন্দের দলটির তিনি জয় চান। অতএব রেগে গিয়ে সব দোষ চাপালেন বেচারি রেফারী টম্ রেনল্ড্স্ সাহেবের ওপর। রেফারি নাকি তাঁর (ওয়েস্ট) প্রিয় দলটির প্রতি সুবিচার করেন নি।

ব্যস, রইল পড়ে বাচ্চারা পিছনে, শ্রীমতী বীরাঙ্গনারূপে অভিযান কোরলেন মাঠে। টম সাহেবকে পাকড়াও কোরে আরম্ভ কোরে দিলেন প্রহার। সে যেন এক যজ্ঞ বসে গেল। রেফারি ঠিক যেন ঠাহর করতে পারলেন না, কী ব্যাপারটা ঘটে গেল তাঁর ওপর দিয়ে। ছাব্বিশ হাজার দর্শক বেশ সোৎসাহে দেখতে লাগল এই নতুন খেলা। শেষে পাঁচজন ভোজপুরী মাপের পুলিশ কর্মচারী কোনমতে মীনা দেবীকে সরিয়ে নিয়ে আসে সেখান থেকে। টম রেনল্ড্স্ তৎক্ষণ মাটিতে চিৎপাত।

• • • •

মিসেস এলিসে রিচার্ডসন তিন ছেলেমেয়ের মা, বয়স তেত্রিশ। অনুতাপে প্রাণটাই বিসর্জন দিয়ে দিলেন। ঘটনা অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত আলবেনি সহরের।

পারিবারিক মা হাস্পত্য কলহ, যা-ই বলুন, ঘটেছিল তাই। বচসা হোতে শ্রীমতী গরম 'গ্রীজ' ছুঁড়ে মারলেন শ্রীযুক্ত রিচার্ডসনের দু'চোখে। সঙ্গে সঙ্গেই চোখে জ্বালা আর যন্ত্রণা তারপরে ডাক্তার-বদ্যি। জানা গেল, শ্রীযুক্তের স্থায়ী অন্ধত্ব সুনিশ্চিত।

তখন শ্রীমতী মনে মনে হায়-হায় কোরে উঠলেন। যাগের মাথায় এ কী করলেন তিনি। অনুতাপ, অনুশোচনা। ধোবী করলেন নিজেকে—শাস্তিবিধানও কোরলেন। নিজের দেহে ছাড়াকাপড়ে আর বিছানায় প্যাপোলিন মাখালেন বেশ কোরে। তারপর নিলেন অন্তিমের শয্যা। অন্ধ স্বামীকে চোখের সামনে দেখতে থাকার কষ্ট এড়ালেন ইহলোক ত্যাগ কোরে।

• • • •

কিশোরী, কি বড়জোর তরুণী। একটা স্কুটার-রিক্‌শ-য় কোরে এসে হাজির হোল নয়াদিল্লীর একটি পেট্রোল বিক্রির দোকানে। ওখানে গাড়ির তেল নিতে এসেছিলেন এক গাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। তাঁর কাছে গিয়ে মেয়েটি বোললে—অমুক জায়গায় আমার একুণি পৌছন দরকার, খুব দরকার কিনা তাই তাড়াহুড়া; আপনি আমায় একটু 'লিফ্‌ট্' দেবেন? একে মেয়ে তায় কাঁচা বয়স (কাঁচা যৌবনও, নয় কি?)—পুরুষমানুষের সাধ্য কি, অস্বীকার করে? বিশেষ কোরে যখন গাড়ির মালিক। সামনে ড্রাইভার সিটের পাশে মালিক ভদ্রলোক নিজের পাশে উঠিয়ে নিলেন তরুণীকে।

তার পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত ও করুণ।

মেয়েটি নির্দিষ্ট জায়গায় নেবে যাবার পর মোটর মালিক আবিষ্কার কোরলেন—তাঁর পকেট থেকে চারহাজার টাকা অন্তর্ধান হোয়েছে।

• • • •

অক্সফোর্ডশায়ারের (গ্রেট বৃটেন) যে আণবিক গবেষণাকেন্দ্র আছে, সেখানকার বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার কোরেছেন—নারীজাতির কেশদামে কেবল আলঙ্কারিক অর্থে পুঞ্জ মেঘ বা অশনিই নেই, বাস্তব অর্থে রয়েছে—সোনা।

হ্যাঁ, যে সোনা দিয়ে গয়না তৈরি হয়। কেমিকেল সোনা নয়, সত্যিকারের স্বর্ণমুদ্রার সোনা।

গবেষণা ও বিশ্লেষণ কোরে তাঁরা বের কোরেছেন যে, এই সোনার পরিমাণ অতি অল্প, প্রায় নগণ্য। চুলের পাহাড় একটা বানাতে পারলে তবে দর্শনযোগ্য কিছু সোনা মিলতে পারে। পরীক্ষাও গবেষণার জন্যে তাঁরা সারা পৃথিবী থেকে ৮০০ রকম কেশদামের নমুনা যোগাড় কোরেছিলেন, তার মধ্যে নর ও নারী উভয়ই আছে। দেখা গেছে, পুরুষের চুলের চাইতে মেয়েদের চুলে সোনার আনুপাতিক পরিমাণ বেশি।

• • • •

এবারকার বিশ্ব-সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর সম্মান পেয়েছেন গ্রেট বৃটেনের বাইশ বছরের মেয়ে (কুমারী) ভ্যালেরী ভ্যান হোয়্‌স্। টোকিও শহরে একটি আন্তর্জাতিক বিচারসভায় মোট সাতচল্লিশ জন প্রতিযোগিনীর মধ্যে ভ্যালেরীই সেরা খেতাবটি পেলেন। গতবছরে পেয়েছিলেন এই খেতাব—ব্রেজিলের মেয়ে মেরিয়া-ডা-গ্লোরিয়া।

গ্লোরিয়ার ওপরেই এবারে ভার পড়েছিল উত্তরাধিকারিণীকে সোনার মুকুট পরানর। তিনি এর পরে পুরস্কার দিলেন, তাঁরা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানাধিকারিণীরা। নাম যথাক্রমে—(সর্ব-কুমারী) লাট্টি অন্ট্রিং (বয়স ২২, ফিন্‌ল্যাণ্ড), মেরিয়া বকাও (১৯, নিকারগুয়া), জ্যানেট বিডিগায় (২০, সুইজারল্যাণ্ড) এবং উসানি কেনফিয়ল (২০, থাইল্যাণ্ড)।

• • • •

আফ্রিকার কেনিয়া রাজ্যে এবার প্রথম একজন মহিলা পার্লামেন্ট-সদস্যা দেখা যাচ্ছে।

মিসেস গ্রেস ওনিয়াঙ্গো একসময়ে মেয়রের পদ অলঙ্কৃত কোরেছিলেন। এবারে তিনি পার্লামেন্টের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সংখ্যায় ছ'জন। কিসুমু শহর কেন্দ্রে মোট ভোট পড়েছিল ৮,৮১২—তার মধ্যে শ্রীমতী গ্রেস একাই পেলেন ৫,৩১০টি ভোট। জয় তাঁরই হোল। গ্রেস পার্লামেন্টের সদস্যা নির্বাচিত হোলেন। এর আগে কেনিয়া পার্লামেন্টে কোন মহিলাকে দেখা যায়নি।

• • • •

আইল অফ হোয়াইট থেকে খবরটা আসা গেছে। ওখানকার রাইড শহরে একটা লোকসঙ্গীতের আসর বসবার ব্যবস্থা হোয়েছিল, সেই আসরের মধ্যমণি ও প্রধান আকর্ষণ ছিলেন যিনি তাঁর নাম বব্ ডাইলান। ঘটনাচক্রে কিন্তু প্রধান আকর্ষণ হোয়ে দাঁড়াল ববের বদলে একটি মেয়ে।

বব্ ডাইলান লোকসঙ্গীতের একজন ওস্তাদ বোলে সাধারণ্যে পরিচিত। এখন তাঁর বয়স উনত্রিশ। গত তিন বছর ধরে তিনি প্রায় অবসরজীবন যাপন কোরছিলেন। রাইড শহরের আসরটাই ছিল তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত (লোকসমক্ষে) পুনরাবির্ভাবের ক্ষেত্র। অনেকেই মনে কোরছিলেন যে, এটাই হবে ইউরোপের সর্ববৃহৎ 'পপ্'-সঙ্গীত উৎসব। আইল অফ হোয়াইট দ্বীপটিতে বাহিরের লোকেরা সাধারণত ছুটি কাটাতেই যায়—বব্ ডাইলানের সুরলহর শোনাবার জন্যে সেখানে হাজার হাজার লোক গিয়ে জড়ো হোল।

আসর সুরু হবে, লাখখানেক শ্রোতা ইতিমধ্যেই হাজির, আরো আসছে, বব্ তখনও এসেনমি আসরে। দর্শকদের মধ্যে থেকে আসরের মাঝখানে হঠাৎ লাফিয়ে পড়ল এক তরুণী। বয়স ষোলো থেকে উনিশের মধ্যে, সারা দেহের কোনখানে কোন আবরণ নেই, বাহুতে আর নাকে লাল রং। নেবেই সে লাফিয়ে দিলে নাচ। পুরো দশ মিনিট ধরে সে নাচল। আর সেই নৃত্যপর নগ্ন শরীরের নানা ভঙ্গির ছবি টপাটপ তুলে নিতে লাগলেন প্রেস ফটোগ্রাফাররা—ছবি তোলার জন্যে তৈরিই তো ছিলেন তাঁরা।

ব্যাপারটা আকস্মিক, কেউই তৈরি ছিলনা এজন্য। আসরে শান্তিরক্ষী প্রহরী যারা ছিল যখন সক্রিয় হোল তৎক্ষণে দশ মিনিট কেটে গেছে। প্রহরীরা এগিয়ে এসে অকুস্থল থেকে মেয়েটিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর কোনখান থেকে একটা জ্যাকেট (জামা) যোগাড় কোরে কোনমতে একটু আব্রু কোরে দিল মেয়েটির গায়ে। ইতিমধ্যে তরুণী চেঁচামেচি সুরু কোরে দিয়েছে, "আমি যা, সেইভাবেই নাচতে নেবেছিলাম, ওরা কেন তা কোরতে দেবেনা? কেন দেবেনা আমার সে-স্বাধীনতা?"

কেউ কান দিল না সেকথায়, তরুণীকে সরিয়ে নিয়ে গেল আসরের সিমানা থেকে।

• • • •

রুশ দেশের কথা বলি।

মানুষের বড় আদর সেখানে। সন্তানসম্ভাবনা হোলেই রাষ্ট্র সেই ভাবী জননীর দায়িত্ব নেবেন। যে নারী চাকরিবাকরি ইত্যাদি করেন, তিনি ১১২ দিনের সবেতন ছুটি ('মেটার্নিটি লীভ') পাবেন, যতদিন না সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বার্ষিক বেতন ছুটি পাওনা, তা ছাড়া বাড়তি এ ছুটি তাঁরা আলাদাই পান। গর্ভাবস্থায় ধাত্রীসদন বা প্রসূতি-প্রবন্ধাগারগুলোতে তাঁরা বিনা পয়সায় সাহায্য ও পরামর্শ পান। প্রসব ও তার পরেকার খরচাপত্রও সরকারই দিয়ে থাকেন, প্রসূতি ও তাঁর বাড়ির লোকজনকে সেচিন্তা কোরতে হয়না। মা শুধু সন্তানধারণ ও প্রসব কোরেই নিশ্চিন্ত। তাঁর ও সন্তানের ভালোমন্দের সব ভাবনা সরকারের।

• • • •

শ্রীমতী প্রমীলা দেবী আর শ্রীমতী সুমিত্রা দেবীর মধ্যে জানাশুনো ও বন্ধুত্ব ছিল। সুমিত্রা দেবীর চার ছেলেমেয়ে, প্রমীলা দেবীও বিবাহিতা। কাজের প্রয়োজনে যখন সুমিত্রার স্বামী বাইরে ছিলেন, সেই সময়ে একদিন বেড়াতে আসেন তাঁর বাড়িতে প্রমীলা। বাড়ীতে তখন সুমিত্রার আড়াই বছরের কন্যা সুনীতা ছাড়া আর কেউ ছিলনা। সেই অবসরে প্রমীলা গলা টিপে হত্যা কোরলেন সুমিত্রাকে। সুনীতার বাকি তিন ভাইবোন বাড়ি ফিরলে সে তাদের জানাল, অমুক চাচী মাতাজীকে খুব মেরেছে। তারপর সবাই জানল খবরটা। দেখা গেল, সুমিত্রার গয়নাগাঁটি আর অন্য কিছু জিনিসপত্রও প্রমীলা চুরি কোরেছেন।

শ্রীমতী প্রমীলা ধরা পড়লেন। বিচার হোল। চুরির জন্যে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড আর খুনের জন্যে মৃত্যুদণ্ড হোল। ঘটনাটা ঘটেছে এই সেদিন—উত্তরপ্রদেশের একটি বড়ো শহরে।

• • • •

সুইজারল্যাণ্ডের মেয়েটিও শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ কোরল।

একটা ধর্মান্ধ গোঁড়া সম্প্রদায়-এর দু'জন স্ত্রীপুরুষ এই ব্যাপারে দায়ী বোলে ধরা পড়েছিলেন। পনের বছর বয়সের মেয়ে বার্থাডেটে ফ্রাসলার তার বাবা সুইজারল্যাণ্ডের এক চাষী। মেয়েটির ওপর নাকি 'অপদেবতা' ভর কোরেছিল। মধ্যযুগীয় ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ঐ দু'জন ফ্রাসলারের মনের ও দেহের 'ভূত' ছাড়াবার জন্যে বেশ ভালভাবেই ও জেনেশুনে মারধোর করে, যার ফল মারাত্মক হয়। কেবল 'ভূত' নয়, ফ্রাসলার নিজেও সেই অত্যাচারের দাপটে ইহলোক থেকেই পালিয়ে গেল।

অভিযুক্ত দু'জনকার যথাযথ শাস্তি হোল। এদের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডবাসী ছিল চারজন, একজন ছিল জার্মান পাদ্রী ও একজন জার্মান শিক্ষয়িত্রী। ফ্রাসলারের 'ভূত' তারা ছাড়াতে চেষ্টা কোরেছিল চাবুক, বেড়াবার ছড়ি আর ঘোড়াচড়ার অনুপ দিয়ে। হত্যার পর তারা বার্থাডেটের দেহটাকে রাখে লুকিয়ে।

• • • •

কানাডার মন্ট্রিল শহরের প্লাস্টিক সার্জন ডাঃ ডব্লিউ, আর, ওয়াটার্স জানালেন, অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্যে যেসব মেয়েরা তাঁদের বক্ষের আয়তন বাড়াতে চান, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন হোচ্ছেন বিবাহিতা। অনেকেরই সন্তানাদি আছে। এঁরা কেউ পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রভাবে পড়ে আবার কেউ বা স্বামীকে খুশি কোরতে ডাক্তারী উপায়ে, পীনপয়োধরা হবার বাসনা করেন। ডাঃ অরেনস্ত জেনেস্টার কাছে যাঁরা আসেন, তাঁরা অনেকে স্তনের নমুনা-চিত্র নিয়ে আসেন, কিংবা বোলে দেন কী মাপের স্তন তাঁরা চান। জেনেস্ট চেষ্টা করেন সেইধরণের আয়তন লাভ সম্পর্কে তাদের প্রতিনিবৃত্ত কোরতে। তিনি বলেন, "৩৪ সেঃ বা ৩৬ সেঃ মাপটাই ভাল। ওদের আমি ঐ মাপে রাজি হতেই বলি।"

বক্ষের আয়তনবৃদ্ধি সম্পর্কে ডাঃ জেনেস্ট জানিয়েছেন—বিশেষ একধরণের রবপদার্থ দিয়ে একটি সিন্থেটিক রাবারের বেলুন ভর্তি করা হয়। তারপর রোগিনীকে ঔষধসাহায্যে অচেতন রেখে সেই বেলুনটাকে স্তন ও বক্ষ-পঞ্জরাস্থির মাঝামাঝি জায়গায় স্থাপন করা হয়। রক্তস্রাব যাতে না হয় অস্ত্র প্রয়োগ করার ফলে, তার ব্যবস্থাও করা হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে শতকরা ৮০ ভাগ সাফল্য লাভ হয়। এ ছাড়া, স্তনবেষ্টের স্পর্শানুভূতিও এতটুকু কমে যায় না এবং জননীটি শিশুসন্তানকে স্তন্যদানও কোরতে পারেন স্বাভাবিক ভাবেই।

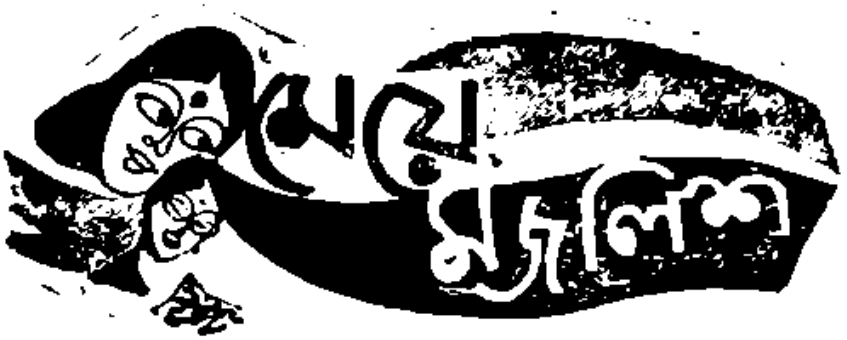

মহিয়সী নারী জননী পুতলীবাঈ

প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা

ভারতবর্ষে অনাদিকাল থেকে জননী ও জন্মভূমি এ দু'টি শব্দ অঙ্গাঙ্গিভাবে উচ্চারিত ও সম্মানিত। এই পুণ্য ভূমিতে ধ্বনিত হয়েছিল—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' ভারতভূমি একীভূত করেছে মাতৃভূমি ও জগজ্জননীর সঙ্গে গর্ভধারিণীর সত্তা। জননীর উচ্চাদর্শ গ্রহণ করে যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষগণ ইতিহাসে মহীয়ান্ হয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী জননী পুতলীবাঈ প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার বিষয়। ধর্মের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজ সেবার ক্ষেত্রে যে সকল মহাপুরুষ তাঁদের উচ্চ জীবনাদর্শ ও ভাবধারা প্রবর্তনের জন্য চির অমর —সেই ভাবাদর্শের উৎসরূপ মহাপ্রাণা জননীরা, তাঁরা কিন্তু ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিতা। নিজেদের যেন্নীর ভাগ সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে তাঁরা পুত্রদের জীবনের মধ্য দিয়ে স্বীয় আদর্শ অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জীবনেও তাঁর জননী পুতলীবাঈ-এর অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত। মহীয়সী পুতলীবাঈ কৈশোরে পোরবন্দরের করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। মহাত্মাজীর জীবনে ধর্মভাব যে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছিল তার মূলে ধর্মপ্রাণা পুতলীবাঈ-এর তপঃনিষ্ঠা এবং ব্রতপরায়ণতা বিদ্যমান। গান্ধীজী তাঁর আত্মকথার মধ্যে লিখেছেন—'মা যে সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন সেই স্মৃতি আমার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। নিত্যপূজাপাঠ না করে মা কখনও আহার করতেন না। প্রতিদিন মন্দিরে যেতেন এবং আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করতেন।—যে ধর্মভাব ভারতীয় নারীর মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত আবহমানকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে—এইসব ধর্মপরায়ণা নারী-চরিত্রই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। মহাকাব্যের যুগে মহারাণী গান্ধারীর 'যতো ধর্মস্ততো জয়:'—এই কণ্ঠধ্বনি যুগ যুগ ধরে ভারতীয় নারীর চিত্ত বীণায় অনুরণিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন এবং ভারতকে তাঁর বিস্মৃত গৌরব স্মরণ করালেন—"ভারতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে? ভারতবর্ষ সমুদয় মহত্ত্ব, নীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রাচীনা জননী। ভারতের কী বিনাশ হবে? তা হলে জগৎ থেকে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা চলে যাবে। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখছি যে আমাদের সেই প্রাচীনা মাতা আবার জাগরিতা হয়েছেন, পূর্বাপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা হয়ে পুনর্বার নবযৌবনশালিনী হয়ে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন।"

আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ভারতবর্ষ ঐহিক ক্লেশকে কখনও অসহনীয় মনে করেনি। ধর্মের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে ভারতীয় নারী কুণ্ঠাবোধ করেনি। মহীয়সী পুতলীবাঈ-এর ধর্মানুভবতা কায়িক ক্লেশকে অতি অনায়াসে জয় করেছিল। মহাত্মাজী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন—"আমার জ্ঞান হওয়ার পর মা কখনও চাতুর্মাস ব্রত ভঙ্গ করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। তিনি খুব কঠোর ব্রতগুলি পালন অক্লেশে করতেন। যে ব্রত নিতেন পীড়িত হয়ে পড়লেও তা ত্যাগ করতেন না। আমার একবারের কথা মনে আছে মা চান্দ্রায়ণ ব্রত নিয়েছিলেন তারপর অসুস্থ হন তবুও ব্রত ভঙ্গ করেন নি। চাতুর্মাস ব্রতের একবেলা আহার তিনি সহজেই পালন করতেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে একবার তিনি একদিন অন্তর একদিন ঐ ব্রতোপবাস করেছিলেন। উপর্যুপরি দু'তিনটে উপবাস করা তাঁর পক্ষে কিছুই ছিল না।"

একবার চাতুর্মাসের সময় মাতা পুতলীবাঈ ব্রত নিলেন যে সূর্যনারায়ণ দর্শন না করে আহার করবেন না। এই চারমাস তাঁর পুত্রেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন কখন সূর্য দেখা দেবেন আর কখন মা আহার করবেন। এ চারমাস বর্ষাকাল—অনেক সময় সূর্যের দেখা পাওয়া দুষ্কর হত। একদিন গান্ধীজী সূর্য দেখা দিয়েছে এই কথা বলে মাকে বাইরে থেকে এনেছেন, এমন সময় সূর্য মেঘের নীচে ডুবে গেল। সেদিন আর আহার হলো না। এই ভাবেই মাতার ধর্মনিষ্ঠা অনুসৃত হয়েছিল পুত্রের মধ্যে।

ইতিহাসের প্রতিটি মহান্ চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখেছি যেখানেই পুত্রের ধর্মানুভবতা, মহাপ্রাণতা, হৃদয়বত্তা উচ্চশিখরে আরূঢ় তার অন্তরালে জননীর প্রভাব বিরাজিত। মাতা পুত্রের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যে, মাতার ভাবধারা পুত্রের মধ্যে অনায়াসে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যোগ্যতম উদাহরণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মায়ের আদেশ বিদ্যাসাগরের কাছে বেদবাক্যস্বরূপ ছিল। একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মা, তোমার তো কোন গয়না নেই—আমার এখন ভাল অবস্থা, আমার ইচ্ছে তোমাকে খানকয়েক গয়না দিই: তোমার কী কী গয়না পরতে ইচ্ছে হয় বলতো?' বিদ্যাসাগরের জননী তখন মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—'বাবা, অনেকদিন থেকেই আমার তিনখানি গয়নার সাধ—ছেলেদের জন্য একটি বিনামাইনের স্কুল, গরীবদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আর গরীব ছেলেদের থাকার জন্য একটা ভাল বাড়ী—এই তিনখানা গয়না আমাকে গড়িয়ে দিও। তা'হলেই আমি খুশী হবো।' মায়ের এই মহানুভবতা মাতৃভক্ত সন্তান বিদ্যাসাগর স্বীয় জীবনে তাঁর প্রতিটি কার্যে দেখিয়েছেন। অপরের দুঃখে যেমন মায়ের সুকুমার কোমল প্রাণ কেঁদেছিল বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন এই হৃদয়সম্পদের যথার্থ উত্তরাধিকারী।

ঠিক এমন ভাবেই আদর্শ চরিত্র গঠনাভিলাষী মহীয়সী পুতলীবাঈ ভোগৈকলক্ষ্য পাশ্চাত্যদেশে গমনের পূর্বে পুত্রকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিলেন—মদ্য, মাংস ও স্ত্রী সংসর্গ পরিহার করবেন গান্ধীজী। প্রকৃত চরিত্র গঠনের জন্য এই তিনটি পরিহার্য একথা জননীর অজ্ঞাত ছিল না। হিন্দুধর্মের প্রকৃত বীর যেখানে বিদ্যমান পুতলীবাঈ তথাকথিত শিক্ষিতা না হয়েও পুত্রের চিত্তে সে বীর্য সম্পাদন করেছিলেন। গান্ধীজী পরবর্তী জীবনে নিয়মিত উপবাস, কৃচ্ছ্রতা ও মৌনতা মায়ের প্রভাবেরই পরিচয়। অতি শৈশব থেকে গান্ধীজীর সত্যপরায়ণতা ও ধর্মানুরাগ মায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ সত্যেনৈষ পন্থা বিততো দেবযানঃ'—উপনিষদের মর্মবাণী গান্ধীজী শৈশবে অনুভব করেছিলেন। সোপনে মাংসাদি আহার করে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী বোধ করেছেন গান্ধীজী প্রতি মুহূর্তে। তারপর সে সত্য মায়ের কাছে উদ্ঘাটিত করেছেন। মায়ের প্রতি আচরণের মধ্যে ধর্মানুরাগও আত্মশক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত। গান্ধীজী স্বীয় জীবনে তাঁরই অনুসরণ করেছেন। আদর্শ জননী আদর্শ পুত্রের

প্রদর্শিনী। আদর্শবান্ পুরুষের চরিত্র আলোচনায় আমরা সর্বক্ষেত্রে দেখি যে জন্মদাত্রী তাঁদের চরিত্রের মূল নিয়ন্তা।

ভারতের এই অনুপম বৈশিষ্ট্য অনেক মহাপুরুষ ও মনীষিগণের জীবন চরিত্রে প্রযোজ্য। মাতৃভক্ত সন্তান দেশমাতৃকার চরণে আপন সুখ সম্পদ উৎসর্গ করেছেন—এমন দৃষ্টান্ত ভারতে বিরল নয়। মায়ের কাছ থেকেই তাঁরা দেশমাতৃকার পূজার মূলমন্ত্রটি সংগ্রহ করেছেন। নারীত্ব ও মাতৃত্বের অপূর্ব মহিমা একীভূত হয়ে ভারতের ঐতিহ্যকে করেছে চিরভাস্বর। আজও দেখতে পাই যেখানেই আদর্শ জননীর দৃষ্টান্ত সেখানেই আদর্শ পুত্রের মহিমোজ্জ্বল চরিত্র। এবং সেই সকল পুত্র দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত অনবদ্য অর্ঘস্বরূপ।

আর্যঋষির কণ্ঠস্বর ভারতে চির অমর—'সত্যং বদ, ধর্মং চর, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'।

মাতৃসম্বোধন হতে এই উপদেশটি আচার্য শিষ্যকে প্রথম বলেন। জননী ও জন্মভূমি ভারতে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। সর্বভূতে সেই জননীরই বিকশিত রূপ—

পুরাণ সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করলো—
'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।'

আমার ডায়েরী

বিদেশে দেখে এলাম

শিউলি ঘোষ

কিছুদিন আগে আমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে লণ্ডনে যেতে হয়েছিল, তার চিকিৎসার জন্যে। অনেকদিন আগে উচ্চশিক্ষার্থে যখন যাবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়েছিল তখন যাওয়া হয়নি। এতদিন বাদে বহু প্রত্যাশিত লণ্ডন দেখবার সুযোগ হল। আমি খুব অল্পদিনই ঐ দেশে ছিলাম কাজেই খুব বিস্তারিত অভিজ্ঞতা হয়নি। ভ্রমণ কাহিনী বা রম্যরচনা লেখা এই কবিকার উদ্দেশ্য নয়। আমার স্বল্পকালীন প্রবাসীজীবনের মধ্যেই যেটুকু দেখেছি এবং যা আমাকে সবচাইতে বেশী আকর্ষণ করেছে সেই সম্বন্ধেই আজ আপনাদের মা বোনেদের দু'চারকথা বলব মনে করেছি।

পাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম যে জিনিষটা আমাকে সবচাইতে মুগ্ধ করেছে তা হচ্ছে "গতি"—জীবনের গতি। পাশ্চাত্যের সমাজ যে গতিশীল সমাজ তা তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতির মধ্যেই দেখা যায়। এদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের বাংলাদেশের সমাজ অনেকটা স্থিতিশীল সমাজ। পাশ্চাত্য দেশে জীবনযাত্রার ধারা ক্রমশঃ যেন বেড়ে যাচ্ছে। আরো আরাম চাই, আরো সুবিধে চাই, জীবন যাত্রার মান আরো উঁচু করতে হবে এটাই পাশ্চাত্যের লক্ষ্য। এজন্যে এদেশের লোকেদের কাজে বিরাম বা বিরক্তি নেই। তা বলে নাচগান হাসিগল্প খেলা আমোদ প্রমোদেরও শেষ নেই। মনে হয় এরা যেন সময়ের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। এদেশে লোকের মধ্যে ব্যস্ততার যেন সীমা নেই। বাংলাদেশের

লোক আমরা তাই এত ব্যস্ততার প্রয়োজনটা কি বুঝতে পারিনা। পাশ্চাত্যে এই যে দুনিবার গতি তার মধ্যে একটি ছন্দ আছে আর আছে সহনশীলতা। আপনারা জানেন ছন্দ বলতেই বোঝায় "গতি" ও যতির একটা সুন্দর সামঞ্জস্য। এদের জীবনেও গতি ও বিরতির এক সুন্দর সমন্বয় ফুটে উঠেছে; তবে বাঙালী জীবনে বিরতি বলতে আমরা যেমন বুঝি নিশ্চিন্ত কর্মহীনতা বা প্রগাঢ় আলস্য, এরা তা বোঝেনা। তাই ছুটি নিয়ে আমরা যখন ভালমন্দ খেয়েদেয়ে বাড়ীতে শুয়ে এক্টার ঘুম দিই বা বড় জোর সিনেমায় গিয়ে আনন্দের চূড়ান্ত করলাম ভাবি এরা তা ভাবে না। ছুটি পেলে এরা যায় বাইরে—কেউ পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে সামান্য কিছু খাবার পিঠের ছাতারস্তাকে পুরে কেউবা সমুদ্রের জলে মাছের মত সাতরায় আর ঐ সমুদ্রেরই তাজা মাছে সারাদিনের রোদে জলে পোড়া শরীরটাকে তাজা করে নেয়। তাই এদের জীবনে বিরতিটাও গতিরই রকম-ফের মাত্র। পাশ্চাত্যের এই জীবন দর্শন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "জানলা খুলিয়া দেখি, জনস্রোত নানাদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, মনে মনে ভাবি, ইহারা যেন কোন এক অদৃশ্য কারিগরের হাতুড়ি। যে জিনিষটা গড়িয়া উঠিতেছে সেটাও মোটের উপর অদৃশ্য, মস্ত একটা ইতিহাসের কারখানা; লক্ষ লক্ষ হাতুড়ি দ্রুত প্রবল বেগে লক্ষ লক্ষ জায়গায় আসিয়া পড়িতেছে, আমি সেই এঞ্জিনের বাহিরে দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকি—কুধার শীমে চালিত সজীব হাতুড়িগুলো দুনিবার বেগে ছুটিতেছে, ইহাই দেখিতে পাই।"

"যাহারা বিদেশী প্রথমে এখানে আসিয়া এখানকার ইতিহাস বিধাতার এই অতি বিপুল মানুষ কলের চেহারাটাই তাহাদের চোখে পড়ে। কী দাহ, কী শব্দ, কী চাকার ঘূর্ণি। এই লণ্ডন শহরের সমস্ত গতি সমস্ত কর্মকে একবার চোখ বুজিয়া ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করি—কী ভয়ঙ্কর অধ্যবসায়। এই অবিশ্রাম বেগ কোন লক্ষ্যের অভিমুখে আঘাত করিতেছে এবং কোন অব্যক্তকে প্রকাশের অভিমুখে জাগাইয়া তুলিতেছে।" রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই যে "ভয়ঙ্কর অধ্যবসায়, এই যে অবিশ্রাম গতিবেগ" এই জাতটাকে যে বিপুল কর্মোদ্যমের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে সকল কোরে তোলবার জন্যে এদের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত সহনশীলতা, আন্তরিকতা আর কর্মক্ষমতা। এদেশের আবহাওয়া আর নির্ভেজাল পুষ্টিকর আহার্য্য ব্যবস্থাই বোধহয় এদের সাহায্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবন যাত্রার মান ও এদেশের চরিত্র গঠনের উপযোগী হয়ে উঠেছে। ইংরেজদের এই কর্মক্ষমতাও দক্ষতাকে অব্যাহত রাখবার জন্যে এরা সব সময়েই সচেষ্ট—এরা জানে যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সুন্দর ও সুষ্ঠু রাখতে হলে সংসারের যাবতীয় কাজ নিজেদের করে নেওয়াই শ্রেয়। তাই এরা লোকজনের ওপর নির্ভর করেনা। কাপড় কাচা, রান্না করা থেকে জুতো ঝাড়া পর্য্যন্ত সব কাজ নিজেরাই করে। ফলে ওদের বাগান থেকে সুরু কোরে ছাদের কোনা পর্য্যন্ত সবটাই ঝকঝকে, তকতকে—সুন্দর একটি ছবির মতন। কোন কাজকেই এরা ছোট ভাবেনা বরং যাকে আমরা ছোট কাজ বলে ভাবি এরা সেইগুলোকেই জীবনধারনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ভাবে—কেন না এইগুলোই তাদের প্রাণশক্তির রসদ যোগায়।

তাই, ভাবপতির বাড়ীর গিন্নিকে দেখি বাজারের থলি নিয়ে হন্‌হন্ কোরে ছুটতে, কর্ত্তাকে দেখি ডিস্ ধুতে কিম্বা ফার্নিচার পালিশ কর্ত্তে কিম্বা বাগানের মাটি খুপোতে। ঘরে বাইরে এরা সর্ব্বদাই কাজের লোক, সর্ব্বত্র গতিশীল।

সজীবচন্দ্র বলেছিলেন বিদেশে বাঙালী মাত্রই সজ্জন। সেদিন আমাদের পৃথিবীটা ছোট ছিল। তাই বাংলাদেশের বাইরে গেলেই আমরা সেটাকে বিদেশ বলে ভাবতাম, আজকে আমরা নিজেদের

ভারতবাসী বলেই ভাবি, বাঙ্গালী বলে ভাবি না। সেজন্যে আর বাঙ্গালী যখন ভারতবর্ষের বাইরে যায় তখন তারও চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে যায়। বাংলাদেশের যা ভারতবর্ষে যে বাঙ্গালীকে আমরা অলস, পরশ্রীকাতর, রুচিহীন দেখতে অভ্যস্ত বা অন্যের প্রতি সহানুভূতিহীন দেখতে অভ্যস্ত তিনি বিদেশের মাটিতে একেবারে রূপান্তরিত হয়ে যান। আমার এই সামান্য ক'দিনের ইংল্যান্ড বাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে সব বাঙ্গালী কি ভারতীয়দের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে যারা অনেকেই আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন না—তাঁরা কত সহজেই আমাদের নিজেদের মত করে নিয়েছিলেন এবং সর্বরকমে সাহায্য করেছেন। তাদের সহানুভূতি এবং সদিচ্ছা সব সময়েই আমাকে মনে করে দিয়েছে যে আমি ভারতবর্ষের থেকে চার হাজার মাইল দূরেও আমি যেন আমার নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি।

আরেকটা জিনিষ যা আমাকে বিস্মিত করেছিল তা হচ্ছে এদের শৃঙ্খলাবোধ। এখানে বাসে টিউবে হাজার হাজার লোক যাতায়াত করে কিন্তু কোন ধাক্কাধাক্কি নেই। একজনকে ডিঙিয়ে তার আগে অধিকার করবার অত্যাধিক উৎসাহ নেই। নিয়মমত যাত্রী নিয়ে বাস বা টিউব যাতায়াত করে—যারা জায়গা পান না, তারা অপেক্ষা করেন। কখনও কখনও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতেও আমি দেখেছি। এই শৃঙ্খলাবোধ এদের প্রতিটি আচরণে। আপনি পার্কে যান, দেখবেন, যেখানে বেড়াবার জায়গা সেখানে বেড়াচ্ছেন, যেখানে খেলবার জায়গা সেখানে খেলছেন, যেখানে বিশ্রাম করবার সেখানে বিশ্রাম করছেন। যেখানে যা করণীয় নয় সেখানে তা করছেন না। তাই সেখানে পার্কের ফুল পার্কের গাছেই থাকে। চিনেবাদামের খোসায় সুন্দর সবুজ ঘাস ঢাকা থাকেনা। তাই উদ্ভ্রান্ত ফুটবল এসে পেরামবুলেটারে হানা দেয়না। সেজন্যে সেখানকার ফুটপাথে কলার খোসা নেই; উদ্যত ষাঁড়ের সিং উঁচিয়ে নেই; মোড়ে পানপাতার ছড়াছড়ি নেই কিংবা আপনার পথ অবরোধ করে ফিরিওয়ালার হাঁকাহাঁকি নেই।

এই যে শৃঙ্খলাবোধ এবং নিয়মানুবর্তিতা এর পেছনে যে ভাবটি কাজ করছে তা হচ্ছে অন্যের সুখ সুবিধের প্রতি এক তীব্র সচেতনতা, আমার কোন কাজের ফলে অন্য কেউ অসুবিধার মধ্যে পড়ছে এটা ভাবতে ইংরেজরা লজ্জা বোধ করে। এরই নিদর্শন আমি পেয়েছিলাম ওখানকার হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য কর্মচারীদের প্রতিটি আচরণে। এরকম সহানুভূতি ও ভদ্রব্যবহার দুনীকে এবং তার উৎকণ্ঠিত আত্মীয় স্বজনকে অনেকটা আশ্বস্ত করে তোলে; একটা নিরাপত্তার ভাব মনের মধ্যে জাগিয়ে দেয়। আমি বিদেশী বলে কিনা জানিনা—ওখানকার নার্স এবং ডাক্তারদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছিলাম তা জীবনে কখনও ভুলব না। এখন বাংলাদেশে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া থেকে সুরু করে বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষা এবং অস্ত্রোপচারের পরবর্তীকালে যে সব ঝামেলায় পড়তে হয় ওখানে আমায় সেসব কিছুই ভোগ করতে হয়নি। যে স্পেশালিষ্ট-এর সঙ্গে আমি এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এখান থেকে গিয়েছিলাম তিনিই নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা করবার পর হাসপাতালে ভর্তি করা থেকে অপারেশন করা যাবতীয় করণীয় সবই করেছিলেন। এটা হয়ত তাঁর কর্তব্য কিন্তু যে আন্তরিকতার সাথে করেছিলেন—সেইটাই আমায় সব চাইতে মুগ্ধ করেছে, এই আন্তরিকতা ও মমত্ববোধ ইংরেজ জাতের বৈশিষ্ট্য। শুধু কেবল উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেই নয় অল্পশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যেও এই ভদ্রতাবোধ সব সময়েই লক্ষ্য করেছি।

ঈশ্বরের কৃপায় আমার স্বামীকে যে আবার সবল সুস্থ করে নিয়ে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি তার জন্যে ইংরেজের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই তেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

UNIVERSITY

গল্পভারতী

মাঘ ১৩৭৬

UNIVERSITY

রজত জয়ন্তী বর্ষ

পঞ্চবিংশতি বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা

স্বামীজি বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র

আমেরিকার শিকাগো শহরের মহাধর্মসভায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। ফিরে এসে তিনি ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করলেন শ্রীরামচন্দ্রের পদরজধন্য সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। এই সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নাম রামনাথপুরম্। চলিত কথায় রামনাদ।

রামনাদের রাজা—ভাস্কর সেতুপতি মহা সমারোহে প্রথম অভ্যর্থনা জানালেন স্বামীজিকে। সে দিনটি ছিল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী।

ওদিকে ঠিক তার দু'দিন আগে ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে নেতাজি সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন উড়িষ্যারাজ্যের কটক শহরে। স্বামী বিবেকানন্দের তা জানবার কথা নয়। তবু তিনি রামনাদের অভিনন্দনের উত্তরে বললেন—

> "সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইয়াছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। সেই বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইয়াছেন। আর কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ত্রিকালজ্ঞ ঋষিতুল্য স্বামী বিবেকানন্দ এ-কথা কাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি সুভাষচন্দ্র।

কারণ সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে দেখা গেল বিবেকানন্দের তিরোধানের পর তাঁর ধ্যানধারণা এবং ভাবজীবনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ভাবজীবন এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে।

সুভাষচন্দ্র তখন অপরিণত বয়স্ক বালকমাত্র। তখনই তাঁর বিদ্রোহী মন সংসারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কাশী চলে গিয়েছিলেন তিনি সন্ন্যাসী হবার জন্য। সে-পথ থেকে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেছিলেন তাঁর পিতা।

সংসারে ফিরে এলেও তাঁর চিরবিদ্রোহী মন সংসারী হলো না। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাই হলো তাঁর একমাত্র কাম্য।

স্বামী বিবেকানন্দের সারাটা জীবন গড়ে উঠেছিল উপনিষদের অনুপ্রেরণায়। মোহতমসাচ্ছন্ন প্রতিটি মানুষের কাছে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন আশার বাণী নিয়ে। কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাদের তমোঘোর—তাদের নিস্তাচ্ছন্ন ভাব। বলেছিলেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত !'

উপনিষদ ও বেদান্তের অনুপ্রেরণায় যে জীবন তিনি লাভ করেছিলেন সে-জীবন শুধু যে আধ্যাত্মিক জীবন তা নয়। তা ছিল চৈতন্যময়, জ্ঞানময় এবং কর্মময়ও। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনও ছিল সেই একই রসে দীক্ষিত। তিনিও চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিকতা ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে কাল্পনিক ব্যবধান—যে বিভেদ-পার্থক্য সেটিকে দূর করে দিতে। তিনি চেয়েছিলেন কর্মজীবনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে, তেজ ও বীর্যে বলীয়ান করতে। বলেছিলেন—সর্বপ্রথম আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে হবে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারত তার স্বাধীন এবং নিজস্ব মতবাদ নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তাই তাঁর একক প্রচেষ্টায় বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে দুর্ধর্ষ বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এক অত্যাশ্চর্য বিস্ময়কর মনোবল নিয়ে যে বীর্যবান অপরাজেয় মনুষ্যত্বের অবিস্মরণীয় কীর্তির গৌরব তিনি অর্জন করে গেলেন তার তুলনা হয় না।

এখন থেকে একাত্তোর বৎসর পূর্বে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন- যাহা যবনদিগের ছিল তাহা আমাদের কোনও কালেই ছিল না। যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাগার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির লহর হইয়া কুরুক্ষেত্র পরিপ্লুত করিতেছে—আমরাও তাহা চাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা। যে দেশ সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল, যে-দেশ নিজের অকর্মণ্যতার ওপর বৈরাগ্যের আবরণ নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেখানে তপস্যার ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকে ধর্ম করিয়া তুলে, নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই, কেবল অপরের উপর দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে, সর্বোপরি গৌরব কেবল পূর্বপুরুষের গুণকীর্তনে, সে দেশের পরিবর্তন চাই।

সুভাষচন্দ্রও বললেন, চাই সবার আগে চোখের সুমুখ থেকে অন্ধকারের যবনিকা সরিয়ে দিতে, হাতের ও পায়ের শৃঙ্খল মোচন করে চাই তেজস্বী এবং বীর্যবান নব ভারতের প্রতিষ্ঠা করতে। এ না করতে পারলে ভারত তার নিজের জাতীয় জীবন সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—যে-সত্য ভারত নিশ্চিতরূপে লাভ করে জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে দান করতে পারবে—সে সত্যটি কি ? সে-সত্য বণিকবৃত্তি নয়, রাজনৈতিক স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, তা বিশ্বজাগতিকতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে প্রতিফলিত। আর বিবেকানন্দ প্রতিফলিত সুভাষচন্দ্রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, সবই মা, সবই কালী। নীচ জাতি, মুচি মেথর, দরিদ্র, মূর্খ—তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

এই উপলব্ধি পশ্চিমের কোন রাষ্ট্রনেতার 'স্লোগান' নয়। এই উপলব্ধির মূলে আছে—অদ্বৈত অনুভূতি। এই বিশ্বসংসার সেই আদিজননী থেকে সমুদ্ভূত। চৈতন্যের একটি অখণ্ড প্রবাহ, সৃষ্টির মূল উপাদানের উপলব্ধির উপনিষদ।

কিন্তু পাছে ক্ষীণপ্রাণ আমরা এই বিরাট ভাবনা এবং এই মহতী কল্পনার কাছে ভীত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি তাই বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে বীর্য্য জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ভারতবাসীর অন্তরে সাহস সঞ্চার করতে। বলেছিলেন, হে বীর, সাহস সঞ্চয় কর!

এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের শক্তিভূতা সনাতনীর উপলব্ধি আমাদের চেতনায় যদি লভ্য না হয়, তাই ভারতবাসীর কাছে দেশজননীকে সেই মহামায়ার প্রতিমূর্তি রূপে স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশবাসীর সেবার মধ্য দিয়েই বিশ্বজননীর আরাধনার পথ প্রশস্ত হয়। স্বদেশমন্ত্রেই তাঁর সাধনার সূত্রপাত।

সুভাষচন্দ্রেরও তাই। তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকে তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্মই এক প্রজ্বলন্ত তেজোদীপ্ত অত্যাশ্চর্য্য স্বদেশপ্রেম ছাড়া আর কিছুই নয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র

অধ্যাত্ম তত্ত্ব নয়, মুক্তির কথাও নয়—সন্ন্যাসীর মুখে সম্পূর্ণ এক নতুন কথা জগৎ শুনলো।

সেকথা শুনে মৃত ভারতবর্ষ নড়ে উঠলো।

দেশবাসী তখন অন্ধ অনুকরণে মত্ত। তিনি বললেন, পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই মাত্র সম্বল ক'রে, উচ্চাধিকার লাভ করা যায় না! বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করতে হলে চাই মহাবলি, জীবন বলি, যাদের জন্যে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হোন, যাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন-দরিদ্র, উৎপীড়িতদের জন্যে তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ করো।

ব্রত তারা গ্রহণ করেছিলো।

তিনি বললেন, সকলের সম্মুখে একটিমাত্র দেবতা আছে, ভারতবর্ষ তার নাম—একটিমাত্র ধর্ম আছে, সে ধর্ম হলো, ভারতবর্ষকে আবার মহীয়ান ক'রে তোলা। এই দুর্বল, অশিক্ষিত, উপবাসক্লিষ্ট কোটি কোটি মানুষ—যারা আজ ভেঙে দুয়ে পড়েছে, তাদের আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। জগৎকে জানাতে হবে, ভারতবর্ষ মরেনি—মরতে পারে না। ভারতবর্ষের যদি মৃত্যু হয়, সভ্যতার হবে মৃত্যু। সেই অবিনশ্বর মৃত্যুঞ্জয় ভারতকে আবার জগতের সম্মুখে তোমাদের তুলে ধরতে হবে।

বললেন, আমরা কর্মকে যেন কোনোদিন অবহেলা না করি। মুক্তির জন্যে তপস্যা? কার কাছ থেকে মুক্তি? মানুষ যদি তার ভাই-এর মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে সে কখনোই মুক্ত হতে পারে না।

তাঁর সে আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। জগতে কোনো আহ্বানই কোনোদিন বৃথা যায় না। মহাপুরুষরা এমনি ক'রেই তাঁর আদর্শ রেখে যান।

সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, সুভাষচন্দ্র হলেন নেতাজী। বাংলার ইতিহাসের এক মহা-লগ্নে দেখা গেল এই অসাধারণ মানুষটিকে।

সুভাষচন্দ্র সেদিন অসাধ্য সাধন করেছিলেন। ভোজবাজী নয়, অলৌকিকও নয়—মানুষ চেয়ে দেখলো স্বপ্ন কি করে সত্য হয়!

এ তপস্যা—তাঁর কর্মে নিষ্ঠা, সত্যে বিশ্বাস। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর অসাধারণ সংযম, আত্মপ্রত্যয়। আর ছিলো নিয়মানুবর্তিতা, নীরব ধৈর্য—যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মস্বরূপ ছিলো। বিশ্বের পটভূমিকায় একদিন যখন তিনি সহসা শান্ত-অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বপদ থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ রণপতিরূপে দেখা দিলেন, তখন জগৎ বিস্ময়ে তাঁর দিকে ফিরে চাইলো। কিন্তু আমরা জানি, সে বিস্ময়ের বীজ তাঁর সেই উন্মুখ যৌবনে শান্ত জীবনের মধ্যেই নিহিত ছিলো।

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রত্যেক সন্ধিক্ষণে আমরা দেখেছি, এই বিচিত্র দেশের ও সভ্যতার আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের তাগিদেই এক শ্রেণীর অপরূপ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে—যাঁরা ভারতবর্ষের আত্মার অংশরূপেই আবির্ভূত হয়েছেন, এবং একই আত্মার প্রকাশ ব'লে তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্র ও বাণীর মধ্যে এক ধারাবাহিকতা প্রবহমান হয়ে আসছে।

ভাববার কথা

—সদানন্দ

আজ দেশের যে চরম দুরবস্থা যে অন্তহীন দুঃখ কষ্ট লজ্জা ও লাঞ্ছনা মাথায় করে দেশের মানুষ অতিশয় জীবনযাপন করছে, সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের মানুষের মনে যে হতাশা দেখা দিয়েছে, জাতির বল-ভরসা, তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যুবশক্তি যে ভাবে দ্রুত অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, তা দেখে চিন্তাশীল দেশ-প্রেমিকেরা অশ্রু সম্বরণ করতে পারেন না।

এই সব মর্মন্তুদ অবস্থার কারণ অনেক নয়, মাত্র একটি। মনুষ্যত্বের অভাবই সেই কারণ। আজ দেশে মানুষ নেই, মনুষ্যত্বের চেতনা পর্যন্ত আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এমনি অধঃপতন হয়েছে আমাদের। দেশের নেতারা একবার ভুলেও সেকথা বলেন না। আমাদের এই অবর্ণনীয় দুর্দশার কারণ যে কি তা তাঁরা একবার ভাবতেও পারেন না। এমনি মোহাচ্ছন্ন হয়েছে তাদের চিন্তাশক্তি। আজ তাই আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে—'মানুষ হওয়া ও মানুষ করা'

শুভ্রতারতী তার আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই তার সুরে এই কথাই বলে এসেছে আজও তাই বলছে। এই হল তার "মিশন"।

আজ যদি আমরা জাতি হিসাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হতে না চাই, তাহলে সবকিছু পরিত্যাগ করে, আর সব পরিকল্পনা সরিয়ে রেখে, সর্বপ্রথম এক সুপরিকল্পিত ব্যবস্থামত, দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সারা দেশের মানুষের মনে ঝটিকা প্রবাহের মত এক বিপ্লবের সৃষ্টি করতে হবে। যে বিপ্লব দেশবাসীর জীবনে এক বিরাট আলোড়ন নিয়ে আসবে—তাদের সামনে এক নূতন জীবনের নব-প্রভাতের আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করবে। যার ফলে দেশবাসী সত্যিকার মানুষ হওয়ার সুযোগ ও প্রেরণা পাবে।

"We have wept long enough ; No more weeping, but stand on your feet and be men. It is a man-making religion that we want. It is man-making theories that we want. It is man-making all round edrecation that we want."

"Be moral. be brave. Be a whole hearted man, strictly moral and brave unto desperation.

"Cowards only sin Brave men never."

Swami Vivekananda

মুনি ঋষির আধ্যাত্মিক সাধনায় উদ্ভাসিত এই পুণ্যভূমি মহাভারতের মানুষই একদিন সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছিল। এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলো। কী সম্মানই না ভারতের মানুষ পেয়েছিল সেদিন বিশ্বের দরবারে। ঊনবিংশ শতকের যে মনীষীরা বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছিলেন যাদের শিক্ষা দীক্ষা, চিন্তা ও ভাবনা অতি উচ্চস্তরের ছিল তাঁরাই মনপ্রাণ দিয়ে বুঝেছিলেন যে এই বিরাট মহাদেশের মানুষকে এমন এক অমৃত ও অভয় মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে যার ফলে তারা সত্যিকারের মানুষ হয়ে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে এবং তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও গৌরব অর্জনে সক্ষম হবে।

তাই সেদিন আনন্দমঠের ঋষি—বঙ্কিমচন্দ্রের মুক্তি মন্ত্র, অভয়মন্ত্র—"বন্দেমাতরম্" দেশের মানুষকে মনুষ্যত্ব লাভে ও জাতীয়তাবোধে প্রেরণা দিয়েছিল। এই বাংলাদেশের মানুষই একদিন এই মহামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে অমৃতের সন্তান মৃত্যু নাহি জানি—এই বেদবাক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছিলও দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে জীবনপণ করেছিল। আনন্দমঠের বীর সন্তানদের দৃপ্তকণ্ঠে নবভারতের মাতৃমন্ত্র সেদিন হয়েছিল তাদের অভয়মন্ত্র। ঋষি বঙ্কিমের মানস সন্তান আনন্দমঠ থেকে নেমে এসে "অনুশীলন সমিতির" সৃষ্টি করেছিল বাংলার গ্রামে গ্রামে। সেদিন এই "অনুশীলন সমিতি"ই বাংলার যুবশক্তির সামনে তুলে ধরেছিল—অজর অমর অমৃতের অভয়বাণী, আর ত্যাগ, বৈরাগ্য, দেশসেবা ও অখণ্ড চারিত্রিক উৎকর্ষের ধ্বজা। অমরত্বের চেতনায় দুর্জয় শক্তির অফুরন্ত উৎসকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত এই অনুশীলন সমিতিই সেদিন দেশবাসীর মনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানের আদর্শহীনতা, শ্রদ্ধাহীনতা ও চারিত্রিক অবনতির দিনে আবার অনুশীলন সমিতির ব্যাপক প্রতিষ্ঠা সত্যিকারের মানুষ তৈরির পথ সুগম করবে। এই সংখ্যায় অন্যত্র অনুশীলন সমিতির গৌরবদীপ্ত অভূতপূর্ব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হল।

"নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত! লব শিক্ষা।"

—রবীন্দ্রনাথ

ভাগ

—শক্তিপদ রাজগুরু

অনেক রাত অবধি জেগে বসে আছে সুরমা, লোকটা তখনও ফেরেনি। অবশ্য তার ফেরার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। দীপকের ব্যাপারটাই এমনি।

সুরমা বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছে লোকটার এইসব ব্যবহার। শান্ত নিরিবিলি একটা মানুষ। প্রথম যখন ওকে দেখে তখন মনে হয়েছিল এটা বোধহয় সংসারের উপর সাময়িক একটা বিতৃষ্ণার ভাবই। এটা আসে নানা কারণে, হয়তো বা নিজে অনেক বেশী লেখাপড়া জানে, পড়াশোনা নিয়েই থাকে, তার তুলনায় সুরমা পড়াশোনায় অনেক নিরেস আর কমতি। কোনরকমে টেনেটুনে স্কুল ফাইনাল অবধি উঠেছিল, যাবার সামর্থও তেমন নেই।

সাধারণ ছাপোষা মানুষ নরেশবাবু কোন সওদাগরি অফিসের কেরানী, দশটা পাঁচটায় ঘানি টেনে জীবনের সব শক্তিটুকুকে নিঃশেষ করে এনেছে, ঘরেও বেশ কয়েকটি পোষ্য। সুরমারা কয়েক ভাই বোন। সুরমা আর সুলতা পিঠোপিঠি দুই বোন। সুরমা পড়াশোনায় তেমন কিছুই নয় আর তার তুলনায় সুলতা পড়াশোনায় অনেক ভালো। ক্লাশে ফার্স্ট হয়। স্কুলের সেরা মেয়ে। তার তুলনায় সুরমা নিজেকে অনেক ছোট আর সামান্য মনে করে।

বাবা বলে—সুলতা আমার মুখ রাখবে। দেখো ও এম-এ পাশ করবে।

সুরমাও বাবার এই কথাগুলো শুনেছে, মুখ কালো হয়ে ওঠে।

সুলতার উপরই চাপা রাগ জমে ছিলে ছিলে। সুরমা বলে ভারি তো মেয়ে এম-এ পাশ করবে না হাতি।

প্রফেসর হবে। কচু! বাবার যেমন কথা।

বাবা বলতো আর সুরমা কোন সংসারে গিয়ে হাতা খুন্তি নাড়বে আর দুবেলা শাশুড়ীর গঞ্জনা খাবে।

গরীবের সংসার তবু মায়ের আদর সেখানে না থাকা নেই, আর আদরটা একটু বেশী পেয়েছিল সুরমাই। এমনিতে সে একটু বেপরোয়া মাথা ঠাণ্ডো মেয়ে। বাবার কথায় ওর মুখখানা ফুলে ওঠে। মা বলে সান্ত্বনার সুরে,

—কিন্তু সুরো আমার লক্ষ্মী মেয়ে।

—থাক্ আর আদরে কাজ নেই, আমি যে সকলের চোখের বালি তা জানি গো জানি।

ধীরে ধীরে সুরমার মনের অতলে একটা নীরব আলার সঞ্চয় জমে ওঠে। সেটার বহিঃপ্রকাশ নেই। কিন্তু মনের অতলে সেই যন্ত্রনাটা ওকে যেন ঘুরে ঘুরে খায় কাঠে লাগা ঘুণ পোকার মতই।

ছোট একটা ঘরে দুই বোন থাকে একটা তক্তপোষে। বয়স হয়েছে মেয়েদের। তাই বোধহয় এই সুবিধাটুকু পেয়েছে তারা।

সুলতা এবার স্কলারশিপ্ পেয়ে মুলকাইনাল পাশ করে প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হয়েছে। সুরমা কেলকরে আবার প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার কথা ভাবছে, অবশ্য কথাটা সে ভাবেনি আদৌ। মহেশবাবুই বলে, পাশ তো করতেই হবে রে!

মহেশবাবু জানে মেয়ের বিয়ে দেবার সামর্থ তার কতটুকু। তবু যদি কোনরকমে পাশ করে একটা ছোটো খাটো চাকরী বাকরীও জুটিয়ে নিতে পারে তার দিন চলে যাবে আর আজকাল চাকরীওয়ালা মেয়েদের বিয়ে থাও হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ ছেলেরাও এখন চায় দুজনেই রোজকার করবে, এটাই এখন চালু সমাজ ব্যবস্থা।

সুরমা মনে পাশ করে কি হবে? ওসব সুলতাই করুক। কথাটার মধ্যে যেন জ্বালার একটু নিবিড় ধোঁয়া মেশানো।

সুলতাও দেখেছে দিদির এই হাবভাব। দিনদিন দিদিটা কেমন বদলে যাচ্ছে। সুলতা জানে তার দিদির এই ব্যবহার। সুলতা নিজেকেই অপরাধী মনে করে। সে নিজে পড়াশোনায় ভালো, মাষ্টার ভালবাসা তার উপরই একটু বেশীমাত্রায় এসে পড়েছে।

রাত হয়েছে। সুলতার সামনে পার্ট-টু ফাইনাল। রাত জেগে পড়ছে সে। পড়তে বসলে তার দিন সময় জ্ঞান থাকেনা। অন্ধকার নেমেছে বাইরে—তার অজানতেই কখন পাড়ার বাড়িগুলোর সব আলো নিভে গেছে। তখনও পড়ছে সুলতা।

সুরমার ঘুম আসে না। পড়াশোনাও ভালো লাগেনা তার। ক্রমশঃ মনে হয়েছে তার করারও কিছু নেই। চারিদিক যেন বিষিয়ে উঠেছে কি শূন্যতার জ্বালায়। এই শূন্যতাটা তার মনের মাঝে শুধু বেদনা আর হতাশাই আনে। পড়াশোনা তার হবে না। গান শেখবার চেষ্টাও করেছিল সে। দিনকতক হারমোনিয়াম নিয়ে প্যাঁ পোঁ করে গলা সেধেছিল, সেসেগুজে খাতা হাতেকরে গানের ইস্কুলেও গেছে আরও পাঁচজন মেয়ের মত।

কিন্তু ওই পর্যন্তই এগিয়েছিল, কোন কিছুকে মনের সঙ্গে গ্রহণ করে সাধনা করার মত মানসিক প্রস্তুতি সুরমার ছিলনা। তাই গানেও বিরক্তি আসে। দিনকতক এই বেসুরো গলার চীৎকারের পর সুরমার গানের সখও মিটে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায় সব সুর।

মহেশবাবু বলে আর একটা চ্যাপটার শেষ হল সুরমার। বুঝলে সুরোর মা সুরোর জীবননাট্যের এক একটা সিন ওর মিলিয়ে নিয়ো তুমি।

সুরমার মনে হয় এই অস্থিরতা তার রক্তগত, কোন কিছুকেই সে গ্রহণ করতে পারেনি। সর্বদা মনে হয়েছে সে ঠকেছে তাই পাবার জন্য এটা সেটা সামনে যা পেয়েছে তার দিকেই হাত বাড়িয়েছে, পরক্ষণেই মনে হয়েছে এটা ভুল। গ্লানিতে মন ভরে উঠেছে আবার নোতুন কিছু পাবার চেষ্টা করেছে। তবু নীরব মনের অতলের দুর্বার জ্বালাটা থামেনি। নিজে জ্বলেছে তার চারিপাশেও ফেলেছে সেই জ্বালার উত্তাপ।

অবশ্য সুরমার মনে হয়েছে তার নায্য প্রাপ্য থেকে তাকে বার বার বঞ্চিত করেছে কোন অদৃশ্য একটা শক্তি। ক্রমেই কঠিন হয়ে সেই শক্তিকে হার মানাতে চেয়েছে সুরমা।

আলোটা জ্বলছে সুলতার পড়ার একঘেয়ে সুর শোনা যায়। সুরমা শুয়ে শুয়ে দেখছে বোনকে। ওর মুখে গালে পড়েছে সেই আলোর বিবর্ণ একটু আভা। সুলতার মুখে ফুটে উঠেছে একটা কাঠিন্য।

সুরমা নোতুন চোখে বোনকে দেখছে। ক'দিনধরেই এটা লক্ষ্য করেছে সে। সুলতা তার কাছে কি

যেন একটা খবর গোপন করে চলেছে। কোনকিছু প্রশ্ন করলেই ওই পরীক্ষার ছুতো করে এড়িয়ে যায়, ঠিক জবাবও দেয় না।

তবু সুরমার মনে হয়েছে হয়তো তার খবরটা জেনেছে আর তাই নিয়ে চিন্তাও করে।

সুরমার জীবনে এটা ঘটবে কোনদিন তা নিজেও ভাবেনি সুরমা। কিন্তু যখনিই যেমন স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে এটাও ঘটেছে তার জীবনে তেমনি সহজভাবেই। তাছাড়া সুরমার সন্তানী মন বার বার চেয়েছে নোতুন কিছু পেয়ে তার মনের সব শূন্যতাকে ভরতে। সেই কারণেই সেদিন দীপককে দেখে তার মনে হয়েছিল এই লোকটিকেই যেন অনেকদিন ধরেই সে খুঁজেছে। ওর মুখ চোখ কথাবার্তা কণ্ঠস্বর এমনকি সেই হাসিটুকু পর্যন্ত তার মনে কি সাড়া আনে।

নরেশবাবুরই পরিচিত, তাঁর আপিসে নোতুন চাকরীতে ঢুকেছে দীপক। ক'মাসেই দীপক আপিসের কর্মী মহলে বেশ নাম করেছে। জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

নরেশবাবুর কদিন জ্বর, আপিস যেতে পারেনি। সুরমা সেদিন সন্ধ্যার মুখে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে এগিয়ে যায়। গলির মধ্যে ছোট্ট বাড়িটায় অন্ধকার নেমেছে। এদিকওদিককার পাড়ার উজ্জ্বল রোশনাই ওরে উঠেছে এখানের পরিবেশ। ঝাপসা হয়ে গেছে চারিদিক। কড়াটা নড়ছে।

সুরমা দরজা খুলে দিয়ে সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারার প্যান্ট পরা একটি ছেলেকে দেখে ওর দিকে অবাক হয়ে চাইল। হঠাৎ একটি মুহূর্তের এই ধোঁয়া ভরা প্রায়ান্ধকার পরিবেশের ওই চাহনি তার সারা মনের সব অন্ধকারগুলোকে আবছা আলোয় ভরিয়ে দেয়-যেন তমসাবৃত আকাশে কোথায় একটা উজ্জ্বল তারার চাহনি ফুটে উঠেছে। বাতাসে কিসের সুবাস জেগে ওঠে—মনমাতানো সেই মিষ্টি গন্ধটা তার বোধহয় অনেকদিনের চেনা, চেনা সেই গলার স্বর।

—নরেশবাবু আছেন? আমি তাঁর আপিস থেকে আসছি।

নরেশবাবু ওর গলার শব্দ শুনেই ঘরের ভিতর থেকে ডেকে ওঠে—দীপক নাকি। এসো এসো। ওরে সুরো ওকে এইখানে নিয়ে আয়।

সুরমার মুখের সেই চকিত ভাবটা কেটে যাচ্ছে, মুহূর্তের জন্য সুরমা যেন এই অন্ধকার জগতের অতলে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল যেখানে সে সন্ধান করেছিল এতটুকু আলোর আভাস।

—আসুন। সুরমা সেই ভাবটা কাটিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে।

ক্রমশঃ তার পরিচয়টাও জেনেছিল। নরেশবাবু খুশীতে ভরে ওঠে।

—বুঝলি সুরো দীপক ইংলিশ-এ এম-এ দিয়েছে এবার। ভালভাবেই পাশ করবে - আমি তো বলি সুবিধা সুযোগ পেলে কোনো ভালো কলেজে চলে যাও যদি। কি হবে এই কেরাণীগিরি করে?

সুরমা ওর দিকে চায়ের কাপটা তুলে দেবার সময় চাইল। নিজের অজানতেই ওর দুচোখের চাহনিতে ফুটে উঠেছে সুরমার মনের অতলের সেই জ্বালাটা, কি করুণ বিষণ্ণতার ছায়া মেশানো সেই চাহনি, এটা বোধ হয় দীপকের নজর এড়ায় না। নরেশবাবু পরিচয় করিয়ে দেয় আমার বন্ধু মেয়ে সুরমা।

—এই দেবার স্কলারশিপ্ পেয়েছিল না? দীপক প্রশ্নটা যেন নরেশবাবুকে নয় ওকেই করেছে। সুরমার মনের মাঝে একটা ঝড়ের সাড়া উঠছে ওটা দুরাগত ঝড়।

নরেশবাবু জবাব দেয়,

সে তো সুলতা এর ছোট। তার এখন পরীক্ষা চলছে, বোধহয় পড়াশোনার ব্যস্ত। দে সুরো—চা দে। কইরে সুলতা—

দীপক যেন হতাশ হয়েছে। সুরমার মনের সেই স্বপ্ন রেশটুকু কি বেসুরো একটা আঘাতে ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে। মনে হয় তার পরিচয় দেবার মত কিছুই নেই, সে নিঃস্ব, শূন্য। সুলতাই তার চেয়ে সবদিক দিয়ে অনেক বড়।

তবু দীপক ওর দিকে চেয়ে আছে। ওর ভাসর দু'চোখের চাহনির সামনে যেন কিছুই লুকোতে পারে না—লুকোনো যায় না।

সুরমা সরে গেল মনের চাপা রাগটা গিয়ে পড়ে বোনের উপরই। সুলতাও বাবার ডাকে এসে পড়েছে। সাদা মাটা একটা শাড়ি পরা ওর চেহারায় একটা অদ্ভুত আছে! দুহাত তুলে দীপককে সে নমস্কার জানালো।

সুরমার যেন এখানে আর করার কিছুই নেই। এখানে সে অবাঞ্ছিত। তাই চুপ করে বোনের দিকে আর একবার দীপকের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে কি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে, ঘের হয়ে এল সে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের কথাগুলো শুনছে সুরমা। মনে হয় দীপক বাবাকে দেখতে আসেনি, ওটা একটা অজুহাত মাত্র। আসলে সুলতার কথা শুনেছে তাই ওকে দেখতে, ওর সঙ্গে পরিচিত হতেই এসেছে।

তবু সুরমা দীপকের যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করতে এসেছিল। কারণ এঁদো গলির ওপাশেই যে সরকারী ডাইবিন। রাজ্যের এঠো কাঁটা ছাই জমে ওখানে। ঘেয়ো কুকুরগুলোও এসে জোটে। তারা এর ওর তাড়া খেয়ে দরজা খোলা পেলে বাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে তাই দরজাটা বন্ধ করে রাখতে হয়।

সুরমা শুনেছে দীপকের সঙ্গে বাবার কথাগুলো। সুলতার ইংরাজীটাও নাকি এক আধটু দেখাবার দরকার। তাই সময় পেলেই সে আসবে তাও নাকি জানিয়েছে সুলতাকে। দীপক দরজার কাছে এসেছে পিছু পিছু আসছে সুরমা। ওর মুখ-চোখ থমথমে। আজ মনে হয় সে নিদারুণ ভাবেই হেরে গেছে। তার মনের কোন সম্পদ নেই যা দিয়ে এমন একটি মানুষকে সে মুগ্ধ করতে পারে সেটা অতি সহজেই হয়তো সুলতা পারে।

—চলি! সুরমা ওর দিকে চাইল। দীপক বলে,

—আজতো আপনি ব্যস্ত, অন্য একদিন আপনার সঙ্গে এসে পরিচয় করা যাবে। খানিকটা জানিয়ে গেলাম আপনাদের।

এটা যেন নিছক ভদ্রতার কথাই। এর বেশী কিছুই নেই এতে। ওসব কথা বলতে হয় তাই বলা। সুরমার মনের সব উত্তাপটুকু উবে গেছে। শুকনো কণ্ঠে সে বলে না, না। আপনারই অসুবিধা হল এতখানি পথ আসাতে। অর্থাৎ ও যেন কষ্ট করে এসেছে। এমনি কষ্ট ভবিষ্যতে না করলেই ভালো হয়।

দীপক জবাব দেয়,

—কষ্ট কি? আমি তো এই দিকেই থাকি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেসে। চলি পরে দেখা হবে।

দীপক অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। তার সেই চকিত হাসিটুকু ভোলেনি সুরমা, ওটা ভুলতে চায় না সে। আরও কি সব ভাবছে। দরজাটা বন্ধ করে সরে এল।

রাত হয়ে এসেছে ঘুম আসেনা সুরমার। আজ যেন সুলতার পড়ায় বেশী মন বসেছে। সুরমা

সুলতার সঙ্গে দীপকের সেই কথাগুলো শুনেছে। ও যে বড় পণ্ডিত তাই যেন জানাবার জন্ত বেরিয়ে উঠেছিল মেয়েটি। সুলতা তার খেলায় ও যেন পড়া ছাড়া আর কিছুই জানেনা, অথচ আজ দেখেছে সুরমা সুলতার মনের সেই সোতটাকে। পুরুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার—জাহির করার এই ছাংলাপনাটা দেখেছে সুরমা।

আজ সুলতাকে মনে হয় ও যেন ইচ্ছে করেই তাকে সেদিক থেকে টেক্কা দিয়ে চলেছে! পদে পদে হার মানাতে চায় সুরমাকে। সুরমার কানের কাছে ওর পড়ার জানটা ভালো লাগে না। ওটা তার একটা মুখোসই। দীপকের মত বোকা-সোকা ভালো ছেলেগুলোকে ভোলবার একটা ছল মাত্র। সুরমা বিরক্তিভরা স্বরে বলে,

—রাত অনেক হয়েছে, আলো নেভা সুলতা ঘুম আসছে না নইলে।

সুলতা দিদির দিকে চাইল। এ যেন অন্ত কোন সুরমা।

নীরব রাগে তার দুচোখ জ্বলছে। সুলতা অবাক হয়েছে ওর কথায়। সুরমা বলে,—নে, আর ঢাঁট দেখাতে হবে না। শুয়ে পড়।

—সামনে যে পরীক্ষা! সুলতা বলে ওর কথায়। সুরমার মনের জ্বালাটা বারুদের মত ফেটে পড়ে। তার জন্ত তোর ভাবনা কি? দীপকবাবু তো বলে গেলেন তোকে ভালো ভাবে পাশ করিয়ে দেবেন। একেবারে বি. এ. পাশ করবি অনার্স নিয়ে, ভাবনা কি?

রাত হয়ে গেছে। তখনও ফেরেনি দীপক। আজ ক'বছর পার হয়ে গেছে। দিনগুলো এসেছে আবার ঝরাপাতার মতই ঝরে গেছে, কোন হিসাবই তার নেই। শুধু বছরের পর বছর এসেছে।

সুরমার মনে হয় একদিন সে ভেবেছিল সেই জিতেছে। অন্তরিক্তগুলোর শূন্যতা তাও পূর্ণ হয়ে উঠেছে একটি জয়ের আনন্দ। সুলতাকে সে হার মানিয়েছে একটা দিক থেকে। দীপককে সেই জয় করে নিয়েছিল, সে-ই দীপককে বিয়ে করেছিল।

সুরমাই মানুষটাকে আপন করে নিয়েছিল। অতীতের ঘটনাগুলো তার পুরুমনে সাড়া আনে আজও।

সুলতাকে পড়া দেখাবার জন্তই আসতো দীপক। সুরমা দূর থেকে দেখতো তাদের। দীপকের চোখের অতলে সেই অতৃপ্ত নেশাটার সন্ধান পেয়েছিল সেইই সুলতার চেয়ে ঢের বেশী আগে। নিবিড় একটি স্বপ্নের আবেশ জড়িয়ে তুলেছিল তার সারা মন। ক্রমশঃ মনে হয়েছিল সুরমার এই সেই মানুষ যার জন্ত এতদিন তার কাছে সবকিছু শূন্য আর অর্থহীন বলে বোধ হয়েছিল। নিজের এই সম্পদের কথা এতদিন জানতো না সে। মনে হয়েছিল সে সবদিক থেকেই হেরে যাবে। হঠাৎ মনে হয়েছিল হারবে না সে। পুরুষকে বশ করার মত একটা সম্পদ তার আছে। সেটা তার রূপ আর যৌবন। এইটার সন্ধান সে জানতো না এতদিন। নিজের দেহের দিকে চেয়ে অবাক হয় সে। তার দেহের অণুপরমাণুতে ফুটে উঠেছে নিটোল যৌবনের সাড়া, কাণায় কাণায় উপছে পড়া নদীর মত সে নেমেছে তাতে, নিটোল হাতের মাংসল ভাবটা পূর্ণতার রূপ নিয়েছে, চোখের চাহনিতে কি আয়ত্তিক মাদকতা। এ যেন জীবনের সব রস ভরা একটি অনাঘ্রাদিত পাত্র, যার ঘ্রাণ তার জীবনকে মাতিয়ে দেবে।

দীপকের মনের সেই তৃষ্ণাটাকে জাগিয়ে তুলেছিল সে।

সুলতা যা পারেনি—সেটা অতি সহজেই করতে পেরেছিল ওই সুরমা। দীপকের সারা মনের ও চোখের সেই তৃষ্ণাকে প্রত্যক্ষ করেছিল সুরমা, আর খুশিই হয়েছিল মনে মনে।

দীপককে সেইই বলেছিল কথাটা,

চাকরী ছেড়ে দিয়ে এবার প্রফেসারীও নাও তুমি !

দীপক ভালো ভাবে পাশ করেছে ! হায়ার সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছে এম. এ তে। বাইরের কোন কলেজে প্রফেসারীও পাচ্ছে। দীপক ইতঃস্তত করে কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে।

সন্ধ্যা নেমেছে। সুরমা ইতিমধ্যে ধীর পদক্ষেপে অনেকখানি এগে গেছে তার জীবনে। এই আসাটা ঘটেছিল অনেক সঙ্গোপনে, দীপকও জানতো না। তবু প্রায় সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে যাবার লোভ সে সামলাতে পারেনি। দীপক দেখেছে সুরমাকে প্রতিটি সন্ধ্যায় যেন ও ব্যাকুলচিত্তে তার পথ চেয়ে কাটিয়েছে। সুলতার মনে অন্য স্বপ্ন। সে বড় হবে এম. এ. পাশ করে ডক্টরেট করবে, হয়তো বাইরে যাবে।

দীপক দেখেছে সুলতাকে, মনের দিক থেকে ওই স্বপ্নটা তাকে নিদারুণে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক আর হিংসুটে করে তুলেছে। তার আর কোনো চাওয়ার স্বপ্ন নেই। সাধারণ নারী আর পুরুষের সম্পর্কটাকে যেন ভুলে গেছে সুলতা পড়া আর ওই বড় হবার ব্যাকুলতায়। দীপকের মন কোথায় একটা অঘাট পাথরের পাঁচিলে ঘা খেয়ে ফিরে এসেছে ক্ষতস্থান অতৃপ্তি নিয়ে।

তার নিজের কাছেই এটা বিচিত্র ঠেকে। মনের অতলের সেই ব্যর্থ কামনাটায় কোন সাড়া না পেয়ে দীপক হয়তো মুহূর্তে হয়েছিল, হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল ওই সুরমাকে।

সুরমার মন ভরে উঠেছিল সেইটুকুতেই। ও জানতো না দীপকের মনের সেই অতৃপ্তির সংবাদ। পুরুষ যে কাকে ভালবাসে তার হিসাব সেই পুরুষেরই অজানা। সামনে যা পায় কাছাকাছি হয়তো তাকেই গ্রহণ করে—কিন্তু সেইটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া কিনা সেই কথাটা ভাবে না সে।

সুরমা সে খবর জানবার দরকার বোধ করেনি। নিজের খুশীতে সে এগিয়ে এসেছিল দীপকের জীবনে। মাঝে মাঝে ওরা বের হয়ে যায় কলকাতা থেকে দূরে, গ্রামে সবুজের নির্জনতায় সুরমা আর দীপক হারিয়ে যায়। সুরমা একলা একান্ত করে পেতে চায় ওকে।

সুরমা তাই সুলতার পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় দীপককে কলকাতা থেকে দূরে চলে যাবে তারা।

তাই চল, মফঃস্বলেও অনেক ভালো কলেজ আছে। পরে কলকাতায় ফিরে আসতে পারবে।

দীপক কি ভাবছে। হয়তো সুলতার কথাই। সুলতা কৃতি ছাত্রী, তার কাছে দীপক চেয়েছিল আরও কিছু। কিন্তু সুলতার মনে সেই কৃতিত্ব আর বড় হবার স্বপ্ন তাকে নারীত্বের সামান্য পাওয়ার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। সুলতার কাছে দীপককে মনে হয়েছিল তুচ্ছ সেই পাওয়ার অনুপাতে।

সুরমা ভুলিয়ে নিয়েছিল সেই প্রত্যাখ্যাত দীপককে। সে আজ ক'বছর আগেকার কথা। দীপককে নিয়ে সরে গিয়েছিল সুরমা, সুলতা এম-এ পাশ করে ডক্টরেট এর জন্য তৈরী হচ্ছে। দীপকও সেই প্রত্যাখ্যানকে ভোলবার জন্যই সুরমাকে বিয়ে করে কলকাতা থেকে সরে গিয়েছিল।

রাতের অন্ধকারে হু হু বইছে বাতাস। কোথায় একটা রাতজাগা পাখী একবার ডেকে থেমে গেল। বাড়িগুলো অন্ধকারে থমথম করছে। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। অসীম প্রাণহীনতা যেন গ্রাস করেছে সমস্ত কিছুকে অন্তহীন নৈঃশব্দের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে।

একা রাত জেগে পথচেয়ে বসে আছে সুরমা।

দীপক এখন কলকাতার কলেজে প্রফেসারী নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। সুরমাও মনে মনে খুশী

হয় নি। মফঃস্বলের সেই নির্জন পরিবেশ থেকে কলকাতায় এসে মনে হয়েছে এই তাদের ঠাঁই। গ্রামঘেঁষা শহরের সেই সাধারণ মানুষগুলোকে সেই বদ্ধ সমাজকে ভালো লাগেনি সুরমার। সেখানে লাজলোভ বেশী করার কিছু নেই, বরং নানা কথাই ওঠে। তার আধুনিক ঢং-এ পেট বেরকরা শাড়ি এইটুকু ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে প্রকাশময় দেহসুষমাকে ওরা নিন্দার চোখেই দেখেছে। তাই নিয়ে নানা কথা উঠেছিল। সে সবকথা সুরমাতো শুনেছেই দীপকও শুনেছিল ওসব নাই বা পরলে। আর ওই হৈ হৈ ভাবটা একটু কমাও! ফ্লার্টিং কমই করো বাপু। জানোইতো আমরা সহর আর আমরা গাঁ এটা।

সুরমার সম্বন্ধে সেখানে নানা কথাই উঠেছিল, সে নাকি ওই কদর্য পোষাকে ছেলেদের নিয়ে সাংঘাতিক ক্লাব করার নামে তাদের মাথা খাচ্ছে মক্ষীরাণী সেজে।

সুরমা রেগে উঠেছিল সে সব কথায়। মনে হয় তার নিজের মনের সেই অদম্য নেশা আর লোভটা বেড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। দীপককে বিয়ে করেছিল জেদের বশেই, আর দীপক তার কাছে এগিয়ে এসেছিল নীরব জানাতয়া মন নিয়ে, সেখানে এছাড়া আর কিছুই ছিল না, এই ভুলটা তারা কেউই সেদিন টের পায়নি। টের পেয়েছিল অনেক পরে।

সুরমাকে তাই যেন দীপক সহ্য করতে পারে না।

সেই সহর থেকে চলে এসেছিল দীপক, সুরমার সেই ব্যবহারগুলোও তার অন্যতম কারণ। সুরমা ভেবেছিল এতদিনে সে দীপককে সম্পূর্ণভাবেই পেয়েছে। সেখানে সুলতার ঠাঁই নেই। তাই সাহস করে সে কলকাতায় ফিরেছে।

কিন্তু হতাশই হয়েছে সে।

সুলতা আরও নাম করেছে। সুরমা শুনেছে তার খ্যাতির কথা। ডক্টরেট হয়েছে। বাইরে যাবে শীঘ্রই; সুলতা ধীরে ধীরে খ্যাতির শিখরে উঠেছে।

সুরমাও শুনেছে সব। সুলতা তবু একবার আসতে পারেনি তার কাছে। সুরমার মনে হয় ভেতেনি সে—হেরে গেছে পদেপদে। যা পেয়ে ভেবেছিল অনেক কিছু পেয়েছে সেটাকেও মূল্যহীন বলেই বোধ হয়। দীপকও তাকে অবহেলা করে, চরম অবহেলার অপমান ওই সুরমাকে তিলেতিলে নিঃশেষ করে এনেছে। মনে হয়েছে কলকাতায় না ফেরাই ছিল ভালো। তবু দীপককে কিছু বলতে পারেনি সে।

কিছু দিন থেকে দেখেছে দীপকের এই অবহেলাটা চরমে উঠেছে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে সুরমা আজই একটা হেস্ত নেস্ত করবে। দীপক এতদিন তাকে এড়িয়ে গেছে, আজ আর সে সুযোগ দেবে না। সুরমার সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে গেছে, মা হতেও পারেনি সে। রুক্ষ হয়ে গেছে। পদে পদে হেরে গেছে সে। কোনো সফলই তার নেই যা দিয়ে এই অভাবটাকে পূর্ণ করতে পারে সে।

চাবিটা খেয়েছে নাম্বছে—দীপক। ওর চোখেমুখে খুশির আভাস। স্তব্ধ হয়ে রুদ্ধশ্বাস আগ্নেয়গিরির মত দাঁড়িয়ে আছে সুরমা, যে কোন মুহূর্তে সে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে খান খান হয়ে ফেটে পড়বে। আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে অতৃপ্ত পরাজিত একটি নারী আর বিপরীতধর্মী কোন পুরুষ।

—এত রাত্রি হ'ল?

দীপক কি পূর্ণতার উজ্জ্বলতায় উপছে পড়ে। ওকে দেখছে সুরমা। বলে ওঠে দীপক, এ্যামেরিকার সেই চানটা পেয়েছি সুরমা। লেকচার-টুরএর সুযোগটা এসে গেল। সুলতাও চলেছে বুঝলে সুরমা, ওর চেষ্টাতে এটা ঘটে গেল।

সুরমার চোখের সামনে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, কোথায় বোধ হয় প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়েছে। কাঁপছে চারিদিক। ওর পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

এতদিন ধরে ওদের কাউকে চিনতে পারেনি। সুলতা—দীপক ওরা সবাই তাকে শুধু ঠকিয়ে এসেছে। হেরে গেছে সুরমা তার সব হারিয়েছে কি দুর্বার আঘাতে। এতদিন শুধু কানাকড়ি নিয়ে তার সঞ্চয়ের পাত্র বোঝাই করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। সেই রাশ রাশ প্রতিবাদের কাটির কোন বিরাট পরাজয়ের আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে, অসহায়ের মত কাঁদছে ব্যর্থ-পরাজিত একটি নারী।

ওরা কেউ কাউকে ভালোবাসেনি—ভালবাসতে পারেনি। ওরা ভালবাসতে ভুলে গিয়ে শুধু অভিনয়ই করে এসেছে।

রাতের অন্ধকারে সবকিছু হারিয়ে গেছে, কোথাও এতটুকু ভাষার আলোর নিশানা নেই।

• • • •

ইলিউডে ষ্টুডিও'র কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরছিলেন চিত্রপরিচালক ডিকি কলিন্স। মনে তাঁর নৈরাশ্যের মেঘ,—ছবিটার উপযুক্ত নায়িকা ত পাওয়া যায় নি,—কাজ চালিয়ে নেবার মত নায়িকা অবশ্য পেয়েছেন তিনি, কিন্তু ওতে মন উঠছে না তাঁর।

পথের পাশে একটা ক্লাব। অতরাত্রেও সেখানে হৈ-হুল্লোড়!

ডিকি ঢুকে গেলেন ক্লাবে। তখন ষ্টেজে নাচ চলছিল আর দর্শকদের মধ্যে বিয়ার পরিবেশন করছিলেন একজন তরুণী।

ডিকি লক্ষ্য করছিলেন তরুণীকে। একটা দৃশ্যে কতকটা এই রকম সুটিং আছে তাঁর। সেখানে বিয়ার শুদ্ধ ট্রে উলটে দেবে নায়ক।

তরুণী কাছে আসতেই ডিকি আচমকা মারল তাকে এক ধাক্কা। ট্রে উল্টে গেল, আর তরুণীও মারল তাঁকে কষে এক চড়।

—পেয়েছি—পেয়েছি চেঁচিয়ে উঠলেন ডিকি। আর মোটা টাকায় চুক্তি করলেন সেই তরুণী মার্লিন ডিট্রিচ-এর সঙ্গে।

একটি ছুটির দিনের দুপুর

রামেন্দ্র পাল

সুধাকান্ত ছুটির দিনের দুপুরটা বেশ আয়াস করেই উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। হাতের কাছে পানের ডিবে, বালিশের ওপরেই খবরের কাগজ। তার ওপর মাধবীও অনতি দূরে বসে বসে নিবিষ্ট মনে কী যেন লিখছিল।

সুধাকান্ত ডিবে থেকে একটা পান মুখে গুঁজে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, কী লিখছ? প্রেমপত্র?

মাধবী মাথা না তুলেই গম্ভীর গলায় উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—কাকে জানতে পারি?

—বেয়াই মশাইকে।

—বেয়াই মশাই!

—হ্যাঁ, অবাক হচ্ছ যে বড়ো? তপনের ভাবী শ্বশুর—ভুলে যাচ্ছ নাকি?

মুহূর্তে সুধাকান্তর রসিকতা করার স্পৃহা উবে গেল।

মাধবী তখন কলম রেখে স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণ তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্নেহের সুরে বলতে লাগল—তা ভুলে থাকাই ভালো। রাগুর বাবা তো কম শুনিয়ে যান নি! ঠিকই বলেছেন তিনি—মেয়ের পেছনে কেউয়ের মতো লেগে থাকা কেন, ক্ষমতা থাকে বিয়ে করুক।

মাধবী একটু থামল। তারপর স্বর বদলে বললে, ভদ্রলোককে আমি মনে মনে নমস্কার করেছি! যোগ্য জবাব দিয়েছেন অসভ্য রকবাজ ছেলের বাপকে!

বলেই দুপুরের বসন্ত বাতাসকে ভারী করে দিয়ে গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আজকের এই দুপুরের বিশ্রম্ভালাপের পূর্বে আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল।

বেশ কয়েকবার বাড়ি বদল করে সুধাকান্ত শেষ পর্যন্ত আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা গলিতে এসে উঠেছেন। দেখতে দেখতে সেও আজ বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল।

কিন্তু এ কি বাড়ি—না বাড়ির জীর্ণ কংকালের একটা অংশ? দোতলা তেতলায় অসংখ্য ভাড়াটে। ভাগ্য যাদের ভালো তারাই আগে দোতলা তেতলার ঘর পেয়ে গেছে। আর কিছু নয়, ওপরে উঠলে তবু একটু আলো—একটু রোদ পাওয়া যায়। কিন্তু নীচের তলায় ঘর ক'খানিতে রোদ আলোর বালাই তো নেইই—উপরন্তু আছে বর্ষার দুর্গন্ধ কলতলার স্যাওলা-পিছল বাতায়াতের পথে ভাড়াটেদের সঙ্গে প্রতিদিন দুবেলা সংঘর্ষ, আর আছে বর্ষার দিনে উঠোনভর্তি ঘোলা জলে সাঁতার কাটা।

এও সহ্য হয়, কিন্তু ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠেছে ঘরের সমস্যা।

একখানি মাত্র ঘর। অথচ মানুষ ছ'জন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন আর ছেলেমেয়েতে চারটি। তার মধ্যে বড়ো ছেলে তপন। তাকে নিয়েই সমস্যা। বি. এ. পড়ছে। এই ঘরের মধ্যে সেই যেন এক উদ্ভট সমস্যা।

কর্তার বয়েস হয়েছে, একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে—তার ওপর তিনি গৃহকর্তা! কাজেই ঘরের এক-চতুর্থাংশ জুড়ে যে পুরনো খাটখানা তা তিনিই অধিকার করেন। সঙ্গে অবশ্য মেজো মেয়েটাকে নেন। আর মাটিতে শোয় মাধবী, বড়ো মেয়ে আর ছোটো ছেলেটিকে নিয়ে।

কিন্তু তপন? সে যে সর্বত্রই বেমানান। কোথাও তাকে যেন ধরে না—খাপ খায় না। তাই তার জায়গা হয়েছে ভাঁড়ার ঘরে।

এটি সত্য একখানি জায়গা। কাঠ দিয়ে পার্টিসান করা। একদিকে রয়েছেন সিংহাসনে নারায়ণ শিলা। তার ওপরেই দেয়ালে টাঙানো লক্ষ্মীর ছবি, কালিঘাটের কালীর ছবি, পুরীর জগন্নাথ দেবের ছবি, তারকেশ্বরের ছবি। সবগুলিতেই সিঁদুর চন্দনের প্রলেপ। পুজোয় বাদ পড়ে না কোনোটিই। আর এক পাশে র‍্যাসানের চাল রাখার টিনের বাক্স। হাঁড়িতে নরাচাকা ভাল, কিছু পাটালি গুড়, হরলিক্সের শিশিতে আমের আচার।

উত্তরের জানলার কোণ ঘেঁষে কাঠের একটা সেল্‌ফে পড়ার বই। অধিকাংশই তপনের। এছাড়া এই ঘরের মধ্যেই মেয়েদের কাপড় ছাড়ার ব্যবস্থা। বেশিরভাগ সময়েই ছাড়া কাপড় পড়ে থাকে মেঝের এক কোণে। তপনের শোবার জায়গা শেষ পর্যন্ত এই ঘরেই হয়েছে। মেঝের ওপর মাদুর পেতে শোয়। কিন্তু স্বাভাবিক পা ছড়াতে পারেনা। লম্বা মানুষের দুর্গতি যে কত রকমের তার ঠিক নেই।

শোবার অসুবিধে নিয়ে তপন কখনো কিছু বলেনি সে কেবল মায়ের কাছে গজ্‌ গজ্‌ করত—পড়বার একটু জায়গা নেই, বই রাখার টেবিল নেই পাস করবে না ছাই!

মাধবী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। তার নিজের মনেও ক্ষোভ কম নয়। সে মফস্বলের মেয়ে। নিজের বাড়ি। হোক একতলা বাড়ি—কিন্তু ঘর ছিল, উঠোন ছিল, ভিজে কাপড় মেলে দেবার, একগাদা বিছানা রোদ্দুরে দেবার মতো ছাত ছিল। সেই ছাতে বা উঠোনে ছোটোবেলা ভাইবোনে হুটোপাটি করে খেলা করেছে। আর আজ তার নিজের ছেলেমেয়েরা?

এই নিয়ে সে বারে বারে স্বামীকে খুঁচিয়েছে—একটা ভালো বাড়ি দেখো। এখানে তো আর থাকা যায় না।

সুধাকান্ত যেমন স্ত্রীর অনেক কথারই জবাব দেন না—এক্ষেত্রেও তেমনি নীরব রইলেন।

রাগ হয় মাধবীর—প্রচণ্ড রাগ হয়। কিন্তু সামলে নেয়।

সে জানে, স্বামীই বা কী করবে? ইচ্ছে করলেই তো আর বাড়ি সংগ্রহ হয়ে যায় না। অনেক সমস্যা।·····দিন দিন লোকসংখ্যা বাড়ছে, পাকিস্তান থেকে যেদিন যারা ছিন্নমূল হয়ে এসে পড়েছিল আজ তারা অনেক চেষ্টায় অনেক পরিশ্রমে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে। আর স্টেশনের চত্বরে বা ফুটপাথে পড়ে থাকা নয় এখন তারাও যথার্থ নাগরিকের মতো জীবন যাপন করতে চায়। তাই সর্বপ্রথম চাই মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই।

অসাধু বাড়িওলারা এই সুযোগটি পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। 'সেলামী' বলে যে একটি অদ্ভুত দাবী করে হয়ে, মাধবী জানে, তার স্বামীর মতো একান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরানীর পক্ষে তা যোটানই সম্ভব নয়। তার পর একটি ঘর খালি হলেই পাশের ভাড়াটে সে ঘরখানি দখল করার স্বাভাবিক অধিকার জন্মিয়ে বসে।

তবু—

তবু মাধবী আর এভাবে থাকতে পারছেনা। সে স্বামীর কাছে যেন একটু সান্ত্বনা চায়—একটু আশা চায় একটু সমবেদনা চায়।

তার যেন মনে হয় সে নিজে যেভাবে ঘরের জন্যে ব্যাকুল তার স্বামী সেরকম নয়। মুখেও একটু সমর্থন জানায় না। চেষ্টা করা তো দূরের কথা।

তার যেন এমনও মনে হয় স্বামী তার বোধ হয় স্বার্থপর। সারা দিন কাটে আফিসে, ফেরে বেশ একটু রাত করে—সন্ধ্যের মধ্যে কিরলে ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে একটু বসতে পারে সেটুকুও করবেনা। তার পর বাড়ি এসেই 'পালঙ্কে শয়ান'। সংসারের সমস্যার দুচারটে কথা বলতে চাও কেউ শুনতেই পাবেনা।

এই নিয়েই সেদিন মাধবী স্বামীকে একটু খোঁটা দিয়েছিল। এই নিয়েই অশান্তির সূত্রপাত।

ছুটির দিন। বেলা আটটা পর্যন্ত 'পালঙ্কে' গড়াগড়ি দিয়ে দুবার চা খেয়ে হঠাৎই সুধাকান্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন—তপনকে দেখছি না যে?

ইচ্ছে করেই মাধবী প্রথমে জবাব দেয়নি।

সুধাকান্ত একটু যেন বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, তপনের গলা পাচ্ছিনা। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে নাকি?

মাধবী ফুটন্নো ফুটছিল। বঁটি থেকে মুখ না তুলেই বললে, তুমি কি ওর কথা কখনো ভাব?

সুধাকান্ত হেসে বললেন, বাবা যখন, তখন ভাবতে হয় বৈকি!

—বুঝতে তো পারা যায় না।

সুধাকান্ত দার্শনিকসুলভ হাসি হেসে বললেন, কারো ভাবনা সরব, কারো নীরব। আমি শেষের দলে।

—হ্যাঁ, নীরব থাকাটাই নির্ঝঞ্ঝাট। কিন্তু মুশকিল কী জান? আমার নীরব থাকলে চলে না। যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম ভাঙাবার জন্যে চেঁচামেচি করতে হয়।

সুধাকান্ত হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আমি জেগে ঘুমোই নাকি?

—নইলে কি জানব কত দুঃখে আজ ছেলেটাকে পরের বাড়ি দিয়ে পড়াশোনা করতে হচ্ছে?

সুধাকান্ত অবাক হলেন। বললেন, পরের বাড়ি যেতে হচ্ছে কেন?

—কী করবে? জায়গা কই? 'পড়াশোনা তপস্যা' এ কথা তো বলেই আমরা খালাস, কিন্তু তপস্যারও তো একটা পরিবেশ চাই।

সুধাকান্ত বললেন, পড়াশোনায় মন থাকলে পরের বাড়ি কেন, রাস্তায় বসেও পড়া যায়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর তার দৃষ্টান্ত।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে কিনা যতদূর জানি, বিদ্যাসাগর মশায়ের বাবা নিজে পালঙ্কে শুয়ে আরাম করতেন না।

এ কথায় সুধাকান্তর মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু তিনি সহজে রাগ প্রকাশ করেন না; বিশেষ, স্ত্রীর কাছে। কারণ তিনি জানেন ছুটির একটা দিন ঘরোয়া অশান্তিতে কাটলে লোকসান তাঁরই। তাই রাগ প্রকাশ না করে সুস্থ হাসির আবরণে ধীরে ধীরে বললেন, পালঙ্কে শোবার সুখটা দেখছি তোমাদের সকলেরই চোখে লাগে। তা বেশ আজই না হয় আজ থেকে মাটিতে শোব, তুমি কিম্বা তপন খাটে শুতে পার।

এ কথায় মাধবী লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। সে কি এই ভেবেই কথাটা বলেছিল?

ছি ছি ছি। মুখে অনুতাপ প্রকাশ করতে না পেরে চোখের জলে প্রায়শ্চিত্ত করল। বললে, মাপ করো, খাটে শোবার লোভ আমার কোনোদিন ছিল না, আজও নেই। আমি শুধু ছেলেটার কথা ভেবেই বলেছি। তাও খাটে শোবার সুপারিশ করিনি। আমি বলতে চাই, তুমি উঠে পড়ে একটু লাগো, একটা ভালো বাড়ি দেখো। আর কিছু নয়, দুখানা ঘর হলেই চলবে। নইলে যে ছেলেটা—

মাধবী কথা শেষ করতে পারল না। কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হল।

এইবার সুধাকান্ত ভুল করলেন। তিনি সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, তপনের জন্যে এত ভাবছ কেন? পুরুষ মানুষ—বাইরে বাইরে যত থাকে ততই ভালো—ততই বাস্তব জীবনকে জানতে পারবে।

এ কথায় মাধবী তার সমস্ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। উত্তেজিত হয়ে বললে, তার মানে তুমি চাও ছেলেটা বাউণ্ডুলে হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াক? বাড়ির সঙ্গে তার এখন থেকেই সব সম্পর্ক ঘুচে যাক?

কথা শেষ করে মাধবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো।

আশ্চর্য, সুধাকান্ত সে কথার কোনো প্রতিবাদ তো করতে পারলেই না, বরঞ্চ অপরাধীর মতো চোখ নিচু করে রইল।

এমনি সময়ে ঝড়ের মতো উত্তেজিত অবস্থায় তপন ঘরে ঢুকল। রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে, দু'চোখ লাল, মুখটা থেকে এই বয়েসেই সব ভাবনা যেন কিসে শুষে নিয়েছে, শক্ত চোয়ালে না কামানো দাড়ি—। সব জড়িয়ে দেখলে মনে হয় যেন ভদ্রসমাজে নিজেকে সগর্বে অচল বলে সে ঘোষণা করতে চাইছে।

ঘরে ঢুকেই মাকে কঠিন স্বরে বললে, রাণুর বাবা তোমাদের কী বলেছে শিগ্‌গির বলো।

ছেলের অবস্থা দেখে মাধবী শিউরে উঠল। বললে, কেন?

—কী বলেছে শুনতে চাই। আমি দেখে নিচ্ছি কী রকম ভদ্রলোক। আর এ পাড়ায় কী করে মেয়ে নিয়ে থাকতে পারে।

মাধবী শান্ত সুরে বললে, ছেলেমেয়ে বড়ো হলেই অনেক কিছু ঘটে। ও কিছু নয়।

সুধাকান্ত অনেকক্ষণ থেকেই স্ত্রীর ওপর চটে ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন মা আর ছেলেতে মিলে তাঁর বিপক্ষ পার্টি হয়েছে। তিনি যে তাদেরই জন্যে এত পরিশ্রম করছেন সে কৃতজ্ঞতা বোধটুকু এদের কারো নেই উল্টে তিনি খাটে শোন বলে সকলের হিংসে।

তাই ছেলের এই উদ্ধত আচরণে তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। চেঁচিয়ে উঠে বললেন, হারামজাদা ছেলে, ভদ্রলোকের মেয়ের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবে আবার উল্টে চোখ রাঙানো? বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—বাড়ি থেকে।

তপন বাপের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখনই বেরিয়ে যাচ্ছিল, মাধবী খপ্ করে তার হাতটা চেপে ধরল।

তপন গর্জে উঠে বললে, ছেড়ে দাও বলছি।

মাধবী স্নিগ্ধ স্বরে বললে, আয় এঘরে, কথা আছে।

পাশের ঘরে গিয়ে তপনের মাথায় হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে বললো, শোন্, এক পাড়ায় ছেলেমেয়ে তোরা। রাণুকে আমিও কম ভালোবাসি না। ওকে দেখছি সেই এতটুকু বয়স থেকে। ওর যদি কোনো কোনোরকম অনিষ্ট করে তা হলে ওর মায়ের মতোই আমার তা লাগবে।

একটু থেমে বললে, আর ওঁর কথায় রাগ করিস নে বাবা। অভাবে অভাবে মানুষটা দিন দিন

খিটখিটে হয়ে থাকে। এরই মধ্যে শুধু তোর কথা ভেবে—তোর একটা আলাদা পড়ার ঘর না হলে কি চলে? —উমি মিত্তে দুটো বাড়ি দেখে এসেছিলেন। কিন্তু যা ভাড়া চাচ্ছে তাতে তো আমাদের মতো লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। কী যে করি—

তপন এ কথারও উত্তরে হাঁ, না কিছু বলল না। মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে রইল।

মাধবী বললে, বেলা হয়েছে যা চান করে নে।

তপন উদ্ধত স্বরে বললে, না আমি চান করব না।

মাধবী শান্ত সুরে বললে, কী খ্যাপা ছেলে রে! আমি মরছি খিদেয়—

—তা তুমি খাও গে না।

—ওমা! তোদের না খাইয়ে আমি কখনো খেয়েছি?

তপন এর কোনো উত্তর দিলনা বটে তবে ভুরু কুঁচকে যেন নিতান্তই বিরক্ত এই ভাবে জামা খুলতে চলে গেল।

আজকের বহুপ্রত্যাশিত ছুটির দিনের এই সকালবেলাটিতে অশান্তি শুরু হয়েছিল, সুখের বিষয় মাধবীর উপস্থিত বুদ্ধিতে চরম পরিণতি লাভ করতে পারেনি। বোধ হয় সেই কৃতজ্ঞতা বশতই সুধাকান্ত মধ্যাহ্ন ভোজনের পর স্ত্রীর সঙ্গে একটু রসিকতা করতে গিয়েছিলেন।

কিন্তু স্ত্রীচরিত্র কে বুঝবে? অথবা বুড়ো বয়েসে প্রেমপত্রের রসিকতা বড্ড বেশি ভুল মনে হয়েছিল। মাধবী তা সহ্য করতে পারেনি। তাই সামান্য একটি কথার উত্তরে স্বামী এবং পুত্র দুই অপরাধীকেই বিদ্ধ করে কক্ষান্তরে চলে গেল।

সুধাকান্ত এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মনে পড়ল মাত্র কয়েকদিন আগেই রাণুর বাবা তাঁর কাছে তপনের নামে নালিশ করে গিয়েছিলেন। নালিশের সুরে কঠোরতা ছিলনা বরঞ্চ কিছু পরিমাণে মিনতির আধিক্যই ছিল।

'—মেয়ের পেছনে ঘুরে লাভ কী? ক্ষমতা থাকে বিয়ে করুক।'

মেয়ের বাবার এই কথাটাই বার বার তাঁর মনে বাজতে লাগল।

—না, তপনের ক্ষমতা নেই। আপাতত সে ছাত্র, পাস করলেও সে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাবে এমন নিশ্চয়তা নেই, বাপেরও এমন সঙ্গতি নেই যে ছেলের বিয়ে দেয়। আর সবচেয়ে বেটা তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধল সেটা হচ্ছে ঘরে ছেলেরই ঠাঁই নেই!

সুধাকান্তর ঘুম হল না। আয়েস করে কাগজ পড়াও হল না। বিছানা ছেড়ে উঠলেন। একটু সন্ধান করে দেখতে চান মাধবী কোথায় গেল।

টেবিলের কাছে আসতেই মাধবীর পরিত্যক্ত চিঠির প্যাডটার ওপর দৃষ্টি পড়ল।

না, চিঠি কাউকে মাধবী লেখেনি। আপন মনে আঁকছিল একটা সুন্দর বাড়ির নক্সা। অনেকখানি জায়গা—অনেকগুলি ঘর—প্রচুর আলো বাতাস, চারিদিকে ফুলের বাগান!

হায় এ ছবি কেন?

হয়তো মাধবীর সহজাত অমন চর্চার সঙ্গে ছোটবেলায় এমনি একটি সংসারের কল্পনাও ছিল।

চোখ

সরল কুমার মুখোপাধ্যায়

চিরুণী হাতে নিয়ে টেবিল আয়নাখানার সামনে দাঁড়িয়ে মনটা হাসি-হাসি হয়ে উঠল কণিকার, আর তখনই চোখ পড়ল বাঁ পাশের জানলাটা দিয়ে একটু দূরের যেন বাড়ীটার দোতলার জানালায়,—সারা গা যেন জ্বলে উঠল,—সেই দুটো চোখ—কালো একটা ভারী গোল মুখের মাঝে। ধড়াম করে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে।

হালানে দাঁড়িয়ে রাগে যেন জ্বলতে থাকে, দুলতে থাকে তার সারা শরীর সজোরে কামড়ে ধরে ঠোঁটটাকে—নির্লজ্জ, ইতর, ছোটলোক—

পাশের ঘর থেকে এই সময় মধু বেরুল, ওকে ঐ অবস্থায় দেখে বুঝতে পারল সব। বলল—কী, আবার সেই চোখ?

—ওঃ, আর পারি না বৌদি, যখনই আয়নার সামনে দাঁড়াব—সকালে বিকেলে তখনই—ঘরটা কাঁদো কাঁদো হয়ে যায় তার; নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে—ইতর, ছোটলোক, জানোয়ার কোথাকার,··· চোখ তো নয়, যেন গিলে খাচ্ছে. ইচ্ছে করে, চুলের কাঁটা দিয়ে গেলে দিই চোখ দুটো। বাঁদর একটা, রাক্ষস, সাত জন্মে যেন মেয়ে দেখে নি!

—দেখেছে গো, দেখেছে বলেই তো চেয়ে থাকে।—পাকা গলায় বলে মধু পিছন ফেরে।

—'চেয়ে থাকে'। চেয়ে থাকাবো—(হেসে ফেলে মধু) না না, তুমি হেসো না বৌদি, সত্যি, এর একটা বিহিত করা দরকার।

—বিহিত আর কী করবে? জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে আমার ঘরে গিয়ে সাজো। রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায় মধু।

—কেন তোমার ঘরে গিয়ে সাজবো?—রাগে দুঃখে বিরক্তিতে চীৎকার করে ওঠে কণিকা; মধুর নিস্পৃহতা ভাল লাগে না ওর।

দাঁড়িয়ে পড়ে মধু, বিস্মিত হয়—তবে কী করবে?

—দাদাকে বলব, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

—ওকে বলে কিছুই হবে না। ওটা মেসবাড়ী—ওর বাবাই ঐ রকম।—আবার পা বাড়ায় মধু।

—কিছু হবে না? কিছু করতেই হবে। কেন চেয়ে থাকবে ও অমন করে আমার দিকে—মেয়ে কি আর কোথাও নেই?—জ্বালা ধরে পড়ে কণিকার কণ্ঠে।

মধু থামে, ওর দিকে ফিরে একবার তাকিয়ে বলে—হুঁ।

—কী 'হুঁ' ?—চীৎকার করে ওঠে কণিকা।

—তাই তো ভাবছি।—গম্ভীরভাবে বলে মধু, যেন চিন্তিত রেখার ওকে।

কী ভাবছ ?···বলো,···বলো, এই বৌদি।—অধৈর্য হয়ে ওঠে কণিকা।

—ভাবছি,—বেশ গম্ভীরভাবেই বলে মধু,—চেহারাটা আমার মতো হলে অবশ্য ডাকাতো না।

টাল পড়ে কণিকার কৌচকান ভ্রুতে, ঘর যায় কেঁপে—আর জ্বালিও না বলছি বৌদি—।

পা বাড়ায় মধু রান্নাঘরের দিকে,—তুমিও আর বকিও না আমাকে, উনুন জ্বলে গেল—।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে চকল পায়ে পাশের ঘোরের দিকেই ফিরল কণিকা।

কিন্তু প্রতিদিন কী করে এ অত্যাচার সহ্য করা যায়। এক রাতে কণিকা কথাটা তুলল দাদার কানে। কিন্তু সত্যি হল না কিছু। জয়ন্ত সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে চুপ করে থেকে বলল,—কী আর হবে একটা মোটা বড় পর্দা ঝুলিয়ে দিস জানলায়।

ঝুলল মোটা পর্দা—বড় পর্দা। কিন্তু কোলকাতার নীচের তলার আঁধার-ঘরে আলো-হাওয়া আসার জন্যে পর্দার ওপরে একটু ফাঁক রাখতেই হয়। আলো-হাওয়ার লোভ অনেকখানি ছেড়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল কণিকা; তবু সেই ফাঁক দিয়েও দেখতে পায় সে চোখ দুটো—গোল কালো একখানা ভারী মুখের মাঝে। আর এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, আয়নার সামনে দাঁড়ালে চোখ দুটো একবার ঘুরে যাবেই ঐদিকে।

কিন্তু একদিন অবাক হতে হল কণিকাকে।

বড় মোটা পর্দাটা ঝোলান থাকত—ছিলও, আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই চোখদুটো আড়দৃষ্টিতে ওপরের ফাঁকটা দিয়ে চলে গিয়েও ছিল, তবু অবাক হয়েছিল কণিকা জানালাটা যে বন্ধ! বন্ধ—সরে গেল সে পর্দার গায়ে—হ্যাঁ, তাই তো, বন্ধই—।

শুধু একদিনই নয়, পরপর তিনটে দিন বন্ধ রইল জানালাটা। তাই কথাটা বলতেই হল বৌদিকে কাকেই বা আর বলবে ?

—তাই নাকি!—সত্যি বিস্মিত হল মধু—বাঁচা গেল, কী বলো ? (কী আর বলবে কণিকা)—হয়তো ভদ্রলোক দুটি দিনে বেড়াতে গেছেন, কিংবা হয়তো অসুখ হয়েছে—বাড়ী গেছেন।

—ভাল হয়েছে, মারা গেলে আরো ভাল হয় বাঁচা যায়। বলে ওঠে কণিকা।

—আহা, অমন কথা বোল না। কারো মৃত্যু কামনা করা উচিত নয়।

—কেন বলব না ? গেছে ভাল হয়েছে আর যেন ফিরে না আসে, মরুক মরুক মরুক।—চিরুনীটা মাথায় বসিয়ে ঘরে ঢুকে যায় কণিকা।

গেল আরো বেশ ক'টা দিন। জানালাটা বন্ধই রইল। কণিকার চোখদুটো গেল আর ফিরে এল।

তারপর একদিন শুরু করে উঠল কণিকার বুকের ভেতর—জানালা খোলা! শির্-শির্ করে উঠল আবার গায়ের মধ্যে। কিন্তু—কিন্তু চোখদুটো তো নেই! সন্তর্পণে পর্দার কাছে এগিয়ে গেল সে, বড় মোটা পর্দাটা একটু সরিয়ে স্পষ্ট চোখে তাকালো,—না, নেই। কিন্তু যে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে! তীক্ষ্ণ হল দৃষ্টি—হ্যাঁ, কয়লা মতো চেহারা।

অন্ত লোক। অন্ত লোক এসেছে ঘরে। বাঁচা গেছে বাঁচা গেছে,—মনে মনে বলল কণিকা,—আজ খুব করে সাজবো—নিশ্চিন্তে সাজবো।

টেনে একেবারে সরিয়ে দিল পর্দাটা, জানালাটা খুলে দিল হাট করে,—ঘরে ছুটে এল আলো, আর ও ছুটে এসে আয়নার কাছে চিরুনীটা জোরে জোরে চালাল চুলের মধ্যে দিয়ে।

আড়চোখে দেখল কণিকা— ও-ঘরের ভদ্রলোক ঘুরতে ঘুরতে জানালার কাছে এলেন। হাত থেমে গেল কণিকার, তাকিয়ে রইল সে. দেখল,—কচলা টকটকে রং—চোখে চশমা—মাথায় টাক—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা! ভদ্রলোক কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন, তাঁর কথার টুকরো শোনা গেল,—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে ভাই, জন্ম-মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না, ও সব তাঁরই ইচ্ছা—

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে কণিকা। হঠাৎ ভদ্রলোকের চোখ পড়ে এদিকে—ভুরু কুঁচকে গেল, তারপর তিনি তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

দাঁড়িয়ে থাকে কণিকা—দাঁড়িয়ে থাকে। কেমন যেন একটা উল্লাস জাগে তার বুকের মধ্যে—যেন চীৎকার করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হয়। বলে ওঠে—সাজবো, আজ খুব করে সাজবো—যেমন খুশি সাজবো। নিজেকে এলোমেলো করতে চায় সে।

কিন্তু—হঠাৎ হাত দুটো যেন অবশ হয়ে যায়—কেমন যেন একটা বিশ্রী অস্বস্তি হতে থাকে। কতগুলো কথা বিশ্রীভাবে মনে উপস্থিত হয়—ওরই বলা কথা—খুব খারাপ লাগে মনের মধ্যে—যেন জ্বালা করে ওঠে। চিরুনীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায় ও জানালার কাছে, তারপর জানালাটা সজোরে বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। না, কিছুতেই পারবে না সে আজ সাজতে—।

• • • •

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে না গিয়ে কি ভাবতে ভাবতে চলছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরী। দারুণ শীতের রাত, তাঁর গায়ে শুধু একটা পশমলোমের ভারী ওভার কোট। হঠাৎ তাঁর মনে হোল কে যেন তাঁকে অনুসরণ করছে।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে মিস্ এলেন প্রশ্ন করলেন—"কে আপনি? এমন পিছনে পিছনে আসছেন কেন?

—একটা কথা বলবার জন্য। লোকটি এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

কি কথা বলুন—কঠস্বরে প্রশ্ন করলেন মিস্ এলেন।

—আপনি যখন ষ্টেজে অভিনয় করছিলেন তখন আপনার স্বামী আপনাকে ছুরি মারে—চমৎকার অভিনয় করেছিলেন আপনার স্বামী—কিন্তু আপনি একটুও চেঁচালেন না কেন? আমি যখন আমার স্ত্রীকে ছুরি মেরে, মেরে ফেলি তখন কিন্তু সে যন্ত্রণায় খুব চেঁচিয়ে ছিল।

এলেন টেরী আর দাঁড়ালেন না, তাড়াতাড়ি পা চালালেন।

যে কাহিনী চিরকালের

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ঃ রমেশচন্দ্র

সুজন রায়

রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় নাম। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরূপে পরিগণিত। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থে তিনি শিবাজীর যে মহান চরিত্র অঙ্কিত করেছেন, দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করবার জন্যে শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক কর্মকৃতির যে বাণী আর আদর্শের রূপায়ণ করেছেন তা যেমন প্রেরণাদায়ক তেমনি রোমাঞ্চকর। এই সংখ্যা পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্যে বীর বিপ্লবীদের নানা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা, নানা বীরত্বের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তাই এই সংখ্যায় ভারতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, স্বাধীনতার পূজারী মহান শিবাজী সম্পর্কে একটি শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সংক্ষেপিত রূপ পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ মনে করছি।

এক

বসন্তের সন্ধ্যা।

অকালে বৃষ্টি নেমেছে। সেই বৃষ্টির মধ্যে কয়েক জনপদের এক পাহাড়ুয়েরা পথ দিয়ে এক ঘোড়সওয়ার ছুটে চলেছেন। বছর আঠারো কুড়ি তাঁর বয়স। পরনে রাজস্থানী পোষাক। নাম রঘুনাথজী হাবিলদার। তাঁর গন্তব্যস্থল অনতিদূরে পাহাড়ের উপর অবস্থিত এক দুর্গ।

পার্বত্যদুর্গে পৌঁছে রঘুনাথজী কিল্লাদারের মহলে গিয়ে হাজির হলেন। কিল্লাদার ছিলেন শিবাজীর বিশ্বস্ত অনুচর। তাঁর সঙ্গে দেখা করে রঘুনাথ তাঁর হাতে কয়েকটি লিপি দিলেন। লিপি পাঠিয়েছেন শিবাজী। তার মধ্যে দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে শিবাজীর যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধের ব্যবস্থা, কীভাবে কিল্লাদার শিবাজীর সহায়তা করবেন, এইসব নির্দেশ লেখা ছিল।

লিপিগুলি পড়ে কিল্লাদার বললেন, রঘুনাথজী হাবিলদার, তুমি যে এত তাড়াতাড়ি সিংহগড় থেকে এখানে আসতে পারবে তা ভাবিনি। যাইহোক, আজ তুমি এখানেই থাকো। কাল সকালে আমি আমার উত্তর তৈরী করে রাখবো।

কিল্লাদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রঘুনাথ সে রাতের মতো সেই দুর্গেই রইলেন। পরদিন ভোরবেলা তিনি ভবানী দেবীর মন্দিরের দিকে গেলেন। শিবাজী এই মন্দিরে নিয়মিত পূজা দিতেন।

মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখলেন, একটি কিশোরী মন্দির সংলগ্ন বাগানের ভিতর ফুল তুলছে।

বালিকা বোধ হয় রাজপুত। বয়স বছর তেরো। তাহী সুশ্রী আর লাবণ্যময় তার চেহারা। দেখে মুগ্ধ হলেন রঘুনাথ।

মেয়েটির নাম সরযূ। মন্ত্রিবরের পুরোহিত রাজপুত ব্রাহ্মণ জনার্দন দেব বাপ মা মরা মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করছিলেন।

রঘুনাথ জনার্দন দেবকে প্রণাম করলেন, পূজা দিলেন, তারপর তাঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে দুর্গে ফিরে গেলেন।

৭ দুই ৭

শিবাজীর প্রতাপ এবং প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়ছিল। সম্রাট আওরংজেব প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু শিবাজীর বহু দুর্গজয়ের কাহিনী শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁকে দমন করবার জন্যে পরাক্রমশালী সেনানায়ক সায়েস্তা খাঁকে নিযুক্ত করলেন।

সায়েস্তা খাঁ মহারাষ্ট্রে এসে অল্পদিনের মধ্যেই পুনা, চাকন দুর্গ এবং অন্যান্য জায়গা অধিকার করে নিলেন।

শিবাজী দেখলেন, বিপদ ক্রমেই বাড়ছে। সায়েস্তা খাঁ পুনা নগরের কাছে সৈন্য সমাবেশ করেছেন এবং শিবাজীর কোন কূটকৌশল যাতে না খাটে সেজন্যে আদেশ জারী করেছেন যে, অনুমতি পত্র ছাড়া কোন মারাঠা পুনা নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। চারিদিকে তাঁর সতর্ক প্রহরীরা ঘুরতে লাগল। শিবাজী দেখলেন, সোজা রাস্তায় সায়েস্তা খাঁকে সায়েস্তা করা যাবেনা। তিনি ফন্দী খুঁজতে লাগলেন।

এক বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষের বরযাত্রীরদল পুনার প্রান্ত থেকে নগরের ভিতর প্রবেশ করবার অনুমতি পেয়েছিল। গভীর রাত্রে বিবাহ। রাত একটার সময় সেই বরযাত্রী দল নগরে প্রবেশ করল। তাদের সঙ্গে বহু বাজনদার। তারা সজোরে বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলল।

শিবাজী বরকর্তার সঙ্গে যোগ সাজস করে, তানজী, যশজী, রঘুনাথ হাবিলদার এবং পঁচিশজন মাত্র মাউলী সৈন্য নিয়ে পথের ধারে এক বাগানের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বরযাত্রা সামনে আসতেই তাঁরা নিঃশব্দে সেই বরযাত্রীদের সঙ্গে মিশে গেলেন। কেউ কিছুই বুঝতে পারল না।

বরযাত্রীরা সায়েস্তা খাঁর বাসস্থানের কাছ দিয়ে চলে গেল। কেউ জানতে পারল না, বরযাত্রীদের মধ্যে জন তিরিশেক লোক সরে এসে সায়েস্তাখাঁর বাসভবনের পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে নামল।

রাত আরও গভীর হল।

সহসা একটা ঘরের মেয়েদের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে যেন কিসের শব্দ! মানুষের চলাফেরার আওয়াজ। একটা জানলা খুলে তারা দেখল, বহু মারাঠা সৈন্য বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে। তারা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

সেই চিৎকারে সায়েস্তা খাঁর সুখনিদ্রা ছুটে গেল। দরজা খুলে দেখলেন, চতুর্দিকে কোলাহল, ছুটোছুটি, বিশৃঙ্খলা। আরও শুনলেন, শিবাজী তাঁর বাসভবন আক্রমণ করেছেন।

প্রাসাদ রক্ষীদের সঙ্গে মাউলী সৈন্যদের তুমুল লড়াই বেধে গেল। প্রাসাদ রক্ষীরা কতক মারা পড়ল, কতক প্রাণ ভয়ে পালালো।

সেই সংঘর্ষের সময় শিবাজী যখন শায়েস্তা খাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় শায়েস্তা খাঁর এক সেনানায়ক পিছন থেকে শিবাজীকে মারবার জন্যে তলোয়ার তুলেছিল। চমকে উঠে শিবাজী ঘুরে দাঁড়ালেন। সামনেই মাথার উপর উদ্যত খড়্গ; এ যাত্রা বুঝি আর রক্ষা নেই!

সহসা একটা বর্শা এসে সেনানায়কের বুকে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শিবাজী দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রঘুনাথজী হাবিলদার। তার হাতের নিক্ষিপ্ত বর্শায় শিবাজী সে-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলেন। রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরলেন শিবাজী।

এদিকে শায়েস্তা খাঁ আর কোন উপায় না পেয়ে কোন ক্রমে ঘরের জানলা ডিঙিয়ে পালিয়ে গেলেন। তবে একেবারের অক্ষত অবস্থায় পালাতে পারলেন না। জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়বার সময় একজন মাউলী সৈন্যের তলোয়ারের আঘাতে তাঁর ডানহাতের একটি আঙুল কেটে পড়ে গেল।

পরদিন সকালে ক্রুদ্ধ মোগল সৈন্য প্রবল বিক্রমে সিংহগড় আক্রমণ করল। কিন্তু গড়ের কামানের গোলার মুখে তারা বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। ছিন্নভিন্ন হয়ে পালিয়ে গেল।

১ তিন ১

শায়েস্তা খাঁর শোচনীয় পরাজয়ে আওরংজেব বিষম ক্রুদ্ধ এবং বিচলিত হলেন। পুত্র সুলতান মোয়াজ্জিম ছিল যুদ্ধবিশারদ। তাকে পাঠালেন শিবাজীকে শিক্ষা দিতে। কিন্তু মোয়াজ্জিম শিবাজীকে শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজেই শিক্ষা পেয়ে ফিরে এলো। অবশেষে সম্রাট তাঁর শ্রেষ্ঠ সহায় ও মহাপরাক্রমশালী অম্বররাজ জয়সিংহকে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করবার ব্যবস্থা করলেন।

রাজা জয়সিংহ শুধু যে একজন শ্রেষ্ঠ রণকুশলী সেনাপতি ছিলেন তাই নয়। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ। মানীর মান রাখতে জানতেন। শিবাজীর প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

শিবাজী রাজা জয়সিংহের প্রতাপ ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। বুঝলেন, তাঁর মত প্রবল প্রতাপ সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করে ফললাভ হবেনা। হবে শুধু লোকক্ষয়। তাই তিনি জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

সন্ধির পর জয়সিংহ বিজাপুর রাজ্য অধিকার করবার উদ্যোগ করলেন এবং এই কাজে শিবাজী তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

পর পর অনেকগুলি দুর্গ জয় হয়। তারপর শিবাজী স্থির করলেন, বিজাপুরের অধীনস্থ পার্বত্য দুর্গ কয়েকগুলি আক্রমণ করবেন। তিনি কবে কোনখানে হানা দেবেন তা আগে কাউকে বলতেন না। এবারও বললেন না। একদিন সন্ধ্যাবেলায় এক হাজার মাউলী আর মারাঠা সৈন্যকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার আদেশ দিলেন। তারপর রাত একপ্রহরের সময় জানালেন কয়েকগুলি দুর্গ আক্রমণ করা হবে।

সেই পর্বত চূড়ায় অবস্থিত দুর্গে ওঠবার একটিমাত্র পথ। অন্য পথ যা আছে তা অত্যন্ত দুর্গম। শিবাজী আদেশ দিলেন ওই দুর্গম পথ দিয়েই দুর্গ আক্রমণ করা হোক।

কিন্তু এ কী ব্যাপার! কিছুদূর উঠেই সৈন্যরা দেখল, দুর্গ প্রাচীরে মশাল জ্বলছে। অর্থাৎ শত্রুরা তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে। শিবাজী বিস্মিত হলেন। তাঁর এই গোপন অভিযানের কথা শত্রুপক্ষ জানল কেমন করে?

শিবাজী তখন শত্রুকে ভোলাবার জন্যে একশো সৈন্যকে দুর্গের অপরদিকে গিয়ে কোলাহল করতে আদেশ দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেদিকে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। শত্রুরা ভাবল, সেইদিক থেকেই দুর্গ আক্রান্ত হয়েছে। তারা সেইদিকে ছুটল।

শিবাজী তখন বাকী সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁর গতি শত্রুদের অজানা রইল না। তারা মার মার শব্দে ছুটে এলো। দুই দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধলো, বৃষ্টির ধারার মত চারিদিক থেকে তীর আর বর্শা নিক্ষিপ্ত হোতে লাগল। 'হর হর মহাদেও' আর 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে পর্বতশীর্ষ প্রকম্পিত হল।

সহসা শোনা গেল 'মহারাজ শিবাজী কি জয়'। পরম বিস্ময়ে সকলে দেখল, শত্রুব্যূহ ভেদ করে একজন রক্তাপ্লুতদেহ রাজপুত পাঁচীলের উপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। সকলে চিনতে পারল—রঘুনাথজী হাবিলদার।

সেই দৃশ্য দেখে শিবাজীর সৈন্যরা দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ চালালো এবং উপরে উঠে দুর্গ দখল করে নিল।

। চার ।

পরদিন বিকালে কল্যাণগড় দুর্গে এক সভা বসল। চাঁদোয়ার নীচে রাজাসনে রাজা জয়সিংহ ও মহারাজা শিবাজী। চারিদিকে বিশিষ্ট সেনানায়কবৃন্দ। আশে পাশে সশস্ত্র সিপাহীর দল।

শিবাজীর আদেশে যুদ্ধবন্দীদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া হল। কল্যাণগড় সহরের কিল্লাদার বৃদ্ধ রহমৎ খাঁকে শিবাজী বিশেষ সম্মান দেখালেন। তাঁর উদার ব্যবহারে অভিভূত রহমৎ খাঁ বললেন, ক্ষত্রিয়রাজ, আপনার ব্যবহারে আমি বিস্ময় বোধ করছি। কিন্তু বলবার নেই, শুধু একটা কথা জানাবার আছে। কাল আপনি যে আমার দুর্গ আক্রমণ করবেন এ সংবাদ আমি আগেই পেয়েছিলাম। সেইজন্যে সৈন্য প্রস্তুত করতে পেরেছিলাম। আপনার একজন সেনা আমাদের এই খবর দেয়।

তাঁর সেনা বিশ্বাসঘাতক! শিবাজী রাগে কাঁপতে লাগলেন। কে এই বিশ্বাসঘাতক? সৈন্যদের নানা প্রশ্ন করা হল। জানা গেল, সৈন্যরা দুর্গ আক্রমণের হুকুম পেয়েছিল রাত এক প্রহরে। অভিযান শুরু হয় দেড় প্রহরে। সেই সময়ের মধ্যে কেউ কি অনুপস্থিত ছিল শিবাজীর শিবিরে? চন্দ্ররাও নামে জুবলাদার এগিয়ে এসে বললে, সেই সময় একজন হাবিলদার শিবিরে ছিল না।

শিবাজী গর্জন করে উঠলেন, কে সে?

চন্দ্ররাও বললে, রঘুনাথজী হাবিলদার!

রঘুনাথ! তুমি, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছো! শিবাজী ভীষণ উত্তেজিত!

রঘুনাথ উত্তর দিলেন, প্রভু, আমি নির্দোষ!

তবে কি কারণে আমার আদেশ লংঘন করে তুমি যুদ্ধযাত্রার সময় অনুপস্থিত ছিলে? পাপিষ্ঠ! কাল বীরত্ব দেখিয়েছিলে। সে তোমার কপট আচরণ। আমার হাতে বিশ্বাসঘাতকের নিস্তার নেই। আমি তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। আমি নিজের হাতে তোমাকে বধ করব।

এই বলে শিবাজী তলোয়ার বার করলেন। রাজা জয়সিংহ শিবাজীর হাত ধ'রে বললেন, ক্ষত্রিয়রাজ,

ভাল মত সব দিক বিবেচনা না করে এমন কাজ করবেন না। আমার মনে হচ্ছে, এই রাজপুত যোদ্ধা বিদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক নয়। যাই হোক, আমি এর প্রাণভিক্ষা চাইছি। আমায় ভিক্ষা দান করুন।

শিবাজী বললেন, মহান রাজা জয়সিংহ। আপনার কথা অমান্য করব না।

রঘুনাথের দিকে ফিরে বললেন, হাবিলদার, রাজা জয়সিংহের কৃপায় তোমার জীবন রক্ষা হল। কিন্তু তুমি আমার সামনে থেকে দূর হও। তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।

রঘুনাথ নীরবে নতমস্তকে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

চন্দ্ররাও জুমলাদার সম্বন্ধে এইখানে কিছু বলা দরকার। তিনি শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়ে রাজা যশোবন্ত সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ গজপতি সিংহের কাছে মানুষ হয়েছিলেন। একবার এক যুদ্ধের সময় অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে চন্দ্ররাও গজপতির প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তাতে মহা সন্তুষ্ট হয়ে গজপতি চন্দ্ররাওকে বলেন, তুমি কি চাও বল। যা চাও তাই তোমাকে দেব।

উত্তরে চন্দ্ররাও বলেন, মহারাজ, আমি আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করতে চাই।

তাঁর এই কথা শুনে গজপতি বিষম ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং চন্দ্ররাওকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে চন্দ্ররাও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এ অপমানের প্রতিশোধ তিনি নেবেন।

অল্পদিনের মধ্যেই সেই সুযোগ এলো।

এক বছরের মধ্যেই গজপতি এক যুদ্ধে মারা গেলেন। তাঁর ছেলে রঘুনাথের বয়স তখন তেরো, মেয়ে লক্ষ্মীর বয়স নয়।

বাবাকে হারিয়ে ভাইবোন দুজনে এক ভৃত্যের সঙ্গে মাড়বার থেকে মেবারের দুর্গে মামার জন্যে বেরুলো। তাদের মা আগেই মৃত হয়েছিলেন।

পথে একদল দস্যু ভৃত্যটিকে মেরে ফেলে রঘুনাথ আর লক্ষ্মীকে মহারাষ্ট্রে ধরে নিয়ে গেল। রঘুনাথ ছেলেমানুষ হলেও অসমসাহসী ছিলেন। তিনি রাতের বেলায় দস্যুদের শিবির থেকে পালিয়ে গেলেন। মেয়েটিকে দস্যু দলপতি জোর করে বিবাহ করলেন। চন্দ্ররাও-ই সেই দস্যুদলপতি।

বিবাহের পর চন্দ্ররাও জায়গীর কিনলেন এবং ক্রমে একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক বলে গণ্য হলেন। তাঁর সাহস ও বিক্রমের কথা জেনে শিবাজী তাঁকে জুমলাদারের পদে নিযুক্ত করলেন।

তার অল্পদিন পরেই রঘুনাথ শিবাজীর সৈন্যদলে ভর্তি হলেন এবং চন্দ্ররাওর নজরে পড়লেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে সহ্য করতে পারলেন না, কৌশল করে তাঁর পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিলেন।

রঘুনাথ সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে চন্দ্ররাওকে দেখে তাঁর বাবার পুরাতন ভৃত্যরূপে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু জানতে পারেন নি এই লোকই তাঁকে আর তাঁর ভগ্নীকে অপহরণ করেছিল এবং এই লোকই তাঁর ভগ্নীপতি।

৭ ছয় ৭

চন্দ্ররাওর বাড়ি থেকে কিছু দূরে ছিল ঈশানী মন্দির। কয়েকজন দুর্গ থেকে বেরিয়ে রঘুনাথ সেখানে গিয়ে হতাশ মনে বসেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ভগ্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর দেখা হোয়ে গেল। লক্ষ্মী সেই সময় পূজা দিতে এসেছিলেন।

ভাই-বোনে মিলে অনেক চোখের জল ফেললেন। অনেক সুখ-দুঃখের কথা হল দু'জনের মধ্যে। রঘুনাথের সমস্ত কথাই লক্ষ্মী শুনলেন। নিজের কথা বললেন, শুধু স্বামীর নাম বললেন না, জানালেন তিনি একজন মারাঠা জায়গীরদার।

কথায় কথায় লক্ষ্মী বললেন, দাদা, শিবাজী তোমাকে যে সন্দেহ করেছেন তা তুমি নিজের কাজ দেখিয়ে খণ্ডন কর। শুনলাম, শিবাজী দিল্লী যাচ্ছেন। সেখানে কত কি ঘটতে পারে। তুমিও সেখানে যাও। দরকার হলে শিবাজীর কাছে গেপে তোমার আসল পরিচয় দাও।

লক্ষ্মীর কথায় রঘুনাথ উৎসাহিত বোধ করে বললেন, ভাল কথা বলেছিস বোন। আমি তাই করব।

লক্ষ্মী বললেন, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে দাদা!

কি অনুরোধ?

লক্ষ্মী বললেন, চন্দ্ররাও নামে এক জুমলাদার বোধ হয় তোমার খুব ক্ষতি করেছেন, তাই না?

রঘুনাথ বললেন, খুবই ক্ষতি করেছে। অবশ্য সে শিবাজী মহারাজের কাছে যা বলেছিল তা মিথ্যে নয়।

লক্ষ্মী বললেন, সে যাই হোক, তুমি শপথ কর, তুমি তাঁর কোন অনিষ্ট করবে না।

মনে মনে বিস্মিত হয়ে রঘুনাথ শপথ করলেন।

রঘুনাথ যে বললেন, চন্দ্ররাও তাঁর নামে মিথ্যা বলেনি, তার মানে হল এই যে সত্যিই কয়েকজন দুর্গ অভিযানের যাত্রাকালে রঘুনাথ নিজেদের শিবিরে ছিলেন না। তিনি সেই সময় জনার্দনদেবের বাড়ি গিয়েছিলেন দলপুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে রঘুনাথ শিবাজীকে বলতে পারেন নি। আর চন্দ্ররাও-ও সে কথা জানতেন না। তিনি রঘুনাথের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন মাত্র।

৭ সাত ৭

রাজা জয়সিংহের অনুরোধে এবং সম্রাট আওরংজেবের আমন্ত্রণে শিবাজী দিল্লী গেলেন। সঙ্গে পাঁচশো অশ্বারোহী, এক হাজার পদাতিক এবং পুত্র শম্ভুজী, মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ও প্রধান তরজী মালপ্রী।

কিন্তু দরবারে হাজির হয়ে শিবাজী দেখলেন, তাঁকে অভ্যর্থনার মধ্যে আন্তরিকতা নেই, বরং যেন অবজ্ঞা পরিস্ফুট। সম্রাট তাঁকে কোনরকম সম্মান বা সমাদর দেখালেন না। শিবাজী রাগে ফুলতে লাগলেন।

তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বুঝলেন, তাঁকে দিল্লীতে আটকে রাখাই আওরংজেবের আসল মতলব। তিনি বিচলিত মনে দিল্লী থেকে চলে যাবার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

সেইদিন রাত্রেই এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী শিবাজীর কাছে এলেন। শিবাজী তাঁকে চিনতে পারলেন। তাঁর নাম নীতাপতি গোস্বামী, মাত্র কয়েকদিন আগে এই নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে শিবাজীর পরিচয় হয়।

সীতাপতি বললেন, মহারাজ, দিল্লী থেকে আপনার পালাবার সব ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। আপনি আমার দেওয়া ছদ্মবেশ পরে এখনি অনায়াসে এখান থেকে চলে যেতে পারেন। কেউ কোন সন্দেহ করবে না। পাঁচীলের ওধারে নদীতে এক আট মাল্লাই নৌকো ঠিক করা আছে। তাতে করে আপনি অল্প সময়ের মধ্যেই মথুরায় পৌঁছোতে পারবেন। সেখানে আপনার ভগ্নীপতি সমস্ত ঠিক করে রেখেছেন।

শিবাজী বললেন, সীতাপতি, আপনার চেষ্টা আর আয়োজনের জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি। কিন্তু আমার আশ্রিত সঙ্গীদের বিপদের মধ্যে ফেলে আমি পালাতে চাই না। আমি একটা উপায় নিশ্চয় বার করতে পারবো।

সীতাপতি বললেন, মহারাজ, আজ যদি না যান, কাল আর সে সুযোগ পাবেন না। কাল থেকে আপনি বন্দী, আমি পাকা খবর জেনে এসেছি।

শিবাজী তবুও যেতে রাজী হলেন না। সীতাপতি চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শিবাজী দেখলেন, সীতাপতির কথা মিথ্যা নয়। তাঁর বাড়ীর চারপাশে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন হয়েছে। তিনি সত্যিই বন্দী। ক্রুদ্ধস্বরে শিবাজী মনে মনে বললেন, মুঘল সম্রাট, এই শঠতার উত্তর তুমি পাবে।

সেইদিনই তিনি রঘুনাথ পন্তকে দিয়ে এক আবেদন-পত্র লিখিয়ে আওরংজেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পত্রে শিবাজী নিজের অনুচর ও সৈন্যদের স্বদেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে সম্রাটকে আবেদন জানালেন। আওরংজেব খুশী হয়ে যথাযথ আদেশ দিলেন। সকলেই চলে গেল। রইলেন কেবল শিবাজী আর তাঁর ছেলে শম্ভুজী।

তারপর দু'চার দিনের মধ্যেই দিল্লী শহরে রটে গেল যে শিবাজী শুরুতর অসুস্থ। অবস্থা সংকটজনক। তাঁর ঘরের দরজা জানলা সব সময়েই বন্ধ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৈদ্য হাকিম প্রভৃতিরা তাঁকে দেখতে আসছেন। তারই মধ্যে একদিন ওমরাহ মালশ্রী মুসলমান হাকিমের ছদ্মবেশে শিবাজীর সঙ্গে দেখা করে গেলেন। তিনি জানিয়ে গেলেন, লোক সত্তর ঘোড়া নৌকা সমস্তই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এখন শিবাজী যে কোন সময়ে পালাতে পারেন।

দু'দিন পরেই সংবাদ প্রচারিত হল যে শিবাজী সেরে উঠেছেন এবং মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাঠাচ্ছেন। প্রত্যহ তিনি রাশি রাশি মিষ্টান্ন কিনতে লাগলেন এবং বড় বড় ঝুড়িতে ভর্তি করে সেগুলি আমির, ওমরাহ, রাজা মহারাজা প্রভৃতি বড় বড় লোকদের বাড়ি পাঠাতে লাগলেন। এমন কি প্রতি মসজিদে এবং ফকিরদের দেবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠানো হোতে লাগল। সে এক এলাহি ব্যাপার।

একদিন সন্ধ্যার সময় দুটি প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের ঝুড়ি শিবাজীর বাড়ি থেকে বেরুলো। প্রহরী জিজ্ঞাসা করল, এত বড় দুটো ঝুড়ি কার বাড়ি যাচ্ছে। উত্তর শোনা গেল, রাজা জয়সিংহের বাড়ি। প্রহরীরা আজকাল আর ঝুড়ি পরীক্ষা করে দেখে না। শত শত ঝুড়ি পরীক্ষা করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

বাহকদের মাথায় ঝুড়ি দুটি চলে গেল। কিছুদূর গিয়ে এক অন্ধকার গোপন স্থানে তারা ঝুড়ি দুটি নামালো, তাদের ভিতর থেকে বেরুলেন, শিবাজী আর শম্ভুজী।

অদূরে গাছের নীচে একটা তেজী ঘোড়া। শিবাজী অশ্বরক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি বন্ধু?

উত্তর শোনা গেল, আমার নাম জানকীনাথ। মথুরায় যাব।

শিবাজী বুঝলেন, এ ঘোড়া তাঁরই জন্যে। ছেলেকে নিয়ে তিনি ঘোড়ায় উঠলেন। অশ্বরক্ষক পিছনে পিছনে যেতে লাগল। কিছুদূর গিয়েই দারুণ বিপদ। তিনজন মোগল সেনা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের নিমেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে বুঝি আর পিতা পুত্রের প্রাণ রক্ষা হয় না।

এমন সময় একটি তীর এসে সামনের মোগল সৈন্যের বুকে বিঁধল। পরে আর একটা তীর আর একজনকে বিদ্ধ করল। তারপর তৃতীয় তীরের ঘায়ে অন্যজনও ভূতলশায়ী হল এবং মারা পড়ল।

শিবাজী দেখলেন, তীরন্দাজ আর কেউ নয়, অশ্বরক্ষক জানকীনাথ। সে কাছে এলে তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, অশ্বরক্ষক তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সীতাপতি গোস্বামী।

শিবাজী আবেগভরে সীতাপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তখন সীতাপতি তাঁর মাথার পাগড়ী আর নকল গোঁফ খুলে ফেলে শিবাজীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, মহারাজ, এই ছদ্মবেশের জন্যে ক্ষমা করুন। আমি আপনার পুরনো সেবক রঘুনাথজী হাবিলদার। আমি আর কিছু চাই না। শুধু আজীবন আপনার সেবা করব, এই প্রার্থনা।

শিবাজী কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন। তারপর রঘুনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, রঘুনাথ, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। তোমার প্রতি অবিচার করেছি। আমায় ক্ষমা কর ভাই।

॥ আট ॥

শিবাজীর প্রত্যাবর্তনের পর সারা মহারাষ্ট্রে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হল। বহু শতাব্দী পরে ভারতে আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হবে—নগরে নগরে এই বার্তা ছুটতে লাগল।

এই সময় রাজা জয়সিংহ মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে শিবাজী অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন।

পরদিন প্রত্যূষে সুবিস্তীর্ণ মাঠে শিবাজীর নির্দেশে তাঁর সৈন্যরা সমবেত হল। তাদের উদ্দেশে তিনি এক আবেগময় মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বললেন, বন্ধুগণ, প্রায় এক বছর হল আমরা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। কিন্তু তাঁর কপট আচরণে সে সন্ধি নাকচ হয়ে গেছে। আমরা মোগলদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ শুরু করব। তোমরা প্রস্তুত হও। বন্ধুগণ, আমি দেখতে পাচ্ছি, মোগলদের সৌভাগ্য সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। মারাঠাদের ভাগ্য তারকা মধ্যগগনে সমুজ্জ্বল। বন্ধুগণ, অগ্রসর হও, দিল্লীর সিংহাসন আমরা অধিকার করব। পূর্বগগনে যে লাল ছটা দেখছো, তা নতুন প্রভাতের দীপ্তি। এ প্রভাত আমাদের জীবন-প্রভাত, মহারাষ্ট্রের জীবন-প্রভাত।

সৈন্যরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল—আজ আমাদের জীবন প্রভাত।

॥ নয় ॥

রঘুনাথজীর প্রতি বিদ্বেষে মনে মনে জ্বলছিলেন চন্দ্ররাও।

একদিন সন্ধ্যায় নদীর তীরে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, এ সংসারে তোমার আমার দু'জনের জায়গা নেই। আমাদের একজনকে মরতে হবে। জন্মাবধি তুমি আমার শত্রু। আজ সেই শত্রুকে শেষ করব। না হয় নিজে মরব।

রঘুনাথ লক্ষ্মীর কাছে যে শপথ করেছিলেন, তা তাঁর মনে পড়ল। বললেন, তুমি পাপিষ্ঠ! কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি লড়ব না।

চন্দ্ররাও বললেন, ভীরু, কাপুরুষ! হবে না? কেমন বাপের বেটা। শোন্ বেকুব! তোর বাপকে আমিই মেরেছি।

এই কথার পর রঘুনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তলোয়ার নিয়ে চন্দ্ররাওকে আক্রমণ করলেন। ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত চন্দ্ররাও মাটিতে পড়ে গেলেন। রঘুনাথ বললেন, আজ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব।

চন্দ্ররাও বললেন, আর সেই সঙ্গে বোনের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিবি।

বিস্মিত চোখে রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে ছেড়ে দিলেন। লক্ষ্মীর কথা তাঁর মনে পড়ল। সে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল, রঘুনাথ যেন চন্দ্ররাওর কোন ক্ষতি না করে।

এমন সময় সহসা গাছের আড়াল থেকে একজন ঘোড়া সামনে এসে দাঁড়ালেন। দু'জনে সভয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, স্বয়ং মহারাজ শিবাজী তাঁদের সামনে। শিবাজী কোন কথা বললেন না। শুধু পিছনে যে চারজন সৈন্য এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের আদেশ করলেন, চন্দ্ররাও জুমলাদারকে বন্দী কর।

পরদিন সকালে চন্দ্ররাওর বিচার। তিনি রঘুনাথের পিতাকে হত্যা করেছেন অথবা কাল রঘুনাথকে বধ করবার চেষ্টা করেছিলেন—বিচার সেজন্যে নয়। প্রমাণ পাওয়া গেছে, কয় মণ্ডল দুর্গ আক্রমণের আগে, চন্দ্ররাওই সেই গুপ্ত সংবাদ শত্রুদের জানিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে চন্দ্ররাও-এর বিচার।

বিচারে চন্দ্ররাও-এর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হল। রঘুনাথ চন্দ্ররাওর মুক্তির জন্যে প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু শিবাজী অটল। তখন একজন বিশ্বস্ত ও প্রিয় অমাত্য তাঁকে জানালেন যে চন্দ্ররাও রঘুনাথের ভগ্নীপতি। শুনে বিস্মিত হয়ে শিবাজী চন্দ্ররাওকে মুক্তি দেবার আদেশ দিলেন।

কিন্তু চন্দ্ররাও সকলকে আরো বিস্মিত করে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরিকা বার করে আত্মহত্যা করলেন।

শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে পতিব্রতা লক্ষ্মীবাঈ সহমৃতা হলেন।

কিছুদিন শোক এবং বিষাদের মধ্যে কাটল। তারপর রঘুনাথের সঙ্গে সহযুর বিবাহ সম্পন্ন হল এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবন পরম আনন্দের মধ্যে কাটতে লাগল।

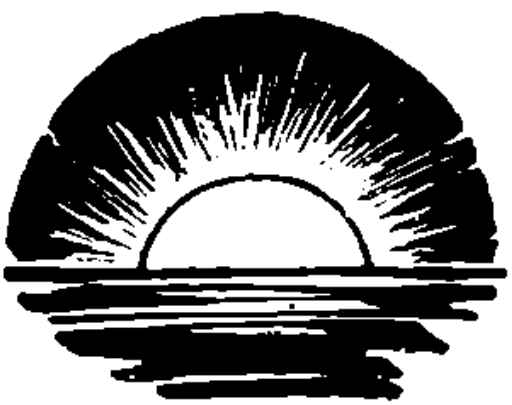

আবার সেই জেল

প্রথম খণ্ড

(দমদম জেলের ডেপুটি সুপার পর্ব)

বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

[লেখক ছিলেন বি ভি (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) বিপ্লবী দলের অন্যতম কর্মী, যে দলের কর্মীদের মধ্যে ছিলেন শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশ। বৃটিশের আমলে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের ফলে লেখককে প্রায় বারো বৎসর জেলে বন্দী থাকতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পর আবার তিনিই প্রায় বারো বৎসর জেলের সুপারিনটেনডেন্টের চাকরি করেছিলেন। এবং আশ্চর্য সত্য, যে-সব জেলে একদা তিনি বন্দী জীবন যাপন করেছিলেন, ঘটনাক্রমে আবার সেই-সব জেলেই তিনি ছিলেন সুপারিনটেনডেন্ট। বন্দীজীবনে যে-সব অন্যায় ও অবিচার তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল, উত্তরকালে জেলের সর্বময় কর্তারূপে সেই সব অন্যায় ও অবিচার রোধ করতে গিয়ে তাঁকে অসংখ্যবার জটিল সরকারী ব্যুরোক্র্যাশীর সম্মুখীন হতে হয়। এই ধারাবাহিক রচনাটিতে তিনি তাঁর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কারাপ্রাচীরের অন্তরালবর্তী হতভাগ্যদের নানা সুখদুঃখের ইতিবৃত্তে যেমন রচনাটি সমৃদ্ধ, তেমনি বাইরের দুনিয়ার ঘুণাক্ষরী ঘটনাবলী সম্বন্ধেও তাঁর লেখনী সমান সোচ্চার। 'তখন আমি জেলে' গ্রন্থে লেখক বর্ণনা করেছিলেন তাঁর বন্দী জীবনের কাহিনী, আর এই রচনায় বিবৃত করেছেন তাঁর চাকরি জীবনের কণ্টকাকীর্ণ ইতিহাস।]

—সম্পাদক, গল্পভারতী

এক

হঠাৎ অজন এসে হাজির।

ভরা ভাদ্র মাস। রীতিমত খরা চলছে দিন-পনেরো ধরে। কড়া গরম। তার ওপর সময় দুপুর বারোটা হবে। উত্তাপের পারা এখন কত ডিগ্রি পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে সঠিক তা বলতে না পারলেও বেশ টের পাচ্ছি সিউমিডিটি শতকরা নিরানব্বই ভাগের একটুও কম হবে না। আমার মাথার ওপর নয়, বস্তুতঃ কোন মানুষেরই মাথার ওপর নয়, ডান দিকের পার্টিশনের মাথার ওপর বিচিত্র শব্দ করে আটচল্লিশ ইঞ্চি পাখা ঘুরছে। ওটা সরকারী সীমাহীন ইকনমির একটি নমুনা। দুজন অফিসারের জন্য একখানা পাখা। তাই পার্টিশনের ওপর দোদুল্যমান হাফাহাফি ব্যবস্থা। ফলে, আমার দক্ষিণাঙ্গে যদিও

কিঞ্চিৎ হাওয়ার ঝাপটা লাগছে, যার অঙ্গে বইছে ঘামের স্রোত। কারণ বাঁ দিকের পার্টিশনের ওপর যিনি বিরাজ করছেন, আজ মাসখানেক যাবত তিনি সমাধিস্থ। খুব প্রপার চ্যানেলে বার বার বার্তা পাঠাবার পরও পি-ডবলিউ-ডিপার্টমেন্টের ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশন মৌনী বাবা হয়ে বসে আছেন। কে জানে সেটা হয়ত ডিপ টকনসি।

দক্ষিণাঙ্গে যেটুকু ঝাপটা লাগছে, তা কি হাওয়ার? মনে হচ্ছে যেন পার্টিশন খচিত এই ঘরখানার কোথাও একটা বরফাবের মুখ খুলে রাখা হয়েছে আর পাখাগুলো তা থেকে শনশনে কনকনে তুলে তুলে এনে আমাদের গায়ে আছড়ে আছড়ে মারছে।

আবহাওয়া অফিসটা এই আলীপুরে বলেই দুনিয়ার যত গরম, সব মিছিল করে এসে এখানেই সমাবেত হয়েছে কিনা, কে জানে!

সীতাকুণ্ডে উক্ত প্রস্রবণে যখন এমনিভাবে অবগাহন করছি এবং পাবলিক সার্ভিসের প্রতি নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছি, এমন সময় শ্রীমান অজনের প্রবেশ।

আবহাওয়া যতই অসহ্য হোক না কেন, এই মুহূর্তে কিন্তু একটি মিটোল সরল কাহিনী শুনছিলাম। একটু আগেই মিষ্টার মিত্রের এজলাস থেকে এসেছি। যুবক অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। আমার চাইতে অন্ততঃ দশ বছরের ছোট হলেও বেশ জমে গেছে আমার সঙ্গে। বস্তুতঃ, প্রবেশন অফিসার হয়ে এই আলীপুরে যোগদান করবার পর মাত্র দশ দিনের মধ্যেই একটা কেস্ পেয়ে যাই, আর সেটা দিয়েছিলেন এই যুবক ম্যাজিস্ট্রেট। সে ছেড় বছর আগেকার কথা। তারপর ত কত কেসই পেয়েছি অন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে। একশো পার হয়ে গেছে। ইনস্পেক্টার জেনারেল অব প্রিজন্স কদিন আগে আমায় বলেছেন আরও একজন প্রবেশন অফিসার আলীপুরে দেবেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরিকল্পনা ছিল একজন অফিসার অন-পঁচিশেক প্রবেশনারকে দেখাশোনা করতে পারেন। সেখানে একশো বারো!

প্রবল গুজব যে অজনই এখানে আসছে দ্বিতীয় প্রবেশন অফিসারের পদে। সেই সুখবরটাই বোধহয় শ্রীমান বহন করে এনেছে। ঘিজেনদার কাছে এলে তার হাসি-হাসি মুখখানি স্বভাবতঃই খুশীতে ভরে ওঠে। আজ কিন্তু খুশীর জোয়ার যেন উপচে পড়ছে।

মিষ্টার মিত্রের এজলাস থেকে যাকে সঙ্গে করে আমার চেম্বারে নিয়ে এসেছি, তার নাম রেখা পাল। বয়স পনেরো-ষোলর বেশী হবে না। সুন্দরী। শরীর অপুষ্ট হলে কি হবে, খাটো ও আঁটো জামায় এবং ঝিনঝিনে শাড়ী পরবার-বিশেষ কায়দায় সেই শরীরটাকেই বেশ সাজিয়ে তুলেছে। সেই সাজানো শরীরটাকেই বাঁকিয়ে চুরিয়ে নানারকম কসরৎ করে বেশ শব্দ করে হাসতে পারে খিলখিলে হাসি। কিন্তু মিষ্টি। কণ্ঠস্বর অবশ্য ততটা মিষ্টি নয়, বেপরোয়া অত্যাচারে ও আসন্ন যৌবনের ভারে ভারী হয়ে উঠেছে। ষোল বছরের কণ্ঠে যেন ছাব্বিশ বছরের আওয়াজ। কিন্তু হাসির শব্দে দশ বছরের খুকি বলে মনে হয়। হাসির সময় ওর ভেতরকার ফুলের মত নিষ্পাপ খুকিটি যেন বেরিয়ে আসে। কথার সময় অবশ্য পালিয়ে যায়।

মিত্রের এজলাসেও এমনি খিলখিল করে সে হেসে উঠেছিল কি একটা প্রশ্নের জবাবে। এক ঘর লোকের মধ্যে বিচারকের গাম্ভীর্য বজায় রাখাই কঠিন হয়ে পড়ল। হয়, ধমক দিতে হয় নয়ত ওর হাসিতে যোগ দিতে হয়। ষোল বছরের কথা উঠতেই পারে না। কিন্তু ধমকও কি করে দেবেন? ওটা ওর ম্যানারিজম হতে পারে। ম্যানারিজমকে আদালত অবমাননার দায়ে ফেলা যায় কি? তাই যুবক ম্যাজিস্ট্রেট ঘেমে উঠলেন, প্রমাদ গুণলেন, অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে প্রবেশন অফিসার ঘিজেন গাঙ্গুলীকে ডেকে পাঠালেন।

নিন মিষ্টার গাঙ্গুলী, নতুন ধরণের মডেল। মেয়ে পকেটমার। সেই মেয়ে পকেটমার রেখা পালের মুখে আজ ইতিহাস শুনছিলাম।

ভবানীপুর থানার দক্ষিণে ওদের বেশ বড় কাপড়ের দোকান। নিজেদেরই বাড়ী। নীচে দোকান। দোতলায় ওরা থাকে। দোকানে চার জন সেলসম্যান। টাকার বাক্স আগলান দীনবন্ধু পাল। যখন তখন রেখা নেমে আসে, বাপের কাছে পয়সা চায়। আজ একটা গল্পের বই কিনব, কাল নতুন দিদিমণিকে কেয়ারওয়েল দিতে হবে, পরশু বন্ধুর দিদির বিয়ে। মাঝে মাঝে সিনেমা দেখারও আবদার জানায়। দীনবন্ধু দ্বিরুক্তি না করে টাকা দিয়ে দেন। আদুরে মেয়ে আর টাকার অভাব। সুতরাং আলাদের ঘরে দুলালী তৈরী হতে লাগল। মেয়ের আবদার আর বাপের আদর সবাই লক্ষ্য করলেও সেলসম্যান রতনের চোখে যেন নেশা লেগে গেল। ফর্সা-টাকা শুকনো শরীরে কি ভেল্‌কি দেখেছিল সেই জানে। প্রথমে দৃষ্টি বিনিময়, তারপর মুখটেপা হাসি, তারপর চিরকুট বিনিময়। শেষে পূর্ণ সিনেমার লাউঞ্জে সাক্ষাৎকার, অবশেষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের সবুজ লন-এ সন্ধ্যার অন্ধকারে হৃদয় বিনিময়। তুমি আমার আমি তোমার।

রেখা তখন ফ্রক পরে। বয়স চৌদ্দ। রতন পঁচিশ বছরের তাজা তরুণ। কিন্তু রতনে রতন চিনে ফেলল।

বছর-খানেক চলার পর এমনি চুরি করে কখনো-সখনো কোনও রকমে চটপট করে বিনিময়ের কাজ সারতে আর ওদের ভাল লাগল না। বাঘ তখন রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছে! তাই বাধাবন্ধহীন নিশ্চিন্ত সুযোগের জন্য দুজনে লালায়িত হয়ে উঠল।

বাপের বাক্স ভেঙ্গে একদিন বেরিয়ে এল রেখা, আর রতন দোকান থেকে সরিয়ে আনল কতকগুলো রঙীন শাড়ী। সোজা চলে গেল দুজনে দিল্লীতে। সেখান থেকে কাশ্মীর। ডাল হ্রদের হাউস বোটে কাটাল মাসখানেক। নেমে এল বোম্বে শহরে। বিলাস বহুল হোটেলে কাটাল কিছুদিন। তারপর বেনারসে। বেনারস থেকে লখনৌ।

অবশেষে পাটনা হয়ে যখন ফিরে এল কলকাতায়, তখন কুবেরের ধনও নিঃশেষ হয়ে গেছে!

কলাবাগান বস্তির খোলার ঘরের মাটিতে শরীর এলিয়ে দিয়ে রেখা বলল, আর টাকা নেই।

নাই-বা থাকল। আছে তাজা তরুণ রতন আর আছে সুন্দরী রেখার মেয়ে-শরীর। আর সেই খিলখিলে শিউরে-দেয়া হাসি। এমনি মূলধন থাকতে টাকার অভাব কি? কলকাতার পথেঘাটে টাকা ছড়িয়ে আছে, শুধু কুড়িয়ে নেবার আর্ট জানা চাই। সেই আর্ট পারদর্শিনী হয়ে উঠল রেখা পাল।

ট্রাম বাসের ভিড়ের মধ্যে চলতে লাগল রেখা। লেডিস সিট ছেড়ে কেউ উঠতে গেলে মিষ্টি হেসে বলে, বসুন না আপনি। আমি এই কাছেই নেমে যাব।

ভিড়ের মধ্যে পুরুষের ঘেঁসাঘেঁসি ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রড ধরেনা। তাই কাঁকুনিতে এর ওর গায়ে গা লেগে যায়। কিন্তু পড়ে যাবার ভয় ত থাকেনা।

যখন বস্তিতে ফিরে আসে, তখন তার ব্রাউজের মধ্যে খানকতক নোট, ফাউন্টেন পেন, হয়ত আর একটা মনি ব্যাগ। রতন ওকে জাপটে ধরে। রেখা খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

বলে, তোমরা পুরুষরা কি বোকা! হাঁ করে দেখবে। ওদিকে পকেট যে ফাঁক হয়ে গেল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

সন্ধ্যার পরেই আবার নতুন বাণিজ্য ক্ষেত্র কলকাতা ময়দান।

সেখানকার প্রয়োজনীয় মূলধনে রেখা পালের খানিকটে ঘাটতি হয়তো আছে, কারণ ওর অপুষ্ট শরীর। কিন্তু সে ঘাটতি পুষিয়ে গেছে ওর স্বাভাবিক কিশোরী-সৌন্দর্যে আর ঘাটো ও আটোসাটো জামায়। তার ওপর এই অযোধ্য অন্ত খিলখিলে হাসি। জলতরঙ্গের মত। হেসে গড়িয়ে পড়া, গলে জল হওয়া। ময়দানের অন্ধকারে সেই মারাত্মক হাসির আওয়াজে যেন হ্যামেলিনের বাঁশীর ডাক!

কিংবা বলা যায় পাইথনরা সব রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে আহারের অন্বেষণে। সারা ময়দান জুড়ে মুখ ব্যাদন করে খিলখিল করে। খানিকটা মাংস পেলেই ওরা খুশী।

ভালই চলছিল ওদের দ্বৈত জীবন।

এমন সময় অকস্মাৎ বজ্রপাত।

একদিন হাতে রেখার হাতসাফাই ধরা পড়ে গেল।

ধরা পড়ে যাবার সেই কাহিনীই বিনাদ্বিধায় বলছিল রেখা পাল। বলার আমোদে মাঝে-মাঝেই খিলখিল করে হেসে উঠছিল, এমন সময় অঞ্জনের আবির্ভাব।

ওর আগমনকে প্রাদুর্ভাব বলা চলে। কারণ আমি জানি এখনই ও বলে বসবে, ছিজেনদা, সুধীরকে ডাকুন। কিংবা নিজেই হয়ত বেলটার মাথায় একটা ঘা মেরে বসবে, সুধীর এলে বলবে, সুধীর, দুটো ভবল ঘোসলাই আর দুটো কোয়াটার চিকেন কারি। তারপর দুটো রাজভোগ, সবার শেষে কফি।

এবং আমি যদি খেতে নারাজ হই কিংবা একটু আগেই খেয়েছি বলি, তাহলেও সে হবে না, তার সঙ্গে খেতে হবেই।

অঞ্জন ত আমার কাছে শুধু শিয়ালদহ পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টের প্রবেশন অফিসার নয়, সে আমার প্রিয় বন্ধু অনিলের জ্যেঠতুতো ভাই। মানে, আমারও ভাই।

অনিল মানে, আলীপুরের একদা জাঁদরেল সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর গুণেশ সেনের বড় ছেলে। গুণেশ সেন মানে, সেই ভদ্রলোক, যাঁর রিভলভারটি ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে আমি সরিয়ে ফেলছিলাম এবং যে রিভলভারটি দিয়ে ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্ণেল ডেভিস পেডিকে হত্যা করা হয়।

অঞ্জনেরই ছোট বোন লীলার তখন আমি গৃহশিক্ষক ছিলাম। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে এই বাড়ীটিতে তখন লোক গিজগিজ করছে। তাঁরা কেউ ভাবতেই পারেননি দশ টাকা মাইনের নগণ্য প্রাইভেট টিউটর একটি দুর্ধর্ষ বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী হতে পারে এবং ছাত্রীকে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্বামীর রিভলভারটি চুরি করবার মতলব ভাঁজতে পারে।

যাকগে সে সব পুরোনো কথা।

হঠাৎ হলেও অঞ্জন যখন এসেই গেছে এবং আরেকখানা চেয়ার খালি থাকা সত্ত্বেও টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে এবং ঘন ঘন কপাল কুঁচকে আমার সুন্দরী মক্কেলের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করছে, তখন আর আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, তার এমন কিছু বক্তব্য আছে আজ যা এই অবাঞ্ছিত মেয়েটির সম্মুখে প্রকাশিতব্য নয়।

সুতরাং বেল টিপলাম। সুধীর এল।

যে রোমাঞ্চকর উপন্যাসখানি সবে মধ্যে উঠেছে, ত্যাপসা গরমে যা শুনতে শুনতে কিঞ্চিৎ পুলক অনুভব করছিলাম, মক্কেলকে বাধা দিয়ে ড্রাইংরুমের চড়াই পথে শনৈঃ শনৈঃ ধাবমান সেই উপাখ্যানটিকে

চারশ ফুট গভীর গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিলে প্রবেশন অফিসারের যোগ্য কাজ হবেনা। তাই মিষ্টি করে চাইলাম রেখার দিকে, মিষ্টিতর কণ্ঠে বললাম, কিছু মনে করো না রেখা, উনি সিয়ালদহ কোর্টের অফিসার, সরকারী কাজে এসেছেন। এঁর সঙ্গে চটপট কাজটা সেরে নিই, ততক্ষণ তুমি তোমার বাবার কাছে বসোগে, কেমন? মাত্র মিনিট-পাঁচেক, তারপরই আবার তোমায় ডাকব আর গল্প শুনব তোমার হাতসাফাইয়ের—

হাতসাফাই কথাটা শুনেই হেসে ফেলল রেখা। হেসে কেটে পড়তে গেল। কিন্তু না, বার বার উচ্চারিত আমার নিষেধের কথা মনে পড়তেই মুখে হাত চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং খসিত আঁচলখানা কোনও রকমে তুলে নিয়ে অপুষ্ট শরীরে একটা হিল্লোল তুলে সুধীরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে যেতেই অঙ্গন বস করে বসে পড়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মুছতে লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, কি আনাব বল। মোগলাই পরোটা, কিমাকারি, না ফ্রেঞ্চ টোষ্ট? না এই আগুনে লিমন স্কোয়াস অথবা লস্সি? এখানে চমৎকার তরমুজের সরবৎও পাওয়া যায় কিন্তু।

অঙ্গন হাসল। নিঃশব্দ হাসি। সেই স্যাচারাল স্মাইল। উৎসবে ব্যসনেটের যা আঠার মত তার ঠোঁটে লেপটে থাকে।

আমায় আশ্চর্য করে দিয়ে অঙ্গন বলল, না দাদা, এখন আর কিছুই খাব না। এইমাত্র খেয়ে বেরিয়েছি।

সে কি, বারোটা বেজে গেছে, এখনও অফিসে না গিয়ে এখানে? কোন প্রবেশনারের বাড়ী যাবে বুঝি?

না, দাদা, অঙ্গন জবাব দিল, আপনার কাছেই এসেছি।

তা বটে। এমনি হঠাৎ মাঝে মাঝে সে আমার কাছে আসে বটে। আমরা আট জন প্রথম ব্যাচে প্রবেশন অফিসারের চাকরিতে ঢুকেছি সে ১৯৫৬ সালের মার্চে আর অঙ্গনরা চাকরি পেয়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে। গভর্ণমেণ্টের এই নতুন তৈরী-করা বিভাগের ক্রিয়াকাণ্ড একটু অভিনব ধরণের। চট করে বোঝা যায়, স্বাভাবে করাও কঠিন। অঙ্গন তাই মাঝে মাঝে বুঝতে আসে।

তাই বললাম, বেশ, বল কি কেস।

কেস গুরুতর। বলে হাসতে হাসতে সে পকেট থেকে একখানা হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা বার করে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাখানা মেলে আমার হাতে দিল, পড়ে দেখুন।

১৯৫৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের শেষ সহর সংস্করণ হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ওপরেই বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তেতাল্লিশ নম্বর বিজ্ঞাপন :—

Applications are invited for the under mentioned posts :—

(a) Superintendent of District Jail or Deputy Superintendent of Central Jail other than Presidency Jail (one post.—Permanent). Women unsuitable.

বললাম, এই তোমার গুরুতর কেস? আর এই কেসটি দেখাবার জন্ত এই রোদে ভবানীপুর থেকে অফিসে না গিয়ে এখানে এসেছ? যাও, এখানা ভাঁজ করে যেখান থেকে বার করেছ সেখানে রেখে দাও। তারপর সুধীরকে ডাকি, তরমুজের সরবৎ খাওয়া যাক্—

মানে? অঙ্গন কাগজখানা ভাঁজ করতে দিল না, বলে উঠল, আমি কি ওখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে নিয়ে এসেছি নাকি? আপনাকে এ্যাপলিকেশন দিতে হবে, দাদা।

বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলাম। বুঝলাম, পাশের কক্ষের পার্টিসিপেট অফিসার কপাল কোঁচকালেন। জিজ্ঞেস করলাম, সাত?

তৎক্ষণাৎ সে জবাব দিল, লাভ চাকরি।

চাকরি! চাকরিত একটা করছি।

এটা অনেক বড় চাকরি।

শোন অঞ্জন, ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এসব চাকরি আমাদের জন্য নয়। জেল ডিপার্টমেন্টে বিশ পঁচিশ বছর চাকরি করছেন, এমনি চালুরে সংখ্যাতীত। বহু সিনিয়র জেলার আছেন—

তাঁরা হতে পারবেন না দাদা, বাধা দিল অঞ্জন, আপনি সবটা পড়েই দেখুন না।

পড়তে লাগলাম :

Person having a lien on a permanent post in the Home (Jails) Department, West Bengal, who are eligible for appointment to the post of Superintendent of District Jail! Deputy Superintendent of Central (of Central Jail) by promotion, are not elligible to apply.

সুতরাং আপনার হয়ে যাবে। অঞ্জন উপসংহার টানল।

আশাবাদীকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। বয়সটা আমার কত ভেবে দেখেছ?

কেন, অঞ্জনের উৎসাহ এবার বেড়ে যাচ্ছে, ওতে ত লিখেই দিয়েছে, রিকিউজি আর পলিটিক্যাল সাফারার হলে এজ রিলাক্সেশন পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন করলাম, বেশ, কত বয়স চেয়েছে?

চল্লিশ।

রিলাক্সেশন কত দেবে মোট?

পাঁচ বছর।

তাহলে হল পঁয়তাল্লিশ। জিজ্ঞেস করলাম, আমার বয়স কত? সাতচল্লিশ বছর নয় মাস দশ দিন —তারপর ঘড়িটা দেখে যোগ করে দিলাম তেরো ঘণ্টা আঠারো মিনিট—

এবার অঞ্জন শব্দ করে হেসে উঠল, ওরে দাদা, আপনার দেখছি ঘণ্টা মেকেণ্ড পর্যন্ত মুখস্থ! কিন্তু সাতচল্লিশ ধরলে ত ঠিক হবে না। কারণ আপনি ত দু'বছর ধরে চাকরি করছেন আর সেই জেল ডিপার্টমেন্টেই। সেটা বাদ যাবে।

বললাম, তাতেও হবে না, তাতেও তুমি আমায় চাকরি দিতে পারবে না। আমার চাকরি দু'বছর হয়নি। গত বছর মার্চে ঢুকেছি: তখনই আমার বয়স ছেচল্লিশ বছর তিন মাস ছিল।

তাহলে সেটাই ধরা হবে। অঞ্জন মন্তব্য করল।

বেশ, সেটাই ধর। কিন্তু তাতে কি পঁয়তাল্লিশ পাচ্ছ?

হিসেবের প্যাঁচ ভাল লাগছিল না বোধহয়। তাই জোর করে বলে উঠল, ও কিছু না, বিজেনদা, মাত্র পনেরো মাস বেশী হচ্ছে। যদি পছন্দ হয়। তাহলে ওটা আর দেখবে না কমিশন।

দারুণ আশাবাদী ছোকরা। আর দাদার বন্ধু সম্বন্ধে ধারণাটা বোধহয় পাহাড় সমান উঁচু! মনে করে, বিজেনদার সঙ্গে কথা করে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দ এতখানি বিগলিত হয়ে যাবেন যে, বয়সের গোলমালটা আর তাঁরা আমলই দেবেন না। মাত্র কয়েক মাসের চাকরি কিনা, তাই জানেনা যে, আমার আবেদনপত্র থ্রু প্রপার চ্যানেল অর্থাৎ ইনসপেক্টার জেনারেল অব প্রিজন্স-এর মারফৎ পাঠাতে হবে এবং বয়স বেশী হয়ে গেছে দেখলে তিনি হয়ত আবেদন পত্রখানা কমিশনের কাছে আদৌ পাঠাবেন না।

ভ্রাতাকে অনেক জ্ঞানদান করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। সে কোথা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছে আমি চাকরি পেলে যে আসনে গিয়ে বসব, সে আসনে বর্তমানে যিনি বিরাজ করছেন, কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি অবসর গ্রহণ করে আসন খালি করে দেবেন আর সেই খালি আসনেই—

বাধা দিলাম, কোথায় সে মধুর সিংহাসন খালি হবে ?

অঞ্জন জবাব দিল, দমদম সেনট্রাল জেলে! ওখানকার ডেপুটি সুপার রজনী চক্রবর্তীর অবসর আসন্ন। ওঁর জায়গাতেই—

কি করে জানলে ?

বাঃ, আমার জানতে অসুবিধা কি। অঞ্জন জোর দিয়ে বলল, আমাকে যে প্রায়ই দমদম যেতে হয়।

কথাটা ঠিক হতেও পারে। শিয়ালদা কোর্টের আসামীরা দমদমেই থাকে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে অঞ্জনকে সেখানে যেতে হয়।

কিন্তু, এর পরেও 'কিন্তু' আছে। এবার সেই কথাটাই পাড়লাম, শোন অঞ্জন, স্বীকার করলাম, চেয়ার খালি হয়নি এখনও এবং খালি হবে। কিন্তু ভাই, শালা-বোনাই নামধারী একটি সম্প্রদায় আছেন, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আসনখানি চিরকাল তাঁদের জন্য সংরক্ষিত, সে খবরটা বোধহয় তোমার জানা নেই। মহারাজ নন্দের শালক বাচাল কি করেছিল ? চাণক্যের মত পণ্ডিতের টিকি টেনে ধরেছিল আর চুল ধরে টেনেছিল নন্দের সংসা মুরার। তাতে পারিষদরা কি বলে তাহির করেছিল মনে পড়ে ? শালকের শাস্ত গুন বাপ। বাচাল মহারাজার শালক। মহারাজ ওর বোনাই। ধরো না বাবা!

আবার হেসে উঠলাম। সার্টিফিকেট অফিসার মনে মনে এবার বোধহয় গাল দিলেন!

মাঝখানের পার্টিশন মানে, কাঠের ফ্রেমে আঁটা ক্যাম্বিস, ছ'ফুটের বেশী উঁচু হবে না। যাকে বলে আব্রু রক্ষা। এ পাশের কথা কেন, বোধহয় নিঃশ্বাসটাও শোনা যায়। সাদা রং লাগানো না থাকলে বোধহয় দেখাও যেত।

আমার হাসিতে অঞ্জন দমে গেল বটে, কিন্তু তথাপি হাল ছাড়ল না। সে পাত্রই নয় সে। বলল, আপনার সব কথাই মেনে নিচ্ছি বিজেনদা। কিন্তু আমার বক্তব্য যে, যা যা বললেন, তা সব ক্ষেত্রে নাও ত হতে পারে। কতকগুলি ব্যাপারে অমনি হয়েছে বলে যে সর্বদাই সব ব্যাপারে তাই-ই হবে, তা কি বলা যায় ?

এবার লজিক আওড়াচ্ছে শ্রীমান। আই. এ-তে ওর লজিক ছিল, বি-এতে ফিলজফি।

সুতরাং স্বীকার করলাম, তা বলা যায় না বটে।

অতএব আপনাকে দরখাস্ত করতে হবে। অঞ্জন হারিয়ে-ফেলা উৎসাহ ফিরে পেয়েছে, এবং তা দু'চার দিনের মধ্যেই। লাষ্ট ডেট ১২ই অক্টোবর। দেরী নেই, বুঝলেন বিজেনদা ?

বললাম, আচ্ছা, কাগজখানা রেখে যাও, ভেবে দেখি।

না, না, ওসব ভাবাভাবি চলবে না। এবার তার কণ্ঠে আবদার বা অনুরোধের সুর নেই, একেবারে দাবী জানাল, আপনি কথা না দিলে চলবে না। ঐ ত এ্যাওয়ারসন হাউস, যদি বলেন, আমি এ্যাপলিকেশন করম্ এনে দিচ্ছি।

বললাম, না, না, এই রোদের মধ্যে তোমার আর যেতে হবে না, আমি সুধীরকে দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি! তুমি বসো, আইনক্রিয় আনাই।

খুশী মনে বলে উঠল অঞ্জন, সঙ্গে একটা রাজভোগ। [ক্রমশঃ]

• • • •

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তে, অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় ৪৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সন্নিকটে মদন মিত্র লেনের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমিতির যুবদলের সহিত কয়েকবার মিলিত হন এবং সামান্য একটি কাঠের টুলে বসিয়া তাঁহার নবরচিত কয়েকটি বাউল গান প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাহিয়া শোনান। সেই সব গানের প্রথম প্রচার এই ভাবেই হয়। নিম্নলিখিত গানগুলি অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগকে তাঁহাদের ব্রতে উৎসাহিত করিবার জন্যই মুখ্যতঃ রচিত হয়। কবির উদাত্ত কণ্ঠে গীত আহ্বানের শ্রোতা এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন।

"ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা…"

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,"

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে।"

"নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।"

"আমি ভয় করবো না ভয় করবো না।"

"নাই নাই ভয়। হবে হবে জয়"। "খুলে যাবে দ্বার,

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে।"

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।"

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।"

বলাই বাহুল্য স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃসাহসিক ব্রতে ব্রতী যুবকবৃন্দকে উদ্দীপনা যোগাইবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

অত্যন্ত দুরন্ত ছেলে। কিছুতেই তাকে বাগ মানানো যায় না। সহজে কোন কিছুকে সে মেনে নেয় না, প্রমাণ চায়, পরীক্ষা করে দেখতে চায়। ছেলেকে নিয়ে বাপ অহিপ্রর চিন্তিত, কেমন করে তাকে শান্ত করা যায়, কেমন করে তার মন সংসারের দিকে ফেরানো যায়, এই চিন্তায় তিনি পীড়িত। সেই সময় সেই গ্রামে ছিলেন এক নামকরা ব্রহ্মচারী। তাঁর অসামান্য শক্তির কথা সকলেই বলাবলি করত, দেব দেবীও তিনি নাকি বেহমুক্ত, সাধু বলতেন, তাঁর শরীর অপাপবিদ্ধ তো বটেই, অ-বন্দুকবিদ্ধও বটে। এমনি সব রটনা।

একদিন পিতা তাঁর দুরন্ত পুত্রটিকে সেই সাধুর কাছে নিয়ে গেলেন। যদি সাধুর আশীর্বাদে পুত্রটি শান্ত হয়, সুবোধ হয়, এই আশায় পিতা ছেলেটিকে সাধুর সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন।

এই সাধুর সম্বন্ধে ছেলেটির মনেও দুর্বার কৌতূহল জেগেছিল, কেমন সে সাধু, একবার পরীক্ষা করে দেখতে হয়। তাই সে সহজেই বাপের সঙ্গে গিয়েছিল সাধুর কাছে।

বাঘোচিত মুকাহি ছেলেটিকে দেখে সাধু খুশী হলেন এবং তাকে অনর্গল উপদেশ দিতে লাগলেন।

অবশেষে ছেলেটি বললে, শুনেছি, আপনি নাকি এত উঁচুতে উঠেছেন যে গুলীর ঘায়ে আপনার শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। একথা কি সত্যি?

সাধু বললেন, হ্যাঁ, সত্যি!

তারপরেই সে এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। ছেলেটি হঠাৎ পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে সাধুর দিকে লক্ষ্য করে বললে, আপনাকে আমি গুলী করে পরখ করতে চাই। আপনি রাজী আছেন?

বাপ হাঁ হাঁ করে উঠলেন। এ যে তাঁরই পিস্তল! তিনি জানতেন না যে ছেলেটা তাঁর পিস্তল সঙ্গে এনেছে!

ছেলেটার কাণ্ড দেখে সাধু আর ছেলেটির বাপ দু'জনেই হতভম্ব। সামলে নিয়ে সাধু বললেন, যে আত্মিকে বন্দুকের গুলীতে অবিদ্ধ বলি, সে আমি এই দেহ নয়, সে হল আমার আত্মা। আত্মা অমর।

ছেলেটির মুখে অশ্রদ্ধা ফুটে উঠল। আত্মা অমর। সে তো সবাই জানে! শুধু বড় বড় কথা! সোনা নয়, পরখ করে দেখা গেল, এ নেহাৎই পিতল। বাপের সঙ্গে ছেলেটি বাড়ী ফিরে এলো।

এমনি মন ছিল সে-যুগের এক সর্বত্যাগী স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসীর, সংসারে যাঁর নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংসার ত্যাগ করার পর যিনি নিরালম্বস্বামীরূপে দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। সব কিছুকে জানতে হবে, তলিয়ে বুঝতে হবে এবং যাকে সত্য বলে মনে করা হবে আজীবন তারই সাধনায় মগ্ন থাকতে হবে—এই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। তাঁর কাছে একমাত্র সত্য ছিল তাঁর দেশ, দেশমাতৃকার শৃংখল মোচন করতে তিনি নিজের জীবনকে নিবেদন করেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া দেশের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। তাই সেই মন্ত্রেই তিনি তাঁর দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তিনি। বরোদায় অবস্থান কালে শ্রীঅরবিন্দের কানে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মন্ত্র দেন এই সন্ন্যাসী। পরবর্তীকালে বীরশ্রেষ্ঠ বাঘা যতীন মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সাধনায় এই সন্ন্যাসীর কাছেই দীক্ষা নেন। বাঘা যতীন ছিলেন স্বাধীনতা-যুদ্ধের পথে বিজয়-মন্ত্রের স্বর্ণধ্বজা। আর সন্ন্যাসী যতীন ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম আচার্য, আদি-প্রবর্তক, স্রষ্টা। তাই তাঁর নাম হয়েছিল বিপ্লবের ব্রহ্মা।

আমাদের দেশে ঈশ্বর লাভের জন্যে বহু সাধক গৃহত্যাগ করেছেন, ঘরের মায়া ও সমাজের বন্ধন

কাটিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। যতীন্দ্রনাথও গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সন্ন্যাস নির্জনে সাধনে ভজনে ব্যয় হয়নি, সংসার ও সমাজের মধ্যে থেকে দেশের স্বাধীনতালাভের জন্যে সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর সন্ন্যাসী-জীবনের একমাত্র ব্রত। বিখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি বই-এ যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন—"যতীন্দ্রনাথের নিজ মুখে শোনা যে তিনি কখন দেশপ্রেমে ও দেশের কথা আলোচনা করতে করতে শ্রীঅরবিন্দকে রাজনীতিতে টানেন এবং তাঁকে বাংলায় আনেন। তখনকার দিনে বাংলার চেয়ে মারাঠা দেশ ছিল রাজনীতিতে বেশী অগ্রসর। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কল্পনা ও ব্যবস্থায় বাংলার তুলনায় মারাঠা দেশ অগ্রণবিক ছিল। লোকমান্য তিলক তখন সে দেশের প্রকাশ্য দেবতা। তিনি দেশকে জাগাবার জন্যে গণপতি উৎসব, শিবাজী উৎসবের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলি উৎসবের রাত্রে অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারী আয়ার্স্ট ও র‍্যাণ্ড গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হয়। তিলক সন্দেহে ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। মারাঠা দেশ তখন হাতে কলমে কাজ করার দিক থেকে সারা ভারতের রাজনৈতিক গুরুর আসনে আসীন।

মহারাষ্ট্রের তিলক সারা ভারতের ললাট-তিলক হয়ে উঠলেন। এই তিলকের কথা বলে বলে যতীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের হৃদয় রঞ্জন করতেন।"

যতীন্দ্রনাথের জন্ম, বাংলা ১২৮৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর ১৮৭৭ বর্ধমান জেলার খানা জংশনের নিকটবর্তী চম্পাগ্রামে। তাঁর পিতার নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সরকারী চাকুরে, ম্যাজিস্ট্রেটের সেরেস্তায়।

চম্পাগ্রামে বিখ্যাত বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। এইখানে বসে সাধক কমলাকান্ত তাঁর সাধনার বল খাটতেন। এই বিশ্বমাতা বিশালাক্ষী দেবীমাতারূপে যুবক যতীন্দ্রনাথের হৃদয় হরণ করেন। মন্দিরের দেবতা দেখা দিলেন দেশজননীরূপে। আনন্দ মঠের সন্তান জেগে উঠলেন। যতীন্দ্রনাথের অন্তরে সেই জাগরণের মন্ত্র হল, বন্দেমাতরম্। পণ হল, জীবন সর্বস্ব ও ভক্তি। সন্তানের বাবা মা, ভাইবোন, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, আছে কেবল সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা, শস্যশ্যামলা মা।

ছেলেবেলায় যতীন্দ্রনাথ যেমন সাহসী তেমনি দুর্দান্ত ছিলেন। ছেলেদের মধ্যে তিনি ছিলেন ডামপিটে সর্দার। অমাবস্যার রাত্রে বনে জঙ্গলে ভূত ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াতেন, খেলাধুলোয়, দৌড়ঝাঁপে, সাহসিকতায় তাঁর সমকক্ষ সে গ্রামে কেউ ছিলনা।

মায়ের স্নেহযত্নে আর কৌশলে দুরন্ত বালক ক্রমে শান্তশিষ্ট হল। গ্রামের পড়া শেষ করে যতীন্দ্রনাথ বর্ধমান-রাজ-স্কুলে ভর্তি হলেন এবং সেখান থেকে প্রবেশিকা পাশ করলেন। তারপর এলাহাবাদে গিয়ে সেখানকার কায়স্থ পাঠশালা কলেজে এফ. এ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। সেই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেই কলেজের অধ্যক্ষ। ছুটির দিনে যতীন্দ্রনাথ চলে যেতেন এলাহাবাদের গ্রাম অঞ্চলে, হিন্দীভাষা শিখতেন আর দেহাতী মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হতেন।

বৈঁচি গ্রামের হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। যতীন্দ্রনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর হিরণ্ময়ীও সন্ন্যাস নেন। তাঁর নাম হয় চিন্ময়ী দেবী।

যতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু কে তা জানা যায় না। কথিত আছে, এলাহাবাদে ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার নর্মদা দর্শন করতে যান। নর্মদাতীরে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ যতীন্দ্রনাথ এবং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকে স্বরাজ-মন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং বাংলায় গিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে নিরত হতে উপদেশ দেন।

যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই যতীন্দ্রনাথ পরাধীনতার তীব্র জ্বালা অন্তরে অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলেন। পরাধীন ভারতে আমরা "নিজ বাসভূমে পরবাসী", আমাদের মান ইজ্জত নেই, আত্মপ্রকাশের সকল পথ অবরুদ্ধ, পরাধীনতার পাষাণভারে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সর্বনাশ ঘটছে। এই অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্যে একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যতীন্দ্রনাথের চিন্তা হল, কেমন করে 'ভেতো' বাঙালীর ভীরুতার অপবাদ ঘোচানো যায়। সেনাদলে ভর্তি হতে হবে, সৈনিক হতে হবে, ভারতের প্রয়োজন বীর সেনানীর, যারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দেশের জন্যে লড়বে।

কিন্তু কেমন করে তাঁর সে আশা ফলবতী হবে? ইংরেজ সৈন্যদলে বাঙালীর প্রবেশ নিষেধ। ইংরেজ বাঙালীকে সন্দেহ করে আর বলে, বাঙালী সৈনিক হবার উপযুক্ত নয়। এ দুর্নাম তাঁকে ঘোচাতেই হবে। সংকল্প করলেন কোন সামন্তরাজ্যের সৈন্যদলে ভর্তি হবেন। গৃহত্যাগ করে নানা দেশ ঘুরে বেড়ালেন, অবশেষে পৌঁছলেন ভরতপুরে। কিন্তু সেখানেও তাঁর আশা সফল হল না। ভরতপুর রাজা তাঁকে সৈন্যদলে নিতে রাজী হল না।

ভরতপুরের এক মঠে ছিলেন এক বাঙালী মোহন্ত। তিনি যতীন্দ্রনাথকে বরোদা রাজ্যে যাবার পরামর্শ দিলেন, বললেন, বরোদার মহারাজের খাস সচিব হলেন একজন বাঙালী যুবক, তাঁর কথা মহারাজ সর্বদা মান্য করেন, অতএব তিনি যদি যতীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেন তাহলে তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

যতীন্দ্রনাথ গেলেন বরোদায়। বরোদা মহারাজের খাস সচিব তখন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর বন্ধু ছিলেন, বাসীরাও যাদব, লেফটেন্যান্ট মাধবরাও যাদব, বেলপাতে প্রমুখ বড় বড় রাজকর্মচারী। শ্রীঅরবিন্দের উদ্যোগে এবং এদের সহায়তায় যতীন্দ্রনাথের সেখানকার সৈন্যদলে প্রবেশ করা সম্ভব হল। সেখানে তিনি নাম নিলেন, যতীন্দ্র উপাধ্যায়।

যতীন্দ্রনাথ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে প্রথমেই সৈন্য দলে উঁচু পদ পেতে পারতেন। কিন্তু সৈন্যদলের সকল স্তরে কাজ করে অভিজ্ঞতায় মনের পাকা করে তোলার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর, তাই সামান্য সৈনিক রূপেই কাজ আরম্ভ করলেন। তারপর নিজের কর্মকুশলতার গুণে দ্রুত পদোন্নতি হয়ে ষোড়শওয়ার সৈন্য থেকে তিনি মহারাজার শরীররক্ষী নিযুক্ত হলেন।

"লম্বা চওড়া চেহারা, অতি সবল দেহ, মুখে চোখে প্রতিভার দীপ্তি, তীক্ষ্ণধী যতীন্দ্র উপাধ্যায় একবার কথা আরম্ভ করলে নিজের প্রতিপাদ্যটি স্থাপিত করে তবে ছাড়তেন।"

শ্রীঅরবিন্দ উপাধ্যায়কে অত্যন্ত ভাল বাসতেন এবং দাদা সম্বোধন করতেন। দু'জনের মধ্যে নানা কথা, নানা আদর্শের আলোচনা হত। দুজনের মনেই একই সুরের ঝংকার। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁরা পরস্পরের সাথী হলেন। তাঁদের আদর্শ ও পথ এক হল, তাঁরা সহধর্মী, সহকর্মী হলেন। যতীন্দ্র উপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দকে সশস্ত্র বিপ্লবের কাজ আরম্ভ করার জন্যে বাংলার দিকে পথ দেখালেন।

এই সূত্রে ভগিনী নিবেদিতার অবদানের উল্লেখ করা দরকার। নিবেদিতা তাঁর গুরুদেব বিবেকানন্দের অসমাপ্ত কার্য সম্পাদনের জন্যেই বিপ্লবীদল সৃষ্টি করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন "ভারতমাতা সহস্র যুবক বলি চান।" বলেছিলেন, "হে ভারত, ভুলিও না, জন্ম হইতেই তুমি মায়ের কাছে বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ সেই মহামায়ার ছায়ামাত্র—ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে বল,

ভারতবাসী আমার ভাই, আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

বিবেকানন্দের সেই বিদ্যুৎগর্ভ ভারতমন্ত্রের মধ্যে যে সর্বাঙ্গীন মহাবিপ্লবের সুর ধ্বনিত হচ্ছে, সেই সুরে প্রেরণা পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বুঝেছিলেন, পরাধীনতার পাশ মুক্ত না হলে ভারতের আত্মপ্রকাশের রুদ্ধ পথ কোনদিন খুলবে না। তাই তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে হাত মেলালেন।

১৯০১ সালে বরোদার মহারাজার আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতা সেখানে যান। সে সময় শ্রীঅরবিন্দ এবং যতীন্দ্র উপাধ্যায় সেখানে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হল। আলোচনা হল নানা বিষয়ের, সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও বাদ গেল না। অরবিন্দ নিবেদিতা ও যতীন্দ্রনাথের মধ্যে এই যোগাযোগ, পুণ্য ত্রিধারায় এই সঙ্গম, ভারতের বিপ্লব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯০২ সালে অরবিন্দ পুনায় ধাপুর সহরের গুপ্ত সমিতির সভ্যরূপে দীক্ষা নিয়ে গুজরাট বিভাগের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তারপর বাংলায় এসে তাঁরা রটনা করলেন, সারা ভারত বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত, কেবল বাংলা কাপুরুষের মত পিছনে পড়ে আছে। এই প্রচার বাঙালীকে লজ্জা দিয়েছিল এবং তার সুপ্ত দেশ প্রেমকে জাগ্রত করতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল।

এই সময় ১৯০২ সালে কলকাতায় অনুশীলন সমিতি গড়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন ধর্মতত্ত্ব' নামে বিখ্যাত রচনাটি ছিল এই সমিতির আদর্শ। অনুশীলন ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দিয়েছেন অখণ্ড মনুষ্যত্বের আদর্শ আর দিয়েছেন আনন্দমঠ। আনন্দমঠের বন্দে মাতরম মন্ত্রই হল আমাদের অভয় মন্ত্র অশোক মন্ত্র। অনুশীলন ধর্মতত্ত্ব এবং আনন্দ মঠ, এই দুইএর ভাব অবলম্বনে অনুশীলন সমিতির উদ্ভব।

ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র বা পি. মিত্র ছিলেন এই সমিতির পরিচালক। মৈহাটিতে তাঁর বাড়ী। তিনি ঋষি বঙ্কিমের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন, আনন্দমঠের হাওয়া তাঁর গায়ে লেগেছিল।

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কলকাতার সতীশ বসু। সোদপুরের স্বদেশপ্রেমিক শশীভূষণ চৌধুরী, (শশীদা) মিত্তির সাহেবকে অনুশীলন সমিতিতে আনেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদে ধন্য হয়েছিল সমিতি। স্বামীজী আনন্দের সঙ্গে প্রীতির সঙ্গে এই বিপ্লবী তরুণদের উপদেশ দিতেন। ছেলেরাও বেলুড়মঠে যাতায়াত করতেন।

মিত্তির সাহেব সতীশ বসু প্রভৃতিকে বলেন, বরোদা থেকে একটা দল এসেছে, তাদের একই উদ্দেশ্য, তারা সমিতির সভ্যদের সামরিক শিক্ষা দেবে। বাংলার ভাগ্যক্রমে এবং মিত্তির সাহেবের উদ্যোগে এই দুই বিপ্লবী দল মিলে গেল। মিলিত দলের সভাপতি হলেন পি. মিত্র সহ-সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও শ্রী অরবিন্দ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন ঠাকুর। এই সময় জাপানী অধ্যাপক মানব-প্রেমিক ওকাকুরা কলকাতায় আসেন এবং শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভারতের মুক্তির বাণী প্রচার করেন।

১৯০২ সালে যতীন্দ্রনাথ এলেন কলকাতায়। সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের চিঠি সরলাদেবীর নামে। সরলা দেবী তখন বাংলার যুবসমাজকে উদ্বোধিত করবার জন্যে এবং তাদের সাহস ও দৈহিক শক্তি অনুশীলনের জন্যে বীরাষ্টমীর প্রবর্তন করে সারা দেশে নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য প্রবাহিত করেছেন।

যতীন্দ্রনাথ সরলা দেবীর সঙ্গে পরিচিত হলেন, তারপর মিত্তির সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিলেন।

অনুশীলন সমিতির আড্ডা ছিল যখন মিত্র লেনে। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে যতীন্দ্রনাথ ১০৮ নং আপার সারকুলার রোডে সস্ত্রীক বাসা বাঁধলেন। আসলে সেটা হল বিপ্লবীদের নীড়। যতীন্দ্রনাথের এই বিপ্লব চক্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে ডাঃ যাদুগোপাল লিখেছেন—"এটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিপ্লবী-নীড়। এখানে ঘোড়দৌড়, সাইকেল চালানো, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা শেখানো হত এবং বিপ্লববাদে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে ভগিনী নিবেদিতা এই বিপ্লবনীড়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দিয়েছিলেন বিপ্লববাদের কতকগুলি বই। তার মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, তাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, ইতালীর মুক্তিদাতা ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী, রমেশ দত্ত, তিলক ও দাদাভাই নৌরোজীর অর্থনীতির বই, অধ্যাপক ওকাকুরার বই এবং আরও অনেক গ্রন্থ। যতীন্দ্রনাথকে রাজনীতি শেখাবার জন্য ও সংগঠনের জন্য তিনি এই বইগুলি বিশেষ করে তাঁকেই দেন।"

সার্কুলার রোডের এই রাজনৈতিক স্কুলে যে সব ছাত্র এসে জড়ো হলেন তার মধ্যে ছিলেন সতীশ বসু, মন্মথ মিত্র, যতীন ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, নলিনী মিত্র, ভূপেন দত্ত, ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিপিন গাঙুলী প্রভৃতি। এখানে সখারাম গনেশ দেউস্কর অর্থনীতির ক্লাস নিতেন। মিত্তির সাহেব পড়াতেন ইতিহাস। যতীন্দ্রনাথ পড়াতেন রাজনীতি। যতীন্দ্র নাথ প্রবন্ধও লিখতেন। ভারতী পত্রিকায় তিনি ইতালীর বিপ্লব সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

এরপর অনুষ্ঠিত হল এক অপূর্বসম্মেলন। যোগেশ বিদ্যাভূষণ সেইসময় নানাপ্রবন্ধ ও পুস্তকে বিপ্লবের আগুন জ্বেলেছেন, উদ্দীপনাময় বাংলায় ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী লিখে সাধারণের কাছে তাঁদের কথা প্রচার করেছেন। তাঁরই বাড়িতে১৯০৩সালে মিলিত হলেন, শ্রীঅরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ, ললিত চট্টোপাধ্যায় এবং বাঘা যতীন।

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় সার্কুলার রোডের বিপ্লবনীড় নানা দিকে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হোতে লাগল। বাংলার যুবকরা শুনলো এক উদাত্ত আহ্বান। সর্বত্যাগ, সর্বস্ব দানের আহ্বান। সে আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে কী সে উন্মাদনা, কী সে আবেগ চঞ্চলতা, কী সে বলসংকল্প! সারা বাংলা দেশ, উড়িষ্যা ও বিহার—সর্বত্র প্রসারিত হোতে লাগল বিপ্লবীদের বহুমুখী কর্মতৎপরতা। গ্রামে ও শহরে কেন্দ্রের পর কেন্দ্র গড়ে উঠল, চক্রের পর চক্র।

কিন্তু এই কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যেই এলো এক দুর্দিন। এলো মতবিরোধ, এলো ভুল বোঝাবুঝি! বিপ্লব নীড়ের নিয়মশৃংখলা রক্ষার ভার ছিল যতীন্দ্রনাথের উপর। সে বিষয়ে তিনি ছিলেন কড়া এবং শক্ত মানুষ। কিন্তু অনেক তরুণ সভ্য তাঁর এতটা কড়াকড়ি পছন্দ করতেন না। তারপর ঘটে গেল এক ঘটনা যার জের চলল অনেক দূর পর্যন্ত। কয়েকজন যুবক অনুমতি না নিয়ে একদিন উধাও হল। তারা ফিরে এলে যতীন্দ্রনাথ চাবুক হাতে নিয়ে তাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন। প্রথমে তারা নীরব রইল তারপর স্বীকার করল যে একজনের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে তারা তারকেশ্বরে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা যতীন্দ্রনাথের কাছে আগেই অভিযোগ করেন যে, কয়েকজন যুবক তাঁর রিভলভারটি তাঁর কাছ থেকে ধার নিতে গিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে নিবেদিতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। পিস্তল তো দিলেনই না, উল্টে যতীন্দ্রনাথের কাছে কথাটা ফাঁস করে দিলেন।

এই ব্যাপার শেষ পর্যন্ত অতিশয় বেদনাদায়ক পরিণতিতে পৌঁছলো। ব্যাপারটা সভাপতি মিত্তির সাহেবের কাছে এমন ভাবে পেশ করা হল যাতে তাঁর মন যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠল এবং শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথকে অপসৃত করাই সাব্যস্ত হল।

যতীন্দ্রনাথের মনে কারুর প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না। তিনি বিনা প্রতিবাদে নিজের হাতে গড়া সার্কুলার রোডের বিপ্লবনীড় ত্যাগ করে সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে এক বাসায় উঠে গেলেন। এই ঘটনা ঘটে ১৯০৪ সালে।

যতীন্দ্রনাথের আহ্বানে শ্রীঅরবিন্দ এসে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়ে গেলেন এবং তারপর কিছুদিন মিলেমিশে কাজও চলল বটে, কিন্তু মনের মিল আর স্থায়ী হল না। আবার গৃহবিবাদ বাধলো। যোগেশ বিদ্যাভূষণ নিজে মিত্তির সাহেবকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। ডাঃ যাদুগোপাল বলেছেন—"যতীন্দ্রনাথকে দল থেকে চলে যেতে বাধ্য করা বা অপসারণ করা বাঙালী চরিত্রের একটা মস্ত দুর্বলতার কলঙ্ক।"

যতীন্দ্রনাথের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল, একথা পরে ডঃ ভূপেন দত্ত ও দেবব্রত বসু স্বীকার করেন।

যতীন্দ্রনাথ কিন্তু আঘাত পেয়ে ভেঙে পড়েন নি। বীরের মতো তিনি দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় তুলে নেন। এই নিয়ে তিনি কোন অভিযোগ করেন নি, কারুর বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় দেন নি।

১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি দাদাভাই নৌরজী ঘোষণা করেন, স্বরাজ আমাদের লক্ষ্য, স্বরাজ আমরা চাই।

স্বরাজ স্বাধীনতা এবং বিপ্লবের কথা প্রচারের এই সুযোগে ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে সাপ্তাহিক যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হন ডঃ ভূপেন দত্ত।

যুগান্তর নামটিও তাঁরই দেওয়া। এখানে যুবকদের সঙ্গে মিত্তির সাহেবের মতান্তর হয়। যুবকরা আলাদা হয়ে যুগান্তর পার্টি গঠন করেন। এই ভাবেই দুই দল অনুশীলন ও যুগান্তর দল গড়ে উঠে।

সার্কুলার রোডে বিপ্লবনীড়ের কাজ যখন চলছিল তখন যতীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদ প্রচারের জন্যে বাংলার বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। এই সূত্রে ১৯০২ সালে তিনি চন্দননগরে যান। সেখানে তাঁরই চেষ্টায় "সুরধুনী মন্দিরে" নামে একটি বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এইখানেই বিপ্লবী শিরোমণি রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং রাসবিহারী তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কথিত আছে, তরুণ বয়সে রাসবিহারী অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে মড়ার মাথা নিয়ে খেলা করতেন দেখে যতীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, তাঁকে কাছে ডাকেন এবং তাঁকে আপন করে নিয়ে স্বাধীনতার সংকটময় পথে তাঁকে এগিয়ে দেন। মানুষ চিনতেন যতীন্দ্রনাথ।

১৯০৬ সালে যতীন্দ্রনাথ ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পাঞ্জাবে গিয়ে উপস্থিত হন। পাঞ্জাবে বিপ্লবের বীজ তিনিই বপন করেন। তখন সর্দার অজিত সিং-এর খুব নাম। লালা লাজপৎ রায়ের সঙ্গে তাঁকেও ইংরেজ বিনা বিচারে দেশান্তরে পাঠিয়েছিল। তাঁর ভাই কিষণ সিং ছিলেন শহীদ ভগৎ সিং-এর পিতা। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী লালা হরদয়াল যতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর অনুরাগী ভক্তরূপে পরিগণিত হন। আমেরিকায় যুগান্তর আশ্রম স্থাপন করেন লালা হরদয়াল। তিনিই ছিলেন বহুখ্যাত গদর পার্টির নেতা।

এঁরা ছাড়া আরও অনেক কৃতবিদ্য সুসন্তান যতীন্দ্রনাথের কাছে বিপ্লবের দীক্ষা নেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, শিয়ালকোটের উকিল লালা অমর দাস ও সেখানকার বিশিষ্ট নাগরিক লালা সফল দাস ও ডাক্তার মুন্সি, পেশোয়ারের ডাক্তার চারু ঘোষ, এবং আম্বালার ডাক্তার হরিচরণ মুখোপাধ্যায়।

ঘুরতে ঘুরতে যতীন্দ্রনাথ নৈনিতালে গিয়ে পৌঁছান এবং সেখানে দেখা পান যোগীশ্রেষ্ঠ সোহহং স্বামীর। তাঁরই কাছে যতীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন, তাঁর নাম হয়—নিরালম্ব স্বামী।

১৯০৭ সালে "সন্ধ্যার" সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় পরলোক গমন করবার পর স্বামী নিরালম্ব কলকাতায়

এসে সন্ধ্যার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন এবং "মরি নাই, আমি আসিয়াছি" এই শিরোনামায় এক অসাধারণ তেজোদীপ্ত রচনা প্রকাশ করেন। "সন্ধ্যার" পরিচালকবর্গ এতো জোরালো আগামী লেখা হজম করতে পারলেন না। ফলে নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গে তাঁদের মতান্তর হল এবং তিনি "সন্ধ্যার" সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন।

তারপর তিনি মায়ের আদেশে চম্পাগ্রামে শ্মশানের ধারে তাঁর নিজের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ছেলে যাতে তাঁর কাছে থাকে সেই উদ্দেশ্যে তাঁর মা-ই সেই আশ্রম তৈরী করে দেন।

সিদ্ধযোগী ভিক্ষতী বাবার সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানপাদ।

১৯০৮ সালে মোজাফরপুরে বোমা ফাটার পর প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়।

তারপর সুরু হয় বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। সেই মামলায় স্বামী নিরালম্বকে আসামী করা হয়। শেষ পর্যন্ত প্রমাণাভাবে বিচারক তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন

১৯১৪ সালে নিরালম্ব যতীন ও বাঘা যতীনের পুনরায় সংযোগ ঘটে। সংযোগ স্থাপিত হয় বিখ্যাত বালেশ্বরের ঘটনা নিয়ে। বাঘা যতীন তখন একটি বাদে সবগুলি বিপ্লব প্রতিষ্ঠানের নেতা। তিনি নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লব সম্বন্ধে গোপন আলোচনা করেন। চব্বিশ পরগণার কর্মী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে এইসব আলাপ আলোচনা হয়। তিনি দু'পক্ষের দূত নিযুক্ত হন। দু'জনের পরামর্শের পর বাঘা যতীন বালেশ্বর যাত্রা করেন।

নিরালম্ব স্বামীর প্রধান বিপ্লব-শিষ্য ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে ইংরেজ সরকার রাঁচীতে স্থানান্তরী করেন। আলীপুর জেল থেকে বেরুবার পর মাত্র কয়েকদিন তিনি কলকাতায় থাকবার অনুমতি পান। সেই সময় নিরালম্ব স্বামী দক্ষিণাড়ার কাছে এক মিত্র দেনে অবস্থান করছিলেন। তিনি ডাঃ যাদুগোপালকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে নানা ভাবে উপদেশ দেন। স্বামীজী রাঁচী গিয়ে কয়েকদিন ডাঃ যাদুগোপালের কাছে ছিলেন। ডাক্তার যাদুগোপালকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন।

১৯১৮ সালে শহীদ ভগৎ সিং কলকাতা কংগ্রেস থেকে চম্পা আশ্রমে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন। ১৯১৯ সাণ্ডার্সকে হত্যা করবার পর ছদ্মবেশে তিনি স্বামীজীর উপদেশ নিতে আসেন। সে-সময় স্বামীজী বরানগরে যোগেন্দ্র বসাক রোডে বিজয়রত্নসন্তরবাবুর বাড়িতে বাস করছিলেন। এই বাড়ীতেই ১৯৩০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর স্বামীজীর দেহান্ত ঘটে। ডাঃ যাদুগোপালের কথায়—"বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার ব্রহ্মা এইভাবে একপ্রকার অগোচরে মহানির্বাণ লাভ করেন।"

১৯০২ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্যে স্বামী নিরালম্ব অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে যে বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রবর্তন করেন, পরবর্তীকালে তা বহু মানুষের সাধনায়, বহু মুখে বহু পথে বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তারলাভ করে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তিতে পরিণতি লাভ করে।

যতীন্দ্রনাথ পাদপ্রদীপের সামনে আসতে কুণ্ঠা বোধ করতেন। নেপথ্যে নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল তাঁর কর্মের ক্ষেত্র। দেশের জন্যে, দেশের লোককে মানুষ করে তোলার কাজে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। সেই সর্বত্যাগী, স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সাধক, সশস্ত্র বিপ্লবের প্রবর্তক মহামানব যতীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবার, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করছি।

গল্প ভারতীর পাতা থেকে

স্বদেশী যুগের স্মৃতি

অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায়

[বাংলা দেশে যে সময়টিকে আমরা স্বদেশী যুগ বলে চিহ্নিত করে রেখেছি, সেই সময়টুকুর মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ঘটে গিয়েছে। সেই যুগের ঘটনাবলীর মধ্যে আমাদের আজকের জাতীয় জীবনের প্রাণবীজ উপ্ত রয়েছে। একান্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের সেই অতি নিকটবর্তী অতীত সম্বন্ধে আমরা আজ উদাসীন, সেদিনকার বহু ঘটনা আজ এরই মধ্যে আমরা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছি। আজও যদি আমরা সজাগ হয়ে না উঠি, তাহলে আমাদের ইতিহাসের সেই স্বর্ণভূমি অচিরকালের মধ্যে রূপকথার জগতে হারিয়ে যাবে। তাই আজ আমাদের সর্বপ্রকারে উচিত, সেই যুগের কাহিনীকে সংকলন করা, যার উপর ভিত্তি করে একদিন আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস পুনর্গঠিত হবে। সেই যুগের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন, এমন অনেক লোক এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন কিন্তু তাঁরা সকলেই বৃদ্ধ হয়ে এসেছেন। একে একে তাঁরা কর্ম-ভূমি থেকে চিরবিদায় নিচ্ছেন। এবং তাঁদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের অনেক পাতাই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় ছিলেন সেই যুগের একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও কর্মী, তাঁর হাত দিয়ে সে যুগের বহু কৃতী যুবক তৈরী হয়েছেন। প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতি-বিজড়িত রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনিই ছিলেন প্রধান শিক্ষক এবং পরে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, সিটি কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনে তিনি অধ্যাপনা করে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর কৃতী ছাত্র নগেন্দ্রকুমার গুহরায় মহাশয় তাঁর কাছ থেকে এই স্মৃতি কথাটুকুর উদ্ধার করে রেখেছিলেন। অধ্যাপক রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলায়, পরলোক গমন করেন ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়। তিনি সে যুগের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর কৃতীছাত্র ছিলেন।]

—সম্পাদক

ভারতীয় স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস আরো পঞ্চাশ কি ষাট বৎসর পরে বোধ হয় ঠিকমত লেখা সম্ভব হইবে। তখন আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয় গবেষকগণ বর্তমান সময়ের দৈনিক কাগজের প্রকাশিত ঘটনাবলির প্রকৃত ফল কি হইয়াছে, তাহা তাহারা উত্তমরূপে বুঝিয়া নিন্দা ও প্রশংসা কাহার কতটুকু প্রাপ্য তাহা দিতে পারিবে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহার ইতিহাস

লর্ড ম্যাকলে প্রায় দুইশত বৎসর পরে লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। টিয়ার্সের ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তথাপি যাঁহারা "স্বদেশী আন্দোলনের" সময় সেই আন্দোলনে কিছু অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের লিখিত বিবরণের কিঞ্চিৎ মূল্য থাকিতে পারে মনে করিয়া আমার যাহা স্মৃতিতে রহিয়া গিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধিরূপে এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে একজন জবরদস্ত লোক তাহা পূর্বেই এদেশে প্রচার হইয়াছিল। তিনি মাসিডনাধিপতি সেকেন্দর বাদশাহের অবতার-রূপে এদেশের সব কিছুকেই ভাঙিয়া গড়িবার কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। ৺অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের—"সিরাজদ্দৌলা" ও "মীরকাসিম" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হওয়া মাত্র কার্জন বাহাদুর লালদিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তাহাতে ব্লাক্ হোলে যে সব ইংরেজ প্রাণ হারাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়, তাঁহাদের নাম খোদিত করাইলেন এবং স্মৃতি স্তম্ভটির নাম হোলো-ওয়েল মেমোরিয়াল রাখিয়া অক্ষয়বাবুর লিখিত ব্লাক হোলের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি অবশ্য আমাদের শ্রদ্ধাকর্ষণেরও যে চেষ্টা কিছু করিলেন, তাহাও বলিতে হইবে। তিনি রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবাস গৃহের প্রাচীর-গাত্রে প্রস্তর ফলকে তাঁহাদের নাম খোদাই করিয়া লাগাইয়া দিলেন। ইহাতে সকলে জানিতে পারিল, এই দুই মহাপুরুষ আমাদের জন্য কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও কিরূপ সংস্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

তৎপর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন উপলক্ষে তিনি চ্যান্সেলার রূপে বক্তৃতা প্রদানের সময় এশিয়াবাসীদিগের মধ্যে সত্যপরায়ণতার অভাব রহিয়াছে, এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়া এক বক্তৃতা করিলেন। তিনি আধুনিক কালের চার্চিল সাহেবের মত একজন বিশিষ্ট বাগ্মী বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং বাক্‌সর্বস্ব আমরা বাঙ্গালীরা অনেকে তাঁহার ভাবক শ্রেণীভুক্তই ছিলাম। এই বক্তৃতা শুনিয়া কিন্তু বাঙ্গালীরা একটু চটিলেন এবং তজ্জন্য হাইকোর্টের প্রধান উকীল ডাক্তার ৺রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে এক প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান হইল। এই সভায় ডাক্তার ঘোষ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মীতার সহিত লর্ড কার্জনের মতের তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। লর্ড কার্জন তজ্জন্য প্রগতিশীল বাঙ্গালীদিগকে জব্দ করার কাজে মন দিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতে বাঙ্গালী হিন্দুরাই সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতাকামী; তাহারাই রামমোহন রায়ের সময় হইতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতেছে এবং তাহারাই জাতীয়তাবাদী বা স্বাধীনতালাভের জন্য নানাপ্রকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছে। শিক্ষা বিষয়েও বাঙ্গালীরাই অগ্রসর; তাহারাই মাষ্টার ও প্রফেসার হইয়া সর্বত্র অগ্রগতির কথা ভাবে! অতএব ইহাদিগকে কিরূপে সংযত রাখা যায়, তাহার চিন্তা করিতে তিনি ব্যস্ত হইলেন। তজ্জন্য ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কার্জনসাহেব বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করার কথা উত্থাপন করিয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে প্রতিযোগিতার ও শত্রুতার ভাব বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করিলেন। বাঙ্গালীরা এই ভেদনীতির প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

এই বঙ্গভঙ্গ কার্যে মুসলমানদিগের সহায়তা আবশ্যক, এইজন্য লর্ড কার্জন মুসলমান নেতৃবর্গকে বুঝাইলেন যে ইহার দ্বারা তাঁহাদের প্রাধান্য লাভ হইতে পারিবে। তজ্জন্য তিনি ঢাকা যাইয়া নবাব সাহেবের অতিথিরূপে থাকাস্থিরা করিলেন ও মুসলমানদিগকে বঙ্গভঙ্গ কার্যে সহায় করিয়া লইলেন। হিন্দু জমিদারগণকেও যে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সম্মত করার চেষ্টা না করিলেন, তাহা নহে। ময়মনসিংহের জমিদার মহারাজা ৺সূর্যকান্ত আচার্যের আতিথ্য স্বীকার করিয়া আত্মীয়তা বর্ধনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মহারাজা

বাহাদুর দেশের মঙ্গলকারী ও মঙ্গলকারক। তিনি অচল অটল রহিয়া গেলেন। গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও মত বদলাইলেন না।

কার্জন সাহেব দেখিলেন যে, হিন্দুদিগকে সুপথে পরিচালিত করা সম্ভব নহে। তখন তিনি বিশেষভাবে মুসলমান তোষণ-নীতির পন্থাই অবলম্বন করিলেন। ১৯০৩ হইতে ১৯০৪ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের আলোচনা চলিতে লাগিল। বাঙালী হিন্দুরা একবাক্যে এই জাতীয়তা বা স্বাধীনতা বিরোধী নীতির সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যেই চিন্তাশীল লেখক, বক্তা, প্রচারক সকলেই বুঝিতে পারিলেন লর্ড কার্জন ভারতের চিরদাসত্ব বিধানের জন্যই বদ্ধ হইয়াছেন। লর্ড কার্জন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রের একটি ভারতবিরোধী ব্যাখ্যা দিলেন। ইহাতে চাকুরী সম্বন্ধেও শিক্ষিত লোকদিগের মনে হতাশ ভাবের সঞ্চার হইল। কেননা তিনি বলিলেন যে ভারতীয়েরা শিক্ষিত হইলেও ইংরাজদের ন্যায় বড় চাকুরী পাইতে পারেনা।

লর্ড কার্জন এদেশের অধিনায়ক রূপে যেন বাঙালীদিগকে উদ্বেলিত করা যায়, সেই সম্বন্ধেই নানা প্রকার কন্দির কথা চিন্তা করিতেন। তিনি এদেশে আসার পর ১৯০০ কি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কাজেও নানা ভাবে ইংরেজদের প্রভুত্ব বর্ধনের চেষ্টা করিলেন এবং তজ্জন্য ২৮ জন ("পাবনা আটাস"এর বীরগণ) মিউনিসিপাল কমিশনার একযোগে কার্য পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কার্যের প্রশংসা সকলেই করিতে লাগিল। লর্ড কার্জন যে বাঙালীবিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, সেই অগ্নিতে কিন্তু আজও আহুতি ভারতের সর্বত্র দেওয়া হইতেছে। আসামে এবং বিহারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের শাসনকালে বাঙালী হিন্দুর দুর্দশা ঘটিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট একরকম খোলাখুলিভাবেই বাঙালী হিন্দু নির্যাতন কার্যে মনোযোগ দিয়াছেন। ইহার কারণ বাঙালীদের দ্বারা এই প্রদেশগুলি উপকৃত হইয়াছে; কিন্তু এখন এই সকল প্রদেশের অধিবাসীরা কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া চাকরীজীবী হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙালীরাও চাকরীজীবী, কাজেই আমরা যেভাবে চাকরীজীবী হইয়া তাঁহাদের দেশে প্রাধান্য করিয়াছি, তাহার তিক্ত স্মৃতির প্রতিশোধ লওয়ার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়াছেন। বাঙালীরাই প্রধানতঃ ইংরেজ বিদ্বেষী, যদিও বাঙালীরাই ইংরেজদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিল এবং বাঙালীরাই ইংরেজ প্রদত্ত শিক্ষালাভ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। শয়তান যেভাবে ঈশ্বরবিরোধী ছিল, ঠিক সেই ভাবেই বাস্তুঘুঘু উপকারীর বিরুদ্ধবাদী ভারত, পাঞ্জাব এবং বঙ্গদেশের সাম্প্রতিক বিভাগ ব্যাপারেও আমার মনে হয় এই চাকরীজীবী মনোবৃত্তির ক্রিয়াই প্রধানভাবে নেতৃবর্গকে পরিচালিত করিয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানেরাই শিক্ষিত হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তজ্জন্য তাঁহাদেরই কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে দেশ ও প্রদেশগুলিকে ভাগ করার প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পার্থক্য বিশেষ কার্যকরী নহে। সুতরাং শতকরা ৯০ জনের জীবনে এই বিভাগের প্রয়োজন হয় নাই। মিঃ জিন্না প্রমুখ মুসলমান নেতারা শিক্ষিত সহকর্মীদিগের জন্যই ব্যস্ত হইয়া এই মাতৃহত্যা ব্যাপারের কার্যটি সম্পন্ন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস কৃষক ও মজুরদের মধ্যে কোন বীর জন্মিবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই ভাগযোগ ভাঙ্গিয়া মাতৃকে এক নূতন ছাঁচে গড়িবে।

মানুষ সৃষ্টির আদি হইতে ধনীলোকদের হাতে ক্রীড়নক হইয়া রহিয়াছে। এই সমাজ ব্যবস্থাকে না ভাঙ্গিয়া নবযুগ প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না। কংগ্রেস দলের নেতৃবর্গ নবযুগের কথা বলেন বটে, কিন্তু কার্যে প্রাচীন ভাবধারার পথে চলিতেছেন। প্রদেশে প্রদেশে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইহার মূলেও চাকরীজীবী মনোবৃত্তি। মহাত্মা গান্ধী ধনী লোকের আদর্শ একেবারে বর্জন করিয়া মনকে বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া কাজ করিতেন এবং জীবন পণ করিয়া সত্য পালন করিতেন। সত্যাগ্রহ তাঁহার পক্ষে ছিল প্রধান সাধ্য। সত্যকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেন এবং সত্যের জন্য জীবন ধারণ করিতেন।

লর্ড কার্জনের মনে যে এসিয়াবাসীদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব বর্তমান ছিল, তদ্বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। প্রাচীন সময় হইতেই জেনোফন প্রভৃতি লেখকেরা এশিয়ার লোক ভীরু কাপুরুষ যুদ্ধ কার্যে অপটু ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছেন। আজও শ্বেতকায় লোকেরা অশ্বেতকায় লোকদিগকে হেয় এবং অবজ্ঞাত মনে করেন। লর্ড কার্জনের সময়েই "Yellow Peril" অর্থাৎ মঙ্গলীয় জাতি ক্রমভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করিতেছিল এবং চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে একটা জাগরণ দেখা দিতে ছিল, তাহাতে শ্বেতকায় লোকেরা ভীত হইয়া উঠিতেছিলেন। ভিন্ ইং নামক একজন প্রসিদ্ধ লেখক তাঁহার "Outspoken-Essays" নামক গ্রন্থগুলিতে অনেক অপ্রিয় সত্য বলিয়া ইংরাজদিগকেও গালি দিলেন। জাপানীরা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রুশ ভল্লুকের পরাজয় ঘটাইয়া দিল। ইহাতে আমরা মনে মনে বেশ একটু খুশী হইলাম। বুয়রদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরাজেরা হারিয়া যাওয়াতেও আমাদের কিঞ্চিৎ আনন্দ হইল। জনৈক জাপানী লেখক ওকা কুরা এখানে আসিয়া অনেক অপ্রিয় সত্য আমাদিগকে বলিলেন এবং আমরা তাঁহার "Asia is one" নামক গ্রন্থ পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। ইতিপূর্বেই বরিশালে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে যখন অধ্যয়ন করিতাম তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের এশিয়া ও ইউরোপ সম্বন্ধে তুলনামূলক একটি বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলাম। আমাদের সমপাঠী ছাত্রগণের মধ্যে আত্মচেতনা জাগিতেছিল। আমরা যে ইয়োরোপীয়দিগের অপেক্ষা হেয়,—এই কথা আমাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য রহিল না। বরং আমরাই ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এই ভাব মনে বর্ধিত হইতে লাগিল। রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা ধর্ম বিষয়ে হিন্দুরা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা শিক্ষিত লোকেরা বহু পূর্বেই বুঝিয়া ছিলেন। এই সময় "Hindu Superiority" নামক একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এইভাবে বাংলা দেশের হাওয়াতে একটা উন্মাদনার ভাব সঞ্চারিত হইতেছিল।

আমি এই সময় অর্থাৎ ১৯০৩ হইতে ১৯০৫-এর জুন পর্যন্ত নোয়াখালী জেলা স্কুলে শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত ছিলাম। সেই সময় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় "দেশের কথা" নামক একখানা বই লিখিয়া ইংরেজ শাসনের দ্বারা দেশের কিরূপ ক্ষয়ক্ষতি হইতেছে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। আমি নোয়াখালিতে এই বইয়ের প্রায় একশতখণ্ড বিক্রয় করাইলাম। ৺তারানাথ রায়চৌধুরী নামক এক যুবক আমাদের যাইয়া খবর দিলেন যে স্থানে স্থানে শিবাজী উৎসব সম্পন্ন হইতেছে। তারানাথ নোয়াখালিরই ছেলে; 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং মাণিকতলা বাগানে বোমার কারখানা আবিষ্কারের পরে অস্ত্র আইনে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ছিলেন। বাংলার সাংবাদিক মহলেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন কেননা পরিণত বয়সে তিনি সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমিও ছাত্রদিগকে লইয়া এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটি সভা করিয়া শিবাজীর আদর্শের ব্যাখ্যা করিলাম। হেডমাষ্টার মহাশয় স্কুলে সভা করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু স্কুলের বেঞ্চ লইয়া যাইতে দিলেন। ছাত্রগণ বেঞ্চ বহন করিয়া লইয়া গেল। শ্রীমান সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি তখন এই বেঞ্চ বহন করিয়াছিলেন, আমার স্মরণে আছে। শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী বোধ হয় এই কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহারা উভয়ে এখন পরলোকে। সন্তোষ প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের অন্যতম পরিচালক ছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে রাজবন্দী হইতে হইয়াছিল। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট পদেও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজেন

নোয়াখালির খ্যাতনামা উকীল। ১২৯৬এর অক্টোবরের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় তিনি স্বগ্রামে নিজ বাড়ীতে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন।

তখন আমি ছাত্রগণকে স্বাধীনতা, স্বাধীনতার উদাহরণ বুঝাইবার জন্য ইংলণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রীন্ প্রভৃতি লেখকগণের লিখিত স্বাধীনতার বাণী সমূহের ব্যাখ্যা দিতাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালী হইতে বাড়ী যাইবার সময় গাড়ীতে বসিয়া ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্রের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। সেই প্রার্থনা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ হইয়াছে। ইংরেজ জাতির মধ্যে যে প্রাচীন সময় হইতেই স্বায়ত্ত শাসনের ভাব বর্ধিত হইতেছে, এইসব কথা বলিতাম। প্রফেসার সীলির "Expansion of England" নামক বক্তৃতাগুলিতে যে 'ভারত বিজয়' আমরাই সম্পাদন করিয়া দিয়াছি, অর্থাৎ ইংরাজেরা আমাদের অর্থে আমাদের দেশীয় সিপাহীদের দ্বারা এদেশ অধিকার করিয়াছেন, এই সব কথা বলিতাম। দেশী জিনিষ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং দেশীয় খেলাধূলার কথাও বলা হইত। বিদেশী ফুটবল, হকি, ও ক্রিকেট খেলার পরিবর্তে আমি হাডুডু ও অন্যান্য দেশী খেলা ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলাম এবং এক দল ছাত্র উৎসাহের সহিত এই সময় খেলায় যোগ দিত। এই সমুদয় কার্যে আমার দুইজন সহকর্মী শিক্ষক ৺বিশ্বেশ্বর হাস ও ৺অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সত্য কথা বলাতে ত্রুটি করিতাম না। চাকরীলোভী বিশেষ ছিলাম না, কাজেই সাবধানে কথা বলা অভ্যাস করিনাই। একবার নোয়াখালী জেলার লোকেরা চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলনের অধিবেশনের বন্দোবস্ত করিলেন। স্বর্গীয় নেতা ৺যাত্রামোহন সেন মহাশয় এই সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সেই দিনটি রবিবার ছিল। সুতরাং আমরা শিক্ষকরাও কেহ কেহ সভায় উপস্থিত হইলাম। উকীলবাবুরা আমাদিগকে ভীত মনে করিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্রূপও করিলেন। কেননা তখন গবর্ণমেণ্টের অধীন যাঁহারা চাকুরী করতেন, তাঁহারা ইতাকার সভায় উপস্থিত থাকিতে ভয় পাইতেন। ইংরেজদের তোষামোদ করাই ছিল চাকরী-জীবিগণের উপজীব্য। যাঁহারা বেশী শিক্ষিত এবং তিন চার পুরুষ ইংরেজী-নবীশ, তাঁহারা এমন এক মনোবৃত্তি গড়িয়াছিলেন, যাহার সঙ্গে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিতাম না। এখনও দেখিতেছি যে অনেক লোক কংগ্রেসের সঙ্গে পূর্বে কোন যোগ না থাকিলেও চাকরীর জন্য কংগ্রেস শাসনের স্তাবক হইয়া উঠিতেছেন। চাকরীজীবী লোকেরা যে সত্যভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তাহার বিশেষ পরিচয় আমরা এখনও পাইতেছি।

আমাদের নেতৃগণের মতকে পদদলিত করিয়া লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের কার্যটি যখন একেবারে ঠিক করিয়া ফেলিলেন, তখন বাঙ্গালীরা বিলাতী পণ্য ক্রয় বন্ধ করিয়া "যাহাকে মারা যায় না হাতে, তাহাকে মারিতে হয় ভাতে" নীতির অনুসরণ করার জন্য ১৯০৫ এর ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউন হলে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক জনবহুল সভা করিলেন এবং বিলাতী পণ্য ক্রয় বন্ধ করার প্রস্তাবটী সর্ব-সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিলেন। এই প্রস্তাবটিই আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র হইল। এই Boycott বা বিলাতের সহিত সংস্রব বর্জন সিদ্ধান্তকেই মূল সত্যরূপে গ্রহণ করাতে নানাভাবে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ হইল। এই সভাই মহাত্মা গান্ধী পরে Non-Co-operation রূপে অসহযোগ নীতিরূপে গ্রহণ করিলেন এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের লবণ সম্বন্ধীয় আইন ভঙ্গ করিয়া দেশময় একটা বিদ্রোহের ভাব জাগাইলেন।

আমি ৭ই আগষ্টের পূর্বেই গবর্ণমেণ্টের চাকরী পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কেননা বি, এল্ পরীক্ষা পাশ

করার পর উকীল হইবার জন্য চাকরী পরিত্যাগ করা প্রয়োজন মনে করিলাম। চাকুরী ছাড়িয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম এবং কিছুদিন উত্তরপাড়া কলেজে প্রফেসারী কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ওদিকে দেশে স্বদেশী আন্দোলনটী রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ও অন্যান্য বাগ্মীনেতৃবর্গ স্বদেশীভাবের প্রচার নানা ভাবে করিতে লাগিলেন। হৃদয়গ্রাহী জাতীয় সংগীত শুনিয়া মন গলিয়া গেল। ক্রমে দেশের কাজে করার জন্য মন ব্যগ্র হইল। কাজেই ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর ১৯০৫) তারিখে বঙ্গভঙ্গ রোধকল্পে যে শপথ অনুষ্ঠান করা ঠিক হইল তাহা কিছুতে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি তখন ৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেনে এক মেসে বাস করিতাম। মেসে পূর্ববঙ্গের কতিপয় চাকরীজীবি ভদ্রলোক থাকিতেন। সকলেই কর্মঠ ও উৎসাহী লোক।

"Dawn" নামক কাগজের সম্পাদক দেশহিতৈষী ও সেবাপরায়ণ ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এম, এ, বি, এল) মহাশয়ের সহিত আমি পূর্বেই পরিচিত ছিলাম। তিনি একজন মহচ্চরিত্র লোক ছিলেন। হিন্দু হোষ্টেলে আমি যখন বাস করিতাম, তখন তিনি হোষ্টেলের অনেক ভাল ছেলের সহিত মেলামেশা করিতেন। তিনি ছিলেন সক্রাতিসের ন্যায় নীরব কর্মী, তিনি একজন প্রতিভাবান লোক ছিলেন। শুনিয়াছি স্কুলে তিনি "বঙ্গব্যাস" স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষাও অধিক প্রতিভাবান বিবেচিত হইতেন। তিনি দেশের কাজ করিবার জন্য সর্বত্যাগী জীবন যাপন করিতেন। ওকালতী করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিতেন বটে, কিন্তু দান করিলেও মনে অহঙ্কার জন্মে, এই রকম চিন্তা করিয়া নাকি অনেক সময় টাকা পয়সা গঙ্গা গর্ভে নিক্ষেপ করিতেন। সতীশবাবু ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়াও শুনিয়াছি। তিনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মহান ত্যাগ এবং বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষাও আমার জীবনে কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ভাবের নানা কারণে পরিচালিত হইতেছিলাম। দেশের ইতিহাসও কিঞ্চিৎ জানিতাম এবং ইংরেজী শিক্ষার মূল্য বুঝিলেও বিলাতি হাবভাব ও সভ্যতা বিশেষ পছন্দ করিতাম না। স্বাধীনতাই যে বর্তমান সময়ে কাম্য, এই কথাটি বিশেষভাবে বিশ্বাস করিতাম। স্বাধীনতার কথাই বিশেষভাবে ভাল লাগিত। জাপান প্রভৃতি দেশের উন্নতি ও প্রগতি আমাদেরও চাই। এই কথাই মনে বিশেষ স্থান পাইত। স্বাধীনতা লাভ হইলেই দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে এবং সাম্য-প্রতিষ্ঠাই চাই, এই আদর্শই মনে স্থান পাইত। পার্থক্য দ্বারা নিজে উপকৃত হইয়াছি তাহাও জানিতাম, কেননা অনেকের নিকট পার্থক্যের জন্য সাহায্য পাইয়াছি, জানিতাম একথাও তথাপি সাম্যবাদ যে সত্য, এই কথাই জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে।

বঙ্গভঙ্গের তারিখে, ৩০শে আশ্বিন—১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) কলিকাতায় সমস্ত দোকানপাঠ বন্ধ ছিল, বাঙ্গালীরা গঙ্গা স্নান করিয়া পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া ভ্রাতৃত্বকে দৃঢ় করিলেন ও সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া ভগবানের নিকট নিজেদের দুঃখদৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। একতার ভাবকে আকার দেওয়ার জন্য তাঁহারা একসভায় মিলিত হইলেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় তখন পীড়িত ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে বহন করিয়া সভাস্থলে সভাপতিত্ব করার জন্য আনা হইল। ঐক্য স্থাপনের জন্য একটি স্মৃতি মন্দির স্থাপন করার অভিপ্রায়ে সার্কুলার রোডের পূর্বদিকে অধুনাতন ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের উত্তর দিকে একখণ্ড ভূমি নির্দিষ্ট করা হইল। এই ভূমিখণ্ডে বসু মহাশয় স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার লিখিত একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনে স্বদেশী

ভাব এবং ঐক্য বদ্ধ হওয়ার পক্ষে উৎসাহ দিলেন। আমরা এই সভা বসিবার পূর্বেই বাগবাজারে পশুপতি নাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে জাতীয় ধনভাণ্ডারে একদিনের আয় দিয়া আসিয়াছিলাম। এই সভার পরে আর এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "সোনার বাংলা" নামক সংগীতটি গীত হইল। সভায় সমবেত বহু সহস্র লোক এই সংগীত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং দেশ প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন।

এই দিনটি আমাদের পক্ষে একটি নবজন্ম লাভের ও নব সংকল্প গ্রহণের দিন হইয়া পড়িল। অনেক যুবক মনে মনে বঙ্গ ভঙ্গ বাতিল করার জন্য ব্যগ্র হইলেন ও বাঙ্গালীদিগের মনে একটা একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। আমরা এতদিন লেখাপড়া শিখিয়া চাকরী করার জন্যই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসনাধীনে আমাদিগকে একটা দৃঢ়তা দান করিয়া আবলম্বী হইতে বাধ্য করিল। আমরা সর্বপ্রথম আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্যই ব্যস্ত হইলাম। বাংলা দেশে এতদিন কাপড়ের কল স্থাপনের কথা কেহ ভাবে নাই; কিন্তু এই সময় বঙ্গলক্ষ্মী নামক কাপড়ের কল স্থাপন করার চেষ্টা হইল এবং একটি National Bank স্থাপনের উদ্যম দেখা গেল। এইভাবে আমরা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে চেষ্টা শুরু করিলাম। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন "Uncrowned King of Bengal"-রূপে সৎকার্যে আমাদের নেতা ছিলেন।

এইভাবে স্বদেশী আন্দোলন একটি আকার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিলাতী কাপড়, বিলিতি লবণ এবং বিলাতী চিনি বর্জনের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল প্রবল হইয়া উঠিল। সভাতে বক্তৃতার সময় এতদিন ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হইতে আপত্তি হইত না; এবং বিশেষ শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজীতেই বক্তৃতা করিতেন। কিন্তু ৺বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় বাংলা ভাষার বিশেষ আদর হইতে লাগিল। এতদিন ব্রাহ্ম সমাজেই বাংলাতে উপাসনাদি ও উপদেশ প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করা হইত। ব্রাহ্মগণের নিকট বাংলা ভাষা আদরণীয় ছিল। আমরা ইংরেজী লেখা ও ইংরেজীতে মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যই সচেষ্ট ছিলাম, কিন্তু এই সময় হইতে সকলেই মাতৃভাষার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। আমরা তখন স্বদেশী ভাবের কথাবার্তাই শুনিতে চাহিতাম। ব্রাহ্ম ধর্ম যে স্বদেশী ভাবের উৎস, এই কথাটা ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিলাম। সাহেবী ভাবাপন্ন লোকেরাও সাহেবী পোষাক অপেক্ষা ধুতি চাদরের পক্ষে ঝুঁকিতে লাগিলেন। ক্রমে "বিজাতীয় শিক্ষা" বর্জনের সংকল্প মনে জাগিতে ছিল। যতদিন চাকরী পাওয়া সহজ ছিল, ততদিন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকেই চাকরী দুর্লভ হইতেছিল।

আমাদের সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই শিক্ষিতেরা বেকার সমস্যার জালে আবদ্ধ হইয়া কার্যোপযোগী জ্ঞান লাভের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতেন। ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা যে আমরা denationalised অর্থাৎ বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইতেছি, এই কথাটা বিশেষভাবে বুঝিয়া "জাতীয় শিক্ষার" কিছু ব্যবস্থা করিতে পারা যায় কিনা সেই ভাবনার বিষয় হইল। ক্রমে ছাত্র দলনের ব্যবস্থাও ইংরেজেরা একটা দাঁড় করাইলেন। কেননা তাঁহারা দেখিলেন যে "ছাত্রেরাই ঘরের বাইরে এসে মনের মহিষ তাড়ায়।" তাহারা দল বাঁধিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে ও লোকদিগকে বিলাতী কাপড় খরিদ করিতে নিষেধ করে, স্বদেশী মিলের কাপড় ঘাড়ে করিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করে, এবং "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" গান করে। ঘরে ঘরে যাইয়া তাহারাই "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটী গান করে মানুষের

মনে দেশের প্রতি প্রীতি জাগাইয়া দেয়। বিলাতী হাবভাব বর্জন উচিত, তাহা দেশের লোককে বলে,—এমন কি স্বাধীনতা লাভ যে সম্ভব, তাহাও তাহারা বলে।

৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই আন্দোলনের সময় "Autonomy" বা "Self-rule" নাম দিয়া কতকগুলি বক্তৃতা বাংলায় দিলেন। তাহাতে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত শাসনের বিষয়ে তত্ত্ব বুঝাইতেন, যদিও "ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দাও" এই কথা সোজাভাবে বলিতেন না। আমরাও লোকদিগকে স্বদেশী চিনি, কয়লার লবণ খাইতে বলিতাম; বস্ত্রে মিলের কাপড় পরিতে উপদেশ দিতাম, বিলাতী কাপড় টেকসই নয় বলিতাম এবং আস্তে আস্তে "স্বদেশী শাসনও" চাই বলিতাম দেশী মতে পঞ্চায়েত দ্বারা বিবাদ মীমাংসার জন্য উপদেশ দিতাম। পাল মহাশয় মুসলমান শাসনের সময় দেশ যে বস্তুতঃ স্বাধীন ছিল, তাহা বুঝাইলেন। ইউরোপীয় লেখকরাও মুসলমান সাম্রাজ্য "tax gathering Empire" মাত্র ছিল, এই কথা বলিয়াছেন। তখন লোকের শিক্ষা-দীক্ষায় ও শিল্পানুশীলনে কোনো বাধা ছিল না। এইসব কথাও আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। এইভাবে বহু বক্তৃতা, বহু প্রবন্ধ, বহু সভাসমিতির দ্বারা স্বাধীনতার কথা প্রচার হইতে লাগিল। ক্রমে গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন ছাত্রদিগকে কিরূপে রাজনীতির আলোচনা হইতে দূরে রাখা যায়। তাঁহারা শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের দ্বারা একটা সার্কুলার বাহির করিলেন। এবং তাহাতে শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষার্থী বালকদিগকে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান করা নিষিদ্ধ কার্য্য বা forbidden fruit করিয়া দিলেন। ইহাতে ফল হইল ঠিক বিপরীত। ছাত্রগণ ইংরেজের শাসিত স্কুলকলেজ ও বিদ্যালয় বর্জ্জন করিয়া "জাতীয় শিক্ষা" লাভের জন্য ব্যস্ত হইল।

জাতীয় শিক্ষা কিরূপ হইবে, এই সম্বন্ধে বহু আলোচনা এই সময় হইতেছিল। National school নাম দিয়া ব্রাহ্ম নেতৃগণ ইতিপূর্বেই স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন! ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এবং রামচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার পর সিলেটে একটি National School স্থাপন করিয়া কিছুদিন উহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। আমরাও অনেকে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না। সুতরাং এই সময়ে বিজাতীয় বা denationalised শিক্ষা প্রণালীর বেশ সমালোচনা হইতেছিল। স্বদেশী আন্দোলনে এই সময় আমরা সকল বিষয়েই "স্বদেশী হওয়ার জন্য ব্যস্ত হইলাম। স্বর্গীয় সুবোধ চন্দ্র মল্লিক মহাশয় এক সভাতে একলক্ষ টাকা দান করিয়া একটি য়ুনিভার্সিটি স্থাপনে উৎসাহ দিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া সম্মানিত করিল এবং তাঁহার গাড়ী নিজেরা টানিয়া তাঁহার বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিল। তদবধি জাতীয় শিক্ষা একটা রূপ গ্রহণ করার সুবিধা গ্রহণ করিল। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হইলেন আমাদের শিক্ষা তরণীর কর্ণধার। ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত ৺সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই এই শিক্ষা পদ্ধতির মূলকেন্দ্রে বসিয়া ইহাকে গড়িয়া তুলিলেন।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর বঙ্গে রংপুরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। স্বর্গীয় সচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ছিলেন কলিকাতায় সিটি কলেজের একজন ছাত্র। কিন্তু তিনি অধ্যয়নরত অবস্থায়ই স্বদেশের জন্য ত্যাগ বরণ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিলেন। তাঁহার অপূর্ব বাগ্মীতা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অন্য ছাত্রগণ উৎসাহ পাইত এবং দলে দলে আন্দোলনে যোগ দিতে লাগিল। তিনি যাইয়া রংপুরে এক বক্তৃতা দান করিয়া তথাকার কর্তৃপক্ষ এবং অন্য লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রভাবে সেখানকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দুইশত ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল এবং একটি জাতীয়

বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিল। তথাকার নেতৃবর্গ তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সহরের প্রায় সমস্ত লোক এই জাতীয় বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন। এখানেও জাতীয় শিক্ষার আদর্শ রূপে রূপ গ্রহণ করিয়া ছাত্র-মহলে উত্তেজনার কারণ হইল। তখন এম, এ, পরীক্ষার সময়, এম, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ পরীক্ষা দিবেন না, স্থির করিলেন। ছাত্রগণই দেখা যায় অনেক ত্যাগ বরণ করিতে পারেন। তাঁহারাই এই শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্যে যোগদান করার জন্য আমিও অগ্রসর হইলাম এবং কয়েকজন এম, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রের সঙ্গে যাইয়া রংপুরে উপস্থিত হইলাম। তথাকার ভদ্রলোকেরা আমাদিগকে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে রংপুরে আর একটি ঘটনা সংঘটিত হইল। তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট পাঁচিশ জন প্রধান প্রধান উকীলকে স্পেশাল কনষ্টেবল নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে শান্তি রক্ষার জন্য সমন দিলেন। তাঁহাদিগকে অপমান করাই মূল উদ্দেশ্য মনে হইল। তাঁহারা কিন্তু একযোগে এই আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। ফুলার সাহেব তখন পূর্ববঙ্গ ও আসামের লাটরূপে কাজ করিতেছিলেন। তিনি এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করাইলেন; কিন্তু তখনও পূর্ববঙ্গ কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনেই ছিল। কলিকাতা হাইকোর্ট ভদ্রলোকদিগকে সমর্থন করিলেন এবং গবর্ণমেণ্টকে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে বলিলেন। ইহাতে সমস্ত বঙ্গদেশে রংপুর স্বাধীনতার রঙ্গভূমিরূপে পরিণত হইয়া একটি তীর্থক্ষেত্রের ন্যায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

আমরা অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে জাতীয় শিক্ষার একটি কাঠামো গড়িয়া ছাত্রগণকে পড়াইতে লাগিলাম। আমাদের ও ছাত্রগণের উৎসাহ আনন্দ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল এবং আমরা নানা প্রকারের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। এদিকে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়া হইয়া গেল এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষার ন্যায় "পঞ্চম মান" পরীক্ষা দিবার জন্য ছাত্রগণকে আহ্বান করা হইল। পূর্ববঙ্গের লোকের মধ্যেই স্বদেশী আন্দোলন উৎসাহ সহকারে চলিতেছিল। পূর্ববঙ্গের নেতৃবর্গই বঙ্গভঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আন্দোলনটি প্রবল বেগে চালাইতে ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবর্গ এই আন্দোলনে বিশেষ চেতনা সঞ্চার করিতে ছিলেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, স্বর্গীয় রমাকান্ত রায় প্রভৃতি বিশেষ উৎসাহ সহকারে স্বাবলম্বীভাব জাগাইতে ছিলেন। তাঁর প্রবণ পূর্ববঙ্গবাসী লোকেরাই ব্রাহ্ম ধর্মগ্রহণে উৎসাহী হইয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনেও তাঁহারাই অধিক ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিলেন। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ইংরাজী ও বাংলায় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার বাগ্মীতায় মানুষের হৃদয়ে যে উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইত, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার অনুকরণে তখবধি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করার রীতি বিস্তার লাভ করিল। এত দিন আমাদের বড় বড় সভাতে ইংরেজীতে বক্তৃতা হইত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে বাংলাতে বক্তৃতা দেওয়াই রীতি হইয়া উঠিল। আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা সময় লইয়া বিপিনবাবু বক্তৃতা করিতেন এবং শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরব থাকিয়া তাঁহার কথা শুনিত।

ইংরাজী সভ্যতা ও ইংরাজী শাসনের প্রতি ক্রমশঃ লোকের মনে একটা বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহন রায়ের সময় হইতে একশত বৎসরে ইংরেজ জাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। আমরাও জাতীয় বিদ্যালয়ে এদেশীয় শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি ছাত্রদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলাম। পূর্বোল্লিখিত "দেশের কথা"

বই-এর অনুরূপ গ্রন্থাদিও সংগ্রহ করিয়া এদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে লাগিলাম। আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীমান নগেন্দ্রকুমার গুহরায় ভং প্রণীত "শহীদ যুগল" গ্রন্থে এই আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। তখনকার অনেক স্বপ্ন রূপায়িত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের বিকটাকারে ভীত হইতেছি।

রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বেশ উৎসাহী এবং স্বাধীনতাকামী ছিলেন। এখন বন্ধু শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয় একজন মহাপণ্ডিত ও হাইকোর্টের প্রধান উকীলরূপে খ্যাত হইয়াছেন। সেই সময় তিনিও রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনাতে ছাত্রগণ বিশেষ আনন্দ পাইত। ছাত্রগণ সকলেই স্বাবলম্বী হইয়া উঠিল। বহু অমনোযোগী ছাত্রও বিশেষভাবে মনোযোগী ও কাজের লোক হইয়া উঠিল। কোথাও কাহারো গৃহে আগুন লাগিলে তাহারা অগ্নি নির্বাপিত করার কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িত। কাহারো বাড়ীতে বিবাহ বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহারা যোগদান করিয়া কার্যটী সুসম্পন্ন করাইয়া দিত। লাঠি খেলায় অনেকে পারদর্শী হইয়া উঠিল। দেশী কলের কাপড় গ্রামে গ্রামে ফেরী করিত। জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা আদায় করার সময় স্বদেশী ভাব প্রচার করার কার্যে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যার সময় স্কুলে তাহারা নানা বিষয়ে তর্ক ও মীমাংসা কার্যে অংশ গ্রহণ করিত। ইহাতে নানা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠে আমরা তাহাদিগকে উৎসাহ দিতাম। এই বিদ্যালয়ে তখন একটী নূতন চেতনা সঞ্চারিত হইল। বাংলা ভাষায়ই এই শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরেজী ভাষায় লিখিত বই পড়ান হইলেও তাহারা বাংলায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। ইহাতে ইংরেজী জ্ঞান কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু সত্য বুঝিবার ও প্রয়োগ করিবার আগ্রহ বর্ধিত হইল। বাংলা দেশের স্কুল সমূহে যদি আজ এই ভাব সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ফল ভাল হইবে, আমার বিশ্বাস।

ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। ছাত্রগণ অনেক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিত তাহাদের গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী জুটিবে কিনা এবং তাহাদের ভবিষ্যতে কি গতি হইবে। আমি বলিতাম "অন্ন যারায় কর, সন কাটিতে পারিবে।" রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অনেকেই পরে বিশিষ্ট লোক হইয়াছেন, দেখিয়াছি। উত্তম শিক্ষা লাভ করিলে যে পরে অনুতাপ করিতে হয় না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। স্কুলে যদি ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান পিপাসা বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া যায় এবং আত্ম নির্ভরতার পথে তাহাদিগকে স্থাপন করা যায়, তবে ইহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবেই হইবে। চরিত্র গঠন কার্যটী ঠিকমত করিয়া দেওয়া চাই। তাহাদের মধ্যে যদি একটা দায়িত্ব জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয় এবং নিজের শক্তির প্রয়োগ করার পথ তাহারা দেখিতে পায়, তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে পারে না। জাতীয় ভাবটি খাঁটি হওয়া চাই। আজ কাল কিন্তু দেশের হাওয়াতে একটা দুর্নীতির বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে। নানা প্রকারে লোকেরা অভাবগ্রস্ত হইয়া বিপথগামী হইতেছে। যাঁহাদের হাতে শাসনভার আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে দেশের লোকেরা নানাপ্রকার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে। ইহাতেই সমস্ত সমাজ দূষিত হইয়া পড়িতেছে। নেতৃবর্গের কর্তব্য, কোনো প্রকার "স্বার্থত্যাগ মন্ত্র" (Self denying ordinance) গ্রহণ করিয়া দেশের হাওয়া বিশোধিত করা। নতুবা স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যাইবে এবং দেশ পুনরায় অন্ধের পাশে আবদ্ধ হইবে।

বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণের এই পথ

অনুশীলন সমিতির

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলার জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে অনুশীলন সমিতি এক বিস্ময়কর নবযুগের সূচনা করিয়াছিল, জন্মভূমির মুক্তিকল্পে যে সমিতি পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের অভূতপূর্ব প্রেরণা ও নির্দেশ দিয়াছিল, যে সমিতির স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও নিজস্ব কর্মপদ্ধতি পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ সুগম করিয়াছিল ও স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর করিয়াছিল—যে সমিতির উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবক সম্প্রদায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অকাতরে আত্মাহুতি দিয়াছিল, বাংলার অগ্নিযুগে যে সমিতির প্রবল প্রতাপে তদানীন্তন বৈদেশিক শাসক সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সমিতির অপরূপ প্রেরণা যুগে যুগে যুবক সম্প্রদায়কে নূতন নূতন উদ্দীপনা যোগাইবে।

অনুশীলন সমিতির ইতিহাস বর্ণনার প্রারম্ভে ইহার প্রতিষ্ঠাতা, সংগঠক ও কর্মসচিব ৺সতীশচন্দ্র বসুর কিঞ্চিৎ পরিচয় অপরিহার্য। কারণ ইহার সহিত তিনি ওতঃপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ইহাই তাহার প্রাণ ছিল। বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সকল মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁহাদের অসামান্য অবদান বাঙালী জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, তাঁহাদেরই সহিত তিনি স্থান পাইবার যোগ্য। সমাজ সংস্কারে রাজারামমোহন, ধর্মপ্রবর্তনে স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র, সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে প্রেরণা দিয়াছিলেন, বাঙালীর শক্তি সাধনায় সতীশচন্দ্রও তদ্রূপ প্রেরণা দিয়াছিলেন। দুর্বলতার অপবাদ ঘুচাইয়া, বাঙালীকে শক্তিশালী করিতে হইবে এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই সতীশচন্দ্র কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং ইহাকেই তাঁহার জীবনের ব্রত করেন।

তাঁহার সাধনা কি পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল তাহা অনুশীলন সমিতির ধারাবাহিক ইতিহাসে প্রমাণিত হইবে।

বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণের প্রস্তুতিতে যে কয়জন কালজয়ী মহাপুরুষের অবদান অনস্বীকার্য তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অগ্রগণ্য। ইংরাজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যুগস্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো সহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে উদাত্তকণ্ঠে ভারতের সুমহান ঐতিহ্য প্রচার করিয়া সর্বপ্রথম এদেশের প্রতি পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সমগ্র জাতিকে মনুষ্যত্বলাভের জন্য তপস্যা করিতে আহ্বান জানাইলেন। তিনি নির্বীর্য দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

"হে বীর সাহস অবলম্বন কর—সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।

বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর; আমায় মানুষ কর।

অপরদিকে সত্যব্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসাকারে আনন্দমঠ লিখিয়া বঙ্গজননীর শৃঙ্খল মোচনে ভবিষ্যৎ বিপ্লব আয়োজনের সঙ্কেত জানাইলেন এবং দেশ মাতৃকার আরাধনার "বন্দেমাতরম্" বীজমন্ত্রে সমগ্র জাতির মধ্যে তেজ ও শক্তি সঞ্চারণ করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ জগন্মাতার নিকট বাঙালী জাতিকে মানুষ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন সতীশচন্দ্র সেই কর্মভার গ্রহণ করেন। ইহাতেই তাহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। "নায়মাত্মা বল হীনেন লভ্য"—এই উক্তির সারমর্ম তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন এবং এই মন্ত্র সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। বাঙালী জাতিকে সৌর্য্যে, বীর্য্যে, সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইবে, বাঙালী জাতি সকল বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে—ইহাই ছিল তাঁহার পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য তিনি সুযোগ অন্বেষণ ও সর্ববিধ প্রয়াস করিতে লাগিলেন। অবশ্য প্রথমত মাত্র শরীর চর্চার বীজ বপন করিয়াই কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে উহা বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ পল্লবিত ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়া দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে।

১৯০০ সালের বহুপূর্বের কথা। সেইকালে "ভীরু কাপুরুষ" বাঙালীকে সকলে ঘৃণা করিত। এই কলঙ্ক মোচনের জন্য কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্নস্থানে আখড়া স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রধানতঃ ডন, বৈঠক, মুগুর, কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত। বিডন ষ্ট্রীটের ছাতুবাবু, বহিপাড়ার অম্বু গুহ এবং তাঁর পুত্র পেতু গুহ কুস্তীতে বিখ্যাত ছিলেন। তখনও মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় এই সব আখড়াকে হেয় জ্ঞান করিতেন। এইগুলি কেবলমাত্র কুলি মজুর, চাকর দারোয়ানদিগের জন্য ভদ্রলোকদিগের জন্য নহে—ইহাই ছিল সাধারণের ধারণা। হার্থস্টোন সার্কাস প্রভৃতির দুঃসাহসিক বীরত্ব-ব্যঞ্জক ক্রীড়াকৌশল দেখিয়া বাঙালী যুবকেরা শরীর চর্চায় মন নিবেশ করিল। তাহার ফলে জিমন্যাষ্টিকের দল পাড়ায় পাড়ায় গড়িয়া উঠিল। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন ৺গৌরমুখার্জী, নারায়ণ বসাক প্রভৃতি অনেকে। এই সঙ্গে রাধিকামোহন রায় মহাশয়ের Friends united club-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শক্তিচর্চার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে বাঙালীর কয়েকটি সার্কাস পার্টিও পরিচালিত হইত। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঘ মারা শ্যামাকান্ত (সোহং স্বামী), প্রফেসার বোস, কৃষ্ণ বসাক (Hippodrome circus) প্রভৃতি তাঁহারা দেশ-বিদেশে নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক দেখাইয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

যৌবনকালে সতীশচন্দ্র বিখ্যাত General Assembly's Institution (হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্বদিকে —অধুনা Scottish church collage-এ পাঠ করিতেন। ঐ কলেজ প্রাঙ্গণে একটি ব্যায়ামাগার খোলেন এবং নানারূপ শক্তিক্রীড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। গৌরহরি মুখার্জীর অধীনে বহু কলেজে ঐরূপ ব্যায়মাচর্চার ব্যবস্থা তখন হইয়াছিল সতীশবাবু গৌরবাবুর ব্যায়াম শিষ্য ছিলেন। বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই খৃষ্টান মিশন ও কলেজের প্রভাব সুবিদিত। এই কলেজেই একদিন নরেন্দ্রনাথও (স্বামী বিবেকানন্দ) অধ্যয়ন করিতেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে মিশনারীরা এই দেশের অনেক প্রকার জনহিতকর কার্যে উৎসাহ দিতেন। সতীশ চন্দ্রের জাতিগঠন মূলক কার্যেও এই কলেজ কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এই কার্যের জন্য সতীশচন্দ্র প্রিন্সিপ্যাল Wann সাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এইরূপে ছাত্র মহলেও তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ইহা ১৯০১ সালের কথা। এই ব্যায়মগারটি পরে অনুশীলন সমিতিতে রূপান্তরিত হয়।

—ক্রমশঃ

শ্রীনীরদবরণ হালদার এম. এস্-সি লিখিত অনুশীলন সমিতির ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত.

শরৎচন্দ্রের চরিত্রের একটা দিক

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রলাপ বকতে অনেকে পারে কিন্তু আলাপ জমানো বড় শক্ত। সাহিত্যিকেরা কতরকমে কত গল্প লেখেন তাই না দেখে আপনি হয়ত ভেবে বসলেন—

সাহিত্যিকেরা মুখে মুখে গল্পও বলতে পারেন চমৎকার।

কিন্তু এমন সাহিত্যিকের কথা আমি জানি—যাঁর লেখা গল্প পড়ে আপনি হয়ত মুগ্ধ হয়েছেন—অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা যাঁর অনেক, কিন্তু একবার যদি বসেন তাঁর কাছে গিয়ে—মনে হবে কতক্ষণে উঠে পালাই। বক্ বক্ করে বকছেন তো বকছেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারবেন না আপনি। ভাবতেই পারবেন না—তিনিই আপনার সেই প্রিয় গল্প লেখক।

আবার আর এক রকমের সাহিত্যিক আছেন—যাঁর সঙ্গে দেখা হলে তাঁর মুখ থেকে শুনবেন শুধু তাঁর নিজেরই কথা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গল্পের মোড়টাকে শুধু তাঁর নিজের দিকে টানছেন। নিজে তো নিজের প্রশংসা করবেনই, এমনকি আপনার মুখ থেকেও শুনতে চাইবেন তাঁর কথা অর্থাৎ তিনি যে কত বড় গল্প-লিখিয়ে সেই কথাটি তাঁর নিজের মুখ থেকেও শুনুন এবং আপনি নিজেও বলুন সেই অমৃত-কথা।

শুধু একটি মানুষকে আমি জানি—যিনি ছিলেন এসবের ব্যতিক্রম। তিনি শরৎচন্দ্র। যেমন সেরা গল্প-লিখিয়ে, তেমনি সেরা গল্প-বলিয়ে। তবে তার জন্যে দরকার হতো তাঁর মনের মত মানুষ।

অল্প-পরিচিত বা অপরিচিত লোকের সামনে তিনি মুখ খুলতেন না সহজে। নিজের প্রশংসা নিজের মুখে কোনোদিনই করতেন না। অন্যের মুখ থেকে শুনলেও কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠতেন।

আবার এমনও দেখেছি—এক একসময় বড় বিশ্রীভাবে জবাব দিয়ে ফেলতেন।

আমার সামনে এমনি দুদিন দুটো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। বড় অপ্রীতিকর ঘটনা।

একদিন গিয়ে দেখি একজন প্রিয়দর্শন যুবক বসে আছে তাঁর কাছে। ইংরাজী সাহিত্যের বড় বড় কথা বলছে আর তুলনা করছে তাঁর লেখার সঙ্গে। অর্থাৎ সে বলতে চায়—শরৎচন্দ্রের লেখা এইসব ইংরেজি লেখার চেয়েও ভাল।

শরৎচন্দ্র তাঁর ইজি চেয়ারটিতে শুয়ে শুয়ে গড়গড়ার নল টেনে টেনে ধোঁয়া বের করছেন আর হুঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছেন। ছেলেটির কথা তিনি মন দিয়ে শুনছেন বলে মনেহলো না।

ছেলেটিও বোধহয় বলবার মত আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। শেষে বললে, বিলিতি গল্প উপন্যাস তো অনেক পড়লাম কিন্তু আপনার লেখার ভেতর যেরকম রস—সেরকমটি আর কোথাও পেলাম না। তাঁদের লেখা পড়ে চোখে জল কোনোদিন এলো না, অথচ আপনার লেখা পড়ে কতবার চোখে জল এসে গেছে—আপনি মনেই বসে বসে কত কেঁদেছি।

কথাটা শুনে শরৎচন্দ্র হঠাৎ বলে বসলেন, না না অত কেঁদো না। চোখ খারাপ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে হাসির গল্প পোড়ো। বলেই তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমি তো হাসির গল্প পেলেই পড়ি। তুমি তো জানো - তোমার কাছ থেকে শিবরামের সেই বইখানা চেয়ে নিয়ে পড়েছিলাম।

ছেলেটি এইবার উঠে দাঁড়ালো। বললে, আজ আমি আসি।

শরৎচন্দ্র বললেন, এসো।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সে চলে গেল। ছেলেটি চলে যেতেই বললাম, ও-রকম কথা আপনি ওকে বললেন কেন?

শরৎচন্দ্র বললেন, কিছুতেই উঠছিল না যে! এই বলে ইজিচেয়ারের ওপর ভাল করে উঠে বসলেন তিনি। বললেন, নিজের প্রশংসা শুনে শুনে তামাকটা পর্যন্ত খারাপ লাগছিল।

আর-একদিনের আর-একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একজনকে বলতে শুনেছিলাম, আপনার 'সতী' গল্পটি পড়লাম। ওরকম গল্প আপনি ছাড়া আর কেউ লিখতে পারেন না। বাংলা সাহিত্যে 'সতীর' মত গল্প দুর্লভ।

শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়েছো ?

লোকটি বললে, পড়েছি। কিন্তু অত ভাল নয়।

শরৎচন্দ্র বললেন, ভাল করে পোড়ো। দেখবে লেখকের গল্প বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ।

নিজের প্রশংসা—প্রায়ই দেখতাম তিনি এমনি করে ফিরিয়ে দিতেন।

কথা তিনি বলতে পারতেন না শুধু একটি জায়গায়।

কোনও সভা-সমিতিতে সভাপতি করে তাঁকে যদি কেউ নিমন্ত্রণ করতে আসতো, তিনি সহজে রাজী হতেন না। বলতেন, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না যে! সন্ধ্যের দিকে আমার আর উঠতে ইচ্ছে করে না।

হয়ত কোনও না-ছোড়-বান্দা লোক—কিছুতেই ছাড়তে চায় না। বলে, আপনার কোনও ভয় নেই। আমরা সঙ্গে থাকবো, আপনি যাবেন, চুপ করে বসে থাকবেন, কিছু বলতে ইচ্ছে হয় বলবেন, না ইচ্ছে করে বলবেন না।

মুখের ওপর হয়ত জবাব দিতে পারলেন না। বললেন, দেখবো চেষ্টা করে। শরীরটে যদি ভাল থাকে তো যাব।

—কথা দিচ্ছেন আপনি। আমরা নিমন্ত্রণের চিঠিতে আপনার নাম ছেপে দিচ্ছি।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। খুব ভাল করে নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপালে তারা। নির্দিষ্ট দিনে গাড়ী গিয়ে দাঁড়ালো তাঁর দরজায়।

—চলুন।

শরৎচন্দ্র তখনও চুপচাপ বসে। বললেন, তাই তো যে! এই নড়বড়ে শরীর নিয়ে আমি যাই কেমন করে? আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমরাও শেষে বিপদে পড়বে।

বলেই তিনি ঢুকলেন বাথরুমে।

সেখান থেকে যখন বেরোলেন, শরৎচন্দ্রের অপেক্ষা করে করে লোকজন তখন অধির চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

হয়ত-বা গেলেন। নয়ত গেলেন না।

আবার হয়ত এমন হয়েছে—শরৎচন্দ্রকে সেদিন বাড়ীতে পাওয়াই গেল না।

কোথায় বেরিয়ে গেছেন কিছু বলেও যাননি।

পরে আবার দেখা হয়েছে সেই-সব লোকের সঙ্গে। তারা বলেছে—আমাদের কথা দিয়েও গেলেন না সেদিন। আমরা খুব বিপদে পড়েছিলাম।

শরৎচন্দ্র বলতেন, ভাখো, এইটিই আমার সবচেয়ে বড় রোগ। সবকিছু ভুলে যাই। সেদিন যে মিটিং ছিল—কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়লো রাত্রি এগারোটার সময়।

এই বলে তিনি মুখ টিপে টিপে হাসতেন।

বলতেন, কেন এরকম করি জানো? সভা-সমিতিতে কিছু বলতে হলেই গায়ে আমার জ্বর আসে। শুধু ভয় হয়—বেফাঁস কথা না বলে ফেলি।

অথচ দেখেছি—বরোদা বৈঠক যেখানে, সেখানে যেতে তিনি কুণ্ঠিত নন।

বাজে শিবপুরে যখন থাকতেন, দেখেছি রোজ বিকেলে তিনি এসে হাজির হয়েছেন এম-সি সরকারের বইএর দোকানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছেন।

এম-সি সরকারের বইএর দোকান, কার্ত্তিক প্রেসের দোতলা (ভারতী আপিস), বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে গজেন ঘোষের বৈঠকখানা—এইরকম অনেকগুলি মজলিসের জায়গা ছিল তাঁর।

মজলিসী মানুষ ছিলেন তিনি।

মনের মত মানুষ পেলে মনের আনন্দে তিনি এমন সুন্দর গল্প বলতেন যে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে বসে তা শুনতে হতো।

সে-সব অনেকদিন আগেকার কথা।

আমরা তখন সবে লিখতে আরম্ভ করেছি।

শরৎচন্দ্র তখন তাঁর আশ্চর্য গল্প উপন্যাস একটির পর একটি লিখে চলেছেন। সারা বাংলা দেশের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন এই অনন্যসাধারণ কথাশিল্পী। যিনিই তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়েছেন, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়ে জানতে চেয়েছেন—কে এই ধরণী অন্তরঙ্গ মানুষটি—কোথায় থাকেন, কি করেন?

তাঁকে জানবার অতিরিক্ত আগ্রহে তাঁর সম্বন্ধে মানুষ একটা অদ্ভুত রকমের পরিচয় সংগ্রহ করেছিল। তিনি নাকি নিতান্ত অসামাজিক, মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন, কারও সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তা বলতে চান না, সর্বদাই একটা বাঘা কুকুর থাকে তাঁর সঙ্গে, অঘোরপন্থী তান্ত্রিকের মত চেহারা,—এমনি একটা কথা তাঁর সম্বন্ধে প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশে।

কোত্থেকে এ তথ্য লোকে সংগ্রহ করেছিল জানি না, তবে এর জন্যে 'বিন্দুর ছেলে' বইখানির প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত তাঁর ছবি, তাঁরই সৃষ্টি বাউণ্ডুলে ইন্দ্রনাথ, সাপুড়ে পাহলী, রহস্যময় শ্রীকান্তের চরিত্র—এইগুলি কতকাংশে দায়ী।

কি জানি কেন, আমি এই কথাগুলো বিশ্বাস করিনি কোনদিন।

আমি তখন কয়লাকুঠির দেশ থেকে পড়তে এসেছি কলকাতায়। একটু-আধটু লিখি, লেখক হবার বাসনা আছে মনে, অথচ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের কোনও পথ খোলা নেই।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করি, মানুষটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের দুর্দমনীয় একটা আগ্রহ পোষণ করে চলেছি মনে-মনে কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব তাই ভাবছি।

রেঙ্গুনের কথা তখন অতীতের কাহিনী। শুনলাম থাকেন তিনি বাজে শিবপুরের একটা গলিতে। প্রায় প্রত্যহই আসেন কলকাতায় আড্ডা দেবার জন্যে। কোথায় কোথায় আড্ডা যেন সেকথা আগেই বলেছি।

এইখানে একটা মজার কথা বলে রাখি।

থাকতাম হুকিয়া ষ্ট্রীটে। আজকাল সেটা কৈলাস বোস ষ্ট্রীট। আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতো শৈলেশ বিশী। হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। জমিদার মানুষ। যেমন সুপুরুষ তেমনি অমায়িক। কোন্ সূত্রে কেমন করে যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হলো সেকথা আজ আর মনে নেই। তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ছিল অনেক। তবু দুজনের সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমি তখন কবিতা লিখি। সকলে গল্প লিখছে। তাই না দেখে আমিও গল্প লিখবার চেষ্টা করছি। কি লিখবো কেমন করে লিখবো তখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। সাঁওতালদের নিয়ে কয়লাকুঠির গল্প লিখবার খুব ইচ্ছা।

শৈলেশের কাছে গিয়ে বসি. রোজ বিকেলে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শৈলেশের পরিচয় ছিল। প্রায়ই সে শরৎচন্দ্রের গল্প বলতো। একদিন বললাম, চল যাই তোমার সঙ্গে একদিন শরৎচন্দ্রকে দেখে আসি।

শৈলেশের সময় আর হয়ে ওঠে না।

একদিন একাই চলে গেলাম—কাউকে কিছু না বলে।

শোনা একেবারে যাকে শিবপুর।

খুঁজে খুঁজে বের করলাম বাড়ীখানা।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, শরৎচন্দ্র একটা ঘরের ভেতর বসে বসে একটা কুকুরকে চা খাওয়াচ্ছেন।

কি করবো ভাবছি—এমন সময় তাঁরই নজর পড়লো আমার দিকে।

—ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছো?—যাও!

বোধকরি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন। বললাম, এক গ্লাস জল খাব।

কি আর করবেন। বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ভেতরে এসো।

নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। বললেন, ঘরে গিয়ে বোসো।

অপরিচিত মানুষ দেখে কুকুরটা তখন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। তাকে তিনি থামিয়ে দিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন।

ঘরে গিয়ে বসলাম। মেঝের ওপর শতরঞ্চি পাতা। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখি একটি রাইফেল বন্দুক টাঙানো, আর তার পাশে একটি রুদ্রাক্ষের মালা।

আমার দুটো সাঁওতালী গল্প তখন প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে। ভাবছি সেকথা তাঁকে বলবো কিনা। এমন সময় দেখি নিজেই হাতে করে এক গ্লাস জল নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকছেন।

জলের গ্লাসটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, যাও।

তাঁর সঙ্গে কি আমার কথা হয়েছিল আজ আর সেসব কথা মনে নেই। শুধু মনে আছে আমি বলেছিলাম, লেখার অভ্যেস আমারও একটু-আধটু আছে।

কথাটা শুনে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, ওটা একটা রোগ।

প্রবাসীতে আমার লেখা ছাপা হয়েছে। ভেবেছিলাম, আমার নামটা বললে হয়ত চিনতে পারবেন।

নাম বলেছিলাম। কিন্তু না, তিনি পড়েননি।

সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু শুনতে চেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে।

কিছুই তিনি বলেননি। যা বলেছিলেন সেসব কথা শোনবার মত নয়।

বলেছিলেন, তুমি অঙ্ক কষতে ভালবাসো?

—আজ্ঞে না। অঙ্কের নাম শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, অঙ্ক কষলে মাথাটা পরিষ্কার থাকে।

এইরকম সব আজে-বাজে কথা।

তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছিলাম সেখান থেকে। প্রণাম করে বলেছিলাম, আজ চলি।

—হ্যাঁ যাও।

বলেই তিনি যে কথাটি বলেছিলেন সেকথা আজও আমার মনে আছে।

বলেছিলেন, গল্প-উপন্যাস লিখছো ভালই করছো, তার জন্য কারও কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা কোরো না। ও হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা কারও কাছ থেকে শেখা যায় না। তোমার মনই তোমাকে বলে দেবে তুমি কি লিখবে, কেমন করে লিখবে।

সেদিন প্রণাম করে চলে এসেছিলাম।

পরবর্তী জীবনে তাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেকথা পরে বলবো।

• • • •

সৈন্যাধ্যক্ষ ধরে এনেছেন জনকুড়ি তরুণকে। তাদের মধ্যে কে জোসেফ্ ম্যাটসিনি, সেটা জানতে চাইলেন তিনি।

কিন্তু কে যে ম্যাটসিনি তা' ঠিক করতে না পেরে তিনি হুকুম দিলেন, সব কটাকেই গুলি করে মার—

একজন সৈন্য বন্দুক উঁচিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াল,—শুধু হুকুমের অপেক্ষা!

হঠাৎ দেখা গেল একজন তরুণ ছুটে সেখানে এলেন,—তীব্রকণ্ঠে বল্লেন, ম্যাটসিনিকে চান আপনি,—আমিই সেই,—এদের ছেড়ে দিন।

সৈন্যাধ্যক্ষ ভ্রূকুটি করলেন, তারপর বল্লেন,—তবে তুমিই মরতে প্রস্তুত হও।

—হয়েছি জেনারেল,—বুক চিতিয়ে দাঁড়াল তরুণ।

—বড্ড সাহসী যে তুমি ছোকরা,—তোমাকে দেখছি আর মারা চলবে না।—হেসে উঠলেন সৈন্যাধ্যক্ষ।

অপঘাতমৃত্যু

সুবোধ সিংহ

সতেরো বছরের আগেকার ঘটনা। পুরোনো হয়েছে বটে কিন্তু পরীক্ষিতের মন থেকে তা মুছে যায়নি, শুধু তার রং বদলে গেছে।

মানুষ সুন্দরভাবে নিখুঁত একটি আশার পরিকল্পনা সাজিয়ে চলতে চায়, কিন্তু কে যেন বার বার তা ওলট-পালট করে ছত্রখান করে দিতে থাকে।

বহুদিন আগেকার একটি সকাল বেলার আকাশ ভোরা হয়ে নামল পরীক্ষিতের মনে। তার ভাবনার সূত্র তন্ময় হয়ে উঠল আবার। সুমিত্রাকে ছেড়ে দিয়েছিল সে,—যেতে দিয়েছিল তাকে। সেদিন সকালের ট্রেনে সুমিত্রা তার বাবার সঙ্গে চলে গিয়েছিল। যা ভেবেছিল তা হ'ল না।—ছেলেমেয়ের জন্য সে আটকে রইল না। ওদের ছেড়েই সুমিত্রা চলে গেল। সন্ধ্যের আগেই এখানের আকাশ ধীরে ধীরে অন্য মূর্তি ধরল। নীল হাওয়াটাই যেন কুঁচকে গেল একটু একটু করে। আকাশ ভরা কালো কালো মেঘের ভাঁজে ভাঁজে বর্ষার বন্যতা অন্ধকারে গুমরোতে লাগল। সূর্য ডুবে যাওয়ার পরেও একদিকের আকাশের মেঘ লাল হয়ে রইল অনেকক্ষণ। কোথায় কি যেন পুড়ে যাচ্ছে আর তারই আলো যেন ঠিকরে পড়েছে মেঘের গায়ে। ঝড়ের আভাস দেখে ওর আক্রোশের মনটাই নরম হয়ে গেল না কি? এতক্ষণে ওদের ট্রেন সিঙ্গাপুরে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই। ঝড়ের নাগালের বাইরে চলে গেছে সুমিত্রা।

কিন্তু পরীক্ষিৎ সেদিন কি একবার ভাবতে পেরেছিল যে একটা অচেনা অজানা ও ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ তার জীবনকে সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ছিঁড়ে দু-টুকরো করে দিয়ে যাবে? আর তার একটা ছেঁড়া টুকরো ঝড়ো হাওয়ায় অতীত, অতিক্রান্ত ও নিঃশেষিত হয়ে উড়ে চলে যাবে?

ভাবেনি পরীক্ষিৎ। কারণ মৃত্যুর এ-চেহারা অসংবৃত আবরণের চকিত প্রকাশ। এ-প্রকাশ সচরাচর স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে না। মৃত্যু কত বিচিত্র বেশে আসে মানুষের জীবনে, কত বিচিত্র অভিনয় করে যায়। স্ত্রীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে পরীক্ষিৎ নিজেকে ভেঙে পড়তে দিলে না। বেশ সহজভাবে এই অসহনীয় শোকের আঘাতকে গ্রহণ করে কঠিন মানুষের মত শক্ত পৃথিবীতে চলাফেরা করতে লাগল। তবু এ-কথা সত্যি নয়,—এ-কথা বলতে বাধা নেই আর যে, শোকের চোখের আড়ালে যে-মনটা বাস করে তাকে সে কোন রকমেই সান্ত্বনা দিতে পারেনি।

সতেরো বছরের পুরোনো দুর্ঘটনা অনেক বসন্ত, অনেক বর্ষা শীত, শরৎ, হেমন্ত পারাপার করে নতুন জন্ম নিয়ে নতুন সাজ পরে পরীক্ষিতের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেদিনের স্মৃতি কেমন করে যে, কি ভাবে ঠাণ্ডা হয়ে জুড়িয়ে গেল তা যেন বুঝতেই পারা গেল না।

সতেরো বছর আগে ওদের দশ বছরের বিবাহিত জীবনকে পরীক্ষিৎ এখন আলাদা অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারছে। যৌবনের রক্ত অন্য কথা পৌঁছে দিয়েছিল, অন্যভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল; প্রৌঢ় বয়েসের কাছাকাছি এসে তার রূপ, রং সব বদলে গেল। পরীক্ষিৎ যেন সুমিত্রাকে নতুনভাবে ভাবতে শিখল। সুমিত্রা যে-কথা বলতে পারেনি সে-কথাও এখন সে শুনতে পেল,—শুনতে পেল সে-সব উত্তর যে-প্রশ্নের সে উত্তর পায়নি।

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ছোঁয়া লেগে সেই বিবাহিত জীবনের স্বল্পপরিসর কাল দীর্ঘ হয়ে গেল। আর পরীক্ষিৎ সেই দীর্ঘ কাহিনী পড়তে পড়তে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেল,—কালো চুলে দাদা পাক ধরতে শুরু করল, বিষণ্ণ ক'লে চোখের চাহনি, মুখের রেখায় সময়ের ছাপ পড়ে গেল,—তবু সেই কাহিনী শেষ হল না। ধারাবাহিক ক্রম অনুসারে দুখল মুহূর্তগুলো ফুলে যেতে যেতে বেশী সময় লাগেনা মানুষের—পরীক্ষিতও সে সবগুলো ভুলতে চেয়েছিল,—কিন্তু সুমিত্রা তাকে কোনদিন তা ভুলতে দেয়নি।

সব ঘটনাগুলোই এখন মিশে গেছে। সালানো ক্রম আর নেই, এলোমেলো হয়ে গিয়েছে সমস্ত অতীত,—ভিড়ের কোলাহলের মত অস্পষ্ট হয়ে গেছে সেসব।

এই অস্পষ্ট দিনগুলো অকস্মাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরীক্ষিতের কাছে—যন্ত্রণার মত স্পষ্ট ও তীব্র। একমাত্র চিৎকার করে উঠল কে যেন,—

—"সুধীন এ-বাড়ীতে ঢোকে কেন? কেন আসে ও? তোমার মোহ কি ওর এখনও কাটেনি?"

আজও সেই রকম একটা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। অফিস থেকে ফিরে এসে সে এইমাত্র বসেছে বারান্দার ইজিচেয়ারে। সেদিনও এই চেয়ারেই বসেছিল সে,—প্রশ্ন বর্ষিত হল সুমিত্রার ওপর। প্লেটে ওরই খাবার নিয়ে সুমিত্রা দাঁড়িয়েছিল সেদিন। পরীক্ষিতের মহান আদর্শের অহঙ্কার সেদিন অকস্মাৎ ওর যৌবনের সর্বগ্রাসী প্রভুত্বের কাছে হার মেনে গেল। সারা দুপুর ধরে ওরই জন্যে কষ্ট করে সুমিত্রা খাবার তৈরী করে রেখেছে,—প্লেট সাজিয়ে এনে ধরেছে ওকে খুশী করবার জন্যে,—ও যা ভালবাসে, সে-সব করে এনেছে একটু সামান্য বাহবা পাওয়ার জন্যে আর মানুষটা এর জন্যে এতটুকুও সৌজন্যবোধ করল না! মানুষ যখন স্বামী হয়ে স্ত্রীলোকের জীবনে প্রবেশ করে তখন বোধহয় স্ত্রীর প্রতি সৌজন্য দেখাবার আর দরকার আছে বলে মনে করে না।

তারই সেদিনকার কথা আজ সে ভুলতে গেল এই নির্জন সন্ধ্যায়। আজ আগের সে-মানুষটি আর নেই—আজ এই ইজিচেয়ারে যে বসে আছে সে একজন প্রৌঢ় মানুষ,—অনেক বছরের শ্রান্তিতে যেন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে,—বুদ্ধি বিবেচনাতেও অনেক শান্ত, ধীর ও সংযত। দিন চলে গেছে দ্রুতবেগে,—দিন যেতে তো বেশীক্ষণ লাগেনা!

রাস্তার আলো জ্বলতেই অনেকগুলো গাছের ছায়া অকস্মাৎ ছুটে এসে বারান্দার থামের গায়ে যেন আটকে গেল। সেই থামের ছায়ার দিক থেকে চোখ আর ফেরাতে পারল না পরীক্ষিত। সুমিত্রাই যেন এসে গেছে ওর অবাধটি দেখার জন্যে। ঠিক ঐ থামের কাছে দাঁড়িয়েই সেদিন সুমিত্রা বলেছিল,—

"সুধীনের ওপর মোহ আমার কোনদিনই ছিল না।

"তাই নাকি? আশ্চর্য তো। তাহলে ওর সঙ্গে বোম্বেতে পালিয়ে গিয়েছিলে কেন?"

"বাবা আর দাদাকে জব্দ করবার জন্যে। শৈবালকে মনে পড়ে? আই, সি, এস শৈবাল সেন? তার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছিলেন তারা। সে-বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলাম—এ ছাড়া উপায় ছিল না!"

"জব্দ?" বিদ্রূপভাবে হেসে উঠল পরীক্ষিৎ।

সুমিত্রা যেন কলাও করে তার প্রত্যেক কাজের একটা চমৎকার যুক্তি দিতে পারে। এ বিষয়ে সে বেশ সিদ্ধহস্ত। সেদিন কিন্তু বড় খেলো বলে মনে হল তার কাছে। কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না সুমিত্রার যুক্তি। ওর তন্বী চেহারার প্রলুব্ধ রূপ ওর যুক্তির ধারকে ধারালো করতে পারেনি সেদিন।

"আমাকে তুমি বাজে কথা বলে ভোলাতে চেষ্টা করোনা সুমিত্রা!"

"বাজে কথা! সত্যি কথা অনেক সময় বাজে বলেই মনে হয়।"

"মোহ তোমার নেই! না থাকতেও পারে। কিন্তু দুপুরবেলা নিরিবিলিতে বেশী মজলিস জমাতে মোহ এসে ঘাড়ে চাপতেও পারে! আমাকেও আবার জব্দ করবার মতলব করেছ না কি তোমরা?"

"অন্য কি ?"

"যে-ভাবে বাবাকে দাদাকে জব্দ করলে,—শৈবালকে জব্দ করলে—আর নিজে জব্দ হলে—আর আমাকেও জব্দ করতে চাচ্ছোনি—সেই রকম আর কি—!"

"আমি কি করতে পারি এ-ক্ষেত্রে ?"

"মেয়েরা যা করে থাকে এ বয়সে তাই করবে—"

"তোমাকে তো মহান চরিত্রের উদার মানুষ বলেই জানতাম! তোমার মন এত ছোট! এত—"

"না। অতখানি মহান চরিত্র নই আমি। এতখানি উদার চরিত্রের মানুষ হতে পারবো না!"

"তুমি বেশ! বেশ পেঁচিয়ে কথা বলতে পার! কথার কদর্থ করতে আটকায় না মুখে।"

কড়া হাতে লাগাম টেনে বজ্জাত ঘোড়া আর সুন্দরী স্ত্রীকে শায়েস্তা করে রাখতে হয়। পরীক্ষিতের কথাতে বেশ কাজ হল। এদের দ্বিপ্রহরের মধুচক্রের বৈঠক ভেঙে গেল। সুধীন আর কখনও এ-বাড়ীতে আসেনি। সুমিত্রার কড়া পতিব্রতার ভাব সুধীন হজম করতে পারেনি নিশ্চয়ই। পরস্ত্রীর সতীপনা পুরুষমানুষ বোধ হয় তেমন বরদাস্ত করতে পারে না। উচ্চকিত পতিব্রতার ভাব পর-পুরুষের মোহের নেশা দেয় ছুটিয়ে—মাখামাখিটা আর জমাট বাঁধবার সুযোগ পায় না তেমন করে।

সতীপনার ভান করে' কেউ কেউ খুব জাঁকিয়ে সোরগোল তোলে!—সুমিত্রা বোধহয় তা করেনি। ওর ভাবভঙ্গী কথাবার্তাতে ছলাকলার ভনিতা হয়তো ছিল না। তা থাকলে বুঝতে পারত সুধীন। ও ফিরে আসত, কিংবা পরীক্ষিতের বাড়ীর সঙ্গে স্ত্রীণ সম্পর্কের সূত্র বজায় রাখতে চেষ্টা করত। কিন্তু পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের এই মাতোয়ারী সহপাঠী বন্ধুটি আর কখন এ বাড়ীতে আসেনি। এমন কি সুমিত্রার দাদা অমরেশের বাড়ীর এমন সুখরোচক আর জমাট আড্ডাকেও সে ছেড়ে দিয়েছিল চিরকালের জন্যে।

বিপত্নীক হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন কাটাতে দেখে অন্তলোকে যে যা বলুক না কেন পরীক্ষিৎ নিজে জানে সে একজন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। ওর চালচলন আর মনস্তত্ত্বকে নির্বিবাদে একই কোঠায় বাস করতে দেখে সে নিজেই বেশ অবাক হয়ে গেছে। মনে হয়েছে এদের মধ্যে যেন কোন বিবাদ নেই,—বেশ মিলেমিশেই আছে। বোধহয় পরীক্ষিৎ নিজে অদ্ভুত বলেই যে কোন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষকে তার ভাল লাগে।

ভাল লেগেছিল সুমিত্রাকে এই কারণেই। সে-ও বেশ অদ্ভুত মিশ্রণের মানুষ। সুমিত্রার বেপরোয়া এবং অদমনীয় প্রকৃতি যেমন তার মনকে আকর্ষণ করেছিল তেমনি ওর নির্ভীক সমর্পণের ভাব ও স্পষ্ট বক্তব্য পরীক্ষিতকে মুগ্ধ করেছিল। মনের ভেতরে আরো একটি অপ্রকাশিত অহঙ্কার পরীক্ষিতের ছিল হয়তো। একটি তেজী যুবতী মেয়েকে বশে আনবার লোভ সে সামলাতে পারেনি। নিজের পৌরুষের উৎপাতটি কতখানি শক্ত আর মজবুত,—কতখানি ধারালো, তা একবার পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল বৈকি।

পছন্দ ও অপছন্দের মধ্যে মনোপ্রবৃত্তির একটি আপেক্ষিকতা আছে। যার চোখে যাকে ভাল লাগে সেই-ই সবচেয়ে সুন্দর তার কাছে। কিন্তু বহু যুবকের মন ভাঙানো যে-মেয়ে—যে মেয়েকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে পারলে অনেক যুবক নিজেকে ধন্য বলে মনে করে—সে মেয়েটি যে অসাধারণ সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। রংয়ের দিক থেকেও এমন কর্সা রং সচরাচর বাঙালীর ঘরে দেখা যায় না।

দুইযৌবনের · সুমিত্রা ও সাধনার রংয়ের খেলা দেখে অবিশ্যি পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে আর সে-সব কথাও পরীক্ষিতের কানে এসেছে বহুদিন। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক,— ওর জন্যে পরীক্ষিতের কোন মনোবিকার ঘটেনি এ পর্যন্ত।

সকলেরই বিশ্বাস, সুমিত্রার মৃত্যু পরীক্ষিৎ বেশ সহজভাবেই নিয়েছিল। যে-ভাবেই মৃত্যু হোক, এই অবশ্যম্ভাবী নিয়মকে কেউ কি সহজ ও স্বাভাবিক, বিষয় বলে মেনে নিতে পেরেছে ? না, পরীক্ষিতও পারেনি

কারণ, মৃত্যুই বোধহয় মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অনেক সময়েই প্রিয়জনের মৃত্যুকে যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি তাকে মেনে নেওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। স্ত্রীর অভাব তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্পৃষ্ট ও অপাঙ্‌ক্তেয় করে তুলতে পারেনি একটি মাত্র কারণে। সে তার দুটি সন্তান রেখে গিয়েছিল। আজ মনে হচ্ছে, ওরাই পরীক্ষিতকে ঠিক পথের সন্ধান বলে দিয়েছে। ন' বছরের তপতী আর পাঁচবছরের দীপক যদি না থাকত,—এবং এ-কথাও সত্যি,—যদি তার মনে ওদেরকে লালন-পালন করবার ইচ্ছেটি না জাগত তাহলে খুব সম্ভবত সে বরুণার কাঁচা যৌবনের বৈধব্যকে এমনভাবে অর্থহীন করে দিতে পারত না।

মায়ের মত না হলেও ওরা দুজনেই খুব কর্মা—কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল, সুন্দর চোখ, রোগা আর মজবুত গড়ন। বেড়ালের বাচ্চার মত সব সময়েই ছটোপাটি করে ওরা আপন মনে খেলা করছে। শোকাচ্ছন্ন বাড়ীতে ওরাই একমাত্র অস্বাভাবিক আনন্দে বিভোর হয়ে আছে। ওরা বেশ নির্বিকার ও নিশ্চিন্ত—মায়ের মারা যাওয়ার খবরে ওদের মনে খুব বেশী আঘাত লেগেছে বলে তো মনে হয়না। বরং হঠাৎ দেখতে পেল ওরা যা চাইছে তাই পাচ্ছে। কোলে কোলে ঘুরছে, আদর খাচ্ছে সকলের কাছ থেকে,—আহ্লাদে আহ্লাদে সুর উঠেছে ওদের গলায়। এমন শাসনহীন স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা ওরা জীবনে কখনও পায়নি। সুমিত্রার মৃত্যুর চার পাঁচদিন পরে দিল্লী থেকে পরীক্ষিতের দাদা ও বৌদি দেরাদুন থেকে প্রমথেশ ও সাবনা ছুটে এল। বাপের মুখ দেখে ওরা খুব বেশী ঠাহর করতে পারেনি কিন্তু ওদের আসার পর ওদের রকম সকম, ভাবভঙ্গী দেখে এই প্রথম তপতী কান্নায় ভেঙে পড়ল। অল্পক্ষণ পরেই অবশ্য দেখা গেল ওরা দুই ভাইবোন পেয়ারা গাছের তলায় বসে পরম আয়েসে নিশ্চিন্ত মনে পেয়ারা চিবিয়ে খাচ্ছে।

যাকে ছাড়া ওদের একমুহূর্তও চলতো না, তার অভাবে ওরা তো দিব্যি আনন্দে আছে! ওদের কি কিছুই অনুভব করবার শক্তি নেই—কিছুই কি বোঝে না ওরা?

ওপরের বারান্দা থেকে পরীক্ষিৎ একদিন দেখল ওরা দুজনে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীতে ওদেরকে দেখাশোনা করবার লোকের অভাব নেই তবু ওর মনে হল দেখবার কেউ নেই। পরীক্ষিতের দাদা সুরজিতের কথা মত সত্যসুন্দরের মাকে এনে রাখা হয়েছিল এ-বাড়িতে। সিঙ্গাপুরে যাওয়ার আগে সুমিত্রা নিজে একটা আয়াকেও ঠিক করেছিল ওদের জন্যে,—আর ছিল ওর সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে অপরিহার্য চাকর রামেশ্বর—বাপের আমলে বাচ্চা অবস্থায় ঘর বাড়ী ছেড়ে সেই যে এ-বাড়ীতে চাকরিতে ঢুকেছে আর ছাড়েনি,—তারপর বাপের অবর্তমানে যখন ওদের একান্নবর্তি পরিবার ভেঙে গেল তখনও তার দাদার কাছে যায়নি। ওরই সঙ্গে রামেশ্বরও হিন্দুস্থান পার্কের এই নতুন বাড়ীতে এসে উঠেছে। রামেশ্বর থাকলে আর ভাবনা নেই কিছু,—ওর সব দিকেই নজর। পরীক্ষিতের অভ্যেস ও মেজাজ সম্বন্ধে তার অজানা নেই। এসব জানা থাকা সত্ত্বেও রামেশ্বরের পাকেচক্রে দেখে পরীক্ষিৎ আশ্চর্য বোধ করল। সেদিন তার মনে হয়েছিল রামেশ্বর কাজে বেশ ঢিল দিয়েছে—তপতী ও দীপকের যত্ন আর তেমনভাবে হচ্ছে না। নইলে, ওরা ময়লা জামা-কাপড় পরে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—ঝুর ঝুর বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে গেটের কাছে গিয়ে রাস্তা দেখছে—এমন তাকে দেখতে হত না। ওদের দেখবার কেউ নেই—এই অনুভূতি অকস্মাৎ ওর মনটাকে একটা মোচড় দিয়ে গেল। ওদেরকে ডেকে পাঠানো হল।

ওরা দুজন কাছে দাঁড়াতেই পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করল,—

"গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ভিজে ভিজে কি দেখছিলে তোমরা দুজন?"

তপতী বলল,—"রাস্তা—।"

পরীক্ষিৎ বলল,—"বৃষ্টি পড়ছে—সে খেয়াল আছে?"

"মা যে এই রাস্তা দিয়ে যাবে,—না ডাকলে তো আসবে না! রাগ করেছে যে—!"

"সেইজন্যে দাঁড়িয়েছিলে?"

"মা প্রত্যেকদিন দুপুরে এই রাস্তা দিয়ে যায়—মা ডাকলে আসবে না সে।"

"এ-সব খবর পেলে কোত্থেকে?"

"আয়া বলেছে—ও তো আর মিথ্যে কথা বলবে না!"

"কি বলেছে সে?"

"বলেছে—'সবুর কর খুকী! তোমার মা শীগ্‌গিরই আসবে। তোমার বাবাই একটা সুন্দর মা এনে দেবে তোমাদের দুজনের জন্যে!' —আনবে তুমি? —ঠিক বলেনি বাবা!"

তপতীর একটা স্বপ্নের সৃষ্টি অনেক বড় বয়েস পর্যন্ত ওর কাছে সত্যি ঘটনা বলে মনে হয়েছে। স্বপ্নের অলীক ছবি ওর শিশু-জীবনে এমন দাগ কেটে গিয়েছিল যে সে ছবিকে মিথ্যে বলে ভাবতে তার কষ্ট হত। ওর মুখে অনেকবার পরীক্ষিৎ সে গল্প শুনেছে।

ওদের মা একটা সোনালী রংয়ের গাড়ী করে ওদের গেটের সামনে এসেছিল। দুই ভাই বোনের সঙ্গে দেখা হল তার। সে একাই গাড়ীতে বসেছিল, আর কেউ ছিল না। এমন কি ড্রাইভারকেও তারা দেখতে পায়নি। মা তো কোনদিন লালপেড়ে শাড়ী পরে না! সেদিন কিন্তু পরেছিল সেই রকমের শাড়ী। ভারি অদ্ভুত লাগছিল মাকে তখন। ওরা মাকে ডাকতে পারত,—কিন্তু কেন যেন ওদের ভারি লজ্জা হল, কিছুতেই মাকে ডাকতে পারল না—গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরুল না তাদের। কিছুক্ষণ পরেই মায়ের গাড়ী চলে গেল। পাশে আয়াও দাঁড়িয়েছিল। তাকে সে জিজ্ঞাসা করল,—"মা নামল না কেন?"

আয়া তাদের দুজনের হাত শক্ত করে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ীর দিকে রওনা হল। পথে যেতে যেতে বলল,—

"বোকা মেয়ে! মা ডাকলে তোমাদের মা কোনদিনই এ বাড়ীতে আসবে না। রাগ করে চলে গিয়েছে তোমার মা,—মা সাধলে আসবে কেন?"

তপতী আয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—

"আর আসবে না?"

"প্রত্যেক দিনই তো দুপুরবেলা আসে!"

"দুপুরে আসে কেন মা?"

"তোমার বাবা যখন বাড়ীতে থাকে না তখনই সে আসে।"

"কেন? বাবা কি করেছে?"

"তাড়িয়ে দিয়েছে তোমাদের মাকে। নতুন মা,—আরো সুন্দর মা আনবে তোমাদের জন্যে। তাঁকে মা বলে ডাকবে তোমরা। —পারবে না?"

তার উত্তর দিতে তপতীর ভয়ানক কষ্ট হল। এত কষ্ট হল যে সে তা বলে বোঝাতে পারে না। আর কাউকেই সে মা বলে ডাকতে পারবে না। কেন পারবে না সে তা জানে না। বলে বোঝাতে পারবে না। আয়ার এ প্রশ্নে কেন তার গলাটা ধরে এল—বলতে পারে না কেন তার গলাটা ব্যথায় টন টন করে উঠল।

ওরা তাহলে ভাবে ওদের মাকে? ভুলতে পারেনি তাকে?

"তোমার সব ভাল বাবা—কিন্তু তোমার একটা দোষ আছে……" বহু রাত্রি অতিক্রম করে পরীক্ষিৎ অতীতের একটা বিশেষ রাত্রিতে পৌঁছে গেল;—শুনতে পেল ওর ন বছর বয়েসের মেয়ের কথা।

তখন ও নিতান্ত শিশু—কিন্তু বড় অদ্ভুত লাগল। বোধ হয় সব শিশু চরিত্রই এমনি অদ্ভুত। ওরা সরল বটে তাই বলে স্বর্গরাজ্যের পবিত্র নিষ্পাপ জীব নয় একেবারেই। সরল বলেই ওরা বোধ হয় ওদের প্রবৃত্তি-গুলোকে ঢেকে-ঢেকে মেকে-ঘষে ভদ্রবেশ দিতে পারে না। ওরা অকপটভাবে স্বেচ্ছাচারী—নিজের এতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব সহ্য করতে পারে না। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ওরা সুচতুর প্রবীণ ব্যক্তির মত অনেক বাধা ও বিঘ্ন সৃষ্টি করবার কৌশল জানে; ওরা জানে কি করে অসাবধানী বাপমায়ের রাত্রিবাসের কীর্তি চুরি

করে রেখে নিতে হয়। ওরা শিশু ও সরল বটে কিন্তু সাধারণ মানুষ যা ভাবে তা নয় ওরা। ওরা ভীষণ স্বার্থপর ও অত্যন্ত পরশ্রীকাতর ও বিদ্বেষবাদী। ন্যায্য ও অন্যায্য অধিকারের জন্যে ওদের একগুঁয়েমি দেখবার জিনিষ, ওরা সে বিষয়ে যথেষ্ট বিদ্বেষপূর্ণ। আদিম পশুর লোভ, ক্রোধ, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, নির্যাতন করবার নিষ্ঠুরতা, প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে—সবই আছে এই শিশু-মানবের প্রথম অধ্যায়ে।

সুমিত্রার মৃত্যুর খবর পেয়ে অনেকেই এসেছিল এ বাড়ীতে। দুঃখের দিনে অনেকে এসে যখন দুঃখের ভাগ নিতে চেষ্টা করে তখন শোকের মন অনেকখানি হালকা হয়ে থাকে। সকলের মুখে শোকের ছবি দেখে কিছুটা যেন ভুলে থাকে নিজের অভাবনীয় ক্ষতির কথা। সান্ত্বনার মত মনে হয়,—এ যেন ওর একার অভাব নয়, অনেকেরই অভাব।

কিন্তু যারা এসেছিল তারা চিরদিন এ-বাড়ীতে থাকবার জন্যে আসেনি। তারা ঘর-সংসার ফেলে এসেছে, তাকে ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারে না ওরা। যে বোঝা ওরা তুলে নিয়েছিল তা একান্তভাবে পরীক্ষিতেরই বোঝা—ওদের নয়। ওরা একে একে সব চলে যেতে লাগল।

বাড়ী খালি হয়ে গেল একটু একটু করে আর তখনি দেখতে পেল ভেতরের ঝড়, যা ছড়িয়ে ছিল বাইরে।

সকলে চলে যাবার পরও সাধনা কিছুদিন ছিল। কিন্তু ওরও ডাক একদিন এসে গেল। আর সেদিন হঠাৎ পরীক্ষিতের মনে হল এই সাধনাই একমাত্র নিকটতম আত্মীয়ের মত ওর অনেক অভাব পূরণ করে গেছে। দুঃখ ও বিপদের মুখোমুখি বসে পরীক্ষিৎ দেখতে পেল ওর এই নতুন অপরিচিত জীবনের অনেকগুলো অনুভূতিকে একটি নারী মধুর স্পর্শ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেমন করে যেন সুন্দর ও শান্ত করে দিয়ে গেছে।

সাধনার অন্তরঙ্গতার মধ্যে যেন একটি যাদুকরী আকর্ষণ আর ভয় মেশানো ছিল।

ওর যাবার আগের দিন রাত্রে পরীক্ষিৎ একটা আর্তনাদ শুনে হঠাৎ জেগে উঠল। এই আর্তনাদ ওর নিজেরই মনের। অবচেতন মনের মধ্যে যে এতক্ষণ যন্ত্রণায় কাঁদছিল পরীক্ষিতের জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা থেমে গেল। থেমে গেল বটে কিন্তু ঘোর কাটল না, থমথমে হয়ে রইল পরীক্ষিতের মন।

বিছানার একপাশে তপতী আর দীপক কুঁকড়ে শুটিয়ে শুয়ে আছে। খাট থেকে সুইচ টিপতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিল সে। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দেখতে পেল, একেবারে ওধারের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। ওটা সাধনার ঘর,—ও-ঘরেই থাকে সে।

সুমিত্রার সহযোগী বলেই বোধ হয় সাধনার ওপর ওর একটা মমতা জন্মেছিল। তাছাড়া ওরা দুজন অনেকটা একরকম দেখতে। কথাবার্তায়, হাত নাড়ার ভঙ্গীতে, হেঁটে-চলার মধ্যে, আর গোটাকয়েক মুদ্রাদোষে ওর সঙ্গে সুমিত্রার অনেক মিল আছে—পেছনদিক থেকে সুমিত্রা বলেই ভুল হবে। তবু ওরা দুজন একরকম নয়,—সুমিত্রা ওর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী।

ওর ঘরে ঢুকে পরীক্ষিৎ দেখল সাধনা দুগালে হাত চেপে টেবিলে কনুই রেখে চেয়ারে বসে আছে। ওর চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে টেবিলের ওপরে। কি এতটা ভাবনার মধ্যে সাধনা এমন তলিয়ে গিয়েছে যে পরীক্ষিতের উপস্থিতি সে বুঝতেই পারল না। বোধ হয় দুটো সুটকেসে ওর জিনিষপত্র, সাড়ী-ব্লাউজ ও গোছগাছ করছিল এতক্ষণ,—খোলা তালার সুটকেসের পাশে এখনও কিছু কিছু জিনিষ পড়ে রয়েছে—সবগুলো না তুলেই সাধনা হঠাৎ নিশ্চয়ই টেবিলের কাছে গিয়ে বসেছে। দুজনের একই দুঃখ যেন টেনে নিয়ে গেল ওর কাছে। আস্তে আস্তে ওর কাঁধে হাত রাখল পরীক্ষিৎ। ওর স্পর্শে সাধনা কিন্তু চমকে উঠল না। তারি অদ্ভুত ভাল লাগল ওর কাছে। সাধনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ভেজা ভেজা চোখ। পরীক্ষিতকে দেখছে সে, তবু মনে হল সে দৃষ্টি যেন এখানে নেই,—চলে গেছে বহুদূরে।

"এখনও জেগে আছ?"

সাধনা ছুটে গিয়ে বিছানাতে বসল,—তারপর কাৎ হয়ে সেখানে শুয়ে পড়ল,—"এইবার ঘুমিয়ে পড়ব,—কাল আবার খুব ভোরে উঠতে হবে।"

ওর চোখের সামনে অতিত যৌবনা একটি তুলতুলী তরুণী। ওর সমস্ত শরীরটাই যেন একটি বিশেষ ইশারায় মত সুন্দর।

একটি মধুর রহস্যের মত গভীর রাত্রি।

ঘুমিয়াহীন দিনগুলো গভীর রিক্ততায় বর্ণহীন। কোন কিছুই পরীক্ষিৎ আজ অস্বীকার করতে পারছে না। —না, নিত্রিত হাতের রহস্যময় শুশ্রূষা,—না, মেয়েলি মনের আত্মবিলয়ের সংকেত জানি,—না, নিজের উত্তেজনাময় মনের দিগ্‌ভ্রমের কথা।

সাধনাকে বলতে শুনল,—

"আপনি এখন যান,—কাল আবার ভোরেই উঠতে হবে, অনেক কেনা-কাটা বাকী আছে—সকালের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে।"

সাধনার কথা শুনে পরীক্ষিৎ থমকে গেল।

ওর প্রথম কথা আর ভাব, পরের কথা আর ভাবের সঙ্গে আর মিলছে না। দুবারের কথা যেন দুটো মানুষের মনোভাব। সাধনার এবারের কথাতে পরীক্ষিৎ আশ্চর্য হয়ে গেল। সে এখন পরীক্ষিতকে চলে যেতে বলছে—ও যেন জানাতে চায় পরীক্ষিৎ আর নিরাপদ নয় এখন।

ওর বিরক্তি ও বিব্রত ভাব বড় রূঢ় বলে মনে হল পরীক্ষিতের কাছে। পরীক্ষিতকে চলে যেতে দেখে সাধনা বলে উঠল,—

"যাবেন—?"

"না। বলে আর কি করব? ঘুমাও। ঘুম পেয়েছে তোমার।"

"কিছু বলবেন?"

"না। বলার কিছু নেই! জেগে আছ দেখে এলাম। বিছানাতে শুয়েছিলাম কেবল—চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। শুতে গেলেই নানা চিন্তা আসে,—নানা রকম ভাবনা! আমার সমস্ত মনটাই যেন একটা যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় ছটফট করে কাটাই—তারপর ভোর হয়ে যায়।"

"সত্যি। আপনার কষ্ট অন্য কেউই বুঝবে না।"

"ঠিকই বলেছ সাধনা! আর সেইটেই সবচেয়ে বড় কষ্ট!"

"আপনার কথাই ভাবছিলাম বসে বসে।"

"চোখ দিয়ে যে জল পড়ছিল, সে কি আমার কথা ভেবে?"

"আপনার কথাই বিশেষ করে—।"

ঘরে একটা চেয়ার ছিল; পরীক্ষিৎ সেটাতে বসতে গেল। সাধনা উঠে বসল। বিছানার চাদরটার ওপরে হাত রেখে বলল,—

"না—না। —ওখানে না। এইখানে আরাম করে বসুন!"

ওর কাছে বসে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করল,—

"আমার সম্বন্ধে কি ভাবছিলে তুমি?"

"আগে বলুন—রাগ করবেন না আপনি?"

"রাগ যদি একান্তই হয়ে পড়ে, বুঝতে দেবো না তোমাকে।"

একটু থেমে কি যেন চিন্তা করল সাধনা কিন্তু খুব বেশীক্ষণ নয়, একটু পরেই সে বলল,—

"বিয়ে করবেন না আর—?"

প্রশ্নটা করে সাধনা কিন্তু পরীক্ষিতের মুখ থেকে চোখ নামাল না। একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। পরীক্ষিতের মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগল সে।

খুব কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হল পরীক্ষিৎ। পত্নীহীন পুরুষমানুষকে আমৃত্যু এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে হয়। যৌবনের প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া স্বামীর কাঁচা শোকের চিত্রও তার জানা আছে বেশ। এ-প্রশ্নের কি জবাব দেয় তারা,—তা-ও তার অজানা নেই। অজানা নেই, শোকের স্মৃতি ফুরিয়ে যায় একদিন, আর সেই সঙ্গে বিদেয় হয়ে যায় শোকের মানুষ।

স্ত্রীর অবর্তমানে অনুরক্ত স্বামীর আচরণ সম্বন্ধে কোন মেয়েমানুষেরই সন্দেহ যায় না। কোন একটা নতুন

নমুনা পেলেই যাচাই করে দেখতে চায় তারা। ওরা যেন এই রূঢ় প্রশ্ন করে অলক্ষিতে নিজেদের ভাগ্যের কথাই জানতে চায়। জানতে চায়, ওরা না থাকলে ওদের স্বামী কিভাবে জীবন কাটাবে।

পরীক্ষিৎ ইচ্ছে করেই একটা আক্রোশের হল ফুটিয়ে দিল সেই মুহূর্তে,—

"ভাবিনি এখনও। স্ত্রীহীন হয়ে জীবন কাটানো কঠিন অনেকের পক্ষেই। কাজেই ভবিষ্যতে কি করে বলবো, এখন তা বলা মুস্কিল।"

চোখে-মুখে সাবনার যন্ত্রণার ছটফটানি দেখে যেন খুশী হল ওর মন। সাবনা চোখ নীচু করে বলল,—

"জানতাম—। —সব পুরুষমানুষই সমান।"

"তুমি কি আমার কাছে কোন ব্যতিক্রম আশা করেছিলে?"

"করেওছি আবার করিও নি। তপতী দীপক আছে, —তাদের কথা ভেবে হয়ত আর করবেন না। ওদের সুখে আপনি সুখী হবেন,—নিজের সুখই কেবল দেখবেন না।"

"সুখের স্পৃহা থাকা কি অন্যায়?"

অল্প কয়েক বছরের সুখের জন্যে আপনি কি চিরদিনের শান্তি নষ্ট করবেন? প্রত্যেক পরিবারে যা হয়, এখানেও তা হবে.—গোলমাল বাধবেই শেষ পর্যন্ত। তাতে আপনি, ওরা, যাকে আনবেন সে,—তারপর আরো যারা হবে তারা—সকলেই নষ্ট হয়ে যাবে।"

"তোমার কথাগুলোতে বেশ বিভীষিকা আছে— বেশ ভয় লাগিয়ে দিতে জান।"

"কিসের অভাব আপনার? লোক-জন, অর্থবল :— সবই আছে—ওদেরকে মানুষ করে তুলতে খুব কঠিন হবে না আপনার পক্ষে। তাছাড়া সত্যসুন্দরের মা আছেন—খুবই দেখাশোনা করেন উনি। বুড়ো মানুষ বটে, কিন্তু বেশ শক্ত—আর মানুষটিও বড় ভাল।"

"না। এ নজির দেখিয়ে বিয়ে করব না,—বিয়ে যদি করতেই হয়, নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই করব।"

"ভগবান না করুন, এ দুর্ভাগ্য যেন আপনার না আসে! সেদিন যদি আসে.—আসুক আপনার জীবনে। ওদেরকে আমি সে দুর্ভাগ্যের মধ্যে ফেলে রেখে যাব না। সেদিন আপনার কোন কথা শুনব না—জোর করে নিয়ে যাব ওদের। এবারই সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম, কিন্তু আপনি ওদের ছেড়ে থাকতে পারবেন না!"

"তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। তোমার কথা ভুলব না কোনদিন।"

"কেবল কি এ-কথাই? আমাদের কথা মনে থাকবে না?"

"তোমার কথা মনে থাকলে তোমার কি সুবিধা হবে?"

"এখানে মাঝে মাঝে আসতে পাব। —সে অধিকার থাকবে তো? ওদের কথা ভেবেই অস্থির হয়ে উঠি। ওদেরকে মাঝে মাঝে না দেখতে পেলে আমার মন খারাপ লাগবে। —বিশ্বাস করেন?"

"বিশ্বাস না করবার কি আছে?

"এদের কাছ থেকে চলে যেতে কষ্ট হচ্ছে।"

"আমারও—ভয়ানক একা হয়ে পড়ব।"

"কষ্ট—?"

"খুব।"

"হয় না কি—?"

এমন সময় হঠাৎ ছোট ছোট পায়ের দুপদাপ শব্দ হল বারান্দাতে - স্পষ্টতর হল,—এগিয়ে এল এ ঘরের দিকে। একটু পরেই পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকল তপতী।

সাবান ঘষা মাথার চুল হাল্কা হয়ে কখনো নীলাভ কখনো বাদামী দেখাচ্ছে। ভয়ে ওর ঠোঁট দুটো তখনও কাঁপছে। ভীতু চোখের দৃষ্টি ভরসার ছবি দেখে আশ্বস্ত হল যেন। পরমুহূর্তেই থমকে গেল সে, থমকে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। একবার পরীক্ষিতের দিকে, একবার মাসীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন সে দেখতে লাগল। হঠাৎ ঘপ্ করে যেন জ্বলে উঠল ওর দুটো চোখ —হিংস্র শ্বাপদের চোখের মত চকচকে হয়ে উঠল। ছুটে এল ওদের কাছে—ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের মধ্যে।

চিৎ হয়ে দুজনের মাঝখানে বিছানাতে শুয়ে পড়ল। ফক উঠে গেল কোমর অবধি। একটা খাটো নীল জাঙিয়া তপতীর কর্সা কোমর ঘিরে আঁটো করে বাঁধা রয়েছে। তার দুটো শক্ত, রুক্ষ, মজবুত পা এঁকেবেঁকে ছটফট করছে শুধু।

সাধনা ওকে কোলে টানতে গেল, তপতী ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছিটকে চলে গেল বাপের কোলের দিকে।

"ভয় পেয়েছ তপতী?" পরীক্ষিৎ তপতীর মুখের কাছে তার মুখ এগিয়ে আনল।

"একটু—।"

"একটু? একটু ভয় পেয়েছ? তবে চলে এলে কেন?"

"তোমার সব ভাল বাবা—কিন্তু তোমার একটা দোষ আছে। তুমি মাসীমাকেই বেশী ভালবাস। আমার চেয়েও বেশী।"

সাধনা ওর কথা শুনে হেসে উঠল,—খুব জোরেই হেসে উঠল। পরীক্ষিৎ হাসতে পারল না ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল ওর মুখ। ওর স্থির শরীরে মনের অস্থিরতা যেন হঠাৎ থমকে গেল। নতুন ভাবে অনুভব করল একটি অদ্ভুত অনুভূতি। তপতীর ঈর্ষা যেন ওদের দুজনের মনের অন্তরঙ্গতাকে অকস্মাৎ যোজনা করে দিয়ে গেল। সেই অদৃশ্য অন্তরঙ্গতা ভেঙে পরীক্ষিৎ উঠে দাঁড়াল।

তপতীর হাত ধরে চলে গেল পরীক্ষিৎ।

বহু বছর কেটে গেছে তারপর, কিন্তু উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া ওদের ঈর্ষার শাসন যে ওকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, সংশোধন করে নেওয়ার সময় দিয়ে গেছে অনেকবার, সে-কথা পরীক্ষিৎ ভুলতে পারেনি। আর ভুলতে পারেনি, শোকে উত্তেজিত মন ভিন্ন পথ ধরে নিজের কোন গূঢ় ইচ্ছের তাগিদকে চরিতার্থ করবার জন্যে কত অনায়াসে ছদ্মবেশ নিয়ে অগ্রসর হতে পারে।

সতর্ক-সঙ্কেতের লাল আলো জ্বলে উঠেছে অনেকবার। সেই আলো—সেই লাল আলো ওকে কতবার সাবধান করে দিয়ে গেছে—কতবার ওকে মোড়ের বাঁকা পথের তাজা লড়কের কথা জানিয়ে অভাবনীয় দুর্ঘটনার দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে।

প্রত্যেকটি দুর্যোগের রাত, প্রত্যেকটি দুর্ভাবনার দিন কাটিয়ে উঠে বেঁচে গিয়েছে সে। আর ততবারই একটু একটু করে ওর চরিত্রের ইস্পাতের ধার তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে—প্রশস্ত হয়েছে অস্ত্র, শাণিত ও সুন্দর। সুন্দর ও অর্থপূর্ণ হয়ে ধন্য হয়েছে তার জীবন। সার্থক হয়ে রয়েছে জীবনের সেই অংশগুলো।

ও কি, ও কেমন, ও কোন ধাতের মানুষ তা পরীক্ষিৎ এখনও বুঝতে পারেনি।

ভালবাসার মন ও তৃষ্ণা নিয়ে যে জন্মেছে সে কি নিজেকে বঞ্চিত করে ধন্য হবে? জীবন তার সার্থক হয়ে উঠবে? পরীক্ষিতের অহঙ্কার তাকে বঞ্চিত করেও সুখ দিয়েছিল,—বঞ্চনা করেনি সে। শৈশবের অনুরিত জীবনকে প্রতিপালন করে দেখতে চেয়েছিল সে। পরীক্ষিতের মধ্যে একটি অহঙ্কারী বৈজ্ঞানিক মন ছিল,—সেই মন আর কিছু জানে না,—কেবল নিজের কৃতিত্বকে দেখতে চায়। দেখতে চায় এই শিশু-অঙ্কুরের যৌবনের ডালে কত ফুল সে ধরাতে পারল,—কত রূপ সে ধরাতে পারল! পরীক্ষিৎ এই অহঙ্কারকেই ভালবেসে এসেছে চিরকাল,—আর কিছু নয়,—আর কাউকেই না। যে পুতুলকে সে তৈরী করল একটু একটু করে,—রং চড়াল, ভ্রূ আঁকল, রঙীন কাপড় পরাল, তা যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেল,—আর যখন তুলির আঁচড় দেওয়ার আর এতটুকুও জায়গা রইল না তখন তার মনের কাছে আর কোন সাড়া পায় না সে। যে আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে তার শিল্পী মন গড়ে তুলবার জন্যে কাজে অগ্রসর হয়েছিল তার সম্বন্ধে সে সেই মুহূর্তে উদাসীন হয়ে পড়ে। যার কাছে পরীক্ষিতের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তাকে অনাদর ও অবহেলার বস্তুর মত ফেলে যেতে তার কষ্ট হয় না।

খড়খড়ার নল মুখের কাছে ধরে প্রৌঢ় পরীক্ষিৎ ইজিচেয়ারে বসেছিল সেদিন। ছ-ফুট লম্বা মানুষটি এখন যেন একটু ঝুঁকে পড়েছে, তবু একটুকুও বেমানান লাগে না চোখে, বরং বেখাপ্পা সটান হলেই ওকে খুলো

স্বাস্থ্য-সজাগ ছিল মাষ্টারের মত দেখাত। বিষণ্ণ টানা চোখ, খাড়া নাক, চাপা পাতলা ঠোঁট বিশেষ একটি স্বাতন্ত্র্য এনেছে ওর মুখের আদলে, বিশেষ একটি প্রতিভাশালীর আভিজাত্য। পরীক্ষিতের বাস্তিক মন ও তাচ্ছিল্য ভাবের আড়ালে যে একটি স্নেহ-প্রবণ মন আছে তা অনেকেই দেখতে পায় না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ওর প্রিয়, অফিসের পরে এই বারান্দায় বসে থাকা তার অনেক কালের অভ্যাস।

সেখানে বসে বসে দীপকের ছেলেবেলার একটা ঘটনা তার মনে পড়ল।

দীপকের চেহারাটা তখন বেশ গোলগাল কিন্তু তাই বলে নরম তুলতুলে নয়। ওর শিলা-পড়নে মুখের গোঁয়ার-গোঁয়ার ভাবটা যেন বেশ মানিয়েছে। পাঁচ বছর বয়েসে একটি শান্ত শুভা সে—রেগে গেলে আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ঘাড় গোঁজ করে ও যখন চুপ করে বসে থাকে তখন বুঝতে হবে ওর মাথায় একটা ভয়ানক মারাত্মক মতলব ঘুরছে। দীপক সব সময় তপতীর সঙ্গে সঙ্গে থাকে—সংসারের দিদির পর সে এক মুহূর্তের জন্যেও ছাড়ে না। যখন সে দিদির কাছে থাকে না তখন সে কোথায় গিয়ে বসে থাকবে পরীক্ষিৎ তা জানে। দাদার কথা মত ওদের জন্যে পরীক্ষিৎ একটা আলাদা ঘর নার্সারির মত করে সাজিয়ে দিয়েছিল। সেখানে জানলার ধারে একটা চেয়ারে সে বসে আর কি যেন ভাবে। কিভাবে তা পরীক্ষিৎ বুঝতে পারেনি অনেকদিন। একদিন স্পষ্ট হল ওর ভাবনার কথা আর তা জানতে পেরে পরীক্ষিৎ আশ্চর্য হয়ে গেল।

একদিন দেখল দীপক সেই ঘরে একা বসে আছে। পরীক্ষিৎ তখনই অফিস থেকে ফিরেছে—অফিসের পোষাক পর্যন্ত ছাড়েনি। ঘরে ঢুকল সে। বিকেলের রোদ পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। শান্ত, নিরালা আর নিঝুম ছায়া পড়েছে সেই ঘরে। ওর হাতে কোন খেলার জিনিষ নেই,—না আছে কোন ছবির বই। অথচ টেবিলে পড়ে আছে অনেক বই, ঘরে রয়েছে অনেক রকমের খেলনা। ওর সামনের খোলা জানলা দিয়ে মরা রঙের পীতাভ আলো এসেছে খানিকটা। সে আলোও ঘরের দেওয়ালের সবুজ ডিসটেম্পার রংয়ের সঙ্গে মিশে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

ওর পেছন দিক থেকে আস্তে আস্তে পরীক্ষিৎ এগিয়ে গেল দীপকের কাছে। দীপকের পিঠে আলতোভাবে হাত রেখে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করল,—

"এখানে একা বসে আছ কেন? কি করছ বসে বসে?"

কোন উত্তর দিল না দীপক; কেবল আচমকা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। তারপর দুহাত বাড়িয়ে দিল পরীক্ষিতের দিকে।

কোলে তুলে নিয়ে সে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল,—

"মন কেমন করছে?"

কোন উত্তর পেলনা পরীক্ষিৎ। আবার জিজ্ঞাসা করল,—

"কেউ বকেছে? দিদি তোমাকে মেরেছে? ঝগড়া করেছ বুঝি?"

এবারও কোন জবাব এলনা। শুধু দেখল, ওর দুটি চোখ। সে চোখ যেন ক্লোরোফর্ম রোগীর চোখের মত এইমাত্র জেগে উঠল যাদুর চিনবার মত দৃষ্টি যেন এখনও ফিরে আসেনি,—যেন এখনও চেতনার বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে।

ওর ঘোলাটে চোখের ওপর পরীক্ষিতের দুঃখময় দৃষ্টি কাঁপতে লাগল বারবার। যেন পরীক্ষিতের প্রাণপণ নিংড়ে তার দৃষ্টি দীপকের ঝিমিয়ে পড়া চোখদুটিকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। পরীক্ষিৎ হঠাৎ যেন খুঁজে পেল একটা জিজ্ঞাসা,—

"বাবার জন্য মন কেমন করছে?"

হঠাৎ পরীক্ষিতের গলা জড়িয়ে ধরে দীপক বলে উঠল,—

"আমি—বাবা—আমি।

"কি আমি—?"

"আমিই মাকে ডেকে আনব। বাবা! আমি ডাকলে মা আসবে না?"

ওদের মিথ্যে আশার স্বপ্ন কাঁটার মত ফুটে রয়েছে —অনবরত কষ্ট দিচ্ছে ওদেরকে—ওটাকে টেনে বা'র করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে।

"তাই ধরে বসে আছ নাকি তোমরা! কে বলেছে এসব আজেবাজে কথা! তোমাদের মা আর আসবে না। সে মারা গেছে।"

"মরে গেলেও আসবে—মা আসবে, মা আসবে! তুমি কিছু জান না!"

"আমি বলছি আসবে না। কে বলেছে এ-সব কথা? আচ্ছা বোকা তো তুমি?"

"তুমিও। তুমিও বাবা বোকা।"

"ঠিক আছে! আমি বোকা। ওসব কথা আর ভাববে না। জানবে,—মরে গেলে কেউ ফিরে আসে না।"

"তুমিও মরে গেলে ফিরে আসবে না?"

"না—কেউ না—আমিও না।"

"তুমিও তো মরে গেছ—তুমি কেন ফিরে এলে?"

"মরলাম কবে?"

"আমি দেখেছি, তুমি মরে গেছ।"

"তা হলে তো ভালই দেখেছ। আর কি দেখেছ?"

"তুমি মাকে তাড়িয়ে দিয়েছ, দেখেছি—তাই মা আর আসেনা, দেখেছি। তুমি মাকে বকেছ—মেরেছ। আমি সব জানি। দিদিও জানে। তুমি ঝগড়া করনি? মা কাঁদেনি? মা কি বলেছে জানো?"

"কী বলেছে—?"

"বলেছে,—'তুমি তোমার বাবার ছেলে, বাবার কাছেই থাক। আমি তোদের কেউ নই—আমি আর আসব না।"

"আচ্ছা! আচ্ছা! তুমি কি দেখেছ তা পরে দেখব! এখন ওপরে চল!" ওকে কোলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল পরীক্ষিৎ। দীপক হাত দিয়ে ওর থুঁতনী ফিরিয়ে বুকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—

"বাবা শোন!"

"কি?"

"তিনদিন সময় দিলাম। তিন দিনের মধ্যে আর একটা মা এনে দিতে হবে।—বুঝলে?"

"যে কোন একটা মা হলেই চলবে!"

ওর কাঁধের দিকে দীপকের মুখ ফেরানো। দীপককে না দেখেই পরীক্ষিৎ বুঝতে পারছে ও ফোঁস ফোঁস করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ও যা চায় তা সে পাবেনা। দীপক তা ভাল ভাবে জানে বলেই ওর মনের সঙ্গে একটা আপস করতে চেয়েছিল সম্ভবত। সেখানে বোধহয় তার ছঃখময় আকাঙ্ক্ষা নতুন করে আবার আহত হল!

মর-জগতের দেব নিয়ে সুমিত্রা ফিরে না এলেও, পরীক্ষিতের ভাবনায় জগতে সে নিত্য যাওয়া আসা করে একদিনের জন্যেও সে তাকে ভুলতে দেয়নি—প্রতিদিন সে আসবে নির্জন সন্ধ্যায়, অনেক রাত পর্যন্ত জড়িয়ে ভুলবে তার সুখ-ছুঃখের কথাতে। প্রেত লোকের কবরে শায়িতা—বেগমের অশরীরী অতৃপ্ত আত্মার মত সুমিত্রা যেন ওদের কাছাকাছি থাকে ওদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে করেওছে যেন অনেকবার—আর এই অনুভূতিকে মিথ্যে বলে সে উড়িয়ে দিতে পারেনা কোনমতেই একবার ভোররাতে দীপক খাট থেকে পড়ে যাওয়ার মত হয়েছিল,—কোমর অবধি ঝুলে পড়েছিল, হঠাৎ মনে হল ওকে যেন কে আলগোছে বিছানাতে তুলে দিল। আর একবার তপতী মোটর গাড়ীর নীচে পড়তে পড়তে হঠাৎ অদ্ভুত আর আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল। মনে হয়েছিল, কেউ ওকে মোটরের সামনে থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে না দিলে ও কিছুতেই বাঁচতে পারেনা।

মৃত্যুকে মেনে নেওয়ার বয়েস হয়নি ওদের যে বয়সে মানুষ প্রথম বুঝতে পারে যে মৃত্যু হল

কোন জীবই আর ফিরে আসেনা সে বয়স থেকেই দুঃখ ও দুর্ভাবনা আসবার সবগুলো দরজাই একে একে খুলে যেতে থাকে। যাকে হারানোর দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যে ওদের চিত্তমনে আছে সম্মোহিত আশা। পরীক্ষিতের দাদা সিঙ্গাপুর থেকে খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে এসেছে এ-কথা তারা জানে কিন্তু এ-কথা তারা বিশ্বাস করেনা যে সেখানে ওদের মাকে পাওয়া যায়নি। যে এরোপ্লেন ওদের মাকে নিয়ে গিয়েছে, সে এরোপ্লেনেই তাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। সিঙ্গাপুরকে ওরা চোখেও দেখেনি, কিন্তু সকলের মুখে মুখে সে নামটা তারা এত শুনেছে যে সে শহরটার সম্বন্ধে তাদের মনে একটা কাল্পনিক ধারণা জন্মে গেছে। সেখানে কোনমতেই তাদের মায়ের মন টিকবে না, সে আবার ফিরে আসবে।

বাড়ীর ছাদ ঘেঁষে কখন হৈমন্ত যদি কোন প্লেনকে উড়ে যেতে দেখে তখনই তাদের মুখে চোখে একটিমাত্র আশা রঙীন হয়ে ওঠে—ওদের মা ফিরে এসেছে। ওদের এই আশাটা যেন বড় অন্ধের মত খেঁকিয়ে তাড়া করে আসে পরীক্ষিতের দিকে! সেদিন কিন্তু পরীক্ষিৎ আগের মত সরে যায়নি। দেখতে পেল ওরা দুই ভাইবোন ছাদের সিঁড়ি দিয়ে হৈচৈ উঠছে। বাড়ীর ছাদের খুব কাছ দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। গর্জনে কেঁপে উঠেছে বাড়ি-ঘর-দোর। একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকল, উত্তর দেওয়ার সময় নেই তাদের। সিঁড়ির দরজার কাছে গিয়ে শুনতে পে'ল ওদের কথাবার্তা।

দীপককে বলতে শুনল,—"এই এরোপ্লেনে মা আসছে—।"

বাড়ী কাঁপানো শব্দ দূরাকাশে নীল আকাশে চোখের জলের মত নীরব হয়ে গেল।

"ওটাতো আকাশের ওধারে চলে গেল রে—মা থাকলেই নেমে পড়ত—চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ত ছাদে!"

"বাড়ি চেনেনি মা।—ও আবার ঘুরে আসবে, —এবার আমি হাত নাড়ব,—চিৎকার করে ডাকব।"

"মা আর আসবে না—।"

"কেন আসবে না?"

"মরে গেছে মা।"

"তুমি কিচ্ছু জান না দিদি!"

"ওমা! ওমা! কি বোকা তুই! মরে গেলে কেউ কি ফিরে আসে? মা নাকি আসবে! মা কি বেঁচে আছে যে আসবে?"

"তুমি জানো—?"

"বাবা বলেছে আমাকে! নিজের মুখে বলেছে! মরে গেলে সে আকাশে চলে যায়,—দেবতা হয়ে যায়—আর সে আসে না!"

"তবে তুমি বলেছিলে মা প্রত্যেকদিন গেটের কাছে আসে!"

"আসেই তো! আমি নিজে দেখেছি—স্পষ্ট—! বাবা বলে,—না, তুমি দেখোনি!"

"বাবা কিচ্ছু জানেনা। বাবাকে একদিন আমি দেখাবো—সুন্দরদিদিকেও একদিন দেখাবো! ও-ও তো সেই কথাই বলে,—মরে গেলে সে আর আসে না!"

"রামেশ্বরলালকে দেখাবে না?"

"ওকে তো আরো দেখাবো।"

"আচ্ছা দিদি! আমি মাকে গেটের কাছে দেখেছি?"

"তুই,—আমি—দুজনেই দেখেছি মনে নেই তোর?"

"হ্যাঁ মনে আছে।—মা ডাকল আমাকে—চুমু খেল, আদর করল,—না দিদি?"

"কিছুই করেনি মা! মা কথাই বলেনি। তোর কিচ্ছু মনে নেই!"

খুব আছে,—তোমার মনে নেই—!"

"বলতো কি শাড়ী পরেছিল?

"টকটকে লাল রংয়ের শাড়ী!"

"তোর কিচ্ছুই মনে থাকে না। লাল শাড়ী মা পরেনি মোটেই—লালপেড়ে তোরা শাড়ী পরেছিল।"

পায়ের শব্দ না করে সে চুপি চুপি নেমে চলে গেল। বিকেলে অফিস থেকে ফিরেই সে দীপকের বিরুদ্ধে

একটা নালিশ শুনল। নালিশের বিষয়টি রামেশ্বরই তাকে জানাল।

সত্যাসুন্দরের মায়ের একটা নতুন থান ছাদে শুকাতে দেওয়া হয়েছিল। দীপক তা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দিয়েছে। এই বৃদ্ধা মহিলাটিকে সকলেই সুন্দরদি বলে ডাকত। ইনি বয়েসকালে কতখানি সুন্দর ছিলেন এখন চেহারা দেখে তা বোঝা যায় না কিন্তু এর স্বভাবটি যে খুব মধুর তাতে কোন সন্দেহ নেই! বেশ মোটাসোটা। সিঁথীবাঁধি গোছের বিধবা স্ত্রীলোক। তার ওপরে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সে বিষয়ে তার ভুল হয়না কোন অবজ্ঞা বা কোন ব্যবহার ওপরে তার কোন অভিযোগ নেই—তিনি কখন অনুযোগ করেন না। এত ভালমানুষ হয়েও তিনি কিন্তু সে রকম সুনাম অর্জন করতে পারেনি। কোন কোন ভালমানুষের প্রকৃতিতে এত প্রবল ভুল বোঝার উপকরণ থাকে, যে তার আসল চরিত্রটি কোনদিনই ধরা পড়ে না। একে সেইজন্যে অনেকেই বুঝতে পারেনি। আরও একটি কারণ ছিল অবশ্য। সেটা বড় অদ্ভুত আর মজার। তার কথা বলার ঢংটি বড় তারি অদ্ভুত। তিনি সব সময়েই নাটকের সুরে কথা বলতেন,—আজকালকার আধুনিক নাটকের সুর নয় তাই বলে,—পুরাকালে যাত্রাদলের মত গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে এবং প্রচুর আবেগ ও উচ্ছ্বাস ঢেলে তিনি কথা বলতেন। সুমিত্রার মৃত্যু সংবাদে যেভাবে তিনি শোকের বন্যা তুলে গলা কাঁপিয়ে নাটকের সুরে পরীক্ষিৎকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন অবিকল সেই উঁচু পর্দায় কাঁপা কাঁপা স্বরে সুন্দরদি ঘড়ির খোল খাওয়াবার জন্যে পরীক্ষিৎকে অনুরোধ করেছিলেন। সুন্দরদি সুখের কথা এবং দুঃখের কথায় তোফাতেদ হারিয়ে বসে আছে—তার কথা বলার ঢং এখন শুধু একটানা আবেগে ভরা শোকের উচ্ছ্বাস! যদিও এই নিরিবাদী মানুষটির ওপরে কারো কোন আক্রোশ ছিল না শুধু তার এইরকম কথার ভঙ্গীতে সকলেই খুব বিরক্ত হত,—মনে করত সকলেই যে এসব তার নাটুকেপনা—এবং এই নাটুকেপনা কারো কাছেই ভাল লাগত না। এর ওপরে দীপকের এই হিংস্র আক্রোশের কারণ বুঝতে তার খুব বেশী কষ্ট হল না। দীপকের মনে সকালবেলা যে ঘটনা উঠেছিল তার সমাধানের জন্যে সে একটি মানুষ খুঁজছিল এ-বাড়িতে। সুন্দরদি ছাড়া তার মনোগত ইচ্ছার সমর্থন করবার মত নির্ভরযোগ্য লোক সে আর খুঁজে পায়নি নিশ্চয়। কারণ পূর্বাহ্নেই সে বাপের বুদ্ধি সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়েছে। কিন্তু সুন্দরদির যেমন দায়িত্ববোধে নিষ্ঠা, সত্যবাদীত্বেও তার তেমনই নিষ্ঠা। তিনি স্তোকবাক্য বলে বালকের মন তোলাতে চাননি। কিন্তু তার পরিণাম যে এমন ভীষণ আকৃতি ধরতে পারে তা বুঝতে পারেননি।

দীপককে ডেকে পাঠান হল। তার মুখে কোন অনুশোচনার ভাব নেই—তার চোখের দৃষ্টি ভয়ে ভীত হয়ে ওঠেনি বরং মনে হল সে যেন নির্ভীকভাবে একটি পশুর দাঁতখিচুনির সামনে দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত হতে জানে।

"তুমি সুন্দরদির কাপড় ছিঁড়েছ?"

"আমি একটা কাপড় কিনে দেব সুন্দরীদিকে!"

পরীক্ষিৎ একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল।

"চুপ! কাপড় কিনে দেব!—টাকার জাহাজ! টাকাটা কোথায় পাবে? রাস্কেল কোথাকার! —কাপড় কিনে দেব!"

পরীক্ষিতের ধমকে দীপক কিন্তু এক পাও নড়ল না। বুকে অনেকখানি বাতাস টেনে পেছনে দুটো হাত রেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চেহারাটা এমন করে তুলল যে প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষার জন্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চোখের মণিদুটো গাঢ় আর স্থির হয়ে উঠল। তারপরেই দীপকের একটা স্বগতোক্তি সে শুনতে পেল যেন খুব গোপন ভাবেই সে নিজেকে এই কথাটা জানিয়ে রাখল।

"ভয় করে—।"

খুব মজার উত্তর শুনে প্রথমটা পরীক্ষিৎ বুঝতেই পারল না,—

"কি—?"

"ভয় করে—।"

"কাকে— ?"

"তোমাকে !"

"উঃ। কত ভয় তোমার। ভয়ে একেবারে মরে গেলে !"

এরেই মোহে ও টিকে আছে ! নইলে কোথায় পড়িয়ে চলে যেত কে জানে। অনেকদিন আগে পরীক্ষিৎ একবার সুমিত্রাকে বলেছিল, —'সন্তান না জন্মালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অধিকার খুব পাকাপাকি হয়ে উঠতে পারে না,—যে-কোন একজনের অভাবে আরেকটি মানুষ খুব সহজেই বোধহয় তার অনুরক্ত মনের বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারে।' সেদিন নিজের অভাবের কথা ভেবেই পরীক্ষিতের এ-কথা মনে হয়েছিল। একটি স্বার্থপর ভালবাসা সুমিত্রার রূপসী দেহের প্রতিটি কোষকে বিশ্বস্ত করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। জীবনের গতি উল্টো ভাবে এসে যে ওকেই পরীক্ষা করতে আসবে এ-কথা ভাবেনি পরীক্ষিৎ। যে ভাবনাকে অনুসরণ করে পরীক্ষিৎ সেদিন এ-কথা বলেছিল, বোধহয় অবিকল সেই ভাবনাকে অনুসরণ করে সুমিত্রাও সেদিন তার কথা মেনে নিয়েছিল। মৃত্যুর প্রাচীর এসে ঢেকে দিয়েছে সুমিত্রাকে। একটি মোহ যেন অর্থহীন হতে পারত, কিন্তু অর্থহীন হতে পারল না।

কর্সা ধুতি, আর ধবধবে পরিষ্কার গেঞ্জি পরে যে পরীক্ষিৎ তখন অন্ধকার বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে তামাক টানছিল, সে এখনকার প্রৌঢ় পরীক্ষিৎ নয়। ধারে কাছে তপতী বা দীপকও ছিল না। সে যে সম্পূর্ণ একা এবং বাকী জীবনটাও যে তার এমনি একাই কাটবে তা এই সন্ধ্যায় বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে কাটাবার সময় যেমন মনে হয় তেমন আর অন্যসময়ে মনে হয় না। তখন একটু বিলাসিতার চর্চা করতে ইচ্ছে করে তার,—শৌকের একটু বিলাস !

ঘরের কাজ করতে করতে সুমিত্রা যেন এইমাত্র চিৎকার করে তপতীকে ডাকল, দীপককে জোর করে ঘরে ফুরফুরে সুগন্ধি পাউডার তার গায়ে দিতে দিতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে সে। পরীক্ষিৎ জানে এখনই সুমিত্রা একটা রূপোর রেকাবী করে একরাশ ঘুঁইফুল এনে ওর কাছে ছোট টিপয়ে এনে রাখবে,—কাছে এসে বসবে তারপরে,—আর তখনই সন্ধ্যার রূপোজ্জ্বল বাতাস নেশা ধরিয়ে দেবে। আস্তে আস্তে পরীক্ষিতের ঠোঁটের কাছে তুলে ধরবে সড়গড়ার নল আর তখনি ঠাণ্ডা হাওয়া সুমিত্রার হাসিতে ভরে উঠবে। সুমিত্রার মৃত্যু তখন যেন অবিশ্বাসের বস্তু তখন বাতাসে আর মৃত্যুর দুর্গন্ধ থাকে না—প্রসাধনের পরিচিত গন্ধে ভরে যায় বারান্দা। হঠাৎ তপতীর ডাক শুনে চমকে গেল সে।

"এদিকে তামাক টানা হচ্ছে মজাসে—দাদা আটটা যে বেজে গেল সে খেয়াল নেই তোমার ?"

গড়গড়ার নলে গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হচ্ছে, মোলায়েম হয়ে মুখ ভরে যাচ্ছে ধোঁয়ায়। নাকে কাঁসি ঝুলিয়ে তপতী আমুদি তামাকের মিঠে গন্ধ টানতে লাগল কিছুক্ষণ। পরীক্ষিৎ নাক মুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—

"একটু—। পাঁচমিনিট। তোমরা খেতে বসো ততক্ষণ।"

"খুব ভাল লাগছে খেতে— ?"

"জমে উঠেছে তামাকটা—।"

"খুব মজা লাগছে—না ?"

"হুঁ।"

"আমারও খুব লোভ করছে।"

"তোমার আর লোভ করে কাজ নেই।"

"মাথা ধরে না তোমার ? আমার একদিন ধরেছিল। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।"

পরীক্ষিৎ গড়গড়ার নলটা চেয়ারের চওড়া হাতলে নামিয়ে রাখল তখনি। অনেক কথাই ও গোপন করে যাবে—পরীক্ষিৎ জানতেও পারবে না। ওর মনটা এখনও কাঁচা, তাই সে সহজেই বলতে পারল।

"দীপক— ? সে কোথায় ?" উঠে পড়ল পরীক্ষিৎ।

"শান্তি দিয়েছ মনে নেই ?"

ওর মনের উৎকণ্ঠা হঠাৎ বেজায় চমকে উঠল,—সে তো অনেকক্ষণ। ওর কথা সে একদম ভুলে গিয়েছিল।

"এখনও লিখছে ?"

"সাত পৃষ্ঠা হাতের লেখা শেষ হয় কখনো ? লিখতে লিখতে তো ভোর হয়ে যাবে !"

"লিখছে ও— ?"

"ও তো লিখছে ! এত শক্তি দিলে কেন বাবা ?"

"ডাকো ওকে— ।"

"ডেকেছি তো—একশোবার ডেকেছি,—আসবে না,—কিছুতেই আসবে না !"

গিয়ে বলো বাবা ডাকছে।"

"ওর বড্ড জেদ বাবা !—করবো তো করবোই, খাবো তো খাবই, মাগুর মাছ খাব তো খাবই—খাব তো খাবই। অত জেদ ভাল না—আমার কোন জেদ নেই।"

ওদের পড়ার ঘরে ঢুকে পরীক্ষিৎ দেখল দীপক লম্বা ডিভানে পা মুড়ে অদ্ভুতভাবে ঘুমিয়ে আছে। মাথার ওপরে বন্ বন্ করে পাখাটা ঘুরছে। পাহারাওয়ালার মত শুধু পঞ্চাশ ওয়াটের আলোটা জ্বলছে, ঘরে আর কেউ নেই। কলমটা তখনও আঙ্গুলে ধরে আছে হাতে, মাথার কাছে ওর হাতের লেখার খাতার পাতাগুলো ফর্ ফর্ করে উড়ছে। ও নিজের কাজ ছেড়ে উঠে পড়েনি, লেগে ছিল ; ঘুম এসে ওর চোখের পাতা বুজিয়ে দিয়ে গেছে, কিন্তু হাতের কলম কেড়ে নিতে পারেনি।

ওকে এই অবস্থায় দেখে ওর মনটা কেমন হয়ে গেল। কি চায় সে বলে বোঝাতে পারে না। সেটা কি মায়া হবে কোন পদার্থের সাহচর্যে ? তাহলে সেদিন তার মনে কোন যন্ত্রণা হল না কেন ? তা কি মাতৃহীন অসহায় শিশুর জন্যে মমতা ? তাহলে ওর শিক্ষার নির্মমতার জন্যে ওর মন খুশী হয়ে উঠল কেন ?

পরবর্তীকালে পরীক্ষিতের মনে হয়েছিল সেদিন সে কেবল দীপককে দেখেনি,—দেখেছিল ওর ভবিষ্যতকে।

যে ভাগ্য মানুষের জীবন গড়ে তোলে,—সে জীবনকে তৈরী করবার জন্যে তার খুব বেশী বড় জিনিষের দরকার হয় না। হাতের কাছে যা পায়—অতি সামান্য ও নিতান্ত তুচ্ছ জিনিষ দিয়েই সে গড়ে তুলতে থাকে তার অনাগত রহস্য।

শিশুজীবনের সামান্য সামান্য ঘটনার মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে পরবর্তীকালের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের একটি জটিল সম্ভাবনা।

এখানকার খড় আর ওখানকার নুটো দিয়ে সে গড়ে তুলতে থাকে একটি মানুষের কাহিনী, যে মানুষের কাহিনীর মধ্যেও আছে বিশিষ্ট সুখ ও দুঃখ, বিশিষ্ট সবলতা ও দুর্বলতা, ভিন্ন ধরনের উত্থান ও পতন।

[ক্রমশঃ

কন্যাকুমারীর গল্প

অরুণা মুখোপাধ্যায়

ভারতের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কন্যাকুমারী নামে হিন্দুদের যে তীর্থস্থান আছে তার কথা অনেকেই বই পড়ে জেনেছেন বা অনেকে হয়ত দেখেও এসেছেন ; কিন্তু এই কন্যাকুমারী নাম কেন হলো ? আজ সে সম্বন্ধেই কিছু বলব।

সে আজ অনেক, অনেক দিন আগের কথা। তখনকার দিনের ভারতের চেহারা কিন্তু এখনকার মত ছিল না। এখনকার মুগের মত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ইত্যাদি রাজ্যে ভারত বিভক্ত ছিল না। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষে তখন রাজা ভরতের রাজত্ব ছিল। তিনি আটটি পুত্র ও কুমারী নামে একটি মেয়েকে ভারতবর্ষের নয়টি স্থানের পৃথক ভাবে রাজত্ব দিয়েছিলেন। কুমারী ভারতের দক্ষিণ ভাগের রাজত্বের অধিকারিণী ছিলেন বলেই এই সহরকে কুমারীর বাসস্থান বলা হয়।

কশ্যপ প্রজাপতি তখন ছিলেন শোনিতপুরের রাজা। তাঁর চারটি অসুর পুত্রের মধ্যে বানাসুরের অত্যাচার তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেবদেবী ও নরনারী সে অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়ল। তবে বানাসুর পরমেশ্বরের কাছে তপস্যা করে এই বর লাভ করেছিল যে একমাত্র কোন কন্যাছাড়া আর কারোর হাতে তার মৃত্যু নেই। এদিকে বানাসুরের অত্যাচারে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে মাতা পৃথিবী ও ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান বিষ্ণু তখন জানালেন বানাসুর বধ সহজ নয় ; একমাত্র পরাশক্তি মহামায়ার দ্বারাই এই কাজ সম্ভব। তবে সেই মহাশক্তির জন্য নিজেদের শক্তিকে আহুতি প্রদান করে একটি বৃহৎ যজ্ঞের প্রয়োজন ও সেই হোমকুণ্ড থেকে এক জ্যোতির্ময়ী দেবীর আবির্ভাবই মঙ্গল সাধন করবে। ভগবান বিষ্ণুর আদেশমত দেবগণ বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ও সেই যজ্ঞ হতে এক দেবীর আবির্ভাব হয়। ভারতের দক্ষিণে সমুদ্রের তটদেশে সেই দেবী তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। ক্রমে দেবী সাবালিকা হলে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এতে অবশ্য দেবর্ষি নারদ চিন্তিত হন। কারণ দেবীর বিয়ে সম্পূর্ণ হলে বানাসুর বধ সম্ভব নয়। সুতরাং পরাশক্তিকে নারদ মুনি জানালেন যে এই বিয়েতে অসুরগণের দ্বারা বিঘ্ন যাতে না ঘটে তারজন্য পরমেশ্বরকে এই আজ্ঞা দেওয়া উচিত যে তিনি যেন চক্ষুহীন নারিকেল, শিরাহীন পান ও গ্রন্থীহীন ইক্ষু সূর্যোদয়ের আগেই সঙ্গে নিয়ে আসেন। তবেই বিয়ে সম্পূর্ণ হবে। নারদের পরামর্শে শিব যখন ঐ তিনটি বস্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কুমারী কন্যাকে বিয়ের জন্য ঠিক এমন সময় নারদ এক মজা করেন। সুচীন্দ্রম নামক স্থানে তিনি মোরগের রূপ ধারণ করে মোরগের মত ডাকতে থাকেন। সূর্য উঠেগেছে মনে করে শিব অবাক হয়ে যান ও বিয়ের লগ্ন পার হয়েগেছে ভেবে তিনি ঐস্থানেই পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকেন। সুচীন্দ্রম নামক স্থানে সেই শিবমন্দিরটি এখনও দেখা যায়। কুমারী স্থানেও দেবীর বিয়ে স্থগিত রইলো। এখানকার কন্যাকুমারীর মূর্তি ভারী সুন্দর। কন্যাকুমারীর সমুদ্রের ধারে নানারঙের বালির আকারে শিবের হাতের সেই তিনিবস্তুগুলোও এখনও দেখা যায়। বানাসুরকে কিন্তু সেই দেবীই বধ করেছিলেন। দেবগণ তখন মনের খুশীতে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন। মরণাপন্ন বানাসুর তখন দেবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও তার মৃত্যুস্থানে একটি পবিত্র তীর্থঘাটের দাবীর স্নানকারীদের গঙ্গাস্নানের ফল দানের কামনা জানান। দেবী বানাসুরের ইচ্ছানুসারে তার মরস্থানে বানতীর্থ নামে পবিত্র তীর্থস্থান স্থাপন করেন আজও তার সাক্ষী বর্তমান।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বাদেশিকতা প্রচারে বাংলা রঙ্গমঞ্চ

দেশের মুক্তি সংগ্রামে, রাষ্ট্র বিপ্লবে, দেশের মানুষকে জীবনের মূল্যবোধে, মনুষ্যত্বের আদর্শে এবং জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে সর্বদেশে গণ্য হয়েছে সেই দেশের সাহিত্য, সংবাদপত্র এবং দেশনায়কদের বাগ্মিতা। আরও একটি হাতিয়ার সর্বজনস্বীকৃত। তা হচ্ছে রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যাভিনয়।

নাটক শুধু লেখা হলেই শেষ হল না। তার অভিনয় হওয়া দরকার। তবেই সে-নাটক সর্বাংশে সার্থক। অভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের মর্মকথা দর্শকের হৃদয়ে পৌঁছোয় এবং তাকে অনুপ্রাণিত করে, উজ্জীবিত করে, নতুন পথের সন্ধান দেয়।

দেশপ্রেমমূলক বা মনুষ্যত্ববোধ-জাগানিয়া নাটক লেখা হল, কিন্তু তা হয়ত পড়ল অল্প লোকেই। কিন্তু সেই নাটকের সার্থক অভিনয় যখন হল তখন অগণিত দর্শক তা দেখে সেই নাটকের ভাবে ভাবিত হল। এবং যেহেতু রঙ্গমঞ্চেই সেই নাটকের উদ্ঘাটন সেই হেতু দেশের কাজে রঙ্গমঞ্চের অবদান অনায়াসে গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। এই সত্য আজ জগতে সর্বত্র স্বীকৃত। দেশকে জাগাতে, দেশের মানুষকে নতুন চেতনায় উজ্জীবীত করতে রঙ্গমঞ্চ যে এক বিশেষ ও অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে তাতে কোনও দ্বিমত নেই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের এই বাংলা দেশেও একদা রঙ্গমঞ্চ এই দিক দিয়ে এক স্মরণীয় আদর্শ রেখেছে। দেশ তখন পরাধীন, জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেম প্রচার করা তখন বিদেশী শাসকদের কাছে ঘোর অপরাধ বলে বিবেচিত। জাতীয় চেতনা জাগাবার কাজে যাঁরা আত্মনিবেদন করেছেন তাঁদের উপর বিদেশী শাসকের কত না অকথ্য অত্যাচার আর কালা কানুনের প্রয়োগ।

সেই আতঙ্কজনক অবস্থার মধ্যেও সিদ্ধ বাংলার মঞ্চ-মালিকরা, নাট্যকাররা এবং অভিনেতা অভিনেত্রীরা ভয়ে পিছিয়ে যান নি। একের পর এক তাঁরা দেশপ্রেমমূলক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, যাজরোষে যে নাটক বন্ধ হয়েছে, আবার অভিনয় করেছেন নতুন স্বদেশী নাটক। আবার আইনের বজ্র তাদের উপর পড়েছে, এমন কি রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষদের গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মঞ্চ মালিকরা ভীত হয়ে থিয়েটারের দরজা বন্ধ করেননি, নাটকের মধ্যে সরকারের কুশাসনকে সমালোচনা করতে পশ্চাদপদ হননি।

গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, দ্বিজেন্দ্রলালের রানা প্রতাপ, দুর্গাদাস, মেবারপতন, দীনবন্ধুর নীল দর্পণ, ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি অনেক নাট্যকারের অনেক নাটকই ইংরেজ শাসকরা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাতে দমেননি নাট্যকার, দমেননি মঞ্চ মালিকও।

সেই মহৎ গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যকে যেন আজকের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বেবাক ভুলে গেছে। দেশে আজ চরম সংকট চলেছে, দেশের মানুষ আজ ভুলেছে ন্যায়নীতিবোধ, মনুষ্যত্বের আদর্শ, দেশের প্রতি ভালবাসা, উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে আজ ভেসে চলেছে বিতাড়িতজ্ঞানশূন্য দেশের যুবসম্প্রদায়। এমনি আপৎকালে দেশের বর্তমান অবস্থা বা সমস্যা নিয়ে রচিত কোন নাটকের অভিনয় হচ্ছে না, এমন নাটক দেখা যাচ্ছে না যার মধ্যে আছে মানুষকে ন্যায়ের পথে দেশপ্রেমের পথে নিয়ে যাবার অনুপ্রেরণাময় বাসনা। এখনকার মঞ্চ মালিকরা সার বুঝেছেন তাঁদের ব্যবসা, যে-নাটক পয়সা দেয় অর্থাৎ মানুষের প্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দিয়ে আকর্ষণ করে সেই নাটকই শুধু তাঁরা অভিনয়যোগ্য বলে মনে করছেন, কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে বা কোন ঝুঁকি নিতে তাঁরা রাজী নন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরে যে সব পেশাদার বা আধা-পেশাদার নাট্য সংস্থা আছে (তাদের সংখ্যা কম নয়) তাঁরাও তাঁদের নাট্য প্রচেষ্টায় এই সুবিধাবাদী পলায়নী মনোবৃত্তির আর একদিক প্রকট করে তুলছেন। তাঁরা দেশের নাড়ীর সঙ্গে কোন যোগ রাখতে চান না, দেশের মানুষ, দেশের সংস্কার, সমাজবিধি ও জীবনাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বিদেশী নাটকের অদ্ভুত অবাস্তব অনুকৃতির মধ্যেই তাঁরা আনন্দ পাচ্ছেন, সেই ধরণের উদ্ভট নাটক লিখছেন এবং তাদের অভিনয় করছেন। দর্শকরা তাৎক্ষণিক আনন্দ হয়ত কিছু পাচ্ছেন, কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় এই সব নাটকের কোন সার্থকতা বা স্থায়ী অবদান আছে বলে মনে করি না। দেশের মানুষকে ভুলে গিয়ে বিদেশের মানুষকে তাঁরা বড় বলে মনে করেন তাঁরা দেশের মানুষের কাছে কোন স্থায়ী শ্রদ্ধা বা স্বীকৃতি লাভ করবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আজ বাংলাদেশের সাহিত্যে এবং সাংবাদিকতায় যে বলাভাব, যে ভাবগত দৈন্য, যে সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির পরিচয় অহরহ দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মঞ্চের নাটকগুলিতেও তার প্রতিফলন।

কিন্তু অতীতের দিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাই, সেই স্বদেশী যুগে, কী সাহিত্যে, কি নাট্যাভিনয়ে উজ্জীবন-মন্ত্রের সে কী উদাত্ত আহ্বান। আর সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে সাধারণ মানুষের সে কী বিপুল আগ্রহ।

এই সম্পর্কে তখনকার দিনের প্রখ্যাত নাট্যকার ও থিয়েটার ম্যানেজার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই দিনের একটি সুন্দর আলেখ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই রচনা থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করে দিলাম যা থেকে আজকের পাঠক সেদিনের কিছু আভাস পাবেন।

"১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইল। ইহা বাংলার প্রাণে এমন একটা আঘাত দিল, যে আঘাতে হনী নির্বন পণ্ডিত মূর্খ আইনজীবী ও হলধারী কৃষক একই সঙ্গে যেন একটা দারুণ বেদনা অনুভব করিল। পথে সে কী উন্মাদনা। গঙ্গাতীরে রাখীবন্ধন। কবীন্দ্র রবীন্দ্র গাহিলেন—"ভাই ভাই এক ঠাঁই"। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক পাড়ায় পাড়ায় কান্তকবি রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেনা ভাই" গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই বৎসরেই বাংলার নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বাংলার অমুকুট রাজা বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল সেই মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম্।" এই সময়েই নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র

সিরাজদ্দৌলাকে অবলম্বন করিয়া বাঙালীকে তাহার কীর্তির কথা তাহার ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী, তাহার অতীত গৌরব ও অগৌরবের উজ্জ্বল ও মলিন চিত্র দর্শক সমক্ষে প্রকটিত করিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভৈরব ভেরীর নির্ঘোষে বাংলার নাট্যশালা স্তম্ভিত হইল। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক সিরাজদ্দৌলার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বেলিত। সিরাজদ্দৌলাও সেই আন্দোলনের যেন একটা অংশ হইয়া পড়িয়াছিল। যেদিন তিলক রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন সেদিনের দর্শক বোধহয় বিস্মৃত হন নাই—তিলক মহারাজ রয়েল বক্সে প্রবেশ করিবামাত্রই সমগ্র দর্শকের কণ্ঠোচ্চারিত 'বন্দে-মাতরম্' শব্দে রঙ্গমঞ্চ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। দর্শকবৃন্দ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া। গিরিশচন্দ্র মঞ্চের উপর হইতেই নতজানু হইয়া তিলককে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। সিরাজদ্দৌলার প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শকদের মধ্য হইতে একজন মুসলমান কবি গিরিশচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া দুই ছত্র কবিতার লাইন আবৃত্তি করেন। কবিতাটির ভাবার্থ এই :—হে গিরিশচন্দ্র ; তুমি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ কর।"

সেই বছরই মঞ্চস্থ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের অমর নাটক রাণাপ্রতাপ সিংহ। এক সঙ্গে দুটি রঙ্গালয়ে সেই নাটক অভিনীত হয়। স্টারে এবং মিনার্ভায়। সেই নাটক দেখে দর্শকদের সে কী প্রবল উন্মাদনা। থিয়েটার শেষ হবার পর প্রতি রাত্রে হাতীবাগান থেকে দর্শকরা বীডন স্ট্রীটের দিকে আর বীডন স্ট্রীট থেকে দর্শকের স্রোত আসতো হাতীবাগানের দিকে। আর সেই সম্মিলিত জনতার কণ্ঠে সেই গান উচ্চারিত হ'ত।—

"চল সমরে দিব জীবন ঢালি
জয় মা ভারত, জয় মা কালী।"

আজকের নাটকে কোথায় সেই প্রাণবত্তা, কোথায় সেই উন্মাদনা? কোন মহৎ চিন্তা, ভাব বা আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না আজকের সাধারণ রঙ্গালয়ের কোন নাটকে। মানুষকে ভাবাতে পারে, উদ্দীপ্ত করতে পারে, তাকে তার বিগত দিনের ঐতিহ্য বা বেদনা অথবা কোন মহান কীর্তি বা প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করাতে পারে এমন নাটক আজকাল আর অভিনীত হচ্ছে না। এর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা যায়, বিশ্বরূপা মঞ্চে বর্তমানে যে নাটকটি অভিনীত হচ্ছে তার কথা স্মরণ করে। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রের "বেগম মেরী বিশ্বাস" নামে যে অসাধারণ কাহিনী রচনা করেছেন তার মধ্যে নবাব সিরাজদ্দৌলার একটি করুণ ট্র্যাজিক নতুন ভাবময় চরিত্রের রূপায়ণ আছে আর আছে সেই সময়কার এক গ্রাম্য বাঙালী তরুণীর সাহসিকতা, দেশের প্রতি ভালবাসা এবং প্রণয় বেদনার অসামান্য আলেখ্য। এই ঐতিহাসিক কাহিনীর সুগ্রথিত নাট্যরূপের মধ্যে অনেক নতুন তথ্য, অনুপ্রেরণামূলক অনেক বক্তব্য, ভাবসমৃদ্ধ গানের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি ভালবাসা আর ভগবৎ ভক্তির অপরূপ প্রকাশ উপস্থাপিত হয়েছে! সেই দিক থেকে আজকের রঙ্গালয়ের এই ভাবহীনতার দিনে, সমাজের এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের যুগে "বেগম মেরী বিশ্বাস" বাংলা মঞ্চে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, তাতে সন্দেহ নেই!

মৃণাল সেন

বিগত যুগের মঞ্চনায়ক

রবীন্দ্রমোহন রায়

নিষ্ঠাবান অভিনয়-শিল্পী এবং বিভিন্ন চরিত্রের সার্থক অভিনেতারূপে রবি রায়ের যে স্বীকৃতি পাওয়া উচিৎ ছিল তা পান নি! বোধ করি তাঁর অভিনয়ে অযথা আড়ম্বর ছিল না, চোখ ধাঁধানো ভঙ্গী ছিল না। অত্যন্ত শান্ত সংযতভাবে অভিনয় করতেন বলেই দর্শকরা তাঁর সুচারু অভিনয়কে বিশেষ মনে রাখেন নি: রবি রায় আজ একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম। অথচ সেই শিশির কুমারের সীতার কুশ থেকে আরম্ভ করে প্রৌঢ় বয়সে ভ্রান্তিতে বাপের ভূমিকা—কত রকমের কত ধরণের চরিত্রেই না তিনি অভিনয় করেছেন যথাযথ শিল্প-সৌকর্য বজায় রেখে।

রবি রায় তাঁর ভাই যশস্বী অভিনেতা ভূমেন রায়ের অগ্রজ। জন্ম ১৮৬৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার কাজিনার গ্রামে। ১৯১৪ সালে মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে প্রবেশ করেন। শিশির কুমার তখন সেই কলেজের অধ্যাপক! কলেজে বহু নাটকে অভিনয় করে তিনি শিশির কুমারের প্রশংসা অর্জন করেন। তারপর শিশির কুমারের সঙ্গে ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিয়ে আলমগীর নাটকে ভীম সিংহের ভূমিকায় সাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। অতঃপর ইডেন গার্ডেনে শিশির কুমার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এবং সেই নাটকে রবি রায় দুর্মুখ ও লবকুশ, দুটি চরিত্রে রূপদান করেন।

শিশির কুমারের নাট্য মন্দিরে যোগেশ চৌধুরীর সীতার কুশ, সাধনাতে রাম ও সূর্য, জনায় শ্রীকৃষ্ণ, বিসর্জনে রঘুপতি সিংহ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে বৃহন্নলা, ষোড়শীতে প্রফুল্ল, সাজাহানে দারা, দিগ্বিজয়ীতে রঘুবর, শেষ রক্ষায় বিনোদ, প্রফুল্লর সুরেশ প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করবার পর রবি রায় ১৯২৯ সালে মনোমোহন থিয়েটারে যোগ দেন এবং সেখানে কর্ণার্জুন, প্রাণের দাবী, রক্তকমল, সাজাহান প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। কিছুদিন পরে আবার শিশির সম্প্রদায়ে যোগ দেন এবং শংখধ্বনিতে অজিত সিংহ, পাণ্ডব গৌরবে শ্রীকৃষ্ণ, তপতীতে সর্বেশ্বর ও কুমার সেন, সধবার একাদশীতে অটল, রমার রমেন, চন্দ্রগুপ্তে চাণক্য, সীতায় রাম প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেন।

এরপর ১৯৩০ সালে রবি রায় মিনার্ভায় চলে যান এবং সেখানে কয়েকটি নাটকের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৩১ সালে অহি পারক কৃষ্ণচন্দ্র দের সহযোগিতায় রঙমহলের প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। রঙমহলে থাকা কালে মন্মথ রায়ের অশোক নাটকের নাম ভূমিকায় তাঁর অভিনয় আজো অনেক দর্শকের মনে আছে।

বেশী দিন কোন থিয়েটারেই তিনি থাকেন নি। রঙমহল পরিত্যাগ করে তিনি ১৯৩৩ সালে নাট্য-নিকেতনে যোগ দেন। এবং বহু নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৪৩ সালে বোম্বাই চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার পর ফিরে এসে তিনি প্রথমে রঙমহল তারপর নাট্য ভারতীতে কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেন। সেখান

থেকে তিনি স্টারে, মিনার্ভায় এবং পরে ও জীবনের শেষ অধ্যায়ে স্টারে গিয়ে শ্যামলী নাটকে পীতাম্বর চরিত্রে অভিনয় করবার সময় অল্পদিন রোগ ভোগের পর পরলোকগমন করেন, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে।

বহু ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। নির্বাক যুগে কমলে কামিনী ছবিতে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারপর আঁধারে আলো, মানভঞ্জন বিচারক ও চন্দ্রনাথ ছবিতেও অভিনয় করেন। সবাক যুগে শ্রীগৌরাঙ্গ, দক্ষযজ্ঞ, বসন্ত সেনা, বাসব দত্তা, দেবদাসী, সাবিত্রী, পণ্ডিতমশাই, ইয়ংলটার, রজনী, গ্রহের ফের, গোরা, জনক নন্দিনী, ছিন্নহার, নরনারায়ণ, ধনের ধন, পরশমণি, কুমকুম, টিকাদার, যোগাযোগ, পতিব্রতা, বিদেশিনী, ছদ্মবেশী প্রভৃতি বহু ছবিতে তাঁর নাটানৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন রবি রায়।

সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি। দেহ ছিল সুঠাম। মুখশ্রী সুন্দর। যেকোন চরিত্রেই তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন।

অভিনয়শিল্পের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। বলতেন, এ বড় কঠিন সাধনার জিনিষ, ফাঁকী দিয়ে বেশী দিন দর্শকদের ধরে রাখা যায় না।

তাঁর অভিনয়ে আমরা বরাবরই সেই নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছি।

আজকের সমস্যা

বেলা দে

অনেক ক্ষেত্রে মায়েদের বলতে শুনেছি আমার ছেলেটা আর মানুষ হলো না। কিন্তু কেন এ আক্ষেপ? আর এজন্য দায়ী কে? এমনি একটী কাহিনী এই প্রসঙ্গে বলছি—

সুন্দর ফুটফুটে ছেলে লাবু কিন্তু কারুর কাছে জীবনে সে স্নেহ ভালবাসা পায় নি; এমন কি মা বাবার স্নেহ ভালবাসা থেকেও বঞ্চিত। লাবুর জন্য কারুরই যেন কোনো সহানুভূতি নেই! এমনি সময় হঠাৎ ছেলেটীর মা মারা গেল। বাবা আবার বিয়ে করলেন। কাজেই বিমাতার স্নেহ থেকেও সে বঞ্চিত হল। উপরন্তু বাবা আরো বেশী মারধোর করতেন ছেলেটীকে। শাস্তির পর শাস্তি পেয়ে ছেলেটী কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়লো। বাবা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন কিন্তু সেখানেও কোনো উন্নতি দেখা গেল না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও তাকে ভাল চোখে দেখতেন না। ফলে লেখাপড়াও চললো না একটু একটু করে লাবু এক ভীষণ প্রকৃতির ছেলে হয়ে উঠলো। সমস্ত মানুষকেই সে শত্রু বলে ভাবতে লাগল। একদিন তার প্রতিবেশীর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে টেবিলের উপর বাবা কিছু টাকা পড়ে থাকতে দেখে চুরি করে বসল। এমনি করে ছেলেটী নানা ধরণের চুরি করতে লাগল। লাবুর বাবা এ অবস্থায় ছেলেটীকে উচ্ছৃঙ্খল শিশুদের এক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সেখানকার প্রধান শিক্ষয়িত্রী লাবুর বাবাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—আপনার ছেলের জন্য ভাববেন না ওকে আমি ঠিক তৈরী করে দেব। বাবার মনে যে নৈরাশ্যের মেঘ জমেছিল তা অনেকটা কেটে গেল।

লাবুর বাবা যখন তিন বছর পরে ছেলেকে ঘরে নিয়ে যেতে এলেন দেখলেন পুত্রের সে আগেই ভাব আর নেই। তার বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে শুভ পথে এগিয়ে চলেছে। ভাল নম্বর পেয়ে লাবু ম্যাট্রিক পাশও করেছে। পুত্রের মুখপানে চেয়ে বাবা আশ্চর্য হয়ে তাকে বুকে করে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। শুনেছিলাম লাবু পরে বি. এ. পাশ করে ভাল স্কুলে চাকরী করছে।

তাই মনে হয় এই ধরণের ছেলেরা বিপথগামী হওয়ার মূল কারণই হলো বড়দের অবহেলা ও খারাপ ব্যবহার।—কারণ স্নেহ বঞ্চিত ছেলেমেয়েরাই বিপথগামী হয়ে পড়ে। তারা কখনো বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে পারে না কাজেই আজকের সমাজ জীবনে যে সব ছেলেমেয়েরা বিপথগামী হচ্ছে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী অভিভাবকরা। তাই সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মা বাবাকে সন্তানপালন করতে হবে, না হলে সমাজের যে চিত্র আমরা দেখছি এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাববার বিষয়।

আদর্শনারী ঃ শ্যামমোহিনী দেবী

মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে সোমবার ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যা। সুসজ্জিত মঞ্চ। মঞ্চটিও ফুলের সাজে সুন্দর করে সাজানো। ধূপ ধুনার গন্ধে ভরপুর কর্ণাকীর্ণ প্রেক্ষাগার আমোদিত। মেয়েরা বেদ গান করছেন। মঞ্চের উপর কয়েকজনের মাঝখানে বসে আছেন শ্বেতশুভ্রা শ্রীমতী শ্যামমোহিনী দেবী। তাঁর সামনে টেবিলের উপর ফুল আর মালার স্তূপ, বহুবিধ উপচার। আজ তাঁর ৮২তম জন্মদিন পালন করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ এবং তার অন্তর্ভুক্ত সাতটি প্রতিষ্ঠান যার সবগুলিকে আজীবনের চেষ্টায়, সর্বস্ব ত্যাগে এবং অপার কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা গড়ে তুলেছেন একক উদ্যমে শ্রীমতী শ্যামমোহিনী। প্রীতি-স্নিগ্ধ পরিবেশ। বহু ভক্ত, ছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্যামমোহিনীর অতুলনীয় কর্ম-কীর্তি কৃতি ও মহৎ জীবনের কথা বলে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তিনদিন ধরে এই উৎসব অনুষ্ঠান চলেছিল।

যাঁকে ঘিরে এই অনুষ্ঠান তাঁর কাছে বসবার সুযোগ পেলাম এবং তাঁর জীবনের কথা শুনলাম। আশ্চর্য কর্মময় এক মহৎ জীবন-চরিত। সিরাশি বছর আগে ১৮৮৮ সালে পাবনা জেলার করঞ্জা গ্রামে তাঁর জন্ম। বাপ ছিলেন জমিদার এবং উকিল। তখন গ্রামে ইস্কুল পাঠশালার বালাই ছিল না। ঘরে বসেই লেখাপড়া শিখতে লাগলেন শ্যামমোহিনী। ছোটবেলা থেকেই অদ্ভুত মেধা আর স্মরণশক্তি। বারো বছর বয়সে মানিকগঞ্জের নামকরা আইন-ব্যবসায়ী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল এবং ভগবানের নিষ্ঠুর বিধানে পনেরো বছর বয়েসেই শ্যামমোহিনী স্বামীকে হারালেন। অতঃপর পিত্রালয়ে ফিরে এসে লেখাপড়ার মধ্যে নিজের অসহ্য বেদনাকে তিনি ডুবিয়ে রাখতে চাইলেন। স্বামী বলে গিয়েছিলেন, তোমার নিঃসঙ্গ জীবনে তুমি আর কী করবে, লেখাপড়া শেখ এবং মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও। গ্রামের মেয়েরা যদি এমনি নিরক্ষরতায় ডুবে থাকে তাহলে সমাজের এবং দেশের উন্নতি হবে কেমন করে।

স্বামীর সেই শেষ নির্দেশে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্যামমোহিনী নিজেকে গড়ে তুললেন নিজের চেষ্টায়। করঞ্জা গ্রামে মেয়েদের স্কুল স্থাপন করলেন। সেই গ্রামে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হল। তাঁর অসামান্য সংগঠন ক্ষমতায় স্কুলের দ্রুত উন্নতি হল। সেই জেলার অনেক সরকারী কর্তাব্যক্তি এবং স্কুল ইনস্পেকটার তাঁর বিদ্যাভবন পরিদর্শন করে খুশী হয়ে তাঁকে পরামর্শ দিলেন, তিনি কলকাতায় গিয়ে টিচারস্ ট্রেনিং পাশ করে আসুন, তাহলে স্কুলটি আরও বড় হয়ে উঠ্‌বে।

ইতিমধ্যে বাবা মা দুজনেই গত হয়েছেন। আছেন এক বড় ভাই। তিনি ভগ্নীকে উৎসাহ দিলেন, শ্যামমোহিনী কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে ভর্তি হলেন। অদ্ভুত ধীশক্তি আর পাঠানুরাগ। প্রথমে শিক্ষার্থিনী, তারপর শিক্ষিকা, তারপর সুপারিনটেনডেনট। নিজের অসাধারণ বৈভব। কিন্তু তাতে তাঁর মোহ ছিল না। খেটে খেতে হবে, এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তাঁর ছাত্রীদের বরাবর অনুপ্রাণিত করেছেন।

১৯১৮ সালে শ্যামমোহিনী বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে নিজের স্কুল স্থাপন করলেন—বাণীপীঠ বালিকা বিদ্যালয়।

ইতিমধ্যে সেভি অবলা বসুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছিল, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে কিছুদিন কাজও করেছিলেন। সেভি বসু এবং তখনকার দিনে আরও অনেক খ্যাতনামা সমাজসেবী তাঁকে উৎসাহ দিলেন। তাঁর স্কুল দেখতে দেখতে ছাত্রীতে ভরে গেল। একটার পর আর একটা বাড়ী নিলেন, তারপর আর একটা।

১৯১৮ সালে পাবনার বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধনের জন্য তিনি সেখানে গেলেন এবং তারপরেই তাঁর জীবনে এল এক নতুন রাটিকাপ্রবাহ। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। নবম আইন ভঙ্গ করলেন। মেয়েদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে আদালত অবরোধ করলেন। উকিল মোক্তারদের সাতদিন পর্যন্ত আদালতে যেতে দিলেন না।

গোরা সার্জেন্ট বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে এল। দেশী পুলিশ লাঠি ঘোরাতে লাগল। কিন্তু শোভাযাত্রার নেত্রী এক পাও পিছু হটলেন না। বোধকরি স্তম্ভিত হল গোরার দল এই তেজ আর সাহসের সামনে। মেয়েদের ছেড়ে দিয়ে তারা আক্রমণ করল পিছনে আসা পুরুষ ভলানটিয়ারদের। সে কী অমানুষিক নির্যাতন। শ্যামমোহিনী মেয়েদের নিয়ে পৌঁছলেন টাউন হলে। সেখানে সভা করে অত্যাচারী ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে রোষদীপ্ত আলাময়ী ভাষণ দিলেন।

বড় ভাই দেখলেন মহা বিপদ। ছোট তো গ্রেপ্তার হল বলে। তিনি তখন তাঁকে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক বছর সেখানে কাটিয়ে আবার কলকাতায় এলেন শ্যামমোহিনী এবং পুরোপুরি নিজের স্কুলের সংগঠন কার্যে নামলেন।

১৯০৪ সালে অনুরূপা দেবীকে সভানেত্রী করে স্থাপনা করলেন নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ। যুদ্ধ বাধল। জাপানী বোমা পড়ল কলকাতায়। চতুর্দিকে পালাও পালাও রব। নিজের ছাত্রীদের, যাদের তিনি যানযান ও আহার দিয়ে প্রতিপালন করছিলেন তাদের, নিরাপত্তার জন্যে বিদ্যাভবন স্থানান্তরিত করলেন। প্রথমে পাবনায় তারপর নবদ্বীপে। সহায়হীন একা মহিলা, কখনো নৌকায় কখনও ট্রেনে কখনো পায়ে হেঁটে পর্বত-প্রমাণ মালপত্তর আর ছাত্রীদের নিয়ে এদেশ ওদেশ করে বেড়ালেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে বৈকি। কিন্তু এত বিপদ এত বাধার মধ্যেও সর্বসময় সংকল্পে তিনি দুর্জয়, আত্মপ্রত্যয়ে তিনি সুদৃঢ়।

১৯৫০ সালে কলকাতায় তাঁর কর্মজীবন চরম সার্থকতার দ্বারে এসে পৌঁছল। অনেক ছাত্রী। অনেক বিভাগ। ভাড়া বাড়ীগুলোতে আর কুলোচ্ছে না। নিজেদের আস্তানা দরকার।

সরকারের খাস জমি ছিল পড়ে মানিকতলা খালের ধারে। তারই একার কাঠা জমি নিজের নামে কিনলেন। কিন্তু জায়গাটা মানুষের উপযুক্ত তো নয়। যেমন দুর্গম তেমনি বনজঙ্গল। ঠ্যাঙাড়ের আড্ডা। সেখানে ঘর তুলে থাকবে কে। বাড়ী তৈরী করবার সময় তদারকের জন্যে সেখানে তো নিজের লোক থাকা দরকার। এগিয়ে এলেন দুই আত্মীয় তরুণ কর্মী শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য এবং শ্রীঅমল চৌধুরী। একটি ঘরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। আর একটি ঘরে তাঁরা দুজনে রইলেন। আশেপাশের লোকেরা বললে, এ জায়গায় ভূতপ্রেতের হানা, আপনারা নির্ঘাত মারা পড়বেন। শুধু ভয় দেখানো নয়। আরও কতরকমের বিরুদ্ধাচরণ। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশ। কিন্তু তাতে দমলেন না শ্যামমোহিনী এবং তাঁর দুই তরুণ কর্মী। সেই সময়কার ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে তাঁরা বললেন যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাঁদের চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

বাড়ী তৈরীর সময় মাটি খুঁড়লেই বেরোত মড়ার হাড় (এখনও বেরোয়)। ১৮৯৭ সালে কলরায়।

মহামারী আর প্লেগের সময় হাজার হাজার মৃতদেহ ঐখানে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হয়। সেই মাটির তলা থেকে বেরিয়েছে মেয়েদের হাতের শাঁখা, মঙ্গলচণ্ডীর ঘট, লক্ষ্মীর ঝাঁপি—আরও কত টুকিটাকি জিনিষ। সেই প্রেতপুরী আজ নারীশিক্ষার স্বর্গভূমিতে পরিণত। আজ সেখানে উঠেছে দুতলা তিনতলা অনেকগুলো বড় বড় বাড়ী। চার পাঁচ বিঘা জায়গা নিয়ে এক বৃহৎ ব্যাপার। বহু ছাত্রী। বহু বিভাগ। বাণীপীঠ বালিকা হাসার সেকেণ্ডারী, স্কুল ফাইনাল, প্রাইমারী স্কুল, কলেজ, ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুল, সঙ্গীত ভবন, অনাথ আশ্রম, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির।

১৯৪৭ সালে পরিষদ রেজেস্টারী হল, দীর্ঘ মেয়াদী লিজে অনেক জমি নেওয়া হল এবং শ্যামমোহিনী রেজেস্টারী করে নিজের নামে কেনা সেই সমস্ত জমি এবং তাঁর যথাসর্বস্ব পরিষদের নামে লিখে দিলেন। কী অদ্ভুত জীবনী-শক্তি আর সর্বব্যাপী দূরদৃষ্টি তাঁর। ৮২ বছর বয়সেও এখনও সমস্ত কাজ তদারক করছেন, এখনও চশমা ব্যবহার করেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতে ক্লান্ত বোধ করেন না। কথায় কথায় বললেন তিলতিল করে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলেছি একটার পর একটা, আর বুকে বাজ করেছি, অবিশ্যি তাতে সময় সময় কষ্ট হয়েছে খুব, কিন্তু কিসের অর্থসঙ্কটে কখনও পড়িনি।

সারাজীবন অপার কৃচ্ছ সাধনের মধ্যে কেটেছে তাঁর। এখনও কাটছে। জীর্ণ একটি কাঠের তক্তাপোষে অতি সামান্য তাঁর শয্যা। সামান্য আহার। সেদিনও পর্যন্ত ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ে রাইটার্স বিল্ডিংএ মন্ত্রিদের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, রাজভবনে গেছেন। জীবনের এত মহনীয় উদ্‌ঘাটন স্বচক্ষে দেখে মনে হল আজ যেন অনেক পুণ্য সঞ্চয় করলাম।

অনুষ্ঠানে তাঁকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হল। অনেকে তাঁর গুণ গান করলেন। তার উত্তরে নীচু কাঁপা গলায় সকলকে আশীর্বাদ করে তিনি বললেন, দেশের আজ বড় দুর্দিন, দেশের যুব সম্প্রদায় আজ যেন দিশাহারা, মনুষ্যত্ববোধ বর্জিত, বিপথগামী, সমাজ, যেন আজ ধ্বংসের মুখে। কিন্তু তাঁর আশা ও বিশ্বাস, এই সনাতন পুণ্যভূমিতে, যেখানে বহু ঈশ্বর-প্রেরিত মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে সেই দেশে এর আগেও যেমন দুর্দিন এসেছে আবার কেটে গেছে, বর্তমানের অন্ধকারও তেমনি কেটে যাবে, মানুষ ফিরে পাবে তার নৈতিক চেতনা, মনুষ্যত্বের আদর্শ, জীবনের মূল্যবোধ। এই দেশের মানুষ আবার কর্মে মহান হবে, ধর্মে মহান হবে, নবদিনমণি উদিবে আবার পুরাতন গৌরবে, এদেশ আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

পরিশেষে ছাত্রীদের এবং সমাগত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে তিনি উপনিষদের সেই শাশ্বত বাণী উচ্চারণ করলেন :

অসতো মা সদ্গময়ঃ
তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ
মৃত্যোর্মামৃতং গময়ঃ।

অতি কৌতূহলী হ'য়ে বিপাক

গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়

খুব ছোটবেলা থেকেই আমার জানবার দারুণ আগ্রহ। সব জিনিষেরই খুঁটিনাটি জেনে রাখতে ইচ্ছে করে। যেমন—যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমার দারুণ কৌতূহল হোতো জানার জন্যে—মাছেদের জলের তলায় ঘুমোবার বিছানা আছে কি না—কিংবা ধাবদের বনের মধ্যে কেউ ভাত রেঁধে দেয় কিনা এইসব। তারপর যখন একটু বড় হয়েছি তখন জানতে ইচ্ছে হোতো—ঘড়ি কি করে চলে বা রেকর্ডের ঐ কালো চাকতির মধ্যে কি করে গান বাজন। লুকোনো থাকে এই সব। তা বাড়ীর লোকেদের অর্থাৎ দাদা, মামা, দিদি শ্রেণীর গুরুজনদের প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করেও তুলতাম। সব সময় তাঁরা যে সহাস্যভাবে সবে সব জবাব দিতেন তা নয়—তবে এটুকু বলতে পারি প্রত্যেকেই আমার এই সব কিছু জানার আগ্রহ বা কৌতূহলকে বেশ তারিফ করতেন। শুনতাম আমি নাকি কালে একটা মাথায় কুরি বা লেডি আইনস্টাইন গোছের হয়ে একটা কিছু করে জগতকে স্তম্ভিত করে দেব। ফলে হোলো কি আমার জ্ঞান বুদ্ধি আর কিছু বাড়ুক বা না বাড়ুক এইটুকু বিশ্বাস হয়েছিল যে জানবার আগ্রহ থাকা বা কৌতূহল থাকা বেশ একটা সদ্‌গুণ।

কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে আমার সে বিশ্বাসে ফাটল ধরছে—ফাটলই বা বলি কেন—ভাঙন ধরেছেই বলা যায়।

আচ্ছা যেমন ধরা যাক লোকের বয়স। সে মহিলাই হোক বা পুরুষই হোক—মানুষটা যখন জলজ্যান্ত রয়েছে তার বয়স তো নিশ্চয়ই একটা থাকবে—তা সেটা যদি আমার জানতে আগ্রহ হয় সেটা কি এমন দোষের?

এই সেদিন বাসে করে যাচ্ছিলাম—একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হোলো। শুনলাম মেয়েটি তার ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে যাচ্ছে। সত্যি বলতে কি মেয়েটিকে দেখে আমি বিবাহিতাই ভাবতে পারিনি—তার ওপর তার একটা স্কুলে পড়ার যোগ্য ছেলে আছে শুনে আমার তো বেশ অবাকই লাগলো। তা আমি যদি তাকে তার বয়সটা কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসাই করে থাকি তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে তা তো বুঝলাম না। মেয়েটি অর্থাৎ ভদ্রমহিলা প্রথমে আমার প্রশ্নটা না শোনার ভান করলেন। দ্বিতীয়বার আমি প্রশ্ন করতে আমি এইখানে নামবো' বলে উঠে গিয়ে বাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তো জানি—উনি ওখানে নামবেন না। কারণ আগেই বলছেন—উনি ধর্মতলা যাচ্ছেন—আর উনি উঠলেন তার ঢের আগে। আসল কথা বয়সটা বলবে না। কেন রে বাবা—কি হয় বয়স বললে? দু বছর কমেও যাবে না—আর দশ বছর বেড়েও যাবে না।

আরো অনেক জায়গায় বয়স জিজ্ঞাসা করে দেখেছি—তাঁরা আমার জানবার কৌতূহল দেখে

তারিফ করার তো কোনো চেষ্টাই করেন না উল্টে ভুরু কুঁচকে বিরক্তিই প্রকাশ করেন। সেই থেকে জেনে গেছি—ঘটনিক্যাল গার্ডেনের ঘটপাছটার আসল বয়সটা যদি আমি জানতে চাই—বা হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর প্রাচীনত্ব নিয়ে যদি আমার কৌতূহল থাকে তবে আমার কৌতূহলের সমাধান পাবো—। কিন্তু আমাদের সমগোত্রীয় জীব মানুষ—ভুলেও তাদের বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করবো না।

তারপর ধরা যাক মাইনের কথা কিছুদিন আগে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হোলো—অনেকদিনের পর। সে তার স্বামীর বদলীর চাকরী সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করছিল। বলছিল—'আর বোলো না ভাই দুদিন কলকাতা—তারপর একটু ঢিমেতে না ঢিমেতে বদলী হলেন দিল্লীতে—ব্যস ছুটলাম তল্পীতল্পা নিয়ে দিল্লী। বছর খানেক দিল্লীতে থাকতে না থাকতে অর্ডার এলো পাটনা যেতে হবে—কি যে ঝামেলা—সত্যিই তো পারা যায়? আমার মনে বেশ কষ্ট হোলো। তাই জিজ্ঞেস করলাম—'তোমার স্বামী কত মাইনে পান ভাই?' তা আমার বান্ধবীটি চটেমটে বললো—'এমন অভদ্রের মত প্রশ্ন করছো কেন?

ওমা—কি এমন দোষের প্রশ্ন? এত কষ্ট এত ঝামেলার চাকরী—তা কত টাকা পান জানতে পারলে বুঝতে পারতাম ওর স্বামী সেই কষ্টের ন্যায্য মূল্যটা পাচ্ছেন কি না। এর মধ্যে অভদ্রতার কি আছে তা তো বুঝলাম না। আর কার মাইনে কত আমারই বা কি দরকার জানার। তবে জানতাম জানার আগ্রহ থাকা ভালো—তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এখন জেনে গেছি ওটা অভদ্রতা—ব্যস্ মাইনে সম্বন্ধে আর কথা নয়।

আরে বাবা—দুনিয়াতে জানবার জন্যে কি কম বইপত্তর আছে? পড়ে নিলেই হয়। এনসাইক্লোপিডিয়া রয়েছে, বিশ্বকোষ রয়েছে, বছরে বছরে ইয়ারবুক বেরোচ্ছে। যা জানার জেনে নাও। খবরের কাগজে রোজ রোজ নতুন নতুন খবর বেরোচ্ছে—জানবার কোনো অসুবিধেই নেই। যত ইচ্ছে পড় আর কৌতূহলের নিবৃত্তি কর। তবে যেগুলো বইতে বা খবরের কাগজে লেখা থাকে না—যেমন পাড়ার লোকের উনকাম, বয়স বা অমুক মেয়েটি বিবাহযোগ্য—তার বিবাহ হচ্ছে না কেন বা করছে না কেন অথবা আত্মীয় প্রতিবেশীদের কার কত টাকার রোজ বাজার আসে—এসব কথা তো আর না জিজ্ঞেস করলে জানতে পারছি না? কারণ এগুলো কোনো খবরের কাগজে ছাপা হয় না। কিন্তু এগুলো জিজ্ঞাসা করলেই মুস্কিল। আরে আমার বাড়ীর লোকেরাই কি কম রাগারাগি করে এজন্যে? অথচ আশ্চর্য—আগে এরাই কত প্রশংসা করতো—সব জানতে চাইতাম বলে।

এই যে আমাদের পাড়ার বোসেরা। বেশ তিনভাই মিলেমিশে ছিল। কিন্তু কানে যখন খবর এল যে ওরা ভিন্ন হয়েছে তা একটু খবর নেবো না কেন এমনটা হোলো? তাই ওদের ছোট ভাইয়ের বৌকে জিজ্ঞেস করেছি তা আমাকে প্রায় মারতে বাকী রাখলো। বললো—'আমরা আলাদা থাকি আর একসঙ্গে থাকি তাতে পাড়ার লোকের কেন যে এত মাথাব্যথা বুঝি না—আপনাদের কি আর কোনো কাজ নেই?" প্রশ্নটা কি এমন অন্যায় আমার তো মাথায় এল না। এদিকে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের কিরকম সম্পর্ক বা আমেরিকা আমাদের কি চোখে দেখছে এগুলো যদি না জানা থাকে তবে লোকে ছ্যা ছ্যা করবে দুনিয়ার কিছুই খবর রাখে না। অথচ পাশের বাড়ীর খবর নিতে যাও—নাক কথা শুনিয়ে দেবে। কবি বলেছেন বটে—'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু?'

আরে দেখা হবে কি করে—দেখতে গেলেই তো বিন্দুরা সিন্ধু হয়ে যেয়ে আসবে।

যাই হোক কিছুদিন ধরেই মনে মনে ঠিক করেছি ব্যস—আর না—অপরের সম্বন্ধে কৌতূহলে একেবারে ফুলস্টপ।

সেদিন দুপুরে আমাদের বাড়ীর ওপর তলার ফ্ল্যাট থেকে দারুণ চেঁচামেচি, কান্নাকাটি, ধস্তাধস্তি—এমন কি মনে হোলো মারধোরও চলছে। আমার তক্ষুণি মনে হোলো—আমাদের একবার খবর নেওয়া কর্তব্য। কিন্তু বাড়ীর লোকেদের জ্বালায় তা আর নেওয়া হোলো না। বাড়ীর সবাই বললে—ওদের পাশুড়ী বৌয়ের ব্যাপারে তোমার মাথা গলানোর কি দরকার? কিন্তু ব্যাপারটা তো জানতে হবে।

যাই হোক দু একদিন পরে ওপরতলায় বেড়াতে গিয়ে পাশুড়ী ভদ্রমহিলাকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম—'কি মাসীমা—সেদিন বৌকে শাসন করছিলেন বুঝি?' বলবো কি মহিলা যেন ভাকিনী মূর্তি ধারণ করলেন। বললেন—'ও বৌমা বুঝি ইতিমধ্যেই লাগিয়েছে সাতখান করে?' ইতিমধ্যে বৌটি চা নিয়ে ঘরে ঢুকছিল—ব্যস্ বৌয়ের ওপর একেবারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন—'হ্যাঁ আদিখ্যেতা করে চা খাওয়াও আর পাশুড়ী বুড়ীর নামে সাতখান করে লাগাও—' বৌমা তো থ। তারপর ভদ্রমহিলা আমার দিকে ফিরে বললেন—'বেশ করবো—একশো বার করবো—আমার বৌকে আমি শাসন করবো, মেরে কেটে ফেলবো—কেটে ফেলবো—দেখা যাবে কে কত আসে ওর মাথা বাঁচাতে বোকো কাণ্ড। কোনো রকমে পালিয়ে এসে বাঁচি।

কিন্তু কৌতূহল বড় সাংঘাতিক জিনিষ। মনে মনে যতই ঠিক করি প্রকাশ করবো না কিন্তু মাঝে মাঝে কি যে হয়—সব ভুলে যাই।

যেমন হোলো এই তিন চারদিন আগে। আমাদের পাড়ার ঐ একতলা বাড়ীর দক্ষিণ দিকের ঘরটা। আমাদের বসবার ঘর থেকে সোজাসুজি দেখা যায় ঘরটা। দেখি সারাদিনই বন্ধ থাকে। সন্ধ্যেবেলা মাঝে মাঝে এই ছেলে ছোকরা গোছের কেউ কেউ ঐ ঘরটায় আসে—তিন চার ঘন্টা থাকে আর রাত্রে আবার তালা দিয়ে চলে যায়। প্রায়ই মনে মনে ভাবতাম এরা কারা? মাঝে মাঝে দেখতাম দারুণ গ্রীষ্মেও ওরা ঘরের জানলা বন্ধ করে দিয়েন করে। ঘুলঘুলি দিয়ে আলো দেখা যায় বুঝি লোক আছে ভেতরে। ব্যাপারটা কিরকম যেন সন্দেহজনক লাগে। বাড়ীতে এই নিয়ে আলোচনা করলে—সবাই বলে—"বাড়ীওলা দেখেশুনে ঘরভাড়া দিয়েছে—যে রকম লোকই থাকুক—আমাদের মাথা ঘামাবার দরকারটা কি?"

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ ঐ ঘর থেকেই একটা দারুণ আওয়াজ। কি হোলো রে বাবা! ব্যাপারটাতো দেখতে হচ্ছে। সুবিধেও ছিল—বাড়ীতে বাবা দেখার মত কেউ ছিলো না। ফলে হাজির হলাম গিয়ে একতলা বাড়ীতে। ততক্ষণে চেঁচামেচি, লোকজন, হৈচৈ সব এসে গেছে। খবর নিয়ে জানলাম ঐ ঘরটায় বোমা তৈরী হয়। তাইই একটা ফেটে গিয়ে এই বিপত্তি। যাই হোক কারুর প্রাণের হানি হয়নি—কারণ বোমা প্রস্তুত কারকদের কারুরই কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না—সব হাওয়া। বাড়ীওলা বাড়ী ছিলেন না—তাঁর স্ত্রী তো আমাকে দেখে কান্নাকাটি—বলে—'কে জানতো ভাই—এরা বোমা তৈরী করে—তা হলে কি আর এদের ঘরভাড়া দিতাম?'

আমিও অবশ্য বললাম—আমার বরাবরই সন্দেহ হয়—আমাদের বসবার ঘর থেকে দেখি তো সব—সারা সকাল ঘর বন্ধ—আর রাত্তিরে যাদের কাজ কারবার তা আমি আগে থেকেই বুঝেছি—ইতিমধ্যে কখন পুলিশ এসে গেছে খেয়াল করিনি। আমার কথা শুনে তো লাখখানেক প্রশ্ন। আমার নাম ধাম, পেশা কতদিন ধরে ওদের এই সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করছি, ঠিক কটার সময় আমি আওয়াজটা শুনেছি, এখন ওদের দেখলে চিনতে পারবো কিনা—ব্যস্ আমার তো সেল বারোটা বেজে। যতই বলি—দেখুন আমি কাউকে চিনিনা—কিছুই বলতে পারবো না—কে কার কথা শোনে—বলে এই তো বলছিলেন আপনার বরাবরই সন্দেহ হয়—বুঝলেন—এই কেসটায় আপনি প্রধান সাক্ষী।"

আমার তো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। শুধু কি তাই? বাড়ীতেও আবার সবার রক্তচক্ষু। বলে হোলো তো এখন? উচিত শিক্ষা হয়েছে। পরের ব্যাপারে আরো উঁকি মারো—এখন চোখবার খানায় যাও এমাহার লেখাও—রোজ শমন আসবে আর মাকে ধরি দিয়ে কোর্টঘর কর—" সত্যি—বেশ ছিলাম পাখিতে—কোথাও কিছু নেই—ঘাড়ে এসে ঝুললো বোমার মামলা।

যাক্ শিক্ষা যথেষ্ট হয়ে গেছে। এই কৌতূহল মন থেকে একেবারে অপারেশন করে বাদ দিয়ে দেব।

টুকিটাকি

প্রত্যেক মা তাঁর সন্তানদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন এবং এরজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের ছেলেমেয়েদের খাওয়া দাওয়ার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কিন্তু শরীর ধারণের পথে প্রধান যে খাদ্য মাছ, মাংস, ডিম, ফল, দুধ এসব আসবে কোথা থেকে। কথাটা খুবই সত্যি তবুও মনে হয় বাজার থেকে যাহোক কিছু আনুক না কেন সেগুলি শুছিয়ে গাছিয়ে নানাভাবে রান্না করে ও নতুন ধরণের রান্না করে যদি প্রত্যহ দেওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই তারা খুশী মনেই খাবে। মোটামুটি একটী তালিকা দিচ্ছি—সকালে দুধের বদলে আটা, ছোলা, আটার রুটী, গুড় মুড়ি, একটা কোনো ফল সেদ্ধ বা পোড়া করা ইত্যাদি। যাদের অসুবিধা নেই তাঁরা ডিম রুটী ও দিতে পারেন। দুপুরের ভাত তাতে সবুজ টাটকা শাক-সব্জি, লাউ বাঁধাকপি কাঁচা পেঁপে পটল ডুমুর এর তরকারী, উচ্ছে আলুভাতে। মুসুর ডাল পেঁয়াজ দিয়ে সপ্তাহে তিন দিন অন্তত: মাছ, মাংস, ডিম থাকবে। টিফিনে রুটি পাউরুটীর স্যাণ্ডউইচ কলা অথবা জ্যাম মাখানো রুটী মাঝে মাঝে ভাল মুড়ি বা আটার মোহনভোগ। রাত্রে আটার রুটী, ডাল নিরামিষ তালনা বা তরকারী, বেগুন পোড়া পেঁয়াজ দিয়ে, শেষে একটু মিষ্টি চাটনী। তবে আগে ও বলেছি সপ্তাহে একদিন ডিম, একদিন মাছ ও একদিন মাংস খেতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যারা খাওয়ায় প্রয়োজন যত কমই হোক্ চাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ অর্থাৎ যেখানে বসে খাওয়া হবে সে জায়গাটী যেন পরিষ্কার হয়। একজন ডাক্তার বলেছিলেন—আহার্য্য দ্রব্যাদি সর্বদা সুন্দর সুস্বাদু করে সাজিয়ে পরিষ্কার পাত্রে স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশের মধ্যে কোনো রোগীকেও যদি খাওয়ানো যায় তাহলে তার হজম হবে। কারণ অতৃপ্তি করে যত ভাল পথ্যই অথবা খাওয়ার আয়োজন হোক না কেন তাতে হজম হয় না মনটা অতৃপ্তির ভাবে ভরে থাকে। কাজেই টেবিল বা মাটীতে আসন বা পিড়িতে খাবার-ব্যবস্থা হোক জায়গাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে। খাবার ঘরের জিনিসপত্র ঝকঝকে হবে—প্রতিদিন জলের কুঁজো বা কলসী পরিষ্কার করে টাট্‌কা জল রাখতে হবে। কাঁচ, কাঁসা, বা যে কোনো ধাতুর বাসনেই খাবার ব্যবস্থা হোক সেগুলি যেন স্বাস্থ্য সম্মত হয় এবং পরিষ্কার হয়। সর্বোপরি খাবার ঘরে থাকবে একটি ফুলদানীতে কয়েক গুচ্ছ ফুল ঘরের সঙ্গে মনেও এতে অনেকটা তৃপ্তি আসবে আজকাল অবশ্য প্রায় অধিকাংশ বাড়ীতেই খাওয়ার ঘর বেশ পরিষ্কার রাখা হয় এবং খাদ্য ব্যবস্থাও মায়েরা বেশ নতুনত্ব এনেছেন, তবুও কিছু বললাম নিশ্চয়ই এই থেকে নিজের নিজের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবস্থা করবেন।

রান্না শিখুন ও রান্না করুন

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

রান্না করে ও রান্না করে খাইয়ে যে আনন্দ হয় তার তুলনা নেই। অথচ আজকাল আমরা অনেকেই এটি উপেক্ষা করে থাকি। হয় পয়ের উপর নির্ভর করি কিংবা যেনতেন প্রকারেন কাজ সেরে নিই। হয়তো বা একবেলা হোটেল থেকেই খাবার এলো। অথচ একদিন ছিল যখন আমরা রান্নার গর্ব করেছি ও রান্নায় অন্য প্রদেশের মেয়েদের হারিয়ে দিয়ে কতই না আনন্দ পেয়েছি। এবারে কয়েকটি রান্নার কথা বলছি শুনুন।

পেঁয়াজহীন মাংস—আজ আপনাদের কাছে কয়েকপ্রকার মাংসের রান্না বলছি। প্রথমে বলি পেঁয়াজহীন মাংসের কথা।

উপকরণ—মাংস ১ কিলো, পালংশাক ½ কিলো, কাঁচা লঙ্কা ১০।১২টি, ঘি খানিকটা, আন্দাজমত চিনি, হলুদ, ধনে, আদা ও অল্প একটু লঙ্কা বাটা এবং ½ কাপ দুধ।

প্রণালী—প্রথমে মাংসগুলি গরম জলে ধুয়ে টক দই অথবা অল্প একটু চিনিসার মাখিয়ে রাখুন। পালংশাকটি একটি পাত্রে সেদ্ধ করে, নামিয়ে ঐ ১০।১২টি কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে বেটে রাখুন। এখন উনুনে ডেচ্‌কি বা হাঁড়ি চড়িয়ে ঘি দিন। ঘিয়ের পরিমাণ বেশ খানিকটা রাখতে হবে কারণ তেল এতে একেবারেই পড়বে না। তারপর ঘিটা একটু গরম হলে ওতে আধাআধি চামচের ২ চামচ চিনি ও অল্প একটু শুকনো লঙ্কা বাটা দিয়ে নাড়ুন। অল্প খানিকক্ষণ পরে মাংসটি ছেড়ে দিন এবং নাড়তে থাকুন। এরপর ধনে হলুদ ও আদা বাটা দিয়ে নাড়তে থাকুন। এবার ½ কাপ দুধ দিয়ে একটু সেদ্ধ নিন। এখন কাঁচা লঙ্কা মিশ্রিত পালংশাক বাটাটি এবার ওতে দিয়ে নাড়তে থাকুন। বেশ অনেকক্ষণ ধরে নাড়ার পর, আন্দাজমত জল দিন। জলটি এমন করে দিন যাতে মাংসটিও সেদ্ধ হয়ে যায় এবং জলটিও শুকিয়ে যায়।

মাংসটি যখন অর্দ্ধেক সেদ্ধ হয়ে আসবে তখন নুন দেবেন। বেশ মাখ মাখ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। পরে পরিবেশন করুন, দেখবেন সাধারণ পদ্ধতিতে তৈরী মাংসের চেয়ে কত সুস্বাদু ও মুখরোচক হয়ে উঠেছে।

মাংসের ডাল—আরও একপ্রকার মাংসের রান্না আপনাদের কাছে বলছি। এটি হল মাংসের ডাল। শরীরের পক্ষে এটি খুবই পুষ্টিকর। বিশেষ করে রাত্রিরের জন্য যদি এই রান্নাটি করে রাখেন তবে খাটুনী কম হয় আর খেতেও অতি সুস্বাদু হয়।

উপকরণ—বিট, গাজর, আলু, কপি, কড়াইশুটি, মাংস (মাংস অল্প হলেই হবে) টমেটো, পেঁয়াজ, তেজপাতা, গরমমশলা ও ভালো ঘি।

প্রণালী—প্রথমে আনাজগুলি কুটে ধুয়ে একটি পাত্রে রাখুন। এবার উনুনে ডেচ্‌কী চাপিয়ে তাতে সামান্য ঘি দিয়ে, পেঁয়াজগুলো একটু বড় বড় করে কেটে ছেড়ে দিন আর তার সঙ্গে মাংসগুলোও ছেড়ে দিন। বেশ একটু নেড়ে নিয়ে আন্দাজমত জল দিয়ে দিন। এবার মাংসটা একটু সেদ্ধ হয়ে এলে ঐ কাটা তরকারীগুলি দিয়ে দিন। তারপর ৩।৪টে টমেটো তেজপাতা। ৪।৫ টা কাঁচা লঙ্কা ওতে দিয়ে দিন। এবার অল্প একটু মুগের ডাল ভেজে ওতে ছেড়ে দিন। যখন দেখবেন বেশ সেদ্ধ হয়ে গেছে, একটু মিষ্টি, নুন, গরমমশলা, একটু ভাল ঘি দিয়ে নামিয়ে নিন। এবার এর উপর যদি একটু ধনেপাতা কেটে ছড়িয়ে দেন তবে ভাল হয়। গরম গরম পরিবেশন করুন দেখবেন খুবই সুস্বাদু হয়ে উঠেছে।

স্যালাড—মাংসের সঙ্গে যদি একটু স্যালাড তৈরী করে নেন তবে খুব ভাল হয়। কারণ মাংসের সঙ্গে স্যালাড থাকলে খাদ্যটি যেন আরও সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তাছাড়া জিনিষটি প্রতিটি খাবারের সঙ্গেই খাওয়া চলে।

উপকরণ—বিট, গাজর, আলু, কড়াইশুটি, টমেটো পেঁয়াজ, পার্সলেবু, নুন ও ২।১টি ডিম।

প্রণালী—প্রথমে বিট, গাজর, কড়াইশুটি, ও আলুর খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে বিট, গাজর, ও আলুগুলি পাতলা পাতলা করে কেটে নিন, ডিমটি সেদ্ধ করে রাখবেন। এবার সেদ্ধ জিনিষগুলি একটি কাঁচের পাত্রে ছড়িয়ে রাখুন। তারপর তার উপর পেঁয়াজ, নুন, টমেটো কেটে ছড়িয়ে দিন। আর তার সঙ্গে পার্সলেবুর রস করে ছড়িয়ে দিন। এবার ডিমটি কুচি কুচি করে কেটে উপরে দিয়ে দিন। এবার আন্দাজমত নুন দিয়ে বেশ উপরে, নিচ করে মাখিয়ে নিন। তারপর কিছু ধনেপাতা কেটে উপরে ছড়িয়ে দিন। অন্যান্য তরকারীর সঙ্গে এই স্যালাড পরিবেশন করুন দেখবেন কত ভাল লাগছে। তেল, ঘি ছাড়া অল্প খরচের যদি এই স্যালাড তৈরী করা যায় তবে মন্দ হয় না।

কপির আচার—শীতকালে সাধারণত তরি-তরকারী খুবই সস্তা হয়। সেইজন্য চিন্তা করে দেখলুম তাই যদি এই সময় বর্ষাকালের জন্য কিছু খাদ্য সংস্থান করে গুছিয়ে রাখা যায় তবে মন্দ কি? সেইজন্য আজ একটি আচারের কথা উল্লেখ করছি।

উপকরণ—কপি, আলু, কড়াইশুটি, লিম, একটু হিং, তেঁতুল, সরষে, রসুন ও লঙ্কাবাটা, কাঁচা লঙ্কা, সরষের তেল ও পাঁচফোড়ন।

প্রণালী—প্রথমে কপি, আলু, কড়াইশুটি, লিম বড় বড় করে কেটে সেদ্ধ করে নেবেন, দেখবেন যেন গলে না যায়। সেদ্ধ হয়ে গেলে একটা ঝুড়িতে তুলে রাখুন। যখন দেখবেন জলটা সব ঝরে গেছে তখন একটি পাথর বা কাঁচের পাত্রে রাখুন। তারপর কাঁচা তেঁতুল সেদ্ধ করে ওর কাই বার করে সেদ্ধ তরকারীতে মাখিয়ে রাখুন। এবার রসুন, সরষে, লঙ্কা বাটা মাখিয়ে ওর উপর দিয়ে মাখিয়ে নিন। একটু হিং জলে গুলে মাখিয়ে নেবেন।

এবার ঐ পাত্রটি রোদে দিন, যখন দেখবেন একটু শুকিয়ে এসেছে তখন রোদ থেকে তুলে নিন। এখন একটি জারে সরষের তেল খানিকটা নিয়ে, তরকারীগুলো আস্তে আস্তে ওর মধ্যে দিয়ে দিন। তারপর একটু পাঁচফোড়ন ও লঙ্কা ভেজে গুড়িয়ে ওর উপর ছড়িয়ে দিন। প্রত্যেকদিন জারটিকে রোদে দেবেন। দেখবেন সকল আনাজগুলি যেন তেলে ডুবে থাকে। ৭।৮ দিন পরে দেখবেন বেশ মজেছে। এইভাবে যখন বেশ মজে আসবে তখন মুড়ি বা গরম ভাতের সঙ্গে মেখে খান দেখবেন কেমন সুস্বাদু ও মুখরোচক লাগছে। ঠিকমত রাখতে পারলে এই আচার বহুদিন থাকবে তবে নজর রাখতে হবে, তেল না কমে যায় আর তরকারীগুলো যেন সব সময় তেলে ডুবে থাকে। আর এর সঙ্গে আর একটা কথা স্মরণ রাখবেন যে প্রায়ই রোদে না দিলে ভবিষ্যতে ফয়ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সব খাবারের শেষে একটি মিষ্টি দিয়ে আজকের মত আপনার প্রস্তুত প্রণালীটি শেষ করছি। একটু ভেবে দেখলাম যে, এখনও চিনিটা বড়ই দুর্মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অল্প মিষ্টির মধ্যে মুগের নাড়ুটি মন্দ হয় না। আজ আপনাদের কাছে মুগের নাড়ু প্রস্তুত প্রণালীটা বলছি।

উপকরণ—মুগের ডাল আধকেজি, চিনি আড়াই শো গ্রাম, ঘি আড়াইশো গ্রাম, একটু বড় এলাচ।

প্রণালী—প্রথমে কাঁচা মুগের ডালটি ভাল করে ভেজে নিন ও পরে একটি পাত্রে ডালটি ভিজিয়ে দিবেন। ডালটি কিছুক্ষণ ভেজবার পর ভাল করে বেটে নিন। এবার উনানে একটি পাত্র চড়িয়ে ঘি দিন। ঘিটি যখন বেশ হয়ে আসবে তখন বাটা ডালটি ওর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করবেন ও চিনিটি দিয়ে ভাল করে নাড়বেন। দেখবেন যখন শুকিয়ে আসছে তখন আবার একটু ঘি দেবেন। বেশ ঝর ঝর হয়ে এলে নামিয়ে ফেলবেন। তারপর বড় এলাচ একটু গুড়িয়ে ওর উপর ছড়িয়ে দেবেন।

———

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

গল্প ভারতী সমসাময়িক সাহিত্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব।

গল্প ভারতী নবজাগ্রত জাতির মর্মরাঙা মর্মকাহিনী।

গল্প ভারতী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ।

গল্প ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতি অন্তরের ব্যথা ও বেদনার কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

গল্প ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

গল্প ভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করেছে।

গল্প ভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প ভারতী জাতির ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী পূজা সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট এই যে ইহা শুধু একটি উৎসব অঙ্গুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সেইজন্যেই দেশব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পূজা সংখ্যা গল্প ভারতী বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে।

গল্প ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

আজই গল্প-ভারতীর গ্রাহক হউন

সডাক বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ১৫৲

যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

গল্প-ভারতী

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১

ফোন: ৫৫-০২৯৪ ও ৫৫-১৩৫৫

গল্প ভারতী

ফাল্গুন—১৩৭৬

রজত জয়ন্তী বর্ষ

পঞ্চবিংশতি বর্ষ, নবম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এই ফাল্গুন মাসের দু'তারিখে অবতরণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন থেকে ১৩৪ বৎসর পূর্বে। প্রতি বৎসরের মত আবার এসেছে সেই ফাল্গুন নব বসন্তের বার্তা নিয়ে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন চিরকালের জন্য প্রতিটি মানুষের অন্তরে চিরবসন্তের বার্তা নিয়ে। আজ সেই মহাপুরুষের জন্মতিথিতে তাঁর সেই চিরস্মরণীয় বার্তার কণামাত্রও যদি আমরা প্রকাশ করতে পারি তো নিজেদের ধন্য মনে করবো।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা লিখে শেষ করা যায় না। যত লিখি মনে হয় বুঝি কিছুই লেখা হলো না। এমন সর্ব-সংস্কারমুক্ত সর্বভাবময় দেবতার মত মানুষ সত্যিই দুর্লভ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ যখন বৈদেশিক শক্তি বৃটিশের নাগপাশে জর্জরিত, ভারতবাসী যখন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে নিজস্ব স্বাধীন সত্তাকে বিসর্জন দিতে বসেছে, ভারতের ধর্মভাব, আধ্যাত্মিকতা যখন প্রায় অবলুপ্ত, চারিদিকে শুধু সংশয় আর সন্দেহ, সেই সর্বনাশা যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বিস্ময়কর আবির্ভাব।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার এই দৈববাণী সার্থক করে তোলবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন আমাদের মাঝখানে। এলেন মানুষ হয়ে। মানুষের মত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনও-বা ভয় এবং সংশয়—ঠিক মানুষের মত আচার-আচরণ দেখে চেনা শক্ত, তাই নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন—

'যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছে।'

মানুষ রূপান্তরিত হলেন নারায়ণে। নরলীলায় প্রত্যক্ষ করলাম অবতারকে।

শুধু বাংলাদেশ নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়—সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

মানুষে মানুষে দেশে দেশে বিভেদ আর বিদ্বেষ। চাই সাম্য চাই সমন্বয়।

রাজনীতি দিয়ে সে সমন্বয় সম্ভব নয়। রাজনীতি বড়-জোর আইনের জোরে ধনবৈষম্য দূর করতে পারে কিন্তু রাজনীতি দিয়ে অন্তরের বৈষম্য দূর হবে না।

অন্তরের বৈষম্য দূর করতে হলে সন্ধান করতে হবে অন্তরের দেবতার, সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের। সব মানুষের মধ্যেই তিনি রয়েছেন। সেই ভাব যতই প্রসার লাভ করবে—মানুষ ততই তার আনন্দময় স্বরূপের সন্ধান পাবে। প্রকৃত সাম্যের দিকে সেই তখনই অগ্রসর হবে মনুষ্য সমাজ। তখন সারা বিশ্ব হবে যেন একটি পরিবার। এখানে শ্রেণীগত কোনও বৈষম্য থাকবে না—জাতিবর্ণনির্বিশেষে মানুষ হবে শুধু আনন্দময় মানুষ।

সম্প্রদায়গত কলহের অবসান হবে মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথায়।

'যত মত তত পথ।'

দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বধর্মের এবং সকলভাবের সমন্বয় সাধন করেছেন তিনি শুধু ওই মহাবাণী প্রচার করে।

'যত মত তত পথ'—এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। প্রতিটি ধর্মের বিধিবিধান আচার অনুষ্ঠান তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন, সাধনা করেছেন, সিদ্ধিলাভ করেছেন, তারপর মূল সত্যটি উপলব্ধি করে সারা জগতকে শুনিয়েছেন তাঁর সেই সত্য উপলব্ধির অমৃতময় বাণী—'যত মত তত পথ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সকলের সুখ-দুঃখের সাথী—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

জীবনে যথার্থ শান্তি লাভের পথ একমাত্র তিনিই দেখিয়ে গেছেন। বলেছেন, "ঈশ্বরের অনন্ত ভাব, অনন্ত নাম, কিন্তু তিনি এক। যে-নামে ও যে-ভাবে মানুষের তাঁকে ডাকতে ভাল লাগে সেই নামেই তিনি ডাকুন, আন্তরিকতার সঙ্গে ডাকলে তাঁর সিদ্ধিলাভ হবেই—তিনি তাঁর দেখা পাবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে কেশবচন্দ্র সেন বললেন—

কি আশ্চর্য, এ যে ঠিক যীশুখৃষ্টের মত কথা। গ্রাম্য ভাষা। গল্পের মত করে এমনভাবে বুঝিয়ে বলা—যাতে স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে সকলে অনায়াসে বুঝতে পারে। যীশু ঈশ্বরকে 'ফাদার' 'ফাদার' বলে পাগল হয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল 'মা' 'মা' বলে। ইনিও যীশুর মত ত্যাগী, তাঁরই মত এঁরও অসীম বিশ্বাস। কারও ওপর কোনও বিদ্বেষভাব নেই। সব ধর্মাবলম্বীই তাঁর আপন জন।

মনীষী রোঁমা রোঁলা লিখলেন—Sri Ramkrishna was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people.

তাঁর সেই একটি জীবনেই যেন অনন্ত জীবন!

আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সারা ভারতবর্ষের তীর্থ পরিক্রমা করে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে যেমনই এসেছেন, অমনিই বলেছেন—"এ কি দেখছি! যেখানে এখন বসে আছি এইখানেই তো সব। মিছেই ঘুরে মরলাম। কোন কোন জায়গায় দেখলাম এঁর এক আনা, কোথাও-বা দু'আনা, কোথাও চার আনা—এই পর্যন্ত। এইখানে দেখছি পূর্ণ ষোল আনা।"

শোকসন্তপ্ত মোহগ্রস্ত মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন জীবনকে মধুময় করবার পথের সন্ধান। এ-যুগ জড়বাদের যুগ। এ যুগেও তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা শোকতাপ এবং নানা সমস্যার সমাধান করে এমন একটি জগতের সন্ধান দিয়েছেন যা পার্থিব জগতের বাইরে আর-এক জগৎ—সত্যের জগৎ, অমৃতের জগৎ, আনন্দের জগৎ।

এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ এ-যুগের সকলের আরাধ্য দেবতা।

তাঁকে জানলেই আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি। বুঝতে পারি ধর্মই জাতির প্রাণ, শিবজ্ঞানে জীবসেবাই আমাদের জীবনের আদর্শ।

বিশুদ্ধানন্দ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ হয়ত বেল গাছের তলায় গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। মুখে প্রসন্ন হাসি।

মনে হয় যেন মাকে দেখতে পেয়েছেন।

মার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলছে দিবারাত্রি।

এমন দিনে দক্ষিণেশ্বরে এলেন তাঁর বুড়তুতো দাদা—রামতারক চাটুজ্জে।

এসেছেন তিনি চাকরির খোঁজে। গিয়ে দাঁড়ালেন মথুরবাবুর কাছে। বললেন, আমার একটা কাজ চাই।

'কি কাজ করতে পারবেন?' জিজ্ঞাসা করলেন মথুরবাবু।

চাটুজ্জে বললেন, ব্রাহ্মণের ছেলে, পুজোর কাজ ছাড়া আর কোনও কাজ তো জানি না।

মথুরবাবু এই রকম একজন লোকই খুঁজছিলেন। ঈশ্বরের নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন গদাধর। কখন কি যে করছেন তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। এঁকেই কালীপুজোর ভার দেওয়া যাক্। বললেন, কাল থেকে আপনি তাহ'লে কালীর পুজো করুন।

কালীর পুজো?

চাটুজ্জে নিষ্ঠাবান পরম বৈষ্ণব। কালীর মন্দিরের পাশে রাধাগোবিন্দজির মন্দির রয়েছে। রাধাগোবিন্দর পুজোর ভার পেলেই যেন ভাল হতো।

মাথা হেঁট করে চাটুজ্জে বোধকরি সেই কথাই ভাবছিলেন।

মথুরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাবছেন?

চাটুজ্জে তাঁর মনের কথা বলতে পারলেন না। বললে চাকরিটা হয়ত হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাই ভাবলেন, কালীও যা কৃষ্ণও তাই—ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া!……ঠিক আছে। বললেন, না কিছু ভাবিনি। বেশ তবে কাল থেকে কালীপুজোই করবো।

কিন্তু একটা কথা—

মথুরবাবু বললেন, কি কথা?

চাটুজ্জে বললেন, গঙ্গার তীরে আমি নিজে রান্না করে খাব।

—কেন? গদাধর তো মায়ের প্রসাদ খায়, আপনার আবার এ খুঁৎখুঁতুনি কেন?

চাটুজ্জে বললেন, ও সব পারে। মায়ের প্রসাদও খায়, আবার ছোটজাত কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্টও মুখে তুলে নেয়। ওর মাথা খারাপ।

হ্যাঁ, তা গদাধরের মাথাটা একটু খারাপ বই-কি! নইলে…

মথুরবাবুর মুখে তাঁর কাণ্ড-কারখানা শুনে রাণী রাসমণি একদিন নিজেই এলেন তাঁকে দেখতে।

দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেই ঘাটে স্নান করে এসে তিনি বসলেন গিয়ে মায়ের মন্দিরে। ডেকে পাঠালেন গদাধরকে।

গদাধরের গান তাঁর খুব ভাল লাগে।

গদাধর আসতেই রাণী বললেন, একটি গান গাও।

গদাধর গান গাইছেন, রাণী ধ্যানমগ্ন হয়ে মায়ের মূর্তির সুমুখে চোখ বুজে বসে বসে শুনছেন।

হঠাৎ গান বন্ধ করে গদাধর চীৎকার করে বলে উঠলেন, এখানেও ওই-সব চিন্তা?

বলেই রাণীর পিঠের ওপর বসিয়ে দিলেন এক চড়!

কথাটা এ-কান সে-কান হতে হতে শুনে ফেললে সবাই।

সর্বনাশ! পাগলামিরও তো একটা সীমা আছে!

এবার বুঝি দক্ষিণেশ্বর থেকে গদাধরের অন্ন উঠলো!

হৃদয় ছুটে এলো।—'এ তুমি কী করেছো মামা? রাণী রাসমণিকে চড় মেরেছো?'

গদাধর বললেন, তুই থাম্।

মথুরবাবু এলেন। বললেন, এ কী করেছেন আপনি?

—কী করেছি?

—চড় মেরেছেন রাণীকে?

গদাধর বললেন, কি করবো বল—মা আমাকে বললে, ওই ছাখ, এখানে বসেও কি-সব মামলা-মোকদ্দমার কথা ভাবছে মেয়েটা। ওকে মার্ তো এক চড়! মার কথা অমান্যি করবো কেমন করে?

বিস্ময়ে হতবাক্ মথুরবাবু! হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন গদাধরের মুখের পানে।

যার যা মুখে এলো সে তাই বললে গদাধরকে।

কিন্তু একটি কথাও বললেন না শুধু রাণী রাসমণি। তাঁর দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর ধারা।—সত্যিই তো! তাঁর এষ্টেটের একটা বড় মামলার কথা ভাবছিলেন তখন।

পাগলামির জন্য শাস্তি দিতে গিয়েছিলেন বুঝি তাঁর মন্দিরের ওই পূজারী ব্রাহ্মণকে। শেষে নিজেই শাস্তি নিয়ে ফিরে এসেছেন। যতই সে-কথা ভাবছেন ততই যেন সেই উন্মাদ পূজারীর পদপ্রান্তে ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় মাথাটি তাঁর লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে!

মা ভবতারিণীর প্রিয়তম সন্তান—অন্তর্যামী কে এই ব্রাহ্মণ?

রাণী ডাকলেন তাঁর জামাই মথুরবাবুকে। বললেন, শোনো বাবা মথুর, তোমরা যাঁকে পাগল বলছো, উনি সামান্য মানুষ নন। ওঁর মুখ দিয়ে মা যে-কথা বলিয়েছেন, ওঁর হাত দিয়ে যে-তিরস্কার আমাকে করিয়েছেন, সে তো তিরস্কার নয়, আমার জীবনের চরমতম পুরস্কার। ওঁর হাতে চড় খাবার পর রাণীর মর্যাদায় আঘাত লেগেছিল সত্যি, কিন্তু তার পরমুহূর্তেই মনে হলো যেন আমার অন্ধকার বুকের ভেতরে আলো জ্বলে উঠলো, মা যেন আমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করে বসলেন।···তাই বলছি, ওই আপনভোলা মানুষটি তো দিবারাত্রি ভাবে বিভোর হয়ে রয়েছে, কখন যে কি করছে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। তুমি যেন ওর সুখ-সুবিধে দেখো বাবা, ওর দিকে সব সময়েই নজর রেখো।

এই নজর রাখতে গিয়ে মথুরবাবু দেখলেন—গদাধরের আবার আর এক নতুন উপসর্গ এসে জুটেছে। বুকের মাঝখানটা লাল হয়ে উঠছে। আগুনের মত জ্বলছে দিবারাত্রি। সারা গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ঘাটে গিয়ে গঙ্গার জলে শরীরটাকে ডুবিয়ে বসে থাকছেন দিনরাত।

মথুরবাবু কবিরাজ ডাকলেন। কলকাতা শহরের সেরা কবিরাজ। গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি বললেও চলে। তিনি এলেন। গদাধরকে খুব ভাল করে দেখলেন। ওষুধ দিলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

তখন মথুরবাবুর একটা সন্দেহ হলো। ভাবলেন বুঝি তিনি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করছেন বলেই তাঁর শরীর এত গরম হয়ে উঠছে। শরীরের নিয়মকানুন কিছুই মানছেন না। তাই এই-সব অদ্ভুত অদ্ভুত রোগ হচ্ছে ওঁর।

মথুরবাবু একদিন দু'জন যুবতী পতিতাকে এনে চুপিচুপি ঢুকিয়ে দিলেন তাঁর ঘরে।

গদাধর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আয় মা আয়, বোস্।

বলেই তাদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম!

মেয়ে দুটো তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

হাতজোড় করে গদাধর বললেন, এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে কেন মা তোমরা? কি বলবে বল।

মেয়ে দুটো তো হেসেই লুটোপুটি!

পাগল ছাড়া গদাধরকে আর কী বলবে তারা?

গদাধর জিজ্ঞাসা করলেন মথুরবাবুকে, এদের কি তুমিই এখানে পাঠিয়েছ? কী বলতে চাও তুমি?

মথুরবাবু বললেন, বলতে চাই—আপনি ওই-সব খেয়ালীপনা ছাড়ুন। প্রকৃতির যা নিয়ম তা ঠিক ঠিক পালন করুন। আপনার রোগ-ব্যাধি সব সেরে যাবে দেখবেন। ঈশ্বর যে ঈশ্বর—সে পর্যন্ত তার নিজের আইন মেনে চলে। নিয়মকে লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা ভগবানেরও নেই।

গদাধর বললেন, সে কি কথা? নিয়ম যে তৈরি করেছে সে কি ইচ্ছে করলে সে-নিয়মের রদ-বদল করতে পারে না? ঈশ্বর কি স্বাধীন নয়?

মথুরবাবু বললেন, তা কেমন করে হবে? নিজেই নিয়ম করে আবার নিজেই যদি তা ভাঙেন তো নিজের কাছে কী জবাবদিহি দেবেন?

গদাধর বললেন, জবাবদিহি কিসের? সবই তো তাঁর খেলা। চাঙাগড়া খেলা। ঈশ্বরের কাছে আবার নিয়ম কি? তিনি সমস্ত নিয়মের বাইরে।

মথুরবাবু কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না সে-কথা। বললেন, লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই ফুটবে কই ফুটুক দেখি একটা সাদা ফুল!

গদাধর বললেন, ইচ্ছাময়ীর যদি ইচ্ছা হয় তো ফুটবে। অসম্ভবও সম্ভব হবে।

পরের দিন সকালে মন্দিরের সুমুখে বাগানের দিকে তাকাতেই গদাধর দেখলেন—লাল জবাফুলের গাছে একটি সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। একটি টক্‌টকে লাল আর তার পাশেই একটি ধপ্‌ধপে সাদা।

আনন্দে অধীর হয়ে গদাধর চীৎকার করে উঠলেন। ডাকলেন মথুরবাবুকে। বললেন, দেখে যাও মথুরবাবু, দেখে যাও লীলাময়ীর লীলা। মা আমার ইচ্ছাময়ী। মা যা খুশী তাই করবে।

বলেন আর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে আসে।

মথুরবাবু তো অবাক!

গড় হয়ে প্রণাম করে গদাধরের পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন।

—তোমাকে আমি চিনতে পারিনি ঠাকুর, তাই তোমাকে নিয়ে ছেলেখেলা করেছিলাম। তুমি নর-নারায়ণ। তুমিই লীলাময়। এ হলো শুধু তোমারই ইচ্ছায়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

হায়!

শেষে এই হল দেশের হাল!

গল্পভারতীর পাতা থেকে

সঙ্গীত-আসর

হোরি গান

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুরূপ বাঙলা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসবের বহু গান প্রচলিত আছে। এইগুলি হোরি বা হোলি গান নামে পরিচিত। সেকালে, দোলের দিন বড় বড় গায়কগণ উৎসব উপযোগী গান রচনা করে নগরে কিংবা গ্রামে দলবলে গেয়ে বেড়াতেন। উৎসবের উহা একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বর্তমান সংখ্যায় একটি হোলি গানের স্বরলিপি প্রদত্ত হল। গানটির রচয়িতা রূপচাঁদ পক্ষী। রূপচাঁদ দাস বা রূপচাঁদ পক্ষী ১২২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গৌরহরি দাস। বাল্যকাল থেকেই রূপচাঁদ সঙ্গীত প্রেমিক ছিলেন। গীতিকার হিসাবে ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর অধিকাংশ গানে পক্ষী ভণিতা দেখা যায়। শুনা যায় পক্ষী উপাধি ধারণ করেছিলেন বলে, তাঁর বাড়ি ভর্তকটা পাখীর খাঁচার আকারের মত ছিল। ১২৮৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

কাফী—ত্রিতাল

হোরি খেলিছ শ্রীহরি সহ রাধা প্যারী
কুঙ্কুম ধুম শ্যাম অঙ্গ ভরি।
পুষ্পমালা হিন্দোলা সাজায়ে ব্রজনারী
রাই শ্যাম অনুপম, দোলে তদুপরি॥
নব নব সখীগণ, আনি চুয়া চন্দন
গোলাব সহিত আবিরী,
ঐ ঐ রসময়ী, শ্যামের বামেতে ঐ
যুগল রূপ রস হের নয়ন ভরি।
উড়ে আবীর গুলাল বৃন্দাবন লালে লাল,
লালে লাল যমুনার বারি
কহে খগ মৃগী মৃগ লাল ব্রজপুরী॥

০　　১　　২　　৩　　০
পমা - া ধা পা | মজ্ঞা া রসা সা I মা া পা না | পা া মজ্ঞা সরা | মা মা ধা া
হো ০ ০ রি | শে ০ ০ শি ০ ছে শ্রী ০ ০ ০ | রি ০ ০০ ০ ০ | ম ০ রা ০

১　　২　　৩　　০
ধা া ধণা র্সা I ণধা ণা পধা া | পা - া া া | রা মা মা মা |
ধা ০ পা০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ | শী ০ ০ ০ | পু ০ ষ ম |

১　　২　　৩　　০
পা া া পা I | মা ধা পা মা | গা মা জ্ঞা রা | মা পা পা না |
দু ০০ ম | জা ০ ম ব | ০ ন ভ রী | পু ০ স্প মা |

১　　২　　৩　　০
া না না া | নর্রা র্সনা ধনা া | র্সা া া া | পা পা পধা র্সর্রা |
০ লা হি ০ | শো০ ০০ ০০০ | না ০ ০ ০ | গা জা য়ে ০ ০ |

১　　২　　৩　　০
র্মজ্ঞা রা র্সা া | স'র্রা স'র্সা ধা র্সা | র্সণা া ধা া | মা া মা ধা
০০ ০ত্র ন | মা০ ০০ ০ ০ | রী০ ০ ০ ০ | ধা ০ ই জা

১　　২　　৩　　০
া ধা ধা ধা I পধা ণর্সা র্সণা ধা | ণা ধা পা া | রা মা রমা পধা |
০ ম ব দু ০০ ০০ ০০ ০ | ০ প ম ০ | শো ০ য়ে ০০ |

১　　২　　৩　　০
পা া পধা র্সা I পা া পধা পা | মজ্ঞা া রা া | সা সা রা রা |
০ ০ ০ ০ ০০ ০ত০ হু | প ০ ০ রি ০ | ম ব ম ব |

১　　২　　৩　　০
রা রা রা গা I মা মা পা মা | পা া পা পা | মা মা মা মা |
ন ধী ন ণ আ নি চু রা | চ ০ ন ম | গো লা ব স |

১　　২　　৩　　০
মা মা ধা পা I মজ্ঞা া রা া | া া া া | সা রা সা ধা |
হি ভ আ ০ বি ০ ০ রী ০ | ০ ০ ০ ০ | ঐ ০ ঐ ০ |

১　　২　　৩　　০
ধা ধা ধা ধা | ধা ণা র্সা ণা | ধা ণা ধপা া | রা মা মা মা |
ন ন ম রী | জা মে র বা | মে তে ঐ০ ০ | দু ন ল ক |

১ ২´ ৩ ০
। পা ধা পা । মা গা মা মা । রা জ্ঞমা জ্ঞা রা । মা পা না ।
০ প ধ স হে ০ র ন ধ ন০ ত ঠি ঊ ০ ছে ০

১ ২´ ৩ ০ ১
না । না না । না নর্রা র্সন ধনা । । র্সা । । । ধধা পা পধা র্সর্রা । র্মর্জ্ঞ । র্রা র্রা ।
আ ০ যী ধ ন্ত লা০ ০০ ০০ ০ ল ০ ০ ধ০ ০০ ০০ ০০ ০ ব ন

২´ ৩ ০ ১ ২´
র্সা । র্রা ধা । র্সণা ধা পা । মা । মা ধা । । ধা ধা ধা । ধণা র্সর্সা ণধা ণা ।
লা ০ লে লা ০০ ০ ল ০ লা ০ লে লা ০ ল ব ধু মা০ ০ ০ ০০ ঠ ।

৩ ০ ১ ২´ ৩
ধধা পধা পা । রা মা মা মা । পা পা ধা পা । মা । মা মা । মর্জ্ঞা মা জ্ঞা রা ॥ ॥
মা০ ০০ ঠি ০ ক হে ব গ ধু গী ধু প লা ০ ল ত ত০ ০ পূ র্ণী

শ্রীচৈতন্যের হোলী লীলা

ভাগবতাচার্য্য শ্রীবিজপদ গোস্বামী

ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে সুরধুনি পুলিনে সখাগণ সনে শ্রীচৈতন্যদেব বসন্ত উৎসবে মাতিয়াছেন। আবির গুলালে লালে লাল হইয়া রং-ভরা পিচকারী লইয়া পরস্পরের অঙ্গে সেচন করিতেছেন—

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।
ঋতু বসন্তে সকল প্রিয়গণ মেলি,
সুরধুনি তীরে চলিলা।
একদিকে গদাধর, সঙ্গে স্বরূপ দামোদর
বাসু ঘোষ গোবিন্দাদি মেলি।
গৌরদাস আদি করি, চন্দন পিচকারি ভরি,
গদাধরের অঙ্গে দেয় কেলি।
স্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে,
সঘনে ফেলায় গোরা গায়।
গৌরীদাস খেলি খেলি গৌরাঙ্গ জিতল বলি,
করতালি দিয়া আগে ধায়।
হরিষ স্বরূপ কয়, হারিলা গৌরাঙ্গ রায়,
জিতল আমার গদাধর।
করতালি দিয়া কেহ নাচে গায় ঊর্দ্ধ বাহু
এ দাস মোহন মনোহর।

হোলী লীলায় হার-জিতের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। ভক্তগণ দুই দল হইয়াছেন। কতকজন শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে আর কতক জন গদাধরের পক্ষে হইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যেমন শ্রীরাধাগোবিন্দের সখীগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া হোলী খেলেন শ্রীনবদ্বীপে তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরের হোলী খেলাতে সখাগণ দুই দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে গৌরীদাস পণ্ডিত হোলী খেলার সেনাপতি। ইনি ব্রজলীলায় সুবল সখা। নিজের দল বল লইয়া হোলী খেলিতেছেন। গদাধরের পক্ষে স্বরূপ দামোদর হোলী খেলিতেছেন। ইনি ব্রজলীলায় ললিতা সখী। শ্রীরাধারাণীর হোলী লীলার সেনাপতি।

গৌরীদাস নিজগণ সঙ্গে চন্দন জল ভরা পিচকারী লইয়া গদাধরের অঙ্গে মারিতেছেন আর স্বরূপ দামোদর নিজগণ সঙ্গে হাতে আবির লইয়া ঘন ঘন শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন। গৌরীদাস হোলী খেলিতে খেলিতে করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতেছেন আর বলিতেছেন—আমার গৌরাঙ্গ জিতল। গৌরাঙ্গের জয় হইল। হোর অহে স্বরূপ বলিতেছেন গৌরাঙ্গ রায় হারিয়া গেল। আমার গদাধরের জয় হইল। ওহে গৌরীদাস, তোমার বলতে লজ্জা হয় না? তোমার হারিয়া গৌরাঙ্গ গদাধরের

সঙ্গে হোলী খেলায় কোন্ কালে জিতেছে তুমি ? এ তো হরি বলে দুটি বাহু তুলে নাচা নয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদা নয়। একে বলে হোলী খেলা। কেহ দুই বাহু তুলিয়া, কেহ করতালি দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। নব বসন্তের আগমনে সকলের অন্তরে নব ভাবের উদয় হইয়াছে, বাসন্তী রঙ্গে রঙ্গিয়া গৌর নবরঙ্গিনী গদাধর সঙ্গে হোলিরঙ্গে মহামত্ত।

শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ গুরুকে শ্রীবৃন্দাবনে হোলীলীলা গুনাইতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে হোলী খেলিবার জন্যে দাঁড়াইয়াছেন। শ্রীরাধারাণীও সখীগণ সঙ্গে সারি সারি দাঁড়াইয়াছেন। তখনও হোলী-যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। একটা ছল চাই। মধুমঙ্গল সেই ছল সৃষ্টি করিলেন।

শ্রীরাধারাণীর সখীগণের মধ্যে একজন দূতী আসিয়া বলিল—কৃষ্ণ, তুমি শ্রীরাধারাণীর সাম্রাজ্য প্রজা হইয়া তাঁহার সম্মুখে কোন্ সাহসে রাজছত্র মাথায় ধরিয়াছ ? শীঘ্র ত্যাগ কর, নতুবা যুদ্ধ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিলেন না। হোলীযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে মত্ত হইল। গৌর গদাধরের প্রবল হোলী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহা হেরিয়া আনন্দধ্বনি উঠিল হরিবোল হরিবোল।

বন্যাকন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে। সে কিনা বড়লোকের মেয়ে দরিদ্রকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু ঘোষ নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়ার মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার কার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা অজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া যখন পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল।

যাবার আগে ছোটবৌদি শাশুড়ীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—সকলকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক শীযুষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ড্রাগে হর্ষিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস্ দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সাহিত্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে ফ্ল্যাটটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্যাতন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে হৃদয় জুড়াই। সন্দীপের কথা মনে পড়ল। সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা

অনুযায়। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা দিতে। হিমাংশু নিলনা, বললে, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে দেবে সেদিন খাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে তার চুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে ফুল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বস-এর পাল্লায় পড়ে সুবীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে শেখাল মদ খেতে। একটা কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুবীর আর নিজের সর্ত পালন করল না। বিরোধ ঘুঘায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুবীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু মাতলামির পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে নষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হলনা। তখন কুমারী সেজে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কমলেশ তার কি যাবৎ এমন এক জিনিস দাবি করল যাতে সে রাজি হতে পারল না।

সেবারের পার্টিতে হিমাংশু বেশিকরে মদ খাইয়ে সুবীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম লাবণি, তাকে বলে দিল যেন সুবীরকে একেবারে তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুবীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুবীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্দীপ সেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে। নিজে ধরা পড়ে যাবার হুকম চটে গিয়ে সুবীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুবীর বনছায়ার কাছে ক্ষমা প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে অনুরোধ করল হিমাংশুকে ধরে তাকে বদেতে উচ্চতর পদে বদলি করিয়েদিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্দীপের অন্তরলোকে দ্বন্দ্ব সুরু হল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শক্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সে উদাসীন থাকতে

পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে সুবীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্দীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের বাঁটোয়ারা হয়ে গেল—এক ঘরে সুবীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুবীর তার ঘরে একটা ক্লাব বসাল যাতে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। লেখার জন্যে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্দীপেরই দ্বারস্থ হল। দেখল সন্দীপ সযত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠায় সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্দীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্দীপের বাড়িতে বসে উপন্যাস নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক পীযূষ দত্তের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল পীযূষ। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখে গিয়েছি।

বনছায়া পীযূষের সঙ্গে হোটেলে মদ খেল, এক ট্যাক্সিতে বেড়াল। তার উপন্যাস 'অবগুণ্ঠনা' 'প্রবাহ' পত্রিকার জন্যে মনোনীত হল। তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে সুবীর গর্জে উঠল: তুমি মদ খেয়েছ? বনছায়া বললে, তুমিই তো শিখিয়েছ মদ খেতে।

বনছায়ার উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই পাঠকমহলে সাড়া পড়ল। কিন্তু সুবীর খুশি হতে পারল না। জানতে চাইল কোথায় বসে সে নতুন করে লিখেছে এবং কী উপায়ে বাগিয়েছে পীযূষ দত্তকে। বনছায়া বললে, অফিসে বসেই লিখেছে, আর যেহেতু পীযূষ দত্তের রুচি কিছু মোটা, তদবিরটা সে মোটা করেই করেছে। রাগে 'প্রবাহে'র কপি ছিঁড়ে ফেলল সুবীর আর তার অক্ষম ঈর্ষাকে ব্যঙ্গ করল বনছায়া। লেখাটা পড়ে হিমাংশু খুব উত্তেজিত হল। সুবীরকে তাকিয়ে বলল, এ অশ্লীল লেখা বন্ধ করে দিন। সেবকাজে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার কার্যের না বদনাম হয়।]

উনত্রিশ

তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাবে সেই কথাটাই দেবজ্যোতিকে বলতে এসেছিল বনছায়া, কিন্তু চেয়ারে বসে কথাটা গুছিয়ে বলবার আগেই তার শরীর নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ল।

হঠাৎ নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে করলেও দেবজ্যোতি ঘাবড়ালেন না। ত্বরিত ব্যবস্থা করলেন। ফোন করে নার্স আনালেন। তাকে সঙ্গে দিয়ে নিজের গাড়ি করে পাঠিয়ে দিলেন নার্সিং হোমে।

'তোমার স্বামীর নাম জানি কী?' গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে দেবজ্যোতি জিজ্ঞেস করেছিলেন।

নামটা উচ্চারণ করতে ইচ্ছে করল না বনছায়ার। দেবজ্যোতি ভাবলেন যন্ত্রণার ঘাবঘানে তাঁর প্রশ্নটাই বুঝি শুনতে পায়নি।

কিন্তু অন্য উপায় নেই। দেবজ্যোতি হিমাংশুকে ফোন করল।

হিমাংশু শোনামাত্রই চিনতে চায় না কে বনছায়া বসুমদার। স্বামীকে ডেকে দিতে বলছেন, স্বামীর নাম বলুন।

'স্বামীর নাম জানিনা বলেই তো আপনাকে খুঁজে নিতে বলছি।' একটু বুঝি বিরক্ত হলেন দেবজ্যোতি: 'আপনি বলবেন তার স্ত্রীকে মিউ-জন নার্সিং হোমে রিমুভ করা হয়েছে। কণ্ডিশন খুব ভালো নয়।

'কার কতদিনের কথা কাকে বলব, মুস্কিলে ফেললেন। কেন, কী হয়েছে? হার্ট-অ্যাটাক?'

'স্বামীকে বললেই সে বুঝতে পারবে।'

'দেখছি খুঁজে পাই কিনা। ভদ্রমহিলার কী নাম বললেন?'

এবার দেবজ্যোতি রুঢ় হলেন: 'আহা, সেই ভদ্রমহিলা যাকে বিয়ে করবার জন্যে আপনার একদিন হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল। আপনাকে ধোঁকা দিয়ে যে আপনার অফিসের এক কেরানিকে বিয়ে করেছে বলে আমার কাছে ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন—' পুরোনো কথা মনে করিয়ে দিতে চাইলেন দেবজ্যোতি: 'না, ভুল হয়েছে, ভদ্রলোককে চাকরি দিলে আপনাকে বিয়ে করবে এই ভাঁওতা দিয়ে ভদ্রলোকের জন্যে চাকরি বাগিয়ে নিয়ে আপনাকে প্রতারণা করেছে—কী, মনে পড়ছে? সেই ভদ্রলোক। সে কি এখনো চাকরিতে আছে, না কি ডিসমিস করেছেন?'

'এখনো করিনি।' হিমাংশুকে অত্যন্ত ক্রূর শোনাল।

'তবে তাকে দয়া করে খবরটা দেবেন। নিউ ডন নার্সিং হোম—'

'আমি আর ওতে ইন্টারেস্টেড নই।'

'ও কোনো ইন্টারেস্টের প্রশ্ন নয়। একটা বিপন্ন মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন।'

হিমাংশু রিসিভার নামিয়ে রাখল।

অবশ্য ভালো নয়, তার মানে, কদিনী মারা যাবে নাকি? গেলে যাবে, গরিব-বড়লোক কত লোকই তো মুহুর্মুহু মরছে, বাড়িতে, হাসপাতালে, ফুটপাথে—যেখানে-সেখানে। বরং মরে গেলেই তো শিক্ষা হয়। চোখ বোজবার আগে অন্তত একবার বোঝে কী পদার্থবানকেই সে নির্বাচন করেছিল! মরে গেলে অন্তত একটা সর্বগ্রাসী যন্ত্রণার থেকে রেহাই পাবে হিমাংশু। আর কিছু না হোক, এক লাথি মেরে সুবীরকে চাকরি থেকে বার করে দিতে পারবে।

মনের ছেলেমানসিতে নিজেই আবার হাসল। মরে গেলে আর শিক্ষা পাবে কী করে? শিক্ষা যে পাচ্ছে তাই বা উপভোগ করা যাবে কী করে? আর শরীরের এমন কী জটিল মামলা যা দশজন ডাক্তারি মোকাবিলা করতে পারবে না? আর একজনকে চাকরিতে পাকাপাকি বসাবার পর সহসা তাকে আউট করে দেওয়া কি মুখের কথা?'

না, বাঁচুক। ভুগুক। বুঝুক। কষ্টে পড়ে, কষ্টে থেকে সে হিমাংশুকে সুখী করুক।

তাই বলে খবরটা এখুনি সুবীরকে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। অবশ্য খারাপ তো সে কী করবে? তাকে তো কদিনীর কাছে এখন যেতেই দেবে না, ভিজিটিং আওয়ার্সের মধ্যেও দেবে কিনা তার ঠিক কী। এখন খবর দেওয়া মানে তাকে অকারণে উদ্যত করা। অফিসের কাজে ছন্দপতন ঘটানো।

তাই বেশ কয়েক ঘণ্টা পার করে বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় সুবীরকে ডাকল হিমাংশু। মুখে প্রশস্ত হাসি নিয়ে সংবর্ধনার সুরে বললে, 'কী খাওয়াবেন বলুন।'

সুবীর প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। পরে সামলিয়ে নিয়ে বললে, 'চিরকাল তো আপনিই খাইয়েছেন, আমি খাওয়াই আমার এমন স্পর্ধা কী।'

'এ মনাই একা আপনার সুসংবাদ।' হিমাংশু মুখের হাসিটাকে বাঁচিয়ে রাখল: 'এতে আমার কোনো কনট্রিবিউশান নেই।'

'সুসংবাদ!' শব্দটা যেন নতুন শুনছে এমনি নিরর্থক ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাল সুবীর।

'সুসংবাদ মানে সুসংবাদের সম্ভাবনা।'

'আমি কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি না।'

'নিউ ডন নার্সিং হোমে যান, বুঝতে পারবেন। দেখবেন আপনার স্ত্রী আপনার জন্যে কী উপহার সাজিয়ে রেখেছেন।'

'উপহার!'

'হ্যাঁ, একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন যে, সন্তান উপহার নয়? ছেলে হোক মেয়ে হোক, সন্তান উপহার। কিন্তু আমি বলছি, নিউ ডন নার্সিং হোমে গেল কেন? আপনার স্ত্রী, আপনার অফিসের নার্সিং হোমে ভর্তি হবে। একটা প্রেস্টিজ তো আছে।'

মুখ ঘুরিয়ে সুবীর বললে, 'আমি আর ওসবে ইন্টারেস্টেড নই।'

একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। মনের ছোট্ট খুশির ঢেউটা বাইরে ফুটতে না দিয়ে হিমাংশু বললে, 'কিন্তু শুনছি কেসটা কমপ্লিকেটেড। পেশেন্টের কণ্ডিশন ভালো নয়—'

এতেও যেন সুবীর আগ্রহান্বিত হল না। কোত্থেকে শুনেছেন, কে কখন কস্তুরিকে হোমে ভর্তি করাল, না, কি কস্তুরি নিজেই হাজির হল পায়ে হেঁটে, কোনো সংবাদেই তার কৌতূহল নেই। সব চেয়ে আশ্চর্য, উদ্বেগের কালো ছায়ার মধ্যে পড়েও এতটুকু উচাটন হলনা। হিমাংশু যেমন ভেবেছিল তেমনি ধরেই উত্তর দিল। বললে, 'কণ্ডিশন খারাপ তো আমি কী করব! আমি কি ডাক্তার?'

উদার হাওয়ায় সমস্ত কুণ্ঠাকার্পণ্যের কুয়াশা উড়িয়ে দিয়ে হিমাংশু বললে, 'আপনি ডাক্তার হতে যাবেন কেন? আপনি এঞ্জিনিয়র, আপনি আর্কিটেক্ট। যান, ঠিক আছে, পাকা খবরটা আমাই, আমিই সেলিব্রেট করব, আমিই খাওয়াব। লাবণিকে ডাকি। অনেক দিন তার খবর নেই।'

'নতুন কোন এক জিনিসের স্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত আছে।'

হিমাংশু সূক্ষ্ম করে একটু হাসল। তার মানে ঘরের খবরে উৎসাহ নেই যত উৎসাহ অ-ঘরের খবরে।

সুবীরকে বিদায় করে দিয়েই অভিরামকে ডাকল।

'কী হয়েছে?'

মুখ ঘোরালো করে নিচু গলায় অভিরাম বললে, 'এবার তুমুল হয়েছে।'

কৌতূহলে মন হয়ে উঠল হিমাংশু: 'কী হয়েছে? মারধোর?'

'অতটা হয়েছে কিনা জানিনা। অন্তত আমার চোখের সামনে দেখিনি—'

'তবে

'তবে বিস্তর গালাগালি, চেঁচামেচি, গালাগালও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাবু মাকে বললেন, আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও এক্ষুনি। যেখানে ঘর নিয়েছ সেখানে থাকো গে।'

'সে আবার কী কথা। তোমার মা কী বললেন?'

'বললেন, যাচ্ছি তোমার বস বোস-সাহেবের কাছে নালিশ করতে। দেখি তোমার এই জুলুমবাজির শাসন হয় কিনা।'

কই আর আমার কাছে এল! একটা নিশ্বাস চেপে গেল হিমাংশু। জিজ্ঞেস করল: 'ও ঘটনা ঘটেছে কবে?'

'পরশু।'

তার মানে, হিমাংশু হিসেব করে দেখল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্যত্র থাকতে বললেও বনছায়া বাড়ি

ছাড়েনি। আজও সে অফিসে এসেছে বাড়ি থেকেই। দুজন একই ছাদের নিচে ঐ লোকটাকে পাশে রেখে রাত কাটিয়েছে, একই বাথরুম ব্যবহার করেছে, কে জানে টেবিলে পাশাপাশি বসে খেয়েছে একই অফিসের খাওয়া।

'এত অপমান সয়ে একত্র থাকার মানে কী?'

'অপমান বলে অপমান!' অভিরাম ব্যথিত মুখে বললে, 'শুধু বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বলা —সন্দীপ সেনের সঙ্গে গিয়ে থাকো।'

'কে—কার সঙ্গে গিয়ে থাকো?'

'সন্দীপ সেন। এখন সমস্ত ঝগড়া তো ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে।'

'কে সন্দীপ সেন?'

'শুনেছি নাম-করা লেখক, কোন বই যেন সিনেমায় হয়েছে।' অভিরাম লক্ষ্য করল হিমাংশুর মুখ বিশেষ উজ্জ্বল হল না, তাই স্বর আগের চেয়েও অস্ফুট করে বললে, 'মায় বন্ধু। মাঝে মাঝে আসেন। লেখা-টেখা নিয়ে মাঝে সাহায্য করেন। তার দরুণই বাবু গায়া।'

'খারাপ হওয়াই তো স্বাভাবিক।' মুহূর্তে হিমাংশুর মনোভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল: 'যখন তাড়িয়েই দিল, তখন ধরজায় একেবারে তালা লাগিয়ে দিলনা কেন? আবার ঢুকতে দিল কোন বিবেচনায়?'

সাহেব মার বিরুদ্ধে যাবেন এ যেন অভিরামের ভাবনার বাইরে ছিল। তাই মূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল, ব্যাপারটা যে সে ভালো করে বোঝাতে পারল না সেই অপরাধবোধে।

'শোনো।' হিমাংশু কর্তৃত্বের সুরে বললে, 'তোমাকে আর ঐ পাপের বাড়িতে কাজ করতে হবে না। ঐখানে তোমার কাজ করার মানে হবে পাপকে সাহায্য করা। আমি এ হতে দিতে পারি না। কাল থেকে —না, আজ বিকেল থেকে তোমার ও বাড়ির থেকে ছুটি।'

এও যেন অভিরামের কাছে দুঃসংবাদ।

'হ্যাঁ, যেখানে স্বামী-স্ত্রীতে নিত্যি ঝগড়া, ঘরে ঘরে পার্টিপান করা, মদ খাওয়া, বাইরে লোকজনের আসা যাওয়া, সে সংসার পাপের নয় তো কী। তাছাড়া এ সংসার তো এখন টেঁসে যেতে বসেছে। নার্সিং হোমে তোমার মার এখন-তখন অবস্থা। টিঁকবে কিনা ডাক্তাররা বলতে পারছে না। যদি টেঁকেও, কদ্দিনে ভালো হয়, কদ্দিনে ছাড়া পায়—সমস্ত অনিশ্চিত। তারপর ছেলে কোলে নিয়ে কোথায় গিয়ে ওঠে, কোন বাড়িতে, কার বাড়িতে, তাতে আর আমাদের ইন্টারেস্ট নেই। যেখানেই উঠুক, আমাদের ছুটি মিলে গিয়েছে।'

সাদা মুখে দুশ্চিন্তা মেখে অভিরাম চলে গেল।

কিন্তু অভিরামের ছুটি মিলে গেলেও হিমাংশুর কি ছুটি আছে? কে এ সন্দীপ সেন? কে এ আবার নতুন শত্রু? সে আসে কোন সুবাদে? তার কী অধিকার?

প্রেমের বিয়ে না প্রেমের বিয়ে! তারপরেও আবার প্রেম। আবার সেইখানে জোট বাঁধলে আবার ছটফটানি। আবার হাত বাড়ানো।

কিন্তু সন্দীপ সেনের অহঙ্কারের ভিত্তি কি? কিসে সে মূল্যবান? কিসে সে অধিকারী?

যাই খোঁজ নিয়ে আসি। এক ক্যাকড়া কাটি তো আরেক ক্যাকড়া গজিয়ে ওঠে।

কয়েক সপ্তাহেই সাহিত্যের হাটে 'অবচেতনা' নিদারুণ রোল তুলল। 'প্রবাহ' কাটতে লাগল হু-হু করে।

সুবীর সেদিন হন্তদন্ত হয়ে 'প্রবাহের' অফিসে এসে হাজির।

সুইং-ডোর ঠেলে শীষুষ হলের কামরায় ঢুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে, 'চিনতে পারেন?'

অন্য লোক বা অন্য সময় হলে চিনতে নিশ্চয়ই আপত্তি করত শীষুষ, কিন্তু বনছায়ার প্রেক্ষিতে সব অর্থ কথাই মনে হল। এক নজর তাকিয়েই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'আপনাকে চিনব না? আমার বাড়ির ছাদে আপনাদের বিয়ের পার্টি হল আর আমি তা ভুলে যাব? সত্যি—বসুন—কী মার্ভেলাস লিখছে বনছায়া—তুলনাহীন।'

মুখোমুখি চেয়ারে না বসে পাশের চেয়ারে বসল সুবীর। বললে, 'ও সব যদ খেয়ে লেখা।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল শীষুষ: 'আমরাও তো মদ খাই, কিন্তু কই লিখতে পারি কৈ? মদ না খেয়ে যারা মদ খায় তারাও বা কী লেখে!'

'শুনুন, একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।' সুবীর ঘনতর হল: 'ঐ লেখাটা বন্ধ করে দিতে হবে।'

'বন্ধ করে দেব? অবশ্যই বন্ধ হয়ে যাবে? কারণ কী দেখাব?'

'ঐ যা আপনারা দেখান—অনিবার্য কারণবশত, কিংবা লেখিকার অসুস্থতা নিবন্ধন—'

'ওসব কারণ চলবে না। আদ্যোপান্ত সমস্ত কপি আমার হাতে। কিন্তু,' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল শীষুষ: 'বন্ধ করার কথা উঠছে কেন? স্বয়ং লেখিকা তো কিছু বলছেন না।'

'আমি—আমি লেখিকার স্বামী—আমি বলছি।'

'এ ক্ষেত্রে লেখিকা একাকিনী। বনছায়ার স্বামী থাকতে পারে কিন্তু লেখিকার স্বামী নেই।'

'শুনুন,' সুবীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর করল: 'টাকা দেব। যে টাকা ওর প্রাপ্য তা দিতে হবে না আর ঐ টাকার সমান টাকা বাড়তি দেব আপনাকে।'

'টাকা!' আবার হাসল শীষুষ: 'টাকা নিয়ে অনেক কুকর্ম করেছি বটে, বাজে লেখা ছাপিয়েছি, ছবি ছাপিয়েছি—সে সব শুনে আপনার লাভ নেই, কিন্তু টাকা নিয়ে কাউ লেখা বন্ধ করেছি এমন কখনো হয়নি। বন্ধ করে লেখিকাকে বলব কী?'

'বলবেন দুঃখিত, কপি খুঁজে পাচ্ছি না, প্রেস থেকে কপি হারিয়ে গিয়েছে, কিংবা আপনার স্বামী জোর করে কেড়ে নিয়ে গিয়েছেন।'

এবার মৃদু-মৃদু হাসল শীষুষ। বললে, 'এ আরো অসম্ভব। কিন্তু,' কণ্ঠস্বরে অন্তরঙ্গতার স্পর্শ আনল: 'কিন্তু লেখাটায় আপনার আপত্তি কেন?'

'লেখাটা অশ্লীল।'

'কী বলেন! জীবনযন্ত্রণা কখনো অশ্লীল হতে পারে?'

'এটা আমার পক্ষে—আমার চাকরির পক্ষে, আমার কার্যের পক্ষে মারাত্মক। ওর ঐ কদর্য লেখায় আমার চাকরি বিপন্ন হতে চলেছে।'

'এমন কখনো শুনিনি। একের লেখায় অন্যের চাকরি যাবে এমন আইন কোথাও আছে বলে জানি না।'

'গোড়াতেই এই, পরে আরো কত না জানি অবজ্ঞতা আছে।'

'তা আছে হয়ত।' শীষুষ চোখ কুঁচকোল: 'আপনি পড়ে দেখেন নি?'

'এক পৃষ্ঠাও না।'

'সে কি, আপনাকেই পড়ায় নি?'

'কবে যে বই লিখল তাই আমি জানিনা।'

'বলেন কী, এত বড় বই, ছাপলে অন্তত পাইকার প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠা হবে, সমস্ত আপনার চোখের বাইরে বসে লিখল? ও হ্যাঁ, পীযূষ অতীত স্মৃতির উপর চোখ বুলোচ্ছে এমনি আনমনে কোমলকণ্ঠ হল: 'আমাকে বলছিল বটে সমস্ত সে লক্ষীপ সেনের বাড়িতে বসে লিখেছে। আগে মনোমত হয়নি বলে সে পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলেছিল, পরে লক্ষীপ সেনের অনুরোধে সব ছেঁড়া টুকরো জড়ো করে আঠা দিয়ে সেঁটে সেটাকে নতুন করে reconstruct করল—ধন্য লক্ষীপ সেনকে, সে না থাকলে ঐ জিনিস বাঁচত না—চিরকালের জন্যে হারিয়ে যেত—'

'পাণ্ডুলিপিটা আমি একবার দেখতে পারি?' এগিয়ে এল সুবীর।

'মাপ করবেন। সেটা সম্ভব নয়।'

সুবীর আবার পুরোনো কথায় ফিরে এল: 'যাক গে, ওটা আগাগোড়া লক্ষীপ সেনেরই হাতের লেখা কিনা সে পরীক্ষার কাজ নেই। আমি বলছি, কত হলে ঐ লেখাটা বন্ধ করে দিতে পারেন?'

'কোনো টাকায় নয়। কোনো কিছুতে নয়।' পীযূষ দৃঢ় হল: 'আমি এমনিতে যতই কেননা শিথিল হই, সাহিত্যের প্রতি দায়িত্বের চেতনায় আমি একটু নিষ্ঠুর।'

'সাহিত্যের প্রতি দায়িত্ব বলছেন, কিন্তু সমাজের প্রতি আপনার দায়িত্ব নেই?'

'আছে, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু জানেন তো, সমাজের চেয়েও সাহিত্য বড়, সাহিত্য বেশি। সাহিত্য তো শুধু বর্তমান সমাজকেই দেখে না, ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি আঁকে। বর্তমান আয়তনে ছোট কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় বড় এমন জীবনের, এমন সমাজের পরিচয় যে সাহিত্য আছে তার প্রকাশের সুযোগ পেলে আমি পেছ পা হব না। আমি মনে করি 'অবন্ধনা' সেই বৃহত্বের দাবি নিয়ে এসেছে। আমার কোনো অধিকার নেই দেশকে এই নতুন সম্পদ থেকে বঞ্চিত করি।'

'কিন্তু যেখানে সেটা একটা পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চলেছে, একজনকে বেকার করতে বসেছে, সেখানে আপনি বন্ধু হয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না?'

'বন্ধু আমি তো শুধু একা আপনার নই, আমি লেখিকারও বন্ধু।' পীযূষ জয়ীর মত হাসল: 'আপনার বন্ধু শুধু ব্যক্তি পীযূষ দত্ত আর বনছায়া বা লেখিকার বন্ধু দুজন, ব্যক্তি পীযূষ দত্ত আর সম্পাদক পীযূষ দত্ত। তাই ওঁর দিকে পাল্লা ভারী, তাই ওঁর দাবিই অগ্রগণ্য।'

'ওর আবার দাবি কিসের? ওকে আপনি ডাকুন, বলুন সব বুঝিয়ে। আপনার ভাবল পার্সোনালিটি দিয়ে ওকে ইনফ্লুয়েন্স করুন। ওকে বলুন বইটা উইথড্র করে নিতে।'

'আমি ওকে বলেছি।'

'বলেছেন? ও কী বলল?'

'বলল, স্বামী পুত্র পরিবার সমাজ-সংসার সমস্ত কিছুর চেয়ে ওর আর্ট বড়। আরো বলল, আর সব ও ছাড়তে পারে কিন্তু আর্ট ছাড়তে পারে না।'

'না, আপনি বলেন নি।'

'যদি না বলে থাকি, তবে ঐ উত্তর পাব বলেই বলিনি। সুতরাং ও লেখা চলছে, চলবে।'

'কিন্তু পুলিশ দিয়ে যদি ও লেখা বন্ধ করা যায়?' সুবীর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

'পুলিশ দিয়ে কত কিছুই তো বন্ধ করা যায়।' পীযূষও উঠে পড়ল: 'পুলিশ দিয়ে তো আপনাকেও বন্ধ করা যায়।'

'আচ্ছা দেখা যাক কে কাকে বন্ধ করে।' সুটং-কোট ঠেলে বেরিয়ে গেল সুধীর।

পরদিন বিকেলে বনছায়া যখন বেরুচ্ছে তখন সুধীর তার এলাকা পেরিয়ে একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল: 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'সেটা কি নিতান্তই তোমাকে বলতে হবে?'

'না, দরকার নেই। কেননা কোথায় যাচ্ছ তা আমি জানি।'

'জানো তো জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'জিজ্ঞেস করছি, সত্যকথা বলবার মত তোমার সাহস আছে কিনা।'

'নিশ্চয় আছে। যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে।'

'সে ডাক্তারের নাম সন্দীপ সেন।' সুধীর রাগে ঘৃণায় ঝি-ঝি করে উঠল: 'যার কোলের কাছে বসে অবন্তনা হলে।'

'অবন্তনা হতে যাব কেন? অবন্তনা লিখলাম।'

'তুমি তো জীবনশিল্পী—লিখতে লিখতে হয়ে ওঠা। অবন্তনা লিখতে লিখতে অবন্তনা হয়ে যাওয়া। তবে আর কী, এ বাড়িতে আর ফিরো না, তোমার সন্দীপ সেনের সঙ্গে গিয়েই থাকো।'

'কার সঙ্গে থাকব, কবে ও কোথায় ফিরব সে তোমার কাছে পরামর্শ নেব না। পথ ছাড়ো বলছি।'

পাশ দিতে বনছায়া এগিয়ে যাচ্ছে, সুধীর হঠাৎ তার হাত চেপে ধরল: 'কিন্তু তোমার পেটে এ ছেলে কার?'

সবেগে হাত ছাড়িয়ে নিল বনছায়া। বললে, 'কারু নয়—আমার।'

লিফট তর নার্সিং হোমে একটু রাত করেই গেল হিমাংশু।

প্রথমেই দেখতে পেল অভিরামকে। ওয়েটিং রুমে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে।

'বাবু আসেনি?' ইশারা করে অভিরামকে বারান্দায় ডেকে এনে জিজ্ঞেস করল হিমাংশু।

'কই দেখতে পাচ্ছি না।'

'মার অবস্থা কী?'

'অপারেশন হয়েছে—এখনো জ্ঞান ফেরেনি।'

'সন্তান?'

'ছেলে—'

'ছেলে?'

'বেঁচে নেই। মরা ছেলে হয়েছে।'

'ঐ ভদ্রলোক কে?'

'ঐ ভদ্রলোকই তো সন্দীপ সেন।' অভিরাম উজ্জ্বল মুখে বললে, 'রক্ত দিয়েছেন।'

হিমাংশুর হঠাৎ খেয়াল হল সে এখানে এসেছে কেন? তার কী কাজ? অপারেশানের পর বনছায়ার জ্ঞান ফেরে কি না ফেরে তাতে তার কী যায় আসে?

'জ্ঞান ফিরে এলে মাকে বোলো যে আমি এসেছিলাম।' (ক্রমশঃ)

'কল্লোল' ও 'কালি-কলম'

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'কল্লোল' বেরুবে। গল্প চাই।

প্রবাসীর জন্য একটি গল্প লিখেছিলাম। চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করে গল্পটি তাঁর হাতে দিয়ে আসবো ভেবেছিলাম। দেখা করতে গেলাম, দেখাও হলো, কিন্তু গল্পটি দিতে পারলাম না। সে গল্প তখন চলে গেছে কল্লোলে।

কল্লোলের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রথম গল্প ছাপা হয়েছে দেখলাম আমার সেই গল্পটি।

গল্পটির নাম ছিল—'মা'।

সাহিত্যের নেশা তখন পেয়ে বসেছে আমাদের।

দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছে মনে। ইংরেজি বই কিনতে গেছি 'বুক কোম্পানী'র দোকানে। সেখানে দেখি ইংরেজি বইএর অরণ্যের ভেতর দাঁড়িয়ে কে একজন ক্রমাগত বইএর পর বইএর পাতা উল্টে চলেছে। উঁচু-উঁচু কাঠের র‍্যাকের ওপর থাকে থাকে বই সাজানো। মাঝে শুধু একটা মানুষের চলবার পথ। সেই পথের ওপর দাঁড়িয়ে ছেলেটি বই পড়ছে।

হ্যাঁ ছেলে বই কি! বয়স তখন তার কুড়ি-বাইশের বেশি নয়।

চোখে-মুখে তার একাগ্র তন্ময়তা। গৌরবর্ণ প্রিয়দর্শন পাতলা ছিপছিপে ছেলেটিকে দেখে মনে হয়েছিল কলেজের ছাত্র।

আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে বই দেখছি। ছেলেটির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার হাতের কাছে সব দর্শনের বই। নাটক, নভেল গল্পের বই দেখতে হলে তাকে পেরিয়ে যেতে হবে। অথচ তার ধ্যান ভঙ্গ করতে ইচ্ছে করছে না। বই দেখতে এসে তারই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মন্দ লাগছে না।

হঠাৎ একসময় সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। বুদ্ধিদীপ্ত দুটি টানা-টানা চোখ। অযত্নবিন্যস্ত মাথার বড় বড় চুল কপালে এসে পড়েছে। মুখখানি সুন্দর। জিজ্ঞাসা করলে, বই দেখবেন?

বললাম, হ্যাঁ, গল্পের বই দেখবো।

—এখানে নয়। আসুন এইদিকে।

ছেলেটি দেখলাম দোকানে কোথায় কি বই আছে—সব জানে।

আমাকে নিয়ে গেল সে কন্টিনেন্টের বইএর র‍্যাকে। ঠিক যেখানে যেতে চেয়েছিলাম সেইখানে। লেখকের নাম, বইএর নাম—সব তার কণ্ঠস্থ।

—এইটে রাশিয়া। এই দেখুন টলষ্টয়, গোর্কি, গোগোল, ডস্টয়ভস্কি, শেখব, টুর্গেনিভ—কি চাই বলুন।

চাই তো সব। ক'খানা বইই-বা পড়েছি!

এটা দেখছি, ওটা দেখছি, তন্ময় হয়ে গেছি বই দেখতে দেখতে, মনে হচ্ছে সবই কিনি।

কিন্তু এত টাকা কোথায়?

ছেলেটি হঠাৎ বলে উঠলো, পেয়েছি।

বলেই সেই কাঠের র‍্যাক্ থেকে মোটা-মোটা চারখানা বই টেনে নামালে। —এই চারখানা বই নিন্ আপনি। পড়তে সময় লাগবে। তা লাগুক্। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যাবেন।

লেখকের নামটি দেখতে চাইলাম।

ছেলেটি বললে, সাডিস্লা রেমন্ট। পোল্যাণ্ডের লেখক। মনে হচ্ছে ইনি এবার নোবেল্ প্রাইজ্ পাবেন।

—কত দাম?

ভেবেছিলাম—একখানা বইএর দাম আর কত হবে?

কিন্তু দাম শুনে চক্ষুস্থির! তিরিশ টাকা।

—একখানা তো নয়। একখানা বই—চার ভল্যুমে লেখা। সামার, অটাম্, স্প্রিং আর উইন্টার। বইএর নাম—দি পেজেন্ট্স্!

বললাম, আজ অত টাকা নেই আমার কাছে। দুটো নেওয়া যাক্, পরে দুটো নিয়ে যাব।

সেদিন দুখানাই নিলাম। সামার আর অটাম্। বাকি দুখানা পরে অবশ্য নিয়েছিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য ছেলেটির দূরদৃষ্টি। সে-বছর সাডিস্লা রেমন্টই নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

ছেলেটি আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়েছি একসঙ্গে। মন্দ লাগছে না ছেলেটিকে।

দুজনে চায়ের দোকানে এসে বসলাম। চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম?

ছেলেটি বললে, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আমার নামও সে জানতে চাইলে। বললাম।

আমার নাম শুনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ যখন বললে, আপনার কয়লাকুঠির গল্প আমি পড়েছি, তখন সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। তখন আমার ক'টা লেখাই বা ছাপা হয়েছে!

কিন্তু আশ্চর্য, আমাকে আর-একবার অবাক করে দিয়ে বললে, নতুন একখানা কাগজ বেরিয়েছে—'কল্লোল'। তাতেও আপনার একটি গল্প দেখলাম।

কল্লোল তখন এক সপ্তাহ বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ।

আমার গল্প তার কেমন লেগেছে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু লজ্জায় জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না।

সে নিজেই বললে, গল্প লেখার হাত আপনার আছে।

বলেই সে তার স্বপ্নময়ি চোখ দুটি বন্ধ করে কি যেন ভাবলে। তারপর চোখ খুলে বললে, আরও ভাল লিখতে হবে।

রেমন্টের বই দুখানা ছিল হাতের কাছে নামানো। বললে, এই বইগুলো পড়ে ফেলুন। পোল্যাণ্ডের

চাষীদের গ্রাম দেখবেন। মাটির গন্ধ পাবেন। আর পরিচয় হবে আপনার সেখানকার অপরিচিত মানুষগুলির অবিকৃত জীবনরসের সঙ্গে। দেখবেন কেমন করে গল্প বলতে হয়। পথ খুঁজে পাবেন।

সুপেন্দ্রকৃষ্ণকে নিয়ে গেলাম 'কল্লোল' আপিসে।

কল্লোলের হলে আর-একজন বাড়লো।

এইবার মুরলীদার কথা বলি।

মুরলীদা মানে মুরলীধর বসু। আমাদের সবচাইতার দাদা।

কল্লোলের পর আমরা আর-একখানি সাহিত্য-পত্রিকা বের করেছিলাম। তার সম্পাদক ছিলাম আমরা তিনজন। এই মুরলীদা, প্রেমেন আর আমি।

মুরলীদার সঙ্গে আমার পরিচয় কেমন করে হলো শুনুন।

আমি তখন বীরভূমের রূপসীপুর গ্রামে। মনের আনন্দে লিখবো বলে চলে গেছি বীরভূমের এই অখ্যাত গ্রামটিতে। বীরভূমের একেবারে পশ্চিম প্রান্তসীমায়, সাঁওতাল-পরগণার গায়ে। ছোট্ট গ্রাম, উঁচু নীচু ঢেউ-খেলানো মাটি, দক্ষিণে শাল তাল তমাল মহুয়া আর হরীতকীর জঙ্গল। গ্রামটি দেখতেও ভাল, গ্রামের নামটিও ভাল।—রূপসীপুর। কিন্তু রূপসীর দেখা সেখানে কদাচিৎ এক-আধটা মেলে।

সেখান থেকে গল্প পাঠাই, কলকাতার পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়, কেউ-বা কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেন, কেউ-বা দেন না।

এখন অবশ্য রূপসীপুর গ্রামে পোষ্টাপিস হয়েছে; কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখন গ্রামে পোষ্টাপিস ছিল না। তখন পাঁচ ক্রোশ দূরে পোষ্টাপিস। সেখান থেকে পিওন আসে সপ্তাহে মাত্র দুদিন। কাজেই লেখা পাঠাবার জন্য মাঝে-মাঝে নিজেকেই যেতে হয় পোষ্টাপিসে। না গেলে মনিঅর্ডার পেতে পেতে দু' তিন হপ্তা দেরি হয়ে যায়। ভাল ভাল পত্রিকাগুলি তো পাওয়াই যায় না।

আবার সেখানেও এক বিপদ। বুড়ো এক ভদ্রলোক তখন পোষ্টমাষ্টার। সব সময়েই দেখি দরজা বন্ধ। ঘরে খিল বন্ধ করে তিনি কাজ করেন। সরকারী কাজ। ভুল হবার তো নেই। জানলার পথে উঁকি মেরে কিছু বললেই খেঁকিয়ে ওঠেন। বলেন, কাজের সময় বিরক্ত কোরো না। দাঁড়াও।

আধ ঘণ্টার আগে কোনোদিন তিনি দরজা খুলেছেন বলে তো মনে পড়ে না।

দুপুরে গেলে এই, বিকেলে যদি যাই তখন আবার আর-এক ঝঞ্ঝাট। প্রায়ই দেখি, ঘোরে তালা বন্ধ করে তিনি কোনোদিন ধান ছাগল খুঁজতে, আবার কোনোদিন-বা দেখি থানার দারোগার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন।

'দয়া করে একবার আসুন' বলবার তো নেই। তক্ষুনি জবাব দেবেন—আমি কারও বাবার চাকর নই।

প্রায়ই যাই, মুখ-চেনা হয়ে গেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে—আসেন শেষ পর্যন্ত। ঘোর খুলে দিয়ে বলেন, খাটের তলায় আছে, নিয়ে যা। দেখিস্ যেন আর কারও চিঠি যেন ছিস্ না।

দেরি করবার উপায় নেই। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে। বাঘের ভয় না থাকলেও ভালুকের ভয় আছে।

এই পোষ্টাপিসের জ্বালায় গ্রাম ছেড়ে পালাই পালাই করছি, এমন দিনে অপরিচিত এক ভদ্রলোকের

একখানি খামের চিঠি পেলাম।—আমার লেখা সব গল্পই তিনি নাকি পড়েছেন। তাঁর খুব ভাল লেগেছে। 'সংহতি' নামে ছোট একটি মাসিক-পত্রের সম্পাদক তিনি। একটি গল্প চেয়েছেন সংহতির জন্য।

ইনিই মুরলীধর বসু।

নির্বান্ধব অবস্থায় বাস করছি পল্লীগ্রামে। এ-হেন সময়ে এই রকম চিঠির মূল্য যে কতখানি তা আমি ভুক্তভোগী, আমি জানি। চিঠির জবাব দিলাম। গল্প পাঠালাম।

চিঠির পর চিঠি।

চিঠিতেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। মুরলীবাবু 'মুরলীদা' হলেন। এ-রকম সাহিত্য-রসিক, এরকম হৃদয়বান মানুষ আমি খুব কম দেখেছি।

কলকাতায় আসবার জন্য মন আমার খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এমন দিনে মুরলীদার একখানি চিঠি পেলাম। লিখেছেন, গত মাসের 'প্রবাসীতে' 'শুধু কেরাণী' নামে ছোট একটি গল্প ছাপা হয়েছে, গল্পটি পড়ে দেখবেন।

'প্রবাসী' প্রতিমাসে আসে আমার নামে।

গল্পটি পড়লাম। একবার নয়, দুবার।

পড়েই সুটকেসটি গুছিয়ে ফেললাম। মুরলীদাকে চিঠি লিখলাম—কলকাতায় যাচ্ছি।

• • • •

পড়ে রইলো শুধু একমুঠি ভস্ম আর গুটীকতক হেহাড্ডি···সেই পুণ্য-ভস্ম তার কলসে পূর্ণ করে, গঙ্গাস্নানসিক্ত বসনে তাঁরা ফিরে এলেন কাশীপুরের বাগানে··· ··

পরিচয়হীন, সম্বলহীন, বন্ধুহীন, গুটিকয়েক বাঙালী ছেলে·····

তরুণ তপস্বী·· ···

নরেন্দ্র আজ মহামৌনী···

যে-ঘরে গুরুর শেষ-শয্যা ছিল, তার মেঝেতে বসে গুরুর শূন্য শয্যার দিকে চেয়ে থাকেন···

বাইরের শয্যা ছেড়ে গুরু নিয়েছেন নিজের অন্তরে চির-শয্যা ··

বাসুকীর সহস্র ফণার মত জেগে ওঠে সহস্র অস্থির প্রশ্ন···কে দেবে তার উত্তর ?

নিরন্তর মৃত্যু-লোক থেকে আসবে না কোন ইঙ্গিত ? যতদিন তুমি ছিলে, ভাবনা ছিল তোমার সঙ্গে ···· তুমিই ছিলে সব প্রশ্নের শেষ উত্তর···সব সমস্যার শেষ মীমাংসা··· সব জিজ্ঞাসার শেষ উপনিষদ ·· মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত করেছিলে তোমার সুনিশ্চিত অস্তিত্ব··· ·· আজ তাই তোমার তিরোধান বিভ্রান্ত করে তুলেছে আজ আমাকে·· যাবার সময় নিজের হাতে তুমি দিয়ে গেলে এদের ভার আমার ওপর·····নিজের ভার যে এখনো নেওনি নিজে বইতে, সে কি করে বইবে এদের ভার ?

স্বপ্নভঙ্গের লেখা "বিবেকানন্দ" থেকে

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি পত্রাবলী

নীলকান্ত গুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বাংলা উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তা আমরা জানি। কিন্তু তিনি যে ইংরাজীতে অনেকগুলি বহুতথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান প্রবন্ধ ও তৎসংক্রান্ত বহু ইংরাজী পত্র লিখেছিলেন, এ খবর বোধ করি অনেকেরই জানা নেই। তাঁর একটি মাত্র ইংরাজী রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। সেটি একটি উপন্যাস—Rajnarain's wife! সেটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু দু'একটি ছাড়া তাঁর ইংরাজী প্রবন্ধগুলির এতাবৎ কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি, সেগুলি আজো পুরানো এবং দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় অনাদৃত অবস্থায় রয়েছে। বহুদিন পূর্বে ১৩১৯ এবং ১৩২০ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি ইংরাজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রবন্ধ দুটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন সেই সময় প্রখ্যাত সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর Mookherjee's Magazineএর জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে একটি প্রবন্ধ লেখবার অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধ অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন The Study of Hindu Philosophy। এই প্রবন্ধটি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের Magazineএ প্রকাশিত হয়। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক শম্ভুচন্দ্রকে ঐ সংক্রান্ত কয়েকখানি ইংরাজী পত্র লেখেন। সেই চিঠিগুলির বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হল। চিঠিগুলি পড়লে জানা যায়, কোন বিষয় লেখবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র সে সম্বন্ধে কত বিস্তৃত পড়াশোনা করতেন, কত গভীর ভাবে চিন্তা করতেন এবং নিজের লেখা সম্বন্ধে অপরের অভিমতের প্রতি তাঁর মনোভাব কতখানি উদার ছিল।

(১)

বহরমপুর

১৯শে জানুয়ারী, ১৮৭৩।

প্রিয় শম্ভু,

বহরমপুরে তিনটি ভাল লাইব্রেরী আছে এবং আমার প্রয়োজনীয় বইগুলি সবগুলি পেয়েছি। কিন্তু সময়াভাবে এখনো সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারি নি। তোমার জন্যে লেখা শুরু করেছি। কিন্তু লেখার সঙ্গে ঐ সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনাও চাই। কাজেই বঙ্গদর্শন সম্পাদনার কাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম। সে কারণে তোমার প্রবন্ধটি শেষ করতে পারিনি। যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ, সমাপ্ত করবার জন্যে অপেক্ষা করলে হয়ত তা তোমার মাসিক পত্রের পক্ষে কিছু দীর্ঘ হয়ে পড়বে। সেই জন্যে, প্রবন্ধটি যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই তোমাকে পাঠাচ্ছি। অসম্পূর্ণ

হলেও প্রবন্ধটি নেহাৎ অপাঠ্য হবে না। আশা করি তুমি ওটি গ্রহণ করবে। তোমার যদি ভাল লাগে, তাহলে আমি ঐ সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ পাঠিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।

আমি লেখার খসড়াটাই পাঠাচ্ছি। আমার হাতের লেখা অতি জঘন্য, সুতরাং কম্পোজিটরদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। তুমি যদি প্রবন্ধটি প্রকাশ কর, তাহলে একবার প্রুফটি আমার কাছে পাঠাবে।

প্রবন্ধটি ভাল করে সংশোধন করতেও পারিনি। যদি তোমার সময় থাকে, একবার ব্যাকরণ-ঘটিত দোষগুলি ঠিক করে নিও, ব্যাকরণ শুদ্ধ হল কি না, আমি ভাল করে দেখিনি।

ভবদীয়
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২)

বহরমপুর
৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩

প্রিয় শম্ভু,

আমি তোমাকে নিরাশ করেছি জেনে দুঃখিত হলাম। কথাটা এই যে, তথাকথিত 'লঘু সাহিত্য' অপেক্ষা গভীর বিষয়ের রচনা লেখা ঢের সহজ। সেই জন্য আমার মত কর্মভারাক্রান্ত হতভাগ্যের কাছে শেষোক্ত শ্রেণীর প্রবন্ধ লেখার প্রলোভন অত্যন্ত অধিক হয়েছিল। আমি যে রচনাটি তোমায় পাঠিয়েছি তা যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে তা বাবিশ-বাস্কেটে ফেলে দিতে পারো। আমি যত শিগগির সম্ভব তোমার পছন্দমত একটি রচনা পাঠাব। কিন্তু শিগগির যে সে সুযোগ পাব, তা বোধ হয় না।

ভবদীয়
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৩)

বহরমপুর
১৬ই মার্চ, ১৮৭৩

প্রিয় শম্ভু,

আমি সবেমাত্র গতকাল সন্ধ্যায় আমার প্রবন্ধের শেষ অর্ধেকটার প্রুফ পেয়েছি ; অপর অর্ধেকটা এখনো পাইনি। ডাকঘর আমার চিঠিপত্র ঠিক ঠিক নিয়মিত দিয়ে থাকে, সুতরাং তাকে গাল দিও না। সমস্ত প্রবন্ধটির প্রুফ পেলেই আমি ফেরৎ পাঠাবো। দেখছি, আমার সুন্দর হস্তাক্ষর পেয়ে কম্পোজিটার মহাকীর্তিকর কাজ করেছেন। আমাকে স্পষ্ট করে লিখতে বলা বৃথা।

ভবদীয়
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৪)

বহরমপুর
(তারিখ নেই)

প্রিয় শম্ভুচন্দ্র,

'হিন্দু দর্শনের' প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় অংশ লেখা অতি দুরূহ ব্যাপার। লিখতে গেলে আমি মারা পড়ব। *

তোমার মাসিক পত্রের উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখতে হলে আমাকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেক মীরস বই পড়তে হবে। সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ বুৎপত্তি না থাকায় আমার মত কর্মভার-জর্জরিত মানুষের পক্ষে তা সম্পাদন করা দুঃসাধ্য।

সাংখ্য দর্শনটিই আমি রীতিমত পড়েছি এবং সাংখ্য সম্বন্ধে যা কিছু বক্তব্য তা আগেই কলিকাতা রিভিউ পত্রে একটি প্রবন্ধে † এবং বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে গ্রথিত করেছি। ‡ যদি তুমি প্রকাশ করতে সম্মত হও, তাহলে আমি উদাহরণ স্বরূপ হিন্দুর চিন্তাজগতে শঙ্করাচার্যের প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে দেব। এর জন্যও আমার কিছু সময় দিতে হবে।

ভবদীয়
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

---

* উপরের চার নম্বর চিঠিখানি দেখে মনে হয়, প্রথম প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশের পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্র অন্য একটি প্রবন্ধ লেখবার সংকল্প জানিয়েছেন। এই সংকল্প কাজে পরিণত হয়েছিল কিনা তা জানা নেই।

† ১৮৭১ সালে ১০৬ নম্বর Calcutta Reviewতে প্রকাশিত হয় Buddhism and the Sankhya Philosophy.

‡ "সাংখ্যদর্শন" বঙ্গদর্শনের প্রথম বছরের (১২৭৯) পৌষ সংখ্যা থেকে শুরু হয়।

সরীসৃপ

কুমারকান্তি ঘোষ

মেজাজটা বিগড়ে গেল। সকাল থেকেই আজ খারাপ সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ট্রাম ধরতে গিয়ে পা পিছলে যখন পড়ল, ওকে তুলতে যাব ভাবলাম, কিন্তু ওর হাত, পা, বুক, পা সব তখন একাকার হ'য়ে গেছে, দাদা কাটটা উড়ে গিয়েছে, ভেতরের নোংরা নোংরা পোষাকগুলো বেরিয়ে গেছে। নিজেই উঠে পড়ল, কিন্তু বইগুলো আমি কুড়িয়ে গুছিয়ে দিলাম। ধন্যবাদ! এত অল্প বয়সেই এত গভীর চোখ। তাহলে আমার সংগে এখানেই ইতি ক'রে দিতে চায় সহজ। মন্দ কী। আমি-ও 'না, ও কিছু না, এতো আমার কর্তব্য'—জাতীয় ভদ্রতার কথাগুলো বললাম না। সরল সমান্তরাল রেখায় ট্রামটা মিলিয়ে গেল।

অফিসের ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম, দরকারী একটা চিঠি কিছুতেই পাচ্ছিলাম না, তখন মার চিঠিটা এল। মার শরীর বেশ কিছুদিন হল খারাপ যাচ্ছে। মনটা হু হু ক'রে কেঁদে উঠল। মার খবর কতদিন নিই না। ব্যস্ত রয়েছি নিজের ব্যসনে, বিলাসে, স্ত্রী-পুত্রে। ভীষণ সোরগোল। ভীড়ের মধ্যে কে যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে। মা নয় তো? দূর থেকে পা দেখা যাচ্ছিল,—ঠিক মার মতোই। কী সর্বনাশ! বাবেই ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যাই, সে-ই আমার মুখের দিকে আড়োপাড় তাকায়। মুখ ঢেকে ফেলি রুমাল দিয়ে। খুব জোরে ধাক্কা মারি কনুই দিয়ে, দেখি আলতো ভাবে রাস্তা হয়ে গেল। কাছে যেতেই মা বললেন, সুখের সময় তো তোরা মাকে ভালবাসবি না, যখন মা মরতে বসবে তখন তার জন্য ছোটাছুটি। আমি বলি, কেঁদে উঠি, না, মা, তোমাকে প্রতিদিন পুজো করি, তুমি আমার ভগবান! মা আমার কথা শুনে কাঁদলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, গভীর আরামে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে। ধরে ধরে উঠি, কিন্তু সুইচ্ খুঁজে পাচ্ছি না—সুইচ্ কোথায়? কই সুইচ্? যদি আলসা তারে হাত লাগে? তবে যে ভীষণ শক্ খাব! নাঃ, সুইচ্ হারিয়ে গেছে। জল খাওয়া হল না। কারণ, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কিছু। এক রাত্রি জল না খেলে কী হয়? মা যে কত দিন নির্জলা উপোস করেন? কিন্তু হায়রে, মার সংগে আমার তুলনা? সুইচ্ পেয়েছি। এই তো, শক্ লাগছে। সেই টিপেছি—দেখি সারা ঘরে সাদা আলো, ও নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে, হাতের ওপর ছেলেকে নিয়ে। সুইচ্ নিবিয়ে দিলাম। জল খাবো না। এক রাত্রি জল না খেলে কিছু এসে যায় না।

তারপর বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছি অথবা স্বপ্ন দেখে সবে মাত্র জেগে উঠেছি। খুব জোরে সার্চলাইট কে যেন ফেলেছে আমার চোখে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল? রুমাল দিয়ে চোখ ঢাকতে যাব, হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেল আলোটা। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। চোখটা কানা হয়ে গেল হঠাৎ আলোর অভাবে। আমার পিঠের ওপর হাত রেখে বলল গণেশ, আজ আমরা বেকার জীবন সেলিব্রেট্ করেছি। হোঃ, হোঃ, ক'রে হাসি। দেখি, ওরা চারজনেই এসে জুটেছে। গণেশ, হাবলা, ভুঁরো আর গিরিশ। গণেশের গলাটাই শুধু শোনা যাচ্ছে, ওদের হাসিগুলো যেন ব্যাকগ্রাউণ্ড্ মিউজিক। আমি ওদের গান্ধিজীর বীন্স্ ও এণ্ড্রুসের কথা বলতেই ওদের হাসির সূত্রপাত। একজন বলল, "শালা, বেকার জীবনের আবার প্রিন্সিপল কী?" কেউ বললে, "জানিস, এটা আমার কোর্থ হাটাই?" আবার একজনে বলল, "গ্র্যাণ্ড হোটেলে তো ঢুকতে পারলি না?"

"না-ই বা হল, শালা, অ্যাডেনিউ বেঁস্তোরাই বা কম কিসে যায়?" ওদের কথাবার্তা থেকে যা উদ্ধার করা গেল তা হচ্ছে ওরা চারজনে আজ ওখানে গিয়ে পেটপুরে ঠেলেছে। যখন বিল্ নিয়ে এল বেয়ারা, গুণেশ লিখে দিল ভট্ পেন বের ক'রে, "I promise to pay". ম্যানেজার ছুটে এল। এক ধমকে ম্যানেজার চুপ। আগুন জ্বালিয়ে বেবে, বোমা মারবে শুনে ম্যানেজার হাত জোড় ক'রে ওদের বললেন, "ঠিক আছে দাদা, এবার দয়া ক'রে আসুন। পরে যখন পারেন দাম শোধ ক'রে যাবেন।" ম্যানেজার ছুটে গিয়ে তার কাউন্টার থেকে মৌরিও নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তখনই ভুঁরো ছেড়েছে ওর তিন আউন্স্ ওজনের বোমাটা। ভীষণ শব্দে মৌরির প্লেট আর ম্যানেজার উভয়েই ধরাশায়ী। ধোঁয়ার অন্ধকারে গুণেশের দল বাইরে এসে দু' নম্বর বাস ধরেছে। কণ্ডাক্টার পয়সা চাইতেই বলেছে ওরা গম্ভীরভাবে, "স্টাফ্!" কণ্ডাক্টার কার্ড দেখতে চেয়েছিল, তখন ভুঁরো তার দু'নম্বর বোমার পাতলা কাগজে জড়ানো খোলটা পকেট থেকে বের ক'রে একটু দেখালো কণ্ডাক্টারকে। কণ্ডাক্টার তার কাজ জানে। একতলার কণ্ডাক্টার সেই যে দোতলায় চ'লে গেল আর নিচে নামে নি। গুণেশদের দৌলতে সেবার একতলার সবাই পেল ফ্রি ট্রিপ্। ভাববাজার পাঁচ মাথার স্টপেজে গুণেশের দল নামল, চলে যেতে যেতে বলল, "চাঁদে গিয়ে কী হবে আর স্টেট্ লটারীর টিকেট কেটেই বা কী হবে—আমাদের দরকার কিছু বোমা বানাবার মালমশলা।" বিকট শব্দে, চুলের টানে, —আমি প্রায় খাট থেকে পড়ি আর কী।

আবার দেখি সেই মেয়েটা! গবিতভাবে চলেছে—ও যে সেদিনই ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছিল তা যেন হ'শই নেই। আমার খুব কাছে এল। ভেবেছে বোধ হয় আর কেউ নেই কাছে। আমি গম্ভীর হ'য়ে রইলাম, একটু পাশ কাটিয়ে অন্য দিকে মুখ ক'রে চলে গেলাম। কাঁদতে কাঁদতে ও বাড়ি চলে গেল। আমার খুব হাসি পেল। টিট্ ফর্ ট্যাট্! তোমার যে কী ধন আছে তা আমার আর জানতে বাকি নেই, কাজেই কেটে পড়। আমার মন মাঝে মাঝে যা-ই চাক, আমি এখন চলছি বিশুদ্ধির খাড়া রাস্তায়। আমাকে কেউ টলাতে পারবে না। আমি চাই আমার দেশটা সব চেয়ে বড় হোক, সব দিক দিয়ে। উনিশ শো সাতষট্টিতে ইলেকশনের পরে একবার মনে হয়েছিল আমার দেশ বুঝি তার লেজের কাপটা মেরে উঠে দাঁড়াল। সে যেন একটা বিরাট সরীসৃপের ছবি—যে যুগান্তকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে তার বিরাট দেহ মড়ার মত মেলে, যার ওপরে উইয়ের মাটির পাহাড় জমেছে, হয়েছে বাবুই পাখির বাসা, উঠেছে শ্যাওলা আর ঝোপঝাড়। তার এক লেজের ঝাপটে অনেকগুলো উইয়ের পাহাড়, গাছ ভেঙে গেল। আর যদি সে তার চার পা, বিরাট লেজ, বড় বড় খোসা-ওলা বিরাট দেহ, আর কুমীরের মত লম্বা প্রাগৈতিহাসিক মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়,—তবে কী হবে? সে যদি বলে—আমার ঘুম ভেঙে গেছে, এবার আমি জেগে গেছি,—তবে কী হবে? তবে আর এই হীনমন্যতা কেন? আমিই যখন এই বিরাট শক্তি, তখন আর কেন ওই সাত-পাঁচ আজে-বাজে জিনিসের পেছনে ছোটা?

আমার স্পষ্ট মনে আছে, যখন নারী এর পরে আমাকে তার পুষ্ট দেহের নৈবেদ্য দিতে এসেছিল, আমি তখন তা গ্রহণ করেছিলাম। আমার মনে একটুও দ্বিধা ছিল না। পশুর মত পান করেছি, তৃষ্ণা মিটিয়েছি। কিন্তু তার পরেই কেঁদেছি আকুলভাবে, অঝোরে। আমার গায়ে সে তার হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে, তার বুকে আমার মুখ চেপে রেখে বলেছে, কাঁদে না, হয়েছে কী এতে—আমি তো তোমারই! আমার কান্না থেমে গেছে, কিন্তু শুধু তখনকার মতো। তারপরেই আবার আমি স্বপ্নে দেখেছি সেই সরীসৃপকে, আমাকে হাতছানি দিয়ে বারে বারে ডেকেছে সে। আমি বাঁধা পড়ে গেছি সংসারের

মধ্যে, আমার সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর মধ্যে, আমার অল্পসাধ্যুক্ত চাকরির মধ্যে, আমার হতাশার মধ্যে।

গুণেশ আমার হাত দেখলো। বলল, "তোর হাতে খুব উন্নতি আছে।"

আমি বললাম, "দেখ, অনেক কাটা কাটা দাগ আছে, যা হচ্ছে স্ট্রাগলের চিহ্ন।"

ও বলল, "তোর মধ্যে মহৎ লোকের সবগুলো লক্ষণই আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে তুই কিছুই হতে পারবি না, কারণ কোনো গুণই তোর ঠিক উপযুক্ত মাত্রায় নেই।"

আমি শুনে হতাশ হয়ে পড়লাম। বললাম, "গুণেশদা আপনি আমার একটা উপায় করে দিন!"

বলল, "আয়, আমার সঙ্গে আয়। আজ থেকে আমাকে গুণেশদা বলেই ডাকবি। আজ থেকে আমি তোর গুরু।"

কোথায় যাচ্ছি কে জানে। অনেকগুলো অন্ধকার স্যুড়ঙ্গপথে ও আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। হাতে ওর মোমের মশাল। মোমের আলোতে আমাদের দুজনের মুখেই কেমন একটা মৃত আভা এসে পড়েছে। আমি কোনো কথা না বলে চলেছি ওর পিছু পিছু। কতক্ষণ এভাবে গেছি জানি না। হঠাৎ আমার চোখের আলো নিভে গেল। দেখি, গুণেশদার হাতে হাতকড়া, পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকেও ধরতে পারে ভেবে আমি খুব জোরে দৌড়োতে চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছিনা—যেন চাঁদের ওপর ছোটার মতো পা আলগা হয়ে যাচ্ছে। একটা বড় গর্তের মধ্যে গুণেশকে ফেলে দিয়ে গর্তের মুখটা ভাল করে এঁটে দিল পুলিশ দু'জন। একজন পকেট থেকে গালা বের ক'রে মোমের মশালের আগুনে গলিয়ে গর্তের মুখটায় খুব করে লাগাল, তারপর সেই নরম গালার ওপরে তার বুটসুদ্ধো খুব জোরে চেপে ধরে রইল, একটু পরে পাটা সরিয়ে আনল। নিচু হয়ে দেখল, সীলমোহরে তার বুটের ছাপটা উঠেছে কিনা। বেশ স্পষ্টভাবে ছাপটা উঠেছে। অট্টহাসি হেসে পুলিশ দু'টো চলে গেল। যাবার আগে অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল গুণেশের উদ্দেশে। আমাকে বলল, "খোকাবাবু, তুমি ভাল ছেলে, তুমি এদের সঙ্গে মিশো না, বিপদে পড়বে।"

ওদের জিজ্ঞাসা করলাম "আমি কী করে বেরোবো?"

ওরা বলল, "সোজা ট্রামে চেপে পুব দিকে চলে যাও।"

ট্রামটা পেয়ে গেলাম দেখি সেই পা-পিছলে-পড়া মেয়েটা। ভ্রুক্ষেপ করলাম না সে দিকে। আমি কণ্ডাক্টারকে বললাম, "সোজা পুব দিকে নিয়ে যাবে।"

কণ্ডাক্টার ড্রাইভারের সঙ্গে পরামর্শ করল। ফোন্ করে দিল যেন ওরা কোথায়। একদল লোক চলে এল।

নতুন লাইন্ বসবে। যেখানে রাস্তা নেই, সেখানে নতুন রাস্তা হবে। সবাই পুবদিকে যেতে চায়। প্রত্যেক স্টপেজে দেখি কী ভিড়! সবাই যাবে নতুন রাস্তায়। এত গাদাগাদি হল যে বলবার নয়। ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম চলেছে পুব দিকে। আমি ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। তবু মনটা খুব খুশি। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। এবার আমি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লাম।

———

আবার সেই জেল

বিভেন গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

(দুই)

বাড়ীতে বসে সেদিন অনেকক্ষণ ভাবলাম।

যে কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের চাকরি কোনদিন করবনা বলে দৃঢ় সংকল্প করে ছিলাম, প্রবেশন অফিসার হবার পর অবশ্য সে কথা আর চলেনা। তবু এই চাকরিতে অনেকখানি স্বাধীনতা আছে, তবু ঘরে বসে কলম পেষা নয়। তারপর মামলার সূত্র ধরে অনেক নতুন জায়গায় যাওয়া যায় নতুন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন যদি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই, চীফ প্রবেশন অফিসার বিনয় দাশগুপ্ত নিশ্চয়ই মনে করবেন এবং মনে করাটা নির্ভুল হবে যে, Probation officer is moving, খুশীই হবেন তিনি।

সন্দেহ নেই চাকরিটি বেশ রোমাঞ্চকর।

অবশ্য যে আইনের বলে প্রবেশন ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি হয়েছিল আমি সেই আইনের কথা কোনদিন খবরের কাগজে পড়িনি। সুতরাং কি এর তাৎপর্য, কি বৈশিষ্ট্য, প্রবেশন অফিসার কথাটার অর্থ কি, তাও জানতাম না চাকরিতে ঢোকবার আগে।

হঠাৎ একদিন বেঙ্গল ন্যাশনাল প্রমোদবাবু বললেন, আরে মশাই, খবরের কাগজে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম, বোধহয় পরশু দিনের ষ্টেটস্‌ম্যান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে, প্রবেশন অফিসার নেয়া হবে আটজন। কোয়ালিফিকেশনের কথা যা লিখেছে, আপনার তা অনেক বেশীই আছে।

সুতরাং দরখাস্ত ছেড়ে দিলাম এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিয়োগের জন্য গভর্ণমেন্টের কাছে সুপারিশ করে যে আটজনের নাম পাঠালেন দেখা গেল তাদের মধ্যে আমিও একজন।

চাকরি পেয়ে গেলাম। প্রবেশন অফিসার। সরকারী চাকরি করবনা বলে যে বন্ধুকভাষা পণ করেছিলাম, প্রমোদবাবুর এক কথায় তা আর রক্ষা করা গেল না।

বৈচিত্র্য আছে, স্বাধীনতা আছে, খুব খারাপ লাগছিল বলতে পারিনা। তবে মাইনে অত্যন্ত কম। মাসেই অফিসার।

বড় ছেলে বাবুল শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। বড় মেয়ে মুকুল ও ছোট ছেলে বেবুল স্কুলে পড়ে। টালিগঞ্জে চণ্ডীতলা লেনের বাড়ীভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা।

প্রবেশন অফিসারের চাকরিতে চলা ভার।

প্রমোদবাবুর প্রথম উপদেশটা গ্রহণ করেছি যখন, তখন দ্বিতীয়টা গ্রহণেই বা দোষ কি? মাসের পয়লা তারিখে নিশ্চিত কিছুর ব্যবস্থা যখন হয়ে গেল, তখন আরও যা পারি, তাও চালিয়ে যাওয়াই ত বুদ্ধিমানের কাজ। কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে "নাময়িকী" পর্যায়ে যে বেতার ভাষণ দিচ্ছিলাম, গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিলাম। দৈনিক বসুমতী পত্রিকার বিনানামে সিনেমা সম্পাদকের কাজটাও চালিয়ে যেতে লাগলাম।

ঠিক এই সময়ই পাগলা অঘন এসে ঘাড়ে চেপেছে। বড় চাকরি সন্দেহ নেই। কিন্তু চারখানা দেয়ালে সীমাবদ্ধ। রোজই নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসা। বাইরে চলমান জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবেনা। সমাজে অপরাধী বলে যারা চিহ্নিত হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গেই দিনের পর দিন কাটাতে হবে।

কিন্তু আরও একটা দিক আছে। প্রবেশন অফিসারের চাকরি করার পরেও যে নানা জায়গায় ঘুরে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়, সেই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ওরা যাতে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা যাবে।

বেশ বুঝতে পারলাম, সরকারী চাকরি আমায় পেয়ে বসেছে। ওটা আমার অদৃষ্টের লিখন বৈ আর কিছু নয়।

ইংরেজেরা যখন এখানে ছিল, সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ওদের খতম করে দিয়ে ওদের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফাওয়ার অথবা লাখি মেরে সাগরের জলে ফেলে দেবার অটুট প্রতিজ্ঞা নিয়ে তখন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স বিপ্লবী দল কাজ সুরু করেছিল, আমি সেই গুপ্ত সমিতির কর্মী ছিলাম। ফলে, রাজবন্দীরূপে অনেক বছর বিনা বিচারে জেলে কাটাতে হয়েছিল। তাতে মিইয়ে পড়া ঘুরে থাকুক, প্রতিজ্ঞার উত্তাপ কয়েক ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছিল! স্থির করেছিলাম, বাইরে এসে আবার সেই ভাঙনের দলে যোগ দেব। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন! এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন পথ নেই।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে অকস্মাৎ ইংরেজ তল্পি-তল্পা নিয়ে সাগর পাড়ি দিল।

১৯৪৫ সালে রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলের বিভিন্ন দলীয় রাজবন্দীরা সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ আসামে প্রবেশ করতে পারলেই আমরা সবাই জেল ভেঙে বেরিয়ে আসব। বিপ্লব সুরু হয়ে যাবে। আমাদের একমাত্র নেতা নেতাজী।

অন্যান্য জেল ও বন্দীশিবিরের রাজবন্দীরাও একই সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

এই উত্তপ্ত মানসিকতার মধ্যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, বিনা আন্দোলনে, বিনা আঘাতে ১৯৪৭ সালেই ইংরেজ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে আর আমরাই আমাদের স্বাধীন দেশ শাসনের কর্তৃত্ব পাব। ভাবতেই পারিনি সেই গভর্ণমেণ্টে আমিও একটা যোগদান করব চাকুরে হয়ে।

রাজসাহী জেলে আমাদের সঙ্গে জলপাইগুড়ির ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্যতম নেতা খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন। তিনিও সবার সঙ্গে সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। মুক্তি পাবার পর নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকেই কাজ করবেন স্থির করেছিলেন।

কিন্তু ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রীসভার যখন পতন হল এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন, তখন মন্ত্রীদের তালিকায় খগেনবাবুর নাম দেখতে পেলাম। ফরোয়ার্ড ব্লক না করে তিনি কংগ্রেসে

যোগদান করেছেন। করুন, তাতে আমার খুব আগ্রহ ছিল না। তবে মন্ত্রী হয়ে বসলেও খগেনদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত নিবিড় সম্পর্কটা চিরদিনই অটুট ছিল, আজও আছে বলা যায়।

তাই মাঝে মাঝে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ যেতাম। কোন চাকরির খোঁজে নয়, খগেনদার সঙ্গে গল্প করতে। খগেনদা আমার কাজকর্মের খোঁজ নিতেন। অধিক অনটন উপলব্ধি করতেন। মাঝে মাঝেই বলতেন। আপনি কংগ্রেসের সদস্য হয়ে যোগদান করুন, তারপর দেখব ডাঃ রায়কে বলে আপনাকে এই রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আনতে পারি কিনা। এত বড় পলিটিক্যাল সাফারার—

বাধা দিতাম, পলিটিক্যাল সাফারার বটে তবে আদৌ বড় নই। একেবারে পদাতিক সেনা। কিন্তু কংগ্রেসের মেম্বার হবার অনুরোধ করবেন না খগেনদা। ওটা যাতে সটবে না।

এমনি করে ওখানে গেলেই খগেনদা চাপ দিতেন, মেম্বার হয়ে যান।

হঠাৎ একদিন বললেন, যাকগে, আপনি মেম্বার না হলেন। এখন এক কাজ করুন দেখি। ডাঃ রায়কে এ্যাড্রেস করে আপনার বিগত রাজনৈতিক ও বর্তমান সাংবাদিক জীবন, সিনেমা লাইনের কাজ, ক্যালকাটা মেডিক্যো থেকে নাট্যাভিনয় ও বক্তৃতা—সব কিছু বিশদভাবে লিখে একখানা দরখাস্ত আমাকে দিয়ে যাবেন। আমি ওঁকে বলেছি।

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু দরখাস্তের উপসংহারে কি লিখব? আমার বীরত্ব কাহিনী বলবার পর একটা কিছুর জন্ত আবেদন বা অনুরোধ জানাতে হবে ত!

একটু ভেবে নিয়ে বললেন খগেনদা, লিখে দেবেন যে-কোন সুটেবল এমপ্লয়মেণ্ট চাই। তবে হ্যাঁ, দরখাস্তখানা যদি বড় হয়ে যায়, খুব সম্ভব বড়ই হয়ে যাবে, তাহলে দরখাস্তের ওপরেই আপনার নাম ও ঠিকানা লিখে একটা 'ব্রিফ' লেটে দেবেন। সেটা যেন এক পৃষ্ঠার বেশী না হয়। বড় হলেই ডাঃ রায় আর নিজে পড়বেন না, সেক্রেটারীদের দিয়ে দেবেন।

দেখা যাক না, খগেনদার কেরামতিখানা—মনে মনে এমনি ধরণের একটা কৌতুকময় মন্তব্য করে একদিন দরখাস্ত ও ব্রিফি খগেনদার করকমলে সমর্পণ করে এলাম।

হঠাৎ একদিন খগেনদার চিঠি পেলাম। লিখেছেন 'ডাঃ রায় ওখানা পড়িয়াছেন। আপনাকে একবার তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি। আপনি আগামী বুধবার বেলা আড়াইটায় এ্যাসেম্বলি হাউসের পশ্চিম দিকের বারান্দায় উপস্থিত থাকিবেন। অন্তথা না হয়। গেট হইতে আমার নামে স্লিপ পাঠাইলেই আমি ঢুকিতে দিবার অনুমতি পাঠাইয়া দিব। অথবা আমি আগেই বলিয়া রাখিব, গেটে আমার নাম করিলেই ছাড়িয়া দিবে।'

সত্যিই ছেড়ে দিল গেটের পুলিশ।

বারান্দায় দেখলাম এখানে-ওখানে দশি আঁটা সোফা পাতা রয়েছে। বিরাট বাড়ী। ওর কোন্ অংশে সভার অধিবেশন চলছে, ঠিক ঠাওর করতে পারছিলাম না। দু'একজন লোককে এদিকওদিক যেতে দেখা যাচ্ছে। কেউ এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে অন্ত দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। আমি সেই প্রায়-নির্জন বারান্দার একখানা সোফায় বসে রইলাম।

আমার মত হাজার হাজার চাকুরিপ্রার্থীর দরখাস্ত প্রতিদিন ডাঃ রায়ের কাছে যাচ্ছে। খগেনদার সঙ্গে তাঁর যা হৃদ্যতা, তেমনি বা তার চাইতেও অনেক বেশী হৃদ্যতা আছে তাঁর লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে। তাঁদের কোনো আত্মীয় বা বন্ধুও কি আর চাকরি খুঁজছেন না? এদের মধ্যে আমার কেসটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ

নয় যে, ডাঃ রায় আমার দরখাস্ত পাঠ করে এতখানি মুগ্ধ হয়েছেন যে, আমাকে একবারটি দেখতে চান। তাও আবার বিধান-সভায় এতখানি ব্যস্ততার মাঝখানে। ভাবলাম, নিশ্চয়ই খগেনদা এক সেকেণ্ডের জন্য এসে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়ে যাবেন, আজ হলনা, আরেক দিন। এমনি আরেক দিন আরেক দিন করে অনেক দিনই চলে যাবে।

অকস্মাৎ বারান্দার প্রান্তে খগেনদাকে দেখা গেল। সঙ্গে, হাঁ, ডাঃ রায়ই ত বটেন।

কি দীর্ঘ ঋজু শরীর! সত্যিই প্রবীণ যুবক! খগেনদাকেও তাঁর কাছে বেঁটে মনে হচ্ছে। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। গায়ে সেই চিরপরিচিত ফুলহাতা সাদা শার্ট। বুকের দুপাশে চাকা পকেট।

খগেনদা বললেন, এই ভদ্রলোকের কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

হুঁ! ডাঃ রায় মোটা কাঁচের মধ্য দিয়ে বার-দুয়েক আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন, আচ্ছা।

বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন এবং যেদিক থেকে এসেছিলেন, যুবকের মত দীর্ঘ পদক্ষেপে সেদিকে এগিয়ে চললেন। আমি হাত তুলে নমস্কার জানাবারও অবকাশ পেলাম না।

দিন দশেক পরই রিলিফ কমিশনার হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর করা একখানা পত্র পেলাম। আরম্ভটা অনেকটা এই রকম your petition dated 10. 7. 50 submitted to the Chief minister, has been forwarded to me for taking necessary action.·· শেষ দিকে বলা হয়েছে আমি যেন ১ই আগষ্ট, ১৯৫০ সাল, বেলা সাড়ে দশটায় এসপ্লেনেডের বোর্ডের সমক্ষে হাজির হবার জন্য অকল্যাণ হাউসে উপস্থিত হই। পরিশেষে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরে অবশ্য জেনেছিলাম ওটা একটা সরকারি গৎ, ইণ্টারভিউয়ের জন্য ডাকলেই জুড়ে দেয়া হয়ে থাকে, এবং পরে আমিও যে কতবার অমনি গৎ ছেড়েছি, তার ঠিক নেই, তাই ওতে স্পষ্ট কথার রূঢ়তা কিছুই নেই—No expenses will be paid for his journey।

অর্থাৎ নিজের খরচায় এসে দেখা করে যাও। চাকরি যদি পেয়েই যাও, তাহলে ত তুমি আমাদের একজন হয়ে গেলে। তখন চোখ বুঁজে তোমার যাতায়াত ও যাবা খরচ দিয়ে যাব। কিন্তু এখন যদি তুমি নির্বাচিত না হও, তাহলে ত তোমার যাতায়াত খরচটা একেবারে জলে যাবে। জলে ফেলে দেবার মত একটি পয়সাও কি গভর্ণমেণ্টের আছে? এ যে পাবলিক মানি, শুধু পাবলিক মানিতেই ব্যয় হয়ে থাকে।

সুতরাং অ-পাবলিক আমি ১ই আগষ্ট নিজের খরচায় অকল্যাণ হাউসের হোতলায় গিয়ে হাজির হলাম। মোটা পর্দার ঢাকা ঘরের সামনে আরও পনেরো বিশজনের ভিড় দেখলাম। সবাই কড় বাসে অপেক্ষা করছেন। আর সবারই বয়স আমারই মত হবে, ৪০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে।

কিন্তু কোন্ চাকরির জন্য ইণ্টারভিউ? হদিস করতে পারলাম না। ওঁরা অনেকেই মৃদু গুঞ্জন করছেন বটে, কিন্তু তাতে শুধু বোঝা গেল, রিলিফ কমিশনার নেই। কিন্তু ঘরের মধ্যে বোর্ড কাজ সুরু করেছেন। ইণ্টারভিউ চলছে।

সহসা একজন ইণ্টারভিউ দিয়ে বেরিয়ে এলেই বিরক্তিতে একেবারে ফেটে পড়লেন, হুঃ, ইণ্টারভিউ না ছাতা! জিগাইতে আছে, তিব্বতের রাজধানীর নাম কি, সিলং কেমনে যাইতে হয়, পশ্চিম বঙ্গে কয়টা জিলা, কয়টা মহকুমা তব্ গুরীর পিণ্ডি! যদি, রিলিফ অফিসারের চাকরিতে এসব কোনটা দরকার হইব? এইগুলি ত ভূগোলের প্রশ্ন, আমার ছোট শোনায় পড়ে। বোর্ড, না ছাতা। খালি লোকগুনাইরে ভাইকা আইনা খামাখা প্যারেসান দেওয়া। কোন্ শালা-বোনাইগো আগে লইয়া লইছে তাখেনগা—

দেখা আর হল না। কারণ এবার আমার ডাক পড়ল। না, আমার ওসব জামাই ঠকানো একটি প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হল না। কি জানি কেন, বোর্ডের সদস্যরা প্রায়িকটে সমীহ করেই কথা বললেন। বললেন, আপনার দরখাস্তে যা লিখেছেন, দেখা যাচ্ছে একাধিক জায়গায় হলেও যা এখন করছেন, সবগুলিই বেশ সম্মানজনক কাজ। যদি এ্যাডিশনাল রিলিফ অফিসারের চাকরি পান, তাহলে কিন্তু এই কাজগুলো আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। আপনি তাতে রাজী আছেন ত?

যা বলা উচিত তাই বললাম, এখনকার সবগুলোর টাকা মিলিয়ে যা হয়, তা যদি নতুন চাকরিতে পাই, তাহলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দোব। অত তায়গায় আর ঘোরাঘুরি করব না।

আচ্ছা, আচ্ছা। মন্তব্য করলেন একজন।

আর এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'সাম্প্রতিকী' পর্যায়ে রেডিয়োতে কি বলেন?

সারা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ যা ঘটছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি তার পটভূমিকা কি তার তাৎপর্য, কি তার সম্ভাব্য পরিণতি এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি দাঁড়াতে পারে, সে সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করি।

আচ্ছা? ভদ্রলোক বিস্ময়ের সুরে বললেন, বেশ ত কঠিন কাজ দেখছি।

মুখোমুখি যিনি বসেছিলেন, তিনি বললেন, বেশ, এবার আপনি—

বেরিয়ে এলাম। কিন্তু 'ইন্টারভিউ, না ছাতা' শোনবার জন্য আর ওখানে অপেক্ষা না করে নীচে নেমে এলাম এবং আমার বিশেষ পরিচিত সুহৃদ অফিসার অমলনাথ চৌধুরীর ঘরে ঢুকে বললাম, চা খাবনা কফি।

চৌধুরী ঘটনাবলী ও ইন্টারভিউয়ের ইতিবৃত্ত শুনে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, ইন্টারভিউ শেষ হয়ে গেলেই আমি আপনাকে রেজাল্ট জানিয়ে দিচ্ছি।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর অমল চৌধুরী ফোন করলেন দোতলায় রিলিফ কমিশনারের পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্টকে। তিনি জানালেন যে, এ্যাডিশনাল রিলিফ অফিসারের একটা প্যানেল তৈরী হল, তাতে আপনার বন্ধুর নামই সবার ওপরে দেখছি।

মাসখানেকের মধ্যেই খগেনদার চিঠি পেলাম।

Your chance has come, খগেনদা আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, আমি হিরণ্ময়বাবুকে ফোন করে দিচ্ছি, আপনি শিউড়ী যাবেন। কি বলেন?

শিউড়ী, মানে কোনো রিফিউজি ক্যাম্পে?

Yes, বেশ গর্ব্বের সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি, As A. R. O you will be Incharge of a Refugee Camp। আপনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। অকল্যাণ্ড হাউসের অধীন হলেও অনেকখানি স্বাধীনতা। যা ভাল বুঝবেন, তাই করতে পারবেন। শুধু ডিরেক্টারেটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। যাক, এতদিনে আপনার আর্থিক দুশ্চিন্তা দূর হল।

নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস তিনি মোচন করলেও আমি খুব খুশী হতে পারলাম না। পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে কাতারে কাতারে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের তেমন কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাই তখনও গভর্ণমেণ্ট করে উঠতে পারেনি। তাই বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি শিবির তৈরী করে এঁদের সর্ব্বাগ্রে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে তাঁদের সরকারী ব্যয়ে খাওয়া ও পরার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু তা এতই অপর্য্যাপ্ত যে, প্রতিদিনই

সেই সব শিবিরে বিস্ফোরক ও বিষাদ লেগেই আছে। অকল্যাণ হাউসকে ত আর সেখানে পাওয়া যায়না, পাওয়া যায় সরকারের প্রতিনিধি এ্যাডিমনাল রিলিফ অফিসারকে। তাই তারই ওপর চড়াও হয় দর্ব্বহারার দল। শারীরিক নির্য্যাতনের ঘটনাও বিরল নয়।

এমনি অবস্থায় ইনচার্জ্জ হবার সগৌরবের কোন অর্থ আছে কি? কোন মূল্য আছে কি?

স্পষ্ট বললাম খগেনদাকে, তার চাইতে আপনি এই অকল্যাণ হাউসে বসিয়ে দিন, আমি চাকরিতে যোগ দিচ্ছি। এ, আর, ও ডেভিগনেশনের অনেক চাকুরে এখানে কেরাণীর মত কলম চালায়। আমিও তাই চালাব, ঐ ইনচার্জ্জের স্বাধীনতা চাইনা খগেনদা।

চোখ কপালে তুললেন খগেনদা, দিন, আর পাগলামি করবেন না। শিবিরের অবাবস্থা এখন আর তেমন কিছু নেই। থাকলেও তার জন্য নিরপরাধ অফিসারের ওপর আর হামলা হয়না। তারপর সিউড়ী খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা। তবে হ্যাঁ, কলকাতার বাইরে। কিন্তু কলকাতার বাইরে চাকরি করবেন না, নিশ্চয়ই এমনি প্রতিজ্ঞা নেই আপনার।—বলে দিই দিবাকরকে?

আবার টেলিফোনে হাত রাখলেন।

কিন্তু আমি রাজী হতে পারলাম না।

খগেনদার পরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হলনা। ভাকার রায়ের কাছে বর্ণা দিয়ে তিনি স্নেহপরবশ হয়ে আমার আর্থিক অনটন দূর করবার জন্য যে একটা ব্যবস্থা করলেন, আমার প্রত্যাখ্যানে শেষটায় তা ভেস্তে গেল।

কিন্তু সে ১৯৫০ সালের কথা।

তারপর প্রমোদবাবুর পরামর্শে দরখাস্ত করে ১৯৫৬ সালের মার্চ্চ মাসে এই প্রবেশন অফিসারের চাকরিতে ঢুকে পড়েছি।

আজ আবার পাগলা অঞ্জন নিয়ে এসেছে বড় চাকরির খবর। কথা দিয়েছি দরখাস্ত করব।

পাগলা আমার কোনো যুক্তিই কানে তুললনা। তার ধারণা আমার যোগ্যতানুযায়ী এই চাকরিটা অনেক ছোট হয়ে গেছে। তারপর সে নিজেও প্রবেশন অফিসার। এই আলীপুরেই তার আসবার গুজব শোনা যাচ্ছে দ্বিতীয় প্রবেশন অফিসাররূপে। একই জায়গায়, কে জানে, স্বাভাবিক শেষ পর্য্যন্ত হয়ত একই ঘরে একই পদমর্য্যাদায় দাদার পাশে বসে চাকরি করতে শ্রীমানের মাথাকাটা যাবে। সুতরাং—

সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত দরখাস্ত করাই স্থির করলাম।

যদি লেগে যায়, ভালই হবে। আর যদি না লাগে, না লাগল, আমার দখলে একখানা চেয়ার ত আছেই আর আছে রেখা পালদের সিহরণ সৃষ্টিকারী উপন্যাসের চাইতেও চমকপ্রদ জীবন কাহিনী।

তাই নেড়ে-চেড়ে দিন কেটে যাবে।

তিলোত্তমা ধূলায় পড়িয়া কাঁদিলেও দিন গেল, রহিলনা।

সুতরাং আমারও যাইবে। [ক্রমশঃ

গানের মেলায়

শম্ভু ঘোষ (মহারাজ)

"তেমন একজন পাগোল পেলাম না,
আছে নকল পাগোল সকল দেশে
আসল পাগোল পেলাম না,
তাই তো পাগোল হলাম না।
তেমন একজন পাগোল পেলাম না।"

বাউল পাগোল হতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর উদাসী সুর সমবেত শ্রোতাদের পাগোল করেছে, নইলে এই দুঃসহ শীতের রাতে শত শত মানুষ এখানে এভাবে বসে থাকবেন কেন? ওপরে আচ্ছাদন নেই, নিচে আসন নেই। কুয়াশা ছাওয়া আকাশের নিচে মাটিতে বসে গান শুনছি সবাই।

গান, বাউল গান। বাঙালীর হৃদয়ের সুরে গাঁথা, বাংলার প্রাণের গান। সেই গান শোনার জন্যই এই মেলাতে আসা। জয়দেবের মেলা।

বীরভূম মেলার প্রান্তসীমায় অজয় নদীর তীরে ছোট গ্রাম কেঁদুলি। সেকালে বলত 'কেন্দুবিল্ব'। পৌষ সংক্রান্তির পুণ্য প্রভাতে সেখানেই বসেছে এই মেলা—বাউলের মেলা। গানের মেলা।

কিছুকাল আগেও পথ ছিল দুর্গম, এখন সুগম হয়েছে। হাওড়া থেকে রাত সাড়ে দশটায় ট্রেনে চাপলে অণ্ডাল জংশনে গাড়ি বদল করে সকাল সোয়া পাঁচটায় দুবরাজপুর। সেখান থেকে বাসে মেলায় আসতে আমাদের মাত্র আধঘণ্টা লেগেছে। কলকাতা থেকে মেলায় আসার সবশুদ্ধ খরচ সাড়ে ছয় টাকা।

আমরা এসেছি দুবরাজপুর হয়ে কিন্তু ফিরে যাব দুর্গাপুর দিয়ে। অজয় পেরিয়ে ওপারে গেলেই দুর্গাপুরের বাস পাব। ওখান থেকে দুর্গাপুরের দূরত্ব পনেরো মাইলের মত। বিকেল চারটায় রওনা হলে ন'টা নাগাদ কলকাতা পৌছান যাবে। এই পথটি অপেক্ষাকৃত সহজতর।

জয়দেবের মেলা বাউলের মেলা হলেও দোকান-পাট কিছু কম বসেনি। তেমনি মাঠের মধ্যে পথের দু'ধারে সারি সারি দোকান। শাড়ী চুড়ি বাসনপত্র থেকে শুরু করে খেলনা ও খাবারের দোকান। নিত্য ব্যবহার্য সমস্ত জিনিসের প্রচুর আমদানী হয়েছে। শিশু থেকে বৃদ্ধারা কেনা কাটায় ব্যস্ত সারাদিন। আর দিনই বা বলি কেন, সারারাত বলাই উচিত হবে।

কাছের মানুষ প্রায় সবাই এসেছেন, দূরের মানুষও এসেছেন অনেকে। দূরের মানুষ এসেছেন ট্রেনে ও বাসে। কাছের মানুষ হেঁটে কিম্বা গরুর গাড়িতে। কয়েকশ' গরুর গাড়ি এসেছে মেলায়। মেলার উপকণ্ঠে কিম্বা অজয়ের ওপারে মাঠে ও বালির চরে দাঁড়িয়ে আছে। এখন অবশ্য ওগুলো

"অনেক তদ্বির করেছি, কোন ফল হয়নি। দুঃখের কথা কি জানেন, এই সম্পত্তির আয় দিয়ে কেবল ঠাকুর সেবা ও জনহিতকর কাজই করা হত। যেমন ধরুন এই মেলার কথা, বাংলাদেশের প্রাচীনতম মেলাগুলির অন্যতম এটি। এই মেলাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে আসছিলাম আমরা। মেলার চারদিন এখানে মহোৎসব হত। দূরাগত যাত্রীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতাম। সম্পত্তি চলে যাবার পর থেকে আর কিছুই করতে পারছি না। অথচ সরকার থেকে কোন সাহায্য করা হচ্ছে না। কোন সেবা প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসছেন না। তাই যাত্রীদের দুরবস্থা দেখে চোখের জল ফেলা ছাড়া এখন আর কিছু করতে পারছি না।"

জয়দেব-মন্দিরের একদিকে বাজার আর একদিকে মেলা। বাজার মানে কাঁচাবাজার। মাছ মাংস ডিম ও তরিতরকারীর মেলা। জয়দেবের মেলা মূলতঃ বাউল তথা বৈষ্ণবদের মহাসম্মেলন। কিন্তু এখানে আমিষ খাদ্য পেতে অসুবিধে নেই কোন। এতে এই মেলার ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটা বোধকরি একবার ভেবে দেখা উচিত হবে।

আরও কয়েকটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রম বা আখড়া আছে এখানে। এদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় বাবা মনোহর দাসের আশ্রম, দীর্ঘ নায়ক সেবাশ্রম ও কোটরে সাধুবাবার আশ্রমের কথা। আশ্রমের শিষ্যরা মেলা উপলক্ষে এখানে এসেছেন। তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে—মহোৎসব লেগেছে। বহু বৈরাগী তাঁদের শিষ্যদের নিয়ে মেলায় এসেছেন—অস্থায়ী আখড়া তৈরি করে বাউল গানের আসর বসিয়েছেন।

কোটরে বাবার আশ্রমের পরে কেঁদুলির মহাশ্মশান অজয়ের তীরে। সেখানে বহু সন্ন্যাসী বৈরাগী ও বাউলরা আস্তানা গড়েছেন। আস্তানা গড়তে তো হাঙ্গামা নেই কোন। গাছতলা পেলে ভাল, না পেলেও ক্ষতি নেই। এক টুকরো চট কিম্বা মাদুর বিছিয়ে বসে পড়লেই আস্তানা হয়ে গেল। নদীর ধারে খোলা জায়গা, শীতের রাত—তাতে কি এসে যাচ্ছে। গান গাওয়া ও গান শোনার পালা চলবে সারাক্ষণ। একারণেই যদি গানের গরমে শীত না যায়, তাহলে গাঁজা তো রয়েছেই। গাঁজা ছাড়া কি সাজন হয়? কেবল বৈরাগী ও বাউলরাই নয়, তাঁদের শিষ্য শিষ্যাদেরও গাঁজা টানতে আপত্তি নেই কোন। অনেক আমেরিকা ফেরৎ বাউলের ভক্ত যুবক আমেরিকান মহিলাকে পরম সমাদরে গঞ্জিকা সেবন করতে দেখেছি। বিস্মিত হইনি। বৈচিত্র্যময় জীবনের সঙ্গে তাল মেলাতে ওদের জুড়ি নেই।

শ্মশানের পরেই মহাকবি জয়দেবের স্মৃতিধন্য কদম্বখণ্ডী ঘাট। বাঁধানো নয়, কাঁচা ঘাট। আশ্চর্য, বাঙালীর পদধূলায় ব্রজমণ্ডলে এত ঘাট তৈরি হল আর বৈষ্ণব কবি জয়দেব যে ঘাটে স্নান করতেন, সে ঘাটের একখানিও সিঁড়ি বাঁধানো হল না!

কদম্বখণ্ডী ঘাট থেকে অজয়ের বাঁধের ওপর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে কুন্দেশ্বর ঘাট—জয়দেব সিদ্ধাশ্রম্। এইখানে জয়দেব বসে শ্রীহরি এসে গীতগোবিন্দের দশম স্বর্গে লিখে দিয়েছিলেন, "দেহি পদ পল্লব মুদারম্।"

ছোট একটি মন্দির। কাঠের দরজা, মন্দিরের মেঝে অনেকটা নিচে। চার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। ভেতরে একটা ভাঙা বেদী, একটি ঘন্টা এবং ভাঙা শিবলিঙ্গ। এখানেই অষ্টাদশ পদ্যাসনে মহাকবি জয়দেব দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন। পাশেই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত দুটি শিবমন্দির আছে। সেখানেও বাউল গানের আসর বসেছে। আমরা অনেকক্ষণ সে আসরে ছিলাম।

আরও একটি দর্শনীয় স্থান আছে এখানে। অজয়ের তীর দিয়ে মাইল দেড়েক হেঁটে—বিল্বমঙ্গল ঘাট। অক্ষয় বট ও যুগল তমাল বৃক্ষ সেই পুণ্যময় রমণীয় স্থানেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই দর্শন করতে যান। আমরাও গিয়েছিলাম। কিন্তু বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কথা এখন থাক। আমরা এসেছি জয়দেবের মেলায়, সাধক কবি জয়দেব গোস্বামীর কথাই ভাবা যাক।

দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে বাংলায় এনেছিলেন। তাঁদের বংশেই সেই শতাব্দীর শেষভাগে এই গ্রামে সাধক কবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী। শৈশবেই জয়দেব পিতৃহীন হন। একটু বড় হবার পরে মা ছেলেকে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে গুরুদেব তাঁকে যত্নসহকারে লেখাপড়া শেখাতে থাকেন।

জয়দেবের বয়স যখন নয় বছর, তখন তাঁর স্নেহময়ী মাতা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মাকে দাহ করার পরে শ্মশান থেকে বালক জয়দেব আর স্বজনহীন ঘরে ফিরলেন না। তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়লেন।

বহু তীর্থ পরিক্রমার পরে তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিছুকাল পরে মাধবাচার্য নামে জনৈক ভগবদ্ভক্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সেখানেই বাস করতে থাকেন।

আঠারো বছর বয়সে সন্ন্যাসী জয়দেবকে সংসারী হতে হয়। কথিত আছে জগন্নাথদেবের আদেশে সুদেব ও সুমতি নামে এক ব্রাহ্মণ দম্পতি তাঁদের কন্যা পদ্মাবতীকে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য সুদেব জয়দেবকে অনুরোধ করেন। জয়দেব সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু পদ্মাবতী জয়দেবকে বলেন, "আপনি পরিত্যাগ করিলেও আমি আপনার শ্রীচরণ-সেবিকা হইয়া থাকিব।"

সরল পদ্মাবতীর সেই অকপট বাণীতে বিমুগ্ধ জয়দেব সানন্দে তাঁকে পত্নীরূপে বরণ করেন। পত্নীকে তিনি এই পুণ্যভূমি কেন্দুবিল্বে ফিরে এসে বসবাস শুরু করেন। রাধামাধবের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সাধক কবির জীবন যাপন করতে থাকেন।

কিছুকাল পরে একদিন পথে তাঁর সঙ্গে গৌড়াধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। লক্ষ্মণ সেন তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁকে পঞ্চরত্ন সভার প্রধানরত্ন রূপে নির্বাচিত করেন। জয়দেব রাজার অনুরোধে পদ্মাবতীকে নিয়ে গৌড়ে যান। এবং কিছুদিন রাজভবনে বাস করে এখানে ফিরে আসেন। তারপরে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন রাধামাধব মন্দির নির্মাণ করে দেন।

গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করার পরে জয়দেব শিষ্য পরাশরকে নিয়ে আবার পুরী যান এবং পরমপুরুষ জগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর এই অমরকাব্য উৎসর্গ করে ফিরে আসেন। এই পুণ্যক্ষেত্রেই আর এক পৌষ সংক্রান্তিতে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। সেই পুণ্যতিথি থেকেই এই মেলা চলে আসছে।

মেলার কথা আগেই বলেছি। বেশ বড় মেলা। বহু দোকান-পাট। অসংখ্য ক্রেতা। সকাল থেকেই দলে দলে মানুষ আসছিলেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিড় বেড়েছে। কেবল মানুষ আর মানুষ। হাসি আর গানে উচ্ছল আনন্দময় মানুষ। আজকের যুগে একসঙ্গে এতগুলি এমন মানুষ দেখতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের। আমরা সৌভাগ্যবান। আমরা এই মেলায় এসেছি।

পাঁচ শ' বছরের পুরনো মেলা। কে কবে প্রথম এই মেলার আয়োজন করেছিলেন জানি না।

তবে আজ এই আনন্দমেলায় দাঁড়িয়ে আমার বার বার মনে হয়েছে এ মেলা নিজে থেকেই আয়োজিত হয়েছে। ধন-মান ও প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, মানুষ মনের তাগিদে এখানে এসে সমবেত হয়েছে। জীবনের জঞ্জালকে হৃদয়ের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আর এই সবকিছুর মূলে রয়েছে কবিপ্রীতি। যে প্রীতি মহাকবি জয়দেব গোস্বামীকে মহাকালের কবলগ্রাস থেকে মুক্ত করে মহাজীবন দান করেছে। পাঁচ শ' বছর আগের এক কবিকে কেন্দ্র করে শহর থেকে দূরে অবস্থিত এই অনুন্নত গ্রামে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এটা সত্যই বিস্ময়কর। জয়দেবের চেয়ে জনপ্রিয় কবি ও সাধক বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোথায়, তাঁদের জন্ম কিম্বা মৃত্যুতিথিতে তো এমন মেলা বসে না!

আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে এ মেলার। এবং সেই বৈশিষ্ট্যের জন্যই জয়দেবের মেলা চিরস্মরণীয়। এ মেলায়ও দোকান-পাট বসেছে, কেনা-কাটা চলেছে। কিন্তু কেবল কেনা-বেচার মেলা নয় এটি। জয়দেবের মেলা, বৈরাগীর মেলা, বাউলের মেলা, গানের মেলা।

বাংলার বিভিন্নপ্রান্ত থেকে দলে দলে বাউল এসে সমবেত হয়েছেন কেন্দুবিল্বের বটতলায়। অপূর্ব সুন্দর এই বৃদ্ধবট—বেদনাপা বট। বড় বড় ঝুরি নেমেছে চারিদিকে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে তার শাখা-প্রশাখার চন্দ্রাতপ। তারই ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন বহু বৈরাগী ও বাউল। তাঁরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গানের আসর পেতেছেন। আমরা কেবল এক আসরের গান শেষ হলে অপর আসরে এসে বসছি। মধুকরের মত ঘুরে ঘুরে মধু আহরণ করছি।

সত্যই মধু। এমন মিঠে পদ আর সুমিষ্ট সুর শুনতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। অথচ এ জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। যে কেউ এখানে এসে পল্লীবাংলার প্রাণের কথায় গাঁথা হৃদয়ের উদাসী সুরে গাওয়া গান শুনতে পাবেন। এর কোন সময় অসময় নেই। চারদিন ধরে মেলা হয়। এই চারদিন সর্বক্ষণ এখানে গানের আসর পাতা। অথচ গায়করা এ জন্য কোন পারিশ্রমিক পান না। দরিদ্র এই শিল্পীর দল নিজ নিজ খরচে এখানে এসে সমবেত শ্রোতাদের গান শুনিয়ে যান। তাঁদের আশ্রয় ও আহারের ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। তবু তাঁরা কোন অভিযোগ করেন না। খাবার জুটলে খান, না জুটলে উপোস করেন। আশ্রয় পেলে বিশ্রাম করেন, না পেলে পথের পাশে বসে থাকেন। ওঁরা যে খেতে বা ঘুমোতে এখানে আসেন নি' এসেছেন গান শোনাতে—ওরা বাউল, বাংলার কোকিল।

তাই ওঁদের মুখে সর্বদা সুখের হাসিটি লেগে রয়েছে। মাথায় ঝুটি বেঁধে, গেরুয়া আলখাল্লা পরে, পায়ে ঘুঙুর দিয়ে, একতারা হাতে নিয়ে ওঁরা নেচে নেচে গাইছেন—

"প্রেম করা সই আমার হল না,
যত প্রেম পেল ঐ পুঁচকে ছোঁড়া,
এক প্রেমেতে নিমাই সন্ন্যাসী,
আর এক প্রেমে রত্নাকর হল বাল্মিকী-ঋষি,
আর এক প্রেমে মীরাবাঈয়ের সংসারে মন মজল না।
প্রেম করা সই আমার হল না।"

যে কাহিনী চিরকালের

লা মিজারেবল ঃ হুগো

সুজন রায়

ফরাসী সাহিত্যে অবিস্মরণীয় ভিক্টর হুগোর নাম। তাঁর বহু রচনা। বহু বিচিত্র তাঁর সাহিত্য সম্ভার। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই বইটি জগৎ-সাহিত্য সভার সামনের সারিতে আসন লাভ করেছে। আজও পর্যন্ত সে আসন অটুট! এই প্রচণ্ড-মনুভূতিপ্রবণ উপন্যাসে ভিক্টর হুগো মানুষকে দেখেছেন তার ভাল এবং মন্দ দু'দিক থেকে, দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের পক্ষে সওয়াল করেছেন, সমাজের চোখে যারা হীন, সমাজ-বিরোধী তাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন মনুষ্যত্বের মহিমা। সেদিক থেকে লা মিজারেবল এক অনন্য উপন্যাস।

। এক ।

দারিদ্র। নিষ্করুণ, দুঃসহ দারিদ্র, যা মানুষের চিত্ত বিকৃতি ঘটায়, মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। কোন সহানুভূতি নেই, কোন সাহায্য নেই, কোন দয়া মমতা নেই—তুমি দরিদ্র, অতএব তুমি জাহান্নমে যাও, খেতে না পেয়ে মরে যাও, সমাজের উপরতলায় তার কোন ছায়া পড়বে না।

এমনি দারিদ্রের কবলে পড়েছিল প্যারিস শহরের দুর্ভাগা বস্তিবাসী, জিন্ ভলজীন। অনেক চেষ্টা করল সে, অনেক লড়াই করল, কিন্তু তার দারিদ্র দিন দিন বেড়েই চলল। দু'বেলা থেকে একবেলা, তারপর সারা দিনই উপোস!

দুর্দান্ত শীত, তার অনাহার। আয়ুষ্কাল বুঝি শেষ হোল তার। বাঁচার শেষ তাগিদ জাগল তার মনে। মরিয়া হোয়ে একদিন একটা রুটির দোকানে ঢুকে একখানা রুটি চুরী করতে গিয়ে ধরা পড়ল।

ধরা তো পড়বেই। কারণ, সে তো পাকা পেশাদার চোর নয়! তাই সহজেই ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাজত। সেখান থেকে আদালত। সংক্ষিপ্ত বিচার। প্রমাণ হাতে হাতে। অতএব জেল পাঁচবছর। তার দুঃখের কাহিনী শুনে বিচারক মুখ বেঁকালেন শুধু, বললেন, ধরা পড়লে সবলেই ওইরকম বলে।

জেলে আহার পেয়ে জিন ভলজীন চাংগা হোয়ে উঠল। তারপর সে স্থির করল, জেলে সে থাকবে না। সে পালাবে।

কিন্তু জেল ভেঙে পালানো কি সহজ? ধরা পড়ল। জেলের মেয়াদ বেড়ে গেল। আবার চেষ্টা করল, আবার ধরা পড়ল, আবার মেয়াদ বাড়ল। এইভাবে সে কুড়ি বছর জেলবাসের পর ছাড়া পেল একদিন।

কোথায় আত্মীয় স্বজন? সব মরে সোপাট! কোথাও গিয়ে একবেলা থাকতে পারে এমন আশ্রয়ও একটা পাওয়া গেল না। উলটে, লোক তার পোষাক আশাক আর চেহারা দেখে তাকে চোর গুণ্ডা ডাকাত মনে করে দূর দূর করে প্রতি পল্লী থেকে খেদিয়ে দিল।

কোন উপায় নেই। বাঁচবার আর কোন আশা নেই। আজ রাত্তেই শীতে আর অনাহারে সে মারা পড়বে নির্ঘাৎ। শেষকালে থানায় গিয়ে হাজির হল সে। তার অবস্থা জানিয়ে বললে, আজ রাতটা আমায় হাজতে থাকতে দিন। কাল সকালে উঠেই আমি চলে যাব।

থানাদার বললে, সে কেমন করে হবে? তুমি কোন অপরাধ না করলে তো তোমায় আমরা হাজতে দিতে পারি না।

হতাশ হল জিন। অদূরে ছিল একটা গির্জা। সেখানে গিয়ে গেটের ধারে একটা পাথরের বেদীর উপর বসে পড়ল। শরীরে আর কোন শক্তি নেই। এইখানে বসে সে রাতটা কাটিয়ে দেবে। মরে তো এইখানেই মরবে।

একটু পরে এক মহিলা গির্জা থেকে বেরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে তার অবস্থা শুনে বললেন, গির্জার পাশেই বিশপের বাড়ী। তুমি সেখানে যাও। নিশ্চয় আশ্রয় পাবে।

জিনের বিশ্বাস হলনা। কোন মানুষের কাছে তার আর কোন প্রত্যাশা নেই। তবুও শেষ আশা নিয়ে সে বিশপের বাড়ী উপস্থিত হল। বিশপ তখন বৈঠকখানায় বসে বই পড়ছিলেন। দরজায় মানুষের সাড়া পেয়ে বললেন, ভিতরে আসুন।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে জিন এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, আমি একজন জেল ফেরৎ আসামী। দুড়ি বছর জেল খাটার পর আজ ছাড়া পেয়েছি। কোথাও কোন আশ্রয় পাইনি। সারাদিন কিছু খেতে পাইনি। আজ রাতের মতো আশ্রয় চাই আর কিছু খেতে চাই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

বিশপ তাড়াতাড়ি বললেন, বসুন, বসুন, আশ্রয় পাবেন বৈকি!

বিশপের স্ত্রীপুত্র ছিলনা। তাঁর সংসারে ছিল তাঁর ভগ্নী। তিনিই সংসার চালনা করতেন। তাঁকে ডেকে বিশপ বললেন, একজন অতিথি এসেছেন। তিনি আমার সঙ্গে খাবেন। সেইমত ব্যবস্থা কর। আর অতিথির সম্মানে আজ রূপোর বাসনগুলো বার কর।

জিনের চেহারা আর পোষাক দেখে ভগ্নী অবাক! এই লোক আবার মাননীয় অতিথি! যাই হোক, তিনি যথার্থ কথামত ব্যবস্থা করলেন। বিশপ আর জিন দু'জনে একত্রে আহার করল! এত সব ভাল খাবার জিন জীবনে খায় নি। সে সোল্লাসে খেয়ে ফেলল সব।

খাওয়া শেষ হলে বিশপ জিনকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই ঘরে বিছানা পাতা আছে। আপনি শ্রান্ত। শুয়ে পড়ুন।

এই বলে বিশপ চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়ি নিস্তব্ধ হল। সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু জিনের চোখে ঘুম নেই। দুড়ি বছর ধরে সে জেলের পাথরের মেঝেতে শুয়ে কাটিয়েছে, এত নরম বিছানায় তার ঘুম হবে কেন? তার অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। উঠে বসল সে। মনে পড়ল, রূপোর বাসনগুলোর কথা, পাশের ঘরের আলমারিতে সেগুলো রয়েছে। আলমারিতে চাবি নেই। খুব সোজা কাজ। গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। কেউ জানতে পারবে না! লোভ! সাংঘাতিক মনোবৃত্তি! জিন ভলজীন লোভে পড়ল। শেষ রাত্রে উঠে পাশের ঘর থেকে সব বাসনগুলো একটা পুটলি বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল! সদর দরজাতেও কোন চাবি লাগানো ছিল না। বিশপের বাড়িতে কোন দরজাতেই চাবি লাগাবার রেওয়াজ ছিল না।

সকালবেলা বাসন চুরি গেছে দেখে বিশপের কোন ভাবান্তর নেই। বললেন, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, অত বিলাসিতা আমার সাজে না, তাই ভগবান বাসনগুলো ওকে দিয়েছেন। ভালই হয়েছে।

কিন্তু জিন বাসনের পুঁটলি নিয়ে বেশিদূর যেতে পারল না। একে তার ওই চেহারা, তার ওপর কাঁধে একটা নতুন কাপড়ের পুঁটলি। রাস্তায় পুলিশ তাকে দেখে সন্দেহ করে তার পুঁটলি খুলে তল্লাস করল।

এত রুপোর বাসন! কোথায় পেলে তুমি?

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে জিন কাঁপা গলায় বললে, বিশপ আমায় দিয়েছেন।

হঠাৎ এতগুলো বাসন তোমায় দিলেন? আচ্ছা, চল তাঁর কাছে। এখনি মীমাংসা হবে।

যাক, তাহলে আবার জেলে যেতে হবে। ভালই হবে, ভাবল জিন। জেলে গেলে না খেয়ে মরতে হবে না।

জিনকে নিয়ে পুলিশ এলো বিশপের বাড়ী।

বিশপ বেরিয়ে এসে জিনকে দেখে সঙ্গের পুলিশকে বললেন, ব্যাপার কি! ওকে ধরে এনেছো কেন?

ওর কাছে অনেকগুলো রুপোর বাসন পাওয়া গেছে। লোকটা বলছে, আপনি নাকি সেগুলো ওকে দিয়েছেন। তাই সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে এনেছি।

বিশপ শান্তকণ্ঠে বললেন, ও সত্যি কথাই বলেছে। ওগুলো আমি ওকে দিয়েছি।

তারপর জিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, বন্ধু, এই সঙ্গে রুপোর বাতিদান দুটোও তোমায় দিয়েছিলাম। সে দুটো নাও নি কেন? একটু দাঁড়াও, সে দুটো তোমায় এনেছি।

এই বলে তিনি ঘর থেকে দুটো রুপোর বাতিদান এনে জিনের হাতে দিলেন।

পুলিশ ফিরে চলে গেল। জিন ভলজীন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে গিয়ে নীচু গলায় বিশপ বললেন, যাও বন্ধু, তোমায় আশীর্বাদ করি, এখন থেকে তোমার জীবন সৎপথে চলুক। তোমার দ্বারা যেন মানুষের উপকার হয়।

॥ দুই ॥

অভিভূতের মতো জিন ভলজীন রাস্তা দিয়ে চলেছে। সে ভাবছে বিশপের মহত্বের কথা। এমন মানুষও এ পৃথিবীতে আছে? তার মনের মধ্যে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে সে গ্রামের প্রান্তে একটা সাঁকোর ধারে গিয়ে বসল। সেই সময় একটি ছেলে একটা টাকা লুফতে লুফতে সেখান দিয়ে দোকানে যাচ্ছিল। সাঁকোর কাছে এসে হঠাৎ টাকাটা তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে এসে পড়ল জিনের পায়ের কাছে আর জিন অন্যমনস্ক হয়ে টাকাটার উপর পা চাপিয়ে দিল।

ছেলেটা এগিয়ে এসে জিনের পা ধরে টানাটানি করতে লাগল।

এই! কি হচ্ছে। ধমক দিয়ে উঠল জিন।

আমার টাকা! দাওনা! কেন দিচ্ছ না!

জিন তখন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। ছেলেটার কথায় বিরক্ত হয়ে আবার ভীষণ এক ধমক দিল। তার চেহারা দেখে আর ধমক শুনে ছেলেটা ভয়ে সেখান থেকে পালালো!

কিছুক্ষণ পরে জিন যখন উঠে দাঁড়িয়েছে, দেখল, তার ডান পায়ের নীচে একটা টাকা। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার কথা তার মনে পড়ল। দারুণ অনুশোচনায় বিহ্বল হোয়ে সে টাকাটা হাতে নিয়ে ছেলেটার উদ্দেশে ছুটল। কিন্তু তার দেখা পেল না। গভীর অনুতাপে কেঁদে ফেলল জিন ভলজীন।

তারপর একটা বড় শহরে গিয়ে সে একটা কারখানা স্থাপন করল। তার হাতে তখন অনেক টাকা। রুপোর বাসনগুলো বিক্রি করে অনেক টাকা পেয়েছে সে।

দেখতে দেখতে তার কারখানা বড় হয়ে উঠল। অনেক লোক খাটতে লাগল। অনেক টাকা আয় হোতে লাগল। কিন্তু জিনের মধ্যে ইতিমধ্যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। টাকার প্রতি তার আর আগেকার মতো লোভ নেই। সে দান করে অকাতরে। কর্মচারীদের প্রতি সব সময় সদয় ব্যবহার করে। কোন দুঃখী আসুক তার কাছে বিমুখ হয় না। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন নাম নিয়েছিল সে, ম্যাডেলিন। লোকে শ্রদ্ধা করে বলত কাদার ম্যাডেলিন।

জিনের কারখানায় জ্যাভার্ট নামে একজন লোক কাজে ঢুকেছিল। আসলে সে ছিল পুলিশের দারোগা, অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ সৎ কর্মী। জিনের প্রতি তার বরাবরই একটা সন্দেহ ছিল। তাই সে তার আসল রূপ জানবার জন্যে তার কারখানায় কাজ নিয়েছিল।

ফ্যানটাইন বলে একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক ছিল জিনের কারখানায়। তার একটি মেয়ে ছিল, নাম কসেটি। মেয়েটিকে তার মা বিদেশে এক দোকানদারের কাছে রেখেছিল এবং তার নামে প্রতি মাসে টাকা পাঠাতো। হঠাৎ কঠিন অসুখে ফ্যানটাইন মারা গেল। মৃত্যুর আগে সে জিনকে বলে গেল যেন কসেটির ভার জিন নেয়। জিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্যানটাইনকে মৃত্যুর সময় সান্ত্বনা দিল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে জ্যাভার্ট জিনের কাছে এসে বললে, আমার চাকরি থেকে বরখাস্ত করুন আপনি।

বিস্মিত হয়ে জিন বললে, কেন? কি দোষ করেছো তুমি?

জ্যাভার্ট বললে, জিন জলজীন নামে এক ধাগী আসামী ছিল। একটা ছোট ছেলের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেবার জন্যে তার নামে পরোয়ানা বেরিয়েছিল। আমি আপনাকেই জিন জলজীন মনে করে আপনাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সদর থানায় লিখেছিলাম

কম্পিত জিন প্রশ্ন করল, তারপর?

জ্যাভার্ট বললে, সদর থানা থেকে খবর এসেছে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কেন না, জিন জলজীন ধরা পড়েছে। আগামীকাল তার বিচার হবে।

জিন হেসে বললে, এই ব্যাপার! আচ্ছা, তুমি এখন যাও। কাজ কর গে!

জ্যাভার্ট চলে গেল। জিনের অন্তরে প্রচণ্ড আলোড়ন! তার জন্যে একজন নির্দোষী সাজা পাবে? তা সে সইতে পারবে না। সত্য পরিচয় দিলে, তার এই বিপুল মান সম্মান অর্থ সবই এক নিমেষে চলে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বিশপের কথা মনে পড়ল, তোমার দ্বারা যেন মানুষের উপকার হয়।

টাকাকড়ি যেখানে যা ছিল সব একটা গুপ্তস্থানে রেখে পরদিন জিন সদর থানায় গিয়ে উপস্থিত হল। আসামীর কাঠগড়ার সামনে গিয়ে সে যখন নিজের পরিচয় ঘোষণা করল তখন সারা আদালত চমৎকৃত, কাদার ম্যাডেলিন, ধার্মিক দয়ালু, ভক্তিভাজন, পরোপকারী কাদার ম্যাডেলিন আসলে জিন জলজীন, এক জেল-ফেরৎ ধাগী চোর!

বিচারক স্তম্ভিত! আদালত স্তব্ধ! নির্দোষী লোকটি ছাড়া পেল। কিন্তু জিন জলজীনকে কেউ গ্রেপ্তার করল না। সে আদালতের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

জ্যাভার্টও এসেছিল আদালতে। সে কিন্তু জিনকে রেহাই দিল না। কর্তব্য তাকে করতেই হবে।

জিন ভলজীন মহৎলোক সন্দেহ নেই, কিন্তু আইনের চোখে সে অপরাধী! অতএব জ্যাভার্ট তাকে গ্রেপ্তার করে চালান দিল।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই খবর পাওয়া গেল, একটা জাহাজে কাজ করবার সময় পালাতে গিয়ে জিন ভলজীন সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে।

॥ তিন ॥

দূরবর্তী এক শহরে আবার জিন ভলজীনকে দেখা গেল এক নতুন আনন্দময় পরিবেশে! ইতিমধ্যে ফ্যানটাইনের মেয়ে কসেটিকে সে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে। কসেটিকে নিয়ে জিন মহাআনন্দে আছে। দশ বছরের মেয়েটি যেন তার প্রাণ! আর কসেটিও এতদিন অত্যন্ত নিষ্ঠুর পরিবেশে অত্যাচারের মধ্যে ছিল, এখন নতুন জীবন পেয়ে সে যেন বেঁচে উঠেছে। নিজের বাপের মতোই জিনকে ভালবাসে, ভক্তি করে।

নিরাপদে এবং পরম সুখে দেখতে দেখতে পাঁচ ছ' বছর কেটে গেল। কসেটি যৌবনে পা দিল। অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠল সে। সেই অঞ্চলে ছিল এক ধনী ব্যারন। তাঁর ছেলে মেরিয়াসের সঙ্গে কসেটির পরিচয় হল এবং প্রথম দেখাতেই দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে ফেললো।

একদিকে যেমন আনন্দিত হল জিন, অন্যদিকে কাতর বোধ করল তেমনি। মেরিয়াসের সঙ্গে কসেটির বিয়ে হবে, এতো মহাআনন্দের কথা। কিন্তু বিয়ে হলে কসেটি আর তার কাছে থাকবে না, এই দুঃখে জিনের বুক যেন ভেঙে পড়ল! কিন্তু উপায় নেই। কসেটিকে সুখী করতে হবে। সেজন্যে নিজের সুখের কথা ভাবলে তো চলবে না।

ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লব শুরু হোয়ে গেল এবং মেরিয়াসও সেই বিপ্লবে যোগ দিল। প্যারিসের রাস্তায় যেসব খণ্ডযুদ্ধ চলল তার মধ্যে মেরিয়াস এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল। তার যাতে কোন বিপদ না ঘটে সে জন্যে জিন সর্ব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতো, তার পিছনে পিছনে ঘুরতো।

এই সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল। ইন্সপেক্টার জ্যাভার্ট রাজার তরফে বিদ্রোহীদের দমন করবার কাজে নিযুক্ত ছিল, হঠাৎ সে বন্দী হল তাদের হাতে এবং বিদ্রোহীরা তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করল।

জিনকে বিদ্রোহীরা জানতো একজন পরোপকারী মানুষ বলে, তারা তাকে শ্রদ্ধা করত খুব। তাই জিন যখন তাদের কাছে গিয়ে বললে যে সে নিজের হাতে জ্যাভার্টকে গুলি করে মারবে, তখন তারা কেউ আপত্তি করল না, বিনা দ্বিধায় জ্যাভার্টকে জিনের হাতে ছেড়ে দিল।

জ্যাভার্টকে নিয়ে জিন একটু ঘুরে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর তার হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে বললে, তুমি এইদিক দিয়ে চলে যাও, এদিকটা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর, এরপর যদি আমায় গ্রেপ্তার করতে চাও তো এই ঠিকানায় গিয়ে আমার খোঁজ কোরো। আমি থাকবো।

জিনের আচরণে জ্যাভার্ট বিহ্বল হতভম্ব হয়ে গেল। ঠিকানা জেনে নিয়ে সে চলে গেল। জিন তখন সেখানে দাঁড়িয়ে শিস্তলের একটা ফাঁকা আওয়াজ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলো। বিদ্রোহীরা তখন চারিদিকে পালাচ্ছে। রাজার সৈন্যরা তাদের তাড়া করেছে, তারা বেপরোয়া গুলি ছুঁড়ছে। চতুর্দিকে ভীষণ চিৎকার, গোলমাল, ছুটোছুটি।

তারই মধ্যে গুলি লেগে মেরিয়াস সাংঘাতিক জখম হল। দূর থেকে দেখতে পেয়ে জিন ছুটে তার কাছে গেল এবং তার অচেতন দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে কোন রকমে একটা নর্দমার ভিতর দিয়ে পালালো। রাজার সৈন্যরা তখন হৈ হৈ করে অন্যদিকে ছুটে চলেছে।

কিছুদূর গিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে জিন নর্দমা থেকে উঠে এলো। তার কোলে সংজ্ঞাশূন্য মেরিয়াস।

নর্দমা থেকে উঠেই জিন চমকে উঠল। তার সামনে দাঁড়িয়ে, ইন্সপেক্টার জ্যাভার্ট। প্রথমটা দু'জনেই যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তারপর ধীর শান্তস্বরে জিন বললে, দয়া করে যদি আমার সঙ্গে আস, তাহলে এই আহত লোকটিকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি তোমার সঙ্গে থানায় যেতে পারি।

জ্যাভার্ট কোন কথা না বলে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। তার মন তখন এক বিচিত্র দ্বিধা দ্বন্দ্বে আলোড়িত!

মেরিয়াসকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে জিন বললে, আমার নিজের বাড়িতে দু'মিনিটের জন্যে একবার যেতে পারি কি?

জ্যাভার্ট ঘাড় নেড়ে বললে, চল।

জিন নিজের বাড়ি গিয়ে ভিতরে চলে গেল। জ্যাভার্ট দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। বাড়িতে গিয়ে কাগজপত্রগুলো কসেটের হাতে দিয়ে মেরিয়াসের আঘাতের কথা তাকে জানিয়ে জিন নীচে নেমে এলো।

কিন্তু কোথায় জ্যাভার্ট। সে চলে গেছে!

রাস্তায় যেতে যেতে অন্তর বিদীর্ণ করে বোধ করতে লাগল কঠিন-হৃদয় কর্তব্যপরায়ণ পুলিস ইন্সপেক্টার জ্যাভার্ট! মানুষের জীবনে শুধু কর্তব্য-পালনই কি সবচেয়ে বড় কথা? কৃতজ্ঞতার দাম নেই? যে-লোকটি তাকে পরমশত্রু জেনেও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচালো, সেই মহানুভব মানুষকে সে জেলে নিয়ে যাবে কোন্ প্রাণে? কিন্তু সে সরকারের চাকর! জেনেশুনে হাতে পেয়ে সে জিনকে ছেড়ে দেবেই বা কেমন করে? তাহলে যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে! কিন্তু না। জিনকে সে ধরতে গিয়ে যাবে না। তাহলে সে কি সরকারের কাছে অপরাধী হবে না?

ভেবে কূল কিনারা পেল না জ্যাভার্ট! কর্তব্যভ্রষ্ট হয়ে সে জীবনযাপন করতে পারবে না। আবার জিনকেও সে গ্রেপ্তার করতে পারবে না! একদিকে কর্তব্যনিষ্ঠা। অপর দিকে বিবেক! এ সমস্যার সমাধান করতে পারলো না জ্যাভার্ট। অবশেষে এই মানসিক দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে সে সীন নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল।

এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই মেরিয়াস সম্পূর্ণ সেরে উঠল, তারপর এক শুভলগ্নে কসেটের সঙ্গে তার বিয়ে হোয়ে গেল। জিন তার জীবনের সব কথাই মেরিয়াসকে বলেছিল। মেরিয়াস সব জেনে বিয়েতে আপত্তি করে নি বটে, কিন্তু বিয়ের পর কসেটিকে আর বড় একটা জিনের কাছে পাঠাতো না, নিজেও যেতো না তার কাছে।

তারপর যেদিন মেরিয়াস শুনল যে বিপ্লবের সেই দারুণ দিনে জিনই তার প্রাণ রক্ষা করেছিল তখন সেই দিনই সে কসেটিকে নিয়ে জিনের কাছে গেল। এতবড় একজন মহাপ্রাণ মানুষের প্রতি সে অবিচার করেছিল, তাই তার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে মনে মনে ব্যাকুল হোয়ে উঠেছিল মেরিয়াস।

কিছুদিন ধরেই জিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

যখন মেরিয়াস আর কসেটি তার কাছে এলো তখন জিন মৃত্যুশয্যায়। কসেটি আর মেরিয়াসকে দেখে তার মুখে করুণ মধুর হাসি ফুটে উঠল। দু'হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করে জিন চিরজীবন চিরদিনের মত চোখ বুজলো। তার সেই মৃত্যু-শান্ত মুখ দেখে মনে হল যেন গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে।

জ্যোতির্ময়

বাঙালী ফুটবলের গুরু

ছোট পাটো চেহারা। অতি সাধারণ, ব্যক্তিত্বহীন। দেখলে মনে হয় না, এ মানুষ কখনো বড় ধরের ক্রীড়াকুশলী হোতে পারেন।

কিন্তু মানুষের বাইরেটা দেখে তো তাঁর ভিতরকার গুণ ধরা যায়না! তেমনি ধরা যেতো না, বাংলার ফুটবল এবং ক্রিকেটের আদিগুরু দুর্গাচরণ মজুমদারকে দেখে। তিনি যখন ব্যাট হাতে খেলতে নামতেন, ধীরে ধীরে ক্রিজের দিকে এগিয়ে যেতেন, তখন সাহেবরা ভাবতো, এ আবার কী খেলবে! তারপর যখন ঘন্টার ঘন্টা ধরে বল করে তাঁকে আউট করতে পারতো না তখন কেউ কেউ রেগে বলে উঠত, হোয়াট এ ডিফিকাল্ট প্লেয়ার! এক ঘন্টা খেললেন। রান করলেন মাত্র পাঁচটি! কিন্তু রানটা কিছু নয়, বিপক্ষ দলের আক্রমণের মরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলেন! তাঁর সহযোগীরা তখন অবাধে অক্লেশে রান তুলতে লাগলেন।

ফুটবলে বাঙালী তরুণদের যে ভাবে তিনি প্রাণপাত করে খেলতে শিখিয়েছেন, যে ভাবে ভাল উঠতি খেলোয়াড়কে চিনে নিয়ে তাকে উৎসাহ দিয়ে তৈরী করেছেন, তেমন দৃষ্টান্ত এদেশে কেন, ও দেশেও বেশি নেই। ফুটবলের প্রশিক্ষক হিসাবে দুর্গাচরণ বাবু ছিলেন যাকে বলে একমেবাদ্বিতীয়ম্!

১৮৪০ সালে কলকাতার মাঠে প্রথম ফুটবলের শব্দ শোনা যায়। তার চোদ্দ বছর পরে কলকাতার বাসিন্দারা আর একবার ফুটবল খেলা দেখল। তারপর ১৮৮৭ সালে কলকাতার মাঠে ফুটবলের ভিত পত্তন হল এবং ১৮৮৪ সালে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব জন্মলাভ করে সেই ভিতকে পাকা করে তুললো।

পর পর অনেকগুলি বিদেশী ও দেশী ফুটবল ক্লাব কলকাতার মাঠে তাদের দাপাদাপি সুরু করল। ১৮৮৫ সালে গড়ে উঠল উত্তর কলকাতার এরিয়ান্স ক্লাব। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতার তালিকায় একজনের নাম দেখা গেল—উমেশ চন্দ্র মজুমদার। উমেশচন্দ্র বললে কেউ চিনবে না। কিন্তু তাঁর ডাকনাম দুর্গাচরণ বাবু বললে চিনবে না এমন ক্রীড়ারসিক তখন কেউ ছিল না। যাঁরা তাকে দেখেছেন বা জেনেছেন তাঁরা আজো তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেন।

অসাধারণ চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন তিনি। সব সময়েই আত্মমগ্ন, যেন কি ভাবছেন। খেলার সময় দর্শক-আসনে বসে যেসব ছোট ছোট মন্তব্য করতেন তার মধ্যে ফুটে উঠতো তাঁর গভীর জ্ঞান এবং অনন্ত চিন্তা।

খেলোয়াড় হিসাবে যত না বড় ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন তিনি কোচ বা শিক্ষক হিসেবে। ১৯১৪ সালে কাসটমস-এর মারফুটে বিখ্যাত খেলোয়াড় জন গ্যালব্রেথ অন্যায় ভাবে তাঁকে ফাউল করে তাঁর হাঁটু ভেঙে দেয়। সেই থেকে তাঁর ফুটবল খেলায় চিরদিনের মতো ছেদ পড়ে। তার পরে অবশ্য অনেকদিন ক্রিকেট খেলেছেন।

ফুটবল খেলা থেকে অবসর নিয়ে দুর্বীরাম বাবু খেলোয়াড় তৈরীর কাজে নামলেন। তাঁর শিক্ষার গুণে অনেক উঠতি নতুন কাঁচা খেলোয়াড় অচির কালের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রূপে পরিগণিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আছে প্রচুর।

অগণিত তাঁর ছাত্র সংখ্যা! সকলকার কাছে তিনি ছিলেন—'স্যার'। কলকাতার খেলার মাঠে স্যার বললে একমাত্র তাঁকে বোঝাতো! শেষ পর্যন্ত কেউ আর তাঁর নাম ধরে বলত না। বলত, স্যার! অনেক ইউরোপীয় খেলোয়াড়ও তাঁকে স্যার বলে সম্বোধন করত এবং তাঁর কাছে খেলা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করত।

আজকের দিনে যে পদ্ধতিতে ফুটবল খেলার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, তিরিশ চল্লিশ বছর আগে দুর্বীরাম বাবু সেই প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। একখানা বইও লিখেছিলেন তিনি ফুটবল খেলা সম্পর্কে!

১৯১১ সালের শীলড বিজয়ী মোহনবাগানের দুই সেরা খেলোয়াড় বিজয়দাস ও শিবদাস ভাদুড়ীর প্রথম জীবনের শিক্ষাগুরু ছিলেন তিনিই।

শুধু কলকাতার মাঠে নয়, মাঝে মাঝে মফঃস্বলে চলে যেতেন তিনি। সেখানকার মাঠে যেসব খেলা হত তা দেখতেন এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন খেলোয়াড়দের নিয়ে আসতেন কলকাতায়, তাঁর নিজের দল এরিয়ানস ক্লাবে।

তাঁর দুর্ভাগ্য, অনেক খেলোয়াড়ই নাম করবার পর আরও নামের লোভে চলে যেতো মোহন-বাগানে। কিন্তু দুঃখ পেলেও দমতেন না তিনি। খেলোয়াড় তৈরীর কাজ তাঁর চলত অব্যাহত গতিতে। তাই তো, তখনকার দিনের এরিয়ান্স ক্লাবকে বলা হত, দি নার্শারি অফ বেংগলি ফুটবল!

যেসব বিখ্যাত খেলোয়াড় তাঁর হাতে তৈরী হয়েছিল তাদের অনেককে তিনি নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, যেমন রূপচাঁদ দক্ষাদার (কৃষ্ণ নগর), নাজাদ (পুর্নিয়া), সূর্য চক্রবর্তী (জলপাইগুড়ি), করুণা ভট্টাচার্য (বহরমপুর), মতিয়ার রহমান (চুয়াডাঙা), বীরেন ঘোষ (চুঁচড়া), তাছাড়া কলকাতার পূর্ণ দাস, বলাই চট্টোপাধ্যায়, ছোনে মজুমদার প্রভৃতি খ্যাতনাম খেলোয়াড় অনেক ছিল।

অসাধারণ মনোবল ছিল তাঁর। এক বছর একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলার আগে তিনি আহত হয়েছেন, সে খেলায় অংশ নিতে পারবেন না। তাই দলের মনোবল যেন ভেঙে পড়েছে, স্যার না থাকলে আমাদের চালনা করবে কে? কে অমন করে ফরওয়ার্ডদের পায়ে বল যুগিয়ে দেবে? কে অমন করে অমোঘ নির্দেশ দেবে?

বিপক্ষে এক শক্তিশালী মিলিটারী দল। এরিয়ানস-এর অধিনায়ক কালী ঘোষ পরামর্শ দিলেন, এ খেলাটা ওদের দিয়ে দেওয়া হোক, অর্থাৎ এরিয়ানস মাঠে নামবে না।

শুনে ধমকে উঠলেন দুর্গীরামবাবু, বললেন, "বৃদ্ধ গোবিন্দ সিংহ জীবিত থাকতে রণক্ষেত্র থেকে বিনাযুদ্ধে পলায়ন কখনো হোতে পারবে না। সেনাপতি যদি ভীত হোয়ে থাকে তো অন্তঃপুরে আশ্রয় নিক। আমি খেলবো।"

সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল, "সে কী! আপনি কী করে খেলবেন! পা যে ভীষণ জখম হয়ে রয়েছে।"

"তা থাক। দেখ না, কী করে খেলি।"

কারো নিষেধ শুনলেন না তিনি। খেলতে নামলেন। সাবধানে ধীর কদমে খেললেন সেন্টার হাফের মতো সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে।

পিছনে দাঁড়িয়ে কখনো বিপক্ষদের অনেক আক্রমণ, তারপর সুযোগ বুঝে এগিয়ে গিয়ে যে দুটি অতুলনীয় পাস দিলেন তা থেকে দুটো গোল হোয়ে গেল। তারপর আর একটা গোল। বিপক্ষদল শেষ পর্যন্ত একটি গোল পরিশোধ করল। এরিয়ানস জিতল ৩-১ গোলের ব্যবধানে।

যেমন বৃহচ্চিত্ত তেমনি নির্মল চরিত্রের মানুষ ছিলেন দুর্গীরামবাবু। কখনো কোন মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেননি। ইংরাজদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে কখনো লাঞ্চ পর্যন্ত খান নি। দেখেছি তাঁকে, ক্যালকাটা ক্রিকেট মাঠে ইডেন উদ্যানে। ক্যালকাটার সঙ্গে এরিয়ান্সের খেলা। লাঞ্চের সময় বাঙালী ও সাহেব খেলোয়াড়রা লাঞ্চ খেতে বসে গেল। দুর্গীরামবাবু একটি কমলালেবু হাতে করে প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

প্রথম বাঙালী টেস্ট খেলোয়াড়:

কী আকস্মিক মৃত্যু: আগের দিনেও অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী একটি খেলায় অংশ নিয়েছেন। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে বাংলার প্রথম ক্রিকেট টেস্ট খেলোয়াড় প্রবীর সেন (পি. সেন) হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন, এ খবর শুনে বাংলার ক্রিকেট-অনুরাগী মাত্রেই অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছেন।

নাটকীয় মৃত্যু। এমনি নাটকীয় ভাবেই তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের সুরু।

১৯৩১-৩২ সালের মরশুমে রনজি ট্রফিতে বাংলার সঙ্গে হোলকারের খেলা। হোলকার দলের নেতৃত্ব করছেন স্বর্গীয় সি. কে. নায়ডু। দুর্ধর্ষ দল হোলকার। সবাই জানে বাংলা দলের উইকেট কীপার রূপে নামবেন অমিয় বোস। বাংলা ব্যাটিং পেল। দেখা গেল, চতুর্থ ব্যাটসম্যান রূপে খেলতে নামলেন এক নতুন খেলোয়াড়। জানা গেল, তাঁর নাম পি. সেন। খোকন সেন নামেই তিনি ক্রিকেট-জগতে পরিচিত। সবাই উৎসুক হোয়ে দেখতে লাগল তাঁর খেলা। রানের পর রান করে চলেছেন। তাঁর রানের বাহারে মাঠসুদ্ধ দর্শক চমৎকৃত। সেঞ্চুরি করলেন প্রথম আবির্ভাবেই। ১৪২ রান।

তারপর উইকেট-রক্ষক রূপেও কী তাঁর অতুলনীয় তৎপরতা। সবাই বুঝলো, এক দিনে বাংলা একজন ব্যাটসম্যান-উইকেটকীপার পেয়েছে। সেই খেলাতেই খোকন সেন বাংলা ক্রিকেট অনুরাগীদের মন জয় করলেন।

উইকেট-কীপার হিসাবে খোকন সেনের অনেক রেকর্ড, অনেক খ্যাতি। শুধু এদেশে নয়, অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েও তিনি তাঁর অসামান্য ক্রীড়াকৃতির স্বাক্ষর রেখে এসেছেন। ১৯৪৭-৪৮ সালের মরশুমে ভারত অস্ট্রেলিয়া সফরে গেছে। খোকন সেন ভারতীয় দলের উইকেট-কীপার! অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডন ব্র্যাডম্যানের তখন রমরমা কাল! ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে খেলায় সেই দলের অধিনায়ক ব্র্যাডম্যান খেলতে নেমেছেন! উইকেট রক্ষা করছেন পি. সেন!

বেপরোয়া খেলছেন ব্যাডম্যান শুরু থেকেই! একবার এক পা এগিয়ে বলটা মারতে গিয়ে ফসকালেন! মুহূর্ত মাত্র! চকিতের মধ্যে খোকন সেন বল ধরে বেল্ উড়িয়ে দিয়েছেন! ক্রিজ ছেড়ে বোধ করি দু'তিন ইঞ্চি পা বেরিয়েছিল ব্র্যাডম্যানের। বলটা ফস্‌কেই পা টেনে নিয়েছেন। কিন্তু পলকের মধ্যে প্রায় অসাধ্য সাধন করলেন পি. সেন। ব্র্যাডম্যান স্টাম্প আউট হলেন। পরদিন বড় বড় করে খবর ছাপা হল অস্ট্রেলিয়ার কাগজে, "উইকেট রক্ষার অপূর্ব নজীর। সাবাস! ভারতীয় পি. সেন।"

ক্রিকেটে খোকন সেনের অনেক কীর্তি। ১৯৫০ সালের রনজি ট্রফিতে বিহারের বিরুদ্ধে নবম উইকেটে জ্যোতিষ মিত্রের সঙ্গে জুটি বেঁধে ২৩১ রান তুলে যে রেকর্ড করেছিলেন আজো তা অটুট আছে।

১৯৫০ সালে কটকের বিরুদ্ধে তিনি উইকেট রক্ষার দায়িত্ব অপরকে দিয়ে বল করেছিলেন এবং বোলিংএ অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। তিনি হ্যাটট্রিক করেছিলেন। এ পর্যন্ত আর কোন ভারতীয় উইকেট-রক্ষক প্রথম শ্রেণীর খেলায় বল করে পর পর তিন বলে তিনজনকে আউট করেছেন, এমন নজীর আর নেই।

ক্রিকেটকে সর্ব মনপ্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন তিনি। কালিঘাট ক্লাবে খেলতেন। বহুবার নিজের ক্লাব আর বাংলা দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। খেলা থেকে অবসর নেবার পর ক্রিকেট মরশুমে মাঠে তিনি কোন দিন অনুপস্থিত হন নি।

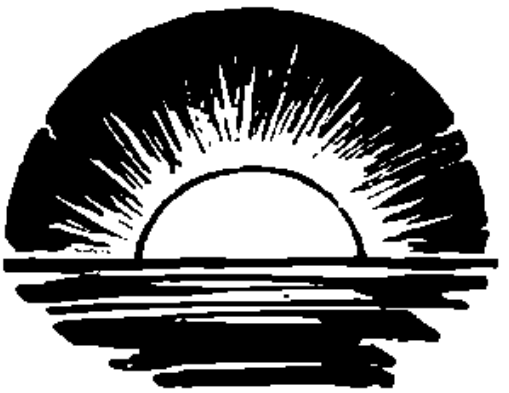

জীবননাট্যের খণ্ডচিত্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অনাথ উপাধ্যায়

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগত জয় করে ফিরেছেন। তাঁর সতীর্থরা মহা আনন্দে তাঁকে ঘিরে বসেছেন। তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রও আছেন। বিবেকানন্দ তাঁর আমেরিকার অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, সে দেশ কত অগ্রসর, সে দেশে মানুষের সেবার কত আয়োজন, দুঃস্থ, অনাথা বিশেষ করে আর্ত মানুষের সেবার জন্য সেখানে মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলির কত আদর,—এই সব কথা সবিস্তারে বলছেন তিনি। শুনতে শুনতে গিরিশচন্দ্র হঠাৎ বলে উঠলেন, ভাল লাগছে না তোমার কথা শুনতে!

সবাই অবাক! বিবেকানন্দ হেসে বললেন, হঠাৎ তোমার কি হল জি. সি. আমার ওপর বিরূপ কেন?

তোমার ওপর বিরূপ নই, নরেন। ভাবছি, আমাদের এই হতভাগ্য দেশের কথা। এইমাত্র দেখে এলাম, একটা লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে! কেউ তাকে দেখবার নেই। সবাই তার কাছ থেকে দূরে পালাচ্ছে! এমনি ঘটনা কতই ঘটছে আমাদের দেশে। তাই ভাবছি, আমাদের এই পোড়া দেশের জন্যে কিছু করতে পারো না! এখানে কি এমন একটা মিশন তৈরী হতে পারে না যার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর যা চাইতেন তাই হয়, দুঃস্থ মানুষের সেবা হয়!

গিরিশচন্দ্রের কথা শুনে বিবেকানন্দ বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, জি. সি.। তোমার মুখ দিয়ে ঠাকুরের নির্দেশ পেলাম আজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠবার এই হল আদি কথা।

• • • •

গিরিশচন্দ্র তখন স্টার থিয়েটারে। ভূনিবাবু (অমৃত বসু) সেই থিয়েটারের কর্তাব্যক্তি। দু'জনে থিয়েটারের দিন এক সঙ্গে আসতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর ঘোড়ার গাড়ী করে বোসপাড়া থেকে বেরিয়ে শ্যামপুকুরে এসে ভূনিবাবুকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিতেন। সেদিন রোজকার মত ভূনিবাবুকে তুলে নিয়ে গাড়ী প্রথমে গেল বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী তলায়। গিরিশচন্দ্র গাড়ি থেকে নেমে সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করলেন। তারপর গাড়ি গিয়ে থামলো গ্রে স্ট্রীটে কেলা-কালীর মন্দিরে। সেখান থেকে হাতিবাগানের ডাকাতে কালীর মন্দিরে! প্রতি মন্দিরেই গিরিশচন্দ্র খালি পায়ে গাড়ি থেকে নেমে প্রণাম করে এলেন। ভূনিবাবু কিন্তু নামলেনও না, প্রণামও করলেন না কোন মন্দিরেই! তিনি ওসব মানতেন না! গিরিশচন্দ্র গাড়িতে উঠলেন। ভূনিবাবু বললেন, আচ্ছা গুরু, রোজ রোজ যে এই কর্ম কর, এর কোন সুফল পাও? এমনি করে সিদ্ধেশ্বরী, কেলা-কালী আর ডাকাতে-কালী করতে করতে যে দেরী হোয়ে যায়!

গিরিশচন্দ্র বললেন, এমনি তো অনেক অপকর্ম করছি! একটু স্মরণ মনন, এই আর কি!

ভূনিবাবু বললেন, ওতে কিছু হবে না। যতই পেয়ার ঠোকো, তুমি যা তাই থাকবে, গুরু!

ভূনিবাবুর কথা শুনি গিরিশচন্দ্র আপন মনে কি যেন বললেন। তারপর সারাক্ষণ গম্ভীর হোয়েই রইলেন। থিয়েটারে এসেও তিনি যেন অন্যমনস্ক, যেন কি ভাবছেন। সেদিন দু'জনের কারুরই ভূমিকা ছিল না। ভূনিবাবু তদারক করছেন, একসময় চাকর এসে জানালো, কর্তা ভূনিবাবুকে ডাকছেন।

উপরে উঠে গিরিশচন্দ্রের ঘরে ঢুকে ভূনিবাবু দেখলেন, গিরিশবাবু মাটিতে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন, খালি গা, দু'চোখে তীব্র দৃষ্টি! ভূনিবাবুকে দেখে বললেন, বোসো আমার সামনে!

ভূনিবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, ব্যাপার কি গুরু!

ব্যাপার আর কি! তুমি তো কিছুই মান না, তাই চেষ্টা করে দেখছি তোমার চৈতন্য উৎপাদন করা যায় কি না!

ভূনিবাবু হাসলেন, আমার চৈতন্য আমার পকেটে আছে, তোমার ঘাওয়াই কোন কাজে লাগবে না।

গম্ভীরভাবে গিরিশচন্দ্র বললেন, আর কোন কথা নয়, চুপ করে বোসো! আমি যখন হাত তুলে ইসারা করব, তখন তুমি দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করবে!

এই বলে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ভূনিবাবু যেন বেশ মজা পেয়েছেন এইভাবে বসে টিপিটিপি হাসতে লাগলেন। মিনিট দশেক পরে গিরিশচন্দ্র আস্তে আস্তে হাত তুলে ইসারা করলেন। ভূনিবাবু দাঁড়িয়ে উঠে দু'পা এগিয়ে এলেন। তারপর তাঁর ডান হাতখানা গিরিশচন্দ্রের মাথার উপর রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূনিবাবুর সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেল, বজ্রাহত হলে মানুষ যেমন ছিটকে পড়ে তেমনি ঠিকরে পড়ে গেলেন তিনি! গিরিশচন্দ্র তখনো ধ্যানস্থ। উঠে বললেন ভূনিবাবু! গিরিশচন্দ্র সস্নেহ কণ্ঠে বললেন, লাগে নি তো তুমি!

ভূনিবাবুর চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে। বললেন, লেগেছে বই কি গুরু! আজকের মতো এমন মার তো জীবনে আর কখনো খাইনি!

• • • •

কোন ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হোয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই বিরাট কোন সৃষ্টিকর্মের পরিচয় দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র একবার নাটক রচনায় যে কর্মপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার আর বোধ করি তুলনা নেই। তাঁর সেই অদ্ভুত কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় জেনে মনে হয়, কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়, যেন কোন ঐশী শক্তি তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল, তাই তিনি তাঁর সেই অসাধারণ কর্মকে সমাধা করতে পেরেছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন ষ্টারের সঙ্গে ক্লাসিক থিয়েটার চালাচ্ছেন। গিরিশচন্দ্রকে মোটা বেতন দিয়ে রেখেছেন। গিরিশচন্দ্রের কাজ ছিল, নাটক লেখা, নাটক মকস্ করা এবং সাধারণভাবে থিয়েটারের ম্যানেজারি করা।

অনেকদিন গিরিশচন্দ্র কোন নাটক লিখতে পারেন নি! অমর দত্ত পুরনো নাটক, যথা —হরিরাজ, ভ্রমর, হারানিধি, এইসব দিয়েই থিয়েটার চালাচ্ছেন। মাঝে মাঝে গিরিশচন্দ্র অভিনয় করছেন, ম্যানেজারের কাজও দেখছেন।

একদিন সকালে অমর দত্ত এক চেঙাড়ি সন্দেশ আর খাবার নিয়ে গিরিশচন্দ্রের বাড়ি এলেন। তিনি যখনই আসতেন তখনই এইভাবে মিষ্টান্ন প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে আসতেন।

গিরিশচন্দ্র তখন তাঁর প্রিয় সহচর অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। অমর দত্ত হেলতে দুলতে এসে ঘরে ঢুকলেন।

গিরিশচন্দ্র বললেন, ওহে অবিনাশ, বাবু এসেছেন, শিগগির নবীনের দোকানে যাও।

অমর দত্ত নবীনের রসগোল্লা খেতে ভালবাসতেন। গিরিশচন্দ্র অমর দত্তকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করতেন।

অমর দত্ত বললেন, আজ থাক। তাড়া আছে। আমি এখনি উঠবো!

গিরিশচন্দ্র বললেন, তা বাবুর কি হুকুম, বলুন।

অমর দত্ত হেসে বললেন, হুকুম আর কি! অনেকদিন তো আপনার কাছ থেকে কোন নাটক পাইনি। আজকাল আর বোধ হয় লিখতে পারছেন না!

গিরিশচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

অমর দত্ত বলতে লাগলেন, তা সে আমি ম্যানেজ করে নেব। অন্য সব নাটক দিয়েও তো বেশ চলে যাচ্ছে। তবে এবার নতুন নাটকের দরকার। দেখি, নিজেই লিখবো না হয় অন্য কাউকে দিয়ে লেখাবো!

গিরিশচন্দ্র নীরবে অমর দত্তর কথাগুলো হজম করলেন। অমর দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। গিরিশচন্দ্র বললেন, বাবু কি চললেন?

হ্যাঁ, যাই, একটু বিশেষ কাজ আছে। একবার এটর্ণী বাড়ি যেতে হবে।

গিরিশচন্দ্র বললেন, বাবু কাল একবার সকালে আসবেন নাকি?

অমর দত্ত বললেন, কাল সকালে? কেন বলুন তো?

গিরিশচন্দ্র বললেন, এই নাটক সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বলব আর কি!

অমর দত্ত হেসে বললেন, কথাবার্তা আর বলবেন কি! নাটক কি আর শিগগির আপনার কাছ থেকে পাওয়া যাবে?

গিরিশচন্দ্র বললেন, চেষ্টা করব, দেখি কতদূর কি করতে পারি!

কিছু কি লিখেছেন?

এক লাইনও না।

তাহলে আর কি হবে? আচ্ছা যখন বলছেন, আসবো।

এই বলে অমর দত্ত চলে গেলেন।

অবিনাশের দিকে তাকিয়ে গিরিশচন্দ্র বললেন, হুজুর কি বলে গেল, তার মানে বুঝলে অবিনাশ?

অবিনাশ বললেন, আজ্ঞে···

বলে গেল, গিরিশ ঘোষ মরে গেছে, তাই না?

অবিনাশবাবু চুপ করে রইলেন। একটু পরে গিরিশচন্দ্র বললেন, আজ সন্ধ্যার পরেই এসো। বসব। খাওয়া দাওয়া সেরে এসো।

অবিনাশবাবু দেখলেন, গিরিশচন্দ্র যেন থমথম করছেন, যেন কি ভাবছেন। বললেন, যে আজ্ঞে, সন্ধ্যার সময়েই আসবো।

অবিনাশবাবু চলে গেলেন। গিরিশচন্দ্র সেদিন আর বেরুলেন না। সারাদিন যেন অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন।

সন্ধ্যার পরেই অবিনাশবাবু এলেন। গিরিশচন্দ্র বললেন, কাগজপত্র নিয়ে গুছিয়ে বস।

গিরিশচন্দ্রের জীবনের কথা যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে বলা বাহুল্য যে, নাটক লেখায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিলেখক ছিলেন অবিনাশবাবু। গিরিশচন্দ্র মুখে মুখে বলতেন আর অবিনাশবাবু লিখতেন। এই ভাবেই গিরিশচন্দ্রের সমস্ত নাটকই লেখা হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিলেন। তিনি যখন নিবিষ্ট চিত্তে কোন নাটক রচনায় ব্যাপৃত হতেন তখন এইভাবে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিতেন—বাইরে থেকে কোন শব্দ এসে যাতে তাঁর মনোযোগ ভঙ্গ না করে সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছো তো অবিনাশ? আজ একটু রাত হবে!

আজ্ঞে, তা হোক না রাত! খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছি!

ঘরের কোনে রাখা কুঁজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে গেলাসটা পাশে রেখে গিরিশচন্দ্র কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, দু'হাত কোলের উপর জড় করা। সেই অবস্থাতেই বললেন, লেখ অবিনাশ।

অবিনাশবাবু কলম তুলে নিয়ে কাগজের দিকে ঝুঁকে বসলেন।

গিরিশচন্দ্র বলতে আরম্ভ করলেন :

পশ্চিমে আরক্ত ভানু অস্তাচল গামী
আসে ছায়া বিকাশিয়া কায়া।
নিবিড় গহন, পাখী ফিরে নিজ নীড়ে।
স্তব্ধ, স্তব্ধ দূর গ্রাম্য কোলাহল···

জলদগম্ভীর স্বরে গিরিশচন্দ্র বলছেন আর অবিনাশবাবু লিখছেন।

পাতার পর পাতা লেখা হচ্ছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য! মাঝে মাঝে দু'এক চুমুক জল খাচ্ছেন গিরিশচন্দ্র, তারপর আবার শুরু করছেন।

সময় কেটে যাচ্ছে! কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যাচ্ছে তা দু'জনের কেউই যেন জানতে পারছেন না। কর্তা আজ নতুন নাটক রচনা করছেন, এই আনন্দে অবিনাশবাবু যেন তাঁর দ্রুত-লেখার শক্তি হাজার গুণ বেশি পেয়েছেন আজ! আর গিরিশচন্দ্র! তিনি যেন আজ অন্য জগতের মানুষ।

কত দৃশ্য! কত অঙ্ক! এ যে বিরাট নাটক সৃষ্টি হচ্ছে! অবিরাম বলে চলেছেন নাট্যকার আর অবিরাম লিখে চলেছেন তাঁর শ্রুতি লেখক :

না জানি কি গুরু অপরাধে
বহু লজ্জা দিয়েছো শ্রীহরি!···
তব পদ স্মরি করেছিনু পণ
রণে দুর্যোধনে করিব নিধন
গদাঘাতে ভাঙি উরু।
বলে বেঁধে তোমারে আনিয়ে
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী।
যাক মম প্রতিজ্ঞা অতলে
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন
কুলনে কৌরব রহুক হস্তিনাপুরে
শেষ নাহি করি।
কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব
এ কলংক অপিতে মাথায়
ইচ্ছা কিহে তব ইচ্ছাময়?

এ কী ভাষা। এ কী ছন্দ! লিখতে লিখতে অবিনাশবাবু রোমাঞ্চ অনুভব করছেন! কর্তার অনেক লেখাই তো লিখেছেন কিন্তু এ যেন একেবারে বৈরিণী ছন্দের চরম প্রকাশ :

হোলে কণ্ঠাগত প্রাণ
তবু নাম আর না আনিব মুখে...

পরম ভক্তের এ কী আর্তি, এ কী নতুন ব্যঞ্জনা।

যুদ্ধ বেধে গেল। একদিকে পাণ্ডব, কৌরব আর অন্যান্য রাজন্যবর্গ, অন্যদিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবকুল। যেহেতু পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণের কথা অমান্য করেছে সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে তাঁর পক্ষে তাঁরা পাণ্ডবদের ধ্বংস করবার জন্যে রণক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন—অষ্টবজ্র সম্মেলন হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, দৈববলে দেবতাদের অস্ত্রগুলি তাদের শক্তি হারিয়েছে, অতএব যুদ্ধ যদি হয় তাহলে দেবকুলের পরাজয় অনিবার্য। জয় হল ভীমসেনের, জয় হল পাণ্ডবদের। পুরাণের সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়!

একটি সুললিত গান দিয়ে নাটক শেষ করলেন গিরিশচন্দ্র! পাঁচটি অংক, তার সঙ্গে ক্রোড় অংক। বহু দৃশ্য! অনেক গান! ষড়রসের বিরাট নাটক!

অবিনাশবাবু বললেন, কি নাম দেবেন নাটকটির!

এক মুহূর্ত ভেবে গিরিশচন্দ্র বললেন, নাম দাও "পাণ্ডব-গৌরব।"

এক রাত্রের মধ্যে পাণ্ডব গৌরব নাটক রচনা সুরু এবং শেষ হয়েছিল! অবিনাশবাবু উঠে জানলা খুলে দিতেই এক ঝলক সূর্যের আলো এসে ঘরে পড়ল। গিরিশচন্দ্র বলে উঠলেন, আরে, এ যে বেশ বেলা হয়ে গেছে। অ্যাঁ! এতক্ষণ ধরে আমরা বলছি আর লিখছি। যাও, অবিনাশ, বাড়ি গিয়ে ঘুমোও সে।

অবিনাশবাবু সযত্নে পাণ্ডুলিপিটি বেঁধে ছেঁদে কর্তার ডেস্কের উপর রেখে চলে গেলেন।

সকাল দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ এলেন অমর দত্ত। দেখলেন, গিরিশচন্দ্র কতকটা আলু থালু বেশে বসে আছেন, তাঁর দু'চোখে লাল আভা, মনে ভাবলেন, কাল রাতে কর্তার মাত্রাটা বোধহয় বেশি হয়ে গেছে।

আসন গ্রহণ করে অমর দত্ত বললেন, আসতে বলেছিলেন তাই এলুম!

গিরিশচন্দ্র মৃদু হেসে ডেস্কের উপর থেকে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে অমর দত্তর সামনে রাখলেন।

অমরবাবু বললেন, কি এটা?

নাটক! বাবু তো কাল নাটকের জন্যে তাড়া দিয়ে গেলেন তাই একটা নাটক লিখে ফেললুম।

পাণ্ডুলিপির আয়তন দেখে অমরবাবু বিস্মিত, বললেন, এ তো বিরাট নাটক দেখছি! কম্‌প্লিট?

হ্যাঁ, কম্‌প্লিট বই কি? কমপ্লিট না হলে কি আর বাবুকে দিতে পারি।

কখন লিখলেন মশায়?

কাল রাত্রে?

এক রাত্রেই লেখা শেষ?

তাই তো দেখছি!

অমর দত্ত কিছুক্ষণ গিরিশচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলে গেলেন। থিয়েটারে গিয়ে বললেন—একটা নতুন নাটক এনেছি আজ। রিহার্সাল সুরু করব আজই।

তাঁর থিয়েটারের প্রধানা অভিনেত্রী সুকুমারী প্রশ্ন করলেন, কি নাটক? নাম কি?

অমরবাবু বললেন, গিরিশ গৌরব।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিগত যুগের মঞ্চনায়ক

ইন্দু মুখোপাধ্যায়

স্টার থিয়েটার। ১৯২৩ সাল। কর্ণার্জুন নাটক অভিনয়-জগতে যেন নতুন যুগ এনেছে। সেই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় যিনি নেমেছেন, দেখলাম, কী সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে, আর কী শ্রবণাভিরাম তাঁর কণ্ঠস্বর! নাম জানলাম, ইন্দু মুখোপাধ্যায়। সেই প্রথম সাধারণ মঞ্চে নেমেই তিনি দর্শকদের মনোযোগ করলেন। তারপর বহু নাটকে এবং চলচ্চিত্রে বহুবিধ ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেছে এবং সব ভূমিকাতেই তিনি যথাযথ সকল সুন্দর অভিনয় করেছেন।

১৮৯০ সালে ২৪ পরগণার গয়লাহাটা গ্রামে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় পরে ভবানীপুর অঞ্চলে এসে বসবাস করেন। সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে ইন্দু মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর সর্টহ্যাণ্ড-টাইপ শিখে কর্মজীবন শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই আবৃত্তি এবং অভিনয়ে তাঁর বুৎপত্তি দেখা যায়।

নৌবীন অভিনেতারূপে সীতাহরণ নাটকে কৈকেয়ীর চরিত্রে তাঁর প্রথম অভিনয়। অভিনয়ের বধ যাত্রার নায় ভূমিকায় তাঁর খ্যাতি সামান্য ছিল না। বহু দলে তিনি অনেক নাটকে, স্টেজে এবং যাত্রায় মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সুনাম অর্জন করেন। পেশাদার মঞ্চে কর্ণার্জুন নাটকে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। তখন দিনের বেলায় তিনি চাকরি করতেন, রাত্রে অভিনয় আসরে নামতেন।

পেশাদার মঞ্চে পর পর তিনি অনেক নাটকে বিভিন্ন ভূমিকা নেন, যথা, ইরানের রাণী (ইউসুফ), কবির মেয়ে (অভিষেক), শাজাহান (সুলেমান), চাঁদসদাগর (নরীন্দর), চিরকুমার সভা (শ্রীশ), চণ্ডীদাস (মুকুট), প্রফুল্ল (সুরেশ), রামপ্রসাদ (বিরিঞ্চি), স্বয়ম্বর (গালেব), মহাশক্তি (অভয়), বাংলার মেয়ে (অজিত), ছিন্নহার (লোকনাথ), পতিব্রতা (মন্মথ), মহানিশা (কবিরত্ন), বিপ্রদাস (রায়বাহাদুর), মানময়ী গার্লস স্কুল (রাজেন), চন্দ্রশেখর (ফস্টার), বৈকুণ্ঠের উইল (বৈকুণ্ঠ) প্রভৃতি।

চলচ্চিত্রেও তিনি একজন সর্বজনচিত্তজয়ী অভিনেতা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। দিদি, মুক্তি, দেশের মাটি, বিজয়া, অধিকার, ভাগ্যচক্র, নর্তকী, মীনাক্ষী, সরমিল, রজতজয়ন্তী, কালিদাস, অজনগড়, মীরাবাই, মহানিশা, বাংলার মেয়ে, পতিব্রতা, অরক্ষনীয়া, বড়দিদি, রামের সুমতি, স্বামী, প্রভৃতি বহু ছবিতে তিনি তাঁর অভিনয় ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখেন। কালিকা থিয়েটারে অভিনীত ঘুমদেবতা নাটকেই তাঁর শেষ মঞ্চাবতরণ এবং ছবিতে 'এ যুগের মেয়েতে' শেষ চিত্রাভিনয়।

১৯৪৭ সালে ভুবিলি পার্কে 'খেলাঘর' নামে তিনি নিজস্ব বাসগৃহ নির্মাণ করেন এবং এই বাড়ীতেই ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায় বর্তমানে স্টার থিয়েটারে অভিনয় করেন।

নাট্য প্রসঙ্গ

জাপানী রঙ্গালয়

এলমার রাইস

অভিনয় জাপানে খুব সম্মানজনক পেশা। অনেক অভিনেতা আছেন যাঁরা বংশপরম্পরায় অবিচ্ছেদ-ভাবে এই অভিনয়-শিল্পকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। একথা বলতে গর্ব বোধ করেন অনেক শিল্পী, যদি কোনো শিল্পীর সন্তান না থাকে, তবে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং কালক্রমে সেই তার পালক পিতার নাম গ্রহণ করে। এইরকম অনেক পারিবারিক নাম জাপানী রঙ্গালয়ের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে এবং সেগুলি রঙ্গালয়-প্রেমীদের কাছেও অত্যন্ত পরিচিত। নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান বলে মনে করি যে আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন হলেন এনোসুকো ইচিকাওয়া। তিনি হলেন প্রখ্যাত কাবুকি অভিনেতাদের অন্যতম এবং বিখ্যাত এক অভিনেতা বংশের সন্তান। ইচিকাওয়া হল পারিবারিক নাম, কিন্তু অভিনেতারা তাঁদের দেওয়া নামেই বেশি পরিচিত। জাপানীদের অদ্ভুত প্রথা হল একটা ভাল দৃশ্য অভিনীত হলে তারা হাততালি দিয়ে প্রশংসা জানায় না, অভিনেতার নাম ধরে চীৎকার করে ওঠে। অচেনা বিদেশীদের কাছে এটা অস্বস্তিকরই লাগে। এনোসুকো খুব রূপসী এবং প্রতিভাশালী অভিনেতা। পুরুষ এবং নারী দুরকমের ভূমিকাতেই তিনি অভিনয় করেন এবং আধুনিক নাটক আর ছায়াছবিতেও তিনি অবতীর্ণ হন।

এই ঐতিহ্যপন্থী রঙ্গালয় ছাড়াও সমসাময়িক ধরণের রঙ্গালয়ও বেড়ে চলেছে সেখানে। আর এসব জায়গায় পাশ্চাত্য ও জাপানী দু'শ্রেণীর আধুনিক নাটকই অভিনীত হয়। তাছাড়া 'রেভ্যু' ও বিচিত্রানুষ্ঠানও মঞ্চস্থ করা হয় এসব রঙ্গালয়ে। জাপানী নাটকানুষ্ঠান অনেকটা আমাদেরই মত, কেবল তাদের মঞ্চউপকরণ আমাদের চেয়ে উন্নত। জাপানীরা সমসাময়িক নাট্যসাহিত্য বিশেষ করে আমেরিকার

নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল। অনেক নাট্যবস্তুই তারা ধার করে বিদেশ থেকে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। জাপানী একদলকে 'স্ট্রীট সিন' অভিনয়ের ছবি আছে আমার কাছে। প্রথম নজরে মার্কিনী প্রযোজনার থেকে দৃশ্যপট, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে কোনো তারতম্যই নজরে পড়ে না। আতসি কাচ দিয়ে দেখার সময় যখন অভিনেতাদের প্রাচ্য দেশীয় মুখাবয়ব চোখে পড়ে তখনই শুধু বোঝা যায় পার্থক্যটা। সমসাময়িক দেশীয় নাটকও জাপানে অজস্র। তাদের গুণগত মান কতটা সেটা বিচার করবার উপায় নেই আমার, তবে শুনেছি দু-একটা নাটক বাদ দিলে বাকীগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

জাপানী রঙ্গালয়ের আরো দুটি চমৎকার দিক আছে যেগুলি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার মধ্যে একটা হল আশ্চর্য একধরণের নাট্য-প্রতিষ্ঠান, যা মেয়েদের অপেরা কোম্পানি বলে পরিচিত। নাম থেকেই বোঝা যায় এগুলি হল সম্পূর্ণত অভিনেত্রীদেরই প্রতিষ্ঠান। সবচেয়ে নামজাদা হল টাকারাজুকার দল। নামটির উৎপত্তি হয়েছে যে স্থানে দলটির উদ্ভব হয়েছিল সেই কোবে ও ওসাকার মধ্যবর্তী 'আনন্দ নিকেতন' থেকে। এখানে একটা অভিনয় শেখার বিদ্যালয় আছে। এই মেয়েরা টোকিও এবং অন্যান্য শহরেও তাদের নাটকানুষ্ঠান করে এবং এই দল রীতিমত জনপ্রিয়। যারা পুরুষের ভূমিকা অভিনয় করে তাদের জনপ্রিয়তাই বেশি। পুরুষের ঢঙে তারা চুল ছাঁটে এবং পুরুষের মত পোশাক-আসাক পরে। এদের বেশ গোঁড়া একদল ভক্ত আছে যাদের বেশির ভাগই মেয়ে। একবার আমি তখন টোকিওর ইম্পিরিয়াল হোটেলে, আমাদার বাইরে হৈ-চৈ শুনে তাকালাম। সমস্ত রাস্তা মেয়েদের ভিড়ে ভরে গেছে। তারা চেঁচাচ্ছে, ঠেলাঠেলি করছে রাস্তার ওপারে রঙ্গালয়ের সামনে দাঁড়ানো বালক-বেশী স্ত্রীলোক অভিনেত্রীটির কাছে পৌঁছবার জন্যে। পুলিশ এসে কর্ডন করে অভিনেত্রীটিকে ভিড়ের ভিতর দিয়ে রাস্তা করে ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

এই সঙ্গে ওখানকার বানরানুপুতুল অভিনয়ের কথাও বলা দরকার। অপূর্ব সুন্দর এই পুতুলগুলো, আশ্চর্যজনক ভাবে জটিল সৃষ্টি। আকার তাদের মানুষের চেহারার দুই-তৃতীয়াংশ উঁচু, এবং প্রত্যেকটির জন্যে দুজন করে পুতুল-নাচিয়ের দরকার হয়। এই পুতুল নাচিয়েদের স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হলেও পুতুলগুলির অঙ্গভঙ্গিমা এত জীবন্ত ও মানুষিয় যে এদের উপস্থিতি ভুলে যেতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অতি উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রঙ্গালয়-শিল্পটি চীনের ছায়াভিনয়ের মতই তাদের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি পার হয়ে এসেছে এবং এখন তাদের পড়ন্ত দশা।

সবকিছু মিলিয়ে জাপানী রঙ্গালয় বিচিত্রমুখী, লোকপ্রিয় এবং উন্নত শিল্পকৃতি সম্পন্ন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এটি একটি বৃহৎ ব্যবসায়ও বটে। জাঁকালো রঙ্গালয় এবং জটিল ও ব্যাপক দৃশ্যনাট্য উপস্থাপনা করতে গেলে চাই বড় অঙ্কের টাকার বিনিয়োগ। সেজন্যেই দেখা যায় কয়েকটি বড় সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে যারা এই ধরণের রঙ্গালয়গুলি এবং বিভিন্ন ধরণের যেসব নাট্যাবদানের কথা বলা হয়েছে সেগুলির প্রযোজনা নিয়ন্ত্রিত করে। তাছাড়া এইসব সিন্ডিকেট ক্রমবর্ধমান-শিল্প ছায়াছবির প্রদর্শন এবং প্রযোজনা নিয়ন্ত্রিত করে, আর এখন বোধহয় বেতার ও টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও এদের হাত পড়েছে।

অভিনয় দর্পণ

ভারতবর্ষে নাট্যকলার উৎপত্তি দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায়। তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্যে ব্রহ্মা রচনা করেন নাট্যবেদ। এটিকে তিনি অভীপ্সিত করেন পঞ্চম বেদরূপে। তারপর মহামুনি ভরত সেই নাট্যবেদ অধ্যয়ন করে প্রণয়ন করলেন তাঁর নাট্যশাস্ত্র। ভারতবর্ষে অভিনয় সংক্রান্ত আরও অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ আছে। যথা, নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণ', অভিনব গুপ্তের 'অভিনয় ভারতী', সার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর,' নারদের 'সঙ্গীত মকরন্দ'। এদের মধ্যে 'অভিনয় দর্পণই' সর্বাধিক প্রচলিত। পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রী এই বইটির বাংলা অনুবাদ করেন।

প্রধানত অভিনয় দর্পণের উপকরণ নিয়ে সম্প্রতি বাংলায় একটি বই রচিত হ'য়েছে—"অভিনয় দর্পণ"। ভরতের অভিনয় দর্পণ ছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় আহরণ করে এবং সেই সঙ্গে আধুনিক কালের নাটক, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং অভিনয়-রীতির আলোচনা করে নির্মল শীল এই বইটি লিখেছেন। যাঁরা অভিনয় করেন বা যাঁরা প্রযোজক অথবা পরিচালক, অথবা নাট্যানুরাগী, সকলেই এই বইটির সঙ্গে পরিচিত হলে লাভবান হবেন। নাট্যবেদের উৎপত্তি, রূপরূপক, নাট্যরচনা, রসজ্ঞান, অভিনয়, প্রভৃতি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়গুলি ছাড়াও, লেখক এই বইএ বাংলা রঙ্গমঞ্চের দিকপাল অভিনেতা যথা গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, শিশিরকুমার, রাধিকানন্দ, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু এবং ছবি বিশ্বাসের অভিনয় ধারার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার আয়োজন করেছেন। প্রবেশ বসুয়া এবং চার্লি চ্যাপলিন সম্বন্ধেও দুটি আলাদা নিবন্ধ আছে। আর আছে লোভিয়েট থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা। নবনাট্য আন্দোলনও বাদ যায় নি। সব মিলিয়ে নির্মল বাবুর অভিনয় দর্পণ একটি যুগোপযোগী বই যা পড়ে সকল শ্রেণীর পাঠকই আনন্দ পাবেন।

নাট্য প্রবাহ

নিখিল ভারত নারী শিক্ষা পরিষদ। সম্প্রতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্তা ভাবমোহিনী দেবীর ৮৭তম জন্মোৎসব উপলক্ষে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় তার প্রথম দিনে পরিষদের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা" নাটকটির অভিনয় করেন। পুরুষের ভূমিকায় মেয়েদের অভিনয় নিন্দনীয় হয়নি। বীণা সেন (চন্দ্রকান্ত), অভয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (বিনোদ), ভলি বিশ্বাস (গদাই), সান্ত্বনা দে, (শিবচরণ), শিপ্রা ভট্টাচার্য (নিবারণ), তপতী বিশ্বাস (ইন্দু), বনফুল চক্রবর্তী (কমল), অজন্তা রায় (কান্ত), হাসি ভট্টাচার্য (বুড়োদাসী), কৃষ্ণা বসু (ললিত) প্রমুখ সকলেই সুঅভিনয় করেন। নাটকটির পরিচালনায় রেণু দাসগুপ্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

অনুষ্ঠানের শেষদিনে সুবাস্তু নাট্যসংঘ 'অতিযান্ত্রিক' অরুণ দাশগুপ্তের নাটক "মাতাল" মঞ্চস্থ করেন। নাটকটির রচনায়, ঘটনাবিন্যাসে এবং চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাট্য নির্দেশনাও প্রশংসার যোগ্য। অভিনয়ে নাট্যকার-পরিচালক এবং তাঁর সহধর্মিণী রেণু দাসগুপ্ত নাটকে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রাণবন্ত অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন, তারক গাঙ্গুলী, প্রদীপ ঘোষ, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, ছবিরী দাশগুপ্ত, মীরা চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস ঘোষ প্রমুখ।

ইমপিরিয়াল টোব্যাকো। এই কোম্পানীর নাট্যবিভাগের সভ্যরা সম্প্রতি স্টার রঙ্গমঞ্চে শচিপদ রায়গুরুর 'অনিবেশন' নাটকটির সুঅভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। নাটকের প্রযোজনা উচ্চাঙ্গের এবং পরিচালনা প্রশংসনীয় (পরিচালনা : দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়)। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য (মীরজাফর) নিতেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (মীরকাশিম), পঙ্কু দে (নন্দকুমার) রামানন্দ চক্রবর্তী (হেসটিংস), দীপিকা দাস (অনি বেগম), অঞ্জলী চট্টোপাধ্যায় (বুন্‌বুনাই), পরিমা ঘোষ (পরিচারিকা) প্রমুখ। দলগত অভিনয় গুণে নাটকটি বিশেষ উপভোগ্য হয়।

বাণী বিতান। সম্প্রতি নাহা ভবনে এঁদের বসন্তকালীন অধিবেশনে "বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও গিরিশচন্দ্র" এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে যে আলোচনা-সভা হয় তাতে অংশ গ্রহণ করেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, উজ্জ্বল মজুমদার, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল কালো, অপর্ণা রায়, ডঃ উমা রায়, অখিল নিয়োগী, প্রমুখ। আলোচনার পর সংস্থার সভ্যসভ্যারা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন নির্মলেন্দু বসু, পঙ্কু অধিকারী, গৌরী জানা ও তপজিৎ চক্রবর্তী।

"গল্প বলুন"

স্কটিশচার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের অভিনয়

অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় একজন প্রতিভাবান নাট্যকার। এতাবৎ তিনি বারোখানি নাটক লিখেছেন এবং সবগুলির মধ্যেই যুগের চিন্তার ছাপ রেখেছেন। তাঁর ১৩তম নাটক "গল্প বলুন।" এই নাটকে তিনি জগতের চিকিৎসা-শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় বিস্ময় 'হার্ট ট্রান্সপ্লানটেশন' নিয়ে এক ভালো গল্প ফেঁদেছেন। একজনের হৃদপিণ্ড আর একজনের শরীরে সংযুক্ত করে তাকে বাঁচিয়ে রাখলে, পুনর্জীবিত লোকটির আচরণে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এই নাটকে তারই এক বিচিত্র চিত্র প্রতিফলিত। পাশ্চাত্য জগতের বিখ্যাত ডাক্তার বার্নার্ড এই কর্ম করেছেন। এদেশে এই নাটকে ডাক্তার মনোজ বসু সেই পরীক্ষা করলেন নাটকের নায়ককে নিয়ে। তারপর এই নাটকে যে প্রেমের ব্যাপারটি ছিল তার পরিণতি কীভাবে ঘটল উৎসুক দর্শক স্টার মঞ্চে সেদিন তা প্রত্যক্ষ করলেন। বিন্যাসে সংলাপে এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতিগুলির সুষ্ঠু পারম্পর্যে নাটকটি যেমন সজীব তেমনি সাবলীল। কৌতুকরসপ্রধান নাটকটি অবশ্য কৌতুহলের দরুণ আগাগোড়া দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখে। দর্শকদের সঙ্গে নাটকের পাত্রপাত্রীদের সংযোগ করিয়ে নাট্যকার যে নতুনতর আঙ্গিকের পরীক্ষা করেছেন তাও সফল হয়েছে। নাটকটির পরিচালনাও (পরিচালক স্বয়ং নাট্যকার) উচ্চাঙ্গের। অভিনয়ে পরিষদের পুরাতন সভ্যরাই প্রধানত (যাঁদের কয়েক বছর ধরেই দেখছি) অংশ নিয়েছিলেন এবং সকলেই সুঅভিনয় করেছেন। শুধু' একজনের অভিনয় দেখে মনে হয়েছে, আরও কিছু অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল।

এক চটুল অন্তঃসারশূন্য অতি আধুনিক তরুণীর ভূমিকায় শ্রীমতী সুনন্দা মিত্র নিখুঁত অভিনয় করেছেন। শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুঠামদেহ (নায়ক) সেখানে চমৎকার। শ্রীপ্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় সুন্দর টাইপ সৃষ্টি করেছেন। শ্রীমতী কেয়া চক্রবর্তীর ভূমিকাটি স্বাভাবিক প্রাণবন্ত। এঁরা ছাড়া শ্রীঅমর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমান গুপ্ত, শ্রীমতী বৈশাখী সরখেল, শ্রীমহান চক্রবর্তী, ও শ্রীমতী তুষারিকা চক্রবর্তী, প্রত্যেকে অনবদ্য অভিনয় করে নাটকটিকে যারপরনাই সুখভোগ্য করে তোলেন।

নাট্যদর্শন

কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চে স্বাগ্‌লারদের তয়ঙ্কের কার্যকলাপ। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন নাট্যোপহার 'মুখোসের আড়ালে।'

'মগুকের' পর প্রেমেন্দ্র-ধনঞ্জয়ের আর একটি রহস্য-চমক-নাটক মুখোসের আড়ালে। সত্যতার সুরক্ষণে চোরাইচালানের বিশ্বব্যাপী চক্রান্তজাল। কলকাতা সহরেও তার শাখাপ্রশাখা। এই সহরের এক অভিজাত পল্লীতে ধনী সুরথ চৌধুরীর অট্টালিকায় তাঁর অজ্ঞাতে চোরাকারবারীদের দলপতি তার আড্ডা গেড়েছে। ব্যাপারটা রীতিমত রহস্য-রোমাঞ্চকর। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর সুরথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে এনেছেন সুন্দরী যুবতী মালতীকে। মালতীই সেই অট্টালিকার কর্ত্রী। সুরথের প্রথম পক্ষের মেয়ে যমুনা দার্জিলিং স্কুল থেকে ফিরে এসে সেই রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছে। এদিকে ইনস্‌পেকটার যাদু স্বাগলারদের দলপতি নীলকণ্ঠকে খুঁজে বার করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ঘটনার পর ঘটনা। রহস্যের পর রহস্য আর রোমাঞ্চ। অবশেষে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে চোরাকারবারীদের নায়িকা এবং নায়কের আসল রূপ উদ্‌ঘাটিত হল।

কিছু কিছু ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগলেও এই সাস্‌পেন্স-ধর্মী নাটকের পরিচালনায় তরুণ রায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটকের গতিকে অব্যাহত রাখবার জন্য তিনি যেভাবে মঞ্চের বাইরে ঘটনা সংস্থাপন করেছেন তার মধ্যে তাঁর নাট্যবোধ ও কল্পনাশক্তি প্রতিভাত।

রহস্য-নাটকের যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে আলো ধ্বনি এবং আবহসঙ্গীতের যে বিশেষ কার্যকারিতা আছে তা এই নাটকে সুপরিস্ফুট। সঙ্গীতে তি বালসারা, মঞ্চসজ্জায় গণেশ দাস এবং আলোক সম্পাতে সুরেশ ভিয়াস নাটকটিকে উপভোগ্য করে তুলতে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। জিতেন পালের ম্যানিও এই নাটকের এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দর্শকদের সারাক্ষণ উৎকণ্ঠিত করে রেখেছে।

বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই নাটকে এবং প্রত্যেক শিল্পীই যথাযোগ্য দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে অবশ্য তরুণ রায়ের দ্বৈত-ভূমিকার অভিনয়ই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এক আধ-পাগল ন্যালাক্ষ্যাপা চরিত্রে তিনি যে নতুন টাইপ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে বলা চলে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একটি চরিত্রে দীপান্বিতা রায়কে দেখা গেল। অত্যন্ত সংযম এবং বুদ্ধির সঙ্গে তিনি চরিত্রটিকে রূপায়িত করেছেন।

অন্যান্য ভূমিকায় রিটা পলিন (যমুনা), দেবরাজ রায় (অনিন্দ্য), অজিত মিত্র (সুরথ), সমরেশ চক্রবর্তী (ইনস্‌পেকটার), রবিন মজুমদার (সুপারিনটেনডেন্ট), পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় (গড়গড়ি), প্রণত ঘোষ (২নং স্বাগলার), সংযুক্তা গুজরাল (এয়ার হোস্‌টেস্), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (ডক কর্মী), বিভাস মুখোপাধ্যায় (বিমান যাত্রী) এবং বাণী হাজরা (বেদু) সুঅভিনয় ক'রে দর্শকদের তৃপ্তি বিধান করেছেন।

বব হাসের পরিচালনায় ম্যাড হ্যাটার্স ক্লাবে টুইস্ট নাচের দৃশ্য দুটি উল্লেখের দাবী রাখে।

আলেখ্য

গোবিন্দ দেব মজুমদার

ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে সকলেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। রাতের শিকলগুলো মাঝে মাঝে ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে বাজছে। লাইনের ওপর কয়েক শো চাকার একঘেয়ে ঘসা খাওয়ার আওয়াজ। মাথার ওপর ফ্যানগুলো সাঁ সাঁ করে ঘুরছে। লাইট-টা ম্লান হয়ে আছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বিকাশ গাড়ির টানা জানালাটা উঠিয়ে দিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ওর তপ্ত চোখে মুখে লাগলো। সিগারেট টানতে টানতে বিকাশ বাইরের অন্ধকারের পানে চেয়ে রইলো। বাংলার এলাকা শেষ হয়ে বিহার শুরু হয়ে গেছে। বহু দূরে ছাড়া ছাড়া পাহাড়, শক্ত লাল মাটির ঊষর প্রান্তর, কোথাও কোথাও দু'চারটে গাছ। মাঝে মাঝে কয়লার খনিতে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, তার একটু পরেই একরাশ জোনাকীর মত ঝিকমিক করছে আলো। কয়লার খনির পাশের ছোটখাটো শহর।

পাশের বেঞ্চিতে অতনু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মুখখানায় যেন খুশির আবেশ লেগেই আছে। মাথার নিচে ধপধপে মাখনের মত নরম বালিশ। কোনেতে লেখা লীণা। বিকাশের মাথার মধ্যে কেমন যেন ওলট পালট হতে থাকে। গাড়িটা ভীষণ গর্জন করে একটা টানেলের ভেতর দিয়ে ছুটছে। গাড়ির শব্দে হঠাৎ অতনু জেগে গেল। তারপর উঠে বসে চোখ রগড়ে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে আবার বালিশটা আঁকড়ে ধরে শুয়ে পড়লো। বিকাশ নিজের স্লাইং সাটের বুক পকেট থেকে চিঠিখানা বের করলো। আশ্চর্য্য! চিঠির অক্ষর-গুলো যেন এক রাশ পোকার মত কিলবিল করছে। লীণা যে এত সুন্দর করে গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে, তা তো বিকাশ কখনই জানতো না। লীণার মধ্যে যে এমন একটা কবি মন লুকিয়ে ছিল তা তো বিকাশের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছিল।

মাত্র দু'ঘন্টা অতনু কলকাতায় ছিল তাতেই লীণার জমলপুরের জীবন তেতো হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে কত কাকুতি মিনতি করে চিঠিখানা লিখেছে লীণা। চিঠিটার লাইনগুলো পড়তে পড়তে ওর কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। এই চিঠিখানা কি আশ্চর্য ভাবে ওর হাতে এসে গেল। সুকান্তর বাড়িতে অতনুর সাথে পরিচয়টাও কেমন আকস্মিকভাবে হয়ে গেল ওর। কত যায়গায় ঘুরে ঘুরে বিকাশ আবার কলকাতায় এলো। নতুন করে চাকরী জোটালো। নতুন নতুন বন্ধু জুটলো। সুকান্ত তার মাঝে অন্যতম। সুকান্তর সাথে অন্তরঙ্গতা বাড়লো। দিনরাত বিকাশ সুকান্তর কাছেই প্রায় থাকে। সুকান্তর বাড়িতেই অতনুর সাথে ওর পরিচয়। সুকান্ত বিয়ে করেনি। তাই অতনুর বৌদির চিঠির কথা নিয়ে ও হাসাহাসি করছিল। চিঠির গোটা কতক বিশেষ লাইন সুকান্ত বিকাশকে পড়ে শুনিয়েছে। হাতের লেখাটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠেছিল বিকাশ। হৃদপিণ্ডটা এক সঙ্গে কয়েকবার লাফালাফি করে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এক চুমুক চা-ও যেন ওর গলায় আটকে গেল। মাথাটা ওর ভীষণভাবে ঘুরছিল। ঝুঁকতে ঝুঁকতে বিকাশ দেখলো চিঠির নিচে নামটাও সেই এক। অদ্ভুত কিন্তু। ওর পানে তাকিয়ে সুকান্ত হো হো করে

হেসে বলে উঠেছিল—কি হে! প্রেমপত্র পড়ে যে তোমার হার্টফেল হবার যোগাড়। একথায় অতনুও লজ্জিত হয়ে বিব্রত বোধ করছিল আর বিকাশও অপরাধীর মত মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

জীবনে বিকাশ এই প্রথম একটি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করে ফেললো। সুকান্ত ও অতনুর চোখ এড়িয়ে ও লীণার চিঠিখানা হাত করেছে। ও জানতো এ নিতান্তই অন্যায় এবং অপরাধ কিন্তু তা সত্ত্বেও না নিয়েও পারে নি। ওর সমস্ত সভ্যতা, শীলতা আর সুজনতা যেন সেই এক মুহূর্তে ধুয়ে মুছে গেল।

চিঠিখানার নাম আর হাতের লেখায় যেন অদ্ভুত মিল। তবুও চোখ দুটোর অবিশ্বাস দূর করার দরকার। তাই কোনও কাজের বাহানায় বিকাশ জরুলপুরে ছুটে চলেছে। ওর জরুলপুরে যাওয়ার প্রস্তাবে অতনুও খুব খুশি হয়েছে। নতুন বন্ধুত্ব, তাই বলেছে চলুন ওখানে খুব ঘোরা যাবে, অনেক বেড়াবার জায়গা আছে। কত কি দেখবার আছে। আপনার সাথে আলাপ হলে লীণা কি খুসিই না হবে। বেশ কিছুদিন থাকতে হবে কিন্তু।

বিকাশ শুধু ম্লান মুখে একটু হেসেছে।

পূবের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। সহযাত্রীদের কেউ কেউ ঘুম ঘুম চোখে আড়ামোড়া ভাঙছে। অতনু চোখ রগড়ে উঠে বসলো। অতনু বিকাশের পানে তাকিয়ে একটু হেসে বললো—গুড্ মর্ণিং।

বিকাশ অতনুকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল।

গাড়ি ভিহরি-অন-সোন ছাড়িয়ে ছুটছে।

অতনু স্যুটকেসটা খুলে টুথপেষ্ট আর ব্রাস বের করে মুখ ধুতে গেল। স্যুটকেসটা এলোমেলো অবস্থাতেই খোলাই পড়ে রইলো। বিকাশ দেখলো ওটার মধ্যে এক গাদা নানা রঙের শাড়ি ব্লাউজ ঠাসা রয়েছে। গাড়িতে তখনও লাইট নেভে নি। ইলেক্ট্রিকের আলোয় দামী দামী কাপড়গুলো যেন ঝকমক করছিল। মুখ হাত ধুয়ে এসে অতনু শাড়ী ব্লাউজগুলো আবার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছিল। বিকাশের পানে চেয়ে লজ্জিত মুখে অতনু বললো—মাঝে মাঝে কলকাতা গেলে এগুলো নিয়ে আসি। বাঙলাদেশের পছন্দ সই জিনিষ পশ্চিমে মেলে না। দেখুন তো হারটা কেমন হলো? অতনু বিকাশের সামনে হাতির দাঁতের কাজ করা দামী একটা ঝকমকে হার তুলে ধরলো। অবাক বিস্ময়ে বিকাশ তাকিয়ে দেখছিল হারের লকেট-টা সাপের মাথার মণির মত জ্বলছে।

বিকাশ একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো—চমৎকার হয়েছে। অতনুর অন্যান্য জিনিসগুলির পানে বিকাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

বড় একটা বেতের ঝুড়ি ভর্তি ন্যাকড়া আর। একটা টিনে বরফ দিয়ে প্যাক করে রাখা আছে একটা বিরাট রোহু ইলিশ মাছ। শাল আর পদ্ম পাতায় মুড়ে বড় বড় দুটি মাটির হাঁড়িতে নানা রকমের মিষ্টি। বাক্সের ওপর খবরের কাগজে জড়ানো রয়েছে সেতলপাটি, তারপাশেই জুতোর বাক্সের একপাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে সবুজ ফিতে বাঁধা আছে নতুন ডিজাইনের একজোড়া হাই হিল জুতো। কথায় কথায় অতনু বললো লীণার নাকি ওটার ভীষণ সখ। স্বামীর মত স্বামী। এরাই মেয়েমানুষকে পুষতে জানে। বিয়ে করা এদেরই মানায়। নারী এদের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। ঐশ্বর্য, আরাম, বিলাস আর প্রাচুর্যের মাঝেই নারীর রূপ আর যৌবন যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে। নারী এক অদ্ভুত মহিমায় মোহনীয় হয়ে ওঠে। তার দেহে মনে প্রাণে যেন এক বিচিত্র লাবণ্যের দ্যুতি ঠিকরে পড়ে।

অতনু কথা বললো—দেখুন, একটা কথা বলবো?

বিকাশ বিস্ময়ে তাকালো।

—আপনাকে সব সময় এত উদাস আর এত চিন্তিত দেখায় কেন?

বিকাশ হেসে বললো—চিন্তা করতে আমার খুব ভাল লাগে।

—আপনি তো তাহলে খুব উঁচু ধরের লোক মশাই!

অতনু হো হো করে হাসে।

বিকাশ অবাক হয়ে দেখছিল, হাসলে অতনুকে কত সুন্দর দেখায়। ফর্সা দোহারা চেহারা। পাঞ্জাবীর বোতামগুলো সব খোলা। চওড়া লোমশ বুকটা দেখা যাচ্ছে। মাথায় একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। অতনুর সারল্য আর সহজ সুন্দর ব্যবহারে যেন মানুষ খুব সহজেই আকৃষ্ট হয়। এই অল্প সময়েই বিকাশকে যেন সে আপন করে নিয়েছে।

বিকাশ একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি কি ভালবাসেন বললেন না তো?

অতনু মৃদু হেসে জবাব দেয়—আমি ভালবাসি, ছবি তুলতে। এই দেখুন না, এবারও নিয়ে যাচ্ছি আর একটা ক্যামেরা। বিকাশ তাকিয়ে রইলো বোহ্রপ্রস্তের মত।

অতনু বলছিল—কোডাক, রলি, আগফা, ওয়েস্টাক্সের একগাদা ধরে পড়ে আছে, তাই ভাবলাম এই নতুন ভিজাইনেরটা নিয়ে যাই। আমার মিসেসের ভীষণ ক্যামেরা প্রেম।

বিকাশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—তাই নাকি?

অতনু বললো—সাংঘাতিক রকমের। চলুন না খুব মজা করে ফটো তোলা যাবে।

বিকাশ একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো—আমি তো ও বিষের পটু নই। তাই ঠিক জমবে না।

—ছাড়ুন মশাই, পটু নই, আমার স্ত্রীমতীর পাল্লায় পড়লে দুদিনেই পাকা ক্যামেরাম্যান হয়ে যাবেন। শুধু এসব ক্যামেরা কেন সিনে ক্যামেরা হ্যাণ্ডেল করা কঠিন হবে না।

বিকাশ একটু হেসে বললো—তাহলে আপনাকে তো খুব ভাগ্যবান বলতে হবে।

অতনু হেসে জবাব দিল—তা অস্বীকার করবো না। আসুন চা খাওয়া যাক্।

বিকাশ জলদি করে মুখটা ধুয়ে এলো।

অতনু ব্যাগ থেকে দুটো ছোট গ্লাস বের করে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললো।

ইউ. পি. শুরু হয়ে গেছে। ট্রেন একটা ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে নক্ষত্রগতিতে ছুটছে। মাঠের পুব প্রান্তে লাল টকটক করছে থালার মত শিশু সূর্য আকাশের লালিমা, স্নিগ্ধ হাওয়ায় স্নান করে যেন হাসতে হাসতে গাড়ির জানলা দিয়ে ওদের গায়ে লুটিয়ে পড়েছে। বিকাশ চায়ের গ্লাসটা হাতে নিয়ে গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে মাঠ নদী, পাহাড় আর গ্রামের পানে চেয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইলো। কখনও মনে হচ্ছিল সে শিশুর মত হেসে উঠবে। আবার পরক্ষণেই ভাবছিল ঈশ্বরের দেওয়া এই অফুরন্ত আলো আর প্রাণ ভরা স্নিগ্ধ হওয়ায় সে প্রাণভরে কেঁদে নিক।

অতনু ওর পানে তাকিয়ে হেসে বললো—চা খান।

বিকাশ চমকে উঠে, একটু লজ্জিত হয়ে হাসলো।

বিকাশ প্রশ্ন করে—আপনি এতদিন বাইরে থাকায় আপনার মিসেস নিশ্চয়ই খুব চটে আছেন?

অতনু জবাব দেয়—সে কি আর বলতে? গেলেই বুঝবেন এবং শুনবেন তর্জনে গর্জনের বহর। ওর এত ভয় না, যে বলার নয়। ভাবে আমি যেন কচি খোকা, হারিয়ে যাব যেন।

বিকাশ একটু হেসে বলে ওঠে—যেতেও তো পারেন।

অতনু আশ্চর্য হয়ে তাকালো।

বিকাশ বললো—মেয়েরা তাই ভাবে।

—ছাড়ুন মশাই, মেয়েদের ভাবনায় যদি মাথা গলিয়েছেন তো গ্যাছেন। ওদের ভাবনায় মাথা গলানো মানে দুর্ভাবনাকে আমন্ত্রণ করা।

বিকাশ হেসে ফেললো।

—আপনি হাসছেন, জ্বলে মরলাম মশাই। কথায় কথায় ঠোস ঠোসানি, আর ভাল লাগে না।

—কেন আপনার মিসেস তো আপনাকে খুবই ভালবাসেন। তবে একথা বলছেন কেন?

—বেশ বলেছেন আপনি, ভাল কি আর ওরা এমনি বাসে, ভালবাসা আদায় করতে হয়।

—কি যে বলছেন।

—আমি যা বলছি বিকাশবাবু, তা একেবারে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত সত্য।

বিকাশ অতনুর ও কথায় আবার হেসে ফেললো।

—মেয়েদের যদি ঐশ্বর্য আর glamour-এর মধ্যে রাখেন, তাহলে তারা আপনার বান্ধবী, আপনার সহচরী। তখন আপনি তাদের তাজমহল বলেও ভাবতে পারেন। আর দারিদ্র্যের মাঝে তারাই দেখবেন কেমন নির্লজ্জের মত আপনার সাথে চ্যালেঞ্জ করে ঝগড়া করছে। আপনি তখন তাদের কাকের বাসা বলেও ভাবতে পারেন। অতনু হো হো করে হেসে উঠলো।

বিকাশ কেমন যেন অন্যমনস্কের মত অতনুর পানে চেয়ে ছিল। অতনু সত্যি বলছে, না মিথ্যে বলছে, তাও বুঝতে পারলো না। আজ তিন বছর ধরে বিকাশ ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত মেয়ে পুরুষের মিছিলকে সে দেখেছে, কিন্তু কারও প্রতি ফিরে সে তাকায়নি। কোন কিছুতে নজর দেবার মত মনও তার নেই। কিন্তু আজ অতনুর কাছে সে যেন এক নতুন কিছু শুনতে পেল।

আজকের এই ভোরের আলো আর স্নিগ্ধ হাওয়ায় যেন কি এক নতুন সুর ওর প্রাণে বাজছিল। তাই অতনুর কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগলেও, বিকাশ তাতে খারাপ বলে মনে করলো না।

তিন বছরের মধ্যে সে লীণার সন্ধান পায় নি। কত ভোরের আলোয়, সন্ধ্যার ছায়ায়, জ্যোৎস্নার প্লাবনে বিকাশ উদাও হয়ে ছুটে গেছে। কিন্তু মৃগতৃষ্ণার মত ছুটে বেড়ানই তার সার হয়েছে।

আজ অতনুকে তার মহা বান্ধব বলে মনে হলো। দিক্‌ভ্রষ্ট জাহাজের কাছে লাইট হাউসের আলোর সঙ্কেতের মত তার জীবনে যেন অতনুর আবির্ভাব। ও যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, অতনু মানে লীণা আর লীণা মানেই অতনু। অতনুর প্রতি এক অদ্ভুত ভালবাসায় ওর হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

গাড়ি এলাহাবাদ থেকে নৈনীতে ব্যাক করলো। তারপর জব্বলপুরের দিকে ছুটলো। সন্ধ্যায় গাড়ি জব্বলপুরে ইন করলো। ওরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। বিকাশ কেমন তাকিয়ে তাকিয়ে কার দিকে দেখছিল। অতনু কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে বললো—আসুন।

কিন্তু বিকাশ ওর সাথে গেল না। বললো—আজ এখানেই ষ্টেশনের কাছ দিয়েই আমার অনেক কিছু কাজ রয়েছে। কাল নিশ্চয় আপনার বাসায় সন্ধ্যের দিকে যাবো।

বাসার ঠিকানাটা দিয়ে অতনু বিদায় নিল।

প্ল্যাটফর্মের এক পাশে বিকাশ সুটকেশটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অবাক হয়ে দেখছিল—এই

অরুণপুর। এখানে লীণা থাকে। বিকাশ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। কোথায় গিয়ে উঠবে জানে না। রাতটা হয়তো ওয়েটিং রুমে কাটিয়ে দেওয়া যায়। চারদিকে যাত্রীর ভীড়। আপ ডাউন লাইনে অবিরাম গাড়ির ছুটে চলার আওয়াজ। বিকাশের মাথাটা এ দুর্বোধ্য অনুভূতিতে ঝিম ঝিম করছে। এই সেই শহর, সুদীর্ঘ দিন ধরে যার সন্ধানে বিকাশ পাগল। এখানে লীণা বেঁচে আছে। সুখে আছে। সে উপযুক্ত স্বামীর সুগৃহিনী। সে কতটা সুখী, তা তার চিঠির ছত্রে ছত্রেই ফুটে উঠেছে।

কি দরকার বিকাশের লীণার সুখের সংসারের গণ্ডীতে স্পর্শ করার। লীণা বেঁচে আছে, সুখে আছে, সেই তো যথেষ্ট। তার চেয়ে বেশী কিছু আশা করার তো বিকাশের থাকতে পারে না। কিন্তু না, কেমন আছে, নিজে চোখে না দেখলে, বিকাশের শান্তি নেই। যে চিন্তা আর যন্ত্রণায় তার প্রতি মুহূর্ত কাটছে, তার সমাপ্তির প্রয়োজন। বিকাশ যাবে। কাল সন্ধ্যায়। নিশ্চয়ই অতনুর বাসায় যাবে। অন্ততঃ পক্ষে কাল সন্ধ্যা অবধি তার বাঁচবার প্রয়োজন। ষ্টেশনের পাশেই একটা হোটেলের দিকে বিকাশ পা বাড়ালো।

পরদিন বিকেলে বিকাশ অতনুর বাসার উদ্দেশ্যে বেরুলো। আজ দুদিন ধরে সে কিছুই খায় নি। মাথাটা অসম্ভব ভারী। অনিদ্রায় চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। বুকটার মাঝে একটা চাপা যন্ত্রণা। দুদিন ধরে দাড়ি গোঁফ কামানোর কারবার নেই। মাথায় উস্কু-খুস্কু চুল, গাড়ির ধোঁয়া আর রাস্তার ধুলোয় জট পাকিয়ে আছে। পকেট থেকে ঠিকানাটা বের করে বিকাশ একে ওকে জিজ্ঞাসা করে পথ হাটছিল। বড় বড় কয়েকটা রাস্তা পার হয়ে একটা সরু রাস্তা পেল। পাশে কোথাও চুণের ভাটি, সাইকেল আর রিক্সা মেরামতের দোকান। চায়ের ছোট হোটেল। চাল ডালের দোকান। পানের গুমটি। টিনের চালার নিচে কসাইয়ের মাংসের দোকান। খানিকটা এগিয়ে গেলেই বেশ খানিকটা ফাঁকা পতিত ভূমি। তার পাশেই ক্রীশ্চানদের কবরস্থান। আম আর লিচু গাছের একটা ছোট্ট বাগান। সামনে দুচারখানা বড় বড় বাড়ি। একটা বাড়ির ছাদে একটি মেয়ে কাপড় মেলছিল। সামনের লনে কয়েকটি ছেলে মেয়ে টেনিস খেলছে। একটা বাঁক ঘুরতেই একটা ছোট্ট দোতলা সাদা রঙের বাড়ি নজরে পড়লো। সামনে একটুকরো সবুজ লন। হাসনুহানা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। কিছু দেশী এবং দুচারটে বিদেশী ফুলের গাছও দেখা যাচ্ছে এদিকে ওদিকে। গেটের কাছে বাংলায় বাড়ির নাম লেখা—"সাহানা"।

বিকাশের বুকটা ধক্‌ করে উঠলো। হ্যাঁ ঠিকই, ঠিকানাটার সাথে মিলে গেছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওপরের ঘরে রেডিও বাজছে। সবুজ আলো জ্বলছে। দামী দামী পর্দার ফাঁক দুঁইয়ে আলোর রেখা লনে এসে পড়েছে। লনটা নানাফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে আছে। লনের কাছে এসে বিকাশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। না, আর এক পাও সে এগুতে পারবে না। তার মাথাটা আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্নায়ুগুলো বুঝি এইবার বন্ধ হয়ে যাবে।

দূর থেকে আওয়াজ এলো—কৌন হ্যায়?

না, এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও চলবে না। এক পা দুপা করে কোনক্রমে বিকাশ এগিয়ে চললো। দেখলো একটা ছোকরা চাকর তাকেই জিজ্ঞাসা করছিল।

বিকাশ প্রশ্ন করে—সাহেব হ্যায়?

চাকরটা জবাব দিল—জী হাঁ। আইয়ে, বৈঠিয়ে। বাইরের ঘরের দিকে ওকে নিয়ে যাচ্ছিল চাকরটা।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বিকাশ কোনও ক্রমে নিজেকে টেনে নিয়ে চললো। দামী দামী টেবিল চেয়ার আর

সোফা সেটে ঘর খানা সাজানো। মেঝের পুরু কার্পেট বিছানো। বারান্দায় দুধপ্ত অফিসে কয়েকটি পুলিশ গুল্ল। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ইলোরা অজন্তার কয়েকটি শিল্প প্রতীক। কোনও ক্রমে একটা চেয়ারের হাতল ধরে বিকাশ দাঁড়ালো। চাকরটা ভেতরে চলে গেছে।

খবর পেয়েই ওপর থেকে দ্রুত পায়ে অতনু নেমে এসেছে। দুহাত জোড় করে বললো—কি আশ্চর্য, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন? বসুন, বসুন, অদ্ভুত মানুষ আপনি!

একখানা চেয়ারে বহুকষ্টে বিকাশ বসলো।

অতনু নিচে থেকেই চেঁচাতে শুরু করেছে—লীণা, লীণা, জলদি এসো।

—যাই।

বিকাশ চমকে উঠলো। ঠিক যেন কবরের তলা হতে বহুদিন পরে একটা সুর ভেসে এলো।

বিকাশ শুনতে পাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে এক জোড়া হাল্কা চলনের আওয়াজ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

দুহাতের মুঠি শক্ত করে প্রাণপণ শক্তিতে বিকাশ নিজের চেতনাকে ধরে রাখতে চাইছে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে দুটি শুভ্র পা, ধীরে ধীরে নামছে। নীল শাড়ির কুঁচোর মত আঁচলটা সাপের খোলসের মত চক্‌চক্ করছে। চেয়ারের হাতলটা বোধ হয় বিকাশের হাতের মুঠোয় গুঁড়ো হয়ে যাবে। বিকাশ উঠে দাঁড়িয়েছে।

লীণা ঘরে এসে গেছে। হাঁ বিকাশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লীণাই তো। গলায় তার কালকের সেই হাভির দাঁতের হারটা ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে।

এইবার লীণা তাকালো। ওকি! লীণার অমন সুন্দর মুখে ছাইয়ের প্রলেপ কে লাগিয়ে দিল? ওর মুখখানা যেন কবর খুঁড়ে বেরিয়ে আসা প্রেতের মুখ। যেন একটা চাপা আর্তনাদ করে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে লীণা। এইবার লীণা পড়ে যাচ্ছে।

—আহা হা, অতনুবাবু, ধরুন, ধরুন ওঁকে।

অতনুকে ধরে থরথর করে লীণা কাঁপছে। না লীণা ভুল করে নি। ঠিকই সে চিনেছে তার পাঁচ বছর ধরে ঘর করা স্বামীকে। বিকাশকে সে ধর্ম, অগ্নি আর নারায়ণকে সাক্ষী করে বিয়ে করেছিল। তা আজও লীণা তাহলে মনে রেখেছে।

অতনু বিব্রত হয়ে পড়লো। ও তাড়াতাড়ি লীণাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ফ্যানের সুইচ্ অন্ করে দিল। ও বিকাশের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো, লীণার ব্লাড প্রেসারটাই আবার বোধ হয় বেড়ে গেছে। অদ্ভুত ভয়ার্ত চোখে লীণা বিকাশের পানে তাকিয়ে রয়েছে।

আট বছর আগে এই মানুষটার হাতেই বাবা মা তাকে সঁপে দিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ওকে ঘিরেই তার জীবন যৌবন পল্লবিত্ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু একদিনের সামান্য একটু ভুলের জন্যেই লোকটা কেমন যেন আচমকা একটা লোহার মানুষের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল।

অপরাধ তেমন কিছুই করেনি লীণা। বিকাশের এক বন্ধুর ছোট ভাইয়ের সাথে লীণা সিনেমায় গিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন বিকাশও ঠিক সেই শোতেই যায়। লীণা জানেনি যে বিকাশ সিনেমায় গেছে। লীণাদের হাসাহাসি আর প্রগলভতা বিকাশের মনে এক সন্দেহের অতল গহ্বরের সৃষ্টি করলো। বাসায় লীণা ফিরে আসবার পর বিকাশ ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল—গিয়েছিলে কোথায়?

লীণা মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিল—বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে।

সিনেমা হলে ওদের হাসাহাসি, কানে কানে কথা কওয়া এবং আরও ঘন হয়ে বসা, সবই বিকাশের মনে পড়লো।

লীণার এই ছলনাটুকুকে বিকাশ ক্ষমা করতে পারে নি। সে জোর করে লীণাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে ওর মুখের ওপর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছিল। ওর শত আকুতি মিনতি আর অনুরোধেও বিকাশ পাষাণের মত স্তব্ধ হয়ে রইলো। দরজার আঘাতে লীণার ঠোঁটটা কেটে যায়। এখনও লীণার ঠোঁটে সেই কাটা দাগটা মিলিয়ে যায় নি। তিন বছর আগেকার সেই স্মৃতিটুকু এখনও ঐ দাগটার ওপর নজর পড়লেই যেন জেগে ওঠে।

সেই রাত্রেই লীণার আর দেখা পাওয়া যায় নি। জানা অজানা সর্বত্র খুঁজে খুঁজেও বিকাশ তার সন্ধান পায় নি। বিকাশ অনুতাপের আগুনে এই তিন বছর ধরে পুড়েছে। সেদিন সুকান্তর বাসায় লীণার চিঠি খানাই প্রমাণ করলো—লীণা বেঁচে আছে, ভাল আছে, সুখে আছে।

চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছে লীণা। অতনু ব্যস্ত ভাবে একটা ওষুধ আনতে ওপরের ঘরে উঠে গেল। বিকাশ লীণার পানে চাইলো। লীণার চোখ দুটিতে অশ্রুর প্লাবন। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে এক দুর্বোধ্য আবেগে থরথর করে কাঁপছিল লীণা। সে কান্নার মানে বিকাশ বুঝতে পারলো না। সেটা ঘৃণার, ভালবাসার, রাগের না দুঃখের তা বোঝা গেল না। বিকাশ নির্বাক হয়ে বসে রইলো। অতনু ওষুধ নিয়ে নেমে আসছে। আঁচলে চোখ মুছে শান্ত হওয়ার চেষ্টা করলো লীণা।

রাত্রে বিকাশকে না খাইয়ে ছাড়লো না অতনু। অতি উপাদেয় খাদ্যের স্বাদ যে অত তিক্ত হয়, বিকাশ এই প্রথম অনুভব করলো। তার জন্যে নাকি অতনুর বাড়িতে দুপুর হতেই রান্নার ধুম পড়ে গিয়েছিল। অতনু বললো, আজ সারাদিন ধরে এত খাটুনির জন্যেই নাকি লীণার ব্লাড প্রেসারটা বেড়ে গেছে। থালার চারপাশে অসংখ্য বাটি সাজানো। কলকাতার নানা ইলিশ মাছ থেকে সুরু করে নানা রকমের রান্নার যেন এক্সিবিশন। দৈ আম আর মিষ্টির ছড়াছড়ি।

কিন্তু বিকাশের গলার মাঝে কি যেন একটা আটকে আছে। কিছুই যেন ওর গলা দিয়ে আর নামছে না।

অতনু বিকাশকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করলো লীণা কেমন রেঁধেছে।

বিকাশ হেসে বললো—চমৎকার।

সেটা হাসি না কান্না বোঝা গেল না।

বিকাশ আর অতনু পাশাপাশি খেতে বসেছিল।

লীণা অদূরে পাথরের মূর্তির মত বসেছিল। সে যেন সবকিছু অনুভূতির ঊর্দ্ধে চলে গেছে।

খাওয়ার শেষে ওরা আঁচাবার পর, দু'খিলি পান নিয়ে এসে বিবর্ণ, রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে দাঁড়ালো লীণা। বিকাশ যেন চমকে উঠলো। তিন বছর আগেও ঠিক এমনি ভাবে বিকাশের কাছে পান নিয়ে এসে দাঁড়াতো লীণা।

অতনুর অনেক সাধাসাধিতেও বিকাশ থাকলো না। বিকাশ বিদায় নিচ্ছে। অতনু দুহাত জোড় করে

কপালে ঠেকালো। বিকাশও তাই। লীণা এসে দরজা ধরে দাঁড়িয়েছে। বিকাশ বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই আবার সেই মনের ফুলের দম বন্ধ হয়ে আসা গন্ধটা পেল। অতনু মৃদু হাসলো। বিকাশ বিবর্ণ মুখে তাকালো। দুহাতে দরজার পাল্লা ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে লীণা। ঠিক যেন ফ্রেমে তোলানো আট বছর আগেকার রঙ চটে যাওয়া, ঘুষে মুছে যাওয়া একখানা ছবি। চোখ, মুখ, ঠোঁট, ভ্রু সব মুছে গেছে, গলে গলে একাকার হয়ে গেছে। ছবিটা একটুও নড়লো না। শুধু কাত হয়ে ঝুলে দরজায় আটকে রইলো।

বিকাশ রাস্তায় এসে পড়েছে। পিছনের বাড়িটা আর দেখা যাচ্ছে না। ক্রিশ্চানদের গোরস্থানে আর আম লিচুর বাগানটায় মধ্যভারতের নাম না জানা পাখীগুলো কি সব তাকাতাকি করছে। ওঃ এত গুমোট গরম কেন? পৃথিবী থেকে হাওয়াটুকুকে কে যেন সরিয়ে দিয়েছে। অনেক দূরে ঐ তো রেল লাইন। কলকাতার দিকে একটা ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। অন্তখানা বোম্বের দিকে। ছোট ছোট আলোর ঘুপরির মত গাড়ির জানালাগুলো দেখা যাচ্ছে! বিকাশ কোন দিকে যাবে? ভারতের কিংবা পৃথিবীর কোন প্রান্তে? ষ্টেশনের কাছে হোটেলে সুটকেশটা পড়েই আছে। থাকুক না। কত কিই তো গেল। মাথার ওপর অনন্ত আকাশ ঐ দূর দিগন্তে মিশে গেছে। তাতে অসংখ্য নক্ষত্রের আলপনা। ওদের নামও বিকাশ জানে না। ঘুগোল কি আর আজ পড়েছে নাকি? শুধু বিশাল চাষাপংটাকে ও চিনতে পারছে। বিকাশ হাঁটছে।

◀এই প্রথম▶

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাঁদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেনা তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে যেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

সম্পাদক গল্প-ভারতী

দণ্ড

শ্রীমতী ইভা রায়

সুবিনয় বাজার নিয়ে বাড়ীতে ফিরতেই ভেজু তার চোখের দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ সমস্ত নিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে ওর পথ আগলে ধরল। ওর পাওনা না দিয়ে এখন সুবিনয়ের সাধ্যি কি যে ঘরে ঢোকে।

সুবিনয় ওর ভাবভঙ্গী দেখে হেসে ফেলল। নজরটা ওর অমন হলে কি হবে, ল্যাজ নাড়ানোর গতি যেরকম প্রবল তাতে যে কোন সময় ওটা খানচ্যুত হয়ে পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুবিনয় বলল, আরে দাঁড়া আগে বার করতে দিবি তো না কি? সে পকেট থেকে ভেজুর প্রতিদিনের প্রাপ্য বিস্কুট দুখানা ওর সামনে ফেলে দিয়ে বলল, "নে এবার পালা।" সে ঘরের দিকে এগোলো। এবার তারও একটা পাওনা আছে। একথা ভাবতেই ওর মুখে একটা খুশীর হাসি ফুটে উঠ্‌ল। এই পাওনা পাছে না পাওয়া হয় এই ভয়ে সে রোজই নিজেকে নানা উপায়ে দোষী সাব্যস্ত করে বাড়ী ফেরে। ওর এই পরম আকাঙ্ক্ষিত এবং একান্ত প্রত্যাশিত পাওনাটির নাম মিষ্টি কণ্ঠের কিছু কথা।

ও যদিও আসবার সময় জানালার ইট রঙের ফুলে পাড়ীর অস্তিত্ব স্পষ্টই দেখেছিল কিন্তু এখন সে কথা কে বলবে। পাড়ীর মালিক সেই মানুষটি তার নতুন গয়নার ঠিনঠিন শব্দ তুলে শিশি বোতলের মধ্যে কি যে মহামূল্যের হারানো জিনিষ খুঁজে চলেছে তা কে জানে। ঘরে যে একজন মানুষ ঢুকল যেন সে তা বুঝতেই পারছেনা অর্থাৎ মনোযোগটা কিছু মাত্রা ছাড়াই মনে হয়। হাসি চেপে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সুবিনয় বলল, "বাজারে আজ পাঁচটা টাকাই খরচ হয়ে গেল ললিতা, কিছু কিনলো না।" অবার্থ লক্ষ্য সুবিনয়ের।

আর এক মুহূর্তও দেরী হল না। সঙ্গে সঙ্গে কড়া মিঠে গলায় তার শাসনের হুকুম হয়ে গেল, "আজ একজনের দ্বিতীয় হলার বরাদ্দ বন্ধ বাস্।"

দ্বিতীয় হলার বরাদ্দ মানে এক পেয়ালা কফি। বাজার থেকে ফিরে শুটি চাই সুবিনয়ের অতএব এ হেন শাস্তিতে সে যে হাকুল অন্ধ হয়ে যাবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

সত্যি সুবিনয়ের মুখ দেখলে মায়াই হচ্ছে এখন। মিনমিনে গলায় সে বলছে, "যাঃ, বললাম বলে সত্যি তাই নাকি? এই তো কেবল দুটাকা বাইশ নয়া।" ওর এই করুণ অবস্থা দেখে সময়োচিত গাম্ভীর্য ভুলে ওর বিয়ে যৌ ললিতা খিল খিল করে হেসেই খুন। তারপর কোনমতে হাসি থামিয়ে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা খুব হয়েছে আর মুখটা অমন করতে হবে না, আমি এখুনি কফি তৈরী করে এনে দিচ্ছি।"

এবার সুবিনয় বাজারের থলিটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে দিতে চিন্তিত ভাবে বলল, "আজ আবার তেজুর মাংস পেলাম না—

—"এই নেয়েছে।" ললিতা ঘরকে দাঁড়াল।

সুবিনয় বলল "মাংসওয়ালা আসেইনি আজ, বাজারে শুনলাম অসুখ করেছে—কিন্তু কি যে আজ খাবে কুকুরটা এ এক ভারী চিন্তায় পড়লাম"।

ললিতা যদিও শুনেছিল সুবিনয়ের আদরের তেজসিং মাংস না খাবলে ভাত মুখেও দেয়না তবু শুধু ভাবলে তো কিছু লাভ হবেনা তাই বলতে গেল "একদিন না হয় অন্য কিছু"—কিন্তু সুবিনয়ের গলার সোচ্চার নৈরাশ্য তাকে একেবারে নিভিয়ে দিল। সুবিনয় বলল, "পাগল? ও খাবে অন্য কিছু দিয়ে? হুঁ তাহলেই হয়েছে। এইরকম মন-মিট-তে তো আগেও কত গেছে। এখন না হয় মাংসওয়ালাকে পয়সা দিয়ে চুপি চুপি ওরা অজ্ঞে একটু মাংস আনিয়ে রাখি। আগে যখন এসব ব্যবস্থা করতে পারিনি তখন তেজুকে নিয়ে আমরা দুভাই যে কি মুস্কিলেই পড়তাম। ছোটো কতরকম ভাবে চেষ্টা করত ওকে খাওয়াতে কিন্তু খেলে তো।" যদিও এসব গল্প অনেক বারই স্বামীর মুখে শুনেছে ললিতা তবু আবার ধৈর্য্য ধরে শুনল তারপর চিন্তিত ভাবে—"সত্যি কি যে হবে আজ!" বলে ঐ ভঙ্গীতেই থলিটা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। আর বেরিয়ে এসেই খুব একচোট হেসে নিল নিঃশব্দে। বাব্বাঃ এই কুকুরটাকে নিয়ে কি বাড়াবাড়িই যে করে ও। আমার 'লালটু'টাই বা কি কম আদরের ছিল বাপের বাড়ীতে; অথচ তার জন্যে ভাবতে হত না এতটুকু। অন্তত খাওয়া খাওয়া নিয়ে ভাবেলা করতে কেউ কখনও দেখেনি তাকে। আসলে তেজু খুবই ভালো কুকুর, ওকে নিয়ে ও মিছি মিছি এত ব্যস্ত হয়—নইলে সত্যি স্বভাবের যেন তুলনা হয়না। মানুষের মত এত বোঝে কুকুরটা যে এক এক সময় আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এই তো সুবিনয় স্কুলে পড়াতে গেলে সে সময় দুপুর বেলাটা একা একা থাকে সে সময় ঐ বারান্দা থেকে এক পাও নিচে নামবে না তেজু। ঘুমের একটু ভঙ্গী পর্যন্ত করবে না। যেন মস্ত এক পাহারাওয়ালা এইরকম একটা ভান করে দরজা আগলে বসে থাকবে। সত্যি কথা বলতে কি এ বাড়ীতে ওকে না পেলে লালটুর জন্যে মন যেমন করাটা তার কিছুতেই কমতো না—নিজের হাতে বড় করা কুকুরটা অথচ এখন একবার দেখবার উপায় অবধি নেই।

আড়চোখে ললিতার দিকে তাকাতে তাকাতে তেজু ওরফে তেজসিং দরজার সামনে এসে ধপাস করে বসে পড়ল। ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ললিতা বলল, "আজ তোর জন্যে মাংস আনেনি আনিস তেজসিং?"

কুকুরটা কান দুটো লোমের ফাঁকে মিলিয়ে দিয়ে হাসির মত মুখ করল।

কথার ছিরে ললিতা বলল "খুবতো হাসি হচ্ছে আজ দেওখন সবস্তরা।"

সে কফির কাপটা নিয়ে সুবিনয়ের ঘরের দিকে গেল।

সুবিনয় মুখ থেকে কিরেই জানতে চাইল,—"তেজুকে কিছু খাওয়াতে পারনি—তাইনা?"

"সে কথা তোমার তেজুকেই জিজ্ঞেস কর" বলে ললিতা হাসিমুখে কুকুরটার দিকে তাকাল। তেজু তখন যেন সত্যি কিছু বলবে এইরকম মুখ করে সুবিনয়ের কর্ণা অথচ পুরোনো পাতবীটার ওপর নিবিকার ভাবে ওর ময়লা থাবা দুটি তুলে দিচ্ছিল—

সুবিনয় পাজাবীটা ছিঁড়ে যাওয়ার ভয়ে ওর কাছ থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করতে করতে বলল "ব্যাপার কি, খুব কুর্তি দেখছি, পেট না ভরা থাকলে তো এমন হবার কথা না: সত্যি কিছু খাওয়াতে পেরেছ নাকি? মাংসওলাটা বুঝি মাংস নিয়ে এসেছিল শেষ পর্যন্ত?"

"না গো না," হেসে ললিতা বলল, "ওসব কিছু না। তোমার তেজসিং আজ বেশ ভালমাথা ভাত খেয়েছে?"

"সে কি?" সুবিনয় ভারী অবাক হয়ে গেল।

"হ্যাঁ ভাই" ললিতা বলল, "প্রথমটা অবশ্য কিছুতেই খাবেনা বেশে অনেক করে বুঝিয়ে বলাতে রাজী হল খেতে।"

ললিতা বলল, "সাধারণ কুকুরের মত হলে হয়ত পারতাম না—এ শুধু তেজু বলেই সম্ভব হল। ওরে সব বোঝে—দেখনা ওর চোখ দুটো কেমন ঠিক যেন মানুষের মত···।"

এসব কথা অবশ্য পাঁচ বছর আগের।

তেজু এখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে খানিকটা নিজীবও। এ সংসারটা এখন শুধু সুবিনয় আর ললিতার নয়। পাঁচবছরে আরো দুজন এসেছে এ সংসারে। ওরা যুবান আর খুকী। যুবানের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই। কিন্তু খুকীটা এত রুগ্ন, দুবছরের মেয়ে, অথচ তেমন বাড় বাড়ন্ত কিছুই নেই।

ওকে কোলে নিয়ে বসে ওর কথাই ভাবছিল ললিতা। এত চিকিৎসা ওষুধপত্র কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, খুকীর গায়ে একটুকু কিছু লাগছে না। ওর যদি যুবানের মত স্বাস্থ্যটা ভাল হত তাহলে হয়ত সুবিনয়কে আজ এত দেনা করে তার চিকিৎসার জন্য টাকা জোগাড় করতে হত না। শরীর তার নিজের একেবারে ভেঙে গেছে। তার জন্যেও সুবিনয়ের চিন্তা কম নয় কিন্তু বেচারা এতদিক কি করে সামলাবে! স্কুলের বাইনে ঠিক সময় পাওয়া যায় না—বাধ্য হয়ে তাকে টিউশানি করতে হয় তবু সংসারের চাহিদা যেন মেটে না। যুবান বাইরের বারান্দায় খেলা করছে। ওর জন্যে ললিতাকে ভাবতে হচ্ছে না। তেজু যতই খুনের ভান করে মটকা মেরে পড়ে থাকুক—যুবান গেটের কাছে গেলেই সব সব করে ধমকে দেবে। ললিতা তাই ছেলে দুরন্ত হলেও তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। এ সব ব্যাপারে তেজু যে তাকে বড় সাহায্য করে। বারান্দাতে দুই থাবায় মুখ রেখে শুয়ে ছিল তেজু—ঘরে বসেই ওকে দেখতে পাচ্ছিল ললিতা, আহা বেচারা কত রোগাই না হয়ে গেছে। অসুস্থ মেয়ে আর পরিশ্রান্ত স্বামীর চিন্তার সঙ্গে ললিতা তেজুর কথাও সমান সহানুভূতি নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। আজকাল তারা আর ভালো কিছুই খেতে দিতে পারে না তেজুকে। মাংস তো দূরের কথা পেট ভরে দুটি ভাল ভাত তা দিতেও তাদের এখন অসুবিধে হয়। আর আশ্চর্য তেজুর স্বভাব। কোথায় গেছে তার সব ঝামেলা আর ঝামেলা। আজকাল ও ললিতার মতই ভাবতে পারে। সত্যি এত কোথায় পাবে সুবিনয়।

এই জোড়াতালি দেওয়া দিনগুলোর মধ্যে হঠাৎ একদিন শ্রী পুত্র নিয়ে পাটনা থেকে ছোটভাই

এসে হাজির হল। ওদের দেখে সুবিনয় আর ললিতা এত বেশি খুশী হয়ে উঠ্‌ল যে সাময়িক ভাবে ভুলেই গেল যে সংসারটা কিভাবে চলছে বিশেষ করে গত কয়েকটা দিন। সময় হয়ে গেলেও মাইনেটা এখনো এসে পৌঁছয়নি হাতের নাগালের মধ্যে। টিউশানিতে পাওয়া টাকাকটাও প্রায় শেষ। এসব কথা ললিতার মনে পড়ল রান্না ঘরে চায়ের জল চাপাতে এসে। আর সুবিনয়ের মনে পড়ল তার কিছু পর স্ত্রীর হঠাৎ ম্লান হয়ে যাওয়া মুখটার দিকে নজর পড়াতে। একটু আড়ালে গিয়ে বলল, ভেব না, কএকটা দিন তো থাকবে, আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলব।

ছোটোভাইয়ের বৌ মণিমালার ঘুরে ঘুরে ছোট বাড়ীটা ইতিমধ্যে দেখা হয়ে গিয়েছিল। ছোটোভাই দাদাকে বলল, "দাদা, তেজুর এমন অবস্থা হল কি করে? অসুখ বিসুখ কিছু হয়েছিল নাকি?"

"অসুখ না হলেও প্রায় তাই"—বলে অর্থহীন একটা কথা বলে সুবিনয় ও কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলল, "তোরা হাত মুখ ধুয়ে চা জল খাবার খেয়ে নে ছোটো, আমি চট করে বাজারটা নিয়ে আসি।" সুবিনয় থলিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ললিতা ওদের সামনে চা আর মাখন লাগানো পাউরুটির প্লেট সাজিয়ে এনে রাখল আর কৌটো থেকে শেষ দুখানি বিস্কুট দিল ওদের ছেলের হাতে। এ ব্যাপারে মুখে আপত্তি না তুললেও খুকি বেশ একটু আশাহত হয়ে ঠোঁট ফোলাল। ছোটো বলল, দাঁড়া তোদের জন্যে বিস্কুট এনেছি ভুলেই গেছি দিতে—বলে একটা বিস্কুটের টিন বার করে টেবিল থেকে ছুরিটা নিয়ে তার মুখটা কেটে সকলের হাতেই বিস্কুট দিল ছোটো।

বরজা থেকে একটু দূরে থাবার মুখ রেখে তেজু শুয়ে ছিল।

ছোটো ওর দাদার ভঙ্গীতেই দুটো বিস্কুট ওর মুখের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, "নে খা। তুই যে বিস্কুট খুব ভালবাসিস্ তা আমি জানি।"

ছোটোর কথা শুনে অভ্যাসবশতঃই বোধহয় তেজু একবার খাবা থেকে মুখটা তুলেছিল। তারপর আবার মুখটা নামিয়ে আগের মতই বিমোতে লাগল, বিস্কুট দুটো ছুঁলোও না।

অবাক হয়ে ছোটো বলল, "একি। ও আর বিস্কুট খায়না বৌদি—?"

ললিতা বলল, "না ঠাকুর পো—ও এখন অনেক কিছুই খায়না, বোধহয় বড় বেশি বোঝে তাই—"

মণিমালা বলল, "ওসব কিছু না দিদি, কুকুরটাতো বেশ বুড়ো হয়ে গেছে। এখন ওর খাওয়াটা আগের মত না থাকাটাই স্বাভাবিক।"

ছোটো বলল, "তাতো ঠিকই। জানো মণি, আগে আমি আর দাদা কাজেই বাজার থেকে শুধু হাতে বাড়ী ফেরার অধিকার ছিল না যদি কোনো দিন ভুলেছি তো আবার যেতে হয়েছে।"

সুবিনয় বাজার এনেছিল। ললিতা এবার রান্না ঘরের দিকে গেল কিন্তু বাজার দেখে ওর যেন কান্না পেল, বলল, "এইটুকু মাংস এনেছ। তার চেয়ে মাছ আনলেই তো হোত?"

সুবিনয় অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলল "ছোটোটা আবার মাছের চেয়ে মাংসই বেশী পছন্দ করে। তেজুটার তো ওর জন্যেই ঐরকম অভ্যেস হয়েছিল", তারপর বলল, "আজকে যা হোক করে চালিয়ে দাও কাল দেখো কেমন বাজার করি।"

কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প বলতে থাকায় খাওয়া দাওয়ার পাট চুকতে ভারী দেরী হয়ে গেল। ওদের হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে খেতে বসেনি ললিতা। ছেলেদের আসল খবরটা এরা মাত্র

দুদিনের জন্যে এসে নাই বা জানল। সবাইকে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে ললিতা যখন এক পেট খিদে নিয়ে খেতে এল তখন বেলা দুটো বেজে গেছে প্রায়। অসুখে ভোগা দুর্বল শরীরে সারাদিন যেন একটা পরিশ্রমের ধকল গেছে। এখন কিছু একটু না পেলে সে বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। সে এসে বসতে বলল। তরকারি কিছুই ছিলনা আর। যা ছিল তা শুধু একটু ডাল আর সামান্য দু এক মুঠো ভাত। মাপের ভুল হওয়ায় ভাতটাও কম পড়েছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আর উপায়ই বা কি; ললিতা ভাতটুকু থালায় ঢেলে নিয়ে ডাল দিয়ে মেখে নিল আর ঠিক এই সময়টি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তেজু। ওকে দেখে ঘরকে গিয়ে ললিতাকে মুখের কাছ থেকে ভাতের গ্রাসটা নামিয়ে ফেলল। মনে হল—সারাদিন কাজ আর পরে ওকে খেতে দেওয়ার কথাটা একেবারে ভুলে বসে আছে সে। অত কুকুর হলে হয়তো সকলের পাতের এঁটো কুক্কারদের খেয়ে পেট ভরাতো কিন্তু তেজু তা এখনও পারেনা। ললিতা না দিলে তার খাওয়াই হয় না। কিন্তু এই মুহূর্তে ললিতা ভেবে পাচ্ছে না সে কি করবে। সামান্য এক মুঠো ভাত এতে হয়তো তেজুর পেটও ভরবে না কিন্তু এটুকু খেতে পারলে সে আবার কাজ করতে পারবে ছেলে মেয়েদের তদারক করতে পারবে। কিন্তু তেজু এমন ক্ষুধার্ত-ইঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে—! ওর মনে হল এটুকু ভাত সে নিজেই খেয়ে নেয়। খেয়ে উঠে ছোটোর আনা বিস্কুটের টিন থেকে সব কটা বিস্কুট ওকে দিয়ে দেয় কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল তেজু বিস্কুটও খায় না আজকাল। আচমকা তার ভারী রাগ হয়ে গেল কুকুরটার ওপর। এই প্রথম সে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তেজুর দিকে তাকিয়ে বলল "আর একটু পরে এলে কি হত শুনি? "পরক্ষণেই উঠে পড়ে থালাটা উপুড় করে তেজুর বাটিতে সবকটা ভাত ঢেলে ফেলে রাগত স্বরে বলে উঠল "নে রাক্ষস খা...।"

কথাটা বলে ফেলেই তার খেয়াল হল—তেজু ভাতের বাটিতে মুখ না দিয়ে কেমন যেন অবাক হয়ে যাওয়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ দারুণ লজ্জা হল ললিতার। ছি ছি সে কি—একটা দিন মাত্র একটা দিনের খিদে সে হাসি মুখে সহ্য করতে পারল না! মুখের ভাতটা তেজুকে দিয়ে দিতে হল বলে সে এতই রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে কোনো দিন যা করেনি তাই করে বসল। গালাগালি দিয়ে খেতে দিল তেজুকে···! সে এবার অপরাধীর মত বলল "খেয়ে নে তেজু!" তেজু খেল না শুধু মানুষের চোখের দৃষ্টিতে তাকে একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে তার পরিচিত জায়গাটায় ফিরে গিয়ে খাবার ওপর মুখটা রেখে শুয়ে পড়ল।

পর দিন সুবিনয় সত্যিই প্রচুর বাজার এনেছিল। কে জানে কোত্থেকে টাকা যোগাড় করেছে সে। আজ ললিতার রান্নাঘরে তরিতরকারি মাছ মাংস সবই প্রচুর ভাবে জমা হয়েছে। মণিমালা আজ রাঁধবে বলে জোর করে ঠেলেঠলে ঢুকেছে। ছোটো বলেছে সেই ভালো একটা কাজে দুটো লাভই হবে তোমার। একদিকে তাদুরকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ানো এবং অন্যদিকে অন্ততঃ একটা দিনও ঘর ভরকে বিশ্রাম দেওয়া হবে।

সুবিনয় খুশীই হয়েছে। বেচারা ললিতা অন্ততঃ একটা দিন সকলের সঙ্গে একটু গল্পটল্প করুক। সে শুধু কাজই করে যাচ্ছে হয়ত কাল বিকেল থেকে এই অল্পেই সে খানিকটা ক্লান্ত হয়ে আছে। কেমন যেন একটু অন্যমনস্কভাব···। যদিও তার ঠিক কারণ সুবিনয় তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছেনা তবুও যা হোক একটা মন গড়া কারণ খুঁজে নিয়ে ভেতরে ভেতরে তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মণিমালা রান্না করছিল। ওর কিছু দূরেই বসে আছে ললিতা। মণিমালা একাই কথা বলে যাচ্ছে ও শুধু হুঁ হাঁ করে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে। ছোটো দু'চারবার কথা বলতে এসে ঠিক জুত না পেয়ে ঘরে গিয়ে পড়া কাগজটাই আবার পড়তে বসেছে।

মণিমালার রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এবার মাংসটা নামিয়ে ফেলতেই ললিতা তাড়াতাড়ি বাটি এগিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে খানিকটা মাংস দাও তো মণিমালা। "একটু অবাক হলেও সে ভাব চেপে আগ্রহের সঙ্গে বেশ খানিকটা মাংস ঝোল শুদ্ধ ললিতার বাটিতে ঢেলে দিল। বলল, "নাও দিদি যদি ভালো লাগে তবে আরো দোব"—মাংসটা বাটিতে পেয়েই আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি ললিতা বেশ খানিকটা ভাতের সঙ্গে মাংস ও ঝোল মেখে সবশুদ্ধ নিয়ে গিয়ে তেজুর বাটিতে ঢেলে দিয়েছে--।

মণি অবাক হয়ে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "ওঃ কুকুরকে খেতে বলে এত ব্যস্ততা।"

"ব্যস্ততা কি বলছ মণি, জানো ও কাল দুপুর থেকে কিছু খায়নি?" বলে ঘরে একরাশ আদর ঢেলে ললিতা ডাকল, "তেজু আয় বাবা খেয়েনে এটুকু।"

তেজু কিন্তু সেই ওর পুরোনো ভঙ্গিতে আবার মুখ রেখে বসেই রইল উঠবার কোনো লক্ষণও দেখালো না।

ললিতা এবার ওর কাছে গিয়ে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদু স্বরে বলল, "আর কত কষ্ট দিবে আর কষ্ট পাবি তেজু? বেশ বাবা বেশ কাল একটু বকেছিলাম বলে না হয় ক্ষমাই চাইছি তোর কাছে চল এবার খেয়ে নিবি চল।"

তেজু যেন ললিতার একটা কথাও শুনতে পাচ্ছে না। ললিতা এবার প্রায় কেঁদে ফেলল, "তেজু ওঠ্ ওঠনারে আমি আর পারিনা।" ছোটো আর মণিমালা অবাক হয়ে ললিতার কাণ্ড দেখছিল। টিফিনটি ছেড়ে সুবিনয়ও বাড়ী ফিরে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল বলল, "ব্যাপার কি ললিতা?"

ললিতা স্বামীকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ব্যাকুলভাবে বলল, "ওগো তুমি একটু ওকে বল না খেতে, বকেছি বলে কাল ভাতটুকু মুখেও করেনি রাত্রে অতকরে সাধলাম খেল না—সকালেও কিছু খাওয়াতে পারলাম না এমন কি এখন পর্যন্ত।" ললিতা চোখের জল লুকোতে মুখ ফিরিয়ে নিল। সুবিনয় বলল, "আচ্ছা আমি দেখছি চেষ্টা করে" কিন্তু না তেজু কিছুই খেল না। ছোটো মণিমালা সুবিনয় আর ললিতা কেউ আর কোনোদিনই তেজুকে কিছু খাওয়াতে পারল না।

সুবিনয় পশু-চিকিৎসক প্রশান্ত চৌধুরীকে মোটা রকম ফী দিয়ে তেজুকে দেখাতে এনেছিল। কিন্তু দেখে তিনি হতাশা আরো বাড়িয়েই দিয়ে গেলেন, বললেন "মিছেমিছি কেন পয়সা খরচ করছেন সুবিনয় বাবু বুড়ো হয়ে গেছে? এবার ওটাকে মরতে দিন।"

ছোটোরা চলে যাবার দিন দশ পর তেজু মারা গেল। কুকুরটার জন্যে সকলের সামনেই সেদিন কেঁদে ফেলেছিল সুবিনয়। ছোট থেকে তাকে এতবড় করে তুলেছিল, সংসারের প্রতিটি ঘটনায় আর সকলের মত তেজুও জড়িয়ে রয়েছে। তাকে ভুলতে অনেক দিন সময় লাগল সুবিনয়ের। তারপর একদিন ললিতাকে বলল, "প্রফুল্লবাবু একটা ভালো জাতের কুকুরের বাচ্চা দেবেন বলছিলেন, রাখব না কি?"

ললিতা দৃঢ় স্বরে বলল "না।"

সুবিনয় অপ্রস্তুত ভাবে বলল, "মানে তুমি এখনো তেজুটার জন্যে মন খারাপ কর কিনা তাই বলছিলাম।" ললিতা কিছু বলল না? ওর নজর পড়ল বারান্দার কোণে রাখা তেজুর খাবারের খুব বাটিটাও দিকে। ওটাকে আজ একবছর পরও তার বলেই মনে হয়, মনে হয় ঐ বাটিতে খাবার ফেলে রেখে শেষ পর্যন্ত তেজুটা না খেয়েই চলে গেছে।

অপরানুবর্তী

সুবোধ সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজকের দিন থেকে অনেক দিন আগেকার দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়ে পরীক্ষিৎ যা দেখল সেদিন কিন্তু সে তা দেখতে পায়নি। সুমিত্রাকে হারানোর দুঃখ ছিল সেদিন, ছেলেমেয়েকে মানুষ করবার দুর্ভাবনা, আর ছিল সমভাবে অনুভব করবার একটি মনের অভাব।

সেদিনের অন্য চেহারা দেখল আজ, অন্যভাবে শুনতে পেল সেদিনকার কথা ও কলরব। অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখো,—অজস্র দুঃখের পাহাড় পেরিয়ে এলেও তোমার মনে হবে সেসব দিন সুখের স্মৃতিতে ভরে আছে। মনে হবে তখন যেন দুঃখের মধ্যেও আনন্দ ছিল আর আজ যেন কোন সুখকেই তেমন ভাবে সুখ বলে আর মনে হচ্ছে না। যে-দিনগুলো বহু দূরে চলে গিয়েছে—হারিয়ে গিয়েছে জীবনের প্রান্ত থেকে—যাকে চোখে আর দেখা যায় না,—সেদিকে বার বার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—সেখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখের কলধ্বনি সোনার হরিণের মত যেন ছুটোছুটি করছে।

মৃত্যুর দুঃখের চেয়ে হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ যে আরো ভয়ঙ্কর তা পরীক্ষিৎ সেদিন প্রথম অনুভব করল। সুরজিৎ ও সুমিত্রার দাদা অমরেশ সিঙ্গাপুরে গিয়েও বিশেষ কোন সঠিক বা স্পষ্ট খবর আনতে পারেনি, এয়ার-লাইনারের কর্তৃপক্ষ অনেকদিন খোঁজ-খবর করেও কোন সন্ধান পায়নি এরোপ্লেনের। ওদের রিপোর্ট, সরকারের তরফ সবই খবরের কাগজে বেরিয়েছিল! সিঙ্গাপুর হয়ে প্লেনটি যাচ্ছিল চায়না—হংকং পর্যন্ত। সিঙ্গাপুরের পঞ্চাশ মাইল দূরে যে-অব-বেঞ্চলের ওপর দিয়ে যখন এরোপ্লেনটি যাচ্ছিল তখন পর্যন্তও এয়ার অফিসের সঙ্গে খবরাখবর চালু ছিল। এখানে এসে খুব সম্ভবত আশঙ্কা করা যায় যে এরোপ্লেনখানি ঝড়ের মুখে পড়ে যায় কারণ এরপরে রেডিওতে আর কোন খবর ধরা যায়নি। ঝড়ের গতি লক্ষ্য করে দিক পরিবর্তন করে প্লেনটির অন্য দিকে চলে যাওয়া খুব অসম্ভব নয়। যদি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দিকে চলে গিয়ে থাকে তাহলে সেখানকার বিমান ঘাঁটিতে তা নামবার সুযোগ পায়নি। সেখানে পৌঁছবার অনেক আগেই সেখানকার আবহাওয়া আরো বিপজ্জনক হয়ে গিয়েছিল। এরোপ্লেনের রেডিও নিশ্চয় বিকল হয়ে যায়,—সেই জন্যে তা কোন সঙ্কেত জানাতেও পারেনি এবং বিমান ঘাঁটিও তাকে কোন নির্দেশ দিতে পারেনি। সিঙ্গাপুর পেরিয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগবার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু অনুসন্ধানকারী উড়োজাহাজ অনেক সম্ভাব্য জায়গায় খোঁজ করেও কোন হদিস পায়নি। এরোপ্লেনটি একেবারে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে—তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এভাবে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির ফলে যদি পেট্রল-ট্যাঙ্ক খালি হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে প্লেনটি যে-কোন স্থানে নেমে পড়তে বাধ্য হতে পারে। এভাবে নামতে গেলে সবচেয়ে বিপদ আগুন ধরে যাওয়া। লোক চক্ষুর অন্তরালে প্লেনটি এমনভাবে পুড়ে গিয়ে থাকবে যে তার ভগ্নাবশেষের কোন নিদর্শনও আর থাকেনি।

খোঁজাখুঁজির কাজ একদিন যথাসময়ে থেমে গেল, থামল না কেবল লোকের মনের কৌতূহল। রহস্যের দিকে প্রত্যেক কৌতূহলী মানুষেরই প্রবল আকর্ষণ আছে। যে এরোপ্লেন রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল,

তাকে নিয়ে উদ্বেগহীন কল্পনার বিরামহীন বানানো কথা চারদিকে নানাভাবে মাশরুমচারার মত যেন ছুঁই ছুঁচে গজিয়ে উঠতে লাগল। এক বিন্দু রহস্যকেও মানুষ পুষে, বাড়িয়ে, রং চড়িয়ে রাখতে বড় ভালবাসে। বোধহয় তা মানুষের প্রাথমিক দুর্বলতা।

সুমিত্রার দাদা অমরেশ এবং পরীক্ষিতের দাদা সুরজিৎ অনেক খরচ-পত্র করে কেবলমাত্র এইসব গুজব নিয়ে হাজির হল তার কাছে। তাদের কথা সে ফেলেও দিতে পারেনি আবার মনেপ্রাণে গ্রহণও করতে পারেনি। তাদের ইঙ্গিতকে প্রত্যাখ্যান করা যেমন কঠিন, তাকে বিশ্বাস করাও তেমনি সহজসাধ্য নয়।

ওদের এখানে পৌঁছবার খানিক আগে বরুণা একটা কাজে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ওকে নিয়ে পরীক্ষিতের সম্বন্ধে ওদের মনে বিশ্রী সন্দেহ হয়েছিল,—এবং সেই জন্যেই সেদিনটির কথা তার স্পষ্ট মনে আছে।

বরুণা ওর ইজিচেয়ারের একটু দূরে একটা চেয়ারে বসে ছিল। অনেকদিন আসেনি, আজ এইমাত্র এসেছে।

এই মহিলাটি পরীক্ষিতের পরলোকগত বন্ধু অসিতের স্ত্রী। এই স্বামী-স্ত্রী দুইজনকেই অনেকেই বিশেষত সুমিত্রা আদর্শ দম্পতি বলত। পরীক্ষিৎ তার জীবনে মাত্র একটি মানুষকে বন্ধু বলে মনে করে,—সে এই অসিত,—যে অসিত মৃত্যুকালে তার অল্পবয়সী স্ত্রী আর তিনটি সন্তানকে পরীক্ষিতের ওপর দেখাশোনার ভার দিয়ে গিয়েছিল। একটা নতুন ধো-তালা ছোট্ট বাড়ী ছাড়া সে বিশেষ কিছুই রেখে যেতে পারেনি। স্ত্রী আর তার সন্তান কটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল সে, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। মৃত্যুর ত্বরিত গতি ওদের বয়সের অযোগ্য ব্যাপার! একটি পরিচিত ব্যাধি যে একদিন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে উপস্থিত হবে এ-কথা তার জানা ছিল। সেইজন্যে যেদিন থেকে পারিবারিক চেনা-ব্যাধি তাকে আক্রমণ সুরু করল, সেদিন থেকেই সে বিধবার একটা মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থানের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। বিধবা অবস্থায় তার একটা আয়ের ব্যবস্থার জন্যে হঠাৎ যারা ক্ষেপে ওঠে, কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আদু হঠাৎ ধপ্ করে কেন যে নিভে যায় তা পরীক্ষিতের কাছে একটা তাজ্জব ব্যাপার।

নতুন বাড়ি থেকে সবে মাত্র রাজমিস্ত্রীরা বাঁশ খুলতে আরম্ভ করা হয়েছে, নতুন খাটিয়ার নতুন চাদর ঢেকে অসিত ঘ-দুই ছেড়ে অন্য পথে অন্য জায়গায় পৌঁছে গেল। মনে হয়, সে যদি নিজের শরীরের জন্যে তার অর্ধেক ব্যবস্থাও করত তা হলে হয়তো বা এই আধুনিক উন্নততর বিজ্ঞানের যুগে মৃত্যুর এই পরোয়ানা সে বাতিল করে দিতে পারত।

কিন্তু একটি নির্বোধ পৃথিবী সর্বদাই লম্বা লম্বা পা ফেলে বিজ্ঞের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গেটের মধ্যে গাড়ী ঢুকবার শব্দ শুনে পরীক্ষিৎ বলল,—

"দাদা আর অমরেশ বোধ হয় ফিরে এলো!"

পরীক্ষিতের উদ্বেগহীন ধীরভাব অটুট রইল না তেমন ভাবে। ওর সামনে বরুণা যেন ছায়া হয়ে গেল,—বরুণার অস্তিত্বও। ওর এই আকস্মিক মনোযোগের অভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা অপমানকর তাচ্ছিল্য আছে। পরীক্ষিৎ হঠাৎ উঠে পড়ল, পায়ে চটি না পরেই এগিয়ে গেল রেলিং-এর কাছে, ঝুঁকে কি যেন দেখল, তারপর ফিরে এসে চেয়ারে বসল গম্ভীর ভাবে।

বরুণা বসে ছিল, অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াল,—

"আজই আসবার কথা ছিল?"

পাখির ডানার ছায়ার মত ওর মনের একটি ভাব হঠাৎ যেন মাটির গায়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে ছড়িয়ে গেল।

"—এখনই।"

"বলেন নি তো!"

"ভুলে গিয়েছিলাম বলতে।"

"তা হলে আজ আমি আর বসব না—আজ উঠি! আর একদিন আসব।"

"যদি দরকার থাকে,—খুব জরুরী—তাহলে আমিও একদিন যেতে পারি।"

"তাহলে তো খুব ভালই হয়, আমাকে আর আসতে

হয় না। কাজের বিষয় নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে আসি, কিন্তু সকলে সব সময় তা ভাল চোখে দেখে না।"

গোটিকোর নীচে গাড়ীর হরণ খোলার শব্দ হল, হরণ বন্ধ হওয়ারও শব্দ হল পর মুহূর্তে। সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে বরুণা সিঁড়ির দিকে যেতে লাগল। পরীক্ষিতের এই বিশ্রামের সময়ের এই সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অন্ধকার কক্ষ তীব্রতার আলোতে ভরে গেল। পরীক্ষিতও এগিয়ে দিতে গেল বরুণাকে,—সিঁড়ির কাছে গিয়ে থামল। সিঁড়িতে নামবার সময় বরুণা যখন এক মুহূর্তের জন্যে ওর দিকে ফিরে তাকাল তখন পরীক্ষিৎ শুধু দেখল ওর একজোড়া চোখ—যে আশ্চর্য চোখের কাছে এসে পৃথিবীর অনেক জটিল ভাবনা অকস্মাৎ থেমে যায়। বারান্দাতে সিঁড়ির কাছে ও দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটি পায়ের শব্দ ওপর থেকে নীচে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর একটি শক্ত সোলের জুতোর শব্দ খট্ খট্ করে ওপরের দিকে আসছে। একবার যেন মনে হল, সিঁড়ির বাঁকের আড়ালে এই দুটো পায়ের শব্দই যেন একটু সামান্য সময়ের জন্যে থেমে গেল—অল্প সময়ের জন্যেই বটে—কিন্তু যতটুকু সময়ের জন্যে থামা উচিত ছিল তার চেয়েও যেন একটু বেশী।

বরুণা! বেচারী বরুণা!

অনেককেই বলতে শুনেছে—বরুণা সুন্দর নয় বরং নিতান্ত সাধারণ। পরীক্ষিতও অস্বীকার করে না—ও নিতান্ত সাধারণ। সাধারণ জায়গায়, সাধারণ ভাবে, সাধারণ মেয়ে দেখে দেখে যে-চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে চোখের কাছে অসাধারণের চেয়ে এই শ্রেণীর মেয়েকেই বেশী আপনার বলে মনে হবে। ডায়পো-পেলেটির ডিনারের টেবিলে বসে কাঁটা-চামচ দিয়ে ইংলিশ-খানা খেতে খেতে ক্যাবেরা তাল দেখতে থাকলে যদিও বরুণাকে একেবারেই ডাকাবে না কিন্তু বাটির কাছে বসে আনাজ কাটতে দেখলে তাকে খারাপ লাগবে না মোটেই। টেনিস-র‍্যাকেট হাতে করে খেলতে নামলে কিংবা গাড়ী চালিয়ে চলতে দেখলে অবাক হয়ে যাবে তুমি, হয়ত বা মুখ ঘুরিয়ে মুচকিও হাসতে পার, কিন্তু বরুণা যদি বিয়ের বাড়ীতে পরিবেশনের জন্যে ছোটাছুটি করে কিংবা আলপনা দিতে বসে অথবা শাঁখ বাজিয়ে বর-কনেকে ঘরে তোলে তখন ওকে চোখে পড়বে সকলেরই এবং কারো কাছেই বেমানান বলে মনে হবে না।

বরুণা চলে যাবার একটু পরেই অমরেশ এসে উপস্থিত হল। চেয়ার টেনে বসল, গম্ভীর হল, আর পাশে একটা আঙুল রেখে ঘাড় কাৎ করে চুপ করে বসে রইল। এদিকে পরীক্ষিতও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে ইজি-চেয়ারে বসে গুড়গুড়ির নল মুখে নিয়ে আস্তে আস্তে তামাক টানতে লাগল। পরীক্ষিতের দাদা ওর সঙ্গে একই গাড়িতে এসেছিলেন তা সে দেখেছে কিন্তু এখানে কেন তিনি নামলেন না, কোথায় তিনি গেলেন,—সে-সব প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করল না পরীক্ষিৎ। ও ঠিকই বুঝেছে যে ওদের মন বরুণাকে দেখে খুবই বেতার হয়ে গেছে। দুজনের মনেই গুরুতর আঘাত লেগেছে বিশেষত দাদার। একটি বিরাট আদর্শের মানুষকে এ-ভাবে অধঃপাতে যেতে দেখে তাঁর হৃদয় এত কষ্ট হয়েছে যে সামলাতে পারেননি। আর, দুজন পুরুষ মানুষের বিজাতীয় বিদ্বেষের মূর্তির সামনে দিয়ে বরুণাকে হেঁটে চলে যেতে হয়েছে—এটা আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেয়ে কম বাহাদুরী নয়! কেন যেন আবার বরুণার চোখ দুটো মনে পড়ল। কি দেখেছিল সে ওর চোখে? বোকার মত কি ভেবেছিল সে? তার অসহায় ভাব শুধু মরিয়া হয়ে উদ্ধত হয়েছিল,—হয়ত বা অপর কোন একটি মানুষের কাছ থেকে একটু সাহসের দরকার ছিল তার।

অমরেশের চেহারা একেবারেই ওর দুই বোনের মত নয়। সুমিত্রা ও সাধনার শরীরের গড়নে সূক্ষ্ম কাজের হাত আছে কিন্তু অমরেশের গড়ন-পেটনে সে কাজের অভাব—তা বড় বেশী স্থূল আর অমার্জিত। ওর দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন যেন স্বাভাবিকের চেয়েও একটু অতিরিক্ত মোটা আর চওড়া চওড়া। না রংয়ের দিক থেকে, না চেহারার ছবির দিক থেকে ওকে কেউ সুমিত্রা-সাধনার ভাই বলে মনে করবে না। কিন্তু ওদের বাবার চেহারার সঙ্গে অমরেশের আশ্চর্য মিল আছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর মোষের মত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে বলল,—

"Sorry Madam,"—তোমার কোন সুবিধে হবে না—।" তীব্রক ভঙ্গী হল পরীক্ষিতের ঠোঁটে, শাণিত ব্যঙ্গে ঝিলিক দিয়ে উঠল ওর অল্প একটুখানি হাসি, মুখ থেকে আলস্য হল ওর ধূসায়িত নল,—

"খুব ভাবনায় পড়ে গেছ, তাহলে ?"

"আমি ? আমার ভাবনার কি আছে ? তুমিই হয়তো বা শেষ পর্যন্ত মুষ্কিলে পড়ে যাবে—এটাই আমার বক্তব্য। একটু সবুর করলে লোকসানে পড়বে না তুমি। এত তাড়াহুড়ো করতে যেও না—অসুবিধেয় পড়বে।"

"তুমিই যে আমাকে ভাবনায় ফেললে !—কি ক'রে এলে, বলত এবার স্পষ্ট করে ?"

"আমরা স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি, —ইংরিজীতে যাকে বলে could not arrive at a definite conclusion."

"ইংরিজি তর্জমা চমৎকার হয়েছে—কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিছুই ! হেঁয়ালি হেঁয়ালি ঠেকছে !—একটু প্রাঞ্জল হও ! দাদা থাকলে ভাল হত। তিনি গেলেন কোথায় ?"

"দাদা ? দাদা গিয়েছেন টিকিট কিনতে। কাল ভোরের ট্রেনেই দিল্লী চলে যাবেন।—আর হেঁয়ালি ? হেঁয়ালি আমি করি না। হেঁয়ালি করবার মত মনের অবস্থাও নেই ! তাছাড়া হেঁয়ালি-টেঁয়ালি আমার মাথায়ও খুব বেশী আসে না ! ও-সব ব্যাপার তোমার মত কবি বা সাহিত্যিকের কাজ—আমার না,—আমি gross—মোটা বুদ্ধির লোক। বুঝি কম—পেঁচিয়ে কথা বলতে পারি না।"

সামনেই টেবিল ছিল। অমরেশ জুতো সমেত তার স্পষ্টিত পা দুখানি টেবিলে তুলে নিজের পকেট থেকে সিগেরেট কেস বার করে একটা সিগেরেট ধরিয়ে ফুঁকতে লাগল। অমরেশের স্পর্ধার পা দুখানি পরীক্ষিতের প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত অসহজ ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য করে ওর হীন ভনিতার ভূমিকা যেন সাময়িকভাবে খানিকটা ক্ষতি পূরণ করে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করল।

পরীক্ষিতের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ উদ্যত হয়ে জ্বলে উঠল,—

"পা নামিয়ে বসলে শোভন হয়। পা-টা নামিয়েই বসো।"

অমরেশের চমকানো রোগ নেই কিন্তু পরীক্ষিতের কথাতে ও বেশ চমকে গেল। লোহার মত পেটা শরীরও মাঝে মাঝে কথার ধারে বিচলিত হয়, তখন তাকে বাগ মানানো কঠিন হয়ে পড়ে। অমরেশ কিন্তু তখনি পা দুটো মেঝেতে নামিয়ে রাখল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রামেশ্বর ওর জন্যে টেবিলে চা আর খাবার রেখে গেল।

"ঠিকই বলেছ। পা চিবিয়ে খেলে তো পেট ভরবে না—খিদের সময় টেবিলে খাবারটাই বেশী শোভা পায়।"

হাসির ধমকা ঝড় তুলে সে তার খাটো মানকে সুসঙ্গত করে তুলবার চেষ্টা করে খেতে খেতে বলতে লাগল—

"তোমার তো অস্থির হওয়ারই কথা ! যার গেছে তার গেছে।—আমার আবোলতাবোল কথা শুনে কিছু মনে করো না। আমারও কম যায়নি কিছু,—ভেবে দেখ,—বোন গেছে, বাবা গেছেন ! যখন ভাবি, আশ্চর্য হয়ে যাই,—এই বাবার জন্যেই কাণ্ডটা ঘটল,—পেনশনে আর সামালো না,—হঠাৎ, কথা নেই বার্তা নেই—সিঙ্গাপুরে একটা নতুন চাকরী নিয়ে বসলেন। এই মানুষটিকে আমি বুঝলাম না কোনদিন—বড় চাকরী করেছেন,—মোটা পেনশন্ পাচ্ছিলেন,—চোদ্দ সুখেই ছিলেন—অতি লোভের ব্যারাম আটকাবেন কি করে—বেঘোরে গিয়ে প্রাণ হারালেন ! নিজে তো গেলেনই, আমাদের পাঁচজনকেও মেরে রেখে গেলেন। পেনশন থেকে একটা আয় হচ্ছিল,—সেটাও গেল বন্ধ হয়ে !"

"তোমাকে তো আর পথে বসিয়ে যাননি ! নিজেও যদ্দ রোজগার করনা—আর তোমার বাবাও যাবে কিছু কম রেখে যাননি !"

"নিজের বুদ্ধি আর পরের অর্থ মানুষ চিরদিনই বেশী আছে বলে মনে করে।"

"লাউডন ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটের ভাড়া তো আর শুনতে হবে না তোমার! নিজের বাড়ীতে গিয়েই থাকতে পারবে এখন।"

"এই আরেকটা দৃষ্টান্ত!—আমার বুদ্ধিতে বুলোয় না—কি করে বুঝব বল! সুস্মিতাকে বিয়ে দিতে চাইলেন শৈলেন সেনের সঙ্গে আর তার বোনকে যখন আমি বিয়ে করলাম,—তখন বেজায় খাপ্পা! মেয়েকে বিয়ে দিলে ভাত যায় না—আর আমি বিয়ে করলেই ভাত নষ্ট হয়ে যাবে! এর কোন মানে হয়?—কি বুঝবে তুমি! বল!"

"সে জন্যে নয়। জাতের তোয়াক্কা তিনি করেননি কোন কালেই! তিনি রাগ করেছেন অন্য কারণে! তোমার স্ত্রী ওকে একটু খুসী করবার চেষ্টা করলেই সব মিটে যেত।—এখন ও-সব কথা ঘেঁটে কোন লাভ নেই,—উনিও আর ফিরে আসবেন না,—তোমারও ও-বাড়ীতে থাকতে কোন বাধা নেই।"

"—হতে কতক্ষণ?—না! আমি এখন ও বাড়ীতে গিয়ে উঠছি না!"

"কেন? বাড়ীর কি অপরাধ?"

"বাড়ী ভাড়া পাওয়া কি সহজ নাকি আজকাল? আর অমন বাড়ী। তোমার কথা মত ভাড়া বাড়ী ছেড়ে দি, তারপর হঠাৎ একদিন তিনি এসে পড়ুন—তখন কোথায় যাব? কোথায় বাড়ী পাব?"

পরীক্ষিৎ কি একটা কথা বলতে গিয়ে থমকে গেল। ওর মনের একটি কথা নীল সমুদ্রের ছবি হয়ে ফুটে উঠল ওর চোখে। অমরেশের অনুচ্চ কথার বিস্তীর্ণ তাৎপর্য বেয়ে ও অন্য একটি রাজ্যে গিয়ে পৌঁছল। বহু দূরবর্তী সমুদ্রের জলে একটি কান্নাই যেন নীল হয়ে ছিল এতদিন, আজ এই মাত্র রহস্যে-ভরা একটি শুভ্র আলোক যেন সেখানে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

"তুমি কি মনে কর———"

"মনে আমি অনেক কিছুই করি যা তোমরা কখন বিশ্বাস করবে না—যা সুরজিৎবাবুও বিশ্বাস করেননি। তোমরা সকলেই খবরের কাগজের রিপোর্ট সত্যি বলে মেনে নিয়েছ—কারণ তা expert লোকের কথা। তোমরা বিশ্বাস করতে পার, তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পার কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি।"

"নিশ্চিন্ত হও কি না হও, ওদের কথা তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। এ-ছাড়া করবেই বা কি তুমি?"

"ওরা তো একটা দুর্ঘটনাকে reconstruct করে বলেছে মাত্র। সত্যি খবর কিছুই দিতে পারেনি তারা.—আর চেষ্টাও করেনি। মাথার মধ্যে একটা কথা রাখলে ভেতরের ব্যাপারটা বুঝতে খুব বেশী কষ্ট হবে না তোমার। চীনার গৃহ-যুদ্ধের সময় সোনার চাহিদা খুব বেড়ে গিয়েছিল সে-দেশে। একতাল সোনা যাচ্ছিল সেই প্লেনে। বুঝেছ ব্যাপারখানা?—চোরাই সোনা। কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে চোরাই মাল পাচার করছিল একদল আরেক দলকে। বেশ লুকিয়ে চুরিয়েই পার করেছিল অনেক ঘাঁটি। কিন্তু সিঙ্গাপুরের কাস্টম-অফিসারদের কাছে এ-খবরটা কি করে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ওরা প্রস্তুত হয়ে গেল তখনি। এর মধ্যে একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল। সিঙ্গাপুর কাস্টমসে যে ওদেরকে ধরবে—সে-খবরটাও যথাসময়ে ওদের কানে গেল পৌঁছে। প্লেন সেখানে নামলো না,—বড়ের দোহাই দিয়ে সোজা সেটা চলে গেল চায়নাতে।

"আরি মনোজ! ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত।"

"খবরটা গোপন—কেউ জানে না এ-পর্যন্ত কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। নাম বলব না—কাস্টমের একজন লোক নিজের মুখে আমাকে এ-কথা বলেছে। আমার নিজের বন্ধু নয় যদিও,—আমার এক বন্ধুর বিশেষ পরিচিত সে। আমার কাছে মিথ্যে বলে তার কি লাভ? বল—?"

"তারপর?"

"কারণ প্লেনটা নিশ্চয়ই হাওয়া হয়ে যায়নি। এয়ার ক্র্যাশে যারা গেলে তার চিহ্ন থাকবে না কোথাও? তা কি সম্ভব?"

"সমুদ্রে পড়লে চিহ্ন তো না-ও থাকতে পারে।"

"সে কথাও ভেবেছি আমি। প্লেনটাতে নিশ্চয়ই

আগুন ধরে গিয়েছিল। একজন মানুষের চোখেও পড়ল না তা? কত লাম্পান, নৌকো, লঞ্চ, ষ্টীমার তো হরদম যাচ্ছে আসছে—ঠিক এই সময়ে কেউ কি কাছে ছিল না?—বিশ্বাস করতে বল, করবো, কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। আর ওর শব্দ? শব্দটা গেল কোথায়? তাও বেমালুম হজম হয়ে গেল? প্রচণ্ড শব্দ হবে—burst করলে প্রচণ্ড শব্দ হয়।"

"জানি না। সে অভিজ্ঞতা নেই।"

"মরে গেছে কি না? ঈশ্বর জানেন। বেঁচে কি কেউ আছে?—কারো বলা সম্ভব নয়—আমার তো নয়ই।"

"হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার চেয়েও মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ঢের বেশী কাম্য—অন্তত আমার কাছে। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি সুমিত্রার যেন মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে।"

"তুমি যে এ-কথা বলবে তা আমি জানতাম—।"

অমরেশ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, চেয়ারটা কর্কশ শব্দ করে দূরে সরে গেল, অমরেশের হাতের আধ-পোড়া সিগারেটটা ছিটকিয়ে পড়ে গেল বহুদূরে; ও চলে গিয়েছে কিন্তু ওর কথার প্রতিধ্বনি ফিরে এল।

"একটু সময় দাও, একটু সময় দিও। যদি এখন—এই মুহূর্তেই এসে দাঁড়ায়, প্রেতাত্মা মনে করে আঁতকে উঠো না!"

সুরজিৎ অনেক রাতে ফিরে এলেন, আর ভোরের ট্রেনে দিল্লী চলে গেলেন। তিনিও এই দুর্ঘটনাকে সন্দেহের চোখেই দেখেছেন, কিন্তু নিজের কোন মন্তব্যের ওপর জোর দেননি এ-বিষয়ে। একটা কাহিনীর প্রচ্ছন্ন সূত্রকে বরাবর রহস্যময় করে তুলেছেন কিন্তু বিজ্ঞান সম্মতভাবে তা স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তাদের সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাবার জন্যেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, একটি রহস্যময় উত্তরেশের লোক রহস্যময় জগত থেকে হঠাৎ যেন দুইলোকের মত জেগে উঠল। নিজের পরিচয় গোপন করা সত্ত্বেও সুরজিতের ধারণা লোকটি যথেষ্ট পরিমাণে নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারেনি। তার বিশ্লেষণ শক্তির কৌশল ও ধারের চমক দেখে নিঃসন্দেহে চমৎকৃত হতে হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষমানুষের জীবিকা কি, তা আন্দাজ করতে খুব বেশী সময় লাগে না। তার কর্মজীবনের অভ্যাস নিজের আলোচনার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে থাকে। গুপ্ত তথ্য-সন্ধান করাই যাদের জীবিকা, তাদের কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গীর মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা পাওয়া যায় এই ভদ্রলোকটির তা ছিল বলে মনে হয়েছিল তার।

একটি লোকের খোঁজে তাকে সমুদ্রের ধারে আসতে হয়েছিল। সিঙ্গাপুরের হারবার ছাড়িয়ে নির্জন একটি তটভূমি। প্রবল রক্তে সূর্যাস্তের সোনার রং ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে। তিন মাইল দূরে শহর থেকে সে যখন সাইকেল চড়ে রওনা হয়েছিল তখনও রক্তের বেগ এত প্রবল ছিল না। এখন হাতে-ধরা সাইকেলটা যেন হাল্কা পোলার মত মাটি ছাড়িয়ে বাতাসের টানে আকাশের দিকে একটু একটু নড়ে উঠছে। আজয় সে এই সমুদ্রের ধারেই বাস করে এসেছে কিন্তু সমুদ্রের এই ভীষণ আকৃতি তার চোখে কখন পড়েনি। কে যেন সমুদ্রের বিশাল জলাধারকে তটভূমির দিকে কাৎ করে ধরে রেখেছে এবং সেইজন্যে মনে হচ্ছিল যেন কূলহীন বিস্তীর্ণ সমুদ্রের জল ফুলে-ফেঁপে তীরের দিকে ছুটে আসছে। সেকেলে-ধাঁচা মেঘের সারি ক্রীতদাসের মত হামাগুড়ি দিয়ে যেন আকাশের অন্ধকার গুহার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শ্রান্ত ও ক্লান্ত, গভীর ও গম্ভীরভাবে তাদের গোঙরানোর শব্দ উঠছে এক-একবার। এমন দুর্যোগের দিনে সমুদ্র-তীর ছেড়ে কোন নৌকো, লঞ্চ বা ষ্টীমার সমুদ্র পাড়ি দেয় না। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সে দেখল একটা সাদা রংয়ের মটোর-বোট সেখানকার একটা খাড়ির কতকটা নিরাপদ স্থানে এসে ঢুকল। সাইকেলটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সেখানিকটা এগিয়ে গেল। স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। কি যে সে পাঁজাকোলা করে খাড়ির ওধারে নিয়ে গেল, তা সে বলতে পারে না!

সে বলতে পারে না বোট-চালকটি বৃদ্ধ না যুবক, সাহেব না সিঙ্গাপুরের লোক। একটু দূরে নির্জন একটা ডাক-বাংলোর পাশে একটি মোটর-ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে সে তার জিনিসটা রাখল। ওপারে যেতে তার অনেকক্ষণ লেগেছিল। একটা সাঁকো পার হয়ে ডাকবাংলোর কাছে যাওয়ার আগেই গাড়ী স্টার্ট নিয়ে পূর্ব-উত্তর কোণের রাস্তা ধরে ছুটে চলে গেল। সবই যেন গোপনীয় একটি সাজানো ব্যাপার বলে মনে হল তার কাছে। সে আর সেদিন বাড়ী ফিরে যেতে পারেনি অথবা যায়নি। সেই ডাকবাংলোতেই সে সেদিনের দুর্যোগের রাত কাটিয়েছিল। গরম গরম ভাত আর মুরগীর ঝোল খেতে খেতে সে বাবুর্চির কাছ থেকে কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করেছিল। মোটর-চালক ভদ্রলোকটি সাহেবও হতে পারে কারণ তার গায়ের চামড়া সাহেবের মত কর্সা কিন্তু সে বরাবর বাবুর্চিটির সঙ্গে দরিয়ার হিন্দিতেই কথা বলে এসেছে; তাছাড়া সে বাংলা-ভাষাও জানে। বিশেষ একটি ভাষার ওপর লক্ষ্য রেখে তার মনে হয়েছে ভদ্রলোকটি হয়ত ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। এখানে ভদ্রলোকটি প্রায়ই আসত,—হয় ভ্যানে, নয় জীপ গাড়িতে। এই ভ্যান অথবা জীপ্-গাড়ি তারই জিম্মাতে রেখে সে মোটরবোটে করে কোম্পানীর কাজে দুই একদিনের জন্যে মফঃস্বলে চলে যেত। মফঃস্বল থেকে ফিরে এসে সাহেব তার মোটর-বোট তারই হেফাজতে রাখত। এ-সব দেখাশোনার জন্যে মোটা মাসকাবারি একটা বন্দোবস্তও ছিল তার সঙ্গে। সাহেবটির বয়েস বড় জোর চল্লিশ বছর। তার কাজ কি, তা সে জানে না, কেন যায় আসে, তা-ও সে বলতে পারে না, তবে তার সঙ্গে বড় বড় কয়েকটা প্যাকিং বাক্স থাকত।

সে রাত্রের ঘটনাটা একটু অন্যরকম। মফঃস্বল থেকে ফিরে আসবার সময় সাহেব কোন মাল নিয়ে আসে না। সেদিন কি একটা মাল সে নিজে ঘরে নিয়ে এসেছিল। কি জিনিস সে নিয়ে এসেছিল তা বাবুর্চিটি ভাল করে দেখতে পায়নি। সে বেশ খানিকটা দূরে ডাকবাংলোতে ছিল তখন। ভ্যানের কাছে এসে দেখল সাহেব মোটর বোট থেকে কি একটা জিনিস সন্তর্পণে আনতে গেছে। ভ্যানের দরজা বন্ধ করে গেছে সাহেব। গাড়ীর ভেতরে কি এনে রেখেছে তা দেখবার জন্যে তার প্রবল কৌতূহল হল। একমুহূর্তও দেরী না করে সে হাতল ঘুরিয়ে গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলল।

টর্চের আলো ফেলল অন্ধকারে।

এক মুহূর্তের মধ্যে যতখানি দেখা সম্ভব। মনে হল একটি জীর্ণ বয়স্ক স্ত্রীলোকের দেহ—অসাড় ও নিস্পন্দ। একটি বীভৎস মুখ দাঁতে দাঁত চেপে আছে। মাথার চুলও এলোমেলো এবং কোথাও কোথাও আশ্চর্যভাবে অস্বাভাবিক রূপ। টর্চের তীব্র আলোতে ওর মুখের কালো রং তেলে-চোবানো চামড়ার মত চক চক করে উঠল। আর একটা আশ্চর্যের কথা,—স্ত্রীলোকটির শাড়ীটি জলে ভিজে গিয়ে সপ্ সপ্ করছে। জিব বার করতে দেখে ও ভয়ানক চমকে গেল,—ওর মনে হল স্ত্রীলোকটি 'জল, জল' করে যেন খুব অস্পষ্টভাবে জল চাইছে।

পরীক্ষিৎ বলল, "আপনার ভাবনার সঙ্গে আমি মাথা ঠিক রেখে ভাবতে পারছি না দাদা!—আপনি কি বলতে চান পুড়ে গিয়ে সুমিত্রা কালো হয়ে গেছে?—বীভৎস সেইজন্যে? এরোপ্লেন থেকে ও সমুদ্রের জলে পড়ে গেছে? —এখনো বেঁচে আছে? এখনও মরে যায়নি? কি জন্যে মরে যায় নি? কেন বেঁচে আছে?"

"একটা ঘটনা মাত্র। একে এত বড় করে দেখো না—সুমিত্রার কথা ভেবে অস্থির হওয়ার কারণ নেই এতে—সে না-ও হতে পারে।"

"এ-সম্বন্ধে লোকটা কি আর কিছু বলেছে?"

"Not very convincing—at least আমার কাছে। লোকটা জুটে পড়েছিল। অনেক টাকা আদায় করল আমার কাছ থেকে। অনেক নতুন নতুন গল্প ফেঁদে বসত—আর এই গল্পের জন্যে প্রত্যেকবারই আমাকে বেশ মোটা দাম দিতে হত। শেষকালে—যেদিন আসল খবরটি আনার কথা সেদিন থেকে আর তাকে দেখা গেল না।"

"আর আপনি—আপনার মত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ও কথাতে ভুলে গেলেন?"

"বিশ্বাস না করতে পার কিন্তু ভাবিয়ে তোলে বৈকি! বৈজ্ঞানিক মনও প্রকাণ্ড বড় রহস্যের কাছে বড় দুর্বল হয়ে পড়ে।"

"সাহেবটির নাম, ঠিকানা জানতে পেরেছেন?"

"No stone was left unturned. সেই ইনকয়রার বাবুটিকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কিন্তুই বলতে পারেনি সে। সাহেব কখনও ডাকবাংলোতে থাকেনি কাজেই ভিজিটার্স্ বুকেও তার নাম ছিল না। মোটর বোটের নম্বর পেলেও একটা খোঁজ-খবর করা যেত হয়তো কিন্তু সকালে সে বোটেরও সন্ধান পাওয়া গেল না। এবং খুব সম্ভবত—সম্ভবত বলছি কেন নিশ্চয়ই—ওটা বড়ে লঙ্গর ছিঁড়ে সমুদ্রে ডুবে গেছে।"

"সাহেবটাকে পাওয়া যাবে না—তা বোঝা যায়।"

"কি করে—?"

"মিথ্যে গল্পের মিথ্যে মানুষটিকে পাওয়া কঠিন! ওর জারিজুরি ভেঙে যাবে তা হলে।"

"এ কিন্তু চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে।"

"কি ব্যাখ্যা?"

"সাহেবটি dare devil smuggler. কাজেই ঠিক দিনে ঠিক সময়ে তাকে যেতে হত—ঝড়, জল, দুর্যোগকে কেয়ার করলে তার চলে না। সেই জন্যেই গিয়েছিল সে,—ঝড়ের আগেই হয়তো গিয়েছিল,—ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কোথাও সে পরিচয় রেখে যেতে চায়নি—অসুবিধা আছে, ধরা পড়বার ভয়। নিজের জীবন অগ্রাহ্য করে যে ঝড়ের মুখে সমুদ্র পাড়ি দেয় পুলিশ তাকে সন্দেহ করবে। কাজেই অপ্রকাশিত থাকা তার পক্ষে নিরাপদ।"

"আর কি বলে—?"

"সে বলে প্লেনটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল। এবং সমুদ্রের ওপরেই আগুন ধরে গিয়েছিল বলেই ওর আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।"

"সে আগুন কেউ দেখতে পেল না? একটি প্রাণীও না?"

"এমন দুর্যোগে কেউ সমুদ্রে থাকে না,—কোন নৌকো ষ্টীমারও না!"

"দূর থেকে শব্দ শোনার কথা। কিন্তু কোন শব্দই কেউ শুনতে পায়নি না! আশ্চর্য!"

"ঝড়ের গর্জনের মধ্যে সে-শব্দ—তা যত ভীষণই হোক—শোনা সম্ভব নয়।"

"একমাত্র সুমিত্রা ছাড়া আর কোন চিহ্ন রইল না—? এক্সিডেন্টে সকলেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর ও-ই শুধু অক্ষত ভাবে বেঁচে গেল?—এ-সব কথা আমি ঠিক বুঝি না!"

এক্সিডেন্টে অক্ষতভাবে যারা বেঁচে যায় তারাও বলতে পারেনা কি করে এ-ব্যাপারটা ঘটল। এর মধ্যে একটা বিরাট রহস্য আছে—যে-রহস্য মানুষ কখন বুঝতে পারে না।"

"তা হলে আপনি বিশ্বাস করেই এসেছেন?"

"এখন তা বলতে পারব না—আরো পরে হয়ত বলতে পারব। তারও অনেক পরে বলতে পারব খোঁজা-খুঁজির ব্যাপারটা তোমার পক্ষে আরো intensify করা উচিত হবে কি না!"

সেইদিন থেকেই পরীক্ষিতের মন যেন দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। একটি আতঙ্কের ইঙ্গিত পেয়েছে সে। তার জগতের একটি শঙ্কিত জীবন তাকে সর্বদাই বড় কষ্ট দিচ্ছে। মধুর বলে মনে হয় তখনই, যখন জীবনের স্পন্দন স্তব্ধ জগতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এই বিবর্তিত মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে সে অস্থির হয়ে উঠল।

খুঁজতে বেরুল সে, কখন সম্ভবের কাছে, কখন অসম্ভবের কাছে। সুমিত্রার মৃত্যুও মিথ্যে হয়ে গেল না, বেঁচে থাকাও সত্যি হতে পারল না।

একটা নিখোঁজ এরোপ্লেনকে নিয়ে রাতারাতি যত গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল, পরীক্ষিৎ সব গল্পগুলোই শুনে এসেছিল সে-দেশ থেকে। এই মন-গড়া গল্পগুলোকে অনুসরণ করে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে সিঙ্গাপুর সহর এবং তার সহরতলীর সমস্ত জায়গা চষে ফেলেছে—সমুদ্র, বাড়ি, ডাকবাংলো, রবারের ক্ষেত, হাসপাতালগুলো, আর সব কয়টা নার্সিং হোম। ডাকবাংলোর বাবুটিকে নিয়ে সে রবার ও কফি প্ল্যানটেশনের যতগুলো ম্যানেজার ও বড় বড় অফিসার আছে সবগুলোকেই সে দেখিয়ে এনেছে। কিন্তু এই সাহেবকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এই হারানো সূত্রটি চমৎকার একটি সমস্যা রেখে কোন কিনারায় না পৌঁছে ডুবে অদৃশ্য হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের এই পথ

অনুশীলন সমিতির

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১২০২ সালে দোল পূর্ণিমার দিন, বাং ১০ই চৈত্র, ১৩০৮ সাল, সোমবার, ইং ২৪শে মার্চ ১৯০২ খৃঃ, কলিকাতায় প্রথম অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। হেদুয়ার নিকটবর্তী ২১ নং মদন মিত্র লেনে ইহার ব্যায়ামক্ষেত্র এবং তাহারই সন্নিকটে এক ছোট বাড়ীতে উহার কার্য্যালয় ছিল। পরে ১৯০৫ সালে অক্সিফ্ (Oxford Missionএর উত্তরে)—৪৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। সংকেতে সকলে উহাকে "Forty-nine" বলিত। কে জানে ইহাতে শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি নিয়তির কোনও ব্যঙ্গ কটাক্ষ ছিল কি না! কারণ পরে এই সমিতির "উনপঞ্চাশ বায়ুর" প্রকোপে তাঁহারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে অনুশীলন সমিতির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে—তাহাই হইল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের শেষ উপদেশ, "সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি ইহা বিস্মৃত হইও না", সমিতির মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিল। যতদূর জানা যায় নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৺নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই সঙ্ঘের নামকরণ করেন "ভারত অনুশীলন সমিতি।" পরে পি. মিত্র মহাশয় উহা সংক্ষেপে "অনুশীলন সমিতি" করেন।

অপর দিকে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার পি. মিত্র মহাশয়ও (প্রমথনাথ মিত্র) পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে বাঙ্গালীর শক্তিচর্চার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলেন। সরলা দেবী চৌধুরাণীও এই উদ্দেশ্যে বীরাষ্টমী ব্রত প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বীরাঙ্গনার বেশে ক্রীড়া দেখাইয়া দর্শকদিগকে মোহিত করিতেন। পি. মিত্র মহাশয় বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বজাতিকে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের সমকক্ষ করিতে চেষ্টিত হইলেন। সোদপুরের শশীদা (শশীভূষণ রায় চৌধুরী) মিত্তির সাহেবকে সমিতিতে আনেন। সেটা ১৯০২-৩ সালের ঘটনা। পি. মিত্র মহাশয় সতীশচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পান ও তাঁহার মানাঙ্কণ দণ্ডণে মুগ্ধ হইয়া অনুশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন ও পরে উহার ডিরেক্টর বা পরিচালক হন।

সমিতির পৃষ্ঠপোষক পি. মিত্র মহাশয়ই এই সময় আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন—পরলোকগত সুরেন হালদার, চিত্তরঞ্জন দাস, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, রজত রায়, এইচ. ডি. বসু প্রমুখ ব্যারিষ্টারগণ তাঁহার সহিত এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন। এমন কি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী রাসবিহারী ঘোষ ও বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

জন্মভূমির মুক্তিকল্পে শক্তিসাধনাই ছিল সে কালের যুগধর্ম। সেই কারণে ঠিক একই সময় বাংলার অন্যত্র এক মহাপুরুষ বাঙ্গালীজাতিকে বীর্যবান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। গৃহস্থ আশ্রমে তাঁহার নাম ছিল শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মস্থান চাঁয়া গ্রাম, থানা জংসন, জেলা বর্দ্ধমান। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি স্বয়ং নিজ নাম বিকৃত করিয়া যতীন উপাধ্যায় নামে বরোদা রাজ্যে সমর-কৌশল শিক্ষার জন্য সৈন্য

বিভাগে যোগদান করেন। সেইখানে তখন পূজ্যপাদ ঋষি অরবিন্দ রাজসরকারে শিক্ষাবিভাগে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সহিত বিপ্লববাদের মন্ত্রণা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন অনুমান ১৯০২ সালে এবং বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। উপযুক্ত কর্মীগঠনের উদ্দেশ্যে তাঁহারাও বাঙ্গালী যুবকদের ব্যায়ামশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। ইহাতে শরীরচর্চার আরও প্রচার হইল। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং সৈনিকবেশে অশ্বারোহণ করিয়া কলিকাতা সহরের রাজপথে যুবক-দিগকে সামরিক শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করিতেন এবং ক্ষাত্রশক্তি ভিন্ন স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নহে ইহা প্রচার করিতেন। এই যতীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন. সোহং স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন। তিনিই বাংলায় বিপ্লববাদের প্রবর্তক বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহাদের কার্য্যের সুবিধা ও সহযোগিতার জন্য ও কর্মী সংগ্রহের জন্য পি. মিত্র মহাশয় মারফৎ অনুশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। বাঙ্গালী যুবকদিগকে অশ্বারোহণ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১০৮ নং অপার সার্কুলার রোডে একটি Riding Club প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পরিচালনার ভার ছিল যতীন মিত্র ও দেবব্রত বসুর উপর। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা গুপ্ত সমিতির একটি ছদ্মবেশ Camouflage—ইহার অন্তরালে বিপ্লবাত্মক কার্য্যসিদ্ধি হইত।

তখনকার পটভূমিকায় দেখা যায় সমগ্র জাতি বৈদেশিক শাসনের নিষ্পেষণে মৃতপ্রায়, ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা বিনষ্টপ্রায়, জাতীয় সত্তা লুপ্তপ্রায়। এই বিকল্প পরিবেশের মধ্যে অনুশীলন সমিতি কংস কারাগারে দেবকীনন্দনের মত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রত্যেক সভ্যই সেই চিরন্তন ভগবদ্বাক্য স্মরণ করিত—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এবং সমিতির অধিবেশন সমূহে সমবেত ভাবে এই চণ্ডীমন্ত্র আবৃত্তি করা হইত—

"ইত্থং যদা যদা হি বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যারিসংক্ষয়ম্।"

ভারতীয় কৃষ্টির চরম সামাজিক আদর্শ এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ, অশোক, শিবাজী প্রভৃতি আমাদেরই পূর্বপুরুষদিগের প্রদর্শিত পথে বাঙ্গালী তাহার স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়াছিল।

অনুশীলন সমিতি সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইহার উচ্চ আদর্শ যুবক সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহারা দলে দলে সভ্য হইতে লাগিলেন। দেশের নেতৃবৃন্দও ইহার কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, নানা প্রকারে সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন এবং সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় সুললিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া সভ্যদিগকে উদ্দীপিত করিতেন সিষ্টার নিবেদিতা নিয়মিত হিতোপদেশ দিতেন।

পরবর্তী কালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও জাতীয় উত্থানে অনুশীলন সমিতির অবদান বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৯০৫ সালে তদানীন্তন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাঙালী জাতির অসাধারণ প্রতিভা ও অদ্ভুত সংগঠন শক্তি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার এক প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পাপে বর হইল। ইহাই জাতিকে সঞ্জীবনী সুধা যোগাইল। বঙ্গভঙ্গ নিরোধ করিবার জন্য এক তুমুল আন্দোলন হইল। তাহার সহিত বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলন চলিতে লাগিল। জাতির এক নব জাগরণ হইল। দেশাত্মবোধের বীজবপন হইল। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অপরূপ ভাবের এক প্রবল বন্যা আসিল। ওজস্বিনী বাগ্মিতায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে মাতাইয়া তুলিলেন। কণ্ঠে কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। সমগ্র জাতি 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। সমিতির বিহিরপুর শাখার প্রধান শিক্ষাব্রতী আশুতোষ ঘোষ ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি প্রতাপাদিত্য উৎসব উপলক্ষে সর্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি প্রচার করেন। তাহাই পরে প্রত্যেক সভায় প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা আনয়ন করিল। জাতীয় একতা বৃদ্ধির জন্য ৩০শে আশ্বিন রাখীবন্ধন অনুষ্ঠিত হইল। বাঙালী অনুভব করিল "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। ক্রমক্রমে বাংলার উন্মাদনা ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল এবং স্বাধীনতার পথ সুগম করিল। বাংলার সেই অভিনব যুগের তুলনা নাই, বাংলার যুবক সম্প্রদায় তাহাতে আত্মবলিরূপে সাড়া দিয়া উঠিল।

বাংলার স্বদেশী যুগে প্রচলিত কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতের নমুনা দেওয়া গেল :—

বন্দেমাতরম্

সুজলাং সুফলাং　　মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্
বহুবলধারিণীং　　নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং মাতরম্।

প্রায় শতাব্দী পূর্বে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরাধীনতা কত ঘৃণ্য তাহার চেতনা জাগাইয়াছিলেন—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়?"

তারপর কবি হেমচন্দ্র তূর্য্য নিনাদ করিলেন—

"বাজ রে শিঙা বাজ এই রবে—
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

[ক্রমশঃ

শ্রীজীবনতারা হালদার এম. এস্-সি লিখিত 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত।

বিজ্ঞপ্তি

১।	প্রকাশকের নাম—	ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬
২।	প্রকাশের সময়—	মাসিক
৩।	মুদ্রাকরের নাম	শ্রীদোলবিহারী দত্ত
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৮-সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৪।	প্রকাশকের নাম—	শ্রীদোলবিহারী দত্ত
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৮-সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৫।	সম্পাদকের নাম—	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	১৩৭/১, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

৬। যে সকল অংশীদার মোট মূলধনের এক-শতাংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—

শ্রীনীলিমা রাণী রায় ৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রী ডি. দেবী—৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

শ্রী এস. এল. রায়—৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আমি শ্রীদোলবিহারী দত্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১।৩।৭০

স্বাক্ষর—শ্রীদোলবিহারী দত্ত
প্রকাশক

গল্পভারতী

চৈত্র—১৩৭৬

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
চৈত্র ১৩৭৬, APRIL, 1970
রজত-জয়ন্তী বর্ষ

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীগোপাল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকলে কারণের উপযোগী।

প্রীষ্ম • জাঙ্গিয়া • লেগী • লাইটি • পাইওনীয়ার বুশ • গোঞ্জী জাঙ্গী • বিস্তোর জাঙ্গী • 'গাইটেক্স' • ডিম্বক • প্লাস মাফিটেক্স • ইকনমিক • ইকনমিক্স • 'পাইওটেক্স' ও অন্যান্য সকল প্রকার বিভিন্ন গেঞ্জী-এর প্রস্তুতকারক।

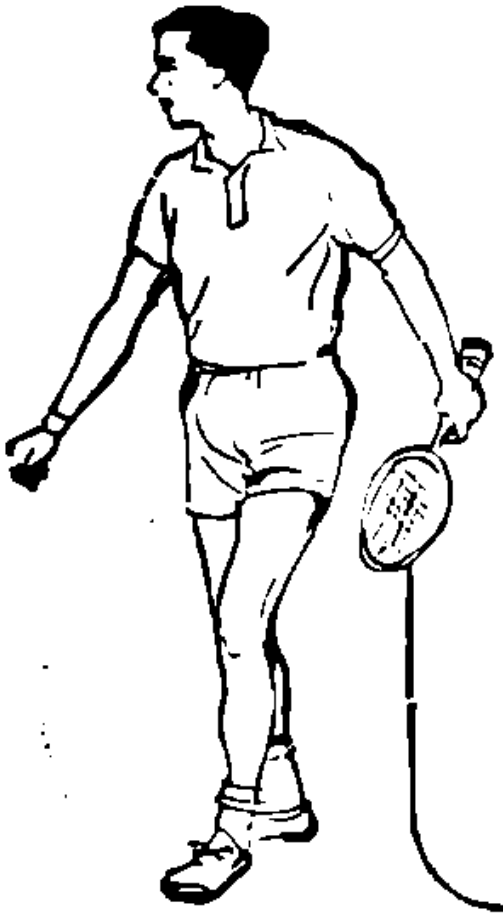

* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেনিস সার্ট • চেন সার্ট • ড্রয়ার ও স্ট্রীক প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধৌত ও প্রস্তুত।

ফোন: ৫৬-২১৮৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

রজত জয়ন্তী বর্ষ

পঞ্চবিংশতি বর্ষ, দশম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

চৈত্রমাস—বৎসরের শেষ মাস। বৈশাখে যে নববর্ষ সুরু হয়েছিল, এই মাসে তার পরিক্রমা শেষ।

চৈত্রে সব চেয়ে বড় উৎসব শিবের গাজন। চড়কপার্বণ।

গাজনের কথা পরে বলছি। কিন্তু শ্মশানচারী কপালমালী দিগম্বর দেবতাটি যখন দেবাদিদেব মহাদেব হয়ে বাংলাদেশের ঘরে-ঘরে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তখন দেখেছিলাম বাঙ্গালীর সংসারে মাসী-পিসি ঠান্‌দিদিরা তাঁদের কুমারী কন্যাদের উপদেশ দিতেন—'শিবের মতন বর যদি চাস্ তো গঙ্গামাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করে পুজো কর!'

চৈত্রের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রচলিত এই প্রথাটি ব্রতের মত পালন করতো অবিবাহিতা কুমারী মেয়েরা। তারপর মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে হাতে-গড়া সেই শিবলিঙ্গ মূর্তিটি নদী কিংবা পুকুরের জলে মেয়েরা দল বেঁধে গিয়ে বিসর্জন দিয়ে আসতো।

তারপর আসে নীলের উপবাস। সন্তানবতী জননীরা এখনও সেই নীলের ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন।—সন্তানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায় জননীর এই নিরম্বু উপবাসের কৃচ্ছ্রসাধন অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য হয়ে আছে মায়েদের কাছে এবং চিরকালই থাকবে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন হয় শিবের গাজনের উৎসব। আগেকার দিনে আমাদের বাল্যকালে দেখেছি প্রায় প্রতিটি গ্রামে এই উৎসব পালন করা হতো। এখন ধীরে-ধীরে এর সে জৌলুস কমে আসছে।

কলকাতা শহরের নিকটবর্তী তারকেশ্বরের মহাদেব নাকি জাগ্রত দেবতা। এখনও দেখি কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার জন্য, কিংবা কারও কোনও কল্যাণ কামনায় লোকজন এই মহাদেবের কাছে মানৎ করে। চৈত্রের প্রথম দিন থেকে সেজন্য বস্ত্র পরে সারাদিন উপবাসের পর আহার করে রাত্রে। তারপর সংক্রান্তির দিন গঙ্গা থেকে মাটির কলসিতে জল নিয়ে কাঁকে করে সেই জল নিয়ে যায় তারকেশ্বরের মন্দিরে। মন্দিরে শিবের মাথায় সেই জল ঢালা হয়।

পুরনোদিনের কথা জানতে হলে—'হুতোম্ প্যাঁচার নক্‌শা' বইখানি দেখতে হয়।

"কোম্পানীর বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দেওয়ান ছিলেন। সেকালে এই নিমকের দেওয়ানীতে বিলক্ষণ পয়সা ছিল। বাবুরা পয়সা করেছিলেন।

এদিকে তুলে বেয়ারা হাড়ি ও কাওরারা তুলসীর পরে উত্তরী সুতো গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্বের গুরু স্বরূপ বাণ ও দশমকি হাতে করে প্রত্যেক ঘরের দোকানে আর লোকের উঠোনে চাকের সঙ্গতে নেচে বেড়াচ্ছে। ঢাকীরা ঢাকের টোপেতে চামর, পাখীর পালক ঘণ্টা ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ করছে। "ওঙ্কেশ্বরে শিবো মহাদেব।" চীৎকারে কান পাতা দায়!

ওদিকে আমাদের বাবুদের নাজনতলা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। ঢাক বাজতে লাগল। শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো। সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্ছে। শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা মাথা চালা হলো তবু শিবের মাথা থেকে ফুল আর পড়ে না!

কি হবে?

সবাই চিন্তান্বিত হয়ে পড়লো।

চার পাঁচজন সন্ন্যাসী বাবুর কাছে গেল।—'বাবু, আপনাকে যেতে হবে।'

বাবু তখন রুমালে বোকে মেখে কিটন্ গাড়ীতে বেরুচ্ছিলেন। কিন্তু কি করবেন, সাত পুরুষের ক্রিয়া কাণ্ড—বন্ধ করা যায় না। অগত্যা যেতে হলো।

ডেউড়ির দারোয়ানরা আগে আগে চললো, মোসাহেবেরা চললো বাবুর পিছু পিছু।

নাজনতলায় সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠলো। সকলে সমস্বরে চীৎকার করতে লাগলো "ওঙ্কেশ্বরে শিবো মহাদেব।"

বাবু শিবের সুমুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

বড় বড় হাত পাখা দুপাশে চলতে লাগলো।

মনে হলো যেন ঝড় বইছে।

পুরোহিত বলতে লাগলো—'বাবা, ফুল দাও!' 'বাবা ফুল দাও!'

গঙ্গাজল ঢালা হলো শিবের মাথায়!

বাবুর হাতে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো।

'বাবা ওঙ্কেশ্বরে শিবো মহাদেব'—সবাই মিলে বলতে লাগলো চীৎকার করে করে।

সমানে মাথা চালা চলতে লাগলো।

এইবার এক বোঝা ফুল আর বিল্বপত্র গড়িয়ে পড়লো শিবের মাথা থেকে বাবুর হাতের ওপর।

সবাই আনন্দ করতে লাগলো। বলতে লাগলো, হবে না কেন? কেমন বংশ!

তারপর বইচি কাঁটার ওপর কাঁপ খাওয়া!

দশবিশ আঁটি ছিঁড়ে বিচালির ওপর ছিঁড়ে বৈঁচির ডালগুলো রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙানো হতে লাগলো। ক্রমে সব কাঁটাগুলি মুখে মুখে বসে যাবার পর পুরুত তার ওপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন।

সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার ওপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো।

'উঃ শিবের কি মাহাত্ম্য!" কাঁটা ফুটলে বলবার জো নেই।

সকলের ঝাঁপ খাওয়া শেষ হলো।

দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো।—গিন্নিরা বলে দিয়েছে—ঝাঁপের কাঁটা একগাছি আনতেই হবে। ওর এমনি গুণ—ঘরে রাখলে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।"

এমনি সব সংস্কার আর কুসংস্কারে জড়িয়ে ছিল আমাদের চৈত্রমাস।

ধীরে ধীরে দেশে যখন শিক্ষার বিস্তার চলতে থাকবে, যেমন করে রুচির মার খেয়ে কুমারী কন্যাদের শিবলিঙ্গ পূজা বন্ধ হয়ে গেছে তেমনি করে আমাদের বৎসরান্তের চৈত্রমাসগুলি বসন্তোৎসবের সুরে সঙ্গীতে ও নৃত্যনাট্যে মনমাতানো এক বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করে তার প্রাচীন স্থূলতা অবলুপ্ত করে দেবে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পরিবার পরিকল্পনা !

এতে যারা সুবিধা পেল।

ধারার মেলা শুশুনিয়া

রামপ্রসাদ সরকার

মেলা প্রধান বাংলা দেশ। উপলক্ষ্য যাইহোক না কেন প্রায় সব ঋতুতে গ্রাম-বাংলার দিকে দিকে মেলার আসর বসতে দেখা যায়। পৌষলি বাতাসে মেলার যে সুর বেজে ওঠে চৈত্রের পাতা ঝরার দিনেও সে-সুর শুনতে পাওয়া যায়। আবার মেঘমেদুর বর্ষার অবিরাম বৃষ্টিধারার মাঝেও রথের মেলার ডাকে সাড়া দিতে কার না মন চায়।

গ্রাম-বাংলার স্থানে স্থানে ছড়িয়ে আছে হাজার লোকগাথা। শহর সভ্যতার চাপে পড়ে যদিও আজ আমাদের অনেক পালা-পার্বণ, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান অবলুপ্ত হতে চলেছে, তবু শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আজও মেলার মহড়ার সুরু হয়। সব মেলার মাঝেই ক্ষয়িষ্ণু বাঙালীর জীবন চেতনাকে আবিষ্কার করা যায়। হাজার অনটনের মাঝে আজও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মেলার আনন্দে মন ভরে নিতে পারে। মেলায় আসা আবাল-বৃদ্ধ বনিতার হাসিখুশী মুখ দেখে তাই পুলকিত হতে হয়।

বাংলার নিজস্ব কৃষ্টি, নিজস্ব ভাবধারার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এমনি একটি মেলা—শুশুনিয়ার 'ধারার মেলা'।

প্রতি বছর চৈত্র মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে বারুণীর স্নানযোগ উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া মেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝরণার ধারায় পুণ্য স্নানের জন্যে পুণ্যার্থী সমাগম হয়। শুশুনিয়া পাহাড়ের রুক্ষ কঠিন বুক চিরে এক ক্ষীণ জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই ধারায় স্নান করলে গঙ্গা স্নানের পুণ্য লাভ হয় বলে সকলের ধারণা। তাই শুশুনিয়ার পুণ্য ধারায় অবগাহন করতে দূরের মানুষ ছুটে আসে। বহু মানুষের ভীড়ে পাহাড়ের কোলে বিরাট মেলার আসর জমে ওঠে। তিনদিন ধরে চলে এই মেলা। আশেপাশের গ্রাম উজাড় করে ছুটে আসে গ্রামা মানুষের দল। বাঁকুড়া, ছাতনা, মেজিয়া, কেঞ্জেকুড়া, ভিদের ষড় ঘাট প্রভৃতি দূর দূর জায়গা থেকে মানুষ আসে পুণ্যস্নানে ও মেলা দেখতে। বাঁকুড়া জেলার মানুষের কাছে এই মেলা "ধারার মেলা" নামে সুপরিচিত।

শুশুনিয়ার গ্রাম-বাংলার মেলার চিরন্তন রূপই দেখতে পাওয়া যায়। পসারীদের পণ্যসম্ভারে পাহাড়ের কোল এক ভিন্নরূপ ধারণ করে। এখানে সেখানে গড়ে ওঠে বেচাকেনার আসর। মধু কুমোর, নিমাই কামার, যাদু মিস্ত্রী, জীবন ময়রা সকলেই আপন আপন পণ্যসম্ভার সাজিয়ে মেলায় বেসাতি করতে আসে। সার্কাস, যাত্রিক, মুৎশুর আসর, নাগরদোলা—তিনদিনের এই মেলাকে মুখর করে রাখে। সারা বছরের অবহেলিত শুশুনিয়া পাহাড় মাত্র এই তিনটি দিনের জন্য নোতুন সাজে সেজে ওঠে যেন।

শুশুনিয়া পাহাড়ে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। সেই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে পুষ্করণ রাজ্যের অধিপতি সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এই 'পুষ্করণ' এবং বাঁকুড়া জেলার দামোদর তীরবর্তী গ্রাম 'পোখর্না' অভিন্ন। পোখর্নাই ছিল চন্দ্রবর্মার রাজধানী। চন্দ্রবর্মা

'কল্লোল-কালি কলম'

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এক হাতে স্যুটকেস্ আর বগলে বিছানার চাদর জড়ানো ছোট্ট একটি বালিশ···

ট্রেন থেকে নামলাম এসে হাওড়ার ষ্টেশনে।

এখন যাই কোথায় ?

কলকাতায় আমার থাকবার খাবার জায়গার অভাব নেই। কিন্তু মন যেখানে যেতে চায় না সেখানে যাব না।

কুমারীপুরের গাঁকারি পাড়ায় তাঁরা পুরণো একটা নক্সরঙে দোতলা বাড়ীতে (যেখানে বসে আমি 'রক্ত পথের যাত্রী এরা' ইত্যাদি অনেকগুলি গল্প লিখেছি) সেইখানে আমার একটা পাকাপাকি আস্তানা আছে। আমার জ্যেঠতুতো ভাই ন্যাংটাদা থাকে সেখানে। পরবর্তী কালে যে ন্যাংটাদা (ন্যাংটেশ্বর মুখোপাধ্যায়) তার নাম যাহাদের সকলের পরিচিত এবং প্রিয়পাত্র হয়েছিল।

সেইখানে গিয়েই উঠলাম।

ন্যাংটাদা এটর্নী আপিসের কেরাণী। স্নান করে খেয়েদেয়ে তাকে আপিসে যেতে হবে। একজোড়া জুতোর গায়ে তার ছোট্ট আর্শীখানি বসিয়ে রেখে বসে বসে সে তখন দাড়ি কামাচ্ছিল। আমাকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে শ্রীধরক। ওরে মা ভবতারিণী ! —যাঃ, কেটে গেল।

চেঁচাতে গিয়ে রেজর্ কুরটা বসে গেল ঠোঁটের কাছে। রক্ত পড়তে লাগলো।

রক্তটা হাত দিয়ে মুছে নিয়ে বললে, মা-কালী রক্ত খুব ভালবাসে তো ! তাই একটুখানি রক্ত দেখে নিলে। তা বেশ্। ঠাকুর ! ঠাকুর !

বললাম, আবার ঠাকুরকে ডাকছিস কি জন্যে ? ঠাকুর আমাকে দেখেছে।

—তাখ্ না কি জন্যে ডাকছি। দু'আনা পয়সা বের কর্।

—আসবামাত্র পয়সা !

ন্যাংটাদা বললে, নিশ্চয় ! মাসের শেষ। হাতে একটি পয়সা নেই। এক্ষুণি ভাবছিলাম কি খেয়ে আপিস যাব। আমার ওপর মায়ের কিরকম কৃপা তাখ্। ভাবতে না ভাবতেই ব্যবস্থা করে দিলে।

বৃন্দাবন ঠাকুর এসে দাঁড়ালো—কি বলছেন ?

দু'আনা পয়সা তার হাতে দিয়ে ন্যাংটাদা বললে, দুজনের জন্যে দুটো ডিমের ঘাম্লেট।

বৃন্দাবন-ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে, 'উনিও কি আপনার সঙ্গেই খেতে বসবেন ?

—ইয়েস্ স্যার। রাত্রি জেগে ট্রেনে এসেছে বুঝতে পারছো না ? এক্ষুণি চানটান করে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোবে।

বলেই সে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, আরও আট আনা পয়সা দিয়ে তাখ্ বিন্দাবনকে। রাত্তিরে আজ লুচি আর আলুর দম খাব। অনেকদিন খাইনি।

দাড়ি কামানো শেষ হয়েছিল। আসবাবপত্র গুটিয়ে নিয়ে ন্যাংটাদা বললে, নে, চান করে একসঙ্গে

খেয়ে নিই আমরা। জয় মা ভবতারিণী! আজ যাবি নাকি দক্ষিণেশ্বরে? যাস্ তো বল আমি সকাল-সকাল আপিস থেকে চলে আসবো।

বললাম, না। আমার অনেক কাজ।

ন্যাংটাদা খুশী হলো না।—কাজ না ছাই! কাগজের আপিসে আজ্ঞা মারবি—দক্ষিণেশ্বরে যাবি কেন? লেখকগুলো সব নাস্তিক আমি জানি। এই যে মা আমার এত উপকার করলেন যাকে তার জন্যে একটা প্রণাম করে আসতে হবে তো! আমি একাই যাব।

বিকেলে গিয়ে মুরলীদার সঙ্গে দেখা করলাম।

—আমার চিঠি পেয়েছো?

মুরলীদা বললে, চিঠি পেয়েছি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঠিকানা পর্য্যন্ত জোগাড় করে রেখেছি।

'অযু কেরানী'র লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র থাকে হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটে। হরিশ মুখার্জি রোড ধরে সেইদিকেই যাচ্ছিলাম।

হরিশ চ্যাটার্জি আর হরিশ মুখার্জিতে আমরা গোলমাল করে ফেলেছিলাম।

হরিশ মুখার্জি রোডের ওই রকম একটা বাড়ীর নম্বর দেখে বাইরের দরজার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন অস্থিচর্ম্মসার এক বৃদ্ধ, গলায় ঠিক মালার মত পৈতে, আর সেই পৈতের মাঝখানে সোনার একটি আংটি ঝুলছে।

বললাম, প্রেমেন্দ্রকে ডেকে দিন তো!

মুখ-চোখের সে এক বিশ্রী ভঙ্গী করে খিঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। কি বললে। প্রেম? কাজির ছোকরা! ইয়ার্কি হচ্ছে?

বললাম, আজ্ঞে না, প্রেম নয়, প্রেমেন্দ্র।

কিন্তু কে শুনবে সেকথা?

দরজাটা মুখের ওপরেই দিলেন বন্ধ করে।

মুরলীদা বললে, হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কিন্তু একটা আছে মনে হচ্ছে যেন গঙ্গার ধারে। আমরা ভুল করিনি তো! এটা হচ্ছে গিয়ে হরিশ মুখার্জি ষ্ট্রীট। চল একবার সেইখানে চেষ্টা করে দেখি।

সেইদিকেই যাচ্ছি, দেখলাম—বলরাম বোসের ঘাট রোড দিয়ে দুজন ছোকরা আসছে গল্প করতে করতে।

আমি হঠ্ করে বলে বসলাম, ওই প্রেমেন্দ্র মিত্র।

মুরলীদাকে বললাম, জিজ্ঞাসা করবো?

মুরলীদা এসব পছন্দ করে না। বললে, আবার খিঁচুনি খাবে।

আমার কিন্তু বেশ লাগে। বললাম, খাই তো খাবো।

বলেই এগিয়ে গেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কোন্‌দিকে বলতে পারেন?

দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—কত নম্বর খুঁজছেন?

বললাম, কিছু ভেবেছেন।

—আপনার নাম ?

বললাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

দুজনের ভেতর একজন বললে, কিছু আর ভেবে হবে না। আমারই বাড়ীতে যাচ্ছেন আপনি। আমার নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র।

মাংস-টাংস খাবার ভয়ে মুরলীদা তখন অনেকখানি দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

চেঁচিয়ে বললাম, ভয় নেই মুরলীদা, এসো। ইনিই প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রেমেন্দ্র তার পাশের জনকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, ইনি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

মুরলীদা হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো।

পরিচয় করে দিলাম।—ইনি মুরলীধর বসু। 'সংহতি' পত্রিকার সম্পাদক।

তখন কেই-বা চেনে 'সংহতি', কে-ই বা মুরলীধর বসু।

বুঝলাম—মুরলীদাকে চেনবার তেমন আগ্রহ নেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের। বললাম, ভাল করে পরিচয় হোক্, তখন বুঝতে পারবেন—এই কাঠখোট্টা মানুষটি আমাদের সাহিত্যের সংসারের কত বড় আপন জন। উনিই আপনার পরিচয় আমাকে দিয়েছেন। আমি ছিলাম বীরভূম জেলার একটা ছোট্ট গ্রামে। সেখানে চিঠি লিখে জানালেন—গত মাসের প্রবাসী পত্রিকায় 'শুধু কেরাণী' নামে একটি গল্প ছাপা হয়েছে। গল্পটি পড়ে দেখো। এ গল্প যিনি লিখতে পারেন ভবিষ্যতে তিনি যে একজন বড় লেখক হবেন সেকথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

চিঠির জবাবে আমি লিখে দিলাম—লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঠিকানাটা জোগাড় কর। আমি কলকাতায় যাচ্ছি।

কলকাতায় চলে এলাম। দেখলাম মুরলীদা আপনার ঠিকানা জোগাড় করেছেন। সেইখানেই যাচ্ছিলাম।

প্রেমেন্দ্র বললে, উঁহু, 'আপনি' নয়—'তুমি'।

বাস্, সঙ্গে সঙ্গে 'তুমি'। একদিনেই অন্তরঙ্গ।

সবাই মিলে বসলাম গিয়ে হরিণ পার্কের একটা গাছের তলায়।

আমাদের কথা যেন আর শেষ হতে চায় না!

সেখান থেকে উঠতে আমাদের রাত্রি হয়ে গেল। দেখলাম—সবাই আমরা ভবানীপুরের বাসিন্দা। সবাই কাছাকাছি থাকি।

এমনি করে প্রথম পরিচয় হলো প্রেমেন আর অচিন্ত্যর সঙ্গে।

তাদের নিয়ে গেলাম 'কল্লোল' আপিসে।

কল্লোলের দলে আর এক জোড়া লেখক বাড়লো।

কল্লোলে লেখকের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন হলো যে ২৭ নম্বর বাড়ীর বাইরের ঘরে আর ঠাঁই হলো না। পাশেই আর একখানা ঘর নেওয়া হলো। খোলার খাপ্‌রার ঘর। তাই তাই সই। আমাদের তখন ঘর হলেই হলো।

কতজন যে সেখানে আমরা জমায়েৎ হলাম তার সীমা সংখ্যা নেই। তাদের সকলের কথা আমি

বলবো না। বলা সম্ভবও নয়। অচিন্ত্যকুমার সে অভাব আমাদের পূরণ করে দিয়েছে। 'কল্লোল যুগ' বইখানি লিখে পুরনো দিনের সে ইতিহাস সে ধরে রেখেছে।

আমি লিখবো আমার কথা।

আমার সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে তাদের কথা।

এক এক সময় মনে হয়—জড়িয়ে নেই কে?

আধুনিক কালে যারা শীর্ষস্থানীয়, যারা আপনাদের প্রিয় লেখক—সবার সঙ্গেই তো আমার যোগাযোগ। সেদিক দিয়ে আমি সত্যিই ভাগ্যবান।

কী ভালবাসাই না তাদের আমি পেয়েছি।

সেইটুকুই আমার ইহজীবনের সম্বল।

তাদের সবার কথাই বলবো। বলবো তারাশঙ্করের কথা, বলবো প্রেমেনের কথা, বলবো—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের কথা, বলবো অচিন্ত্যকুমারের কথা, বলবো পবিত্র গাঙ্গুলীর কথা। কল্লোলের কর্ণধার দীনেশ গোকুলের কথা তো বলবোই।

যখন যার কথা মনে পড়বে তার কথা বলবো।

বলুন না এই অচিন্ত্যকুমারকে।

বই খাতা হাতে নিয়ে রোজ আসে কল্লোল-আপিসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারে। গল্প লেখে, কবিতা লেখে। তখন ভাবতাম বুঝি—ছোঁড়াটা কলেজ থেকে এমনি করে পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আড্ডা মারছে, লেখাপড়া বুঝি-বা গেল।

বলতাম, তুমি ভাঁহা ফেল্ করবে অচিন্ত্য, কেন মিছেমিছি কলেজের মাইনেটা দিচ্ছ, কলেজের খাতা থেকে নামটা কাটিয়ে এইখানে—আমাদের খাতায় নাম লেখাও।

এই নিয়ে কতদিন কত কথা বলেছি তাকে।

অচিন্ত্য জবাব দিত না, শুধু হাসতো।

তারপর একদিন দেখলাম সেই বয়ে-যাওয়া ছেলে অচিন্ত্যকুমার আমাদের সবাইকে অবাক করে দিলে। এম-এ আর ল, একসঙ্গে পাশ করে প্রথমে মুনসেফ্ হলো, তারপর জজ্—একেবারে সেসন্ জজ্।

এখন তার বয়স হয়েছে। সব কিছু গুটিয়ে-বাটিয়ে দিয়ে চুপ করে বসেছে। পুরনো দিনের কথা কিছু বললে হাসে আর বলে, সবই হয়েছে ঠাকুরের কৃপায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত অচিন্ত্যকুমার। আমাদের সাহিত্য-সাথী প্রিয়তম বন্ধু। এই আমাদের গর্ব।

কল্লোলের চলছে তখন তৃতীয় বর্ষ। গোকুলের (গোকুল নাগ) টি-বি হয়েছিল।

তখনকার দিনে টি-বি হওয়া মানে অবধারিত মৃত্যু। ষ্টেপ্টোমাইসিন্ তখন অজানা।

দার্জিলিং পাঠানো হলো গোকুলকে। কিন্তু এই ছোঁয়াচে রোগ টি-বি রুগীর সঙ্গে যাবে কে?

তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুদের ভদ্রতা ছিল বোধহয় একটু স্বতন্ত্র ধরণের। পবিত্র এগিয়ে এলো। বললে, আমি যাব!

সেই মৃত্যুপথযাত্রী গোকুলকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র গেল দার্জিলিং-এ।

গেল দু'জন। কিন্তু ফিরে এলো একা।

দার্জিলিং-এই মারা গেল গোকুল।

দীনেশরঞ্জনকে আমরা বলতাম ডি-আর। D. R. একা পড়ে গেল।

কল্লোল-আপিস কিন্তু তেমনি সরগরম। হিতৈষীর সংখ্যা অগণিত। লেখক বন্ধুর সংখ্যা কম নয়। তেমনি আড্ডা, তেমনি খাওয়া-দাওয়া, তেমনি হৈচৈ—সবই চলছে। অথচ এত বন্ধু পরিবৃত হয়েও হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম—দীনেশ তার প্রিয়তম বন্ধু গোকুলকে হারিয়ে কেমন যেন নিঃসঙ্গ—কেমন যেন একা হয়ে গেছে।

শিল্পী চিরকালই একা।

তার ওপর দীনেশ ছিল চিরকুমার। বিয়ে-থা করেনি। আগে ছবি আঁকতো আর আপন মনেই গান গাইতো। 'কল্লোল' বের করে মনের একটা আশ্রয় পেয়েছিল।

গোকুল চলে যেতেই সে আশ্রয়ের ওপর দীনেশের তেমন আস্থা রইলো না।

আজকাল তবু দেখছি লোকজন সাহিত্য-পত্রিকা পড়ছে। পাঠক সংখ্যা যেন বেড়েছে বলেই মনে হয়। আর তখনকার দিনে? একহাজার কপি যদি বিক্রি হতো পরম সৌভাগ্য।

তিন বছর কাগজ চালাবার পরেও দীনেশকে সেদিন বলতে শুনলাম—আর ভাল লাগছে না শৈলজা, ঘরে-বাইরে গালাগালি আর সইতে পারছি না।

চুপ করে শুনলাম।

শুনলাম – কল্লোল তখনও নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি।

শুধু আপিসের খরচ চালানো তো নয়, লেখকদের কিছু কিছু দিতে না পারলে দীনেশ যেন স্বস্তি পাচ্ছে না।

দীনেশ বললে, কল্লোলকে আঁকড়ে ধরে আছো তোমরা, তাই কল্লোল চলছে। কিন্তু কল্লোল তোমাদের কি দিলে? খেতে দিলে না, পরতে দিলে না, দিলে শুধু নিন্দা।

ভারতবর্ষে এবং প্রবাসীতে তখন আমার লেখা প্রায়ই ছাপা হচ্ছে। ওঁরা তখন টাকা দিচ্ছেন। তখনকার দিনের ভাল বলতে যা বুঝায় তাই। শরৎচন্দ্র একটি লেখার জন্যে পেতেন পঞ্চাশ টাকা। আর আমি পেতাম তিরিশ টাকা।

হরিদাসবাবু আমার লেখার একজন অনুরাগী পাঠক হয়ে গেছেন। সেইজন্যই মনে হয় বুঝি এই অনুগ্রহ।

দীনেশ একদিন ভারতবর্ষের একটি গল্প দেখিয়ে বললে, এ-গল্প কল্লোল কোনদিন পাবে না তোমার কাছ থেকে জানি। আর সেই জন্যই মনে হয় কল্লোল বন্ধ করে দিই।

বন্ধ করতে কিন্তু পারেনি। কল্লোল তেমনি মাসের পর মাস নিয়মিত বের হতে লাগলো। কল্লোলে লেখকদের আড্ডাও চলতে লাগলো সমানে।

ঘড়িতে চারটে বাজছে, আর বাড়ীর ভেতর থেকে বৌদির (দীনেশের) হাতে-গড়া রুটি আর তরকারির একটি করে ডিস আসছে প্রত্যেক আড্ডাধারী লেখকের হাতের কাছে। তারপর আসছে গরম চা।

আবার সেই জেল

—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

(তিন)

প্রবেশন অফিসারের চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে এসে নীচের তলার যে ঘরে অপেক্ষা করেছিলাম, এবার সে ঘর নয়। নীচের তলায়ই বটে, তবে অন্য ঘর। এ্যাওয়ার্সন হাউসে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিস। নানা রকম চাকরির জন্য লিখিত পরীক্ষা অথবা ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়। বিভিন্ন নাম্বার ঘরে প্রার্থীরা অপেক্ষা করে।

জেল-সুপারিন্টেনডেন্টের চাকরি প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানা একজন অফিস বেয়ারা দেখিয়ে দিল।

দেখা গেল, আমরা বারোজন। এগারজনের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। ওঁদের পোষাক অনেক সুন্দর। ঝকঝকে জুতো, ক্রিজওয়ালা প্যান্ট, বোতাম-খোলা কোট, আমেরিকান কলার টাই, টাইট-নট্ নেকটাই। কারুর বুক পকেট থেকে রুমালের কোণ উঁকি মারছে। মসৃণ করে কামানো গাল আর পালিশ-করা চুল। চমৎকার সেজে এসেছেন সবাই। টুপী? না, টুপী কেউ আনেননি! তখনও, এবং এখনও ওটা তেমন চালু হয়নি।

একজনকে ব্যতিক্রম দেখলাম। স্যাণ্ডেল, খদ্দরের ধুতি ও খদ্দরের খয়েরি রঙের পাঞ্জাবী। কাঁধের উপর চাদর। না, এঁর মাথায় খদ্দরের টুপী নেই। তবু যেন শুচিতার প্রতিচ্ছবি, সাধারণ পোষাকে অসাধারণ।

আর আমার? নিজের পানে আর দৃষ্টিপাতের সাহস পেলাম না। আজ বেশ সকাল করেই গার্ডেনরিচে যেতে হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের একটা এন্‌কোয়ারির রিপোর্ট আজই তাঁকে দিতে হবে। যে বস্তিতে ঢুকেছিলাম, সেখানে জল নিকাশের কোন ড্রেন নেই বলে সারা বছরই ময়লা জলের কাদা থাকে। জুতোর তার নিদর্শন রয়েছে। প্যাণ্টটাও বোধহয় দশ দিন আগে থেকে পরছি। হাওয়াই সার্টটি কতদিন যে ঘামে ভিজে আবার শুকিয়ে গেছে, তার ঠিক নেই। সুতরাং নিজের দিকে না তাকিয়েও মানস-চক্ষে আমার বিকৃত রূপ বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

বড় চাকরির জন্য বড় পোষাক পরে এসেছেন ওঁরা! আর আমি যেন এসেছি এক চরম

চুঁ মেরে যেতে। তবে হ্যাঁ, মনের কথাটা প্রায় তাই-ই বলা যেতে পারে। জানি, এ চাকরি আমার ভাগ্যে নেই। তবু এসেছি, শুধু পাগলা অজনের পাল্লায় পড়ে।

হঠাৎ একজন বলে উঠলেন, আরে, বিজেন বাবু না?

চমকে উঠলাম। খুব ভাল মনে করতে পারছি না। মুখখানা চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছি, কোথায়—

কি মশায়, চিনতে পারছেন না? ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করলেন, এ্যাম্বেচার ষ্টাফ-রিপোর্টার বিমল দাশগুপ্তকে মনে পড়ে?

ও—এবার মনে পড়েছে। জবাব দিলাম, প্রায় দশ বছর পর দেখা। তাই—

আর এই দশ বছরে বিমল দাশগুপ্তের শারীরিক পরিধি বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে, দাশগুপ্ত ছুড়ে দিলেন, সঙ্গে চেহারায় যৌলুসও। পাকা ঘরের তারতম্য অবশ্য কিছুই হয়নি।

প্রায় সবাই হেসে উঠলেন!

আবদুলের চাইতেও কালো বিমল দাশগুপ্ত। প্রায়ই দেখা যায় কালোদের লাবণ্য একটু বেশী। বিশ্বকর্মা বোধহয় একদিকের ত্রুটি আরেক দিকের প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেন। কিন্তু এঁর বেলায় ব্যতিক্রম। যেমন কালো, তেমনি লাবণ্যের লেশমাত্রহীন। ১৯৪৮ সালে 'দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকায় আমি যখন বার্তা সম্পাদক, তখন একদিন সরাসরি এই ভদ্রলোক এসে হাজির। অনুরোধ, তিনি ষ্টাফ রিপোর্টারের কাজ করবেন। জানিয়ে দিলাম, আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ষ্টাফ রিপোর্টার আছে। কোন চাকরি খালি নেই। তখনই ঐ কথাটা বলেছিলেন, এ্যাম্বেচার ষ্টাফ রিপোর্টার। অর্থাৎ রিপোর্ট সংগ্রহ করে সাধ্যমত সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে দেবেন, ছাপানো, না-ছাপানো আমাদের খুশী! পারিশ্রমিক চাইবেন।

মানে! সেদিন স্পষ্ট মন্তব্য করেছিলাম, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো?

আজ্ঞে না। তাও নয়, জবাব দিয়েছিলেন দাশগুপ্ত, ঘরের খেয়ে নয়, ঘরের না-খেয়ে ঘরে পর্যাপ্ত খাবার নেই, অথচ সখ আছে ষোল আনা।

এ-কথার পর আর আপত্তি করতে পারিনি। একখানা পরিচিত কার্ড দিয়েছিলাম বিমলবাবুকে আর নোট বুক। মনে আছে, একেবারে এ. বি. সি. থেকে সুরু করলেও অল্প দিনের মধ্যেই সাংবাদিকতার বর্ণমালা ছাড়িয়ে গিয়ে প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ করে অনেকগুলো ভাগই একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। শুধু কণ্ঠস্থ নয়, নিজের মৌলিকতারও পরিচয় রেখেছিলেন! এমনি সব খুঁটি নিউজ সংগ্রহ করে আনতেন আর এমনি সরস ভাষায় তা রচনা করে অফিসের সহকর্মী সমাবেশে পাঠ করতেন যে, প্রথমটা মনে হত, স্রেফ গাঁজা। কিন্তু না, বার কয়েক পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, শুনতে গাঁজা মনে হলেও আসলে আদু-খবরার চাটনি, স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়!

মাত্র বছরখানেক ছিলেন বিমল দাশগুপ্ত। কিন্তু প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত, ঐ আজ যা বললেন, এ্যাম্বেচার ষ্টাফ রিপোর্টার। ঘরের না-খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো!

কিন্তু বেশী দিন আর মোষ তাড়াতে হয়নি। আগে কার কাছে যেন শুনেছিলাম, আজ জানতে পারলাম যে, এম. এ. পাস করে বিলেত গিয়েছিলেন। সেখান থেকে সোস্যাল সায়েন্সে-এর ডাল ডিগ্রি আহরণ করে এনেছেন। আমেরিকাতেও চুঁ মেরে এসেছেন। ইয়োরোপও বাদ দেননি। অনেক দিন বিদেশে বাস করে এলে কি হবে, স্বরাজ অফিসের সেই জমজমাট রসালো গল্পের কথা ভুলতে পারেন নি।

সেখানে যেমন ছিলেন গল্পের রাজা এখানেও এই ওয়েটিং রুমের অপরিচিতদের মধ্যেই আমার মনে পুরোণো দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এমনি জমিয়ে ফেললেন যে, ঘরের গুমোট অস্বস্তিকর আবহাওয়াটা একটু পরই কর্পূরের মত উবে গেল। সবাই আপন আপন পরিচয় দিয়ে যেন বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লাম।

মনে মনে বেশ উপলব্ধি করতে লাগলাম যে, এ চাকরি কিছুতেই আমার বরাতে নেই। অন্য প্রার্থীদের শুধু পোষাকই যে আমার পোষাকের তুলনায় অনেক দামী ও পরিচ্ছন্ন, তাই নয়, ওঁদের প্রত্যেকে আমার চাইতে অনেক বিদ্বান। কেউ কেউ আবার বেশ বড় চাকুরেও বটেন। যে কোন কারণেই হোক, এঁরা ছেড়ে ফেলের সুপারিনটেনডেন্ট হতে চান। ভাবলাম, এখানে বসে সময় নষ্ট না করে এতক্ষণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রিপোর্টটা লিখে ফেললে কাজ হত।

বেলা এগারোটা বাজতেই একজন একজন করে ডাকা হতে লাগল। নীচের তলারই কোনোঘরে কমিশনের সদস্যরা বসেছেন। কিন্তু যিনিই যাচ্ছেন, তিনি আর এঘরে ফিরে আসছেন না। ব্যাপার কি? বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যাঁর ইন্টারভিউ হয়ে যাচ্ছে, তাঁকে ও দিকের দরজা দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওখান থেকে আর এঘরে ফিরে আসা চলবে না!

হাসি পেল। ইন্টারভিউয়ের সময়কার প্রশ্নগুলি যদি এখানে ফিরে এসে কেউ বলে দিয়ে যান, তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। কিন্তু ইন্টারভিউয়ের প্রশ্নগুলির কোন সিডিউল থাকে কি? না, যার যাকে যা খুশী জিজ্ঞেস করা হয়? আমার প্রবেশন অফিসারের চাকরির বেলায় ত তাই দেখেছিলাম।

যাকগে। যেখানকার যা রীতি।

হারাধনের দশটি ছেলের মত আমাদের বারোজন এক এক করে কমে যখন মাত্র তিনে এসে দাঁড়াল, তখন ডাক পড়ল আমার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। অবশিষ্ট দুজনকে সহাস্য নমস্কার জানালাম, তারপর বেয়ারার পেছনে বেরিয়ে এলাম।

কক্ষে প্রবেশ করে সবাইকে সস্মিতমুখে নমস্কার জানিয়ে আসন গ্রহণ করলাম।

একপাশে বসে আছেন ইনস্পেক্টার জেনারেল অব প্রিজন্‌স্ ডাঃ পি. কে. বিশ্বাস। বাঁ দিকে বসে আছেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অপরিচিত। তবে কালো নেকটাই, কালো কোট ও কালো রংয়ের পায়জামা দেখে বোঝা গেল ভদ্রলোক আইনজীবি। আর মুখোমুখি বসে আছেন কমিশনের চেয়ারম্যান। আমার দরখাস্তখানা দেখতে দেখতে হঠাৎ মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, শ্রীনগর থানার সেন্ট্রিকে লাথি মেরে পালিয়ে গিয়ে কোথায় যেন উঠেছিলেন আপনি?

চমকে উঠলাম। কিন্তু মুহূর্তমাত্র! তারপরই সংশোধন করে দিলাম, না, আমি পালাইনি, পালিয়েছিল সুবোধ চক্রবর্তী। পালিয়ে গিয়ে নৌকো করে নেমেছিল ঘোলঘর বাজারে।

ও ইয়েস, ইয়েস। বলে উঠলেন চেয়ারম্যান। তারপর ডাঃ বিশ্বাস ও সেই ভদ্রলোকের বিস্ময়-মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, O, let me introduce him. He is - was a jail bird so to say. He has written a very good book about his long detention life for political cause. The name of the book is 'তখন আমি জেলে'—

ও—তাহলে আপনিই সেই বিজেন মজোপাধ্যায়, কলরব করে উঠলেন সেই ভদ্রলোক, 'তখন আমি জেলে'-র লেখক? আরে মশাই, কি আর বলব। মাসিক বসুমতী একখানা একদিন কিনে

এনেছিলাম এ্যাসম্ব্যানেজ থেকে। ছেলেমেয়েরা আর তাদের মা আপনার ঐ লেখা পড়ে একেবারে পাগল। সেটা বোধহয় আপনার থার্ড কি ফোর্থ ইম্প্রুভমেন্ট। তারা চায় প্রথম থেকে। গেলাম সেই বইবাজার। ছই কেকের মত বসুমতী বিক্রী হয়ে যায়। আগের মাসের সংখ্যাই পাওয়া যায়। আমার কথা শুনে সম্পাদক মশাই অনেক চেষ্টা করে জোগাড় করে দিলেন।—মশাই, তারপর দিনই বসুমতীর গ্রাহক হলেন আমার স্ত্রী! কোনো মাসে একদিন দেরী হলেই কোন কর, চিঠি লেখ, অফিসে যাও, কেন কাল বসুমতী আসেনি—বাব্বা! মশাই, একখানা বই লিখেছেন বটে।

এটা ত কোন প্রশ্ন নয়, তাই চুপ করে রইলাম।

একটু পর আবার মুখ তুললেন চেয়ারম্যান, হুঁ, আচ্ছা মিঃ গাঙ্গুলী, আপনি ত অনেক দিন অনেক জেলে থেকেছেন। প্রিজনার হয়ে থাকলেও এ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি ভাবে চলে, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। সেন্ট্রাল জেলের ইন্ডাষ্ট্রিগুলোতে প্রায়ই লোকসান হয়ে থাকে। এর কারণ কি বলতে পারেন?

বলতে পারি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম। তারপর সবিনয়ে বললাম, আমাদের আই. জি. এখানে রয়েছেন, উনি যদি পারমিশন দেন, তাহলে বলবগুলো—

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বলুন আপনার বক্তব্য। ডাঃ বিশ্বাস বললেন।

—আই. জির অনুমোদন পেয়েই এবার নির্ভয়ে মুখ খুললাম, ইনডাষ্ট্রিতে যাদের নিয়োগ করা হয়, তাদের বাছাই করা থেকেই গলদ সুরু হয়। বাইরে যে ছিল চাষী, লাঙল চালাত, জেলে তাকে জুড়ে দেয়া হয় ছুতোর মিস্ত্রির কাজে। যে ছিল কর্মকার, তাকে বলা হয়, সিধার মেশিন চালাও। আর ধরজীর কাজ যে করত, তাকে বসিয়ে দেয়া হয় তাঁতে। তাই ভাল জিনিষ তৈরী হয় না। জিনিস ভাল না হলে লোকে কিনবে কেন? কিন্তু সেই খারাপ জিনিষেরই দাম আবার ভাল জিনিষের দামের চাইতেও বেশী।

কেন, তা হবে কেন? সেই ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

কারণ, দাম কসবার সরকারী রীতি। ডাঃ বিশ্বাসকে দেখিয়ে বললাম, উনি ভালভাবেই জানেন। প্রথমতঃ ঠিকাদার মারফৎ কাঁচা মাল কেনা হয় বলে তার দাম পড়ে বাজার দরের চাইতে বেশী। তারপর কামারকে দিয়ে ছুতোরের কাজ করাতে গেলে নিশ্চয়ই সময় বেশী লাগবে। মানে, লেবার চার্জ বেশী। তারপর হাতুড়ী বাটালী কথাত ব্যবহার করার ফলে ওগুলো যতটা ক্ষয়ে যায়, তার জন্যও চার্জ করা হয়। তারপর লাভ। প্রত্যেকটি জিনিষের দাম কেলবার সময় লাভ ধরা হয় শতে বারো টাকা। একখানা শতরঞ্চির বেলায় যা, একটা বাড়নের বেলাতেও তাই।

চেয়ারম্যানের কণ্ঠ শোনা গেল, হুঁ। কিন্তু বলতে পারেন, কিভাবে একে প্রফিট আরনিং ইনডাষ্ট্রিতে পরিণত করা যায়?

যা দিলাম, যতদূর জানি, বছরের শেষে ব্যালেন্স শীটে প্রফিট একটা অঙ্ক দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ সেটা আনরিয়েল বা ফিক্টিশাস প্রফিট। গভর্ণমেন্ট ডিপার্টমেন্টগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ জেলে গেলে সেখান থেকে কিনে থাকে। দাম দেয় শুধু ইনভয়েস স্বাক্ষর করে। গ্রাহক ডিপার্টমেন্ট যখন দরাদরির প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করবে না, তখন জেল বিভাগ সাড়ে বারো টাকা লাভের পরেও প্যাকিং ইত্যাদি খাতে বেশ মোটা রকম চার্জ করে ইনভয়েস পাঠায় নিজেদের ইনডাষ্ট্রিতে লাভ দেখাবার জন্য। বিনা আপত্তিতে ইনভয়েস সই হয়ে আসে। একে কি সত্যিকার লাভ বলা যায়?

কিছুক্ষণ সবাই গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন। আমার ভাবন ওঁদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে. ওঁদের ভাবলেশহীন মুখের পানে চেয়ে বোঝবার উপায় নেই।

এবার সেই ভদ্রলোক মুখ খুললেন, কিন্তু আমাদের সে প্রশ্নের জবাব পাইনি, কি করে এই সব ইনডাস্ট্রিতে রিয়েল প্রফিট আর্ন করা যেতে পারে।

মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম, এক কথায় এর জবাব দোব?

ও—ইয়েস।

It must be run on a commercial basis and the Officer-in-charge should act as a Commercial manager.

হো হো করে হেসে উঠলেন চেয়ারম্যান। ওঁরাও যোগ দিলেন। তিনি বললেন, চমৎকার বলেছেন। ব্যবসাদী ও ব্যবসায়। এই কনসেপশনটা না আসা পর্যন্ত লাভের কথা কেউ ভাববে না। গুড। তারপর ডাঃ বিশ্বাসকে বললেন, আপনি কিছু জিজ্ঞেস করুন ডাঃ বিশ্বাস।

বিশ্বাস হাসতে হাসতে বললেন, আমার ডিপার্টমেন্টেই উনি চাকরি করছেন, আমি ত ওঁকে ভাল ভাবেই জানি। সুতরাং—

উনি আপনার নিজেরই পরিবারের লোক, তাই না? বলে চেয়ারম্যান আবার হেসে উঠলেন।

একটু পর বললেন, আচ্ছা মিঃ গাঙ্গুলী—

উঠে দাঁড়ালাম। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। বড় বড় পা ফেলে চললাম অফিসের দিকে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রিপোর্টটা লাঞ্চের পরই যদি দিতে পারি।

তারপর একদিন এ্যাওয়ারদন চাউলের অবাধ্যায় প্রায় ভুলেই গেলাম বলা চলে।

অঞ্জন আরও কবার অমনি অকস্মাৎ এসে মোগলাই পরোটা আর চিকেন কারি খেয়ে চলে গেছে। জেল সুপারের চাকরি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। বুঝাই জেদ করে বিজেনদাকে চৌড় করাবার জন্য বোধহয় লজ্জিত ও দুঃখিত।

ভালই হয়েছে। আমিও আবার নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পাবলিক সার্ভিস করে যেতে লাগলাম প্রবেশন অফিসাররূপে।

প্রবেশন ডিপার্টমেন্টের ক্রিয়াকলাপ কি, প্রবেশন অফিসারই বা কাকে বলে, কি তার কাজ, এ সম্বন্ধে ১৯৫৬ সালে সাধারণ লোকের ধারণা বিশেষ কিছুই ছিল না।

বিধান সভায় যে আইনটি পাশ করে গভর্ণমেন্টকে এই প্রবেশন ডিপার্টমেন্ট খোলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, সেই আইনটি পাশ হয় ১৯৫৪ সালে, West Bengal Offenders (release on admonition and probation) Act, 1954. আর সেই ডিপার্টমেন্ট খোলা হল ১৯৫৬ সালে জেল ডিপার্টমেন্টের অধীনে। ১৯৫৬ সালে আমরাই আট জন প্রথম নিযুক্ত হলাম প্রবেশন অফিসাররূপে।

প্রবেশন অফিসারের কাজ একেবারে সমাজ কল্যাণমূলক। যদি কোন প্রথম অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব তেমন বেশী না হয় আর বিচারকের মনে হয় যে, ছয় মাস কারাদণ্ড বা তার কম মেয়াদী সাজা দিলেই তার বিচার করা হবে, তাহলে সেইক্ষণে শুনানী মুলতবী রেখে তিনি প্রবেশন অফিসারকে নিয়োগ

করতে পারেন কৃত অপরাধের কারণ নির্ণয়ের জন্য। প্রবেশন অফিসার আসামীর সঙ্গে দেখা করবে, তার মনের কথা শুনবে। তার পরিবারের লোকদের সঙ্গে কথা বলবে, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনা করবে, কি রকম পরিবেশে আসামী থাকত, তা বুঝতে চেষ্টা করবে এবং তারপর কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট পেশ করবে বিচারকের কাছে।

বিচারক তখন ইচ্ছে করলে সেই রিপোর্ট অনুমোদন করে আসামীকে অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে কারাগারে না পাঠিয়ে তার বাড়ীতেই থাকবার সুযোগ দিতে পারেন। একজন বা দুজন তার জন্য জামিন দাঁড়াবে। কোন উকিল মোক্তার দাঁড়ালে চলবে না, দাঁড়াতে হবে তার কোন নিকট আত্মীয়কে, যে অপরাধীর কল্যাণ চায় এবং যার কল্যাণের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে।

অনধিক তিন বৎসরকাল অপরাধী আমাদের অধীনে প্রবেশনে থাকবে। প্রবেশনে, মানে আবেক্ষণে। আমরা সেই প্রবেশনারের তদারকি করব বলেই আমাদের ডেজিগনেশন দেওয়া হয়েছে প্রবেশন অফিসার। ওর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, ওর পরিবারের সদার সঙ্গে মিশে ওকে ভাল করে তুলব, যাতে ওর অপরাধ প্রবণতা দূর হয়ে যায়, সুস্থ ও আইনানুগ নাগরিক হয়ে ও যাতে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

যদি ভাল না হয়? তাহলে আমাদের রিপোর্ট পেয়ে সেই বিচারক দেওয়াল ঘাটবার জন্য জেলে পাঠিয়ে দেবেন ওকে।

আইনের এই মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তেমন কোন প্রচার হয়নি। তার ফলে যেখানেই যাই, সেখানেই আমরা কি ও কেন, এ সম্বন্ধে বেশ খানিকটা বক্তৃতা দিতে হয় আসল কাজ সুরু করবার পূর্বে।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখ বেশ সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

প্রথমেই গেলাম ডায়মণ্ডহারবার লাইনে সংগ্রামপুরে, ষ্টেশন থেকে চার মাইল দূরে একটি গ্রামে। একটা এনকোয়ারি ছিল। সেখান থেকে ফিরে এলাম বারুইপুর জংশনে। আবার গেলাম জয়নগর-মজিলপুরে। সাইকেল নিয়ে লোক অপেক্ষা করছিল, গেলাম আট মাইল দূরে একটি গ্রামে। প্রবেশনারকে দেখে এলাম। ফিরে এলাম সোনারপুর জংশনে। আবার চললাম একেবারে ক্যানিং। মাইল দুয়েক দূরে একটি গ্রামে গেলাম। একটি প্রবেশনার সম্বন্ধে বেয়াড়া রিপোর্ট পেয়েছি। তাই না জানিয়ে ভিজিট করে এলাম। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নদীর ওপরেই মাছের বাজার বসে গেছে। খুব সস্তা না হলেও বেশ টাটকা। সেরখানেক মাছ কিনে পাঁচটার ট্রেনে চেপে বসলাম।

টালিগঞ্জের বাড়ীতে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। বারো ঘণ্টার ট্রেন জার্নি, সাইকেল চালানো ও গ্রামের মেঠো পথে হাঁটাহাঁটির ফলে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। শীতকালেও যেন ঘেমে উঠছিলাম। মাছের ব্যাগটা আত্রেয়ীর হাতে দিয়ে বললাম, জলদি গরম জলের ব্যবস্থা কর, গা ধোব, তারপর চা, সঙ্গে কেক। ছেলেকে দিয়ে কেক আনাও।

বলেই লম্বা হয়ে খাটে গা এলিয়ে দিলাম। চোখ বুজে এল।

একটু পর চোখ খুলতেই দেখি, আত্রেয়ী তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, মুখে মৃদু মৃদু হাসিও দেখা যাচ্ছে।

না জলে গেল! কতখানি পরিশ্রম করে এলাম, তা তুমি কি করে বুঝবে? বললাম, কি, জল দেবে, না নিজেই করে নিতে হবে?

মৃদু মৃদু হেসেই আত্রেয়ী বলল, না, না আমিই করে দিচ্ছি। জেল সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবকে কি আর কষ্ট দিতে পারি?—

মানে? উঠে বসলাম। ঠাট্টা করবার আর সময় পেলে না?

ঠাট্টা কিসের? আত্রেয়ীর চোখেমুখে খুশীর ঝিলিক, জেল সুপার দেব না ত কি প্রবেশন অফিসার বলব?

মানে? বিস্ময়ের আমার আর সীমা রইল না।

আত্রেয়ী শান্ত কণ্ঠে বলল, বিকেলবেলা তোমার পিছন সুধীর এসেছিল। বলল, মা, সাহেব ত এবার জেল সুপার হয়ে গেলেন।

ও জানল কি করে?

বলল তোমাদের সি. পি. ও নাকি তোমায় ফোন করেছিলেন, তোমায় না পেয়ে ওকেই বলে দিয়েছেন বাড়ীতে খবর দিতে যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ তোমার নামই পাঠিয়েছে।

সি. পি. ও কি করে জানলেন?

তাঁকে নাকি তোমাদের আই. জি. ফোন করে জানিয়েছেন, আত্রেয়ী জবাব দিল, বলে দিয়েছেন খবরটা এখন গোপন রাখতে।

বুবুল পাশের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, বলল, মা অমনি তোমার পিছনকে দু'টাকা বখশিস দিয়ে দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত আর দেরী করতে পারলে না?

সে প্রশ্নের কোন জবাব দিল না আত্রেয়ী, ডাকল, বেবুল, দোকান থেকে কেক নিয়ে আয় যে! সবাই মিলে কেক আর চা খাওয়া যাক! তারপর মাছ কাটতে যাব।

মনে তখন কিসের তরঙ্গ দোল খাচ্ছিল, আজ আর তা মনে পড়ে না।

[ক্রমশঃ]

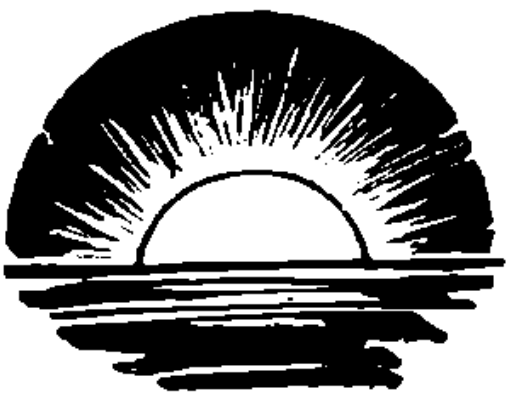

গল্প ভারতীর পাতা থেকে

ভাঙ্গাগড়া

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

ভাবি বিচিত্র লাগছে উত্তমার—

একখানার পর একখানা দরখাস্ত ও উল্টাচ্ছে, টাইপ করা অক্ষরগুলোয় দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে, আবার কোনওটা মনোযোগ সহকারে পাঠ করছে। বিচিত্র একটা অনুভূতি উত্তমার স্নায়ুগুলিকে রোমাঞ্চিত করে তুলছে, কত দেশান্তর, দূর দূরান্তর, গ্রাম গ্রামান্তর থেকে না এ চাকরীর দরখাস্তগুলি আসছে।

একখানা দরখাস্ত হাতে নিয়ে আনমনা হয়ে গিয়েছে উত্তমা, স্মৃতির উপকূলে ওর মন থমকে দাঁড়ালো, বিচিত্র অনুভূতি ওর চোখের তারায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মজুমদার এলুমিনিয়ম ফ্যাক্টরীর প্রপ্রাইটারের স্ত্রী উত্তমা।

বিয়ের পর সুরজিৎ মজুমদার স্ত্রীকে বলেছিল—"শোন উত্তমা আমি তোমাকে লক্ষ্মী ডাকবো, কী মিষ্টি নাম লক্ষ্মী; তুমি আমার ফ্যাক্টরীতে মূর্তিমতী লক্ষ্মী হয়ে ওঠ, তোমাকেও ফ্যাক্টরীর সক্রিয় দায়িত্ব নিতে হবে।"

মৃদু হেসে উত্তমা সেদিন স্বামীকে সম্মতি জানিয়েছিল।

সুরজিৎ আরও বলেছিলেন—"কুল পদ্মের আড়ালে ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রীর অস্তিত্বটা ক্রমেই যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বাস্তিক অনুষ্ঠান হোক, তার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বাণিজ্যিক বুদ্ধিকাতেও ফসল ফলাতে হবে।"

বাণিজ্যিক বুদ্ধিতে অপর্যাপ্ত ফসল ফলিয়েছে উত্তমা।

মজুমদার ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষার দায়ীত্বেও রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কৃতিত্ব বইকি উত্তমার।

মজুমদার ফ্যাক্টরী, মজুমদার ইণ্ডাষ্ট্রিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে।

বেলেঘাটার এঁদো গলি ছাড়িয়ে মহানগরীর বড় রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করছে। উত্তর বাঙ্গলার খ্যাতিমান নৃপতির প্রকাণ্ড প্রাসাদ টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙ্গছে, মজুমদার ইণ্ডাষ্ট্রী নূতন বলের গড়ে উঠছে।

এবার শুধু এলুমুনিয়মেরই ভাঙ্গাগড়া আর কারিকুরি নয়, বিরাট কাণ্ড কারখানা; এবার কনভিসনের মেসিন নির্মাণ হবে, নির্মাণ হবে ফ্রেজিভেয়ার, ফ্যান, আর কত কী, ছোট ফ্যাক্টরী, প্রকাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিতে বিস্তার লাভ করছে।

মধ্যে মধ্যে আনন্দ প্রকাশ করে সুরজিৎ বলে স্ত্রীকে—"আমার তোমাকে নামকরণ ব্যর্থ হয় নি লক্ষ্মী, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। অধ্যক্ষার সুদক্ষ ফ্যাক্টরী পরিচালনায় কৃতিত্বই শুধু দেখাওনি, কীর্তিও রাখলে। দশবছরে একটা ফ্যাক্টরীর অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে।"

"আমার কৃতিত্ব আর কী—" ম্রিয়মান হাসলো উত্তমা—দেশের পটপরিবর্তনের সুযোগটুকু আমরা নিতে পেরেছি। মানুষের ভাগ্য খান্ খান্ হয়ে ভাঙছে, অট্টালিকার সৌধে বাস করবার স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে যাচ্ছে মানুষ, ভাঙা ডানার ক্লান্ত উদ্যমে ঘর বাঁধছে আবার—পর্ণকুটিরে না হয় টিনের আর টালির ছাউনিতে; জীবন উপকরণের সবটুকু সমৃদ্ধি যেন অধৃত রাক্ষস গ্রাস করে নিচ্ছে। পিতল কাঁসার কথা মানুষ মন থেকে ছাঁটাই করে দিচ্ছে, এলুমুনিয়ম আর এনামেল মানুষকে আবার সংসার গড়বার সুযোগ দিচ্ছে। মজুমদার ফ্যাক্টরীও তাই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।"

"ভাঙা আর গড়া" সুরজিৎ বলেছিল—"নদীর এক পাড় ভাঙে আর এক পাড় গড়ে ওঠে, বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর এই হোল বিচিত্র ইতিহাস।"

একদিন উত্তমা বললো স্বামীকে—"শোন, মজুমদার ফ্যাক্টরীর আমি না হয় সুদক্ষ অধ্যক্ষা ছিলুম, এখন আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রী বিরাট হয়ে উঠছে, অধ্যক্ষার কাজ আমি চালিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু একজন ইঞ্জিনীয়ার ওয়ার্কস ম্যানেজার তো চাই। যন্ত্রপাতির কোন গোলমাল হলে আমি তো আর বুঝবো না—"

"বেশ তো!" উৎসাহ প্রকাশ করে সুরজিৎ বললে—"কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও—তারপর উপযুক্ত লোক বেছে নিয়ে নাও; আর শোন লক্ষ্মী—" সুরজিৎ আবার বললো—"বিলেতের একজন খুব বড় ষ্টীল ফ্যাক্টরীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁর কার্য দেখবার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি ওদের দেশের কাজকর্মগুলো দেখে মাসখানেকের মধ্যে ফিরে আসবো, তুমি এদিকে কাজ সুরু করে দিও। রঞ্জন, অজিত, বলাই, নিমাই ওরা তোমায় সাহায্য করবে।"

বিচিত্র লাগছে উত্তমার।

দেশ দেশান্তর, দূর দূরান্তর থেকে চাকরী প্রার্থীর কত না দরখাস্ত আসছে। বিচিত্র অনুভূতি।

একখানা দরখাস্ত হাতে নিয়ে আনমনা হয়ে গিয়েছে উত্তমা।

দরখাস্তখানা বিলেত থেকে পাঠিয়েছে—কুমার সিদ্ধার্থ রায়। বিলেতে দশবছর ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে এবং হাতে কলমে শিখছে।

"কুমার সিদ্ধার্থ রায়—" আনমনা উত্তমার স্নায়ুতে রোমাঞ্চ লাগছে, ভাগ্যের যেন বিচিত্র প্রহসন। উত্তর বাঙলার খ্যাতনামা নৃপতির পুত্র রাজকুমার সিদ্ধার্থ একদিনকার আপন প্রাসাদে মজুমদার ইণ্ডাষ্ট্রীর কর্মচারীরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

স্মৃতির সমুদ্রে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে উত্তমা, চিত্তে অনুভূতি; নিশ্বাস ফেলতে কিছুটা সময় লাগছে ওর। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশে কুমার সিদ্ধার্থের সঙ্গে আলাপটা ক্রমে ক্রমে জমে উঠতে লাগলো। সকলেই জানে কুমার উত্তমাকে বিয়ে করবে। আবার সকলে জানতে পারলো—"রাজ বধূ হবার যোগ্যতা নাকি নেই উত্তমার। একমাত্র রাজকন্যাই রাজবধূ হতে পারে। ব্যারিষ্টারের মেয়ে উত্তমা। রাজপরিবার ঐতিহ্য না থাক—বংশ গৌরবের আভিজাত্য ছিল। মনের সরোপনে গভীরভাবে ও আহত হোল। তাই কুমার সিদ্ধার্থ যখন একে চুপি চুপি বললো—"চলো আমরা আলাদা নীড় বাঁধি, আমি তো আর অক্ষম নই—"

ওর প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেনি উত্তমা, "দরকার নেই" অভিমান আহত গলায় ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিল।

আয়না উত্তমার হাতে তখনও সিদ্ধার্থের দরখাস্তখানা রয়েছে, বিচিত্র অনুভূতি ওর স্নায়ুকে রোমাঞ্চিত করে তুলছে।

ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলরাম ঘরে এসে এসে ঢুকলো। জিজ্ঞেস করলো "এই দরখাস্তখানা কী মনোনীত করলেন"?

"হ্যাঁ বলাইবাবু" সংক্ষিপ্ত উত্তর উত্তমার।

হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত উত্তমা বিলেতের দরখাস্তখানাই মনোনীত করলো।

• • • •

চাকরীর নিয়োগপত্রখানা নিতে এসে একদণ্ড বিস্মিত হোলনা কুমার সিদ্ধার্থ। এ যে ভাগ্যের বিচিত্র প্রহসন।

উত্তর বাঙ্গলার খ্যাতিমান নৃপতির ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজকুমার সিদ্ধার্থ, দুঃস্বপ্নের ঘোর ওর কালো চোখের তারায় থম্‌থম্ করছে। দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কী?

রাজকুমার কি বিশ্বাস করতে পারছে উত্তর বাঙ্গলার বিখ্যাত নৃপতির রাজপ্রাসাদ টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙছে। রাজ পরিবার ঐতিহ্য ওই ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে মিশে যাচ্ছে।

সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটছে।

ত্রিতল প্রাসাদের প্রাচীর গাত্রের দিকে কুমার সিদ্ধার্থ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, টাওয়ার ক্লকটি খোলা হয়ে গিয়েছে। প্রাসাদের এ দিকটায় এবার ভাঙা শুরু হবে। আর একদিক রাজমিস্ত্রীরা টুকরো টুকরো করে ভাঙছে। কারুকার্যকরা সৌখিন দেওয়ালের টুকরোগুলি ছিটকে ছিটকে পড়ছে, শ্বেতপাথরের মেঝে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, মোজাইকের থামগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ।

একটি মজুরনী ওর ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে সৌখীন পাথর আর মোজাইকের টুকরোগুলো সংগ্রহ করছে।

লর্ড কর্নওয়ালিশের রাজতন্ত্র সমাধি লাভ করেছে, মজুরনী মেয়েটি হয়তো রাজারাজরার যুগকে ওর ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে বেঁধে রাখতে চাইছে। যেন প্রত্নতাত্ত্বিক চাইছে প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণীয় করে রাখতে।

ভাঙা আর গড়া।

টেনিস-প্রাঙ্গনে মজুমদার ইণ্ডাস্ট্রী গড়ে উঠছে, কয়েক টিনের ছাওয়া প্রশস্ত উদ্যান ঘেরা হয়ে গিয়েছে। সৌখীন ফুলের বাগান, খেলার মাঠ বাণিজ্যিক মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এয়ার-কণ্ডিশন মেশিন, রেফ্রিজেরেটার, পাখা কত কী নির্মাণ হবে।

রাজতোরণের আর একপ্রান্তে মজুমদার ইণ্ডাস্ট্রীর অফিস নির্মিত হয়েছে। বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতে চায়না কুমার সিদ্ধার্থের।

আর এক দফা বিস্ময়ের মুখোমুখী হয়ে ও দাঁড়ালো। অফিস ঘরের দরজা খুলে উত্তমা বের হয়ে এল, ডাকলো—"এস সিদ্ধার্থ, এ ঘরে তোমার নিয়োগপত্র পাবে—"

"তুমি? উত্তমা তুমি?" অস্ফুট গলায় সিদ্ধার্থ বললো। ও অফিস ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ারে

বলেছে। ওর সামনাসামনি চেয়ারে উত্তমা বসলো। ওরা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। দশ বছরের ব্যবধানের পরিবর্তনটা হয়তো ওদের চোখে অস্বাভাবিক লাগছে। বাইশ বছরের তরুণী তন্বী উত্তমা বন্ধিমের কোঠায় যেন তারিক্তি হয়ে উঠেছে। বাইশ বছরের সুন্দর সুকুমার রাজপুত্র সাগরপারের জল-হাওয়ায় বন্ধিমের কোঠায় পৌঁছে আরও সুশ্রী হয়েছে। তবে ওর চোখের কালো তারায় একটা ক্লান্তির ছায়া নেমেছে।

উত্তমা জিজ্ঞেস করলো—"বিলেত থেকে কী আন্ড এলে? মেম বউকে এনেছ তো?"

"মেম বউ—" সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ হাসলো। বিয়ে আর করা হোল কই? তোমাকে ভুলে যেতে বিলেত চলে গেলুম, এক বন্ধুর পরামর্শে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে সুরু করলুম—শেষ প্রায় হয়ে এসেছিল, ইতিমধ্যে বাড়ীতে বিপর্যয় ঘটে গেল। বাবা মারা গেলেন। সম্পত্তির যে কী হলো, কিছুই বুঝতে পারি না, টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেল দেশ থেকে, মহা বিপদে পড়েছি—এই সময় কাগজে তোমাদের বিজ্ঞাপনটা দেখে দেশে ফেরবার একটা পথ পেলুম।"

উত্তমা বললো—"কে যেন বলছিল—তোমার মেম বউ খুব ভাল হয়নি—"

"থাকগে ও কথা—" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ বললো, "চলো উত্তমা বাইরে যাই, বাড়ীটার যে এ দুর্দশা হয়েছে জানতুম না; ভাঙাচোরা প্রাসাদের মধ্যে কত স্মৃতির স্বাক্ষর না রয়েছে;" একটা নিশ্বাস ফেলে সিদ্ধার্থ কী যেন ভাবতে সুরু করলো।

উত্তমা বললো—"বাড়ীটার দুর্দশা ঠিক নয় সিদ্ধার্থ, এক যুগ যায় আর এক যুগ আসে; নূতন যুগ যে জন্ম নিচ্ছে তারই আত্মপ্রকাশ তো ঘটছে রাজপ্রাসাদের ভগ্ন-স্তূপে, আত্মবিনাসের সমাধিতে।" ওরা অফিসের বাইরে বের হয়ে এসেছে।

সিদ্ধার্থ বললো—"আত্মবিনাসের শুধু সমাধি নয় উত্তমা, আমাদের আত্মগরিমারও সমাধি হয়ে গিয়েছে।"

"আত্মগরিমার সমাধিতে এবার আত্ম-বিশ্লেষণের পতাকা উড়বে।" উত্তমা বলতে লাগলো—"আমাদের এসুমিনিয়ম ফ্যাক্টরীর ক্রমশঃ উন্নতি হতে লাগলো—কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই এই প্রাসাদটা কিনে ফেলা হলো।"

আবার ম্রিয়মান হাসলো সিদ্ধার্থ—"এ বাড়ীতে সেদিন রাজবধূ হয়ে পদার্পণের যোগ্যতা ছিল না তোমার, মজুমদার ইণ্ডাষ্ট্রীর অধ্যক্ষা হয়ে প্রবেশ করেছ।"

"শুধু তাই নয় সিদ্ধার্থ—আমার আরও মর্যাদা রয়েছে"—উত্তমা জানালো—"মজুমদার ইণ্ডাষ্ট্রীর প্রপ্রাইটারের পত্নীত্বের অধিকারও এ বাড়ীতে প্রবেশের অধিকার তাকে সুযোগ দিয়েছে!"

সিদ্ধার্থ বললো—"বিলেতে থাকতে বড় বধূরাণী লিখেছিলেন, তোমার এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছে—আমার জন্য তাঁরা কোথাকার রাজকুমারী ঠিক করেছেন—"

এবার ওরা রাজপ্রাসাদের ভগ্ন-স্তূপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কুমার সিদ্ধার্থ বললো—"যে ঘরখানা ভাঙা হচ্ছে—ওখানা ছিল "খানা ঘর," প্রত্যেক গভর্ণর ওখানে খানা খেয়েছে বিলেতের কত লর্ডও ওই ঘরের ডাইনিং টেবলে কাঁটা চামচ ধরেছে—"

"ওখানেই এখন মজুমদার ইণ্ডাষ্ট্রীর অফিস থাকবে—" উত্তমা বলতে লাগলো "ওদের ঘরগুলো যেন বড় বড় হবে, প্রত্যেককে একটু করে সব্জি ফলানোর জন্যে বাগান দেওয়া হবে—"

সুধার সিদ্ধার্থ বললো—"যা ছিল ব্যক্তির, তা হয়ে যাচ্ছে সমষ্টির।" এবার ওরা প্রাসাদ প্রাঙ্গনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকটায় রাজকর্মচারীদের আবাস ছিল। এখন মজুমদার ইণ্ডাষ্ট্রীর কর্মচারীরা বাস করছে।

উত্তমাকে দেখে দোতলা থেকে একটী বধূ নেমে এল। ও উত্তমার পারসোনাল এসিষ্ট্যাণ্ট অভিতের স্ত্রী মৃদুলা, টেলিফোনে চাকরী করে। উত্তমাকে ও বললো—"দিদি, মজুমদার ইণ্ডাষ্ট্রীর উদ্বোধন তো আনুষ্ঠানিকভাবে হবে শুনলুম—"

"ইচ্ছে সকলেরই তাই—" উত্তমা বললো—"মজুমদার বিলেত থেকে ফিরে এলেই ব্যবস্থা হবে।"

মৃদুলা বললো—"আমরা কয়জন টেলিফোন মেয়ে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' অভিনয় করবো।"

"বেশ তো কোর—" ওকে উৎসাহিত করে উত্তমা বললো—"প্রথমদিকে আমাদের কিছু নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ থাকবেন, তারপর তো আমরা নিজেরাই থাকবো, তোমাদের মেয়েদের বিশেষ অসুবিধা হবে না—" অফিস ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে উত্তমা সিদ্ধার্থর সঙ্গে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলো।

উত্তমা বললো—"কলেজ ফাংসানে তুমি কী সুন্দর রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে সিদ্ধার্থ তুমি সেদিন উদ্বোধন সঙ্গীত গেও—"

"গান যে ভুলে গেছি—" সিদ্ধার্থ মৃদু হাসলো—"দশ বছর গান করিনি, আমার সেতারের তার টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেছে যে—"

উত্তমা বললো—"ওই ছেঁড়া তারেই তুমি গান কোর—" ওরা আবার অফিস ঘরে প্রবেশ করলো।

• • • •

মজুমদার ইণ্ডাষ্ট্রীর উদ্বোধন উৎসব।

মজুমদার ইণ্ডাষ্ট্রীর প্রাঙ্গনের এক প্রান্তেই সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, স্টেজ বাঁধা হয়েছে।

সম্মুখের আসনে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিবর্গের সঙ্গে সুরজিৎ, উত্তমা ও সিদ্ধার্থ বসেছে।

সিদ্ধার্থর সঙ্গে স্বামীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে উত্তমা বলেছিল—"আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রীর নূতন ওয়ার্কস ম্যানেজার, সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরেছেন—" সিদ্ধার্থকে অভিনন্দন জানিয়ে সুরজিৎ বলেছিলেন—"বিলেতের কারখানাগুলো দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি, এইদিক থেকে আমরা কত পিছিয়ে রয়েছি, আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে যত লাগবে—ততই ফ্যাক্টরীর উন্নতি হবে।" সিদ্ধার্থ মৃদু হেসে অভিনন্দনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল।

এইমাত্র অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে।

উদ্বোধন সঙ্গীত গাইছে সুধার সিদ্ধার্থ :—

"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান—
তার বদলে আমি চাইনে কোন দান"
ভুলবে সে গান যদি না হয় যেও ভুলে
উঠবে যখন তারা, সন্ধ্যা সাগর কূলে।

• • • •

তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে—
সেই কথাটী তুমি ভুলবে কেমন করে ?
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান—
ভুলতে সে কী পারো ভুলিয়েছ মোর প্রাণ।

গান অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে। দেবদাস অভিনয় করছে মৃদুলা আর তার সহকর্মীরা। অভিনয় প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে। কিন্তু গানের হৃদয়স্পর্শী আবেদনটা উত্তমার প্রতিমুখে অনুরণিত হয়ে ফিরছে। ওর পাশেই সিদ্ধার্থ বসেছিল ওকে বললো—"ছেঁড়া তারের গান, তাই এত ভালো লাগলো সিদ্ধার্থ।" দেবদাসকে তখন পার্বতী বলছে—"নয় কেন ? তুমি গাও, আমি পারিনে ? তোমার রূপ আছে, গুণ আছে, আমারও রূপ আছে, গুণ আছে, তোমার বাবা বড়লোক কিন্তু আমার বাবা ভিক্ষা করে বেড়ান না—"

এই সময় সুরজিৎ উত্তমাকে বললেন—"ওই মেয়েটী, ওই পার্বতীর সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক ছিল—ছেলে আমাদের পাশাপাশি বাড়ী—"

উত্তমা জিজ্ঞেস করলো—"বিয়ে হোল না কেন ?"

"আমাদের পণের দাবী যা ছিল, তা ওঁদের মিটানোর সাধ্য ছিল না।"

আবারের ভঙ্গীতে উত্তমা স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো—"তুমি ওকে নিশ্চয়ই খুব ভাল বাসতে ?"

"ভালবাসা—" উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন সুরজিৎ—"জীবনের প্রয়োজনকে হয়তো সব চেয়ে ভালবাসি, ব্যাঙ্কারী, ইণ্ডাষ্ট্রী, বিজনেস—"

কুমার সিদ্ধার্থ ভাবছে—রাজপ্রাসাদ টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙছে, সকলেই তা দেখছে, কিন্তু মনের মধ্যে যে ভাঙা-গড়া চলে কেউ তার হিসাব-নিকাশ রাখে না।

সেরা আদমী

বিজনকুমার ঘোষ

জুন মাস। পর পর কয়েক দিন মাত্রাতিরিক্ত গরম পড়ল। প্রত্যেকদিন বাংলা খবরের কাগজগুলো কাবিয় করে লেখে, মনসুন এসে পড়ল বলে। বঙ্গোপসাগরে ভয়ংকর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। ওই গাছপালা উপড়ে, ট্রাফের তার ছিঁড়ে, এলাকাকে বুক সমান স্রোত বইয়ে এবার মূর্তিমান আপদ হাজির হল, আর রক্ষে নেই। কিন্তু হাওয়া অফিসের ভবিষ্যদ্বাণীকে কাঁচকলা প্রদর্শনপূর্বক জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গরম সপ্তাহেই বজায় আছে। মাঝে মাঝে ফুলবাবুর মত দু'চার ঝিপ জলকা মেঘ উড়ে যায় শুধু।

এই রকম এক দুপুর বেলায় হিন্দুস্থান পার্কে বাঁশী বেজে উঠল, অনেকে ভাবল বাঘের আগে যেমন কেউ, তেমনি বৃষ্টির আগে অন্য কেউ। বস্তুত ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হিন্দুস্থান পার্কের প্রতিটি ইট কাঠ পাথর লোহা এমন তেতে থাকে, আর তার ভেতরের মানুষগুলো তাতোধিক যে, অন্য কোন কল্পনা মাথায় আসে না।

মিন্টু ওর আধ ঘুমন্ত মাকে টেনে তুলল, মা লাপখেলা এসেছে দেখব। মীরা দু'চারবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার বালিশে কাত।

পপি ওর মাকে কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না। শাড়ির আঁচল ধরে প্রাণপনে টানাটানি আরম্ভ করে দিয়েছে।

টিনু ছ' ছাড়িয়ে সবে সাতে পা দিয়েছে। ফলে পিসিমার পাতলা খান কাপড়টা ছিঁড়েই গেল।

কার্টুনের গায়ে ভীষণ জোর। ভোর বেলায় বাসে চেপে ইংরেজী স্কুলে যায়। অতটুকু ছেলে হলে হবে কি, আন্টিরা ওর কমপ্লেন বুকে একটা লাইন লিখবারও জায়গা রাখেনি। প্রত্যেক দিন জামা ছিঁড়ে কপাল কাটিয়ে আসা ওর অভ্যাস। সেই কার্টুন উপাদান না দেখে ঘুমন্ত অ্যাঠাবাবুর মাথা লক্ষ্য করে ছবি ক্রিক নিয়ে পৌঁড়ে এল।

হিন্দুস্থান পার্ক জুড়ে ছোট বড় নানা ঘটনা দ্রুত ঘটে যেতে লাগল।

এদিকে বাঁশীওয়ালা আপন মনে বাঁশী বাজিয়েই চলেছে। যেন লোহার বাসর ঘরে বেহুলা কেঁদে কেঁদে উঠছে। দোতলা তিন তলার ফুল বারান্দাগুলিতে একটি দুটি করে মানুষ ফুটতে লাগল।

শ্রীমতীশ সরকার অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অধিভক্ত বাংলার বিস্তর গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন। অভিজ্ঞতা দারুণ। বললেন, ওহে কি সাপ তোমার ঝুড়িতে?

—শঙ্খিনী। সোঁদর বনের শঙ্খিনী বাবু।

—শঙ্খিনী তো ওদিকে থাকে না। তবাই অঞ্চলে থাকে। ঘন বন আর শুকনো অঞ্চলে থাকতে ভালবাসে। নিশ্চয়ই এ্যাডেলটারেট।

সাপুড়ে ইংরেজী কথাটা বুঝতে পারল না। এটুকু বুঝল বাবু বিশ্বাস করতে চাইছে না। বলল, হামার লিজের হাঁখে ধরা বাবু। আসল শঙ্খিনী। বারো হাঁথ লম্বা। দশ কুড়িয়া লাগবে বাবু।

—যোগাস! সতীশ সরকার মুখ বাঁকালেন: আসল শঙ্খিনী একবার আমার ভাক বাংলোয় উঠে এসেছিল। খুব বোর রাইফেল দিয়ে গুলী করেছিলাম ব্যাটাকে। কাচের বয়মে ছাল ছাড়িয়ে রেখেছি। তুই দেখতে চাও?

—আপনি দেখেন। শহরের মানী লোক আছেন বটে!

এবার রিটায়ার্ড অনন্ত মোহন চ্যাটার্জীর বাড়ি। চার পাশে নানা গাছপালা পুতে পাথরের মাঝখানে একটি নিখুঁত বনভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে। নেমপ্লেটে লেখা আছে, ডিগ্রীজ্ এ্যাণ্ড সেলস্ আজ্। পাড়ার ছেলেরা প্রত্যেক বার পুজোর সময় চাঁদা ধরে পঞ্চাশ টাকা। প্রতি বারই তিনি ঘণ্টা তিনেক ধরে অর্থনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি নানান বিষয় ফেঁদে শেষে পাঁচ টাকা দিয়ে বিদায় করেন। ঘিরে দাঁড়ানো প্রচুর নাতি নাতনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, খেলা দেখাও। কত নেবে?

—দশ কুড়িয়া।

—ওরে বাবা! এ যে ডাকাত!

—আসল শঙ্খিনী বাবু। পাঁচ হাঁথ দাঁড়ায়ে ছোবল মারে। হামি বুক পেতে ছোবল লিব। দশ কুড়িয়া বেশী হল বাবু? হামার জানের দাম নাই?

—কথা শিখেছিস তো ভারী!

—কেনো শিখব নাই? কথা কি শুধু তুমি জানবে বাবু? শহরের লেখা আদমী আছ বলে কি হামরা মানুষ নাই!

—আরো অনেক সাপুড়ে এসেছে এপাড়ায়। আট আনা নিয়ে খেলা দেখায়। তুই দশ টাকা চাইছিস কেন?

—সে সব ঝুটা সাপ বাবু। এ বনের আসল শঙ্খিনী। লিজের হাঁথে ধরেছি। পাঁচ হাত দাঁড়ায়। বিষ কাটি নাই বাবু।

—হু, আসল শঙ্খিনী না ছাই! সব ভেলকি বাজি।

সাপুড়ে চলে যেতেই নাতিনাতনীরা উৎসুক মুখে দাদুর দিকে তাকাল। কি ভাবে প্যাঁচ কষবেন ভাবছিলেন, এমন সময় দেখা বৌমাকে দেখে, কি জান বৌমা, আসল শঙ্খিনী, বিষ ছাড়ায়নি। ছেলেপুলে নিয়ে বাস করি। কোন রকমে সাপটা যদি বোপড়া গাছটার মধ্যে ঢুকে যায়! লোকটাকে ঠিক বিশ্বাস হল না।

ডক্টর অনিমা চৌধুরীর কখনো দুপুরে ঘুম আসে না। তা যতই গরম পড়ুক। তাঁর সুন্দর ফ্ল্যাটটা সারা বছর খালি পড়ে থাকে। শুধু পুজোর ছুটি আর গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে বাস করেন। উত্তর বাংলার এক কলেজের অধ্যক্ষা। অবিবাহিতা। বললেন, তোমার পেছনে ওটি কে?

—হামার বহু মাইজী।

—এটি বোধ হয় মেয়ে?

—হ' মাইজী। দশ বরস হল।

—কিন্তু দেখাচ্ছে যেন ছয়।

—কি করবে মাইজী। হামরা বনে থাকি। ধারাপানি দিতে পারি না। আসল পঞ্চিনী আছে মাইজী। লিকের চাপে—

—না না, আমার ঘরে বাচ্চা ছেলে নেই। কে দেখবে? এই বলে চট্টর অনিমা চৌধুরী দোতলা থেকে মেয়েটার উদ্দেশে একটা ধমকের বল ছুঁড়ে দিলেন। গত কাল ওটি পাশের ফ্ল্যাট থেকে উড়ে এসেছিল।

মধুবনীর ঘোষ হেডারসন কোম্পানির সতের বছরের এরিয়া ম্যানেজার। পিওর বৃটিশ ফার্ম। ওপের মর্যাদা দেয় বটে এরা। কেরানী হয়ে ঢুকেছিলেন। বিলেতে ডিরেক্টর বোর্ডের মেম্বাররা পর্যন্ত মিঃ ঘোষের ইংরেজী ছাকুট শুনে মুগ্ধ। রিটায়ার করেছেন সেল বছর। তার আগেই তিন ছেলেকে ওই কোম্পানিতেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এই বাড়িটা করেছেন। বাইরে বিস্তর জমিজমা। ব্যাঙ্কে এত টাকা আছে, লোকে বলে, চট করে তুলে নিলে যে কোন ছোট খাট ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে যেতে পারে। ঝোলাঝুলি কাঁধে বুনো লোকটা তাঁর সামানই বাঁশী বাজাতে লাগল। ব্যাঙে আসল পঞ্চিনীও বিষ ভুলে গিয়ে তালে তালে মাথা নাড়ায়। কিন্তু খেপে উঠলেন ঘোষ সাহেব।

—কার হুকুমে ভিতরে ঢুকেছিস? আদমী কায় না জানবার! গেট আউট।

—তুমি শহরের মানী লোক আছ বাবুজী। হামি বনের মানুষ আছি—পেছোতে থাকে সাপুড়ে।

—বনের মানুষ বনে যা। আছি নিকালো। এ্যাই উদুক, শহরে কেন?

—উদুক নেহী, হামি সাপুড়ে আছি বাবুজী। সাপ খেলা দেখাই। আসল পঞ্চিনী—

—সাপ দেখতে হয় চিড়িয়াখানায় যাব। যা এখন—গেট আউট।

—সে সব মরা সাপ বাবুজী। খাইতে পায় না। এ বনের তাজা সাপ আছে। ফিস্ ফিস্ আওয়াজ শুনেন—। হামি বুক পেতে ছোবল দিব। দশ জনিয়া লাগবে বাবুজী।

—হা, আমি দশ টাকা খরচ করি পাড়ার লোক হুমড়ি খেয়ে তাই দেখুক। অত সোজা হলে সতের বছর ম্যানেজারী করতে হত না। যা ব্যাটা, ভাগ।

তবু যায় না। বাঁশী রেখে বলে, মাইজী মেয়াটাকে কুছু খাইতে দিন। পুরানা শাড়ি দিন—

ঘোষজায়া এই সময় খুশি হয়ে ওঠেন। গত রাত্রে হঠাৎ নেমন্তন্ন খাওয়ায় বাসি রুটি ঘরে গিয়েছিল অনেক। চাকরটাকে হুকুম করলেন, ওরে রুটি ক'খানা ছুঁড়ে দে' তো।

হিন্দুস্থান পার্কে ঘর আই. সি. এস আছে। কিন্তু সেরা বাড়ি হল স্যার বি. এস. মিত্রের। সিনিয়ার তো বটেই, সারা জীবন সেরা সেরা পদের জুরী হাঁকিয়ে গিয়েছেন। একালের আই. এ. এস. ছোকরাদের তিনি কড়পার চোখে দেখেন। মজঃফরপুরীর পাশে বাকইপুরের টোকো লিচু। এ বেশের গরম মোটে সহ্য করতে পারেন না। এখনো ছ' মাস তাকে বিলেতেই কাটাতে হয়। এবারই যাওয়া হয়নি। ঘুম থেকে পাইপটা সরিয়ে আর্দালীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াটস হ্যাপেনড্?

—স্যার সাপখেলা দেখাতে এয়েচে। সাপুড়ে।

—সাপুড়ে? হুরি বল! সেক, বেগার এ্যাণ্ড পানিশ্ট টিল মোরিং আওয়ার। হোপলেস!

চাকুরিয়া লেক কাছেই। এখনো কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলের মত বিল্ডি হতে সুরু করেনি। বিকেলে হাত পা' ছড়িয়ে বসা যায়। লেকের মাঝামাঝি বিরাট রেইন গাছের তলায় দুটো বেঞ্চি আছে। সবাই যানে রিটায়ার্ড বুড়োদের আড্ডাস্থল। নতীশবাবু আগে ভাগে এসে লাঠি পেতে রাখেন। তবে হিন্দুস্থান

পার্কের রিটায়ার্ড বলেই হয়ত এখানে বৌমার অত্যাচার, ভায়বেটিস, কিডের ব্যথা নিয়ে আলোচনা হয় না। তার বদলে টংলডের আবহাওয়া, দেশ উচ্ছন্নে যাওয়া চাঁদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের লেটেস্ট মতামতে আসর সরগরম হয়। এক সঙ্গে চারজনই এসে পড়ায় সতীশবাবু লাঠি তুলে আগলা করে দিলেন। গলার মাফলারটা খুলে রেখে অনন্তবাবু বললেন, পাড়ায় একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন?

রঘুবীরবাবু বুঝে নিলেন, আমিও ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। সাপুড়েটার কথা বলছেন তো?

—হ্যাঁ। বলিহারী আস্পর্দা! কোথা থেকে এক সাপ ধরে এনেছে, বলে কিনা দশ টাকা লাগবে। এই সেদিন একটা সাপুড়ে খেলা দেখাল মাত্র আট আনায়। তাকাত!

রঘুবীরবাবু বললেন, ধন থেকে এসে কি হবে, জেনে গেছে এটা হিন্দুস্থান পার্ক। অন্য পাড়ায় সোনা মুখ করে যে দশ আনা চায় এখানে সে-ই দশ টাকা হাঁকে।

—ধরেছেন তো ঠিক।—অনন্তবাবুর মুখে সমুদ্র হাসি।

—এটুকু ধরতে না পারলে বৃথাই ম্যানেজারী করলুম। কিন্তু এসব ব্যাপারে ইন্‌ভালভেন্স হওয়া উচিত নয়।

সতীশবাবু বললেন, আমার মনে হয় আসল শঙ্খিনী নয়। সাপটা খুব রেয়ার। এক মাত্র হিমালয়ান রেঞ্জে পাওয়া যায়। হিজলপুর ফরেস্ট বাংলোতে আমি একবার শুল বোয় রাইফেল দিয়ে কাত করেছিলাম।

অরবিন্দ লাহিড়ীর হাইকোর্ট পাড়ায় বেজায় সুনাম। তাঁরই দৌলতে প্রচুর খুনী আসামী ফাঁসী ঘাটে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মাথা বড় সাফ। সরষে পরিমাণ ফাঁক পেলেই হল। জেরাগত হাতুড়ি মেরে মেরে এত বড় করে ফেলেন যে তখন গোটা মানুষটাকে বের করে আনতে একটুও অসুবিধে হয় না। বললেন, তা তো বুঝলাম কিন্তু ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই কিছু মতলব আছে।

—কি রকম?—সবাই একবার মুখের দিকে তাকালেন।

—দেখছেন না, সাপুড়ে কিন্তু সাপ খেলাবার দিকে মন নেই। এদিক ওদিক চাইছে। সব সময় চোখে একটা ত্রাসের ভাব। আমার মনে হয়, একটু লেখাপড়াও জানে। মেমরেটগুলি পড়বার চেষ্টা করছিল।

—মন বলেন নি। আমারো একটু সন্দেহ হয়েছিল। সাপ খেলাবার চার্জ দশ টাকা, এ মশাই বাপের জন্মে শুনিনি। সাপ না দেখানোটাই আসল উদ্দেশ্য।—রঘুবীরবাবু বললেন।

সতীশবাবু বিরক্ত হলেন, ঝুড়ি খুললে দেখবেন শঙ্খিনীর বদলে একটা কোলা ব্যাঙ, বসে আছে। ভেজালের যুগ। যে যে দিক দিয়ে পারে ঠকিয়ে নিচ্ছে। পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।

অনন্তবাবু বললেন, মজার কথা হচ্ছে, মনের ভাষা শঙ্খিনী এখনো বিষ কাটায়নি। আবার বলছে, বুক পেতে ছোবল নিব। তাহলে তো তুই মরবি হতভাগা!

—তাহলেই বুঝুন ঠিক বলেছি কি না। সব ফলস্।

রঘুবীরবাবু বললেন, রাত্রে কোথায় ছিল বলুন তো? স্বামী স্ত্রী একটা বাচ্চা। এখানে তো খোলা রোয়াক নেই।

—এ পাড়াটাই বা বেছে নিল কেন? আরো তো পাড়া আছে সেখানে যা না।

অনন্তবাবু ভয় সুরে বললেন, আমি মশাই সৌখিন মানুষ। বাড়ীর চারধারে রেয়ার গাছপালা লাগিয়েছি। যদি সাপটাপ কিছু ছেড়ে দিয়ে যায়।

অরবিন্দবাবু বললেন, বেয়ের বাপ চত বাপ। আগে থেকে চটাচটি করা ঠিক নয়। বুঝিয়ে সুঝিয়ে চলে যেতে বললেই হবে।

—কি রকম একটা অহঙ্কারী ভাব লক্ষ্য করেছেন? হাসি খুশির মানুষ আছি! তুমি শহরের সেরা আদমী বটে। এর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে। বলুন ঠিক কি না?

—আচ্ছা, এই বিষয়টা নিয়ে স্যার বি. এনের সঙ্গে আলোচনা করলে কেমন হয়।

—আপনিও যেমন! পাড়ার কারো সঙ্গে মিশতে দেখেছেন?

—ভয়ানক হাই ব্রো। যেন বিলেত দেশটাই ওনার নিজের দেশ।

—হুঃ! অমন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ঢের দেখেছি মশাই। আমার শালার ভায়রা স্বদেশী করত বলে ব্রিটিশ আমলে চাল পেলায় না। নাহলে ওরকম একখানা বাড়ি হাঁকিয়ে আমিও দু'বেলা বিলেত যেতে পারতাম।

সন্ধ্যায় মিসেস্ কণা সেনের মস্ত পার্টি। তবে একান্তই পুরুষ বর্জিত নয়, যদিও মহিলারাই পাদপ্রদীপের তলায়। এ পাড়ায় ও ধরনের রক্ষণশীলতা কল্পনা করা যায় না। মিসেস সেনের একমাত্র মেয়ে শেলী সেন নিখিল ভারত বাষ্টিক প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে প্রধান মন্ত্রীর হাত থেকে। গান বাজনা নাচ বক্তৃতা মেলামেশা ঠোকাঠুকি খাওয়াদাওয়া—কিছুই বাদ নেই। আসর একটু থিতু ধরার পর চেয়ার টেবিল কাছে টেনে ভাগে ভাগে সল্প-গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল।

চাটুজ্জে গিন্নী বললেন, একটা জিনিস মার্ক করেছেন, বাদরের গলায় মুক্তো?

কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি। পাছে কেউ কিছু বলে ফেলে সেই ভয়ে বেশী সময় দিতে রাজী হলেন না, কি আশ্চর্য, আমি লাপুড়েটার বৌয়ের কথা বলছি।

তিনটে টী এস্টেটের মালিক রাধিকা ঘোষের স্ত্রী বললেন, নিশ্চয়ই কোন ভদ্র ঘরের মেয়েকে ফুসলে এনেছে। পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।

—আমারও মনে কিন্তু স্ট্রাইক করেছে।—ঘোষজায়া বললেন: কোন বাপ মা-ই সাপুড়ের সঙ্গে অমন মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না। নিদেন পক্ষে ডবলু. বি. সি. এস তো জুটতই।

—কেন? হাসলেন ভট্টর অনিমা চৌধুরী: শরৎ চাটুজ্জের অরক্ষণীয়া দিদির মত হতে পারে না?

—ওসব গল্পেই চলে। এখন কেউ বিশ্বাস করে না।

—কিন্তু সাহিত্যিকেরা তো বাস্তব থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেন।

—করলেও একটা ঘুটো কেস নেখে সর্বদা জেনারালাইজ করা ঠিক নয়।—গত বছর বাংলায় এম. এ. পাশ করেছে মীরা দত্ত, অর্থাৎ মিস্টার দা।

—কিন্তু হিউম্যান ক্যারেক্টার কি ঘন ঘন পাল্টায়?

—তাহলে বলতে চান কলকাতার যাবতীয় কাবুলীওয়ালা রবীন্দ্রনাথের রহমৎ? বয় ফ্রেন্ড মিনিমের জন্যে পেন্সা বাদাম নিয়ে ঘোরে?

—আহা, আমরা আসল পয়েন্ট ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছি যে। ঘোষজায়া স্মরণ করিয়ে দিলেন।

—আমার কিন্তু পদ্মিনী সাপটা একটু দেখার ইচ্ছে ছিল ভাই। মিসেস চাটার্জী ঘাড়টা বেঁকে দুই হাতে কান চাকলেন।

মিসেস ঘোষ বললেন, আমার মেকলেসটার দিকে বিশ্রী ভাবে তাকাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেলাম। সেই থেকে বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।

– শহরের সেরা আহমী, এই 'সেরা' কথাটার ওপর কি রকম এ্যাক্সেন্ট দিচ্ছে দেখেছেন?—মীরা দত্ত ভাষাতত্ত্বের পেপারে ভাল নম্বর পেয়েছিল।

অনিমা চৌধুরী বললেন, মেয়েটার মুখ মিষ্টি, কিন্তু বড্ড আনডেভলাপ্‌ড।

—বনে থাকে, সাপ ব্যাং পোকা মাকড় খায়। মোস্ট আনহাইজিনিক ডায়েট!

—আচ্ছা পাড়া ছেড়ে যাচ্ছে না কেন বলুন তো? ভোর থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ওদের ঘোরাফেরা করতে দেখি। কেউ তো খেলা দেখে না। কোথায় শোয়?

এরপর সবাই ঘোষ গিন্নীর দিকে এক সঙ্গে তাকাল।

—লেডি মিত্রের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছেন নাকি? আপনার সঙ্গে তো খুব খাতির।

—হু, খাতির না আরো কিছু। নেহাৎ পাড়ায় থাকেন তাই না গিয়ে পারিনে। বিলেতের ঘরে কান কালাপালা। আমার আপন পিসতুতো দেওর বিলেতে থাকে। বলুন তো, আমি কয়বার বিলেতের গল্প করেছি?

—নিজেকে খুব সুন্দরী ভাবেন। বয়েস কালে আমিও অমনি দেখতে ছিলাম। সন্তর্পণে গালের মেচেতার ওপর আঁচল চাপা দিলেন মিসেস্ চ্যাটার্জী।

—যাই বলুন, বিলেতের ওইসব হাইক্লস পেইন্ট মেখে নং সাজতে আমি মরে গেলেও পারব না।

সব পাড়ায় মস্তান থাকে। হিন্দুস্থান পার্কেও নেহাৎ ঘাটতি নেই। অভিজাতদের ফাঁকে ফোকরে যে কয় ঘর অকুলীনের বাস, এরা সাধারণত সেই সব জায়গায়। নানান কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যে তিন দিনের দিন নজরে এল সিধুর। দু' আঙুল মুখে পুরে শিস দিতেই বিচ্ছির হরলা দিয়ে গোটা চার পাঁচ নানান সাইজের দাঙাত বেরিয়ে এল। টেরী বাগানো। ছুচলো জুতো। চামড়ার সঙ্গে এঁটে থাকা প্যান্ট। বেশ বোঝা যায় জুন মাসের গরমে চলাফেরায় যথেষ্ট কষ্ট হয় বেচারাদের। কিন্তু ষ্টাইল বড় বালাই। সিধু এগিয়ে এল।

—এ্যাই তোর নাম কিরে?

—জাপদি সর্দার।

—কোথায় থাকিস?

—বনে থাকি। বনের মানুষ আছি।

—কিন্তু তিন দিন ধরে তোকে এখানে দেখছি। মতলবটা কি?

—তুহার কি মতলব আছে? বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সিধু। সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে প্রথমেই আমার কলার চেপে ধরে। কিন্তু লোকটার আনা-ই নেই। বুক ভর্তি লোম। আর যা দুর্গন্ধ গায়ে। তবু সিধু ভাবছে সকাল বেলায় ছুঁচো মেরে হাত নষ্ট করবে কিনা।

জগা লাফিয়ে উঠে বলল, আবে গুরু, বউটা কড়া দেখতে মাইরী।

—বড় হলে সা মেয়েটা যা হবে। কেষ্টু জুলজুল চোখে তাকাতে লাগল।

বহনা হতাশ সুরে বলল, আর জন্মে যেন সাপুড়ে হই গুরু।

অদ্ভুত বাচনভঙ্গী বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল সাপুড়ের। কিন্তু লছমনিয়ার দিকে এক সঙ্গে ঠেরিয়ে তাকাতে আর হাসতেই সব স্পষ্ট হয়ে গেল।

—তুহারদের মতলব ভাল নাই। তুহারা জানবার আছিস। হঠ্ যা হঠ্ যা—

—মাইরী কি বলছে গুরু। কিচেন করে দেব নাকি?—জগা বেশীক্ষণ রাগ পুষে রাখতে পারে না।

—পেটে গজ পুরে দেব শালাকে। বহনা এই কাজ করতে গিয়েই ছ'মাস হাজতে ছিল।

—শহরের সেরা আদমী মাফিক কথা বটে। তুহারা জানবার আছিস। হঠ্ যা হঠ্ যা—

—চোপরও উল্লু কাঁহাকা! চোখ দুটোকে প্রচণ্ড করে সিধু কোমরের ছুরিতে হাত দিল।

কেষ্টু বলল, মাইরী কোথাকার এক সাপুড়ে এসে পাড়ায় ইজ্জত নিয়ে চলে যাবে, এ্যা!

চোখের পলকে বাঁশী ফেলে ঝুড়িটা তুলে নিল বাপসি।

—আ যা হামার শঙ্খিনী, খা খা ডঙ্কিলারে খা, জানবারকে খা। পালাচ্ছিস কুথা? আ হাঃ হাঃ হাঃ—

কেষ্টু জগা বহনা ইত্যাদি এ ধরনের প্রতি-আক্রমণের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। সিধু বলল, বোম্ ছাড়া সুবিধে হবে না। ব্লাকে এক হাত লিতাম।

বহনা বলল, শঙ্খিনী সাপের কাছে পেয়ারী নয় মাইরী। চ' কেটে পড়ি—

—ছেড়ে দাও গুরু। সাপুড়ে আর আমরা? ইজ্জত নিয়ে কথা।—দোতলায় দাঁড়ানো দ্বিতীয় বাড়িকের এক মেয়ের দিকে তাকিয়ে কেষ্টু বলল।

কথাটা ঠিক। তাছাড়া তখনি জরুরী কাজ হাতে থাকায় কালবিলম্ব না করে যে যার কেটে পড়ল। পেছনে হিন্দুস্থান পার্ক জুড়ে বাপসি সর্দারের বুনো হাসি বিষ ছড়াতে লাগল।

অনন্ত চ্যাটার্জীর ছোট শরীরটা জুড়ে হরেক রকম রোগ। অজীর্ণ, বাত, ডায়বেটিস। গৃহ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পথ্য। একবেলা তো বটেই, সম্ভব হলে দুই বেলাই হালকা পায়ে ভ্রমণ। এই সময় কোন রকম দুশ্চিন্তা মাথায় ঢুকবে না। মন প্রফুল্ল রেখে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে হবে। বড় বৌমা নিজে মার্কেটিং-এ গিয়ে কিনে এনেছে সাদা হাফ প্যান্ট, পশমের চেন টানা জামা, কেটস্ জুতো।

খুব ভোরে ফুটপাথে নেমেই অনন্তবাবু দেখতে পেলেন রাস্তার ঠিক মাঝখানে ঝুড়িটা। চোখটা সভয়ে বুলোলেন। না, কোথাও সেই বুনো মানুষগুলিকে দেখা যাচ্ছে না। চার পাশে গাছপালা লাগিয়ে ভারী মুশকিলে পড়া গেছে। যাকগে, ডাক্তারের উপদেশ মনে পড়ায় ঝুড়িটার সঙ্গে দ্রুত ব্যবধান তৈরী করতে লেগে গেলেন। পকেটে একটা কমলালেবু থাকে। লেকটাকে একবার পাক দিয়ে সেই বেঞ্চটাতে বসে ফোকলা দাঁতে ভিটামিন সি চোষেন। আজ কিছুই ভাল লাগল না। সূর্যের আলো প্রবেশ না করা গভীর বনের মানুষ এরা। যাড়ুক জানে। বিষ দাঁত না ভাঙা ছোবল নিতেও পারে বুক পেতে। মনে কি আছে কে জানে। ছেলেপুলে নিয়ে বাস করি!

ফেরার পথে বাড়ির সামনে লোকজনের ভিড় দেখে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কাছে আসতেই নিশিরবাবু বলে উঠলেন, তামাশাটা দেখলেন মশাই? সাপ খেলে পালিয়েছে।

—আছে কোথাও কাছে পিঠে। অনন্তবাবু নিজেকেই আশ্বস্ত করতে চাইলেন।

—টিকি দেখা যাচ্ছে না মশাই। পাড়ার ছেলেরা পুলিশের ভয় দেখিয়েছে অমনি হাওয়া। অরবিন্দবাবু ঠিক বলেছেন। কেরার আসামী। বুনো ওলো ছদ্মবেশ। শিশিরবাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

আপাত নিরীহ ঝুড়িটা ক্রমশই লোক ডেকে আনছে। পথচারীরাও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বারো হাত শঙ্খিনীর পরিণতি দেখবার আশায়। পাড়ার মস্তানরা যথারীতি ছুটে গেছে। কিন্তু মস্তানী করতে ভরসা পাচ্ছে না। জগা বলল, মাইরী, হিস্ হিস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু।

—কাছে যাসনি। বিষ ছাড়ায় নি। লোকটা তো ভারী টেঁটিয়া!

বহ্না বলল, বেজ ঝুড়ির ওপর মাল ঝেড়ে।

—খবরদার। ফসকালে সাপটা তোকেই তেড়ে আসবে। খা হাতি পর্যন্ত ভয় খায়।

—বউটা মাইরী ডাকুন! —কেতু জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল: খা, খচ্চরের হাতে পড়েছে। ভায়া থাকলে শুধু সীওর কলার চেপে ধরত।

সতীশবাবুকে আসতে দেখে রিটায়ার্ডরা চঞ্চল হলেন।

—ওর মধ্যে নাকি কোলা ব্যাং আছে, কাইণ্ডলি ঝুড়িটা তুলুন না?

সতীশবাবু যেন শুনতে পাননি; বললেন, আগেই বলেছি লোকটা বোয়ালুয়েটি। শিগ্‌গীর থানায় রিং করুন।

রঘুবীরবাবু হাতের ছড়িটা তুলে দেখালেন, দেখেছেন ঝুড়িটা কেমন ওঠানামা করছে? এদের গায়ে দারুণ শক্তি মশাই। সাতটা পাঁচ দিতে পারলে বাঘ পর্যন্ত কাহিল।

মিঃ এন. চক্রবর্তী বললেন, যতই ইলেকট্রনিক যুগ আসুক, ভারতবর্ষে এখনো তন্ত্রমন্ত্রের সাধনা টিকে আছে।

—ঠিক বলেছেন। এরা যেমন মানুষের উপকার করতে পারে তেমনি সর্বনাশও। এইসব বুনো লোকদের চটানো ঠিক নয়।

—আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম কি—এগিয়ে এলেন শিশিরবাবু: চাঁদা তুলে বরং খেলাটা দেখানো হোক। বেচারা বিষ্ নিয়ে সাপটা ধরে এনেছে।

—আমিও সেটা ভেবেছিলাম—মিঃ চ্যাটার্জীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে: তাহলে সাপটা ফেলে রেখে যেত না। মশাই ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি—

কথাবার্তার ফাঁক দিয়ে বেলা বেড়ে যেতে লাগল হু-হু। সেই সঙ্গে ভিড়। পুলিশ রাইফেলে গুলী ভরে জায়গাটা কর্ডন করে দাঁড়িয়েছে। বেশ বেলায় পুলিশ কমিশনারের জরুরী অনুরোধ পেয়ে চিড়িয়াখানা থেকে দু'জন মাইনে করা সাপুড়ে এল। হাতে লাউ বাঁশী, মাথায় হলুদ পাগড়ী। মুখ শুকিয়ে গেলেও বাইরে সেটা বুঝতে দিল না। বাড়িগুলির চেহারা দেখে বুঝল, এখানে কেরামতি দেখাতে পারলে মোটা বকশিস। একজন বাঁশী বাজাতে লাগল, অন্যজন দেরা আদমীদের দিকে চোখ রেখে বিড় বিড় করে মন্ত্রের ঘটা লাগিয়ে দিল।

বাঁশীর সুর তীব্র হল এক সময়। মন্ত্র পড়তে পড়তে ঝুড়ির খুব কাছে গেল লোকটা। এই প্রথম পুলিশকে লাঠির সাহায্যে ভিড় সরাতে হল না। নিজে থেকেই দূরে সরে গিয়ে আতঙ্কিত দৃশ্য দেখবার জন্য প্রস্তুত হল। আশ্চর্য, হ্যাচ্‌কা টানে ঝুড়ির ডালাটা খুলে ফেলতেই, শঙ্খিনী লাফ ঝাঁপ হাত লাফিয়ে বেড়ে এল না। তার বদলে একে একে বের হতে লাগল পুরোন শাড়ি, আটার রুটি, রবারের বল—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ মন্তব্যে চমকে ফিরে তাকাল সবাই। মুখে পাইপ সিল্‌কের থেলি হাতে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে কখন স্যার বি. এম. পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রবল হাসির ছোবলের মধ্যে বাঁশী হাত শঙ্খিনী সাপটাকে স্পষ্ট দেখা গেল এবার।

বিচিত্র বীন

শিশির মজুমদার

খবর এসে পৌছাল যখন তখন প্রায় বেলা পড়ে এসেছে।

দারোগা মুনেশ্বর সিং চৌকিদারকে ধমক দিলেন।

—এতক্ষণ করছিলি কি? লাস দেখার সাথে সাথেই খবর দিতে পারিস নি?

চৌকিদার হাত কচলে বলল—আজ্ঞে আসছিলামই তো হজুর—কিন্তু সরপঞ্চ যে আগে যুগল-প্রসাদকে গ্রিফ্‌তার করতে বলল।—তাইতো যত গোলমাল···।

—যুগলপ্রসাদকে গ্রিফ্‌তার করা হয়েছে! অবাক হলেন মুনেশ্বর সিং।—কেন সরপঞ্চ কি দারোগা বনেছে নাকি!

না হজুর—যুগলপ্রসাদ ভাগবার তালে ছিল। গ্রাম সুদ্ধু সবাই বলছে—ওই নাকি বনবালাকে খুন করেছে।

—কিসে বুঝল তারা?

—কাল হাটের মাঝে গ্রাম সুদ্ধু লোকের সামনে দুজনে ঝগড়া করেছে হজুর।—এ খবর কে না জানে!

এ খবর শুনে একটু গম্ভীর হলেন মুনেশ্বর সিং।

···নাঃ যেতেই হবে তাহলে ··আচ্ছা জ্বালালে যা হোক। কোথায় ভেবেছিলেন এখন সন্ধ্যে বেলা একটু বসে গান বাজনা করবেন। না ··এখন ছোট বন বাঘাড় ভেঙে···ঘোড়ার পিঠে।

—হাওলদার! হাঁক পাড়লেন তিনি।

হাওলদার এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

—ঘোড়া তৈয়ার করতে বল···আর দেখ·· তুমিও দুজন কন্‌ষ্টেবল নিয়ে সঙ্গে চল।

—জী হজুর। বলে হাওলদার তৈরী হতে গেল।

খুন!—না আত্মহত্যা?

মুনেশ্বর সিং বসে বসে ভাবতে লাগলেন। এও তো হতে পারে—মেয়েটা হয়ত মনের কোন দুঃখে—সেচ্ছায় বাঁধের ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে। সুবিধা হয়েছেও তাই। কিন্তু কোথা থেকে ঐ যুগলপ্রসাদ এসে এমন সুন্দর সম্ভোটাকে দিল মাটি করে।

—ঘোড়া তৈয়ার হজুর। দরজার কাছ থেকে হাওলদার কামতাপ্রসাদ খবরটা দিল।

—চল তাহলে। আর দেরী নয়।

মাইল দুয়েক পথ ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে অন্ধকার হয়ে গেল। গ্রামের বাইরে সরপঞ্চ তার দলবল নিয়ে আলো হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। হুজুরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। মুনেশ্বর সিং নামলেন।

—কে সরপঞ্চ এ গাঁয়ের? ঘোড়ার লাগাম হাওলদারের হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি হুজুর। সরপঞ্চ এগিয়ে এসে সেলাম বাজাল।

—লাস কোথায় পড়েছে—চল দেখাবে চল।

—একটু বিশ্রাম করবেন না হুজুর।

না এখন বিশ্রাম নয়। এনকোয়ারী খতম হয়ে গেলে না হয় একটু বসে যাওয়া যাবে।

সরপঞ্চ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সঙ্গে চলল আরখানা গ্রাম। এমন কাণ্ডতো রোজ ঘটেনা। হাজোগা হুজুরের পায়ের ধুলো কম কথা নয়!

অনেকখানিক পথ। গ্রাম ছাড়িয়ে তারপরে মন্দির। সে কোন আমলে পঞ্চপাণ্ডব বানিয়ে দিয়েছিল—এখন ভেঙে পড়েছে। সরকারী নীল নোটিশ গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের লোকেরা যা পারে পুজো দেয়। দেবতা বলে কথা।…তাও পার হয়ে গেলে তবেই রাজা বাঁধ। এ বাঁধও নাকি পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যম পাণ্ডব ভীম নিজের হাতে বানিয়ে ছিলেন। কে জানে কোন যুগে।

অন্ধকারের মাঝেও মুনেশ্বর সিং বুঝতে পারলেন—মন্দির আর বাঁধের অবস্থা জীর্ণ হয়ে এসেছে। দুই ভেঙে পড়বে একদিন—তারও আর বেশী দেরী নেই। তখন আর এমন করে ওঁকে ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে আসতে হবে না দুর্গা লালের খবর নিতে।

—আগে বাঁধের উপুরে যাবেন না হুজুর—আগে নীচে? সরপঞ্চ জিজ্ঞাসা করল।

—কেন উপুরে আবার কি আছে?

—আজ্ঞে হুজুর—বনবালার বেলওয়ারী চুড়ির কতগুলো টুক্‌রো বাঁধের ধার ঘেঁসে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

—তাই নাকি!

—হাঁ হুজুর। খবর পেয়েই আমি আর চৌকিদার দুজনে এসে বাঁধের চারদিকটা খুঁজে দেখতে গিয়ে ওগুলো দেখি।

আবার একটু ভাবনায় পড়লেন মুনেশ্বর সিং। তবে কি সত্যিই কেউ ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টার চিহ্নস্বরূপ ঐ চুড়ির টুক্‌রোগুলো।

—লাস কোথায় আগে তাই দেখাবে চল। বললেন মুনেশ্বর সিং—তারপর না হয় উপুরে যাওয়া যাবে।

ভেঙে পড়া বাঁধের পাশ ঘেঁষে আঁকাবাঁকা পথ উঁচু-নিচু হয়ে বাঁধকে বেড় দিয়ে গেছে জলার দিকে।—সেই পথ বেয়ে সবাই পৌঁছাল জলার ধারে। একটু দূরে কজন লোক বসে জটলা করছিল—এদের আসতে দেখে তারা উঠে দাঁড়াল।

—ওরা কারা? মুনেশ্বর সিং প্রশ্ন করলেন।

সরপঞ্চ বলল—হুজুর আমার হুকুমে ওরা লাস পাহারা দিচ্ছে। নইলে হয়ত শেয়াল শকুনে ছেঁড়াছেঁড়ি করবে।

সামনে এসে দাঁড়াল সকলে।

সরপক হাতের আলো এগিয়ে ধরে বলল—এ ঝুখন লালের উপুর থেকে কাপড় তুলে নাও হজুর দেখবেন।

ঝুখন ডোম এগিয়ে এসে যত্ন সেলাম করে কাপড় তুলে নিয়ে সরে দাঁড়াল।

মুনেশ্বর সিং দেখলেন—দেখলেন বছর কুড়ি বাইশের এক দেহাতী মেয়ের লাস সামনে পড়ে আছে। এমন ভাবে দেহটা পড়ে আছে দেখলেই বোঝা যায় উঁচু জায়গা থেকে পড়ার ফলেই মৃত্যু। আধা ভালগোল পাকান দেহটার চার পাশ ঘিরে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। সেই রক্তের মাঝে বিচিত্র এক ভঙ্গি করে পড়ে আছে মেয়েটা। এমন অনেক দেখেছেন মুনেশ্বর সিং। তবুও মনের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। কিন্তু ভুললেন না তিনি দারোগা। ভাল করেই দেখলেন সব খুলিশি খুঁটি নিয়ে। মেয়েটার বয়সই শুধু কম নয়—রূপও ছিল দেহ ভরা···তাছাড়া···যৌবন। এমন একটা দেহাতী ডুকরীকে নিয়ে খুন খারাবী হয়ে যাওয়া—কিছু নতুন ঘটনা নয়।

—আচ্ছা হয়েছে দেখা। এবার চাপা দাও। বলে সরে এলেন তিনি। লালের একটু ঘুরেই লণ্ঠনের আলোতে কি যেন চিক চিক করে উঠল। নজর এড়াল না মুনেশ্বর সিং-এর। নিচু হয়ে জিনিষটা তিনি হাতে তুলে নিলেন। এক টুকরো বেলওয়ারী চুড়ি ভাঙ্গা।

—আলোটা একটু তুলে ধর তো। হুকুম দিলেন মুনেশ্বর সিং।

আশপাশে আরও অনেকগুলো চুড়ির টুকরো চিকমিক করে উঠল। দু একটা তার তুলে পকেটে রাখলেন তিনি। কোন সন্দেহ নেই এগুলো ঐ ডুকরিটার সাথেই নিচে পড়েছে।

আশপাশটা একটু ভাল করে দেখবেন বলে একটু উঁচু জায়গাতে উঠে এলেন তিনি।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সামনেই বিশাল জলা। যে নদীর গতি বন্ধ করবে বলে বাঁধ তোলা হয়েছিল—সে নদী আজ আর নেই। সে বাঁধও নেই। আছে ঐ বন্ধ বিশাল জলা আর এই একপাশ খাড়া মাটির পাহাড়। কালের স্রোতে দুয়েরই আজ কি ভীষণ দুর্দশা। জলা আর বাঁধের মাঝখানে যে একটুখানি পাড়—তারি ওপরে পড়ে আছে মেয়েটার দেহ। এত সুন্দর জায়গায় একি বিতৎস কাণ্ড। আর সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে সাহস হল না ওঁর। জল নাবা বাঁধের বুকে—ঝোপ জঙ্গল—আগাছার তো শেষ নেই আর। এসব জায়গায় সাপের ভয় থাকতে পারে।

তাড়াতাড়ি নেবে আসতে যাবেন···এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন—কোথায় যেন কে বাঁধের ওপরে কোনখানে কি একটা অদ্ভুত যন্ত্র বাজাতে সুরু করেছে। থমকে দাঁড়ালেন উনি।—বীন। বিচিত্র বীন। এ যন্ত্র ওর ভাল করেই চেনা। আওয়াজটাও ওঁর পরিচিত। অবাক হলেন মুনেশ্বর সিং দারোগা। বড় অদ্ভুত তো। এত রাতে এমনি জংলা জায়গায়—এত বিতৎসতার মাঝখানে—এ সখ আবার জাগল কার! পাগল নাকি লোকটা!···না না·····পাগলের হাত দিয়ে তো এমন মিঠে আওয়াজ বার হবে না। এতো গুণী। পাকা ওস্তাদ। সুরের স্নিগ্ধ-স্নিগ্ধ গন্ধকে সারা আকাশ বাতাস ভরে তুলেছে।— সাধক বুঝি লোকটা। তাই এমন জায়গা বেছে নিয়েছে—সাধনার জন্য। বাঃ বাঃ!

ওঁর সেরী দেখে—সকলে উঠে এল উপরে। সরপক বলল,

—হজুর নিচের কাজ তো মিটেছে। এবারে উপুরে চলুন। এদিক দিয়েই পথ।

—কে ওখানে অমন করে বাজনা বাজাচ্ছে?

—ওতো আমাদের মিশিরজী হজুর।

—কেওয়ানা !

—না না হুজুর বড় গুণীন।

—এখানেই কি রোজ এসে বাজনা বাজায় নাকি ?

—জী হুজুর। তবে আজ বোধহয় মিশিরজীর মনটা তেমন ভাল নেই। তাই ওর হাতের বাজনা আজ অমন কাঁদছে।

—কেন কি হয়েছে ওঁর ?

ঐ মেয়েটাকে মিশিরজীও খুব ভালবাসত হুজুর।

—কই সে কথা তো আমাকে আগে বলনি !

ধমকে গিয়ে মুনেশ্বর সিং প্রশ্ন করলেন।

সম্ভ্রমের সাথে সরপক বলল—

—মিশিরজীর বয়স হয়েছে হুজুর। তাছাড়াও অমন মানুষ হয় না। আমরা গাঁ সুদ্ধু সবাই ওকে ভক্তি করি।

—হুঁ। আচ্ছা চল উপরে চল।

বাজনা তখনও সমানে বেজে চলেছে। আকাশ বাতাস তারই সুরে ভরপুর। এ পৃথিবী যেন আর পৃথিবীই নেই—মনে হল মুনেশ্বর সিং দারোগার। এতটা পথ ছুটে আসার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে ওর। এমন একজনের দেখা পাওয়া সে তো ভাগ্যের কথা।

বাঁধের ওপরে উঠে এসে একটু দাঁড়ালেন উনি। এখন এগিয়ে গিয়ে—অমন লোকের ধ্যান ভেঙে দেওয়া উচিত হবে না। সে হবে পাপ। ঐ মেয়েটাকে খুন করার পাপের থেকেও বেশী।

মুনেশ্বর সিং ভুলে গেলেন তার দায়িত্বের কথা। ভুলে গেলেন কয়েক জোড়া চোখ ওর দিকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে রয়েছে—তার বিচারের আশায়। ভুলে গেলেন উনি—হুজুর। থানার দারোগা। ডিউটি !—সারা পৃথিবীর সব কাজ ওর সাধনার সামনে থমকে থাকতে পারে যুগ যুগান্তর ধরে—কোনও ক্ষতি হবে না তাতে।

সুরের সাথে চাঁদের আলোর খেলা চলছে তখন। বাতাসের ঢেউ লেগেছে তাতে। তারই দোলায় দুলে উঠেছে সমস্ত বিশ্ব।

মুনেশ্বর সিং দারোগার মন থেকে মুছে গেল সব বিভৎসতা। মুছে গেল সব রক্ত সব সন্দেহ। সুর আর সুর। বড় করুণ গুণীর যন্ত্রে। ব্যাথার সুরে দিক্‌দিগন্ত কাঁদিয়ে তুলেছে। এ যেন মিশিরজীর বুক চেরা কান্না করা গান।

হঠাৎ সব থেমে গেল। শুধু সুরের রেশ কিছুক্ষণ সবাইকে শুদ্ধ করে রেখে দিল। সবার আগে হুঁস ফিরে এল সরপকের। ডাকা এগিয়ে ডাকল—

—মিশিরজী। ও মিশিরজী। থানা থেকে হুজুর এসেছেন। আর আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকাল মিশিরজী।

মুনেশ্বর সিং চমকে উঠলেন।—একি। গুণী অন্ধ। অন্ধ চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা নেবে এসেছে। অমন করে যে বাজাতে পারে তার চোখে তো জল থাকবেই। এ আর এমন কথা কি। কিন্তু গুণী অন্ধ !

—হুজুর নমস্তে। মুহূর্তে জোড় করল মিশিরজী। এ যেন কেমন ভাল লাগল না মুনেশ্বর সিং দারোগার। এত বড় গুণী তাঁর কাছে থানার দারোগা। ছি ছি।

বললেন—আপনার হাত ভারি মিষ্টি মিশিরজী। আমার ভারি ভাল লেগেছে।

—আজ আমি সেরা বাজনা বাজালাম হুজুর।

—সে কি!—কেন! অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মুনেশ্বর সিং।

—হুজুর আমার বীণার সব তার ছিঁড়ে গেছে।

—এ কথার মানে?

হাসল মিশিরজী। অদ্ভুত সে হাসি।

—রাত অনেক হল হুজুর। আপনারও তো অনেক কাজ। হুকুম হয় তো এবারে আমি যাই।

মুহূর্তে বাস্তব জগতে ফিরে এলেন মুনেশ্বর সিং দারোগা। সত্যি তো তদন্তের এখনও অনেক বাকী। যুগলপ্রসাদকে এখনও তো জেরাই করা হয় নি!

—আচ্ছা আসুন আপনি।

নমস্কার করে মিশিরজী চলে গেল।

—হ্যাঁ কোথায় যেন কি দেখাবে বলেছিলে জিজ্ঞাসা করলেন উনি।

—হুজুর আরও একটু এগোতে হবে ঐ পথটার ধারে। যেখানে বসে মিশিরজী এতক্ষণ বাজাচ্ছিলেন।

লণ্ঠনের আলোয় অনেকক্ষণ ধরে তন্নতন্ন করে জায়গাটাকে দেখলেন মুনেশ্বর সিং। চুড়ির টুকরো গুলো ছড়িয়েই আছে চারদিকে। কোন সন্দেহ নেই। মেয়েটা বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। ভাঙা টুকরোগুলো তারই প্রমাণ। কিন্তু একি! সারা জায়গাটা জুড়ে কোথাও আর এমন কোন বিশৃঙ্খলা নেই যা দিয়ে ওই প্রমাণকে দাঁড় করানো যায়। একটা কুটোও এদিক থেকে ওদিকে হয় নি। একটা ঝোপ বাড়ের ডালও ভাঙে নি। মেয়েটা কি লড়েছে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়েই। তাকি সম্ভব। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। মুনেশ্বর সিং সত্যি একটু ভাবনায় পড়লেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা। দুর্ঘটনার পর কি এখানে বহু লোকের আনাগোনা হয়েছে। এ চুড়ির টুকরো তো তাদের কারও হতে পারে!

—না হুজুর না। ব্যস্ত হয়ে সরপঞ্চ বলল!—আমার পক্কা হুকুম ছিল। পাহারাদার ছাড়া আর কেউ এদিকে আসেনি হুজুর। আমি হলপ করে বলতে পারি। এ চুড়ি ওরই হাতের হুজুর।

—হুঁ।

সরপঞ্চ বলল—হুজুর বাঁধের ঠিক এই জায়গাটায় এখনও সাবেক কালের মতন খাড়া আছে। ধসে যায় নি। এখান থেকে পড়লে কারও আর নিস্তার নেই। সোজা পড়বে গিয়ে জলায় পাড়ে। যেমন বরবাদ পড়েছে।

সাবধানে ঘাড় অবধি গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন উনি। অস্পষ্ট অন্ধকারের মাঝে কাপড় ঢাকা বিভৎস মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে।—খুন। নিজের মনেই একথাটা নিজেকে স্পষ্ট করে শুনালেন দারোগা মুনেশ্বর সিং।

—এখানকার কাজ আমার মিটেছে।—সরপঞ্চের দিকে তাকালেন উনি—এখন ঘুগলপ্রসাদের খবর নিতে হবে। তার ব্যবস্থা কর।

চলুন হুজুর পঞ্চায়েতের বৈঠকে।

চলে যাবার আগে শেষ বারের মতন পিছন দিকে ফিরে তাকালেন মুনেশ্বর সিং। চাঁদের আলোয় নাচ সুরু হয়েছে জলের চেউয়ে।—এখানেই তো গুণী বীনকারের হাতের বীন বাজবে এমন করে। তার ঐ সুরের নেশা আর এই বিচিত্র পরিবেশের জন্য আর একবার ওকে এখানে ছুটে আসতে হবে।

ঘুগলপ্রসাদকে সামনে এনে দাঁড়করাতেই ও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল!

—হুজুর মাই বাপ। আমি এ খুনের কিছুই জানি না হুজুর। আমাকে ছেড়ে দেবার হুকুম হোক।

—এই ও। গর্জন করে উঠলেন, দারোগা সাহেব।

—চুপ কর। চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব।

—হুজুর মাই বাপ।

—যা জিজ্ঞাসা করি তার ঠিক ঠিক জবাব দে। মিথ্যা বলবি না।

—না হুজুর আমি যা জানি তা ঠিক বলব।

—বনবালাকে তুই চিনতিস্?

—হ্যাঁ হুজুর। ওর সাথে আমার রোজ দেখা হত।

—কথাবার্তা বলতিস্?

—আমি বলতে চাইতাম হুজুর—ও কিন্তু মুখ ফিরিয়ে চলে যেত হুজুর!

—কেন! কি কথা তুই বলতিস্ ওকে!

—সাদির কথা হুজুর।

সাদির কথা। অবাক হলেন না মুনেশ্বর সিং। যা ভেবেছেন ঠিক তাই। কেসটা যে শেষ পর্যন্ত এতই সহজ হবে তা উনি বুঝতেই পেরেছিলেন।

—বনবালা তোর কথা শুনে কি বলত?

—ও কিছু বলত না হুজুর! ও ভাবত আমিও এ গাঁয়ের আর পাঁচটা ছোকরার মতন শয়তান। লুচ্চা।—

—জিভ ছিঁড়ে নেব তোর। আচমকা গর্জন করে উঠল সরপঞ্চ।

—হুজুরের সামনে মিথ্যা কথা। এ গাঁয়ের নামে মিথ্যা বলার তুই কে রে।

আবার জট পাকাল নাকি! ভাবলেন মুনেশ্বর সিং। না জ্বালালে দেখছি। একটু রাগ করেই বললেন:

—তুমি থাম সরপঞ্চ! যা কথা বলার আমাকে বলতে দাও।

—হুজুর মাফ করবেন। বিনিতভাবে উত্তর দিল সরপঞ্চ ওর সব কথা মিথ্যা হুজুর।

—সে আমি বুঝব। তুমি চুপ কর।

—এ গাঁয়ের ছেলেদের সাথে মেয়েটার বনিবনা ছিল না?—ঘুগলপ্রসাদকে প্রশ্ন করলেন মুনেশ্বর সিং।

—না হুজুর। ওরা মেয়েটার ধর্ম নেবার ফিকিরে ছিল হুজুর।

সরপঞ্চ আবারও চেঁচিয়ে উঠল।

—সব মিথ্যা কথা হুজুর। সব মিথ্যা কথা।

—যুগলপ্রসাদ হাত জোড় করে বলল,

—আমার একটা কথা শুনে তারপর আমার বিচার হোক হুজুর।

—বেশ বল, কি বলতে চাও তুমি।

—আমি তীন গাঁয়ের লোক। এ গাঁয়ে আমার তেজারতীর ব্যবসা। গাঁ সুদ্ধু সবার হাল বলদ আমার কাছে বাঁধা পড়েছে হুজুর। তাই ওরা ষড়যন্ত্র করে আমাকে ফাঁসিয়েছে।

—তা নয় বুঝলাম। মুখ তুলে তাকালেন মুনেশ্বর সিং কিন্তু তাই কি তুই হাটের মাঝখানে বনবালার সাথে ঝগড়া করিস নি?

মুখ শুকিয়ে গেল যুগলপ্রসাদের। কোনমতে বলল,

—করেছি হুজুর।

—তবে! তবে! সরপঞ্চ খুশীতে ফুলে উঠল। হুজুরকে কি তুই বুদ্ধু পেয়েছিস যে যা বোঝাবি তাই বুঝবেন।

—তুমি থামবে! ধমকে উঠলেন মুনেশ্বর সিং।

—কেন তোদের ঝগড়া হয়েছিল কাল। শুনি।

—ও আমাকে যা নয় তাই বলে অপমান করেছিল হুজুর।

—তুই ওকে শাসিয়ে ছিলি তখন।

—হ্যাঁ হুজুর। বলেই হঠাৎ দারোগা সাহেবের পা দুটো দুহাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল ও।

—তার সাথে এ খুনের কোন সম্বন্ধ নেই হুজুর।

—সে আমি বুঝব। যাও এখন বাইরে গিয়ে বস।

যুগলপ্রসাদ সরে যেতেই হুকুম দিলেন মেয়ের মাকে নিয়ে আসবার।

তাকে শুনেই বুড়ি মেয়ের শোকে নতুন করে ডুকরে কেঁদে উঠল।

—হুজুর আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

এ কান্নার কান না দিয়েই মুনেশ্বর সিং জিজ্ঞাসা করলেন:

—তোমার মেয়ের বিয়ে দাওনি কেন?

—হুজুর এ গাঁয়ের ছেলেগুলো সব পাজি আমাকে টাকা না দিয়েই বিয়ে করতে চায়।

—কত টাকা চেয়েছিলে তুমি?

—পাঁচ কুড়ি টাকা হুজুর—এ আর এমন কি বেশী। দুকুড়ি আমার ভাগড়া ছিল হুজুর। ওমনি লোটার লোভে তাও কেউ দিল না।

সরপঞ্চ খিঁচিয়ে উঠল এ বুড়িও কম পাজি নয় হুজুর। দিন রাত মেয়েকে খাটিয়ে নিজে বসে বসে খেত। মেয়ের বিয়ে দিলে পাছে নিজেকে খেটে খেতে হয় তাই টাকা বেশী চেয়ে ও বুড়ি সবাইকে ভাগিয়েছে। নইলে পাঁচ কুড়ি টাকা কি কম হল হুজুর।

বুড়ি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—

—ওর মুখে পোকা পড়বে হুজুর। ও নিজেই আমাকে পাঁচ কুড়ি টাকা দিতে চেয়েছিল। শুধু ওর বয়স আর মেয়ের যোয়ানীর কথা ভেবেই না আমি রাজি হইনি। তাই ওর রাগ।

—তার মানে! মুনেশ্বর সিং-এর কপালে কুঞ্চন উঠল।

—সরপঞ্চ নিজেই তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? ঠিক বলছ তুমি?

হ্যাঁ হুজুর। কিন্তু ওর স্বভাব চরিত্তিরের কথা কে না জানে এ গাঁয়ে। তাই আমি রাজি হইনি।

মুনেশ্বর সিং সরপঞ্চের মুখের দিকে তাকালেন। একটু যেন গুটিয়ে গেল সরপঞ্চ সে চাহনীর সামনে। সামলে নিয়ে বলল একদম বাজে কথা হুজুর। এ গাঁয়ে এর কেউ সাক্ষী আছে? দুঃখে বুড়ির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কি বলতে কি বলছে।

এ কথায় কান দিলেন না মুনেশ্বর সিং। বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—তোমার কাউকে সন্দেহ হয় বুড়ি?

—হয় হুজুর।

—কাকে?

—এ গাঁয়ের সবাইকে হুজুর। সবাই ওর ধর্ম নষ্ট করার ফিকিরে ছিল।

—কি বাজে কথা বলছ। ধমকে উঠলেন মুনেশ্বর সিং।

—যুগলপ্রসাদকে সন্দেহ হয় তোমার।

স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করলেন উনি।

—না হুজুর। ও মানুষটা ভাল। আমার দরকার হলেই ও লুকিয়ে কত টাকা দেয় আমাকে। ও আমার মেয়ের কোন ক্ষতি করেনি হুজুর।

—তুমি যে ওর কাছ থেকে টাকা নিতে সে কথা তোমার মেয়ে জানত?

ওরে কোন দিনও বলিনি হুজুর। মেয়ের যা রাগ। ও দুচোখে কোন দিনও দেখতে পারত না মানুষটাকে।

—তোমার মেয়ের সাথে কাল যে ওর ঝগড়া হয়েছিল তা তুমি জান?

—জানি হুজুর। তবুও বলব ও মানুষটার দয়া ধর্ম আছে। আমার মেয়ের ও কোন ক্ষতি করতে পারে না হুজুর।

সরপঞ্চ সুযোগ পেয়ে বলল,

—আমার সাক্ষী কিন্তু একেবারে অন্য কথা বলবে হুজুর। হুকুম হয় তো তাকে এবারে আনা যেতে পারে।

—আনো তোমার সাক্ষী। দেখি সে কি বলে।

বললেন মুনেশ্বর সিং।

হাফ ডাকের চোটে কাঁপতে কাঁপতে বছর পনের ষোলোর একটা ছেলে এসে দাঁড়াল সামনে। মাটি অবধি ঝুঁকে সেলাম বাজিয়ে বলল,

- হুজুর আমি রোজ গরু চরাই ঐ বাঁধটার ধারে। আমার নাম বরমবীর।

—কি দেখেছ তুমি। জিজ্ঞাসা করলেন মুনেশ্বর সিং।

—আমি আজ সকালে হাটে গেছিলাম গরুর ভুষি কিনতে। পথে দেখলাম ঘুগলপ্রসাদ আর বনবালা দুজনে খুব ঝগড়া করছে।

—কি বলছিল ঘুগলপ্রসাদ ?

—ঘুগলপ্রসাদ বলছিল, তোকে আমি খুন করে ফাঁসি যাব বনবালা। আমি তোর ব্যাবহার আর সহ্য করতে পারছিনা।

—ঠিক শুনেছ তুমি একথা !

—জি হুজুর। আমি খুব কাছেই ছিলে পড়েছিলাম ওদের।

—তুমি কিছু বলনি ঘুগলপ্রসাদকে ?

—না হুজুর। সে আমার মহাজন। তবে আমি কোন কথা বলিনি তাকে।

—এ কথা শুনে বনবালা কি বলল ?

—ও বলল, যা যা তোর মুরোদ আমার জানা আছে। আমি দাখি মারি তোর টাকাতে।

—তারপর।

—তারপর হুজুর আমি দুপুর বেলা বাঁধের ধারে গরু চরাচ্ছিলাম দেখলাম বনবালা বাঁধের উপুরে একলা দাড়িয়ে। অমন সময়ে ও জায়গায় কোন দিন যায় না হুজুর। আমি অবাক হয়েছিলাম।

—তারপর।

—কিছুক্ষণ পরে গরুগুলো বাঁধের ধার থেকে চলে আসাতে তখনি ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাব বলে আসছিলাম ··দেখলাম ঘুগলপ্রসাদ বাঁধের খা বেয়ে উপুরে উঠছে।

—তারপর কি হল ? ব্যস্ত হয়ে মুনেশ্বর সিং জিজ্ঞাসা করলেন।

—দুটো গরু ঘর মুখো হওয়াতে আমি তাদের নিয়েই ব্যস্ত হয়েছিলাম হুজুর তারপর কি হয়েছে আমি আর জানি না।

একটু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মুনেশ্বর সিং। তারপর বললেন—ব্যস ওতেই হবে। ডাক ঘুগল প্রসাদকে।

শুষ্ক মুখে ঘুগলপ্রসাদ ঘরে ঢুকল। মুনেশ্বর সিং চেঁচিয়ে উঠলেন—এবারে তুই কি বলবি যে···শুনি। কিরে চুপ করে রইলি যে।

কোঁচার খুটে মুছোচ্ছ মুছল ঘুগলপ্রসাদ। বলল আমাকেই দোষী ধরলেন হুজুর !

গর্জন করে মুনেশ্বর সিং একটা বিশ্রি গালাগাল দিলেন। বললেন—ধরমবীর যা বলল তার কি উত্তর দিবি তুই। শুনি।

—ও যা বলেছে সবই সত্যি বলেছে হুজুর।

—তবে ?

ঘুগলপ্রসাদ দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল :

—দিন হুজুর হাত কড়া। কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই।

—তবেই বেশুন হুজুর। সরপঞ্চ চেঁচিয়ে উঠল আমি আগেই বলেছি।

—কি বলছিস তুই ভেবে বলছিস তো ? তিক্ষ্ণভাবে ঘুগলপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে মুনেশ্বর সিং জিজ্ঞাসা করলেন।

—জানিস এর ফলে তোর কি শাস্তি হতে পারে।

—ফাঁসি হুজুর। হুজুর আমার জিন্দিগী এমনিতেই বরবাদ হয়ে গেছে।

—তবে তুই স্বীকার করলি সব।

—হাঁ হুজুর।

আসামীকে আর লাশ চালান দিতে রাত্রি অনেক হয়ে গেল। সরপঞ্চ বলল :

—আর কেন হুজুর বাকি রাতটুকু এখানেই থেকে যান। আপনার কোন অসুবিধাই হবে না। ঘরে গেলেন মুনেশ্বর সিং দারোগা। মনের একটা ইচ্ছার কথা জানালেন তিনি সরপঞ্চকে; বাকি রাতটুকু মিশিরজীর মিষ্টি হাতের মধুর আলাপ শুনে কাটাবেন। লোক ছুটল মিশিরজীকে খবর দিতে। খাওয়া দাওয়া সেরে একটা সিগারেট ধরিয়ে সরপঞ্চের ঘরের দাওয়ায় এসে বসলেন মুনেশ্বর সিং। সিগারেটে দুচার টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়েছেন—ধোয়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন কে যেন—রাস্তার ধারের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে—হাঁকলেন উনি।

—কে ওখানে?

লোকটা একটু এগিয়ে এল। আরে এ যে মিশিরজী।

—একি কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি? আমি তো এই রাত্র লোক পাঠালাম আপনার ওখানে। দেখা হয়নি। বয় আসেননি আপনার!

—ও বয় আর আমার হাতে বাজবে না হুজুর।

—ওহো ভুলেই গেছিলাম যে তার ছিঁড়ে গেছে।

—না হুজুর এ বীনকারের হাতে আর বীন বাজবে না কোন দিনও। অবাক হলেন হুজুর? একথা কি জানেন আপনি মনের মাঝে রাত্রিদিন যে বিচিত্র বীন আপনা থেকে বেজে চলেছে হাতের বীন তো শুধু তার প্রতিধ্বনী তোলে। আমার মনের বীনের তার ছিঁড়ে গেছে হুজুর। হাতের বীন আর তাই বাজবেনা।

—বনবালার মৃত্যুটা দেখছি আপনাকে খুব বেশী রকম আঘাত দিয়েছে।

—সে ছিল আমার সুর লোকের ছন্দ লক্ষ্মী। আমার বীন বাজত শুধু তারই পথ চেয়ে।

—খুব দুঃখ পেলাম আপনার কথা শুনে।

—আমি কিন্তু এসব কথা বলতে আসিনি।

—বেশ তো কি বলবেন বলুন।

—যুগলপ্রসাদ একেবারে নির্দোষ। আমি সাক্ষী তার।

—সে কি। মুনেশ্বর সিং চেয়ারের ওপরে সোজা হয়ে বসলেন।

—হাঁ হুজুর। রোজ সকালে বনবালা আসত আমার ওখানে বাজনা শুনতে। শুধু সকালে যেন, ও না এসে বসলে আমি বাজাতে পারিনা হুজুর আজকাল। আজ সকালে ও এল না। দুপুরে খুঁজতে বার হয়ে শুনলাম ও গেছে বাঁধের দিকে। বাঁধের উপরে পৌঁছে শুনি যুগলপ্রসাদ বলছে তুমি ভুল বুঝ না বনবালা। আমি ব্রাহ্মণ ডেকে ধর্মসাক্ষী করে তোমাকে বিয়ে করব। তোমাকে নষ্ট করার কোন মতলব আমার নেই। হুজুর মেয়েটা ছিল বড় দুঃখী। সবাই শুধু ওর কাছে স্বার্থের জন্যই আসত। ওর মা-ও ওর মনের কথা বুঝতে চাইতো না। যুগলপ্রসাদই ওকে প্রথমে ওর মনের মতন কথা শুনিয়েছে।

হজুর আমি সাক্ষী বনমালা দুগালপ্রসাদকে বলেছিল তুমি তবে মার টাকা মিটিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে যাও।

—কিন্তু দুগলপ্রসাদ যে তার দোষ স্বীকার করেছে।

—ও যদি নিজের মুখে এসব কথা বলত হজুর তবে কি আপনি বিশ্বাস করতেন। ও জানে না যে আমি ওর সাক্ষী।

—তবে দোষী কে।

—হজুর আমার হাতের বীন! মনের বীনের সুরের কি প্রতিধ্বনি তুলত কোন দিনও তা বুঝতে চেষ্টা করিনি। দুগলপ্রসাদ মনের আনন্দে চলে গেল। বনবালা গান গেয়ে নেচে উঠল। আমার মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল। ও তবে চলে যাবে ভীনগাঁয়ে। আমার বীন কি আর তাহলে বাজবে না কোনদিনও। আমি অন্ধ বলেই কি আমার এত সুখ সব নষ্ট হয়ে যাবে। এমন সময় বনমালা আমাকে দেখতে পেল। ছুটে কাছে এসে বলল, তোমাকেই আমি মনে মনে খুঁজছিলাম। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আমি বললাম, আমাকে ফেলে তুমি চলে যাবে। ও বলল, মাঝে মাঝে এসে তোমার বাজনা শুনে যাব দুজনে। মাঝে মাঝে আসবে শুধু। বাকি দিনগুলো তবে কাটবে আমার কি করে? ও বলল আমার নিজের ঘর হবে। নিজের মানুষ হবে। কোলে আসবে বাচ্চা—তাদের ফেলে হয়ত কদিন পরে আর আমি আসতেই পারব না। আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম—তুমি যেওনা বনবালা। আমাকে ফেলে তুমি চলে যেওনা। ও অবাক হয়ে বলেছিল, কি বলছ তুমি! আমি বললাম—তোমাকে নিয়ে এতদিন মনে মনে যে সুরের জাল বুনেছি আমি, এমনি করে তা তুমি ছিঁড়ে দিও না। ও ধমকে গিয়েছিল হজুর! বলেছিল, ছি ছি—তোমার মনেও পাপ। সরে যেতে দাও আমাকে। আমি দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলাম—আমি তোমাকে যেতে দেব না। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম হজুর। আমার এই নোংরা দুটো হাতের মাঝখানে আমি ওকে টেনে নিয়েছিলাম। ধরে রাখতে পারিনি হজুর। তখন কি জানতাম ধরে না রাখার জন্য এত দূরে চলে যাবে ও। জানলে সব লজ্জা মাথায় তুলে নিয়ে ওকে আমি ধরেই রাখতাম।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন মুনেশ্বর সিং। তারপর বললেন। আপনাকে সহরে যেতে হবে মিশিরজী।

—আমি তৈরী হজুর। শুধু একটা মিনতি। আমাকে এ রাতের অন্ধকারেই নিয়ে চলুন। কেউ যেন এ মুখ আর আমার দেখতে না পায়।

—বেশ তাই চলুন।

চৌকিদার গিয়ে ডাকল সরপঞ্চকে।

—হজুর এখুনি চলে যাচ্ছেন।

—সে কি?

—আপনার আসার দরকার নেই।

—একলা যাচ্ছেন হজুর?

—না সঙ্গে আসামী মিশিরজী

—কি বললি!

—তিনিই আসল দোষী। নিজের মুখে সব কথা হজুরের কাছে স্বীকার করেছেন।

চৌকিদার চলে গেল।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে একলা সরপক্ষ বসে রইল। এ কি করল মিশিরজী। এমন করে মিথ্যাটাকেই সত্যি বলে প্রচার করল ঘুসলপ্রসাদ। বনবালা ওর কে। ওরা সুখী হলে কি লাভ হ'ত ওর। অন্ধকে কি আর পুছত ওরা বিয়ের পরে। আর এ না করলে কি আর ঘুসলপ্রসাদকে বাঁচান যেত না। শেষকালে ঐ দেবতার মতন মানুষটাকেই এ মিথ্যা পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। মিথ্যা মিথ্যা···এ যে কত বড় মিথ্যা তা তো ও নিজেই জানে। চারদিকের দেওয়ালগুলো যেন ওকে চেপে ধরতে চাইল। দম বন্ধ হয়ে এল ওর। মনে হল মিশিরজীর নীরব আর্তনাদ বীনের ঝঙ্কার হয়ে যেন কোনখানে বেজে চলেছে। ছুটে ঘর থেকে বার হল।

বনবালা আমাকে ক্ষমা কর। বনবালা আমাকে ক্ষমা কর। গলা দিয়ে ওর স্বর বার হল না। তবু মনে হল যেন ওর প্রচণ্ড চিৎকার দূর বাঁধের গায়ে বাধা পেয়ে হা হা করে প্রতিধ্বনি তুলে ওকে শুধু ব্যঙ্গ করল। দূরে বহুদূরে কোথায় তখনো যেন মিশিরজীর হাতের বীন মধুর বিতৎস সুর তুলে বেজে চলেছে।····· প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।··· ·····

পরদিন চৌকিদার কিন্তু দেরী করল না খবরটা থানায় পৌছে দিতে। খবর শুনে মুনেশ্বর সিং স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

যে কাহিনী চিরকালের

রবিনসন ক্রুশো . ডি ফো

সুজন রায়

একটি বই লিখে চিরকালের জন্যে অবিনশ্বর খ্যাতি অর্জন করেছেন, পৃথিবীতে এমন লেখক বিরল। সেই বিরলতম লেখকদের অন্যতম হলেন ড্যানিয়েল ডিফো। সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে লণ্ডন শহরে তাঁর জন্ম। দেশবিদেশের অনেক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তিনি পড়েছিলেন এবং যৌবন কালেই "রবিনসন ক্রুশো" লিখেছিলেন। বইটি প্রথমে ইংলণ্ডে তারপর পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে, বইটির কত লক্ষ কপি যে বিক্রয় হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শেষ জীবনে ডি ফো নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় মারা যান। মানুষের মনে যদি সাহস থাকে, উদ্যম অধ্যবসায় থাকে তাহলে মানুষ যে কোন অবস্থায় যে কোন বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে, রবিনসন ক্রুশোর অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে লেখক সেই কথাই বলতে চেয়েছেন।

। এক ।

ইংলণ্ডের এক বনেদী পরিবারে একটি ছেলে জন্মালো। তার নাম রাখা হল রবিনসন ক্রুশো। বাপ মায়ের আদুরে ছেলে, বড়মানুষী চালে তার শিক্ষা দীক্ষা। বাপের ইচ্ছে, ছেলে আইন পাশ করে উকিল হবে।

কিন্তু ছেলের মন অন্য দিকে। সারা দিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পারহীন দিগন্তের দিকে চেয়ে যেন কি ভাবে। সমুদ্র বুঝি তাকে ডাকে।

ছেলেবেলা থেকেই দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াবার প্রবল ঝোঁক দেখা গিয়েছিল রবিনসনের মধ্যে। বিশেষ করে সমুদ্রে পাড়ি দেবার দুর্জয় বাসনা। বাপ মায়ের নিষেধ শুনলেন না, শেষ পর্যন্ত সামান্য টাকাকড়ি নিয়ে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। জাহাজে চেপে লণ্ডনে যাবার সময় পথে বিপদ ঘটল। ভলা ভেঙে গিয়ে জাহাজ ডুবে গেল। ভাগ্যক্রমে অন্য একটি জাহাজ এই দুর্ঘটনা দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে রবিনসন ও অন্য যাত্রীদের উদ্ধার করল।

যাত্রার সূচনাতেই বিপদ বিস্ময় হতাশা। কিন্তু রবিনসন ক্রুশো দমবার পাত্র নয়। লণ্ডনে পৌঁছে জাহাজ আপিসে গিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন এবং শিগগিরই এক জাহাজের মালিকের সঙ্গে তাব জমিয়ে

ফেললেন। তাঁর জাহাজ ব্যবসা উপলক্ষে প্রায়ই তিনি উপকূলে যান। তিনি রবিনসনকে পরামর্শ দিলেন, রবিনসন যদি কিছু মনিহারী জিনিষ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সিনি উপকূলে যান তাহলে মোটা লাভ করতে পারবেন। কারণ সেখানে মনিহারী জিনিষের খুব চাহিদা।

রবিনসন তো এই চান! ব্যবসা হোক না হোক, সমুদ্র বেড়ানতো হবে। এবে তাঁর আহলাদের সীমা! আত্মীয়স্বজনের কাছে ধর্না দিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করলেন। সেই টাকা দিয়ে কিনলেন সস্তা দামের খেলনা, পুঁতির মালা, কাঁচের জিনিষ, আরও সব টুকিটাকি মনিহারী দ্রব্য।

সমুদ্র যাত্রা সুরু হল। এবার ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন গন্তব্যস্থানে নিরাপদে পৌঁছে জিনিষগুলো চড়া দামে বেচে অনেক টাকা লাভ করলেন রবিনসন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে জাহাজ চালানোও শিখে ফেললেন। তাঁর আনন্দ দেখে কে।

লণ্ডনে ফিরে এসে আরও জিনিষ সওদা করে আবার তিনি অভিমুখে পাড়ী দিলেন এবং সেখানে পৌঁছে দু'চার দিনের মধ্যেই সব মাল বিক্রয় করে অনেক টাকা পকেটে নিয়ে দেশে ফেরবার জন্যে জাহাজে উঠলেন।

এবার সমুদ্রের বুকে ঘটল এক বিপর্যয় কাণ্ড যার ফলে তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে গেল!

মাঝপথে হঠাৎ একদল মূর জলদস্যু তাঁদের জাহাজ আক্রমণ করল এবং জাহাজের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল। তখন সে-অঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা খুব চালু ছিল। জলদস্যুরা রবিনসন আর অন্য যাত্রীদের ক্রীতদাসরূপে বাজারে বিক্রি করে দিল। হঠাৎ কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল! কোথায় সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, সে কিনা শেষকালে ক্রীতদাস! উপায় নেই। ভাগ্যকে মেনে নিতেই হবে! রবিনসন ক্রীতদাসের জীবনে অভ্যস্ত হলেন। যথাসময়ে তাঁর মনিবটি ছিল বড় ভাল। সে রবিনসনের প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করতে লাগল। ক্রীতদাসের ভাগ্যে এমন দয়া প্রায়ই ঘটেনা। লোকটির মাছ ধরবার প্রবল নেশা। আর রবিনসন মাছ ধরায় ছিলেন ওস্তাদ। কাজেই তিনি দুচারদিনেই মনিবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাহলেও এভাবে এখানে তো থাকা যায় না। পালাতে হবে। কিন্তু কেমন করে পালাবেন? কোন উপায়ই তো রবিনসন দেখতে পাচ্ছেন না।

অবশেষে বছর দুই পরে সুযোগ পাওয়া গেল। তাঁরই সমবয়সী একটা মূর চাকরকে নিয়ে তিনি একদিন একটা ছোট নৌকা করে সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলেন। খানিকটা দূরে গিয়ে রবিনসন ধাক্কা মেরে চাকরটাকে জলে ফেলে দিলেন এবং বন্দুক উঁচিয়ে তাকে সাঁতার দিয়ে ডাঙায় ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু চাকরটা গেলনা। সে হাতজোড় করে তাঁকে জানালো যে, সে সর্বপ্রকারে রবিনসনকে সাহায্য করবে, সে তাঁর কাছেই থাকতে চায়, তার কথায় বিশ্বাস করে রবিনসন তাকে নৌকায় তুলে নিলেন।

কিন্তু কোন্ দিকে যাবেন? কোন্ তটে গিয়ে আশ্রয় মিলবে? নৌকায় সামান্য খাবার ছিল। এক রাত্রেই তা ফুরিয়ে গেল। অকূল সমুদ্রের মাঝখানে রবিনসনের মনে দিনদিন জোড়া হতাশা ঘনিয়ে উঠল।

দু'দিন দু'রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় কাটাবার পর রবিনসন দূরে একটা জাহাজ দেখতে পেলেন। উল্লাসে অধীর হোয়ে হাত নেড়ে, গায়ের জামা খুলে সেটাকে নিশানের মত উড়িয়ে তিনি সেই জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

জাহাজ ধীরে ধীরে তাঁর নৌকার কাছে এলো, তারপর জাহাজের কাপ্তেন রবিনসনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যাপার বুঝে নিয়ে তাঁকে এবং মূর চাকরটাকে নিজের জাহাজে তুলে নিলেন।

কাপ্তেনের জাহাজ ব্রাজিল অভিমুখে যাচ্ছিল। সেখানে পৌঁছে তিনি রবিনসনকে নামিয়ে দিলেন। মূল কর্তাটি কাপ্তেনের কাছেই রয়ে গেল।

॥ দুই ॥

ব্রাজিলে তাঁর দিন ভালই কাটতে লাগল। উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন তিনি। যেকোন অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করবার মতো মনোবল তাঁর ছিল। তিনি সেখানে চাষবাস শুরু করে দিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলেন।

কিন্তু মাথার পোকা আবার নড়ে উঠল। সমুদ্র আবার তাঁকে ডাকতে লাগল। তার উপর তাঁর ব্রাজিলের বন্ধুরাও তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। গিনি উপকূলে ব্যবসা করে যে লাভের পথ তিনি আবিষ্কার করেছেন, সে-পথ তিনি ছাড়বেন কেন? তাঁরা তাঁকে গিনিতে গিয়ে মাল বিক্রি করবার পরামর্শ দিতে লাগলেন।

বেশি বলতে হল না। মনে মনে রবিনসন তো তাই চান! সঙ্গে সঙ্গে তোড়জোড় শুরু করলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে শুভদণ্ড দেখে বেরিয়ে পড়লেন।

দু'চার দিন বেশ ভালই কাটল। শান্ত সমুদ্র। অনুকূল বাতাস! জাহাজ স্বচ্ছন্দগতিতে লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে চলল। তারপরেই এলো মহা দুর্যোগ। প্রকৃতির রুদ্র রোষ যেন রবিনসনের জাহাজটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকাশ কালো করে ঝড় উঠল। যেন নটরাজের প্রলয় নৃত্য সুরু হল। সেই ঝড়ের দাপটে রবিনসনের জাহাজ একটা চড়ায় গিয়ে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা খেল। তার তলা চিরে গেল জাহাজ ডুবতে লাগল। তখন রাত্রি নেমেছে।

রবিনসন এবং আরও কয়েকজন একটা নৌকা বাগিয়ে তার উপর চড়ে কোন রকমে কাছাকাছি ডাঙায় যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হঠাৎ এক পর্বতপ্রমাণ ঢেউ এসে নৌকা উল্টে দিল। রবিনসনের সঙ্গীরা সকলেই সেই প্রচণ্ড তরঙ্গ-রঙ্গে তলিয়ে গেল।

প্রাণপণে সাঁতার কেটে একা রবিনসন আধমরা অবস্থায় কোনমতে ডাঙায় পৌঁছলেন। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। নিশুতি রাত। দূরে শুধু সমুদ্রের গর্জন। চারিদিকে তাকালেন তিনি। কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকার যেন হাঁ করে গিলতে আসছে! কাছাকাছি একটা বড় গাছ দেখে তিনি তার উপর উঠলেন। গাছের ডালে বসে রাত কেটে গেল।

ভোরের দিকে বোধহয় কিছুক্ষণের জন্যে ক্লান্ত দু'চোখে তন্দ্রা নেমেছিল। ধড়মড় করে জেগে তিনি দেখলেন, দুটো মোটা ডালের আশ্রয়ে তিনি এই অবস্থাতেও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। চারদিকে আলো। সকাল হয়েছে। ঝড় থেমে গেছে। আকাশ রৌদ্র কিরণে ঝলমল করছে। সমুদ্রের দিকে তাকাতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য তাঁর নজরে পড়ল। ঝড়ের বেগে তাঁদের জাহাজটা প্রায় ডাঙার উপর উঠে এসেছে।

গাছ থেকে নামলেন। খিদে আর তেষ্টায় শরীর অবশ বিকল। কিছু না খেলে বেশিক্ষণ আর বেঁচে থাকা যাবে না। কিন্তু কোথায় আহার পাওয়া যায়? তাঁর মনে পড়ল, জাহাজে অনেক খাবার আনা হয়েছিল। রুটি, মাখন, ন্যায়, শুকনো মাংস, পনীর, ফল ও কাঁচা তরকারী। সেগুলো কি এখনো আছে?

রবিনসন তীরে গিয়ে জাহাজের উপর উঠলেন। জাহাজের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে তাঁর দু'চোখ আনন্দে

বিস্ফারিত হল। খাবারগুলো সবই প্রায় আছে, নষ্ট হয়নি। প্রথমে প্রাণভরে আহার করলেন। তারপর নিজে যে কেবিনটায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

কেবিনের ভিতর তার জিনিষপত্র সবই রয়েছে। বন্দুকটা যেমন টাঙানো ছিল তেমনিই আছে। প্রথমেই বন্দুকটা নিয়ে কাঁধে ঝোলালেন। কার্তুজও যা ছিল, নিলেন। তারপর জাহাজ থেকে খানকয়েক তক্তা এবং ছুতারের যন্ত্রপাতি নিয়ে সেই গাছের কাছে ফিরে এলেন।

শুরু করলেন একটা আস্তানা বানানোর কাজ। অনভ্যস্ত হাতে কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত সেখানে একটা চালাঘর বানিয়ে নিলেন।

তেরা তো যাহোক একটা হল। খাবারদাবারও পাওয়া গেছে প্রচুর। এখন দেখা যাক, দ্বীপটার মধ্যে কি আছে, কারাই বা এখানে বাস করে। ধীরে ধীরে একটা ছোট পাহাড়ের উপর গিয়ে উঠলেন। পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়। তাহলেও তার উপর উঠে তিনি সমস্ত দ্বীপটাকে দেখতে পেলেন। চারিদিকে তাকিয়ে যা দেখলেন, তাতে তাঁর মনটা বিলক্ষণ দমে গেল। কোথাও কোন বসতি নজরে পড়ল না। লোকজন কাউকে দেখা গেল না। শুধু নানা জাতের জন্তুজানোয়ার ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব জন্তুজানোয়ার পরিবৃত হয়ে একা এই দ্বীপের মধ্যে কতদিন থাকতে হবে কে জানে! সহসা তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হোয়ে উঠল।

কিন্তু অবস্থাকে মেনে নেওয়া ছাড়া তো গত্যন্তর নেই। ধীরে ধীরে রবিনসন নিজের নবনির্মিত আস্তানায় ফিরলেন। সে-রাতটা তার মধ্যে কাটিয়ে পরদিন সকালে স্থির করলেন, জাহাজ থেকে প্রয়োজনে লাগবার মতো যা পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে আসা দরকার। তাদের দিয়ে তাঁর এই নতুন জীবনযাত্রায় অনেক কাজ হবে।

সেদিন থেকে প্রত্যহ ভাঁটার সময় তিনি জাহাজে উঠে যা কিছু কাজে লাগতে পারে সব নামিয়ে আনতে লাগলেন। বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ পেলেন। আরও আনতেন, কিন্তু চৌদ্দ দিনের দিন আবার প্রচণ্ড ঝড় উঠল এবং ভাঙা জাহাজখানা সেই ঝড়ের মুখে পড়ে সমুদ্রের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

জিনিষ অনেক কিছুই সংগ্রহ করা গেল, কিন্তু তাদের রাখা যায় কোথায়, এই হল তাঁর চিন্তা। অনেক অনুসন্ধানের পর যে পাহাড়ে তিনি প্রথম দিন উঠেছিলেন সেই পাহাড়ের একটা জায়গায় খানিকটা সমতল জমি আবিষ্কার করলেন। তার একদিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে, সুতরাং সেদিক দিয়ে কোন বন্য জন্তু আসবার সম্ভাবনা ছিল না। সেদিকটা পিছনের দেওয়াল করে সুমুখের তিন দিক তিনি একটা অর্ধচন্দ্রাকার বেড়া দিয়ে ঘিরলেন এবং একটা মই তৈরী করে তার সাহায্যে সেই উঁচু ঘর থেকে নীচে নামাওঠা করবার ব্যবস্থা করলেন। রাত হলে ঘরে ঢুকে মইটা তুলে নিতেন। যাতে কোন জন্তু জানোয়ার উপরে উঠতে না পারে সেজন্যেই এই আয়োজন করলেন।

তারপর জাহাজ থেকে আনা জিনিষপত্রগুলি একে একে এনে ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। বাসাটি মন্দ হল না। খাবার জায়গা, শোবার জায়গা, বসবার জায়গা, রীতিমতো যেন বড়লোকের হালঘর।

বাসা ঠিক করবার পর রবিনসন আসবাবপত্র তৈরী করতে লাগলেন। ছুতারের কাজ তো কোন দিন করেন নি তাই খুবই কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলে মনে করলেন না। প্রথমে একটা টেবিল, তারপর একটা চেয়ার, তারপর শোবার জন্যে একটা তক্তাপোষ। জাহাজ থেকে পাওয়া একটা শক্ত কাঠের তক্তা কেটে একটা কোদাল তৈরী করলেন। একটা লোহার পাতকে পিটিয়ে একটা কুড়ুলও তৈরী হল।

রিনসন নতুন পরিবেশে রবিনসন ক্রুশো নতুন জীবনযাত্রা শুরু করলেন।

। তিন ।

দিন কয়েক পরে মাটির দিকে চেয়ে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলেন তিনি। জাহাজ থেকে যেসব জিনিস এনেছিলেন তার ভিতর ছিল একটা বড় চটের নতুন থলি। থলির মধ্যে ছিল কতকগুলো ভুঁষ। থলিটা কাজে লাগবে, তাই তিনি ঘরের বাইরে এনে ভুঁষগুলোকে মাটিতে ফেলে দিয়ে থলিটা খালি করে নিয়েছিলেন। তারপর সেকথা তাঁর আর মনে ছিল না। অল্প কয়েকদিন পরেই বর্ষা নেমেছিল। দিন কয়েক জল হবার পর, রবিনসন দেখলেন যেখানে ভুঁষগুলো ফেলা হয়েছিল সেখানে কতকগুলো অংকুর দেখা দিয়েছে।

অংকুর বড় হলে তিনি দেখলেন, কতকগুলো বিষ ধানের কতকগুলো যবের। দেখে তাঁর মনে অত্যন্ত আনন্দ হল। কোদাল দিয়ে খানিকটা জমি চষে ঠিক করে নিলেন, তারপর ধান আর যবগুলো পেকে উঠলে সেগুলো আবার সেই চষা জমিতে ছড়িয়ে দিলেন। এইভাবে অনেক ধান আর যব পাওয়া গেল।

রুটি সেঁকবার জন্যে চাটু চাই। কাঠের থাতা বানালেন। একটা মাটির চাটু তৈরী করে সেটা আগুনে পুড়িয়ে নিলেন। মিষ্টি রুটি তৈরী হোতে লাগল।

এবার পোষাক? জাহাজ থেকে এক প্রস্থ পোষাক পাওয়া গিয়ছিল। কিন্তু তা আর কতদিন চলবে। ছাগল মেরে তার চামড়া শুকিয়ে এক প্রকার পোষাক বানালেন তিনি। সে বড় অদ্ভুত পোষাক। একে একমুখ দাড়ি গোঁফ, তার ওপর ওইরকম বিচিত্র পোষাক, তাঁর চেহারা যা ছিল তা দেখে তাঁর দেশের মানুষরাও বোধ করি ভয় পেতো।

রবিনসনের বুদ্ধিমত্তার আর একটি পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার। এই জনহীন জগৎ-ছাড়া দ্বীপের মধ্যে বসেও তিনি মাস ও দিনের হিসাব রেখেছিলেন। যেদিন তাঁর জাহাজ ডুবি হয় সেদিন থেকে মাস ও তারিখ হিসাব করে দেওয়ালের গায়ে প্রতি মাস ও তারিখ লিখে ক্যালেন্ডারের মতো করলেন, তারপর প্রত্যহ সকালে উঠে এক একটা করে তারিখ কেটে দিতে লাগলেন।

। চার ।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। রবিনসন ক্রুসো যেন সেই দ্বীপের রাজা। যতদূর দৃষ্টি যায়, সবটাই তাঁর রাজত্ব। প্রজা বলতে কয়েকটা কুকুর আর বিড়াল। তারা তাঁর খুব দোষ মেনেছিল। তিনি যখন টেবিলে বসে আহার করতেন তখন তারা সব প্রসাদ পাবার আশায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতো।

একা একা জঙ্গলে টহল দিয়ে, জল পেড়ে, সমুদ্রের কিনারায় মাছ ধরে দিন ভালই কাটছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা ব্যাপারে রবিনসন উদ্বেগ বোধ করলেন, ভয় পেলেন।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, সমুদ্রের ধারে বালির উপর এক প্রকাণ্ড পায়ের ছাপ। তিনি বিহ্বল বোধ করলেন। এতদিন পরে হঠাৎ এ পায়ের ছাপ কোথা থেকে এল? চারদিক ঘুরে পাহাড়ের চূড়োয় উঠে অনেক খুঁজলেন কিন্তু কোথাও মানুষ দেখা গেল না। তাঁর গা ছমছম করতে লাগল। দিনের বেলায় এক রকম কেটে যায়, কিন্তু রাত হোলেই ভয় বাড়ে, ঘুমোতে পারেন না।

ঘরের চারধারে মজবুত বেড়া। কিন্তু তাতে আশ্বস্ত না হোয়ে আরও একটা বেড়া লাগালেন। ক্রমে তাঁর ভয়ের ভাবটা কমে গেল।

এমনি করে আরও বছর দুই কেটে গেল। তারপর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রবিনসন বাইরে এসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন সমুদ্রকূলে খান পাঁচেক নৌকা বাঁধা রয়েছে। ভাল করে ব্যাপারটা দেখবার জন্যে তিনি দূরবীণ (জাহাজ থেকে পাওয়া) নিয়ে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের উপর উঠলেন। সেখান থেকে যা দেখলেন তাতে সবশরীর যেন হীম হোয়ে গেল।

পঁচিশ তিরিশ জন লোক একটা প্রকাণ্ড আগুনের চারদিকে নৃত্য করছে আর সেই সঙ্গে তাদের বিকট চিৎকারে সমুদ্রতীর যেন আলোড়িত হচ্ছে।

অন্যদিকে দৃষ্টি ফেলতেই রবিনসন সন্ত্রাসে দেখলেন, তাদের কাছে বাঁধা একটা নৌকা থেকে তারা দুজন লোককে টানতে টানতে সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিয়ে এলো, তারপর সকলে মিলে লোক দুটোকে বেদম প্রহার করল। একজন তো মারের চোটে বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল।

প্রথম লোকটা যখন মার খাচ্ছিল তখন দ্বিতীয় লোকটা সুযোগ পেয়ে তাদের হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক তাকে ধরবার জন্যে তার পিছনে ছুটলো। কিন্তু যে প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে তার সঙ্গে তারা পারবে কেন?

রবিনসন সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রাণভয়ে ভীত লোকটা সেই দিকেই ছুটে আসছে।

যে তিনজন পিছনে আসছিল তাদের মধ্যে একজন ফিরে গেল। বাকি দু'জন এগিয়ে আসতে লাগল। তখন রবিনসন স্থির করলেন, এই দু'জন মৃত্যুদূতের হাত থেকে লোকটাকে বাঁচাতে হবে। ঝোপের আড়াল থেকে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

প্রাণভয়ে ভীত লোকটি তখন তাঁর কাছে এসে পড়েছে। পিছন থেকে রাক্ষসের মতো একজন হানাদার তার দিকে ধেয়ে আসতেই রবিনসন তাঁর হাতের বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সজোরে লোকটার মাথায় আঘাত করলেন! সঙ্গে সঙ্গে লোকটা অজ্ঞান হোয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল।

দ্বিতীয় রাক্ষসটা দূর থেকে তাঁকে তীর মারবার উদ্যোগ করছে দেখে রবিনসন বন্দুক তুলে তাকে গুলী করলেন।

এদিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনে সেই বন্দী লোকটি আরও ভয় পেল এবং রবিনসনের পাশ কাটিয়ে ছুটতে লাগল। রবিনসন প্রাণপণে ছুটে অতিকষ্টে তাকে ধরলেন এবং নানা ইসারা ইঙ্গিতের দ্বারা তার ভয় দূর করলেন। লোকটা তখন বারবার তাঁকে নমস্কার করতে লাগল এবং তাঁর পায়ের উপর পড়ে কৃতজ্ঞতা জানালো।

রবিনসন তাকে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। তাকে খেতে দিলেন, তার শুয়োবার ব্যবস্থা করে দিলেন। লোকটা সত্যিই অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। কিছু খেয়ে সে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমে আচ্ছন্ন হল।

এই ঘটনাটা ঘটেছিল শুক্রবার, ইংরাজীতে শুক্রবার হল ফ্রাইডে। তাই রবিনসন তার নাম রাখলেন ফ্রাইডে। সকাল বেলা ফ্রাইডে ঘুম থেকে উঠেই রবিনসনের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে মাথা রেখে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল, দু'হাত জোড় করে নিজের ভাষায় সে অনেক কথাই বলল, অবশ্য রবিনসন তার কিছুই বুঝতে পারলেন না, কিন্তু লোকটিকে তাঁর খুব ভাল লাগল, তার মুখে সারল্য এবং বুদ্ধির ছাপ। আচার ব্যবহারে বিনীত আত্মসমর্পণের ভাব।

এতদিন রবিনসন এই প্রকাণ্ড দ্বীপের মধ্যে নিঃসঙ্গ ছিলেন। এখন একজন অনুচর জুটলো। ফ্রাইডেকে তিনি ইংরাজীতে কথাবার্তা বলতে শেখালেন, তাকে দিয়ে নানা কাজ করাতে লাগলেন। ফ্রাইডের মাথা ছিল খুব সাফ, বন্য জগতের মানুষ হলেও তার বুদ্ধি ছিল, বোঝবার ক্ষমতা ছিল, সে চটপট কাজ চালানো কথা বলতে শিখলো এবং নানা কাজকর্মে পটু হয়ে উঠল। তাঁর প্রতি ফ্রাইডের ভক্তি আর আনুগত্যের পরিচয় পেয়ে রবিনসন মুগ্ধ হলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, ফ্রাইডের মত অমন প্রভুভক্ত ভৃত্য বোধহয় আর কেউ কখনো পায়নি।

॥ পাঁচ ॥

বছরের পর বছর কেটে গেল। এক নাগাড়ে সাতাশ বছর রবিনসন সেই দ্বীপে বাস করলেন। তারপর একদিন সকালে ফ্রাইডে এসে খবর দিল তীরের কাছে সমুদ্রের উপর একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে।

খবর পেয়ে রবিনসন দূরবীন হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। জাহাজ এসেছে শুনে তাঁর আনন্দ হল, কিন্তু সে জাহাজ কাদের আর কেনই বা তারা এই অজানা জায়গায় এসেছে তা আগে জানা দরকার। হঠাৎ তাদের দেখা দিয়ে বিপদে না পড়তে হয়। রবিনসন তাই তীরের কাছে না গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে জাহাজটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন।

তীরের কাছে এসে জাহাজটা নোঙর ফেললো। তারপর জাহাজ থেকে কয়েকজন লোক নৌকা করে দ্বীপে এসে নামল। রবিনসন দেখলেন, তারা সকলেই শ্বেতাঙ্গ, ইংরেজ। আর তাদের মধ্যে তিনজনের হাত-পা বাঁধা, তারা বন্দী।

বন্দী তিনজনকে তীরের কাছে একটা চড়ায় ফেলে বাকি লোকগুলো দ্বীপের মধ্যে ঢুকে গেল আর সেই সুযোগে রবিনসন বন্দী তিনজনের কাছে গিয়ে ব্যাপার কি জানতে চাইলেন।

রবিনসনের চেহারা আর পোষাক দেখে বন্দী তিনজন তো প্রথমটায় ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর রবিনসনের কথায় আর আশ্বাস বাক্যে যখন তারা বুঝলো যে তিনি তাদেরই স্বজাতি তখন তারা তাদের বিপদের কথা জানালো। তাদের মধ্যে একজন ওই জাহাজেরই কাপ্তেন, বাকি দু'জন তার মেট। জাহাজের খালাসীরা ষড়যন্ত্র করে তাদের বন্দী করেছে, তাদের মতলব বন্দীদের এইখানে ফেলে রেখে তারা জাহাজ নিয়ে পালাবে।

রবিনসন তখন তাদের বাঁধন খুলে দিলেন, তারপর তাদের হাতে লাঠি সোঁটা পিস্তল দিয়ে ফ্রাইডেকে সঙ্গে নিয়ে সবাই মিলে বিদ্রোহীদের দমন করবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন।

বিদ্রোহী খালাসীরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তারা এখানে এভাবে আক্রান্ত হবে। তারা লড়াই করবার চেষ্টা করল বটে কিন্তু রবিনসনের বন্দুকের গুলীতে যখন দলের চার দুজন মারা পড়ল এবং আরও তিনচারজন জখম হল তখন তারা মাটিতে শুয়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করল। রবিনসন সদলবলে এগিয়ে গিয়ে তাদের বন্দী করে বেঁধে ফেললেন। যে দুজন মারা পড়েছিল, সকলে মিলে মাটি খুঁড়ে তাদের কবর দিলেন, আহতদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

রবিনসনের দলে জাহাজের কাপ্তেন আর যেই ছ'জন শুধু যে প্রাণে বেঁচে গেল তাই নয়, জাহাজটাও তারা ফিরে পেল।

কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে কাপ্তেন রবিনসনকে দেশে ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। রবিনসন তো এতদিন সেই সুযোগই খুঁজছিলেন। এমন জায়গায় তিনি এসে পড়েছিলেন সে জায়গাটা যেন জগৎ ছাড়া, এখানকার মানুষ যেন এতদিনের মধ্যে একটাও জাহাজ আনাগোনা করেনি। আজ যখন লাগাতার সুযোগ এসেছে তখন সে সুযোগে তিনি ছাড়বেন কেন? তিনি ফ্রাইডেকে নিয়ে জাহাজে উঠলেন।

অনুকূল বাতাসে জাহাজ ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করল।

সুদীর্ঘ আটাশ বছর পরে অসমসাহসী অনন্য সাধারণ অধ্যবসায়ী অ্যাডভেঞ্চার নায়ক রবিনসন ক্রুসো সেই অজানা দ্বীপের বাস শেষ করে আবার দেশের মাটিতে এসে পা রাখলেন।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিপক্ষমুগের মঞ্চনায়ক

শৈলেন চৌধুরী

শিশিরকুমারের সঙ্গে আজীবন বিচ্ছেদ অথবা একই অভিনেতাই তাঁর সারা জীবন অভিযোজিত করেননি যেমন করেছিলেন শৈলেন চৌধুরী। সেই যে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে পেশাদার মঞ্চে নামলেন তিনি, সেই থেকে শিশিরকুমার প্রযোজিত সমস্ত নাটকেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

সুন্দর চেহারা ছিল। লম্বা চওড়া ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মঞ্চের উপর কোন চরিত্রেই বেমানান লাগতো না তাঁকে। আর অভিনয়ও করতেন সাবলীল স্বাভাবিক ভঙ্গীতে। অভিনেতা হিসাবে হয়ত খুব বড় ছিলেন না তিনি, কিন্তু সব ভূমিকাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন। কোন ভূমিকাতেই তিনি অসাফল্যের নজীর রাখেন নি।

পূর্ববঙ্গের এক অভিজাত জমিদার বংশে শৈলেন চৌধুরীর জন্ম—১৮৯৭ সালে।

তাঁর ভগ্নী প্রখ্যাতা বেতারশিল্পী বেলারাণী মজুমদার, বসন্তকুমার মজুমদারের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁদের পুত্র খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার শৈলেন চৌধুরীর ভাগ্নে।

শৈলেন চৌধুরীর বাল্যকাল কাটে ফুরিদপুরে। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন এবং শিশির কুমারের সান্নিধ্যে আসেন।

ছাত্রের ভিতর অভিনয় শিল্পের প্রতি অনুরাগ আছে দেখে অধ্যাপক শিশিরকুমার তাঁকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন এবং শৈলেন চৌধুরী তাঁর বিশেষ প্রিয় পাত্র হন।

শিশিরকুমারের কাছে শৈলেন চৌধুরী শুধু অভিনয় শিক্ষাই করেননি। যত যাই বলেছেন, গুরুর কাছে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা অভিনয় শিল্পের আলোচনা করেছেন।

শিশিরকুমারের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদিয়ে যেসব নাটকে অভিনয় করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তার মধ্যে ছিল। সীতা, আলমগীর, সাজাহান, রঘুবীর, ঘোড়শী (নিশ্চল), দেবরক্ষা (সমাট), বিজয়ী (রেজাখাঁ), মহাপ্রস্থান (অর্জুন), নরমা (বিতীষণ), বিজয়া (বিলাস), ভাগ্য (উত্তীয়), রীতিমত নাটক, যোগাযোগ (বিপ্রদাস), জীবনরঙ্গ (নায়ক), উল্কাচিত্রি (মোহন), মাইকেল (বিদ্যাসাগর) বিপ্রদাস (রায় সাহেব)। তারপর মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করে (১৯৩৪ সালে), সেখানে ঘর্ষবাদ,

রাষ্ট্রবিপ্লবে সাজাহান, দুই পুরুষে শিবনারায়ণ, যাত্রীপাগার জগমল প্রভৃতি নতুন এবং বহু পুরানো নাটকে অভিনয় করেন। যাত্রীপাগার জগমলই তাঁর শেষ রঙ্গাভিনয়।

শৈলেন চৌধুরী শিশিরকুমারের সঙ্গে আমেরিকায় যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে চলচ্চিত্রে যোগদেন। প্রথমে অল্প চিত্র প্রতিষ্ঠানে এবং পরে নিউ থিয়েটার্সের তরফে তিনি বহু ছবিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন, যথা, পল্লী সমাজ, সীতা, বিষয়মদল, বিরহ, প্রফুল্ল, তরুবালা, পরপারে, কাল পরিণয়, রাজর্ষী, টক্কি অফ টকিজ, ছিন্নহার, মুক্তি, অভিজ্ঞান, অধিকার, বড়দিদি, রক্তত জয়ন্তী, জীবন মরণ, পরাজয়, আলোছায়া, ডাক্তার, অভিনেত্রী, নর্তকী, প্রতিশ্রুতি, শোধবোধ, প্রিয়বান্ধবী, কাশীনাথ, অভিনয় নয়, মোটানা প্রভৃতি।

২৪শে জুলাই ১৯৪৬ সালে তিনি কিছুদিন রোগ ভোগের পর পরলোকগমন করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

স্মৃতিচারণ

ষ্টার থিয়েটার—চিরকুমার সভা ও রবীন্দ্রনাথ

ডঃ অহীন্দ্র চৌধুরী

১৮ই জুলাই (১৯২৬) শনিবার রাত সাড়ে সাতটায় হবে—চিরকুমার সভার প্রথম অভিনয়। আমরা প্রস্তুত হতে লাগলাম।···ঠিক হয়েছিল, কবি যে সব নতুন গান এতে সংযোজিত করছেন, সেগুলির স্বরলিপি রাধাচরণ গিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে আসবে। আর গানের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখে যেবেন মঞ্চ ব্যবস্থা—সেটসিন প্রভৃতি।···

কবির অন্তরঙ্গ ও স্নেহভাজন গোষ্ঠীর অনেকেরই ইচ্ছা ছিলনা যে উনি পাবলিক থিয়েটারে নাটক দেন। কলকাতায় তখন যে ক'টি রঙ্গমঞ্চ চলছে সে সংবাদও বোধ করি ওঁরা সঠিক রাখতেন না। সবই ওঁদের কাছে ঐ এক পাবলিক থিয়েটার। অবশ্য এসবই প্রতিবন্ধক হোলো না শেষপর্য্যন্ত। কবি নাটকটী খুসী মনেই দিয়েছিলেন অভিনয় করতে।

প্রস্তুতির কাজ ত চলছে। সমরেন্দ্রনাথ এসে ষ্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে সিনটিন গুলি দেখতেন প্রথমটায়। পাবলিক থিয়েটার সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা ত ভালো ছিলনা তাই ভিতরে আসতে দ্বিধা করতেন বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন বুঝলেন আবহাওয়া আদৌ আপত্তিকর নয়, তখনই উঠে এলেন ষ্টেজের ওপরে। দিনেন্দ্রনাথও তাই। কথাছিল গানের তত্ত্বাবধান করবেন শুধু। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এসে উৎসাহের প্রাবল্য লক্ষ্য করে শেষ পর্য্যন্ত নিজেই বসে গেলেন গান শেখাতে। গাড়ী একখানি, তাই তাঁকে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি বাড়ি ফিরে আসতাম। আমি থাকতাম বলে যতক্ষণ না ওঁর কাজ শেষ হচ্ছে। ফেরার পথে কতই না গল্প হয়েছে ওঁর সঙ্গে। এক সঙ্গে কাজও করেছি একসঙ্গে গল্পও করেছি প্রচুর। আর সমরেন্দ্রনাথ? বিশেষ করে চন্দ্রবাবুর ঘরটি যা করে দিয়েছিলেন, তার চমৎকারিত্বের কথা আজও ভুলিনি। একটা সিঁড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে লোক এসেছে। কিউরিয়ে

কম্পোজিশন করেছিলেন বরখানির, তাতে দৃশ্যটি এমন হয়েছিল যে যাঁরা তা না দেখেছেন, তাঁরা তার মনোরম রূপখানি কল্পনাও করতে পারবেন না।

গগনবাবু দীনবাবু পরে কাজে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন বলা চলে। এবং এঁরা এঁদের বন্ধু মহলে চাউর করেছিলেন—পাবলিক থিয়েটারকে যা ভাবতুম তা নয়, এদের শক্তি আছে।

শনিবার প্রথম রজনীর অভিনয় হয়ে গেল। পরের সপ্তাহে, অভিনয়ের দ্বিতীয় দিনে—কবি এলেন দেখতে। ২৫শে জুলাই, পঁচিশ সনে—বাংলা ৯ই শ্রাবণ শনিবার রাত সাড়ে সাতটায়। রাজা ও রাণীতে আসেন নি কবি, তাই একটু ক্ষোভ ছিল, এবার আর সে দুঃখ রইল না। দীনুবাবু গগনবাবু সুখ্যাতি করে থাকেন, তাই বোধহয় এবার এলেন কবি। সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের আরও অনেকে।

কবি ও যথারীতি অভিনয় দেখে চলে গেলেন। সেদিন আর ওঁর সঙ্গে এই নিয়ে কোনো কথা বলবারই সময় পেলাম না আমরা। স্থির হোলো, কবির সঙ্গে কথা হবে কাল সকালবেলায়। ওঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। যাবেন অপরেশচন্দ্র আর প্রবোধবাবু।

প্রবোধবাবু আমাকে বললেন—তুমি যদি যাও ত ভোরবেলা এসো।

তাই হোলো। ভোরবেলাতেই হাজির হলাম টেজে। সেখান থেকে ওঁদের সঙ্গে জোড়াসাঁকোয়, কবির সন্নিধানে। গিয়ে সাক্ষাৎকার ঘটতেই পায়ে হাতদিয়ে প্রনাম করে বসলাম কাছাকাছি। নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মশাই। আমি কাছে যাওয়া মাত্রই ইনি আমাকে দেখিয়ে কবিকে বলে উঠলেন—ইনিই চন্দ্রবাবুর অভিনয় করেছেন। তখন ঠিক বুঝিনি কেন ও কথা বললেন চারুবাবু। পরে শুনলাম কবি ভাবতেই পারেননি যে একটি যুবক চন্দ্রমাধবের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। তাঁর ধারণা হয়েছিল, চন্দ্রবাবু লোকটি নিশ্চয়ই কোনো প্রধান বা প্রৌঢ় অভিনেতা। সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কবি বললেন – বেশ হয়েছে।

ভেবেছিলাম এইবার কবি শুরু করবেন আলোচনা। কিন্তু তা করলেন না, বেশ খুশী খুশী ভাবই দেখলাম ওঁর। বসে আছি ওঁর কাছে, টুকরো টুকরো নানান কথাই হচ্ছে। মোট কথা, কবি আমাদের প্রশংসাই করলেন। অপরেশবাবুর অনুরোধে কবি হেসে বল্লেন—আচ্ছা, আচ্ছা, আরও বই দেবো।

এ প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমরা যে কী আনন্দ বুকে নিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিলাম, সেটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আমার নিজের জিজ্ঞাসা ছিল 'চন্দ্রবাবু' সম্পর্কে। ওঁকে যে সে বিষয় খুশী করতে পেরেছি, এ-ই আমার পুরস্কার।

রঙ্গালয়ের রঙ্গ কথা

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী অভিনীত হইতেছে। চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যেসময় রাজপথ দিয়া স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক পশুপতিকে লইয়া মহম্মদ আলী দুইজন মুসলমান সৈন্যসহ গমন করে সেই সময় অদূরে অগ্নি প্রজ্বলিত আলো দেখিয়া পশুপতি বলিয়া থাকে, "ওরে আমার গৃহ, মুসলমানেরা আগুন দিয়েছে – মনোরমা গৃহে আছে, ছাড়ো ছাড়ো"—সৈন্যরা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু উন্মত্তের ন্যায় পশুপতি তাহাদের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়।

বেঙ্গল থিয়েটারে যৎকালে মৃণালিনীর অভিনয় হয় সুঅভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পশুপতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক রাত্রে উপরোক্ত দৃশ্য যে সময়ে অভিনীত হইতেছে, পশুপতিবেশী কিরণবাবু—"ছাড়ো, ছাড়ো"—বলিয়া সৈন্যদ্বয়ের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই সময় একজন সৈন্যের এমন feeling আসিয়াছে যে, সে কোনমতেই পশুপতিকে ছাড়িবে না। কিরণবাবু যতই বল প্রকাশ করিতেছেন, সে ততই তাহাকে সজোরে আপটাইয়া ধরিতেছে। বহুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর কিরণবাবু শেষে অনন্যোপায় হইয়া সৈনিককে সজোরে রঙ্গমঞ্চের উপর আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ধাবিত হইলেন। সবেগে পতিত হইয়া সৈনিকটির নাক-মুখ ছেঁচিয়া গেল। দর্শকগণ চক্ষের সম্মুখে এই সজীব অভিনয় দেখিয়া উল্লাসে ঘন ঘন করতালি ধ্বনি করিতে লাগিল।

ড্রপ পড়িয়া যাইলে কিরণবাবু সৈনিককে ক্রোধে ভর্ৎসনা করিয়া দেখেন, তখনো তাহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। তিনি তাহার অবস্থা দেখিয়া ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ, এমন আহাম্মুক তুমি! দেখ দেখি! এখনো রক্ত পড়ছে।"

সৈনিকটি করজোড়ে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আহাম্মুক তো বলছেন, নাক দিয়ে রক্তও পড়ছে বটে, —কিন্তু আজকের গে কেমন জমিয়ে দিলুম, বলুন?—কোন দিন কি এমন ক্ল্যাপ্ পেয়েছেন?"

* * * * ২

এই কিরণবাবুই একবার এক অভিনয়ে এক মহা হাস্যকর কাণ্ড করিয়াছিলেন।

ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত নাটক "নন্দ বংশোচ্ছেদ" অভিনীত। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের শেষে রাজকুমার নন্দ ও মন্ত্রী পুত্র বিজয়বল্লভ, এই দুইজনের মধ্যে অসীযুদ্ধ হয় এবং নন্দ আহত হইয়া ভূপতিত হন।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। নগেন্দ্রবাবু জ্যেষ্ঠ ও কিরণবাবু কনিষ্ঠ। কিরণবাবু তলোয়ার খেলা বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই নাটকে নগেন্দ্রবাবু বিজয়বল্লভের ও কিরণবাবু নন্দের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত দৃশ্যে যে সময় বিজয়বল্লভবেশী নগেন্দ্রবাবু এবং নন্দবেশী কিরণবাবু পরস্পর অসিযুদ্ধ করিতেছে, সেই সময় একদিন কিরণবাবু সহসা এরূপ ক্ষাত্র-তেজোদীপ্ত হইয়া উঠিলেন যে, যদিও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার ভূপতিত হইবার কথা, কিন্তু পতন তো দূরের কথা, তাহার অসি-সঞ্চালন নৈপুণ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। দর্শকগণ সমরকুশলী বীরদ্বয়ের অসিযুদ্ধ দর্শনে পরমানন্দে করতালিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন এই ভীষণ সমরের কোনরূপ অবসানের লক্ষণ দেখা গেল না, তখন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা উইংসের পার্শ্ব হইতে অনুচ্চস্বরে কিরণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"পড় কিরণ পড়, বড্ড বেশী হোয়ে যাচ্ছে।" কিরণবাবু যুদ্ধ করিতে করিতেই বলিলেন—"তলোয়ার-খেলায় মেজদা' আমার সঙ্গে পারে নাকি?"

ক্রমে যুদ্ধের অবস্থা যখন সঙ্গীন হইয়া উঠিল তখন নগেনবাবুই যুদ্ধ করিতে করিতে অনান্তিকে বলিলেন—"আমিই হার মানছি ভাই, তুই এবার পড়"। কিরণবাবু তখন বিজয় গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

নাট্য প্রবাহ

অমৃত মহল

কলকাতার অনেক নবনাট্য সংস্থার মধ্যে আরেকটি নাম সম্প্রতি সংযোজিত হয়েছে—অমৃত মহল। যাঁরা এই সংস্থাটি গড়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, উত্তমকুমার, তরুণকুমার এবং শ্যাম গাঙ্গুলী। এঁরা বাংলা নাট্যের ঐতিহ্য অনুসারী হয়ে যাটি বেশী নাটক মঞ্চস্থ করবেন এই পরিকল্পনা নিয়ে যে কয়টি নাটক ইতিমধ্যে নির্ধারিত করেছেন তাদের মধ্যে আছে বিদ্যাসুন্দর, খাস দখল, বিরাজ বৌ এবং বিধা।

সম্প্রতি এঁরা জামসেদপুরে বেঙ্গল ক্লাব আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় করে এসেছেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তরুণকুমার বলেন, 'আজকের বাংলা নাট্যজগতে মৌলিক নাটকের একান্ত অভাব দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্য সংস্থা বিদেশী নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে চমক সৃষ্টির প্রয়াসী। কিন্তু তাতে করে বাংলা নাট্য সাহিত্যের কতটুকু উন্নতি হচ্ছে তা চিন্তার কথা।"

জামসেদপুরে এঁদের বিদ্যাসুন্দর অভিনয় দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দান করেছে। নাটকটির সুপ্রযোজনা, সুপরিচালনা এবং সুঅভিনয় এই সংস্থার নাট্য প্রযোজনার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এঁদের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তরুণকুমার, জয়শ্রী সেন, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, সমিতা বিশ্বাস এবং প্রণব মজুমদার। এঁরা মালনীরূপে জয়শ্রী সেন নাচে গানে এবং অভিব্যক্তিতে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যসকল শিল্পী যথাযথভাবে তাঁদের ভূমিকাগুলিকে রূপায়িত করেছেন। এঁদের পরবর্তী প্রয়াস অমৃতলাল বসুর খাস দখল।

রবীন্দ্র মেলা। রবীন্দ্র চর্চার যেসব সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান হয় রবীন্দ্র মেলা নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। রবীন্দ্র মেলা একটি ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে যা সমগ্র কলকাতার রবীন্দ্রানুরাগীদের বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। গত বছর যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কৃপায় এই অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। এবার তাঁরা পূর্ণোদ্যমে এ বছরের কাজ শুরু করেছেন এবং পল্লী-ভারতীর সম্পাদক বরিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে একটি কর্ম পরিষদ গঠিত হয়েছে। রবীন্দ্র মেলায় শৈলজানন্দের সভাপতি নির্বাচনে আমরা যে সবিশেষ আনন্দিত তা বলাই বাহুল্য।

এই সূত্রে মনে পড়ছে রবীন্দ্র মেলার উদ্ভবের কথা। ১৯৫৮ সালে সুহৃদ কয়, বীরেন সেন, অমল সরকার প্রমুখ কয়েকজন নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে সুকমল ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের প্রস্তাব জানালেন নতুন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সুকমল ঘোষ সানন্দে রাজী হলেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করা হল। আপিস বসল। ১৬/১সি, রামকান্ত বসু স্ট্রীটের মানব ভবন বাড়িতে। সেকী উৎসাহ, সে কী প্রাণচাঞ্চল্য। তারাশংকর রবীন্দ্র মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে (নামকরণও তাঁরই) বললেন, "রবীন্দ্রনাথ মেলার মধ্যে এই দেশের স্মৃতিস্মরণ ও স্মৃতিপূজার প্রাচীন ধারাকেই শুধু লক্ষ্য করেন নাই, লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, এমন আয়োজনের মধ্যেই শুধু শ্রদ্ধা পূজা স্মরণ স্বতঃস্ফূর্ত হইতে পারে। এই আয়োজনটির মধ্যে আমরা সেই পুরাণোর রূপকে নূতন কালের উপযোগী করিয়া নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করিব।"

সেই প্রথম বৎসরের (২৫শে বৈশাখ—১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪) আকর্ষণীয় কর্মসূচিতে সকল নায়করা শিল্পী ও শিল্পী-নাট্যগোষ্ঠী ছাড়াও বহু বিশিষ্ট মনীষী ও সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আলোচনাদির অনুষ্ঠানে তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, কালিদাস নাগ, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় কুমার মজুমদার, অন্নদাশংকর রায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, কাদার ফাদার ও তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। সে বছর শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

মহাজাতি সদনে প্রথম অনুষ্ঠানটি হয়। মহাজাতি সদনের নির্মাণকার্য তখনো শেষ হয়নি। ভিতরে প্রেক্ষাগার বা মঞ্চ কিছুই হয়নি—ছিল শুধু ইট বালির পাহাড়। দু'চার দিনের মধ্যে যে বালির স্তূপের উপর কেমন করে এক ইন্দ্রপুরী গড়ে উঠেছিল, যা দেখে সবাই বিস্মিত মোহিত হয়েছিল!

নাট্যকল্প। এই সংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি অল্প ছলে তিনটি একাংকিকার অভিনয় করলেন, প্রদ্যোৎ গুহের 'অন্তরোড', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাক্ষস' ও 'সেনোবাকারায়'। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন ইন্দ্রাণী গোস্বামী, দেবাশিষ রায়, বিপ্লব দাশগুপ্ত, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনুর শর্মা, দেবব্রত চৌধুরী, কমল সাহা, রত্না দত্ত, কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনী চৌধুরী।

এইচ জি. আই। এই প্রতিষ্ঠানের নাট্যবিভাগ গত মাসে হিন্দি হাই স্কুল মঞ্চে তাঁদের প্রথম নাট্য প্রয়াস নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' পরিবেশন করেন। অরুণাংশুর ভূমিকায় বিনয় চক্রবর্তী, রাজীবের চরিত্রে শিবেন চক্রবর্তী, কমলার ভূমিকায় স্বপ্না মিত্র ও মিলির ভূমিকায় ইন্দিরা দে বিশেষ নাট্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। নির্দেশনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন বিমল দে।

হাওড়া কো-অপারেটিভ। হাওড়া ডিসট্রিক্ট কো-অপারেটিভ স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি রঙমহলে শরৎ মুখোপাধ্যায়ের 'সূর্যমণি' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। সলিল গুহের সুপরিচালনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়। অভিনয়ে মুরারী রায়, গোপাল সেন, সুধীর সাহা, প্রদ্যোৎ দাস, পুলিন পাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সরকার, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনতি চক্রবর্তী ও বীণা ঘোষ দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন।

হুংকং এ্যাণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্ক। স্টার মঞ্চে এঁরা গত মাসে অভিনয় করলেন তারু চট্টোপাধ্যায়ের সুখ্যাত নাটক 'কানাগলি'। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন, বিজেন ভট্টাচার্য, যতেশ গুপ্ত, সুনীল ও নিমাই দে, সুনীল দাস ও প্রতিমা পাল।

ব্রাদার্স অ্যাণ্ড সিস্টার্স ইউনিট। এই সংস্থার শিল্পীরা কয়েকদিন আগে বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী হলে শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছেন। জ্যোৎস্না গুহের বিন্দু, অন্নপূর্ণা সাহার বিন্দুর মা, স্বপন পালের যাদব, মালতী মুখোপাধ্যায়ের অন্নপূর্ণা দর্শকদের চিত্ত আলোড়িত করে। দেবা দাস ও শাশ্বতী সাহিড়ীর অভিনয়ও সুখভোগ্য হয়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন, মালতী মুখোপাধ্যায়, শ্রাবণী মুখোপাধ্যায় ও বুলবুল সাহিড়ী।

নাট্য পরিক্রমা।

১৩৭৬ সালে কলকাতার সাধারণ নাট্যশালাগুলি গ্রাহকের অনিশ্চিত অবস্থা সত্ত্বেও মোটামুটি সন্তোষজনক কর্মকুশলতা এবং সাফল্যের নজীর রেখেছেন।

স্টার থিয়েটারের যা বৈশিষ্ট, মনোরম প্রযোজনা, সুলিখিত ঘরোয়া নাটক, আরামদায়ক প্রেক্ষাগার এবং সুঅভিনয়—তাঁদের বর্তমান নাটক 'শর্মিলা'য় তা পুরোপুরি বজায় আছে। এ বিষয়ে নাট্যকার ও পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

বিশ্বরূপায় 'ঘর' ছিল একটি দারুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক যার উপস্থাপনায় প্রচুর সাহসের পরিচয় ছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেঘের উপর প্রাসাদ' নামক উপন্যাস থেকে এই নাট্য রচনা করেছিলেন রাসবিহারী সরকার। এঁদের বর্তমান নাটক 'বেশম মেরী বিশ্বাস' সত্যিই এক বিরাট ও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। বিমল মিত্রের ঐ নামের উপন্যাস থেকে নাটকটি রচনা করেছেন রাসবিহারী সরকার। এই ঐতিহাসিক নাটকের প্রযোজনা এবং অভিনয় যেন নতুন যুগের সূচনা করেছে।

রঙমহলের শিল্পীগোষ্ঠীর মতো কমেডি টীম আর দ্বিতীয় নেই। এঁরা এঁদের ক্ষমতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন। তাই পর পর কৌতুক ব্যঙ্গ রসাশ্রিত নাটকের অভিনয় করে চলেছেন। 'সেমসাইড'-এর পর এঁদের বর্তমান নাটক সুনীল চক্রবর্তী রচিত 'আমি মন্ত্রী হব' কলকাতার নাট্যানুরাগীদের মধ্যে হাসির তুফান তুলেছে সেই সঙ্গে ভাবিয়েছেও।

মিনার্ভায় লিটল থিয়েটার গ্রুপ তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী বিশেষ মতবাদ সম্বলিত নাটকের অভিনয় করেন। এঁদের 'লেনিনের ডাক' একটি উপভোগ্য নাট্য সৃষ্টি।

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে অভিনয় করছেন তরুণ রায়ের দল। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বনফুল বৈরাগী প্রণীত বহুল-নাটক 'মুখোসের আড়ালে' বর্তমানে এই মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। এই দলের পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা তরুণ রায় যে একজন কৃতবিদ্য ও নাট্যবিশারদ অভিনয় শিল্পী তা আজ বলাই বাহুল্য।

আমরা আশা করব, নতুন বছরে অর্থাৎ ১৩৭৭ সালে বাংলার নাট্যশালা তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আরও সচেতন হবেন এবং সমাজ কল্যাণকর আদর্শমূলক ও সেই সঙ্গে উপভোগ্য নাটকাবলী পরিবেশন করবেন। বাংলাদেশের দর্শক যে কৃপণ অনুদার ও অরসিক নয়, এ প্রমাণ তাঁরা বরাবরই পেয়ে আসছেন, বাংলা নাট্যের দর্শকদের প্রতি তাই তাঁদেরও বিশেষ কর্তব্য আছে।

জ্যোতির্ময়

আমাদের ফুটবল খেলা :

এটা নিঃসন্দেহ যে স্পোর্টস-এর উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গত আট দশ বছরে ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। যে সুযোগগুলো ভারতবাসী আগে কল্পনাও করতে পারেনি আজ সেগুলো আমাদের হাতের মুঠোয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিদেশে পাড়ি দেওয়া লেগেই আছে। যেমন অলিম্পিক, এশিয়ান্ গেম্‌স, থমাস কাপ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। খেলোয়াড়দের আশা ও উৎসাহের অভাব নেই। বছর বছর তাদের সম্মান ও খেতাব দেওয়া হচ্ছে, অর্জুন পুরস্কার, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ইত্যাদি।

আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজ্যে ফুটবলের নানা প্রতিযোগিতা। কিন্তু এত সত্ত্বেও ফুটবলের ক্ষেত্রে এশিয়ার মধ্যে ভারতের স্থান এত নীচে কেন? অনেকে বলবেন, এর জন্যে পরিচালকমণ্ডলী দায়ী। আমি বলব, দায়ী খেলোয়াড়রা প্রধানত। তাঁদের যেন নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্যক চেতনা নেই। তাঁরা বোধহয় জানেন না যে ভবিষ্যত খেলোয়াড়দের তাঁরাই পথপ্রদর্শক ও প্রেরণা স্বরূপ। বিশেষ করে আজকের যাঁরা ভাল খেলোয়াড় তাঁদের সম্বন্ধেই বলছি। তাঁদের জীবনযাত্রা, তাঁদের সাধনা, তাঁদের আচার আচরণ আদর্শ স্বরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু আজকের ভাল খেলোয়াড়দের মধ্যে ক'জনের সম্বন্ধে আমরা মুক্তকণ্ঠে একথা বলতে পারি?

তারপর আমাদের দেশের কোচিং। তাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। কোচ যাঁরা তাঁরা নিজেরাই ভাল খেলা কোনদিন খেলেন নি। কিন্তু আমরা জানি বিশ্বের নামকরা ক্লাবগুলির সমস্ত কোচরাই অতীত দিনের এক একজন দিকপাল খেলোয়াড় ছিলেন। বিদেশে সারা বছর ধরেই কোচিং চলে। অফ্ সিজনের থিওরিটিকাল ট্রেনিং, মরশুমের সময় হাতে কলমে শেখা। কত তার আয়োজন, কত পাঠ্য বিষয়, কত পরীক্ষা! আর আমাদের দেশে? খেলোয়াড়রা কোচিং-এর মর্মই পেলে না, মনে করে এটা একটা বাড়তি ঝঞ্ঝাট। আর কোচরাও বেশির ভাগই ট্রেনিং-এর মর্ম খেলোয়াড়দের বোঝাতে পারেন না। এমন কি, দেখেছি, বেশির ভাগ কোচ-ই শারীরিক দিক থেকে পুরোপুরি ফিট নন, ফিজিকাল ডেমনস্ট্রেশন দেবার ক্ষমতা নেই তাঁদের। অ্যাডভান্স্ কোর্স বা টীম ট্রেনিং দেবার মতো কোচ সারা ভারতে খুব কমই আছেন।

যেমন ঢেউএর পর আর একটি ঢেউ ঠিক আপনা থেকেই তৈরী হয়ে আসে, তেমনি প্রগতিশীল দেশগুলোও ধাপে ধাপে খেলোয়াড় তৈরী করতে থাকে। আমাদের দেশে দুটি মাত্র ধাপ, একটি জুনিয়ার যাদের বয়স একুশের কম, আর একটি সিনিয়ার, যাদের বয়সের ঠিক নেই। এই দুই ধাপ করার অর্থ এই যে, একজন চলে যাচ্ছে, অপরজন তা পূর্ণ করছে। কিন্তু আমরা এখনো বুঝছি না, জুনিয়ার বা সিনিয়ারের সত্যার্থ কি? যারা সিনিয়ার ইণ্ডিয়া দলে স্থান পেলেন বা প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ গ্রহণ করলেন তাঁরা আবার জুনিয়ার দলে কি করে স্থান পান? বার বারই দূর এশিয়া ফুটবল প্রতিযোগিতায় তাই দেখছি, বোঝা যাচ্ছে না, কারা জুনিয়ার আর বা সিনিয়ার। ফলে ধাপে ধাপে খেলোয়াড় তৈরীর যে পরিকল্পনা এবং যে পরিকল্পনা ঠিক মতো কাজ না করলে খেলোয়াড় তৈরী অসম্ভব, সে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাচ্ছে।

ইংলণ্ড, জার্মানি, ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কোন খেলোয়াড় প্রথম শ্রেণীর খেলার অংশ নেবার পর আর তাঁকে যুব জাতীয় দলে দলভুক্ত করা হয় না, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম সেসব দেশে আছে। কিন্তু আমাদের দেশে ম্যাচ জেতবার জন্য জুনিয়ার প্রতিযোগিতাতেও আমরা সিনিয়ার খেলোয়াড় দলভুক্ত করি, ফলে অনেক উঠ্‌তি জুনিয়ার খেলোয়াড় যাঁরা খেলার সুযোগ চাপান এবং হতাশ বোধ করেন। খেলার সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে এরে কত বড় ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা তা এদেশের ক্রীড়াপরিচালক মণ্ডলী অথবা ক্লাবগুলি কেউই বোঝেন না।

ভাল খেলোয়াড় সৃষ্টি করতে হলে, আরও বুদ্ধিযুক্ত পরিকল্পনা, সংবৎসরের ট্রেনিং এবং জুনিয়ার ও সিনিয়ার খেলোয়াড়দের সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা দরকার। নচেৎ আমাদের দেশের ফুটবলের উন্নতি কোনদিনই হবে না।

—স্বরাজ ঘোষ

ফুটবল খেলার প্রতি মানুষের আগ্রহ কত বেড়েছে খেলার মধ্যে গেলে তা দেখা যায়! দিন দিন দর্শক সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অধিকাংশ মানুষই খেলা দেখবার সুযোগ পান না। কোন খেলার ধারাবিবরণী রেডিওতে শোনা গেলে দেখা যায় দোকানের সামনে শ্রোতার ভীড়, সেই দোকানে রেডিওর সেই ধারাবিবরণী শোনা যাচ্ছে। খেলার প্রতি আগ্রহ এত বেড়েছে কিন্তু খেলার মান বাড়ছে না, এটা কি তজ্জব ব্যাপার নয়!

কলকাতার ফুটবলকে ভারতের পথিকৃৎ বলে অনেকেই স্বীকার করেন। কলকাতায় এসে না খেলা পর্যন্ত খেলোয়াড় সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পান না—এটা যেন প্রবাদবাক্য। তারই জন্যে প্রতি বছর বহু খেলোয়াড় অন্য রাজ্য থেকে কলকাতায় আসেন।

কিন্তু স্থানীয় খেলোয়াড়দের ক্রমশ পিছিয়ে পড়বার কারণ কি? অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন সুযোগের অভাব। বাস্তব ঘটনা কি একথা স্বীকার করবে? বড় বড় ক্লাবের কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু কলকাতায় অসংখ্য মাঝারি ক্লাব রয়েছে (বড় ক্লাব আর কটা?), যে দল গুলিতে খেলোয়াড় তৈরী হতে পারে, কিন্তু কই, খেলোয়াড় তো তৈরী হচ্ছে না, খেলার মানও বাড়ছে না।

এর জন্যে কতক অংশে খেলোয়াড়রাও দায়ী, তাঁদের অনেকের মনোভাবও নিন্দনীয়। খেলোয়াড়দের বর্তমান দলত্যাগের মনোভাবে জর্জরিত। কথায় কথায় দলত্যাগ, দলের প্রতি আনুগত্যের অভাব। নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি বীতরাগ। অবশ্য ক্লাবের কর্মকর্তাদের বৈষম্যমূলক আচরণও এই অবস্থার জন্যে কম দায়ী নয়। কর্তাদের নজরের মধ্যে পক্ষপাত অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। কেউ পড়েন সুনজরে, কেউ দুনজরে। যিনি সুনজরে পড়লেন তাঁর পোয়াবারো, খেলতে পারুন আর নাই পারুন, তিনি সুযোগ পেতেই থাকবেন, আর যিনি যত ভালই খেলুন, দুনজরে পড়লে তাঁর বারোটা বেজে গেল।

তারপর খেলোয়াড়দের দেহের শক্তির সঙ্গে নৈতিক শক্তিও কী করে বজায় থাকবে, সেজন্যে বিদেশের শিক্ষণ শিবিরে কড়াকড়ি নিয়ম, খেলোয়াড়দের জীবন যাত্রায়ও সেই নিয়মের বাঁধন। অর্থাৎ তোমার নৈতিক চরিত্র যদি ভাল না থাকে তাহলে তুমি যত বড় খেলোয়াড়ই হও দলে তোমার জায়গা হবে না—এ জ্ঞান খেলোয়াড়দের থাকা উচিত। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই চেতনা প্রতি খেলোয়াড়ের মধ্যে করে দেওয়া হয়।

পাশাপাশি আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি, অনেক ভাল খেলোয়াড়ও খেলাকে সাধনা হিসাবে না নিয়ে, ক্যাশান হিসাবে নিচ্ছেন—যেন সুন্দরী মেয়ে বরার একটা কোয়ালিফিকেশন হিসেবে। অনেক খেলোয়াড়কেই দেখা গেছে, খেলার পর মাঠ থেকে বেরিয়ে বান্ধবী নিয়ে নির্জন পুরীতে চলে যান। পানদোষও অনেকের মধ্যে পাওয়া গেছে। অনেক সোসাইটি পরিবার দেখেছি যাঁরা খেলোয়াড় বাছাই করেন নিজেদের মেয়েদের জন্যে। তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যান। মেয়েদের ভিড়িয়ে দেন খেলোয়াড়ের সঙ্গে। আর খেলোয়াড়রাও সেই সমস্ত সোসাইটি গার্লদের সঙ্গে মিশতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করেন।

আমার কাছে এমন বহু তথ্য আছে, কলকাতার কোচিং ক্যাম্পে, মাঠের বাইরে খেলোয়াড়রা বান্ধবীদের নিয়ে কী করেন আর না করেন তার অনেক দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি।

বর্তমান খেলার মান অবনতির জন্যে এই ঘৃণনীয় আচরণ বিধি যে অনেকখানি দায়ী তাতে সন্দেহ নেই। এই অবস্থার অবসান যদি না ঘটানো যায়, খেলোয়াড়দের এই চেতনা না জাগে যে খেলা শুধু খেলা নয়, খেলা মস্ত বড় সাধনার জিনিষ, সেজন্যে নৈতিক মেরুদণ্ডই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, যদি এই বোধ খেলোয়াড়দের না জাগে যে তিনি শুধু নিজের দলের নয়, সারা দেশের প্রতিনিধি (বিশেষ করে শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়রা যদি এ সত্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম না করেন) তাহলে কলকাতার ফুটবলের তথা বাঙালীর ফুটবলের মান উন্নতির আশা করা বৃথা।

—শৈলেশ চৌধুরী

মধুমালতী

শ্রীহেমন্ত বালা দেবী

তার নাম ছিল মধুমালতী। থাকতো পল্লীগ্রামে। খড়ের চালের চালাঘর ছিল তাদের। ছিল গাই বাছুর, আম বাগান, ফল ফুলের বাগিচা, পুকুর আর ধান ক্ষেত। ছিল রাখাল, মালী, জন দুনীর কৃষি কাজের জন্যে। মধুমালতী মা বাবার একটি মাত্র মেয়ে। বাবা ছিলেন প্রথমে জমিদার, পরে জোতদার। মধুমালতী বালবিধবা। মা বাবা তাকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণ করলেন। শ্রীবৃন্দাবনে নিয়ে গেলেন। মধুমালতী সেখানেই বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কিছুদিন থেকে সেখানকার সব রীতিনীতি শিখে নিল। পরে দেশে ফিরে শ্রীনবদ্বীপে এসে থাকলো। সেখানেই সে নিজের মনের মত অষ্টধাতু ও কালো পাথরের শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করে গ্রামে ফিরল। মেয়েকে সুখী করবার জন্যে বাবা অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হলেন না। গড়ে উঠল মাধুমালতীর দেবমন্দির, পঞ্চচূড়া ছন্দে। সেখানে বসলেন শ্যামসুন্দর, রাধারানীর সঙ্গে। বসলেন, কৃষ্ণবলদেব শ্রীদাম সুবল। বসলেন নন্দ, যশোদা, রোহিনী, দুই গোপাল শাদা কালো। তাতেও তৃপ্তি হোল না, গড়ে উঠলো নিকুঞ্জ মন্দির। সখীগণ সহ শ্রীরাধা বল্লভ এসে বসলেন। অষ্ট ধাতুময় বিগ্রহ। তারপর এলেন পঞ্চতত্ত্ব ও গৌর গোপাল। এলেন পূজক, সেবক পাচক ব্রাহ্মণ তিন জন। বেতনভোগী জন এঁরা, বাবার বন্ধুজন। মেয়ের প্রতি মায়া বশতঃই এলেন তাকে সাহায্য করতে। প্রণাম পাবেন অবশ্য। নবীন উৎসাহ উদ্যমে জেগে গেল মধুমালতী ঠাকুর সেবায়। তারই মত বালবিধবা এবং কুমারী কয়েকটি সখী এসে জুটলো। তারা সেলাই করে, বোনে, আঁকে, রচনা করে। তারা মন্দির বানায়, আলপনা দেয়, তৈরি করে ফুলের অলঙ্কার। তারা গান গায়, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করে। শিশুরা সেজেগুজে এসে নাচে, করে অভিনয়। বৈশাখে চন্দন যাত্রা, বৈশাখে ফুলের কাজ বেশি। ফুলময় বাংলা। প্রতি পূর্ণিমায় রাসনৃত্যাভিনয়, কীর্তন পদাবলী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কথকতা। জ্যৈষ্ঠে স্নান যাত্রা, জল যাত্রা, বনবিহার। তারপর আসে কালীদমন যাত্রা, আসে রথযাত্রা উৎসব। শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন এসেছেন পুরী থেকে। এসেছে রথ, গড়ে উঠেছে গুণ্ডিচা বাড়ি। তারপর শ্রীগুরু পূর্ণিমা তারপরে শ্রাবণে ঝুলন, রাখী পূর্ণিমা। ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দশী। আশ্বিনে শ্রীবলদেব জন্মযাত্রা উৎসব। মহাপূজা, দুর্গোৎসব, কোজাগরী, শারদীয় রাস। কার্তিকে নিয়মসেবা, দীপাবলী, সাত্ত্বী। কার্তিক অগ্রহায়ণে জগদ্ধাত্রী পূজা, বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী, মহারাস, নবান্ন। পৌষে পুষ্যাভিষেক, পৌষলক্ষ্মী, পিঠক উৎসব, বন ভোজন। মাঘে মাঘ স্নান, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, পিঠক ভোগ, গজ উদ্ধারণ, বাসন্তী পঞ্চমী, শ্রী অদ্বৈত সপ্তমী, ভীমাষ্টমী, শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, পূর্ণিমা উৎসব ফাগুনে শ্রীশিবরাত্রি, বাসন্তী পঞ্চমী থেকে দেড়মাস দোল উৎসব। চৈত্রে বাসন্তী বাসন্তী পূজা, বলদেব-রাস যাত্রা। বারোমাস হয়ে ওঠে উৎসব ময়। পাঠ, কীর্তন, ভজন, কথকতা, পাঁচালী, অভিনয়। মধুমালতীকে তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে অবকাশ দেন না মাতাপিতা। সারাদিন ঘরে খাটিয়ে নেন চোখে চোখে রেখে। রাত্রি এক প্রহরে সে ঘুমে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু বয়সটা হোলো বাইশ। যথা সময়ে চাঁদ ওঠে,

মলয়া বয়, ফুল ফলের সুগন্ধ ভাসে বাতাসে, পাখীরা ডাকে। মন কেমন করে। কেন যে কেমন করে, জানে না মধুমালতী। সে বারো বছর বয়সে বিধবা। শ্রীবিগ্রহে তার অঙ্গমনস্কতা দূর করতে পারেন না। কেন যে সে অকারণে কাঁদে, সে তা' নিজেই জানে না। এমন সময় এলেন গোস্বামী প্রভু শ্রীনবদ্বীপ ধাম থেকে। সঙ্গে যুবক পুত্র কুমুদ। পিতাপুত্র উভয়েই পরম রূপবান। বর্ণ কাঞ্চন গৌর সর্বাঙ্গ সুগঠন, স্বাস্থ্যবান, সাধুপুরুষ বলেই জ্যোতির্ময় চেহারা। মুক্তগুম্ফমুণ্ডিত। তিলক শোভিত, তুলসী-কণ্ঠী পরিহিত, পুষ্পচন্দন ভূষিত। মস্তকে নামাবলীর উষ্ণীষ পরিধানে শান্তিপুরের সূক্ষ্ম ধুতি, মুর্শিদাবাদী সিল্কের চাদর। দক্ষিণ হস্তে নবরত্ন আংটি, দোনার তাগা, আজানু ত্রিধাতু নির্মিত রত্নাঙ্গুরীয়, গলায় স্বর্ণসূত্র গ্রন্থ সোনার ইষ্ট কবচ, হাতে গোমুখী অথবা শ্রীহরিনাম জপের ঝোলা, পায়ে খড়ম। পিতা অনায়াসেই ভক্তি আকর্ষণ করেন। পুত্র ডেকে আনেন লজ্জা ও ক্রন্দন। একমাস ছিলেন। চলে যাবার পর থেকে মধুমালতী আর দেবার্চন নিত্যকর্মে, গৃহকাজে মন দিতে পারে না। তার ভাবান্তর পিতা-মাতাও লক্ষ্য করলেন। তাঁরা অবুঝ নন, কিন্তু জাত-ধর্ম সমাজ আছে। বিধবা বিবাহ এ বংশে হয়নি কখনো। মেয়েকে পাঠালেন কাশীতে দিদিমার কাছে। সেখানে দিদিমা, দুই মামা, দুই মামী, পাঁচটি মামাতো ভাই। মেয়ে হয়নি, মধুমালতীই ভাইদের একমাত্র দিদি। তাদের মামা মামী নেই কারোই। দুই ভাই দুই বোন। মধুমালতীকে তাঁরা সাদরে গ্রহণ করলেন। তার পিতার নির্দেশে দুই মামা এবং সদ্য কলেজে ঢোকা বড় মামাতো ভাই মধুমালতীর পড়াশোনার ভার নিলেন। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান (নানা শাখা) পড়া আরম্ভ হোলো। এত কা- ঘাড়ে পড়লে যে অন্য চিন্তার অবকাশ নেই। একলা থাকার জো নেই। দিদিমা, দুই মামা চোখে চোখে রাখেন। কাঁদার সময় নেই। সারাদিন খাটুনী রাত্রে অগাধ ঘুম। পাঁচটি বছর গেলো। প্রাইভেটে পড়ে পরীক্ষা পাশ করল, তারপরে পড়াশোনাতেই ডুবে রইল। ইতিমধ্যে চিত্ত শুকিয়ে খটখটে হয়ে এলেও বয়সটার তো নানান্ দোষ। মধুমালতী আবিষ্কার করলো মনের ভাবনাগুলো ঠিক একই খাতে বয় না। তার নানা রূপ, নানা ছন্দ, নানা রঙ, নানান্ শাখা। শুধু বই নিয়েও আর থাকা যায় না। ইতিমধ্যে দিদিমার অসুখ, মা এলেন তাঁকে দেখতে। বাবা ঠাকুর সেবা নিয়ে ঘরে আছেন। দিদিমার কাশী প্রাপ্তি হোল।

মাসখানেক পরের মায়ের সঙ্গে মধুমালতী দেশে ফিরল। দেশে এসেই পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে। সে ভেবেছিল কুমুদকে ভুলে গেছে। ভোলেনি তো! কিন্তু উপায়?—বাবা বললেন, "অবিদ্যার পুঁথি" অনেক তো পড়া হোল। এবার কিছু ব্রহ্মবিদ্যার পুঁথি পড়ো।" পড়তে দিলেন ধর্মগ্রন্থ, জ্ঞানমার্গ, যোগ মার্গ, ভক্তি মার্গ। সবই জানা গেল, বোঝা গেল, কিন্তু পুঁথি, সেতো প্রাণবন্ত নয়। সে তো রক্তের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনা। কী করে জীবন কাটে? বাবা একটি মা মরা ছেলে—স্বজাতিরই, পাড়া থেকে কুড়িয়ে এনে দিলেন। "একে মানুষ করো, একে আমাদের ধর্মে এনে এরি হাতে সব দিয়ে যেতে হবে।" নাম হোলো অজিত। তা' অজিত খানিকটা সান্ত্বনা বই কী। তা হলেও কুমুদকে ভোলা যায় না। দিন যায়। আরো পাঁচ বছর। এবারে বাবা অল্প কয়েক দিনের রোগে মারা গেলেন। সংসার চলে কী করে। মা শক্ত হাতে হাল ধরলেন। শিষ্য সেবক ছিল। কাছে এসে দাঁড়ালো। এমন সময় গোস্বামী প্রভু আবার এলেন। এবারে পুত্রকে সঙ্গে আনেননি। শোনা গেল, এখান থেকে যাবার পরেই পুত্র নিরুদ্দেশ। দশ বছর পরে তাঁর দেখা পেয়েছেন। সে আগেই তিনটি বিষয়ে এম. এ, এম. এস সি পাশ করেছিল। দর্শন, মনস্তত্ত্ব আর নৃতত্ত্ব নিয়ে অনেক চর্চা করেছে। নানা দেশ ঘুরেছে, কিছুটা জাদুবিদ্যাও শিখেছে। বিবাহ করেনি। এখন সে মধুমালতীকে চায়।

"সর্বনাশ। একী কথা।" মা চমকে উঠেন। গোস্বামী প্রভু বললেন, "কালের গতি দুরত্যয়া। ঘোর কলিযুগ আসত। তুমি আমি দৈবকে ঠেকাতে পারব না। আমার একমাত্র ছেলে, সে একে না পেলে আত্মঘাতী হবে। তুমি আমার ছেলেকে বাঁচাও।"

মা মেয়েকে নিয়ে নবদ্বীপ ধামে গেলেন। উঠলে ডেরা নিল। সমস্ত ঠাকুর দেবতা সঙ্গে নিয়ে উঠলে দেশের গ্রাম থেকে এবং নবদ্বীপ থেকে অনেক দূরে, অন্য এক গ্রামে বাসা বাঁধলো। সেখানে তারা ভজন সাধন আরম্ভ করে দিল।---কুমুদের বিদ্যা কাজে লেগেছে। সে কামকে প্রেমে রূপায়িত করতে পেরেছে। তারা পরস্পরের ভজন-সাথী হয়েছে। মা অজিতকে নিয়ে সংসারে আছেন। অজিত মাসোহারা দেবে মধুমালতীকে। এখন মা দিচ্ছেন। গোস্বামী প্রভু ভাতুষ্পুত্রকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করেছেন, সেখান থেকেও আসছে মাসোহারা। আর স্থানীয় গ্রামবাসীদের সংযোগিতা।

কুমুদ, মধুমালতী নূতন নাম নিয়েছে প্রেমদাস আর ঘুঘল-দাসী। তারা ভক্তিগ্রন্থ সমস্ত পাঠ ও অনুশীলন শেষ করে নিজেরাই নূতন ভাব, নূতন ভাষায় নূতন ভক্তিগ্রন্থ লিখেছে। সে গ্রন্থে আছে প্রেমের কথা, ভাবের কথা, রসের কথা, আনন্দের কথা, সৌন্দর্যের কথা। সে গ্রন্থে নাই আদিরস, স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির আকর্ষণ। সে গ্রন্থে আছে সরল সহজ স্বাভাবিক রুচিভাপূর্ণ ভজন পদ্ধতি। নাই খুঁটিনাটি ঘোর প্যাচ, নাই অনুষ্ঠানের জটিলতা। তাদের সুশিক্ষিত হাতে পড়ে ধর্ম, ধর্মানুষ্ঠান, মনোভাব সমস্তই অতি সুমার্জিত, নির্মল, উন্নততর রূপ নিয়েছে। তাদের জীবন বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তারা এখন উন্নততর মানুষ। তারা শুষ্ক কঠোর বৈরাগ্য নেয়নি, ভেণী হয়নি। কিন্তু মণিমন্ত্র মহৌষধি বলে তারা নূতন জীবন নূতন আনন্দ পেয়েছে, যার অনুভূতি আমরা কেউ এখনো পাই নি।

এই প্রথম

অপরাহ্ণবতী

সুবোধ সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরীক্ষিৎ তার ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীর নিয়ে ফিরে এল কলকাতায়। এসে দেখল একটা খবর এখানেও তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সত্যসুন্দর এসেছে অনেকদিন পরে।

তাকে দেখে পরীক্ষিৎ আশ্চর্য হয়নি। সে ওদের বাড়ীতেই মানুষ হয়েছে—তার রকম-সকম স্বভাব সকলেই জানে। ছোটবেলা থেকেই ও আলসা বাঁধনের মানুষ। এমন আসক্তিহীন এবং উদাসীন চরিত্র অধিক বয়েসের মধ্যে খুঁজলে কিছু হয়ত দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু একটি জোয়ান যুবকের মধ্যে সচরাচর তা দেখা যায় না। এ-স্বভাবের লোক এই বয়েসে দেখলে আমরা আশ্চর্য হই।

একদিন সকালে ছোট আয়নার সামনে পরীক্ষিৎ দাড়ি চাঁচবার জন্যে সেফটি রেজর গালে ঠেকিয়ে আয়নার দিকে ঝুঁকে বসল।

আয়নার দিকে তাকিয়ে কিন্তু সে রীতিমত অবাক হয়ে গেল। দেওয়ালে টাঙানো সুমিত্রার একটা ছবি আয়নাতে প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে। দিনের পর দিন এই জায়গায় বসে, এমনিভাবে আয়নাটাকে কাৎ করে সে দাড়ি কামাবার জন্যে এখানে এসে বসেছে কিন্তু চুলে-ফুল-পোঁজা এ-মুখটা তো আয়নাতে এসে পড়েনি কোনদিন!

একটি বিশেষ মুহূর্ত বুকে এ-ছবিটির ছায়া যেন আয়নাতে ওর চোখের সামনে এসে পড়েছে—ঠিক যেন এখনই,—এ-সময়েই পরীক্ষিতের দুটি চোখের দৃষ্টির সামনে সুমিত্রার আসবার দরকার ছিল।

ঠোঁটের মধ্যে একটা হাসির টানের রেখা আছে বটে কিন্তু আজ তার মনে হল তার এই মুহূর্তের একটি ভাবনার ওপর প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ইঙ্গিত করবার জন্যেই তার ঠোঁটের কোনে একটি হাসি মিটি মিটি করে উঠেছিল সেদিন।

সুমিত্রার কঙ্কালসার রুগ্ন শরীরের কথা ভাবছিল সে। আর ভাবছিল তার বীভৎস, বিকৃত ও জীর্ণ মুখের কথা। এই মুখ ও এই শরীর নিয়ে সে যদি ফিরে আসে তাহলে দিনের পর দিন সে তার সঙ্গে বাস করবে কি করে? যাকে ভালবাসত,—সে নয়, যাকে একদিন ভালবেসেছিল সে চলে গেছে। রুগ্ন-কঙ্কাল নিয়ে মানুষ কি কখন রূপসী ভার্য্যার তৃষ্ণা মেটাতে পারে? বিকৃত মনোভাবের মানুষ ছাড়া অন্যায় জীবন নিয়ে কোন পুরুষ কিংবা নারীর যৌবন কি কখন ভালবেসে তৃপ্তি লাভ করে সুখী হতে পেরেছে? তবে তার এই লজ্জোজাত অনুভূতিকে সর্ব্বদা কড়া শাসনে নজর-বন্দী করে রেখে পরীক্ষিৎ এত কষ্ট পাচ্ছে কেন? বিশ্বাস কর! সে এই অনুভূতির জন্যে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে, বুঝতে পারছে অমানুষিক অন্যায় করছে সে। সে জন্যে পরীক্ষিৎ লজ্জিত তবু শত চেষ্টা করেও সুমিত্রার কাল্পনিক কদাকার চেহারার প্রতি তার বিতৃষ্ণাকে তাড়াতে পারছে না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ছবির ছায়া আয়নাতে পড়ে হেসে ফেলল আর তার ভাবনাটাই যেন হঠাৎ চমকে উঠল।

পরীক্ষিৎ মুখ তুলেই দেখতে পেল সত্যসুন্দর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে প্রণাম করে চুপ করে

দাঁড়িয়ে রইল সে। পরীক্ষিৎ ওকে দেখেও কোন কথা বললো না,—দাড়ি কামাতে লাগল।

সত্যসুন্দর সুন্দরদির ছেলে,—একমাত্র সন্তান। সত্যসুন্দর ওর মায়ের পেট আসে থেকেই এ-বাড়ীতে আছে। বলতে গেলে এই বাড়ীতেই তার আত্মীয়, কিন্তু এখানেও সে বছরে দশ বারো দিনের বেশী থাকে না। দেশের বাড়ীতে ওর মা যখন একলা পড়ে থাকত তখনও তাকে দেখবার জন্যে সে খুব অল্পদিনই সেখানে গেছে। সংসার সম্বন্ধে তার বিতৃষ্ণা আছে কিনা বলা কঠিন কিন্তু সেদিকে যে তার কোন আকর্ষণ নেই তা বোঝা যায়।

সত্যসুন্দরকে ভালবেসে কাছে রাখা যায় না আবার ঘৃণা বা অপমান করে দূরেও সরিয়ে দেওয়া চলে না। ওর নিরহংকারী, অমায়িক ও নিরীহ মন একটি লক্ষ্যকে সার্থক করবার জন্যে কিছুটা অসামাজিক, কিন্তু পরিমাণে ক্ষতিহীন এবং সব বিষয়ে অদৃষ্ট নির্ভরশীল হয়ে অন্য সব মানুষ থেকে যেন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। পৃথক পথ ধরে চলেছে সে—ভিন্ন প্রকৃতির একটি মন। সমস্ত মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে বিশ্বাস হারিয়ে বসে আছে সে-বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে ওর যেন একটা রোখ চেপে গেছে। ঘুরছে সে দেশে দেশে, আশ্রমে আশ্রমে, তীর্থে তীর্থে, দূরদূরান্তরে, দেশদেশান্তরে। আশ্চর্য হতে হয় স্বভাব দেখে। কারো জন্যে ওর কোন শোক, কিংবা কোন বিষয়ে ওর কোন দুঃখ তার মনে আজ পর্যন্ত পরীক্ষিৎ দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। ষোটে তো আঠারো উনিশ বছরের ছোকরা কিন্তু অল্প বয়সে ও দুঃখ-বৈরাগ্য, অভাব-অভিযোগ-অনাটনকে এমন-ভাবে তুচ্ছ করবার স্পর্দ্ধা পেল কোথা থেকে? ওর দুটি চোখ, ওর ঠোঁটের শান্ত পরিচ্ছন্ন হাসি যেন আনন্দে ভরা হয়ে আছে। সত্যসুন্দর দুঃখবৈরাগ্যে ভেঙে পড়েনি কোনবার বরং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে প্রতিবার।

সত্যসুন্দর কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। যদি একটু একটু হেসে হেসে সে কথা না বলত তাহলে তার বোজা চোখের পাতা দেখে মনে হতে পারত ও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর লোম্বা সীথি আর ঢেলেসেজে পালিশ করা চুল, ঢোলা হাতা পাঞ্জাবী, আর সটান কোমান খাটো ধোঁচা দেখে আজকালকার মডার্ন ছেলেরা নাক সিটকাবে। তার স্বভাব-চরিত্র ও জীবন-যাত্রা দেখে তারা বলবে সত্যসুন্দর সেইজাতের মানুষ যারা এস্কেপিষ্ট,—দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে যারা ভয় পায়, যারা পৃথিবীর পক্ষে অনেকটা সমাজের কাছে মূল্যহীন।

দাড়ি কামিয়ে এতক্ষণ পরে পরীক্ষিৎ নিশ্চিন্ত হল আর অবসর হল কথা বলবার।

"কবে এলে?"

"পরশু—।"

"ছিলে কোথায়?"

"রূপনারায়ণপুরে—আশ্রমে।"

"আমি কয়েকদিনের জন্যে লিলাপুরে গিয়েছিলাম,—কালই ফিরেছি।"

কোন খবর পাওয়া গেল?"

"সুমিত্রার?"

"হ্যাঁ—ছোটমা'র।"

"সেনটার খবরই পাওয়া যায় নি এ-পর্যন্ত—ওর আর খবর পাবো কি করে! বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য।—বেঁচে নেই কেউ।"

"খুব জোর করে বলতে পারি না আমি। রূপনারায়ণ-পুর থেকে সেই খবর পেয়েই ছুটে এসেছি—।"

আশার সঙ্গে লড়তে লড়তে পরীক্ষিৎ হয়রান হয়ে গেছে। এখন আশার যে-কোন কথাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শিখেছে সে। আশার মন-ভুলানো প্রতিশ্রুতি তাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে। আশার যন্ত্রণাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে গিয়ে ওর আশার মনটাই যেন শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

"শুভব? কি শুভব তুমি আবার নিয়ে এলে? শুনতে শুনতে যে কান ঝালাপালা হয়ে গেল!"

"শুভব বলে মনে হয়নি আমার। যিনি বলেছেন, তিনি মিথ্যে বলার লোক নন। ছোটমা আমাকে মানুষ করেছেন—তাকে কখন ভুলতে পারি না। তাকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারি—সার্থক মনে করব নিজেকে।"

ওর কথা শুনতে শুনতে পরীক্ষিৎ ভাবতে লাগল অন্য কথা।

সুমিত্রার বেঁচে থাকার স্বপক্ষে এতগুলি পাওনার প্রলোভনের যুক্তি সকলের মনেই আসছে কেন? একটি আশাকে বিশ্বাস করে রহস্যময় করে তুলছে প্রত্যেকেরই মনের পৃথিবী আর সে মিছে একটি নিরাশাকে অন্তহীন স্মৃতির দুঃখময় বিলাপে ভরে তুলছে প্রতিদিন। সকলের মত একই নিয়মে পরীক্ষিৎ একই কথা ভাবতে পারছে না কেন? সকলের অলক্ষ্যে ওর মনের একটি ভয়ানক ভাবনাকে টিটকারী দিয়ে হেসে উঠেছে যে-ছবি, মানুষকে সে কি কম ভালবাসে আর সবার চেয়ে? সেই ছবির মানুষকে সে এত বেশী ভালবাসে যে ওর রূপের কদর্য পরিবর্তন অব্যক্ত দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত পরীক্ষিতের মনকে অনবরত পীড়া দিচ্ছে। আর ওরা? আর ওরা কি ভাল বেসেছে যে সুমিত্রার শরীরের ক্ষত দেখে ওদের মন ক্ষতবিক্ষত হবে? ওরা বোধহয় কেবল রহস্যকেই ভালবেসেছে, সুমিত্রাকে নয়,—অন্ততঃ ওর মত অটুট, অক্ষত এবং সমগ্র সুমিত্রাকে নয়। ওরা বোধহয় কবর খুঁড়ে রহস্যের কঙ্কালকে খুঁজে বার করে টাঙিয়ে রাখতে চায় বাদুঘরে, যেখানে কসিলের সঙ্গে ইতিহাসের কৃতিত্বের একটা ঠাণ্ডা কথাবার্তা চলতে থাকবে দিনরাত। ঈশ্বর! তুমি আমাকে মুক্তি দাও!—সুমিত্রার মৃত্যু দিয়ে তুমি আমার ভালবাসাকে চিরজীবি করে রাখ; একটি সুন্দরকে অসুন্দর করে, অসুন্দরের একটি কণ্টকে বাঁচিয়ে রেখে জীবনে প্রেমের মর্যাদাকে কদর্য ও কুৎসিত হতে দিয়ো না।

পরীক্ষিৎ শুনতে পেল সত্যসুন্দরের কথা।

"বিশ্বাস আপনারও হবে—আপনি যা ভাবছেন তাময়।"

পরীক্ষিৎ ওর চেহারাটাকে তাকিয়ে দেখল। একটি কালো রংয়ের পেঁয়ো চেহারা, শান্তীর আড়ালে গলায় তুলসীর মালা, মজবুত নাক আর নিখুঁত স্বাস্থ্য। বিংশ শতাব্দীর এতগুলি নতুন ঝকঝকে পয়সার মধ্যে ও যেন আঠারো শতাব্দীর একটি অচল ও বেমানান ধরা পয়সা।

"ফিরিয়ে আনতে চাও তুমি? কি করে?—কি শুনেছ তার সম্বন্ধে?"

"গোয়ালিয়রের পণ্ডিতজীর এক ভাইয়ের মুখে শুনলাম কথাটা। কথায় কথায় তিনি তাঁর ভবঘুরের জীবন বলতে গিয়ে একটি ঘটনা বললেন।"

"গোয়ালিয়রে গিয়েছিলে নাকি?"

"না। তিনি রূপনারায়ণপুরের আশ্রমে এসেছিলেন আমাদের গুরুকে দর্শন করতে। সম্প্রতি বর্মা থেকে ফিরেছেন। সেখান থেকেই শুনে এসেছেন তিনি। তিনি যার মুখে কথাটা শুনেছেন তিনি কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুরের একটি নার্সিংহোমে ছিলেন।"

হঠাৎ লটান হয়ে বসল পরীক্ষিৎ,—

"নার্সিং হোম!—সিঙ্গাপুরের?"

"হ্যাঁ! সিঙ্গাপুরের একটা নার্সিং হোম।"

"নার্সিং হোমের রোগী ছিল লোকটা? নার্সিং হোমের নাম বলেছে কিছু?"

"না! তা পণ্ডিতজীর ভাই জানেন না। জিজ্ঞাসা করেনি তাকে। নামধাম খুঁটিনাটি জানার জন্যে তার কোন কৌতূহল ছিল না। এবং তা না থাকাই স্বাভাবিক।"

"Interest না থাকাই স্বাভাবিক বটে।—নার্সিং হোমের ডাক্তারের নামও জিজ্ঞাসা করে নি নিশ্চয়ই।"

"না। ডাক্তারের নামও শুনেছেন বলে মনে হয়নি তার। আর বলে থাকলেও ভুলে গেছেন। মনে করতে পারলেন না।"

"ডাক্তারের নাম জানার দরকারই বা কি তার।"

"আমাদের অবিশ্যি সুবিধে হত—যেটুকু জানা গেছে, খুবই আশ্চর্য!—সকলের বিশ্বাস না-ও হতে পারে।"

"কেন?"

"কারণ" একটু সন্তর্পণে তার কথাগুলো এগুতে লাগল,—"কারণ—ভদ্রলোকটি তখন রোগী—দশ-পনেরো দিন আগে তার সাংঘাতিক অস্ত্রোপচার হয়ে গিয়েছে ওর ওরেই তার কানে যা এসেছে তাই কেবল জানেন।"

সিগারেট ধরিয়ে এবার পরীক্ষিৎ ইজি চেয়ারের পিঠে এলিয়ে পড়লেন হঠাৎ।

"খবর মন্দ আনোনি তাহলে!"

"শুনলেম,—একটি রোগিণী এসেছে সেখানে—প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে লোকটি তাকে এনেছে সে তাকে সেখানে রেখে পালিয়ে গিয়েছে—নাম ঠিকানা কিছুই বলে যায় নি! বেয়ারা বলে,—লোকটা সাহেব। এই একটি মাত্র বেয়ারাই সাহেবটিকে দেখেছে। ডাক্তার লোক অত্যন্ত ভাল বলে মহিলাটির চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন। অন্য কেউ এ-ধরণের রোগীর ভার নিত না।"

পরীক্ষিৎ সোজা হয়ে বসল আবার।

"সাহেব—?"

"একেবারে খাঁটি সাহেব।"

"পুলিশে খবর দিলেন না কেন ডাক্তার?"

"কাকুতি-মিনতি করেছেন মহিলাটি—যেন জানাজানি না হয়।'

"কেন—?"

"মুখখানা পুড়ে গিয়েছিল স্থানে স্থানে, শাড়ীতেও আগুন ধরে গিয়েছিল, জলে ভিজে গিয়েছিল তার সাদা শরীর—এসব লক্ষ্য করবার বিষয়। মহিলাটি তার বিয়ের জীবনের একটি ইতিহাস বলেছেন ডাক্তারের কাছে,—ডাক্তার বিশ্বাস করেছেন তার কথা। আমার তো মনে হয় অর্থাৎ আমার নিজের ধারণা, মহিলাটি যা বলেছেন সবই তার বানানো কথা। ডাক্তারকে বুঝিয়েছেন কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। কারণ বেঘিয়েছেন, স্বামী অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসতো, ওর ওপরে অত্যাচার করত, মাতাল হয়ে মার-ধোর করত। অনেক সহ্য করেছিলেন কিন্তু যেদিন তার স্বামী অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলেন, সেদিন আর সহ্য করতে পারেন নি। আগুন ধরিয়েছেন,—পুড়ে যাচ্ছেন, চীৎকার করছেন তবু তারা বাঁচাবার একটুও চেষ্টা করে নি। দুজন তখন বাড়ীতেই ছিল। তারপর যখন এল তখন তার মুখ পুড়ে গেছে, শাড়ীতেও আগুন ধরে গিয়েছে—তিনি মাটিতে পড়ে ছটফট করছেন। স্বামী তার গায়ে এক বালতি জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে দিয়েছিলেন। তার সন্দেহ ও বিশ্বাস তিনি ইচ্ছে করেই আগুনে পোড়া মানুষের গায়ে জল ঢেলেছিলেন—বাঁচতে যেন তাকে কোন রকমেই না পারে সে। এরকম চরিত্রের স্বামীর পক্ষে ওকে ও-ভাবে মারিং হোমে ছেড়ে পা ঢাকা দেওয়া খুব আশ্চর্য নয়—বিশ্বাস করলেন ডাক্তার। কিন্তু আমি মহিলাটির একটি কথাও বিশ্বাস করিনি। আমার ধারণা—"

ওর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে পরীক্ষিৎ হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠল।

"তোমার কি ধারণা,—তোমার কি মনে হয়,—ওর কথা কতখানি বানানো,—সে-সব কথা আমি শুনতে চাই না—ও-সব তুমি তোমার মাথা থেকে উড়িয়ে দাও। যদি কিছু প্রমাণ পেয়ে থাক তাহলে সেটুকু বল। গল্প আমি ঢের শুনেছি—।"

কেবলমাত্র একটি সুখবর পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে-মানুষ অনেক দূর থেকে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে প্লেনের টিকিট কিনে এখানে এসেছে, সে মানুষের পক্ষে পরীক্ষিতের এই মন্তব্য একটু রূঢ় হয়ে গিয়েছিল বৈ কি!

রূঢ় ব্যবহার অথবা আঘাতের প্রতি যে সামলে নিতে পারে,—যে তাতে বিচলিত বা উত্তেজিত হয় না তার ব্যক্তিত্বকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

সত্যসুন্দর কেবল চেয়ারের হাতল ধরে চোখ নীচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শুধু অত্যন্ত শান্ত ও ধীরভাবে ওর কামানো গোঁফের নীচে একজোড়া ঠোঁট রবারের মত বড় হতে লাগল ক্রমশঃ এবং তা দীর্ঘ হতে হতে হঠাৎ যেন কেটে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওর সাদা সাদা ঝকঝকে দাঁতের একটু আভাস।

সেই নিঃশব্দ হাসির মধ্যে পরীক্ষিৎ দেখতে পেল ওর মনের নিবিরোধী নিঃশংসয়তা যেন ধীরে ধীরে মূর্তবদ্ধ হচ্ছে।

"না। প্রমাণ কিছু দিতে পারব না হয় তো—কেবল অনুমান।"

"অনুমান? কি অনুমান করছো তুমি?"

"তিনি এত কর্সা যে বাঙালীর ঘরে এমন সচরাচর দেখা যায় না। তাতেও কোন খটকা আসতো না যদি না দেখতাম তারিখটাও ওর আমার দিনটির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বিমান দুর্ঘটনা সেই তারিখেই হয়েছে। এরমধ্যে যদি বা অনুমান করবার কিছু না থাকে কিন্তু ওর শাড়ীর রং শুনলে আমার অনুমান একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। মহিলাটি পরেছিলেন একটা ঘোর লাল রঙের সিল্কের শাড়ী। ছোট মা সেই রংয়ে একটা শাড়ী সেদিন পরে গিয়েছিলেন।"

"তাতেও স্পষ্ট কিছুই প্রমাণ হয়না—।"

সত্যসুন্দরের দিকে না তাকিয়ে পরীক্ষিৎ আয়নার দিকে ঝুঁকে ডান হাত দিয়ে একটা ছোট ধারালো চিক-চিকে কাঁচি তার চওড়া জিভের মত ওয়াক্তের প্যাটার্নের ছাঁটা গোঁফের কাছে তুলে আনল আর তা খুব মনযোগের সঙ্গে ছাঁটতে ছাঁটতে থেমে থেমে বলতে লাগল,—"কারণ—ওর যদি বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ না পেয়ে থাকে—" ডান দিকের ঠোঁটের কিনারা থেকে বা দিকে কাঁচিখানা সরে গিয়ে ক্যাচ করে শব্দ করে উঠল,—"আর তোমার মতে তার টনটনে জ্ঞান ছিল—অন্ততঃ নার্সিং হোমে পৌছনার পর—" হাতের কাঁচি ঠোঁট থেকে কিছু দূরে হাতে-সিগারেট-ধরার মত ঝুলে রইল কিছুক্ষণ, "এ-অবস্থায় তুমি আমি কি করি?—" পরীক্ষিতের কথা কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ করতে হল। সে ঠোঁটের কিনারা থেকে তার পুষ্ট পুরুষালি নতুন গজানো চুলগুলোকে নিপুণভাবে রেজাইন থেকে ছেঁটে যেতে লাগল। খানিকবাদে পরীক্ষিৎ টেবিলে কাঁচিখানা রেখে খাড়া হয়ে বসে সত্যসুন্দরের দিকে তাকাল,—"বাইরের জগতের কাছে তার বেঁচে থাকার খবরটা এমন করে চেপে যাওয়ার কোন অর্থ হয়? কেউ এমন অদ্ভুত হয়? শুনেছ? নেহাৎ মাথা খারাপ না হলে? একটা শিশুও তো নিজের ক্ষতির কথা বোঝে। জানাজানির ভয়ে সে এত কাতর হবে কেন? এত কাকুতি মিনতির কথা ওঠে কেন? কি জন্যে তার এত ভয়? এত দুর্ভাবনা! সে তো কোন অপরাধ করে নি। বেঁচে যদি থাকত তাহলে নিশ্চয়ই খবর পাঠাতে পারত—কাজেই আমি যা ভেবেছি সে-কথাই ঠিক।"

সত্যসুন্দরের বোজানো চোখের পাতা ক্যামেরার সাটারের মত একমুহূর্তের জন্যে খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। ও যেন মারাত্মকভাবে অসুস্থ একটি মানুষের পরিচিত অনুভূতির অতি ক্ষুদ্র একটি শিকড়ের ছবি তুলে নিল ওর কাজের সুবিধের জন্যে।

"আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম তবু একটি ঘটনা আমি জানি আর সেই ঘটনাই আমার বার বার মনে পড়ছে। হয়তো এ-ইঙ্গিতের একটা তাৎপর্য আছে।—হয়তো মিথ্যে কিন্তু সত্যি ও তো হতে পারে? আমার এক দিদি—খুব সম্পর্কের এক দিদির জীবনে একটা দুর্ভাগ্য দেখেই আমার এ-ধারণা হয়েছে। বিয়ের বছরেই ছেলে ধরাতে গিয়ে ও ডাবলডাবে পুড়ে গেল—মুখটাই পুড়ে গিয়েছিল বেশী,—বিভিকিচ্ছিরি হয়ে গেল ওর অমন সুন্দর মুখ। কাণ্ডটা ঘটেছিল ওর বাপের বাড়ীতেই—"

"ওর স্বামীর কি অবস্থা? কি করল সে?"

"আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু দিদি আর যায়নি। যাওয়াটা কঠিনই তার পক্ষে।"

"কি রকম—?"

"যতদিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন একদিনও তিনি ওর সঙ্গে একঘরে বাস করেন নি।"

"কেন—?"

"ওর মুখের আর কিছু ছিল না—ওকে দেখে তার ভয় হত,—কাছে বসতেন না, কথা পর্যন্ত বললেন নি তেমন করে।"

"ওকে নিতে চেয়েছে—এটাই কম বড় কথা নয় কি?"

"অশ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালন করার কোন অর্থ হয় না। বোঝেন নি দিদি, তাই পুড়ে যাওয়ার পর দেখা করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল সে তার স্বামীর মধ্যে আগের মানুষটিকেই পাবে—সজ্জন, অনুরক্ত ও উদার। সে-বিষয়ে কারো যদি আশঙ্কা থাকে—যদি থাকে,—তবে তার পক্ষে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত না হওয়াই তো স্বাভাবিক!"

পরীক্ষিৎ সত্যসুন্দরের মত একজন ছোকরার কথার ফাঁদে হঠাৎ ধরা পড়ে যেন আটকে গেল। ওর দম্ভ, অহমিকা, আর ভোগালো বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বাই যে তাঁকে পা দিয়ে ছটফট করতে লাগল। ছটফট করতে করতে বন্য পশুর মত নিজের ওপরেই অসহায় রাগে ফুলতে লাগল।

"আমি তোমার দিদির বাবা হলে চাবুক মেরে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিতাম—এ-সব অর্বাচীন মেয়েদেরকে চাবুক মারতে হয়, নইলে চৈতন্য হয় না!"

"ধরা যা অনুগ্রহের ওপরে বাঁচতে চায়নি সে—আর তা বোধহয় আত্মসম্মানের পক্ষেও অপমানকর—।"

"বিয়ের পরে বাপের বাড়ী কি মেয়েদের স্বাভাবিক আশ্রয়? এই অস্বাভাবিক আশ্রয়ে থাকতে তার আত্মসম্মানে লাগল না—আত্মসম্মানে লাগল স্বামীর ঘরে যেতে? হোক না ধরা! তাই বা মন্দ কি! সুন্দর মুখ যখন গেছে তখন তার সবই চলে গেছে, এ-কথা কেবল মেয়েরাই ভাবতে পারে—"

"কিন্তু সে তো ঠিক একথা ভাবেনি—।"

"নিশ্চয়ই এ-কথাই ভেবেছে—অন্য কিছু নয়। এ-কথা বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার মগজে অন্ততঃ নেই!"

"—হতে পারে।"

"হতে পারে নয়—তোমার দিদির ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। পুরুষমানুষ কখন এভাবে ভাবেনা—ভাবতে পারেনা। তারা ঠিক নিজের জায়গায় এসে বসবে আর স্ত্রীর সেবা আদায় করে ছাড়বে!"

ছেলেবেলায় যে পরীক্ষিৎকে দেখে সে ভয়ে কাঁপত, বাড়ীর লোকেদের কাছে যে পরীক্ষিৎ ছিল ভীতির কারণ, সত্যসুন্দর সেই পরীক্ষিতের কথার জবাব দিতে আজ আর সাহসের অভাব বোধ করল না। সাহস যেন একপাল বন্য জন্তুর মত ছুটে এসে লাফিয়ে পার হয়ে চলে গেল ক্ষিপ্র খরস্রোতের একটি গভীর ও ভয়াবহ খাদ। সত্যসুন্দরের মাজাঘষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর দাঁত দেখা গেল আবার।

"স্বামীর চেহারার ত্রুটি কিংবা শরীরের অকর্মণ্যতা স্ত্রী যতখানি মেনে নিতে পারে স্বামী ততখানি পারেনা। স্ত্রী অবহেলা করতে পারে না,—তার স্বভাবের মধ্যে সে-বস্তু নেই। তাদের মানসিক গঠন অন্য রকম, তারা অন্য ধাতুতে গড়া। আমার শ্রীগুরুদেব বলেন ওরা আদ্যাশক্তির অংশ। স্ত্রীজাতি স্বামীর আত্মিক সম্বন্ধকে বড় বলে মনে করে। পুরুষ তা করে না। এই তফাৎ এবং সেই জন্যেই—।"

পরীক্ষিৎ ওর কথার মাঝখানে যদি উঠে না যেত তাহলে বোধহয় সত্যসুন্দরের কথা বলবার নেশার ঝোঁক আরও খানিকক্ষণ চলত। হঠাৎ সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে পরীক্ষিৎকে সেখান থেকে চলে যেতে দেখে সত্যসুন্দর কথা বন্ধ করে চুপ করে গেল।

ইজিচেয়ার খালি পড়ে আছে, হাতলের ওপর এ্যাস্-ট্রে, একগোছা চাবি, পেপার-ওয়েটে চাপা একটা দশ টাকার নোট, সোনার দামী রিষ্ট-ওয়াচ আর সিলেট রেজর-ব্লাস সাবান তোয়ালে।

সত্যসুন্দর ভেমনিভাবে চোখ নীচু করে শূন্য ইজি-চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হাতলে-রাখা জিনিসপত্রগুলো বন্ধ করে তুলে মামার কাছে দিয়ে সে আস্তে আস্তে নীচে চলে গেল।

সূর্যোদয়ের দিন ও সূর্যাস্তের রাত্রি নিঃশব্দে একটি আরেকটিকে অনুসরণ করে চলতে লাগল। ছায়া হয়ে যেতে লাগল গতির সমুদ্র। কেবল স্থল পথে ছড়িয়ে রইল একটি আজান্তে কান্না। দূরান্তের নীল আকাশের নীচে নিষুম রাত্রির মত একটি মন নিঃসঙ্গ ও নিস্পন্দ হয়ে আছে। অন্ধকার পাহাড়ের কালো-বনে-ঢাকা রেখার ওপর নতুন শরীরের একটি চাঁদ আশ্চর্য হয়ে যেন মেয়ে গেছে আর খোলা জানালা দিয়ে দেখছে একটি অপরিচিত যন্ত্রণা। সমুদ্রের অজান্তে লোনা বাতাস ঘন হয়ে আসছে রাতে, বিদেশী গাছের পাতা নিঃশব্দে ঝরে পড়েছে সেখানে। রূপের ভর অহঙ্কারের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল—কারো কাছে বলবার নেই কিছু, জানাবার নেই কোন কথা,—বোঝাতেও পারছে না সব কিছু, কেবল বেড়ে যাচ্ছে দূরত্ব, ফিরে যাওয়ার

পথ যাচ্ছে ছিঁড়ে,—অতিক্রান্ত হয়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতির আয়োজন এসে গেল জীবনে। অতীতের ভাঙা টুকরো গুলো দুহাতের অঞ্জলিতে তুলে ধরে সে আজ দেখছে ওরই অন্ত জীবনের একটি রূপ। কাঁপছে হাত, কেঁপে উঠছে আজকের প্রতিচ্ছবি তারপর অঞ্জলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে গেল ওর সবখানি,—বাকিটুকু আপনার,—প্রত্যাশার যা-কিছু। অনেক দূর থেকে যারা ডাকছে তাদের কাছে সে ফিরে যেতে পারেনা কারণ আজকের এই মানুষটিকে তারা কেউ ডাকছে না।

সুমিত্রার ভাবনার কাছে পৌঁছে পরীক্ষিৎ তাকে একেবারে নতুনভাবে দেখল। অন্যের ট্রাজিডির দুঃখ দেখলে যেভাবে মন কেঁদে ওঠে, নিজের জীবনে সে ট্রাজিডির সূচনা মনকে সেভাবে নাড়া দিতে তো পারে না! কেন পারে না? কেন পারল না এতদিন? কোথায় আটকাল? কেন আটকায়? নিজের জীবনের সঙ্গে স্বার্থের সুখ জড়িয়ে থাকে তার, বোধহয় সেইজন্যেই নিজের স্বভাবের দুর্নীতির মধ্যে যে ট্রাজিডির বীজ লুকিয়ে থাকে তাকে ঠিকমত ধরা যায় না। ধরতে পারেনি পরীক্ষিৎ এতদিন, আজ শুনলো অন্য একটা দিকের কথা, চালের অন্য দিকের ছবি দেখল।

সুমিত্রার স্মৃতি নিয়ে যে দন্তের চরিত্র এত বড় হয়ে উঠেছিল আজ তা একটি সম্ভাবনার কাছে হেরে নিতান্ত গন্ধহীন হয়ে পড়ল বলে মনে হল তার।

একটা দুঃখের সুর এসে পৌঁছল তার কানে। অনুপস্থিত সুমিত্রাকে নিয়ে পড়তে লাগল নানা কাহিনী। দূরদেশে ওর অজ্ঞাত জীবনযাত্রা ছায়াছবির মত মাঝে মাঝে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। গলায় তুলসীর মালা, একটি কোলো ছেলের একটা খবর ক্রমেই যেন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সুমিত্রা জানে ওর অনুপম চেহারা পরীক্ষিতের আদর্শের মনকে একদিন জেগে দিয়ে কদর্য করে তুলবে। পরীক্ষিতের প্রাণশূন্য ঘরে বাস করার চেয়ে কোন রকমে জীবিকা অর্জন করে পৃথিবীর একধারে অবলুপ্ত হয়ে পড়ে থাকাও অনেক ভাল। সকাল বেলার ফুটফুটে সুন্দর আলোতে বসে সে ভাবতে পারছে না কিভাবে সুমিত্রার এই মনোভাবের জন্ম হল,—অতীতে কোন্ ব্যবহারের মধ্যে এর ইঙ্গিত ছিল?—তার স্বভাবের কোনখানে এভাব গোপনভাবে নিমজ্জিত হয়ে ছিল? এতই কি প্রচুর উপকরণ সে পেয়েছে যার জন্যে সন্তানের আকর্ষণও অগ্রাহ্য করে আত্মগোপন করে থাকা শ্রেয় বলে সে মনে করল? ছিল নিশ্চয়ই তা না হলে সুমিত্রার এ-মনোভাব হবে কেন? নিশ্চয়ই ছিল নইলে তার আজের মনের পরিণতি এমন রূঢ় সত্যে এসে পৌঁছল কেন?

যতই দিন যেতে লাগল ততই সে শুনতে পেল একটি শব্দভেদী বাণের মত কি তখন একটা গুমরিয়ে উঠছে আর ঠিক তারই দিকে অলক্ষ্যে এগিয়ে আসছে। সত্যসুন্দরের দিদিকে পরীক্ষিৎ যেন চোখের সামনে দেখতে পেল। দেখতে পেল সুমিত্রাকেও। ওর দিদির অসুন্দর আকৃতির মধ্যে সেও যেন লীন হয়ে আছে। সত্যসুন্দরের দিদি তার পোড়া মুখ ঢেকে কাঁদছে। ওর স্বামী ওকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে-জিনিস না পেলে মেয়েদের মন বাঁচে না, সেই ভালবাসা কি আর ওষ্ঠের চুম্বনে, ক্ষুধিত কমলের আলিঙ্গনে, বন্যার মত আদরে, একীভূত স্পর্শের সুখে শিহরণ নিয়ে জেগে উঠবে? সেই জন্যেই কি সুমিত্রা জীবিকার জন্যে চাকরী নিয়ে সারাদিন খাটছে সেবাশ্রমে? শীর্ণ হাতে ছাতা ধরে ক্লান্ত হয়ে ফিরছে তার ছোট্ট একটি অস্বাস্থ্যকর কুটুরীতে, গড়িয়ে পড়ছে মলিন বিছানাতে, কোন রকমে উঠে দিনান্তে একটু ভাত ফুটিয়ে নিচ্ছে, একলা শুয়ে শুয়ে ভাবছে স্বামী ও সন্তানের কথা, গভীর রাতের চিন্তা, বেদনা ও স্বল্প দিনের কর্মময় কোলাহলে হয়তো মিশে যাচ্ছে।

বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ একটা প্রবল ঢেউয়ের বেগে পরীক্ষিৎ কাঁপতে লাগল, কি যেন হয়েছে তার ভেতরে, কি যেন বাইরে আসবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কি যেন আটকে পড়ে যাচ্ছে অবচেতনার মাঝে, কি যেন পরীক্ষিৎ রোধ করে এসেছে এ-কয়দিন। ওর সারা বুক লাল হয়ে উঠেছে, মাথাটা টনটন করছে,

গলার শিরগুলোকে কে যেন মুঠি করে চেপে ধরেছে—এত ব্যথা লাগছে গলায় যে ঢোক গিলতেও কষ্ট হচ্ছে তার।

সুস্থ ও স্বাভাবিক হওয়ার পরে সে যখন থেকে বেরিয়ে এল। অনেক হাল্কা আর ঝরে ঝরে লাগল শরীর ও মন। অনেক দিনের কায়েমী ব্যাধি অস্ত্রোপচারে একদিনের মধ্যেই যেন সেরে গেল। দুষ্ট-ব্যাধি এতদিন ওকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারেনি।

পরীক্ষিৎ এতদিন কেবল নিজের কথাই ভেবেছে—যে-দিক থেকে দেখলে আর ভাবলে ওর পক্ষে সুবিধে আর সোজা হয়। জীবিত সুমিত্রাকে ভাবেনি কোনদিন। তারও দুঃখ থাকতে পারে, তারও কিছু বলবার আছে হয়ত। গোপনতার মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে গেছে যে, সে অভাবনীয়, কঠিন ও ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে—আজ এ-কথা সে মেনে না নিয়ে পারল না।

সত্যসুন্দরকে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দিয়ে পরীক্ষিৎ অনেকটা আরাম বোধ করল। যদি সুমিত্রা বেঁচে থাকে আর সত্যসুন্দর তাকে খুঁজে বার করতে পারে তাহলে সুমিত্রা যেন অন্ততঃ এমন একটি আগ্রহের ছবি দেখতে পায় এখানে এসে, যে-ছবির কাছে সে নিঃসঙ্কোচে এবং নির্ভয়ে সুখী হওয়ার আশা করতে পারে। সুমিত্রা যা মনে করে বসে আছে তা যে একেবারেই সত্যি নয়, সে-কথাটাই তার জানা দরকার। স্ত্রীরা স্বামীর সম্বন্ধে যতটুকু বোঝে ঠিক ততটুকু নিয়েই সমগ্র চরিত্র নয়। তারা যতখানি বোঝে অথবা জানে তার বাইরেও তার অনেকখানি জগত আছে। চরিত্রের যে-মানচিত্র গুটিয়ে আছে একদিন তা খুলে ধরতে হবে সুমিত্রার চোখের সামনে। সেই দিনটির জন্যে পরীক্ষিৎ অপেক্ষা করতে লাগল। এবং কেবল অপেক্ষাই নয় সে যেন খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে লাগল।

মাস দুই কেটে যাওয়ার পর সত্যসুন্দরের কাছ থেকে একটা চিঠি এল।

চিঠিতে খুঁটিনাটি নির্ভুল হিসাব-পত্র। বাড়তি টাকাও ফেরত পাঠিয়েছে মণিঅর্ডারে। খোলাখুলির কথাও খুব সংক্ষিপ্ত। তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত সুমিত্রার মৃত্যুর খবর। মৃত্যুর খবর যে লাইনে আছে সেখানকার ভাষাও খুব স্বচ্ছ নয়। চিঠিতে ডাক্তারের মত একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে পাঠিয়েছে সে। কিন্তু তবু সে যেন সম্পূর্ণভাবে তার মৃত্যু কবুল করতে পারেনি।

"...তাঁকে খুঁজে পাইনি। তিনি যারা গিয়েছেন বলেই সকলের বিশ্বাস। আপাততঃ তাঁর সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছি বটে কিন্তু এখনও আমার বিশ্বাসকে আমি প্রত্যাহার করতে রাজী নই। আমি অকৃতকার্য হয়েছি বলেই যে তাঁর মৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমার, যারা বা সম্ভব হয়নি, অন্যের দ্বারা তা হয়ত অনায়াসেই সম্ভব হতে পারে। কাজেই তাঁর অন্বেষণের কাজে আপনাদের নিরস্ত হতে বলা আমার পক্ষে অনুচিত....."

পরীক্ষিৎ চিঠিখানি ভাঁজ করে খুব ধীর ধরে রেখে দিল ড্রয়ারে। মারা গেছে বলে যদিও সত্যসুন্দরের বিশ্বাস নয় তবু স্পষ্টাক্ষরে চিঠিতে সে-কথাই সে স্বীকার করে নিয়েছে। তার হেরে যাওয়ার কথাই যে সুমিত্রার মৃত্যুর দলিল-পত্র সে-বিষয়ে পরীক্ষিতের কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু চিঠির সম্বন্ধে যা ভাববার তা সেখানেই শেষ হল না। শরীরের একটি মুখ-চোরা উপসর্গ যেমন একটা অজানা ব্যাধিকে ইঙ্গিত করতে থাকে তেমনি ওর সংশয়াকীর্ণ নৈরাশ্য যেন আঙুল দিয়ে নির্দেশ করছে সুমিত্রার নতুন জীবনের ভয়ঙ্কর এই অংশকে।

এই ভাবনাটাই ধীরে ধীরে সত্যসুন্দরের চিঠিতে অন্য একটা কথার ইঙ্গিত খুঁজে পেল।

চিঠিটা পড়ল আরো কয়েকবার। আর যতই পড়তে লাগল ততই তার মনে হতে লাগল সুমিত্রাকে সত্যসুন্দর খুঁজে পেয়েছে। সে বেঁচে আছে কিন্তু ফিরে আসতে চাইছে না। কেন একথা মনে হল তা সে বলতে পারে না কিন্তু সে বিষয়ে তার দৃঢ় প্রত্যয় হল।

সত্যসুন্দর কি তবে শবের কালো ছায়া দিয়ে একটি মগ্ন স্ত্রীলোকের নষ্ট মন ঢেকে দিয়ে ওর বিফলতার দলিল রেখে গেল?

সেই জন্যেই কি সে নিজে এসে দেখা পর্যন্ত করে গেল না? এতদিনের বন্ধ জানালার অন্তরালে যে আগ্রহের দুটি হাত সুমিত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল, যে-তৃষ্ণায় রাঙা ঠোঁট ব্যাকুল বেদনায় ফুলিয়ে উঠেছিল, চোখের কালো কাজলে মেঘের অলকণা শুরু হয়ে থেমে ছিল; আর সেই মরতে ধরা শক্ত জানালাটি জোর করে খুলে পরীক্ষিৎ কি অন্য কিছু দেখতে পেয়েছে যা কোনদিনই সে দেখতে চায়নি?

জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে সে দেখতে লাগল একটি আশ্চর্য দৃশ্য। আর সেই মুহূর্তে তার মন রাত্রির মত নিঝুম হয়ে গেল।

বিগত জীবনের দুঃস্বপ্নের দিকে পেছন ফিরে সুমিত্রা নতুন একটি সুখের কাছে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করে বেঁচে যেতে চাইছে। পরীক্ষিৎকে সে ভালবাসতে চেয়েছিল কিন্তু ভালবাসতে সে পারেনি। সন্দেহের বিষে জারিত হয়ে আছে যে মন তাকে ভরকরা চলে কিন্তু ভালবাসা যায়না। সুমিত্রার কাছে পরীক্ষিৎ কেবল অপরিচিতই হয়ে রইল। এই পরীক্ষিতের কাছেই গচ্ছিত ছিল সুমিত্রার ভালবাসার একটি মন।

কামনার বিকৃত বাসনা সুমিত্রার ভালবাসার মনকে লুট করে নিতে চেয়েছিল মাত্র। মেয়েদের মধ্যে একটা সওদাগরি মন আছে—যে কারবারে তার মূলধন পর্যন্ত খোয়াতে বসেছে সেখানে নতুন করে আর টাকা ঢালবে না সে। দুটি শাবক পেয়ে পরীক্ষিৎ যখন সবেমাত্র সুমিত্রার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছে তখনই কেবল শিথিল পাহারা এড়িয়ে তার পালিয়ে যাবার সুযোগ এসে উপস্থিত হল। সুমিত্রার ক্ষেত্রে দৈব খুব কাজে লেগে গিয়েছিল নইলে এ-ভাবে আত্মগোপন করা কঠিন হত সুমিত্রার ক্ষেত্রে।

ভিন্ন একটি মানুষের সংস্রবে এসে সুমিত্রা তার ছেড়ে আসা সংসারকে এত সহজে ভুলে যেতে পারল শুধু এই কারণে। হয়ত পরীক্ষিতের প্রভুত্ব তার ভাল লাগেনি। সুমিত্রার পক্ষে শাসন না-মানা পুরুষকে মেনে নেওয়া তেমন সহজ হয়নি হয়তো। কে জানে ও বোধহয় মনে মনে আরও অনেক বন্য, নিরীহ ও অসহায় মানুষের জীবনে প্রতিভার আগুন জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল। সফল হয়নি এখানে, হয়তো সফল হয়েছে অন্য কোথাও। কাঁচকে হীরে বানিয়ে ও নিজে জ্বলে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু হীরেকেই জ্বলতে দেখে ও ভয়ে পিছিয়ে গেল। তাইতো সুমিত্রার মনের মায়া পেরিয়ে চলে গেল মনের মানুষের কাছে।

পরীক্ষিতের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল! আশ্চর্য! সে জ্বলে, কিন্তু ঈর্ষা হল না তার বরং সুমিত্রার জন্যে খুব কষ্ট হল পরীক্ষিতের। এই পথে গিয়ে কেউ কি কখন সুখী হতে পেরেছে? কত বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনায় জীবনের প্রতিটি দিন ধীরে ধীরে নির্বাসিত হয়,—কত অনুশোচনায় ধূসরিত হয়ে ওঠে ক্লান্ত জীবনের শিকা! সুখকে পাওয়ার জন্যে আমরা ভেঙে ফেলি সংসার,—নতুন সংসারেও সুখের সন্ধান আমরা দেখতে পাইনা।—সুমিত্রা কি সুখী হতে পারবে? সুমিত্রা যে পোষা পাখীর মত মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখেছে—সে তো জানে না ব্যাধের পাশবিকতা কাঁদ পেতে রেখেছে তারই মত নিরীহ, নির্ভরশীল বিশ্বাসী মানুষকে ধরবার জন্যে? ওকে সুখী করবার জন্যে পরীক্ষিতের বিরাট সত্তা যেন বিধাতার মত মহীয়ান হয়ে উঠল। বিপথের বিপদ থেকে এই অবোধ নারীকে বাঁচাবার জন্যে ও মমতার অদৃশ্য হাতদুখানি নীরবে সুমিত্রার জীবনকে স্পর্শ করে রইল।

[ক্রমশঃ

বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের এই পথ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কবি মনোমোহন বসু আন্তর্জাতিক ভারতীয় আর্থিক দুরবস্থা স্মরণ করাইলেন—

"দিনের দিন সবে হীন ভারত হ'য়ে পরাধীন,
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অপমানে তনু ক্ষীণ।
তাঁতি কর্মকার, করে হাহাকার
সূতা, জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার।"

কবি গোবিন্দলাল রায় ভারতের কণ্ঠে গাহিলেন—

"কতকাল পরে, বল ভারত রে,
দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।"

রবীন্দ্রনাথ দীক্ষা দিলেন—

"নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে হে ভারত লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা!"

রবীন্দ্রনাথ একতার মন্ত্র দিলেন—

"বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।"

বাংলাই প্রথম বিদেশী বর্জন (Boycott) ও স্বদেশী গ্রহণ করে। ইহাতেই দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হয় ও ভারতে উৎপন্ন জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহ দিলেন কান্ত কবি রজনীকান্ত—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।
মা যে মোদের দীন দুঃখিনী তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

মুকুন্দ দাস যাত্রার মধ্য দিয়া ও কবক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিতার দ্বারা জাতীয় চেতনা জাগাইলেন। বিদেশী শাসককে শাসাইলেন—

"সাবধান! সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান।"

এই অভাবনীয় সুযোগে অনুশীলন সমিতির প্রসার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুধু যে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে ও উপকণ্ঠে শাখা খোলা হইল তাহা নহে, বাংলার গ্রামে গ্রামে শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বভাবতঃই সতীশচন্দ্রের কার্যক্ষেত্র বিস্তার লাভ করিল। তিনি ইহাতেই মনপ্রাণ নিয়োজিত করিলেন এবং অতীব দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সহিত কেন্দ্র পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংগঠন শক্তি ছিল অদ্ভুত ধরণের। কোনও কঠোর ব্যবস্থা নাই। অথচ স্নেহের বন্ধনে সকলেই আবদ্ধ—ইহাই ছিল বিশিষ্টতা। বলা বাহুল্য একমাত্র জাতীয় ক্রীড়া সমূহই অনুষ্ঠিত হইত। বিদেশী ক্রীড়া, ফুটবল, ব্যাটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য বলিয়া বর্জন করা হইত দেশীয় ক্রীড়াসমূহ বেশী উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। Indoor games অলসতার প্রশ্রয় দেয়, যথা—তাস, পাশা, ক্যারম ইত্যাদি। ইহাদের তুলনায় লাঠি ও তরবারি খেলা প্রভৃতিতে তৎপরতা ও কর্ম কুশলতা বৃদ্ধি পায়।

আজকাল যেরূপ প্রত্যেক Clubএর নিজস্ব uniform আছে, অনুশীলন সমিতির সেরূপ ছিল না। দাদাভাই নৌরজীকে অভ্যর্থনা করিয়া হাওড়া হইতে কলিকাতায় আনিবার সময় সভ্যরা মাত্রই পায়ে কালো মোজা ও মাথায় সাদা উড়ানীর পাগড়ী ব্যবহার করিয়াছিলেন। আজকাল Club ও Gymnasium পরিচালনায় অর্থের ব্যয় বাহুল্য হয়, অনুশীলন সমিতির সময় সেরূপ ছিল না।

কলিকাতার প্রধান কেন্দ্রের আদর্শে সহরের বিভিন্ন পল্লীতে সমিতির শাখা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য—বহিপাড়া, পটলডাঙ্গা, Grey Street, বিডিরপুর, হাওড়া, শালিখা, শিবপুর প্রভৃতি। শাখার সভ্যদিগের জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে শিক্ষক পাঠানো হইত। তাঁহারা ব্যায়াম চর্চা, লাঠিখেলা ও অসি শিক্ষা দিতেন। পরস্পরের মধ্যে খেলাধূলার প্রতিযোগিতা হইত। সকল যুদ্ধের অবতারণা হইত। এমন কি কলিকাতার সভ্যরা চন্দননগরে গিয়া কপাটী ও হাডু-ডু খেলা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিত। ক্রমশঃ কলিকাতার উপকণ্ঠেও সমিতি বিস্তার লাভ করিল। যথা—বালীতে শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ায় শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরে অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ ও শ্রীনিতেন্দ্র নাথ লাহিড়ী, হরিপাল ও ৺তারকেশ্বরে ডাক্তার যাদবেশ্বর দাস সংগঠন করিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ মানুষ তৈয়ারী করা। শারীরিক উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যায়াম—ডন, বৈঠক, কুস্তী ইত্যাদি হইত। হাডু-ডু-ডু প্রভৃতি দেশীয় খেলা চলিত। ক্রমে লাঠিখেলা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইল। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় অতি নিষ্ঠার সহিত বড় লাঠি খেলা শিক্ষা দিতেন। যে লাঠির বন্দনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্তব করিয়াছিলেন, "হে যষ্টিধর! তুমি বাঙ্গালীর ধন রাখিয়াছ, মান রাখিয়াছ, প্রাণ রাখিয়াছ" সেই লাঠিখেলা জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ছোরা খেলা, তরবারি শিক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ, জুজুৎসু প্রভৃতি চলিতে লাগিল। সাময়িক কারদায় ড্রিল ও Mock fight হইত। সংগোপনে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। নৌকা পরিচালনা, অশ্বারোহণ প্রভৃতির আয়োজন ছিল। মধ্যে মধ্যে গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইত। এই সূত্রে তরবারিতে মার্স্তাজা সাহেবের পদ্ধতি, বড় লাঠিতে অতুল ঘোষ, ছোটলাঠি, ছোরা, তলোয়ারে যাদুবাবু, মুষ্টিযুদ্ধে (Boxing) নগেন দত্ত, সুরদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জাপানী ওস্তাদ "গিবিন" বা জাপানী তলোয়ার খেলা শিক্ষা দিতেন।

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে অনুশীলন সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ববঙ্গে উহার প্রসার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পি. মিত্র মহাশয় স্বয়ং ঢাকায় গমন করেন এবং তথায় একটি মুখ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেই স্থানে ৺পুলিনবিহারী দাসের অসাধারণ কর্মপ্রচেষ্টা ও সংগঠন শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার উপর ঐ কেন্দ্রের সমস্ত

তার শুরু করেন। পরে পুলিনবাবু লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির প্রভাব বিস্তার হইল এবং সকলেই পুলিনবাবুর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহারই পরিচালনায় নানারূপ বৈপ্লবিক কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাটনা, কাশী, দিল্লী, গৌহাটী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশেও অনুশীলন সমিতির শাখা বিস্তার হইতে লাগিল।

মানসিক উন্নতির জন্যও নানারূপ জ্ঞানবৃদ্ধির আয়োজন ছিল। দেশ বিদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে সকলকেই উৎসাহিত করা হইত—বিশেষ করিয়া বীর পুরুষদিগের জীবন চরিত, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার কাহিনী ইত্যাদি যথা—মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, টডের রাজস্থান, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, রুশিয়ার নিহিলিষ্ট রহস্য ইত্যাদি পড়া হইত।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ও তাহার মূলমন্ত্র Liberty, Equality and Fraternity ও ইতালীর তিন মহাপুরুষের Mazzini, Garibaldi, Cavour জীবনচরিত পাঠ্য ছিল।

নিয়মিতরূপে রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশের কথা ও জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা হইত। ইহার জন্য ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তখন তিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "দেশের কথা" প্রণয়ন করেন। এইরূপ শিক্ষা বিস্তার ও অধ্যয়নের জন্য সমিতির সংলগ্ন একটী পাঠাগার ছিল। তাহাতে অনুমান ৪০০০ উৎকৃষ্ট বই ছিল। কলিকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখান হইত যথা, স্বামী বিবেকানন্দ, ডব্লিউ সি. ব্যানার্জী, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়দিগের আবাসস্থান, মধুসূদনের স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা এইগুলি পরিচালিত হইত। Sociology, History, Politics, History of Bengali Literature, Political Science, Moral Philosophy ক্লাস করিয়া পড়ান হইত।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি; ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ভক্তিযোগ ও সংযম শিক্ষা অবশ্য পাঠ্য ছিল।

নৈতিক উন্নতির জন্য সপ্তাহে একদিন (রবিবার) Moral class হইত। রামায়ণ, মহাভারত, কথকতা, গীতা, চণ্ডীপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। হরিদাস হালদারের রাবণ বধ পালাই কথকতার উল্লেখযোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ বন্দনা ও ধর্মসঙ্গীত হইত। প্রধানতঃ অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় গান ধরিতেন আর সকলে এক সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান করিতেন। সে কি উন্মাদনা! এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে অনুশীলন সমিতির সভ্যরাই প্রকৃত বীরোচিত সুরঝঙ্কার সহিত জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরম্ গান করিতেন। ইহাই ছিল সকল প্রেরণার উৎস।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানাবিধ উপদেশ ও সাধন পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। সংযমশিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপায় ও নির্দেশ দেওয়া হইত। তজ্জন্য সত্যচরণ শাস্ত্রী, শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিত আসিতেন ও উৎসুক সভ্যদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বেদ উপনিষদে অমৃতের সন্ধান, মরণের ভয় জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার পন্থা, আত্মজ্ঞান ও মানব জীবনের রহস্য প্রভৃতি সমাতন তত্ত্ব সরল সহজ উপায়ে মনের মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া হইত। এইরূপে চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত।

ভারতের ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য—রাজনীতির সহিত ধর্মের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। পৌরাণিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইবে।

রাজর্ষি জনকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্য মুনির, ছত্রপতি শিবাজীর সহিত গুরু রামদাস, বিবেকানন্দের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের—মাত্র এই কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই চলিবে। এই জন্য শক্তি অর্জনার সঙ্গে সঙ্গেই অনুশীলন সমিতিতে নৈতিক বল অর্জনের জন্য বিশেষ মনযোগ দেওয়া হইত।

উদ্দীপনার উৎস স্বরূপ নানারূপ জাতীয় সঙ্গীত সকল সভা একসঙ্গে মিলিয়া গান করিতেন। বিশেষতঃ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বীরত্বব্যঞ্জক কবিতাগুলি সাময়িক কায়দায় কোরাস সহকারে গীত হইত—

"যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
সে দিন উঠিল বিশ্বে সে কি কোলাহল সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ"……
বল আমার! জননী আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর;
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহিতো মেষ!
দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!

অবশ্য চিত্তবিনোদনের জন্য অবসর মত মধ্যে মধ্যে পদব্রজে, নৌকাযোগে, রেলপথে সভ্যদিগকে বেলুড়মঠে, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, শ্রীরামপুর প্রভৃতি নানা স্থানে নানা উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়া হইত। অনেক সময় বনভোজন হইত। মধ্যে মধ্যে কলিকাতার উপকণ্ঠে যাওয়া হইত।

সমিতির সভ্যদিগকে কিরূপ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করিতে হইত, Moral class প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হইত। সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে হইত—খেলার মাঠ ঝাড়ু দেওয়া, পাঠাগারের বই রৌদ্রে দেওয়া ও ঝাড়া, আলমারি সাফ করা, অফিস ঘর কলি দেওয়া, এমন কি ড্রেন সাফ করা, জঞ্জাল ফেলা, নৌকায় দাঁড় টানা, হালধরা, দীর্ঘ পথভ্রমণ, সাইকেল চালানো ইত্যাদি।

কিম্বদন্তি আছে যে প্রাচীনকালে শ্রীসদেশে স্পার্টান জাতির ছেলেদের শক্তি পরীক্ষার জন্য পাহাড়ের উপর হইতে নীচে ছুঁড়িয়া ফেলা হইত। সমিতির সভ্যদেরও সেইরূপ কঠোর পরীক্ষা দিতে হইত। কেহ কি কল্পনা করিতে পারেন যে, গলায় ফাঁসি দিলে যাহাতে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু না ঘটে তজ্জন্য কোন সভ্য নিয়মিত চর্চার দ্বারা গ্রীবাদেশ শক্ত করিয়াছিলেন। তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া গলায় বাঁশ দিয়া দুধারে দুইজনকে দাঁড়াইতে বলিতেন। এইরূপ প্রত্যহ অভ্যাস করাতে তাঁহার গ্রীবা লৌহবৎ কঠিন হইয়াছিল। তাঁহার নাম ভূপতিবিহারী মুখোপাধ্যায়।

এইরূপে একটি যৌথ পরিবার গড়িয়া উঠিল। নেতৃবৃন্দ সকলদিকেই লক্ষ্য রাখিতেন—কে কিরূপ Exercise করিতেছে, কে কতদূর লাঠিখেলা শিখিল, কাহার ওজন কতটা বাড়িল, স্কুলকলেজে কিরূপ লেখাপড়া হইতেছে, কে পুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে এবং কে পাইতেছে না—এসব তদারক করিতেন। আবার কোন সভ্যের অসুখ হইলে তাহার বাড়ীতে খোঁজ লইতেন ও দেখার জন্য লোক পাঠাইতেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীজীবনতারা হালদার এম. এস্-সি লিখিত 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত।

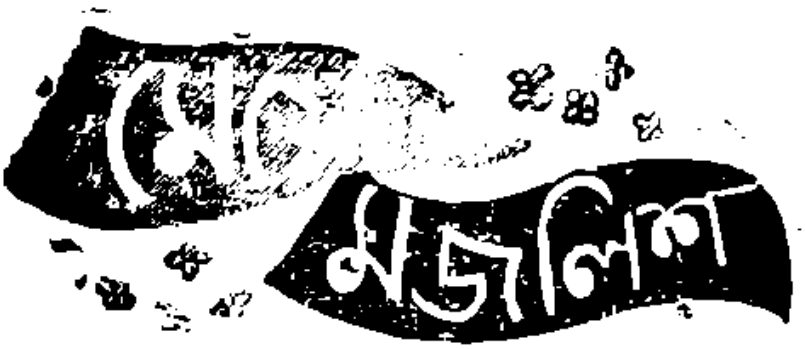

বর্ষশেষ

বেলা দে

সকলকে নিয়েই উৎসব। পারস্পরিক একটা আত্মিক যোগের সুর সেখানে শোনা যায়। সকল ঋতুই মানুষের মনকে নতুন করে দোলা দেয়। তাই পুরাতন যে বছরটী চলে যাচ্ছে তার সঙ্গেও আমাদের সারা বছরের কত সুখ দুঃখের ইতিহাস জড়িয়ে আছে তাই এই বছরকে বিদায় দিতেও মনটা ব্যথায় ভরা। আগের দিনের মা বোনেরা চৈত্র সংক্রান্তিতে কত ব্রত-পার্বণ করতেন আজও পল্লী বাংলার ঘরে ঘরে এই সব ব্রত অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে।

আমরা মা বোনেরা এই পুরাতন বছরে প্রার্থনা করি পুরাতন বছরের যা কিছু অভাব অভিযোগ সব যেন মুছে ফেলতে পারি।

আমাদের দেশে যেমন প্রতিটি ঋতুতে ব্রত অনুষ্ঠান পালন করা হয় তেমনি আবার ঋতুভেদে খাদ্য তালিকাও প্রস্তুত করা যায়। 'চৈত্র মাসে খেতে মিঠে শোল মাছে আম।'

শোল মাছ দিয়ে আমের অম্বল একটী এই সময়ের উপাদেয় খাদ্য। তা ছাড়া কাঁচা আমের নানা রকম আচার মোরব্বা এই সময় করে রাখার প্রচলন আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটী ঘরেই আছে।

সারা বছরের জন্য এই আচার করে রাখতে হয়। তা ছাড়া বাগদা চিংড়ির ঝোল, নিমঝোল, কাঁচাআমের ঝোল, উচ্ছে ভাজা, কলাইডাল এইগুলি এই সময়ের বিশেষ খাদ্য ব্যবস্থার রীতি আছে।

শীতের শিথিলতার শেষে প্রকৃতির অঙ্গে যখন শিহরণ জাগে, কচিপাতার কাকলীতে আর ফুলের রঙীন সজ্জায় যখন পুলক জাগে তখনই আসে বর্ষ বিদায়ের পালা। মায়েরা ঘরদোর পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখেন। পুরানো যা কিছু সব সরিয়ে দিয়ে যে নতুনকে আহ্বান জানাতে হবে। গ্রাম-দেশে গোয়ালঘর ও মাটীর ঘরগুলি এই সময় ঝকঝকে করে মাটী দিয়ে নিকিয়ে নেওয়া হয়। চারদিকেই একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ মানুষের মনকে নতুন দিনের ডাকে সাড়া জাগায়। আমরাও আজ গল্প-ভারতীর 'মেয়ে মজলিশের' মা বোনেদের সকলকে জানাই, তাঁরাও পুরানো বছরকে বিদায় দিয়ে নতুনকে যেন অভ্যর্থনা জানান।

একটি সমস্যা

শকুন্তলা

সত্যিই সেদিনের একটী মুহূর্ত্তকে আমি কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না। আর পারিনি বলেই কথাগুলো লিখে রেখেছি আমার মা বোনেদের কাছে বলব বলে। সেই একটি দিনের কথা—আমি চলেছি ব্যস্ত হয়ে অফিসের ট্রাম ধরব বলে। ঠিক আমারই মত আর একজনও বাড়ীর দরজা দিয়ে পা বাড়াচ্ছেন। কানে ভেসে এলো : "না, আমি কিছুতেই বাড়ীতে থাকব না তুমি অফিসে যাবে না, আমি তোমার কাছে থাকব"। কি করুণ—কি মর্মান্তিক দৃশ্য : ছোট্ট সাত বছরের শিশুটি মাকে ছেড়ে দিতে রাজী নয় কিন্তু মায়ের পক্ষেও যে ফিরে আসা সম্ভব নয়, ১০ টায় অফিসে পৌছতেই হবে। সম্ভবতঃ মেয়েটীর কোনো আত্মীয়া শিশুটীকে আদর করে ঘরে নিয়ে গেল। তার কোলে আর একটী দু'বছরের বাচ্চা। বুঝলাম সংসারের প্রয়োজন তাকে এই শিশু-রাজ্য থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। অথচ শিশুর কাছে দিনের পর দিন মায়ের এই অনুপস্থিতি বড়ই বেদনাদায়ক। মায়ের পক্ষেও তাই। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে মায়ের চাকরী না করে উপায় নেই। হয় তো একার (স্বামীর) রোজগারে সংসার চলবে না তাই এই করুণ দৃশ্যের অবতারনা। ভাবছিলাম বেচারা অবাঞ্ছিত শিশুরদল যারা এসেছে সংসারে ; কিন্তু মায়ের কোলে মানুষ হয়ে উঠতে পারল না, সংসারের প্রয়োজন মাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল! হায়রে হতভাগ্য শিশুরদল! মেয়েটিও সকলের অলক্ষ্যে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে অফিসে চলে গেলেন। এমনি ধারা কত মা ও কত শিশুর মধুর সম্পর্ক আজ কোথায় নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছে অথচ ইচ্ছা করলেই এর সমাধান করা যায়—আমরাও এমন কত চিঠি পাই তাতেও বহু তথ্য জানবার আগ্রহ অনেকেরই থাকে। অবাঞ্ছিত শিশু মা বাবার বোঝাই হয়ে থাকবে! তারা কখনো সকলের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতেও পারবে না! অভাবের সংসারে সন্তান পালন করা খুবই কঠিন কাজ। আজ নানাদিকের সমস্যার মধ্যে এই সমস্যাটিও কম নয় তাই প্রতিটি মা বাবাকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। যে শিশুটি হয় তো একদিন জাতির গৌরব হতে পারতো মা বাবার অবহেলায় সে শিশুটি ভবিষ্যত জীবনে জাতির কলঙ্ক হয়ে দাঁড়ালো। এমন সন্তান নিশ্চয়ই কোনো মা বাবারই কাম্য নয়। এ বিষয়ে আপনারা কি বলেন? যদি কিছু জানাবার থাকে তাহলে অবশ্যই 'গল্পভারতী'তে লিখে পাঠাবেন।

ভবিষ্যৎ গৃহকর্ত্রীর প্রতি উপদেশ

শ্রীহেমন্ত বালা দেবী

নারী পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। যে নারী জীবনের দায়িত্ব নিতে অক্ষম, সে যেন বিবাহিতা না হয়। যদি বা বিবাহিতা হয়, যেন পতি দেবতাকে সবিনয়ে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে ক্ষমা চায় এবং অন্য বিবাহের সুযোগ দেয়।

প্রথমেই নারী নিজের স্বাস্থ্য রক্ষায় মনোযোগ দেবে। ভাল খাওয়া এবং সুনিদ্রা, সু-হজম তার অত্যাবশ্যক, কেন না তার স্বাস্থ্যের উপরই সংসার ও সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করছে। এজন্য দুধ, ফল, শাকসব্জী গ্রহণ অত্যাবশ্যক। অবশ্য অন্যান্য দ্রব্যও আছে। শাকসব্জী বাড়িতে উৎপন্ন করতে শিখতে হবে। নিজের মত স্বামীর স্বাস্থ্যও যাতে ভালই থাকে তা'ও যথাসাধ্য দেখতে হবে। "যথাসাধ্য", কেন না স্বামী তোমার কথার বাধ্য নাও হতে পারেন। এজন্য যথাসাধ্য তাঁকে তোমার মতে এনে তাঁর আহার নিদ্রার বন্দোবস্ত করবে তুমি। তোমার উপর বাড়ির সকলের জীবন নির্ভর করছে। অতএব খাবার দাবার যাতে ভাল হয় তা তোমারই দেখার কথা। ভৃত্যরাও মানুষ, তাদেরও স্বাস্থ্য দেখতে হবে। বাড়িতে যতটা পার টাটকা খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করবে। খাবার পরেই ঘুম। যাতে বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি না হয়, দুশ্চিন্তার কারণ না থাকে, হাওয়া বাতাস ভাল খেলে, শীতগ্রীষ্মের আধিক্য উপশমের ব্যবস্থা থাকে, অসুখ বিসুখ না হয়, এসব তোমারই দেখবার কথা। টাকা উপার্জনের ভার নিতে নিওনা। টাকা সাশ্রয়ের ভার নিও। তোমার বাসাকক্ষে থাকতে দামি বাদ্যযন্ত্র কেনা অনাবশ্যক। লাইব্রেরীর ভাল ভাল শিক্ষাপ্রদ বই, আকাশ বাতাস, বাগান, পশুপাখী, নিজের কল্পনা ও স্বপ্ন আর ঘরের কাজ কর্ম, এসব থাকতে বাজে সিনেমা দেখা অনাবশ্যক। শিক্ষাপ্রদ সিনেমা দেখতে পার। খরচ বাঁচানো, অথচ নিত্য নূতন আনন্দের পসরা সাজিয়ে, নিজেকে, স্বামীকে, সকলকে সুখী করার যথেষ্ট উপকরণ তোমাকে দিয়েছেন বিধাতা। তোমার হাসি, কণ্ঠস্বর, গান, চলাফেরার ধরণীয়তা, গৃহশ্রী, তোমার হাতের রান্না, শিল্পকাজ এসব দিয়ে ঘরকে ইন্দ্রপুরী করতে পার তুমি। কী উপায়ে অল্প খরচে সুন্দর জীবন যাত্রা নির্বাহ হয়, তার কৌশল তোমাকে শিখতে হবে। সেজন্য উদ্যান, কৃষিক্ষেত্র, পশুপক্ষী পালন ক্ষেত্র গৃহস্থালীর অত্যাবশ্যক প্রার্থিত বস্তু। সেজন্য বাড়ি তৈরি করতে হলে মফঃস্বলে অথচ শহরের কাছাকাছি এবং যেখানে জলাশয় আছে এমন স্থানেই করা উচিত। এবং গৃহিণীর পক্ষে বাইরে টাকা রোজগার করতে না গিয়ে ঘরে বসেই টাকা তৈরি করা উচিত।

নারী ব্রহ্মচারিণী হবে এবং পুরুষকেও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত শিখিয়ে নেবে। আদর্শ দম্পতি হর-পার্ব্বতীর মত। তুমি পার্ব্বতীর মত প্রশ্নে প্রশ্নে তোমার স্বামীর নিজস্ব মৌলিক জ্ঞান বিজ্ঞান উদ্ভাবনে সাহায্য করবে। তুমি অনেক জেনেও না জানার মত নম্র বিনয় প্রকাশ করে স্বামীর কাছ থেকে সব জানতে চাইবে, যেন তোমার স্বামী তোমাকে বোঝাতে গিয়েই নিজের নূতন মহিমা খুঁজে পান। তোমার স্বামীকে তুমি দেবতা রূপে তৈরি করে নিতে চেষ্টা করবে, এজন্য তোমার বিবাহের পূর্বে পতি নির্বাচন যাতে উপযুক্ত হয়, সে কথা ভাবতে হবে, দরকার মত মতামত প্রকাশ করতে হবে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে স্বামী বদ্‌লানো সহজও নয়, সুন্দর নয়। ভারতবর্ষের চিরন্তন জাতীয় ঐতিহ্য মুছে ফেলা উচিত হবে না তোমার পক্ষে। তোমার উচিত ভারতীয় পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্রশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত রীতিমত অধ্যয়ন করা তার পর পাশ্চাত্য পুরাণ ইতিহাস এবং চিকিৎসা শাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের যতটুকু পার চর্চা করা। দর্শণশাস্ত্রে মাথা ঘামাতে যেও না। এ শাস্ত্র গৃহিণীর পক্ষে ক্ষতিকর, কেন না গৃহিণীকে গৃহ রচনা করতে হবে। যার গৃহ গেছে, সেই যেন দর্শণশাস্ত্রের চর্চা করে। পুরাণাদি থেকে বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত অংশই তোমার পাঠ্য হবে, যা গৃহধর্ম্মের অনুকূল। যা বৈরাগ্য মূলক বা বীভৎস অশ্লীলভাব মনে আনে, সে সব তোমার অপাঠ্য। নির্বাচিত পাঠ্য বিষয়ের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীন প্রবীনাদের সাহায্য নিও। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে যথাযোগ্য কালে সুসন্তানের জননী হোয়ো। বিজ্ঞানশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র আর পুরাণাদি থেকে তোমার সমস্ত আবশ্যকীয় জ্ঞান সঞ্চয় করে থাক যদি, তবে তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা সহজ হবে। এমন করে তুলবে নিজেকে এবং নিজের পরিবেশকে, যেন সহজেই স্বামী তোমার কাজের, কথার, চিন্তার সারবত্তা ও যুক্তিযুক্ততা বুঝতে পেরে তোমার মতে মত দেন। কিন্তু খবরদার, তাঁর সামনে যেন নিজের বিদ্যে জাহির করতে যেও না, ঔদ্ধত্য দেখিও না বিনম্র নম্রভাবে তাঁর কাছে নিজেকে ছোট করে এনে ছোটর মত কথা কোও। এমনভাবে চলবে তাঁর সামনে, যেন তাঁর কাছে তুমি অনেক ছোট। তাঁর স্নেহ এবং প্রভুত্ব প্রকাশের সুযোগ তাঁকে দিও। না দিলে পুরুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, পৌরুষের অবমাননা কোরো না। তিনি যে বাড়ির কর্ত্তা, তোমারও কর্ত্তৃপক্ষ, এটুকু গৌরব তাঁর যেন থাকে। ঔদ্ধত্যে নয়, বলে নয়, ছলে কৌশলে চাতুর্য্যে মাধুর্য্যে তাঁকে নিজের মতে আনবে। তাঁকে ভোলাবে, কিন্তু চলা কলা হাব ভাব নিয়ে নয়, শ্রদ্ধাভক্তির মাধুর্য্য দিয়ে। তোমাদের সংসারে যেন অবহিত বহুগোষ্ঠীর চেঁড়ার গোয়াল সৃষ্টি না হয়। অল্প কয়টি ছেলেমেয়েকে মানুষ করে গড়ে তোলাই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। মাথার উপরে ধর্ম্মকে রেখে, সত্য ও ন্যায়কে সম্মুখে রেখে, মুখে হাসি, চিত্তে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা এবং বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করবার শক্তি নিয়ে, নিঃস্বার্থ সেবাব্রত নিয়ে তোমাকে সংসারে অবতীর্ণ হতে হবে। পুরস্কার—স্বামীর কৃতজ্ঞ সাশ্রু আত্ম নিবেদন।

তোমার স্বামীকে যদি তুমি সংযমী, সাধু করে তুলতে পার, তবে তাঁকে তাঁর সাথীদের সঙ্গে

মিশতে দিতে ভয় পেয়োনা—ঈর্ষাতুরা হয়ো না। তুমি মাতৃশক্তি, কিন্তু পুরুষের জীবনে কান্তা শক্তিও আবশ্যক। তুমি বাৎসল্য স্নেহ মনে এনে তোমার স্বামীর প্রতিটি কথা কাজ ও চিন্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে রাশ আল্‌গা করে দিয়ো এবং দরকার বুঝলেই রাশ টেনে আয়ত্বে এনো। স্বামী শাসনের অনেক অস্ত্রই বিধাতা দিয়েছেন তোমাকে। যদি প্রাণপণ করে তাঁর সংসারের সেবা করে থাকো, তবে সে অস্ত্র প্রয়োগের অধিকার তোমার আছে। যদি নিজের মধ্যে ত্রুটি থাকে, তবে অবশ্য অধিকার নেই। তোমার স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে অস্ত্রের অপপ্রয়োগ কোরোনা কিন্তু, তাহলে উল্টো বিপ্লব ঘটবে। যাকে ফেরাতে চাও, তাঁর মতে মত দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে থেকে, সাবধানে একটু একটু করে ফিরিয়ে আনবে। হ্যাচ্‌কা টান দিও না, রাশ ছিঁড়ে যাবে। যদি কোনো দেবী প্রতিমা রূপিণী নারীকে তিনি ভালবেসে থাকেন, তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা হোও, যদি কোনো দুষ্টা নারীর খপ্‌রে পড়েন, তবে প্রাণপণে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কোরো।

তোমারও জীবনে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা, সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে, চাই কি হয়ত ভালও বেসে থাকতে পারো কাউকে। কিন্তু সর্বদা মনে রেখো, দেহপ্রাণ তোমার নিজস্ব নয়, তা সংসারের, সমাজের, দেশের। মন অবশ্য তোমার নিজের। উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রেখে চলতে হবে তোমাকে, যেন তোমার সন্তানেরা মাকে অশ্রদ্ধা করতে না পারে। এজন্য বাহিরে সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য, যথা প্রয়োজন ব্যবহার করতেই হবে। মনে মনে যাঁকে উদ্দেশ্য করে অর্ঘ্য রচনা করেছ, তিনি যেন নিরপর্য্যায়ে নেমে না আসেন। তবেই তোমার প্রেম সার্থক, যদি সে প্রেম সংসারে দাবানল না জ্বালে। তোমার প্রেম যেন তোমার প্রেমিককে দেবতা করে। পতিকে মানুষ হতে বলে, তোমাকে গ্লানি না দেয়। এজন্য তোমাকে সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনা সহ্য করেও মনকে চেপে রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে সংসারে কল্যাণ কুসুমের আবরণ বিছাতে হবে। অশ্রুজল ছাড়া নর-নারীর জীবনের সাথী আর কিছু নেই জেনো। পৃথিবীতে কেউ কারো নয়।

যদি সৌভাগ্য বশতঃ পতি ও প্রেমাস্পদ রূপে একজনকেই পেয়ে থাকো, তবে এমন দুর্লভ সৌভাগ্য যাতে চিরস্থায়ী ও চিরবর্দ্ধিত হয় এবং মরণান্তেও প্রেমস্মৃতি সমুজ্জ্বল থাকে, সে জন্য সারা জীবন সাধনা কোরো। আর পাশ্চাত্য দাম্পত্য বিজ্ঞান শাস্ত্র থেকে তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে শুনে নিতে ভুলো না। আদর্শ কান্তাই আদর্শ প্রিয়া, আদর্শ গৃহিণী এবং ভবিষ্যতে আদর্শ জননী হতে পারেন। প্রিয় কান্তের বংশকে তিনি যেমন করে লালন-পালন করবেন, অন্য মাতা তা' পারবে না।

আদর্শ গৃহদম্পতির জ্ঞাতব্য—

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা। মনোবিজ্ঞান, শিশুমনস্তত্ত্ব জ্ঞান, দাম্পত্য বিজ্ঞান। কৃষি বিজ্ঞান (শস্যক্ষেত্র, সবজীবাগ, ফল বাগিচা ও ফুলের বাগান রচনা) গবাদি পশুপালন ও পক্ষী

শাসন। নন্দন তত্ত্ব (সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প, সেলাই-বোনা ইত্যাদি)। অর্থনীতি। গণিত বিজ্ঞান। দেশ ভ্রমণ বা ভ্রমণ কাহিনী পাঠ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ ও নব্য বিজ্ঞান শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন ও উভয়ের সারবস্তু আহরণ। রন্ধনবিদ্যা ও গৃহকর্ম। (উভয়েরই শিক্ষনীয়) শিশুপালন ও বালক বালিকাকে শিক্ষাদান। সংসারের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও আনন্দ বিধানের খুঁটিনাটি। আদর্শ গৃহনির্মাণ। আদর্শ পল্লী সমাজ স্থাপনা। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য। আদর্শ গ্রাম সংগঠন।

যারা দেহে মনে ক্ষাত্র তেজে উদ্দীপ্ত প্রচুর শক্তিমান, বলশালী, তারাই যাক রাজনীতিতে বা দেশরক্ষী বাহিনী রচনায়। যারা অল্পবলশালী তাদের জন্য শান্ত পল্লীজীবনই বরনীয়। যেখানে বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্বশাসন, স্বাবলম্বী পল্লী সমাজ, স্বয়ং সম্পূর্ণ আদর্শ গ্রাম্য জীবন যাত্রা, স্বল্পে সন্তোষ, নিজকৃত চারু ও কারু শিল্পময় পরিবেশ, নিজরচিত সাহিত্য সঙ্গীত অভিনয়াদির চর্চা, সেই কল্পলোকের দেবসংসারে আমি তোমাদের আবাহন জানাচ্ছি। সেই স্বল্পবলশালী সাধারণ নরনারীকে আমি বলছি,—তোমরা পল্লীকেন্দ্রিক হও, কুটীর শিল্পে মন দাও। মনকে শান্ত সুস্থ প্রফুল্ল রাখো। মাটি জল উদ্ভিদ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ নরীসৃপ সকলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপনা কর। সকলের সুখ দুঃখের অংশভাগী হও। সকলের কল্যাণব্রতে ব্রতী হও।

দক্ষ ঠাকুরাণী

(একটি বাস্তব চরিত্র চিত্র)

শ্রীকণা দেবী ভারতী

চৈত্র মাসের দারুণ রোদে দক্ষ ঠাকুরাণী একটি সৎ-বামুনের খোঁজে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। খোঁজও একটা পাওয়া গেছে। মুখুজ্যেদের হারাণ নাকি তিন বেলা আহ্নিক করে থাকে ও নিষিদ্ধ জিনিস খায় না। তা'ছাড়া গত বছর গাঁয়ের বারোয়ারি তলায় বাজি ধরে ভরা পেটে দু'সের রসগোল্লা খেয়েছিল। এই ঘটনা চোখে দেখেছেন যিনি—তিনি গ্রামের একজন মাতব্বর ও সাধু লোক। অতএব ব্রহ্মতালুতে একটি ডিজে গামছা চাপিয়ে দক্ষ ঠাকুরাণী মুখুজ্যে-বাড়ির অন্দরে এসে হাঁক দিলেন—"হারাণ, বাড়ি আছিস ?"

তাঁর গলার স্বর শুনে হারাণ ছোকরা ভয় পেয়ে গেল। চণ্ডীতলায় মানত করা ঠাকরুণের একটি পাঁঠা গত রাত্রিতে নিরুদ্দেশ হয়েছে। গ্রামের সবাই এক বাক্যে বললেন, পাড়ার বখাটে ছোঁড়াদেরই এই কাজ। বলা বাহুল্য সেই ছোকরা-দলের নেতা স্বয়ং হারাণ।

দুরু-দুরু বক্ষে হারাণ বেরিয়ে এল দাওয়ায়। না, পাঁঠার প্রসঙ্গ নয়, এক গাল হেসে দক্ষ ঠাকুরাণী বলে উঠলেন—"বাঁচলুম; এবার 'মাস বামুন' খাবার পালায় আমার বাড়িতে তোকে খেতে হবে ভাই।"

হারাণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল—"শরীরটা ভাল যাচ্ছে না ঠানদি। তুমি—তুমি চক্কোত্তীদের গণেশকে বল। তা ছাড়া ও বেল খাইয়ে—"

"আ:—আমার পোড়া কপাল! গণশা আবার খাইয়ে? সেবার পুষ্যিমেতে বউমা ওকে বামুন করেছিল। শেষ পাতে সোটা কতক ভাঁপা-সন্দেস আর ক্ষীর দিতেই কেঁদে ফেলল। ও: নাকি গা গুলোচ্ছে বলেই—পাত ছেড়ে উঠে পড়ল হতভাগা। দই-পায়েস রইল পড়ে।"

একটু দম নিয়ে দক্ষ ঠাকুরাণী আবার বলতে শুরু করেন—"তুই আর অমত করিস নে দাদা—বৈশেক মাস, ধম্মো মাস। কি-বছর বামুন খাচ্ছে। ভাঁপা-ধম্মো তো কিছুই করা হ'ল না। স্বস্তুরের ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছি। আমার পরকালের জবাব দেবার আর রইল কী? তোরা থাকতে আমার এই দুর্গতি? পোড়া গাঁয়ে লোকও নেই!" দক্ষ ঠাকুরাণীর চোখ সজল হয়ে উঠল।

এরপরে মুখ গোঁজ করে হারাণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। কিন্তু ভোজ খেতে গিয়ে তার কান্না পেতে লাগল। সুক্তো, ডাল, ঘণ্ট, চচ্চড়ী, ভাজা, ডালনা, অম্বল, দই, পায়েস অবধি কোন ক্রমে সহ্য করেছিল, শেষ পাতে দক্ষ ঠাকুরাণী একটা জাম বাটিতে ঘন দুধ ও থালা প্রমাণ দু'খানা আমসত্ত্ব ও গোটা পাঁচেক কলা নিয়ে গুছিয়ে বসলেন:

হারাণ কাতরভাবে বলল, "মরে যাব ঠানদি, আর পারছি না!"

"ওমা, ও কি একটা কথা হল রা? তোমার ছেলে তুই! আমার গাছের কলা—আর হাতের তৈরী আমসত্ত্ব এটুকু খেতেই হবে ভাই! দাঁড়া,—পাটালি এনে দিচ্ছি—"

দক্ষ ঠাকুরাণী পিছন ফিরতেই হারাণ কাঁধের শুকনো গামছা খানা দুধের বাটিতে ডুবিয়ে ফেলল। শুকনো গামছা দুধ টেনে নিতেই সে হাতের মুঠোয় গামছা ধরে উঠে পড়ে। ফিরে এসে দক্ষ ঠাকুরাণী (চোখে একটু কম দেখেন) ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলেন—"চুমুক দিয়েই দুধটা খেয়ে নিলি?"

হারাণ ততক্ষণে খিড়কী পুকুরের রাস্তায়। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল "আর একদিন এসে তোমার পাটালি—আমসত্ত্ব খেয়ে যাব ঠানদি।"

সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। দক্ষ-ঠাকুরাণীর দল আমাদের সমাজ থেকে এখন নিশ্চিহ্ন! এই সব বিচিত্র চরিত্রের কাহিনী এ যুগের মানুষদের কাছে গল্প বোধ হতে পারে। কিন্তু এঁরা একদিন সত্যিই ছিলেন, মানুষকে খাইয়ে এঁরা আনন্দ পেতেন।

(হায় রে সেকাল) মহারাণীর আমলে এইসব ঠাকুরপদের মেজাজও প্রায় রাণীর মতই ছিল।

শোনা যায় রুক্ষ ঠাকুরাণীর পেট-রোগা স্বামীটি স্ত্রীর 'খাওয়ার আদর' সহ্য না করতে পেরে অকালেই কাশীবাসী হয়েছিলেন।

যাক্ এবার তাঁর আম্র-মহোৎসবের কাহিনী শুরু করছি। বিরাট আম বাগানের মালিকানা স্বত্ব পেয়েও ঠাকুরুণের মনে শান্তি ছিল না। আত্মীয়-কুটুম্ব দেশান্তরী; তাই আম পাকলেই তিনি নিঃশ্বাস ফেলে আক্ষেপ করতেন—'কত আম ফেলা-ছড়া যায়, কাক-চিলে খায়, আপন জনের মুখে ওঠে না। ভুলেও কি দেশে আসতে নেই?' মনের দুঃখ মনে চেপে 'বউনি' করতেন পাকা আমের ঝুড়ি গুরুদেবের বাড়িতে পাঠিয়ে। গুরু-প্রসাদী শেষ করে গাঁয়ের মন্দিরে আম ভোগ দিয়ে এবার সৎ ব্রাহ্মণের পাতে দিতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। গাঁয়ের ঘরে ঘরে আম খাবার ধুম পড়ে যেত। প্রায় বাড়িতেই রাতে হাঁড়ি চড়ত না। মুড়ি-চিড়ের ফলার যত ইচ্ছা পেট ভরে খাও শুধু রাধুনী মোক্ষদা গজ্‌গজ্ করতে আপন মনে—'এত বিলোনো কেন বাপু! দু এক ঝুড়ি আমাদের দিলে তো হয়। মেয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতুম।'

কি পাচীর মা খল্ খল্ করে হেসে বলত, সত্যি বাপু! গিন্নীমাকেও কোনদিন আম খেতে দেখলুম না গা—"

"আম খাবে কী? হবিষ্যি তো করেন নিকে-সেদ্ধ, আর খানকুনীর ঝোল দিয়ে। বাতপিত্তের রোগী—চেরকাল তো দেখছি।"

"হ্যাগা মাসী। সেই সিঁদুরে আম তো ঝুড়ি-ঝুড়ি পচে যায়; ও আম তো কাউকে দেন না—তবে ঝুড়িতে রাখ কেন?"

"ওমা, ওগুলো যে পোকা আম। বাইরে সোন্দর—ভেতরে পোকা। কি—জানি বাপু রাত্তিরে যখন জল খান, একটা ডালায় করে, পোকা আম গোটা চার পাঁচ রেখে আসি। চেয়ে চেয়ে দেখেন বোধ হয়! বড় লোকদের মনের কথা আমরা কি জানি।"

একটু ধোঁকা মুখে পুরে ক্ষুব্ধ চিত্তে মোক্ষদা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল।

নিশুত রাত। রুক্ষ ঠাকুরাণী আহ্নিক সেরে জল খেতে বসলেন। মেঝেতে ঢাকা দুধ, পাশে পাথরের থালায় গোটা কতক আম। এক চুমুকে দুধটুকু খেয়ে, আলোর দিকে পেছন ফিরে বসে আম খেতে শুরু করেন। ঠিক সেই সময় এক গ্লাস জল নিয়ে মোক্ষদা ঘরে ঢুকে 'খ'! গিন্নীমা আধো-আঁধারে চোখ বুজে পোকা-আম খাচ্ছেন। ঝন্‌ঝন্ শব্দ! মোক্ষদার হাত থেকে পাথরের গেলাস পড়ে দু' টুকরো হয়ে মেঝেতে গড়াতে থাকে।

মা

বেলা দেবী

সে ভাল থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি, তার ক্রুর কুটিল সমাজ, এই কুটিল সংসার তাকে ভাল থাকতে দেয়নি। হিংস্র শ্বাপদের মত ফণা তুলে তাকে ছোবলে ছোবলে জর্জরিত করে দিয়েছিল, তার দু'চোখ থেকে পৃথিবীর আলো কেড়ে নিয়েছিল। আমি আমার ঠিকে ঝি কুসুমমালার কথা বলছি।

গায়ের রঙটা কর্দা, আঁটোসাঁটো শরীরের বাঁধুনি, দেহে ভরা যৌবন, কিন্তু মুখের চেহারা বীভৎস কদাকার, সারামুখে ক্ষতচিহ্ন। নাকটা বাঁকা, এবড়ো খেবড়ো দু'টো ঠোঁট আর চোখ দু'টো নিশ্চিহ্ন। কপালের উপরে মাথার তালু পর্যন্ত টাকের মত পোড়া দাগ। সেখানে চুলের চিহ্নমাত্র নেই।

কুসুমমালা দু'তিন বাড়ীতে বাসনমাজা ঠিকে ঝি'র কাজ করে। চোখে দেখে না তাই কুসুমমালার একমাত্র সন্তান পুষ্পমালা তাকে হাতে ধরে বাড়ী বাড়ী নিয়ে যায়। কলতলায় এঁটো বাসনের ডাঁইএর কাছে বসিয়ে দেয়। হাতে ধরিয়ে দেয় পালপাতা আর ছাই, দৃষ্টিহীন চোখেই কুসুম নিপুণহাতে বাসন মাজে, আর পুষ্প ধুয়ে ধুয়ে সে বাসন ঘরে তোলে।

কুসুমমালার কাহিনী বড় নিষ্ঠুর, বড় করুণ কাহিনী। একদিন ছিল যেদিন কুসুম দেখতে রূপসী ছিল। তার টিকোলো একটি নাক ছিল। পানের রসে রাঙ্গা পাতলা দু'টি ঠোঁট ছিল। মাথায় চুলের অরণ্য ছিল। আর ছিল আজকের দৃষ্টিহীন দু'টো চোখের গর্তে ঢলোঢলো মায়াময়া দু'টি চোখ। সেই কুসুম কি করে আজকের কুসুমে রূপান্তরিত হলো তাই নিয়েই তো এই কাহিনী।

বস্তির মধ্যে একটি খুপরি ঘর নিয়ে বাস করতো সকন্যা কুসুমমালা। বাড়ী বাড়ী ঠিকে ঝি'এর কাজ করে দিন কাটত। স্বামী একটা কারখানায় মিস্ত্রী ছিল। র‍্যাকসিডেন্ট হয়ে মারা যায়। সেই থেকে কুসুম এই বস্তির বাসিন্দা। যখন এলো মেয়েটার বয়স তখন বছর পাঁচ। আর কুসুমের সবাঙ্গে সাতাশ বছরের ভরা যৌবন।

এই রূপযৌবনই হয়ে দাঁড়াল কুসুমের শত্রু। পাশের ঘরের ভাড়াটে নবীনকৃষ্ণ লোভের দৃষ্টি ফেলল কুসুমের দিকে। বত্রিশ বছরের ভাগড়া জোয়ান নিঃসন্তান বিপত্নীক নবীনকৃষ্ণ। যখন তখন কুসুমের সুখ সুবিধে দেখতে আসে সব ব্যাপারে দরদ সহানুভূতি দেখায়।

কুসুম যে কিছু বোঝে না তা নয়। কিন্তু সৌজন্য হারায় না। নবীনকৃষ্ণ দাওয়ায় বসে বসে বিড়ি টানে। কুসুম হয়ত কলাইকরা মগে করে চা-ও এনে দেয়।

বস্তির মধ্যে সরস্বতীর সঙ্গে কুসুমের সবচেয়ে বেশি ভাব। সরস্বতী কুসুমেরই সমবয়সী। মুখ টিপে হেসে বলে—কি রে কুসুমি, আবার ব্যান বিয়ের ফুল ফোটবো ফোটবো করছে।

তোর মরণ! কুসুম ঝঙ্কার দেয়।

তা আমি মরি কেতি নেই। কিন্তু কথাটাতো মিছে নয়। আর দোষেরই বা কি বল্। তুইও বেধবা সেও বেধবা। মিলবে ভাল।—সরস্বতী খিকখিক্ করে হাসে।

পোড়ারমুখে হাসি দেখনা। কুসুম দ্বিগুণ ঝঙ্কার দেয়।

আহা! তোমরা পীরিতের মরবং খেতে পার আর বললেই আমার পোড়ার মুখ হল, না?

কুসুম এবার গম্ভীর হয়ে বলল—ওসব কথা বলতে নেই সরি, আমি মেয়ের মা।

সরস্বতী থমকে গেল। পরিহাস ছেড়ে স্বাভাবিক গলায় বলল—তুই কি নবীনকেষ্টর ভাবসাব কিছু বুঝতে পারছিস না?

খুব বুঝি।

তাহলে।

দাঁড়া না, বেবস্থা করছি।

সরস্বতী শঙ্কিতকণ্ঠে বললে কি বেবস্থা করবি। ওকে বেশি ঘাটাস না বাপু। একটু গুণ্ডা মতন মানুষ। কি কত্তে কি করে বসে।

না না, ভয় করিসনে। তবে এমন দাওয়াই দেব না। বেশিদিন চেয়ে, আর চ্যাঁ ভোঁ করবার ক্ষ্যামতাটি থাকবে না। হ্যাঁ, আমার নাম হলগে কুসুমমালা।

সেদিন নবীনকৃষ্ণ ঘরের দোরে তালা দিয়ে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে কুসুম ডেকে বললে—অ কেষ্টদা, আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরোগো সন্ধ্যেবেলা আমার ঘরে একটু এসো—

নবীনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে পড়ল—কেন গো কুসুম। কিসের তলব।

এসোই না।

সেদিন ছিল ভাইফোঁটা। সন্ধ্যেবেলা কুসুমের ঘরে শাঁখের আওয়াজ শুনে সরস্বতী গলা বাড়িয়ে দেখল পিদিমের সামনে একটা আসনের উপর হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছে নবীনকৃষ্ণ। কুসুম তার কপালে ফোঁটা দিয়ে প্রণামী একখানা ধুতি পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলে। বললে গড় হইগো কেষ্টদাদা, সারাজনম যেন তোমার বুন হয়ে থাকতে পাই। বেপদে আপদে এই দুখী বুনটারে একটু দেখ গো।

ব্যাপারটার আকস্মিকতায় নবীনকৃষ্ণ কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল। আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত কুসুমের কথাগুলি বুঝি তার মনকে স্পর্শ করল, সে কুসুমের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল।

পরদিন সরস্বতীর সে কি হাসি! বলে-বাবা! রসড় জানিস বটে তুই।

মিনুসেকে ধরে একেবারে ভাই ফোঁটার আসনে বসিয়ে দিলি।

কুসুমের মুখেও চাপা হাসি।

সেই থেকে সত্যি বুঝি পরিবর্তন হল নবীনের। আরও দুটবার ভাইফোঁটার আসনে বসল। উপদ্রব নেই। শুধু নির্দোষ আন্তরিকতা। কুসুমও প্রতিদান দেয়। ভালমন্দ এটাওটা, রান্না করে তরকারিটা আপটা ধরে দিয়ে আসে। বলে আর কতকাল এমনি হাত পুড়ে ভাত খাবে কেষ্টদা। ঘরে একটা ভাত আনো।

নবীনকৃষ্ণও বলে তুমার মত বুন থাকতে চিন্তা কি!

দেখেশুনে হাসতে হাসতে সরস্বতী বলে তোর মাথা বটে একখান কুসুমি। কিস্তির একখানা বার করলি বটে। মাংসখেকো বাঘকে একেবারে ঘাসখেকো পাঁটা বানিয়ে ছাড়লি। দুই বেটাছেলে হলে নেকাপড়া শিখলে জজ ম্যাজিষ্টর হতে পারতিস।

কুসুম গৌরব উদ্ভাসিত চাপা হাসিতে এই প্রশংসাটুকু উপভোগ করে।

মাঝরাত্তিরে কড়ানাড়ার শব্দ শুনে কুসুম দরজা খুলে দেখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নবীনকৃষ্ণ।

তুমি এত রাত্তিরে কেষ্টদা।

কুসুম, আমি আর পারছিনে। দিনরাত্তির বুকের ভেতরটা কুরে খাচ্ছে। তুমি কি তা কোনদিন বোঝবে না কুসুম।

বুঝেছি, আমার কপালে কের শনি লেগেছে। কিন্তু তুমি এখন যাও কেষ্টদা। ঘরে আমার মেয়ে রয়েছে।

কুসুম শক্তহাতে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

পরদিন কুসুমের ঘরে এসে নবীনকৃষ্ণ জোর গলায় দাবী জানাল—কুসুম, আমি তোমাকে বিয়ে করব।

কুসুম শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল—আর আমার পুন্নি?

সেও আমার ঘরে আমার মেয়ের মত থাকবে।

তোমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি হবে? সে তোমাকে কি বলবে?

একটু থতমত খেয়ে গেল নবীনকৃষ্ণ। তারপর সব দ্বিধা ঝেড়ে জোর গলায় বললো—বাবা বলবে।

একবার আগল ভেঙে গেলে তারপর আমি তো চৌদ্দটা বিয়েও করতে পারি। পুন্নি কি তাহলে চৌদ্দজনাকেই বাপ বলবে না কি?

মিছে বলছ কেন কুসুম। বিধবার কি বিয়ে হয় না।

হয়। কিন্তু যার ছেলে আছে মেয়ে আছে তার হয় না। হওয়া উচিত নয়। মেয়েছেলে

'ভই' হলে কত দোয়ামীই হতে পারে, কিন্তু জন্মদাতা বাপ একজনই হয়। না না আমি পারব না কেষ্টদা। আমার পুষ্পিকে এমন অপমান আমি করতে পারি না। তার মাথা হেঁট করে দিতে পারি না। আমি যে মা।

কুসুমের কাহিনী আমি কুসুমের মুখেই শুনেছিলাম। যখন নবীনকৃষ্ণর সঙ্গে তার এই কথাগুলি হচ্ছিল তখন সে কি করছিল কোন ভাষায় কথা বলছিল তা আমি জানি না। হয়তো তখন সে মাটি চটকে উনুন নিকোচ্ছিল বা গোবরের তাল হাতে নিয়ে বেড়ার গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুঁটে দিচ্ছিল। কিন্তু আমার মনে ভেসে ওঠে এক মহীয়সী মাতৃমূর্তি। খাটের এক প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসেছে। হাত দু'টি কোলের উপর জড়ো করা। সংসারের সব কিছু প্রয়োজনের ঊর্ধে পৃথিবীর নীচতা দীনতা ছাড়িয়ে অন্য লোকে যেন চলে গেছে সে। মাতৃত্বের গৌরবে মুখখানা উদ্ভাসিত। মাথা উঁচু করে সে যেন বলছে—আমি কি নীচে নামতে পারি! আমি যে মা।

কুসুম নবীনকৃষ্ণকে বলেছিল—বুঝেছি কেষ্টদা, তুমি আর এ বাড়ীতে আমারে বাস করতে দেবা না।

অন্য বাড়ী ঠিক করল কুসুম। এ বাড়ী ছেড়ে উঠে যাবে। ঠেলাগাড়ীতে মোটঘাট উঠানো হয়েছে। নিজেও ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। এবার রওয়ানা হবে। এমন সময় নবীনকৃষ্ণ বাইরে থেকে একটা বোতল হাতে করে বাড়ীতে ঢুকল। কুসুমের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে নিজের ঘরে গেল।

কুসুম সরস্বতীকে শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেছে হঠাৎ দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নবীনকৃষ্ণ। তার হাতে একটা কাপ। কুসুমের কাছাকাছি এসে কাপের তরল পদার্থটা ছুঁড়ে মারল কুসুমের মুখে। মারে বাবারে জ্বলে গেলরে।

চীৎকার করে উঠলো সরস্বতীও। ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এলো সবাই। দেখলো নবীনকৃষ্ণ দৌড়ে পালাচ্ছে। কুসুমের মুখ কালীবর্ণ। মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মাটিতে গড়াচ্ছে কুসুম। কাপটা গড়াচ্ছে কাছেই। একজন জলের ঘটি হাতে নিয়েই ছুটে এসেছিল। সে এসে ঘটির জলটা ঢেলে দিল কুসুমের মুখে, জলের কাপটা দিতে লাগল। ছ'মাস ভুগে বেঁচে উঠল কুসুম বেঁচে উঠল আজকের এই মূর্তি নিয়ে। আর সাত বছরের জন্য জেলে গেল নবীনকৃষ্ণ। সরস্বতী গাঢ়কণ্ঠে বললে—পুষ্পি যেন তোর এই মহত্ত্বের মর্যাদা দিতে পারে কুসুম।

সবাই কুসুমকে দেখে আঁৎকে উঠে। বলে—বাপ্! কি ভয়ানক চেহারা! আমি কিন্তু ওকে ততটা কুৎসিত দেখিনা, মনে হয়—সেই বিকৃত মুখখানাতে তার শুচিশুভ্র স্বর্গীয় মাতৃমনটি যেন ফুটে উঠেছে।

গল্পভারতী

কার্ত্তিক ১৩৭৬

সকলেরই পছন্দসই বিস্কুট

লিলি

থিন

এরারুট

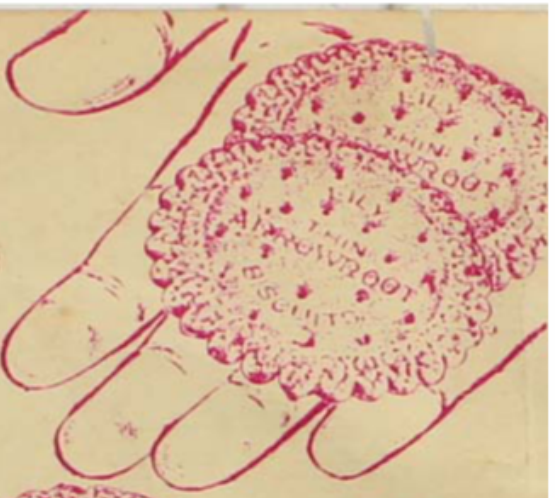

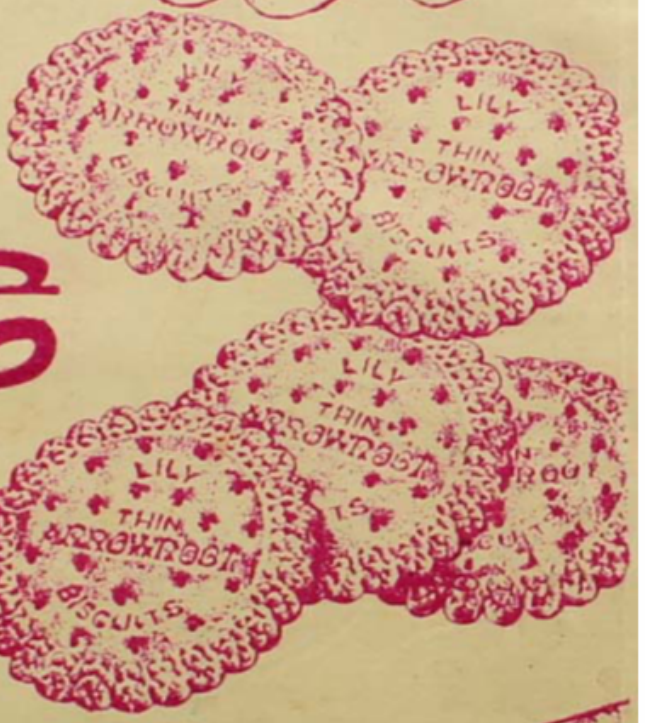

রোগী ও রুগ্ন ব্যক্তিদের
পক্ষে বিশেষ উপযোগী

সকলেই স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন
সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা৪

লিলি বিস্কুটই কিনবেন

আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষা দীক্ষায় ও কাজে কর্মে যতই উন্নত হবে ততই কল্যাণ হবে আমাদের সমাজের ও দেশের।

গল্পভারতী "মেয়ে-মজলিশ"এ আমরা এখন থেকে নানা বিভাগে কৃতবিদ্য মেয়েদের উল্লেখ যোগ্য সংবাদ পরিবেশন করবো—

সম্পাদিকা মেয়ে মজলিশ

শ্রীমতী রত্না মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৬৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজি বি-এসসি অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ইনি স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম কন্যা এবং স্বনামধন্য স্বর্গীয় ডাঃ শিবপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্রী। শ্রীমতী রত্নাদেবী পাইওনীয়ার মিটিং মিলস-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত শিবপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় (এফ. আর. সি. এস.)-এর পত্নী। ডাঃ কল্যাণকুমার একজন প্রখ্যাত অরথোপেডিক সার্জেন, বর্তমানে ইংলণ্ডে একটি বড় হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

অধিকতর কর্ম্মশক্তি ও আনন্দ

সকল বয়সের জন্য

সুস্বাদু ও পুষ্টিকর

লিলির গ্লুকোজ বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৩

বিভি বিস্কুটই কিনবেন

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের একান্ত প্রয়োজন লিলি ব্র্যান্ড বার্লি

নিয়মিত খেলে
শক্তি ও স্বাস্থ্য গঠনে
সাহায্য করে।

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য

লিলি ব্র্যান্ড বার্লি

লিলি ব্র্যান্ড বার্লি বলেই চাইবেন

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৬৭

সকলেরই পছন্দসই বিস্কুট

লিলির

থিন

এরারুট

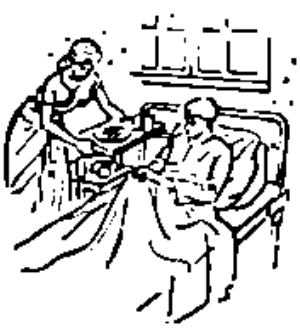

রোগী ও রুগ্ন ব্যক্তিদের
পক্ষে বিশেষ উপযোগী

সকলেই স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন
সর্বদাই বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

লিলি বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

LB-32/56

বিভিন্ন বিস্কুটই মিলবে

বিপ্লব-বাদের প্রথম

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরালম্ব স্বামী (বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

আবির্ভাব : ৫ই অগ্রহায়ণ ১২৮৪

ইং ১৯শে নভেম্বর ১৮৭৭

তিরোভাব : ১৯শে ভাদ্র ১৩০৭

ইং ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

দিনের শেষে আপনি যখন কাজ করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন

এক গ্লাস টাটকা লিলি বার্লি খেলে
অনেক আরাম ও আনন্দ পাবেন

লিলি ব্র্যান্ড বার্লি বলে চাইবেন

আধুনিক
বিজ্ঞানসম্মত
কারখানায় প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৩

॥ লীলাময় ॥

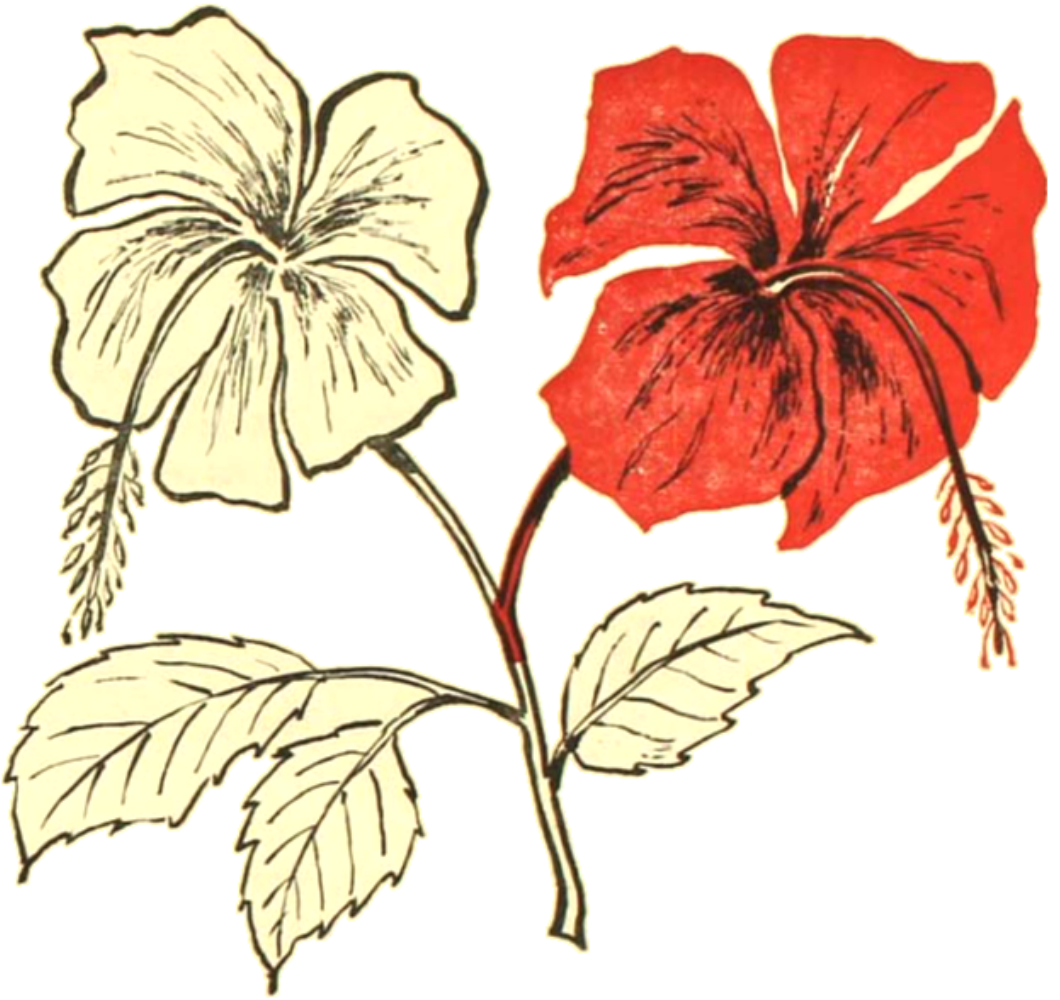

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পূজারী গদাধর।

তখনও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ হননি।

কিছুদিন থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করছেন তিনি। কাঙালীরা খেয়ে গেছে, তাদের উচ্ছিষ্ট পাতা পরিষ্কার করছেন, ঝাঁটা হাতে নিয়ে মেথরের কাজ করছেন, কাঙালীদের পাতা থেকে উচ্ছিষ্ট খাবার প্রসাদ বলে মুখে তুলে নিচ্ছেন।

ভাবাবেশে সব সময়েই বিভোর হয়ে আছেন তিনি। মায়ের পুজোর আগেই ভোগ দিয়ে দিচ্ছেন। পুজোর ফুল চন্দন মায়ের চরণে না দিয়ে নিজের মাথায় রাখছেন।

সবাই ভাবছে বুঝি মানুষটি পাগল হয়ে গেছে।

পাগল ছাড়া কী আর বলা যায় তাকে?

পরবার কাপড়টা পর্যন্ত ঠিক রাখতে পারেন না।

তার জন্যে লজ্জা-টজ্জা করেন না কাউকে।

কেমন যেন ভাবে বিভোর হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন এদিকে-ওদিকে, আর ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন, মা মা, কোথায় তুই?

মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই।

আর গাড়ি নেই। গাড়ি বাড়ি হয়েছে। যাত্রীরা যাবতীয় বস্তু নিয়ে এসেছেন সঙ্গে। উনুন বানিয়ে খিচুড়ি অথবা ডালভাত ফুটিয়ে নিয়েছেন এক ফাঁকে। এখন গান শুনছেন। ঘুম পেলে গাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়বেন।

যাঁরা হেঁটে এসেছেন, তাঁদের কেউবা, কোন আশ্রয়ে ঠাঁই নিয়েছেন, কেউবা গাছতলায় বাসা বেঁধেছেন। আর যাঁরা তা পাবেন নি, তাঁরা পথের ধারে কিম্বা মাঠে কখন অথবা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বেন। রাতটা কেটে যাবে কোনমতে। রাত তো চিরস্থায়ী নয়, সে যতই হিমেল হক, একসময়ে যাবে ফুরিয়ে।

জয়দেব মন্দির—কৈন্দুলি

—ফটো—ডাঃ স্বপন রায়চৌধুরী

বাস থেকে নেমে মেলার দিকে তাকালে প্রথমেই নজরে পড়ে একটি সুন্দর ও সুপ্রাচীন মন্দির পোড়ামাটির মন্দির। অনেকটা বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত স্থাপত্যকলার মতো। এটিই জয়দেবের মন্দির। মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের অর্থানুকূল্যে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। সাধক কবি জয়দেব সেবিত শ্রীরাধামাধব মন্দিরের মূল বিগ্রহ। পাশে রয়েছে লক্ষ্মণ সেন সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দ। উভয় বিগ্রহই ভারী সুন্দর।

জয়দেব মন্দিরের অনতিদূরে রাম-সীতা এবং কৃষ্ণ-বলরামের মন্দির। বেশ বড় মন্দির। তিন ভাগে বিভক্ত। সামনে বারান্দা। ভেতরে কৃষ্ণ-বলরাম, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, গৌর নিতাই ও অদ্বৈত এবং গোপাল মূর্তি। সংস্কার অভাবে নাটমন্দিরটি ভেঙে গেছে। মন্দিরে যাবার পথে বিরাট জায়গা জুড়ে কাছারীবাড়ি - মহাপ্রভুজীউ এবং রামচন্দ্র ঠাকুরজীউ রাধামাধবদিগের দেবত্তর এস্টেট। আগে বহু সম্পত্তির মালিক ছিলেন এঁরা। এখন কিছু নেই বললেই চলে! ভূমি-সংস্কার আইনে চোদ্দ বছর আগে সে সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন। দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এক পয়সাও পাওয়া যায়নি। তাই এস্টেটের ম্যানেজার শ্রীঅতুল দত্ত দুঃখ করে বললেন,

সকলেরই পছন্দসই বিস্কুট

লিলির

থিন

এরারুট

রোগী ও রুগ্ন ব্যক্তিদের
পক্ষে বিশেষ উপযোগী

সকলেই স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন
সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

লিলি বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

ছিলেন পরাক্রান্ত নৃপতি ; তাঁর রাজ্য বাঁকুড়া থেকে ফরিদপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; তিনি গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক নিদর্শন ছাড়াও শুশুনিয়া পাহাড়ের নিসর্গ শোভা সকলের মন সহজেই কেড়ে নেয়। তাই মেলায় আসা মানুষের অনেকেই শুশুনিয়া পাহাড়ে ওঠেন। এ সময় পাহাড় আগন্তুকদের জন্যে তার সৌন্দর্য্যের পসরা সাজিয়ে অপেক্ষা করে। গাছে গাছে নবকিশলয়, শিমুলের ডালে লালফুলের মাতন। কোকিল ও তারকের কলতান শেষ-বসন্তের আকাশে-বাতাস ভরিয়ে রাখে। রোদের তেজ থাকলেও সকলেই কষ্ট স্বীকার করে পাহাড়ে ওঠা-নামা করে। পথশ্রমের পরে নীচে নেমে এসে ঝরণার ঠাণ্ডা ধারায় যখন অবগাহন করা হয় তখন প্রশান্তিতে মন ভরে ওঠে।

বাসুলী দেবীর মন্দির

মেলা থেকে ফেরার পথে অনেক ছাতনায় কবিকের বিরতি দেন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচয়িতা বাসুলী উপাসক বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান এই ছাতনায়। বড়ু চণ্ডীদাসের সময়ের পাথর নির্মিত বাসুলী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছাতনা শুশুনিয়া পথের পাশেই দেখা যায়। বাসুলী দেবীর আসল বিগ্রহটি যে মন্দিরে পূজিত হচ্ছে সে মন্দিরটি ছাতনার দুবরাজপুর গ্রামে রাস্তার পাশে অবস্থিত। মন্দির গাত্রের এক ফলক থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটির গঠন নৈপুণ্য খুবই সুন্দর। মন্দির গাত্রে কিছু পোড়ামাটির অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সর্বপাপহরা বাসুলী দেবীর চরণে প্রণাম নিবেদন করে মেলার যাত্রীরা মেলা শেষের বাসে নিজ নিজ স্থানে ফিরে চলেন।

শুধুই কেশ তৈল নয় একটি কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকীই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্বতা রোধ করে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-১

SA-2/69

Regd. No. C3643

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

15 MAY 1970